# গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

বরুণকুমার চক্রবর্তী

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৪০০, এপ্রিল, ১৯৯৩

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭৩

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক, সুখ্যাত কবি ও খ্যাতকীর্তি শিক্ষাবিদ্
অধ্যাপক ড. কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, ডি. লিট্

শ্রদ্ধাভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

সাহিত্য অন্বেষা
সাহিত্য সমীক্ষা
বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত
টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য
লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ (২য় সংস্করণ)
বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র (৩য় সংস্করণ)
লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার (৪র্থ সংস্করণ)
লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ
বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়
নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ
প্রগল্প (২য় সংস্করণ)
বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস (৪র্থ সংস্করণ)
উইলিয়াম মর্টনের দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ (সম্পাদিত)
চৈতন্য পরিক্রমা (সম্পাদিত)
সবিনয় নিবেদন
প্রসঙ্গ : লোকপুরাণ
বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার (সম্পাদিত)
প্রবন্ধসংগ্রহ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদিত)
ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যসম্ভার (সম্পাদিত)
প্যারীচাঁদ রচনা সংগ্রহ (সম্পাদিত)
লেটো
লোকজ সংস্কৃতি : প্রেরণা ও প্রেক্ষিত
বাংলার লোকক্রীড়া
লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা
বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতি চর্চা (সম্পাদিত)
বাংলার লোকসংস্কৃতি (যুগ্মভাবে সম্পাদিত)
তুলনামূলক লোকসংস্কৃতি (সম্পাদিত)
বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ (সম্পাদিত)
লোক প্রযুক্তি
লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে
Essays on Folkloristics

# নিবেদন

বাংলা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্তমানে এক স্বীকৃত সত্য। আমাদের লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য রসিক মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে। বিদেশীয় পণ্ডিত, গবেষকগণও তাই আমাদের লোকসাহিত্য আলোচনায় বহু পূর্ব থেকেই আত্মনিয়োগ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

আমাদের গীতিকা, লোকসাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ বিশেষ। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যালাডের যে সংখ্যাধিক্য, আমরা হয়ত সে গৌরবের অধিকারী নই, কিন্তু যে অর্ধ শতাধিক গীতিকা ইতিমধ্যেই আমাদের হস্তগত, যেগুলির জন্য আমরা বিশেষভাবে দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রকান্ত দে'র কাছে ঋণী, দুঃখের বিষয় সেগুলির একটি ব্যতীত এ পর্যন্ত আনুপূর্বিক আলোচনা হয়নি। তাও সেটির আলোচনার কৃতিত্ব চেক্-পণ্ডিত ও গবেষক দুশান জাভেটিলের। বাংলা ভাষায় আমাদের গীতিকা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা এই প্রথম।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যেখানে একান্তভাবেই ঈশ্বরকেন্দ্রিক, গীতিকাগুলিতে সেক্ষেত্রে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষেরই রাজকীয় আধিপত্য। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায়, বিশেষতঃ যখন আমাদের সমাজে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না একেবারেই পরিণামে সকল বিষয়েই পুরুষের অনুশাসন মেনে চলতে গিয়ে আমাদের নারীরা পুরুষের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল, তদুপরি সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-বেহুলার দৃষ্টান্তে স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে গ্রহণ করার যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নারী যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একান্তভাবে পরভৃতিকায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তখন বিস্ময়করভাবে গীতিকার নারীচরিত্রগুলি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হওয়ার কারণে একান্তভাবে অসচেতন পাঠকের দৃষ্টিও সহজেই আকর্ষণ করে। আমরা জানি গীতিকাগুলির রচয়িতারা সকলেই পুরুষ, অথচ অকপটে এঁরা নারীর মহিমাকে বড় করে তুলেছেন। নায়িকা চরিত্রগুলির তুলনায় নায়ক চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ, ম্রিয়মাণ, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, আদর্শভ্রষ্ট এবং অকৃতজ্ঞরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিপরীতক্রমে গীতিকার নায়িকা চরিত্রগুলি ত্যাগে, তিতিক্ষায়, বিরল কর্তব্যপরায়ণতায়, কৃচ্ছ্রসাধনে, অসাধারণ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই গীতিকাগুলির মুখ্য আকর্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে। নারী চরিত্রগুলির বিবিধ বিরল গুণের মূলে তাদের অন্তরের অমোঘ প্রেমশক্তিকেই দায়ী করতে হয়।

অধিকাংশ গীতিকাতেই ঈশ্বর অনুল্লিখিত থেকে গেছেন বিস্ময়করভাবে। যেখানে উল্লিখিত হয়েছেন, সেখানেও বন্দনা গানে যান্ত্রিকভাবে, অথবা বিভিন্ন সময়ের পূজার্চনার বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে দু'একজন দেবদেবী উল্লিখিত হয়েছেন, উল্লিখিত হয়েছেন সামাজিক রীতির বিবরণ দান প্রসঙ্গে।

মূলতঃ প্রণয়, তাও আবার প্রাক্‌বিবাহ পর্বের প্রণয়কেন্দ্রিক রচনা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের লোককবিরা যে অসাধারণ সংযম ও শালীনতাবোধ রক্ষা করে এইসব বিবরণ দান করেছেন, তাতে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। উল্লেখ্য যে এঁরা কেউই সহজলভ্য জনপ্রিয়তার পথ অবলম্বন করেন নি।

বলা হয় গীতিকা রচয়িতারা নাকি সব নিরক্ষর কবি, সেক্ষেত্রে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে তবে এইসব কবিরা গীতিকাগুলি রচনার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় শিল্পগুণের পরিচয় দিলেন কি রূপে?

মধ্যযুগের সাহিত্য যেহেতু মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক তাই সেই সূত্রে অলৌকিকতার সীমাহীন প্রাধান্য সেখানে। ধর্মশক্তিকে বড় করে দেখাতে গিয়ে, বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর ক্ষমতা প্রচারের তাগিদের কাছে মানুষ সেখানে বড় বেশি অবহেলিত, দেবতার করুণানির্ভর, দীন হতশ্রী রূপে তার আত্মপ্রকাশ। মানুষের পৌরুষ অলৌকিকতার কাছে পদানত হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পালাগুলিতে ক্ষেত্রবিশেষে অলৌকিকতার বিবরণ লভ্য হলেও মূল পালার ঘটনা বা চরিত্র নিয়ন্ত্রণে অলৌকিক শক্তিকে কবিরা ব্যবহার করেন নি।

লোককবিদের উদার মানসিকতার পরিচয়বাহী, সমসাময়িক সমাজজীবনের পরিচয়ে সমৃদ্ধ, লোককবিদের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচায়ক গীতিকাগুলিতে অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তেমনি ঘটনার উপস্থাপনায় নাটকীয় গুণকে সাধ্যমত রক্ষা করা হয়েছে। লোককবিরা কাহিনী নির্বাচনে যে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন এবং সংক্ষিপ্ততা ধর্ম রক্ষায় যে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না। অবশ্যই পাশ্চাত্য ব্যালাডের একমুখীনতা, ঘটনার তীব্রতা, এবং বিরল সংক্ষিপ্ততা ধর্ম আমাদের গীতিকায় অনুপস্থিত। তথাপি আমরা যা পেয়েছি তাও নিঃসন্দেহে আশাতীত।

মূলতঃ গীতিকাগুলি গেয়, তাই এগুলির সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য, সুর, ছন্দ, ধুয়া ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যালাডের সঙ্গে আমাদের গীতিকাগুলির পার্থক্য সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। অলঙ্কার প্রয়োগে কবিরা কতখানি স্বকীয়তা দেখিয়েছেন, এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদেশীয় কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্য কোথায়—সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। মনীষী রোমা রোঁলা যে আমাদের মদিনা, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা ইত্যাদির কাহিনী আস্বাদনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিংবা জর্জ গ্রীয়ারসন যে গীতিকাগুলির প্রকাশকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বলে মনে করেছিলেন, উইলিয়াম রোদেনস্টাইন যে গীতিকাগুলিকে সৌন্দর্য ও নাটকীয়তায় পূর্ণ দেখে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন, তার বস্তুকেন্দ্রিক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রতিটি পালা ধরে। প্রমাণিত হয়েছে যে এইসব মনীষী নিছক হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি, বস্তুত আমাদের গীতিকায় এমন ঐশ্বর্য আছে যা সহজেই রসিক মানুষের চিত্তকে আপ্লুত করে।

গীতিকা সম্পর্কিত আধুনিক তত্ত্বের নিরিখে রচিত বর্তমান গ্রন্থটি যদি রসিক পাঠককে গীতিকা বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে, তবে গ্রন্থটি রচনা সার্থক হয়েছে বলে বর্তমান লেখক আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন। মূল পালাগুলিতে চরিত্রগুলি যে বানানে উপস্থাপিত, ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মোটামুটি ভাবে সেইরূপ রক্ষিত হয়েছে আলোচনাতেও। গ্রন্থটি রচনায় বর্তমান লেখক নানাজনের সহায়তা লাভ করেছেন। পাশ্চাত্য গীতিকাগুলির আলোচনায় ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুমিত্রা সেনের সহায়তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, অনুরূপ ভাবে অলংকারের আলোচনায় প্রবীণ কবি ও অধ্যক্ষ ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু এবং ছন্দের আলোচনায় বন্ধুবর ড. উত্তম দাসের ঋণ অপরিশোধ্য। অগ্রজ প্রতিম অধ্যাপক ড. প্রলয়কুমার দেব এবং বন্ধুবর ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটি রচনায় লেখককে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। অন্যান্য নানা কার্যে সহায়তা করেছে শ্রীমান্ সৌগত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান্ দীপক বড়পণ্ডা, উৎসাহিত করেছেন ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, অগ্রজ প্রতিম অধ্যাপক দিলীপকুমার ঘোষ এবং সহপাঠী ড. মানস মজুমদার, শ্রীমান্ সৌমেন দাস। শ্রমসাধ্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করে দেবার জন্য শ্রীমান্ মানস ঘোষকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাই।

অনুজপ্রতিম শ্রীমান্ অনুপকুমার মাহিন্দার গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বর্তমান লেখকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বরুণকুমার চক্রবর্তী

লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
১লা বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

# বি ষ য় সূ চী

১.



২.

## প্রথম অধ্যায়

# গীতিকার উদ্ভব ইতিহাস ও সংজ্ঞা

William Morris ব্যালাড সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'the finest poems in our language', কবি Swinburne-এর দৃষ্টিতে 'the most precious treasures of our own or any language' : কিন্তু এ হেন ব্যালাডের শিক্ষিত মানুষের দরবারে স্বীকৃতি লাভ ঘটে মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তাই বলে ব্যালাডের উদ্ভব অত পরবর্তীকালের নয়। ত্রয়োদশ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তীকালেই ব্যালাডের অস্তিত্বের সন্ধান মিলেছে। সংখ্যায় অবশ্য তেমন নয়, মাত্র একটিই তা হ'ল 'Judas'. চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দেও ব্যালাডের সঙ্গে মানুষের পরিচিতি ঘটেছিল। পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দে ব্যালাডের পরিচিতি পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতর হল। তবে তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্যদেশে ব্যালাডের বহুল পরিচিতি ঘটল ষোড়শ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তীকাল থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত। বলা হয় ডেনমার্কের প্রাচীনতম ব্যালাডগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত। জার্মানীতে অবশ্য প্রথম ব্যালাডের সন্ধান মেলে চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দের সূচনা লগ্নে। স্পেনে ব্যালাডের প্রচলন কাল চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তীকাল। ফ্রান্সে ব্যালাডের প্রচলন দেখা দিল পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দে। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে ব্যালাড খুব প্রাচীন কালের সৃষ্টি নয়। মধ্যযুগের অনেক পরবর্তীকালে সাহিত্যের এই বিশেষ আঙ্গিকটির উদ্ভব। সমগ্র ইউরোপে ত্রয়োদশ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে একটি ব্যতীত কোনো ব্যালাডের সন্ধান মেলেনি—'Even if the earliest possible date, the 13th century be accepted for the whole of Europe, the ballad is still one of the later forms of mediaeval literature.'[১]

আমাদের বাংলা গীতিকার উদ্ভব ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার সূচনাতেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের লৌকিক সাহিত্যের তিনটি ধারা প্রচলিত প্রথমাবধিই—'প্রথম ধারা গান, দ্বিতীয় ধারা ছড়া, তৃতীয় ধারা গেয় অথবা বাচনীয় আখ্যান।'[২] কিন্তু ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত দু' চারটি ছড়া এবং এক আধটি গান ব্যতীত আমাদের হাতে আর কিছু এসে পড়েনি। অবশ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত রচনায় প্রাপ্ত কিছু গল্প কাহিনী চলে এসেছে, সে বিষয়ে সমালোচক-ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন। অষ্টম শতাব্দীতে কালিমপুরের অনুশাসনে যে লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে তা থেকে জানা যায় রাজা ধর্মপালকে নিয়ে যে পল্লীগীতিকা রচিত হয়েছিল তা গীত হত বনচারী রাখালবালক ইত্যাদিদের কণ্ঠে। দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বাণগড়ের মহীপালের তাম্রশাসনে মহারাজ রাজ্যপাল সম্বন্ধে একইভাবে পল্লী গীতিকার উল্লেখ আছে। বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবতে' যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপাল সম্পর্কিত গীতিকার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। বঙ্গীয় 'রাজমালা'য় উল্লিখিত হয়েছে 'লক্ষ্মণমালিকা', অনুমিত হয় এই 'লক্ষ্মণমালিকা' লক্ষ্মণসেনকে নিয়ে রচিত কোন গীতিকা বা তজ্জাতীয় রচনা।

সেক শুভোদয়ায় রামপালদেব সম্বন্ধে পালাগানের বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে রামপাল একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থে ধন্যমাণিক্য ও তদীয় পত্নী কমলা দেবী এবং পরবর্তী রাজা অমরমাণিক্য সম্পর্কে পালা গানের উল্লেখ মেলে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রণয়কাহিনী ঘটিত গাথা-কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন হল সরূফের 'দামিনীচরিত্র'। এটির লিপিকাল আনুমানিক ১২০৩ বঙ্গাব্দ।[৩] এটির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয় উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত—'নীলার বারমাসি'র।[৪] দ্বিতীয় যে প্রাচীন প্রণয় গাথার সন্ধান মেলে সেটি খলিল রচিত 'চন্দ্রমুখীর পুথি'। প্রকৃতিতে এটি রূপকথা ধর্মী। পূর্বভারতে এই ধরনের কাহিনীর বহু প্রচলন ছিল বলেই অনুমিত হয়।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারগত বিরোধের সমাপ্তি ঘটলে ধর্মমূলক কাহিনীগুলি রূপান্তরিত হল জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ লৌকিক কাহিনীতে। দেবপূজার সঙ্গে নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য এইসব আখ্যান থেকে পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ লৌকিক কাহিনী রূপে আত্মপ্রকাশ কিছু বিলম্বেই ঘটে থাকবে। 'প্রাচীন দেব দেবী ও ক্ষমতাশালী যোগী ঋষিগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের সরল উদ্দেশ্যহীন কল্পনার আশ্রয়ে সাধারণ মানব-মানবীর রূপে কাহিনীগুলির পাত্র-পাত্রীর স্থান অধিকার করিলেন'।[৫]

অনুমিত হয় চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীকালের মধ্যেই গাথাকাব্য বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এই সব গাথা কাব্যের প্রচলন বৃদ্ধি পায়।

গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনার প্রথমেই আমরা এর সংজ্ঞা বিষয়ে দৃষ্টি দিতে পারি। কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হল এই প্রসঙ্গে—

১. 'A ballad is a song that tells a story, or to take other point of view–a story told in song
...... it may be defined as a short narrative poem, adapted for singing, simple in plot and metrical structure, divided into stanzas, and characterized by complete impersonality so far as the author or singer is concerned!'[৬]

২. 'It deals with a single situation revealed dramatically. with little intrusion on the part of the story teller. Simplicity and economy of expression, which are preeminent among the ballad's natural virtues, are lessons which every poet must learn.'[৭]

৩. 'a simple spirited poem in short stanzas in which some popular story is graphically told.'[৮]

৪. The ballad proper is best understood not primarily as a narrative poem or as a song, but as a song and chorus evolved by the group mind of a community a group mind

which is more than the sum of the individual minds that compose it, more than the conviction of the strongest or most active clique.'[৯]

৫. 'They are anonymous, narrative poems, nearly always written down in short stanzas of two or four lines. They are distinguished from all other types of narrative poetry by a peculiar and effective way of telling their stories. They deal with one single situation and deal with it dramatically...'[১০]

৬. 'A ballad is a folksong that tells a story which stress on the crucial situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech, and tells it objectively with little comment or intrusion of personal bias.'[১১]

৭. 'The ballads of a country may be described, briefly, as the unpremeditated out pouring of the national heart. They put into convenient phrases the popular idea of life in its various relations. For the sake of emphasis, the idea is moulded in the form of a story; as in all true poetry, it is the concrete expression of what in the abstract would be unintelligible to the popular mind.'[১২]

৮. With us, songs of sentiment, expression or even description are properly termed songs, in contradistinction to mere narrative compositions which we now denominate Ballads.'[১৩]

৯. 'A ballad is story of the four elements common to all narratives, action, character, setting and theme–the ballad emphasizes the first. Setting is casual; theme is often implied; Characters are usually types and even more individual are undeveloped, but action carries the interest. The action is usually highly dramatic.'[১৪]

১০. 'The traditional ballad is 'a song that tells a story' in simple verse and to a simple tune. It is the product of no one time or person, its author, if ever known, has been lost in the obscurity of the past and in the processes of oral tradition.'[১৫]

১১. 'a simple sentimental song composed of several verses sung to the same melody or 'a poem in short stanzas narrating a popular story'.[১৬]

১২. 'The truth is that the Ballad is an idea, a poetical form, which can take up any matter and does not leave that

matter as it was before.'[১৭]

১৩. 'A ballad is a song that comments on life by telling a story in a popular style'.[১৮]

(১) গীতিকা এক ধরনের সঙ্গীত যার মাধ্যমে একটি গল্প বর্ণিত হয়। অন্য ভাবে বলা যেতে পারে গানের মাধ্যমে বর্ণিত গল্পই হল গীতিকা।
গীতিকার সংজ্ঞা হল ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট বর্ণনাত্মক কবিতা, যা গীত হবার উপযোগী করে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এর ঘটনাটি যেমন সরল অবয়বও তেমনি সরল ছন্দোবিশিষ্ট, কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত, গায়ক অথবা রচয়িতার নিরিখে এটি সম্পূর্ণরূপে অব্যক্তিগত রচনা।

(২) একক ঘটনা কেন্দ্রিক রচনা যা নাটকীয়ভাবে প্রকাশিত, গল্প কথক এতে সামান্যতম ভাবেও উপস্থিত থাকেন না। সারল্য এবং বাহুল্যবর্জিত প্রকাশ গীতিকার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য—প্রতি কবিরই এগুলি শিক্ষণীয়।

(৩) একটি সরল, তেজোদৃপ্ত, ক্ষুদ্র স্তবক সমন্বিত কবিতা, যাতে কোন জনপ্রিয় কাহিনী লৈখিক চিত্রের ন্যায় বর্ণিত।

(৪) যথার্থ গীতিকা মূলত: বর্ণনামূলক কবিতা অথবা গানই নয়, তা সঙ্গীত এবং সমবেত সঙ্গীত যাতে একটি গোষ্ঠীর মানুষের মনোভাব সুবিন্যস্ত ভাবে অভিব্যক্ত, এই সুবিন্যস্ত মনোভাব ব্যক্তি মনের সমষ্টিমাত্র নয়, তারও অধিক কিছু, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত কর্মক্ষমদলের অথবা সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দৃঢ় বিশ্বাস অপেক্ষাও অধিকতর কিছু।

(৫) গীতিকাগুলির রচয়িতারা অজ্ঞাতনামা, এগুলি বর্ণনামূলক কবিতা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পায়তন বিশিষ্ট স্তবকে রচিত, স্তবকগুলি দুটি অথবা চারটি পঙ্‌ক্তি সম্বলিত। অন্যান্য বর্ণনামূলক কবিতা থেকে গীতিকার পার্থক্য গল্প কথনের বিশেষ ও ফলপ্রসূ ভঙ্গীতে। এগুলি একক ঘটনা সম্বলিত এবং ঘটনা নাটকীয় ভাবে উপস্থাপিত।

(৬) গীতিকা এক ধরনের লোকগীতি যা একটি কাহিনীকে বর্ণনা করে এবং বিশেষ ভাবে কাহিনীর সংকটময় মুহূর্তের উপরই গুরুত্ব প্রদান করে ঘটনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে ক্রিয়াকে উদঘাটিত করা হয়, নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কাহিনীকে উপস্থাপিত করা হয়, ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা কিংবা মন্তব্যের অনুপ্রবেশ এতে কদাচিৎ ঘটে।

(৭) গ্রামীণ গীতিকাকে সংক্ষেপে একটি জাতির অন্তরের আবেগের অচিন্তিতপূর্ব অভিব্যক্তি রূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। গীতিকায় জীবন ও তার বিভিন্ন দিকের ধ্যান ধারণাকে উপযুক্ত ভাষায় রূপ দান করা হয়। মর্মস্পর্শী করার অভিপ্রায়ে ধারণাকে গল্পাকারে পরিবেশন করা হয়, যথার্থ কবিতার সকল ক্ষেত্রেই যেমন অবোধ্য, অস্পষ্ট কিংবা বিমূর্ত জগৎকে সাধারণের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য বাস্তবতার সহায়তা নেওয়া হয়ে থাকে তেমনি।

(৮) ভাবপ্রবণতা যুক্ত, অভিমত যুক্ত এমনকি বর্ণনাত্মক সঙ্গীতকেই আমরা যথার্থ সঙ্গীত নামে অভিহিত করি, কিন্তু বিপরীত গুণাবলীর দ্বারা বিশিষ্ট আখ্যায়িকাকে বিশেষভাবে গীতিকা আখ্যায় ভূষিত করা হয়ে থাকে।

(৯) গীতিকা হল গল্প। সব আখ্যায়িকায় যে চারটি সাধারণ উপাদান লক্ষিত হয়—তা হল ক্রিয়া, চরিত্র, উপস্থাপনা এবং বিষয় ; কিন্তু গীতিকায় গুরুত্ব পায় ক্রিয়া, এতে উপস্থাপনা নৈমিত্তিক, বিষয় অনেক সময়েই উহ্য রাখা হয়, চরিত্ররা সাধারণ শ্রেণীর, এমন কি অপরিণত, কিন্তু ক্রিয়াই কৌতূহলকে জাগ্রত রাখে। গীতিকার ক্রিয়া সাধারণত: অতি উচ্চ নাটকীয়তার গুণসম্পন্ন।

(১০) প্রচলিত গীতিকা আসলে সঙ্গীত যাতে সরল ছন্দে এবং সাধারণ সুরে কাহিনী পরিবেশিত হয়। গীতিকা সময় বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়। সত্য সত্যই যদি এর কোন রচয়িতা থেকে থাকেনও, তিনি মৌখিক ঐতিহ্যের কারণে এবং অতীতের দুর্বোধ্যতায় বিস্মৃত হয়েছেন।

(১১) একই সুরে গীত বিভিন্ন স্তবক যুক্ত আবেগপূর্ণ সঙ্গীত অথবা ক্ষুদ্র স্তবক যুক্ত যে কবিতায় জনপ্রিয় কোনো কাহিনী বর্ণিত হয় তাকেই বলে গীতিকা।

(১২) গীতিকা যথার্থ অর্থে একটা ভাব বা ধারণা মাত্র, একটা কাব্যিক রূপভেদ যা যে কোনও বিষয়কেই অবলম্বন করে এবং পূর্বের কোনো বিষয় বলে তাকে পরিহার করে না।

(১৩) গীতিকা হল সঙ্গীত যা জনপ্রিয় রীতিতে গল্প বলার মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করে।

গীতিকার সংজ্ঞা বিষয়ক আলোচনায় এতগুলি পৃথক পৃথক সংজ্ঞার উল্লেখ আপাতভাবে অকারণ বাহুল্য দোষে দুষ্ট বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সচেতন ভাবেই এই বাহুল্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমত: গীতিকা সম্পর্কে আমাদের দেশের আলোচনা সীমিত এবং পাশ্চাত্য প্রভাব জাত। কিন্তু এই বিষয়টি যে পাশ্চাত্য দেশে বহু আলোচিত তা এতে যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখে গীতিকা সম্পর্কে বিভিন্ন জনের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ ঘটবে আমাদের। এতে তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ মিলবে আর সেই সঙ্গে আমরা মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞায় পৌঁছতে পারব।

প্রথম সংজ্ঞায় হেলেন চাইল্ড সারজেণ্ট ও জর্জ লাইমান কিটরেজ গীতিকার সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য, অবয়ব, ঘটনা ও ছন্দোনির্মিতির সারল্য, গায়ক বা রচয়িতার নির্লিপ্ততা ইত্যাদি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করলেও গীতিকার নাটকীয়তা, মৌখিক ঐতিহ্য, প্রকাশের ক্ষেত্রে সহজ ধর্মকে রক্ষা করা, ঘটনা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে মূলত: কাহিনীর অগ্রসর হওয়া, গোষ্ঠী বিশেষের দলগত মানসিকতার ছাপ, উপস্থাপিত চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অবশ্য একথাও স্মর্তব্য যে সংজ্ঞার সীমিত পরিসরে সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ

. খুবই দুরূহ।

দ্বিতীয় সংজ্ঞায় এ্যানি হেনরি এহ্রেন প্রিস গীতিকার নাটকীয়তা ধর্ম, সারল্য, বাহুল্য থেকে মুক্ত কিংবা গল্প কথকের নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা বিষয়ে বলেছেন। প্রথমেই উল্লেখ করে নেওয়া ভাল যে এক্ষেত্রে গল্প কথক বলতে গীতিকার রচয়িতাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা 'গল্প কথক' কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে ধরলে রচয়িতার বিষয়টি অনুল্লিখিত থেকে যায়। গীতিকার সংজ্ঞায় রচয়িতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবশ্য স্বীকার্য। প্রতি কবির পক্ষে গীতিকার বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করা উচিত বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সে বিষয়ে একমত হয়েও কেবল রচয়িতার নৈর্ব্যক্তিকতাকে স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি ওঠার সম্ভাবনা। কেননা কাব্য ত শুধু নৈর্ব্যক্তিক ধারণা প্রসূত হয় না, তা আত্মকেন্দ্রিকও হয়। এখন প্রশ্ন হল দ্বিতীয় সংজ্ঞায় গীতিকার অতি প্রয়োজনীয় সামান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হলেও মৌখিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে গীতিকার আত্মপ্রকাশ, এতে চিত্রিত চরিত্র, এর সাঙ্গীতিক ধর্ম, অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতা ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। অথচ এগুলির উল্লেখ ব্যতিরেকে গীতিকার সংজ্ঞা অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য।

ডঃ মুরে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি খুবই সংক্ষিপ্ত। গীতিকা যে ক্ষুদ্র স্তবক সম্বলিত রচনা, মূলত: একে কাহিনী নির্ভর কবিতা ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হলেও গীতিকা সর্বোপরি গান তা বলা হয়নি। বলা হয়নি এর নাটকীয়তা, মৌখিক ঐতিহ্য, এতে উপস্থাপিত চরিত্র, সংলাপ ধর্মিতা, চিত্রিত চরিত্রগুলির অসম্পূর্ণতা কিংবা এর অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতা সম্পর্কে।

রবার্ট গ্রোভস প্রদত্ত চতুর্থ সংজ্ঞায় গীতিকার বর্ণনাধর্মিতা, সাঙ্গীতিক ধর্ম এবং বিশেষত: একটি গোষ্ঠীর মানুষের মানসিকতা সঞ্জাত বলে গীতিকাকে অভিহিত করলেও এর গল্প রস, নাটকীয়তা ধর্ম, সারল্য, মৌখিক ঐতিহ্য, উপস্থাপিত চরিত্রের বিশেষত্ব—বিষয়গুলি অনুল্লিখিত রয়ে গেছে।

পঞ্চম সংজ্ঞাটি এম. জে. সি. হডগার্টের। হডগার্ট গীতিকার রচয়িতা, গীতিকার বর্ণনাধর্মিতা, এর স্বল্পায়তন, নাটকীয়তা, উপস্থাপন ভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু অনুল্লিখিত থাকার বিষয়গুলিও কম নয়। এ সবের মধ্যে রয়েছে গীতিকার সাঙ্গীতিক পরিচয়, মৌখিক ঐতিহ্য, চিত্রিত চরিত্রের অসম্পূর্ণতা, রচয়িতার নির্লিপ্ততা, সংক্ষিপ্ততা ধর্ম প্রভৃতি।

জি. এইচ. জিরাউল্ড প্রদত্ত সংজ্ঞায় উল্লিখিত হয়েছে রচয়িতার নৈর্ব্যক্তিকতা, গীতি ধর্মিতা, কাহিনী উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জিরাউল্ড গীতিকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখে ব্যর্থ হয়েছেন। যেমন রচয়িতা যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি, কিংবা মৌখিক ঐতিহ্যে যে গীতিকার সৃষ্টি, এর সারল্য, সংক্ষিপ্ততা ধর্ম ; গীতিকা গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতার পরিচয় বাহী এসব অনুল্লিখিত রয়ে গেছে।

জর্জ ক্লিনটন ডেমস্‌মোরিয়োডেল প্রদত্ত গীতিকার সংজ্ঞায় এ পর্যন্ত আলোচিত

সংজ্ঞাগুলির তুলনায় কিছুটা অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ইনি গীতিকায় একটি জাতির অন্তরের অচিন্তিতপূর্ব অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন ঠিকই। জীবন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণার গল্পাকারে রূপদানের কথাও বলা হয়েছে। বিমূর্ত জগৎকে কাব্যে বাস্তবতার সহায়তায় যেমন বোধগম্য করা হয়, তেমনি বিশেষ ধারণাকে গল্পের মাধ্যমে যে গীতিকায় রূপায়িত হতে দেখেছেন লেখক, সেজন্য অবশ্যই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করতে হয়। তথাপি একথাও অনস্বীকার্য যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন সম্পর্কে উল্লেখ করা হলেও গীতিকার রচয়িতা, এতে চিত্রিত চরিত্র, এর মৌখিক ঐতিহ্য, নাটকীয়তা, রচয়িতার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, সারল্য প্রভৃতি অবশ্য উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে।

উইলি রিটসন অভিনব ভাবে গীতিকার ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন। সার্থক সঙ্গীতের যে সব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেগুলির বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আখ্যায়িকাকে লেখক গীতিকা বলেছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনি গীতিকার রচয়িতার নৈর্ব্যক্তিকতা কিংবা গীতিকার আখ্যানধর্মিতা সম্পর্কে আলোকপাত করলেও সর্বোপরি গীতিকাও যে গান তার উল্লেখে বিরত থেকেছেন। যেন গীতিকা সাঙ্গীতিক গুণাবলী থেকে মুক্ত এক বিশেষ রচনা বলে রিটসনের বক্তব্যে মনে হতে পারে। বলাবাহুল্য তা যথার্থ নয়। রিটসনও গীতিকার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখে অনীহা দেখিয়েছেন। গীতিকার নাটকীয়তা, সারল্য, গোষ্ঠী মনের প্রতিফলন, এর মৌখিক ঐতিহ্য এসবই অনুল্লিখিত রয়ে গেছে।

মারিয়া লিচের সম্পাদিত গ্রন্থে গীতিকার মূল বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই উল্লিখিত। উল্লিখিত হয়েছে গীতিকায় পরিবেশিত গল্পের প্রসঙ্গ, এতে ক্রিয়ার প্রাধান্য, চিত্রিত চরিত্রের অসম্পূর্ণতা, নাটকীয়তা ইত্যাদি। সারল্য, রচয়িতার আত্মনির্লিপ্তি, এর মৌখিক ঐতিহ্য, দলগত মানসিকতার প্রতিফলন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিরও উল্লেখ কিন্তু বাঞ্ছিত ছিল।

এভিলিন কেণ্ড্রিকওয়েলস্ তাঁর সংজ্ঞায় গীতিকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গীতিকা সর্বোপরি সঙ্গীত যা সরল ছন্দে রচিত এবং নিতান্ত সাধারণ সুরে পরিবেশিত হয়। বলা হয়েছে গীতিকা কাহিনী নির্ভর। রচয়িতার ব্যক্তি পরিচয় যে এতে অনুপস্থিত থাকে, মৌখিক ঐতিহ্যে গীতিকার সৃষ্টি এ সবই ঠিক। তবে সেই সঙ্গে এর সারল্য, নাটকীয়তা, জটিলতামুক্ত আখ্যান, গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ, অসম্পূর্ণ চরিত্র— এসব সম্বন্ধে কিছু বলা হল না। হলে সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণতা লাভ করত।

আভিধানিক অর্থে জনপ্রিয় কাহিনী সম্বলিত স্তবক যুক্ত যে সঙ্গীত গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত, তাকেই বলা হয়েছে গীতিকা। এক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে বলে গীতিকার কয়েকটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফলে সংজ্ঞাটি আংশিকতা দোষে দুষ্ট হয়েছে। অনুল্লিখিত রয়ে গেছে গীতিকার নানা বৈশিষ্ট্য যেমন নাটকীয়তা, সারল্য, এর

মৌখিক ঐতিহ্য, চিত্রিত চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি।

অধ্যাপক ডব্লিউ পি. কার, তাঁর সংজ্ঞায় গীতিকার নির্বিচার বিষয়বস্তু এবং এর কাব্যিক আঙ্গিক সম্পর্কেই তাঁর বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু গীতিকার অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নি।

ম্যাথিউ হ্যাডগার্ট উল্লেখ করেছেন যে গীতিকা হল সঙ্গীত, জনপ্রিয় রীতিতে গল্প কথনের মাধ্যমটিকে আশ্রয় করে জীবন বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এতে। এক্ষেত্রেও বলাবাহুল্য গীতিকার অন্যান্য নানা বৈশিষ্ট্যই অনুল্লিখিত রয়ে গেছে।

লক্ষণীয় গীতিকায় পরিবেশিত গল্পের ওপরেই সমালোচকেরা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারপর গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে এর সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি। গুরুত্বের বিচারে এরপর জোর দেওয়া হয়েছে বর্ণনা, ঘটনার সারল্য, কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত, অজ্ঞাত পরিচয় কবির রচনা এবং জনপ্রিয় কাহিনীর ওপর।

এইবার আমরা গীতিকার একটি সংজ্ঞা প্রণয়নে প্রয়াসী হতে পারি—

জটিলতামুক্ত মূলত: একটি ঘটনাকেন্দ্রিক আখ্যান, সচরাচর যা জনপ্রিয়, নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে কোনো প্রকার নীতি-উপদেশে ভারাক্রান্ত না হয়ে, সারল্যকে রক্ষা করে, অপরিণত চরিত্রকে উপলক্ষ্য করে, ঘটনা ও সংলাপকে আশ্রয় করে গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতা সঞ্জাত হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় রচয়িতার আত্মনির্লিপ্তির পরিচয়বাহী, মৌখিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাকৃতির স্তবকে রচিত যে সঙ্গীত, তাই হল গীতিকা।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# ব্যালাড ও গীতিকা

ইংরেজিতে যাকে ballad বলে আমরা বাংলায় তাকেই গীতিকা বলে আসছি। কিন্তু ballad এবং গীতিকা সমার্থক নয়। হয়ত উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের পরিমাণই অধিক, তাই বলে বৈসাদৃশ্য নেই তা নয়। এই প্রসঙ্গেই আমরা উল্লেখ করতে পারি যে গীতিকা একান্তভাবে যেখানে গীত হবার জন্য রচিত, সেখানে balladও নিছক গানের জন্যই রচিত এমন কথা কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয় সমালোচকেরা মানেন না। বরং অনেকেরই মতে ballad এক ধরনের নৃত্য-সঙ্গীত।

'Popular British Ballads' (Cambridge, 1894) গ্রন্থে R. Brimley Johnson তাঁর ভূমিকায় বলেছেন, 'The word ballad is admittedly of very wide significance. Meaning originally 'a song intended as the accompaniment to a dance', it was afterwards applied to a 'light simple song of any kind' with a le .ving towards the sentiment or romantic', অর্থাৎ আর. ব্রিমলি জনসন ballad মূলত: নৃত্যের সঙ্গে গীত হবার জন্য রচিত বলে স্বীকার করেছেন এবং এও বলেছেন যে পরবর্তীকালে ব্যালাড লঘু সরল সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়েছে, বলাবাহুল্য যার সঙ্গে নৃত্যের আর কোনও সম্পর্ক থাকেনি।

A. B. Friedmanও তাঁর 'The Ballad Revival' (1961) গ্রন্থে বলেছেন 'The word (Ballad) originally came from latin 'Ballare', to dance, and the provencal form ballada was used in the earlier Middle Ages to describe various dance songs and verse forms derived from them, but not apparently for the narrative poems we now call ballads' অর্থাৎ ফ্রায়েডম্যানও স্বীকার করেছেন মূলত: নৃত্যসঙ্গীত রূপেই ballad এর উদ্ভবের কথা বিশেষত: যে ল্যাটিন ballare শব্দ থেকে ballad শব্দের উৎপত্তি, তারও অর্থ নৃত্য, মধ্যযুগের প্রথমদিকে নানাবিধ নৃত্য-সঙ্গীতকে বোঝাতেই ballad শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে যেমন নিছক বর্ণনাত্মক কবিতারূপে গীতিকার পরিচিতি, আদিতে কিন্তু ব্যালাড তা ছিল না।

Frank Egbert Bryant এর 'A History of English Balladry' গ্রন্থেও (America, 1973) ব্যালাডকে নৃত্য-সঙ্গীত রূপেই অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে Ballad শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'Ballada' থেকে আর Ballada শব্দটির অর্থ হল নৃত্য সঙ্গীত—'Ballada seems to have meant a dancing song and is clearly derived from Low Latin (and Italian) ballare to dance.' এগবার্ট ব্রায়াণ্ট জানিয়েছেন কোন কোন ক্ষেত্রে ballat বা ballet শব্দের ব্যবহারও লভ্য। ballet অথবা ballat যাই হোক না কেন—তা উদ্ভূত হয়েছে ইতালীয় ballates থেকে এবং যার অর্থ নৃত্য-সঙ্গীত। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমালোচকেরা ballad শব্দটির

মূলের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে এর সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। Evelyn Kendrickwells তাঁর 'The Ballad Tree' গ্রন্থে (New York, 1950) এই একই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করে বলেছেন যে ইউরোপের সর্বত্র ballad নৃত্য-সঙ্গীত রূপে ব্যবহৃত হয়নি বা এর এরকম পরিচিতি ছিল না। তাঁর মতে–'There have been attempts, unsuccessful in part, to derive the word ballad from 'ballare' (Italian to dance), but the connection between ballad and dance, while it has existed in many countries–for the ballad is known through out Europe–is not everywhere established', কেণ্ড্রিকওয়েলস আরও মন্তব্য করেছেন, 'Dance has probably contributed to the British ballad such rhythmic elements as the refrains, ballad and dance songs having met at some mediaeval crossroads; but there is little evidence that ballads were danced in Britain.'

Maria Leach সম্পাদিত 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology And Legend' গ্রন্থের (New York, 1949) প্রথম খণ্ডেও ballad এর নৃত্য-সঙ্গীত রূপে ব্যবহৃত হওয়া প্রসঙ্গে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে, 'we cannot think of the ballad as basically a dance song....'; অবশ্য মাঝে মাঝে যে ballad কে নৃত্য সংগীত রূপে ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে, '.....occasionally it was adopted to that purpose.' এখানে purpose বা অভিপ্রায় বলতে নৃত্যসঙ্গীতকে বোঝানো হয়েছে। একই কথার পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয় অন্যত্রও, 'sometimes the ballad was accompanied by dance' স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলিতে ballad এর নৃত্য-সঙ্গীত রূপে বহুল পরিচিতি ও ব্যবহার চালু থাকলেও ইংলণ্ডে অথবা ইউরোপের অন্যত্র কিন্তু তা ছিল না, 'it was rare in England and found only sporadically in other parts or Europe.'

মোটের উপর ballad-এর নৃত্য-সঙ্গীত রূপে উদ্ভব অথবা ব্যবহার নিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক মহলে যতই বিতণ্ডা থাকুক, বাংলার গীতিকা সম্পর্কে সেরকম বিতর্ক ঘটেনি, বিতর্কের কোন অবকাশও নেই। কেননা আমাদের গীতিকাগুলি একান্তভাবেই বর্ণনাত্মক সঙ্গীত রূপেই সৃষ্ট হয়েছে এবং গীত হয়ে এসেছে।

### ব্যালাডের বাংলা প্রতিশব্দ

ইংরেজি ballad বা আখ্যানমূলক লোক-গীতিকে কি নামে অভিহিত করা যাবে সে বিষয়ে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে। দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, সুখময় মুখোপাধ্যায়, আশরাফ সিদ্দিকী, মযহারুল ইসলাম, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রমুখ বিদগ্ধ জনেরা নানা নামেই balladকে অভিহিত করেছেন।

দীনেশচন্দ্র সেন balladকে অভিহিত করেছেন 'গীতিকা' নামে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামগুলি দীনেশচন্দ্র প্রদত্ত। আশুতোষ ভট্টাচার্যও 'গীতিকা' বলে অভিহিত করেছেন ব্যালাডকে। সুকুমার সেন ব্যালাডকে অভিহিত করেছেন 'গাথা' বলে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যালাড বলতে বুঝিয়েছেন 'গীতি-আখ্যায়িকা' বা 'গীতি-আখ্যান'কে। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক 'পালা' বা 'পালাগান' ব্যবহার করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায়ও 'গীতিকা' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। মযহারুল ইসলাম ব্যালাডের বাংলা করেছেন 'লোক গীতিকা' বা 'লোক গাথা'। আশরাফ সিদ্দিকীর মতে ব্যালাড শব্দটির বাংলায় অনূদিত রূপ 'গীতিকা' বা 'গাথা'। চিত্তরঞ্জন দেব ব্যবহার করেছেন 'লোক-গীত-কথা"। বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য ব্যবহার করেছেন 'গাথাকাব্য' কথাটি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন 'প্রাচীন পল্লীগাথা' কথাটি।

অর্থাৎ Folklore-এর প্রতিশব্দ নিয়ে যেমন পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা গেছে এবং Folklore-এর বাংলা প্রতিশব্দ নির্মাণে অথবা নির্বাচনে যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, ballad-এর প্রতিশব্দ গঠনেও তেমন বৈচিত্র্য লক্ষিত না হলেও মোটামুটি ভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয়।

সুকুমার সেন ballad বলতে 'গাথা' বুঝিয়েছেন। সংস্কৃত পালি এবং প্রাকৃতেও 'গাথা' শব্দটির সন্ধান মেলে। সেখানে 'গাথা' বলতে বোঝানো হয়েছে আখ্যান বা কাহিনীমূলক কবিতাকে। কিন্তু আমরা জানি ballad এক ধরনের লোক সঙ্গীত, যা গীত হবার জন্যই রচিত এবং গীত হত। কিন্তু 'গাথা' বলতে তা যে গেয় তা বোঝায় না। কবিতা রচিত হয় পাঠের জন্য, গানের জন্য নয়। বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য 'গাথা কাব্য' ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে 'গাথা' শব্দটিতেই, 'কাব্য' শব্দটির অর্থও অন্তর্ভুক্ত। তাই পৃথকভাবে গাথার সঙ্গে কাব্য শব্দটির সংযোজন অনাবশ্যক, অপ্রাসঙ্গিক। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক যে 'পালা গানের' কথা বলেছেন, তাও গ্রহণযোগ্য নয়! কেননা ballad-এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা নিছক পালাগানে অনুপস্থিত। যাত্রাকেও পালা গান বলা হয়। বলাবাহুল্য যাত্রা আর ব্যালাড এক নয়। যেমন যাত্রা কিংবা পালাগানের রচয়িতাকে বলা হয় পদকর্তা অথবা অধিকারী। কিন্তু যিনি গীতিকার গায়ক তাঁকে বলা হয় 'গায়েন' বা 'গায়ক'। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী উভয়ের পার্থক্যটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করেছেন—'যাত্রা বা পালাগানগুলোকে যদি বলি রাজারাজড়াদের খনিত দীঘি-পুষ্করিণী, তবে গাথা গানকে বলতে হবে নিতান্তই প্রকৃতি-সৃষ্ট সরোবর। সরোবর সাধারণ হতে পারে কিন্তু অনাবিল প্রকৃতির পটভূমিতে এর মধ্যে যে নব যুগের সুস্নিগ্ধ সুরভি—তার তুলনা কোথায়?...গাথা গানগুলো by the people, for the people এবং of the people; এগুলো creation of the masses rather than the classes.'[১]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'গীতি-আখ্যায়িকা' বলেছেন। ব্যালাডের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই এতে উপস্থিত—আখ্যানধর্মিতা এবং গীতিধর্মিতা। কিন্তু প্রশ্ন হল, গেয় আখ্যায়িকা মাত্রই কি ব্যালাডের সমপর্যায়ভুক্ত? ব্যালাডকে অতি অবশ্যই লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত

হতে হয়। 'গীতি-আখ্যায়িকা' মাত্রই লোকজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা বোঝায় না। 'গীতি-আখ্যায়িকা' যেমন 'creation of masses' জোর করে বলা যাবে না, তেমনিই বলা যাবে না নিশ্চিতভাবে যে এগুলির প্রসঙ্গে 'by the people, for the people এবং of the people' কথাগুলিও প্রযোজ্য। এঁদের তুলনায় মযহারুল ইসলাম কথিত 'লোকগীতিকা' বা 'লোকগাথা' অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। চিত্তরঞ্জন দেবের 'লোক-গীত-কথা'তেও ব্যালাডের লৌকিক চরিত্র, গীতিধর্মিতা এবং আখ্যানধর্মিতা পরিস্ফুট। তবে তিনটি পৃথক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বলে ব্যবহারিক কিছুটা অসুবিধা দেখা যায়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন 'প্রাচীন পল্লীগাথা' কথাটি। 'প্রাচীন' কথাটি চরিত্রে আপেক্ষিক। আমরা 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় সংকলিত রচনা থেকেই তার প্রমাণ পাব। স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন সংকলিত 'তোমেরদ্দি-লালমতি' গীতিকাটি, কিংবা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর থেকে সংগৃহীত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গানে'র তুলনায় মুহম্মদ আয়ুব হোসেন সংকলিত 'দোলেহার', বিশেষত: 'নাদের মনোয়োরা' অনেক বেশি অর্বাচীন। তাই আমাদের মতে দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত 'গীতিকা' শব্দটিই গ্রহণযোগ্য। 'Folklore' শব্দের বাংলা পরিভাষা নানা জনে সৃষ্টি করলেও শেষপর্যন্ত যেমন 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিই সকলের গ্রহণযোগ্য হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, অনুরূপভাবে ব্যালাড অর্থে 'গীতিকা' শব্দটিই অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং ইতিমধ্যে হয়েওছে বলে বলা যায়।

**Ballad-এর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম এবং কয়েকটি পাশ্চাত্য ব্যালাডের পরিচয়**

Maria Leach সম্পাদিত Standard Dictionary of Folklore. Mythology And Legend গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যালাড যে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত তার উল্লেখ করেছেন। ডেনমার্কে ব্যালাডকে বলা হয় vise; স্পেনে আবার এর পরিচিতি romance রূপে। রাশিয়ার গীতিকা বলতে বোঝায় bylinaকে। ইউক্রেনে এর পরিচিতি dumi নামে। সাইবিরিয়ায় ব্যালাডকে বলা হয় junacka pesme বলে। ব্যালাডের বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন দেশে এর পরিচিতি থেকে প্রমাণিত হয় গীতিকা বা ব্যালাডের জনপ্রিয়তা ও এই বিশেষ রীতির রচনাটির ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়ার প্রসঙ্গটি। তবে সর্বত্রই যে এই বিশেষ রীতির রচনাটি একইরূপ চরিত্রের তা কিন্তু নয়। সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যায়, 'This type of folk song varies considerably with time and place,'[২] আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের গীতিকা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করে নিতে পারি, যা আমাদের গীতিকাগুলির বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সহায়ক হবে।

রাশিয়ান bylina-কে তথাকথিত ব্যালাড থেকে কেউ কেউ পৃথক বলে মনে করেছেন। সমালোচক Entwistle অবশ্য bylina-কে গীতিকা হিসাবেই গণ্য করেছেন। কিন্তু Chadwick'র মত সমালোচকেরা bylina'র সঙ্গে বীরত্ব গাথার সাদৃশ্যই অধিক

লক্ষ্য করেছেন। সে যাই হোক, আমরা কিন্তু bylina-তে লক্ষ্য করি অবয়বগত স্বল্পতা, নাটকীয়তা, তবে এগুলি স্তবকে বিভক্ত নয়। সচরাচর bylina-র বিষয়বস্তু হ'ল বীরের শোষণ। Bylina-র নায়ককে লোককথার নায়ক বলেই মনে হয়। রাশিয়ান গীতিকাগুলি চরিত্রে বাস্তবতার পরিপন্থী। এদের গীতিকায় নায়ক চরিত্রেই গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা যায়। গীতিকাগুলি আজগুবি, অবাস্তব বর্ণনায় সমৃদ্ধ। নায়ক চরিত্রে অবশ্য মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

ইউক্রেনের dumi'র চরিত্র পৃথক। ডুমিগুলি অনেক বেশি ঐতিহ্যাশ্রিত, বিশেষত অবয়বগত বিচারে। অধিকাংশ ডুমিই স্তবকে বিভক্ত। ডুমি'র সুর অত্যন্ত মিষ্ট ও সুরেলা। এগুলি মূলতঃ গার্হস্থ্য বিষয়ক হয়ে থাকে। প্রেম, বিবাহ, বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়গুলিই প্রধান। বেশ কিছু ডুমির বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। চরিত্রে এগুলি অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক।

বুলগেরিয়ার অধিকাংশ ব্যালাডে সাক্ষাৎ মিলবে অপ্রাকৃত ক্ষমতাবিশিষ্ট চরিত্রের। এখানকার ব্যালাডে ভাগ্য, সাপ, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পাখী ও অন্যান্য প্রাণী ইত্যাদির দেখা মিলবে। অনেকগুলি গীতিকাতেই সূর্য ও চন্দ্রকে দেখা যায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী চরিত্ররূপে। প্রেম বিষয়ক গীতিকাগুলিতে বিষাদান্ত পরিণতি, চাতুর্য, স্ত্রীহরণ, স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ ইত্যাদি লক্ষিত হয়।

ইটালীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গীতিকা হ'ল 'Donna Lombarda'। এতে বর্ণিত হয়েছে প্রেমিকা Rosamund কর্তৃক তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে বিষ প্রয়োগের কাহিনী। ইটালীতে অধিক সংখ্যায় ঐতিহাসিক গীতিকার সন্ধান মেলে। অবশ্য রচনাকালের বিচারে এগুলি অর্বাচীন।

স্পেনে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সুগঠিত বর্ণনাত্মক সঙ্গীতের সাক্ষাৎ লভ্য। এদের বলা হয় 'romancero'। 'Romancero' হ'ল ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট এবং নাটকীয়তার বৈশিষ্ট্য সমন্বিত বিবরণী। এগুলি নৈর্ব্যক্তিক। Romancero'র প্রকরণ অত্যন্ত দুষ্পরিবর্তনীয়। তাছাড়া এগুলি খুব বেশি ঐতিহ্যাশ্রিত। অধিকাংশ স্পেনীয় গীতিকা প্রকৃতিতে অর্ধ-ঐতিহাসিক। উল্লেখযোগ্য হ'ল ঐতিহাসিক চরিত্রকে আশ্রয় করা হলেও তার ব্যক্তি চরিত্রকেই গীতিকায় বিশেষভাবে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় নিষ্ঠুর রাজা Pettro'র প্রসঙ্গ। বেশ কিছু গীতিকা রচিত হয়েছে একে নিয়ে, কিন্তু কদাচিৎ Pettroকে চিত্রিত করা হয়েছে রাজা বা শাসকরূপে। অনেকগুলি ব্যালাডে বর্ণিত হয়েছে মুরেদের সঙ্গে খ্রীস্টানদের বিরোধ। কিছু সংখ্যক ব্যালাড রচিত হয়েছে প্রাচীন মহাকাব্য বা মহাকাব্যোচিত ঘটনা অবলম্বনে। যেমন Cid—এই মহাকাব্যিক চরিত্রটি বেশ অনেকগুলি ব্যালাডে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু মহাকাব্যের রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা Cid ব্যালাডে রূপান্তরিত হয়েছেন স্পেনের লোক-নায়ক রূপে। ফরাসীদেশের লোকসঙ্গীতের অধিকাংশই গীতিপ্রাণতার জন্য উল্লেখযোগ্য। বর্ণনাত্মক যে সব লোকসঙ্গীতের সাক্ষাৎ মেলে, সেগুলি হয়ত বহিরাগত, নতুন লিরিক থেকে

নতুনভাবে রচিত। ফ্রান্সের pastourella বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণনাত্মক রচনা। এগুলির যথার্থ গীতিকার সঙ্গে তেমন সাযুজ্য নেই। হয় বহিরাগত বিষয় অবলম্বনে এগুলি রচিত, নতুবা সাহিত্য সূত্রে এগুলির বিষয় সংগৃহীত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য pastourella হল—The woman killer, King Loy's Daughter, The Torch of Love। পশ্চিম জার্মানী ভাষায় সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু এগুলি চরিত্রে যত না বর্ণনাত্মক, তদপেক্ষা অনেক বেশি গীতি ধর্মী। বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি যত না জাতীয় চরিত্রের, তদপেক্ষা অনেক বেশি স্থানীয় বা আঞ্চলিক। আমরা প্রচলিত গীতিকা বলতে যা বুঝি, পশ্চিম জার্মানীতে সেই শ্রেণীর গীতিকার সাক্ষাৎ দুর্লভ। এতদঞ্চলের অধিকাংশ লোকসঙ্গীত রূপকধর্মী, নতুবা ব্যঙ্গাত্মক। বেশ কিছু লোকসঙ্গীত আবার রাজনৈতিক বিষয়ক। এই বিশেষ শ্রেণীর লোকসঙ্গীতকে স্তবকে আবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাবে না। অথচ গীতিকা স্তবকে আবদ্ধ। বেশ কিছু জার্মানী গীতিকা ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রয়ী। এসব গীতিকা মূলতঃ যুদ্ধের সাধারণ বিবরণে সমৃদ্ধ। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গীতিকা হল The Battle of sempact, Epple von Gailingen, Lindenschmid। এগুলির অধিকাংশই দস্যু ব্যারণদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জার্মানী গীতিকায় আমরা পাব অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বামন চরিত্র, অশরীরী আত্মা ইত্যাদি। একটি জনপ্রিয় জার্মানী ব্যালাড হল Pied piper of Hamelin। সঙ্গীতের যাদুকরী ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়েছে The Fiddling Hunch back গীতিকাটিতে।

ড্যানিশ ব্যালাড অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইংরেজি ব্যালাডের মতই এইসব গীতিকার বিষয়বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। ড্যানিশ ব্যালাড হ'ল ঐতিহাসিক, অপ্রাকৃত বিষয়ক, তাছাড়া ঐন্দ্রজালিক গীতিকা, বাস্তবানুগ, প্রেম ও রক্তপাত ইত্যাদি বিষয়ক গীতিকাও সুলভ। The knight in Bird Dress গীতিকায় বর্ণিত হয়েছে একজন নাইট কিভাবে তার প্রেমিকাকে লাভ করল পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে। The Avenging sword এ বর্ণিত হয়েছে একটি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা সম্পন্ন তরবারি তার প্রভুর জন্য কিভাবে নিজে সংগ্রাম করেছে তার বিবরণ। The Lady and the Dwarf king-এর বর্ণিত বিষয় হল—এক বামন রাজাকে এক রমণী বিবাহ করে তার সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে কেমন করে বাধ্য হয়েছে। The Lind worm এ প্রচলিত রূপান্তরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। Young Svejdal-এ বর্ণিত হয়েছে যাদু পাহাড় থেকে svipdog-এর সাহায্যে Menglad এর মুক্তির কাহিনী। The Maiden Hind এ বর্ণিত হয়েছে একটি ছেলে তার মাতৃ আজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে একটি হরিণীকে হত্যা করে। পরে সে জানতে পারে এটি ছিল আসলে তার কনিষ্ঠা ভগিনী! Ebbe skammalson-এর কাহিনীটি চমকপ্রদ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাগদত্তাকে অধিকার করে নিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তার বাগদত্তা সহ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করে। এই ব্যালাডে বিবাহ সংক্রান্ত নানা আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

ড্যানিশ গীতিকাগুলি সাধারণতঃ প্রকৃতিতে শোকাত্মক বা বিষণ্ণ হয়। প্রেমের

বিয়োগান্ত পরিণতি গীতিকাগুলির মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়। সীমিত সংখ্যক লঘু ভাবের অর্থাৎ হাস্যরসাত্মক গীতিকার সন্ধানও মেলে।

যুগোশ্লাভিয়ায় দু' ধরনের গীতিকা মেলে—এক শ্রেণীর পুরুষদের সঙ্গীত—এদের বলা হয় Junacka pesme, আর এক শ্রেণীর হল মহিলাদের সঙ্গীত—Zenska pesme। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের সঙ্গীতে বীর্যবত্তার ভাবটি প্রকট। সমালোচকের ভাষায় 'they represent really an epic urge working itself out in the shorter narrative form'.

যুগোশ্লাভিয়ার বিখ্যাত নায়ক Marcokraljevic এর অসমসাহসিক কার্যাবলী নিয়ে বেশ কিছু গীতিকা রচিত হয়েছে। 'The ballad of Marco and Andrija' তে Edward এবং দুই ভ্রাতার তুলনামূলক সম্পর্ককে রূপায়িত করা হয়েছে। একদিন Marco এবং Andrija এই দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হল। Marco তার তরবারিটি Andrija-র বক্ষে বসিয়ে দিল। মৃত্যু পথযাত্রী Andrija Marcoকে অনুরোধ করল সে যেন তাদের মাতাকে ঘটনাটি না জানায়। সে Marcoকে শিখিয়ে দেয় যদি তাদের জননী জিজ্ঞাসা করে Marco-র তরবাবিটির রক্তাক্ত হবার কারণ, তবে সে যেন বলে যে সে তরবারিটি দিয়ে একটি হরিণ মেরেছে। আর যদি তাদের জননী Andrija'-র সন্ধান করে, তবে সে যেন বলে যে সে এক রমণী কর্তৃক প্রলুব্ধ হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছে। Andrija বলে যায় Marco যখনই যুদ্ধে তার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করবে, তখনই যেন সে তার নাম ধরে ডাকে। Andrija এইভাবে তার ভ্রাতার দুষ্কর্মকে, তার ভ্রাতৃঘাতী ভূমিকাকে গোপন রাখার প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে গেল। সে জানত নতুবা প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেলে তাদের জননী নিরতিশয় আঘাত পাবে। 'Marco Kraljevic and the Arab king's Daughter' গীতিকায় কারাধ্যক্ষের কন্যার সহায়তায় বন্দী Marco'র কারাগার থেকে পলায়নের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কারাধ্যক্ষের কন্যা Marcoকে ভালবাসত। বেশ কিছু গীতিকাকে মনে হয় যেন লোক কাহিনীর রূপান্তরিত অবস্থা—'some seem very like folktales translated into ballad form'. তবে কবিত্ব শক্তি ও নাটকীয়তার বিচারে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় Kosovo কেন্দ্রিক গীতিকাগুলি। ১৩৮৯ সালে কসুভুর যুদ্ধে সার্বরা তুর্কীদের কাছে পর্যুদস্ত হয়—কসুভু বিষয়ক গীতিকাগুলি এই ঘটনার দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে রচিত। 'The Fall of the Serbean kingdom' এ বর্ণিত হয়েছে সার্বদের পতন। কসুভু কেন্দ্রিক গীতিকায় আনুপূর্বিক যুদ্ধের বিবরণের পরিবর্তে যুদ্ধের বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'The Maiden of Kosovo'তে অনূঢ়া কন্যাকে যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত মৃতদেহগুলির মধ্যে তার প্রেমিককে সন্ধান করতে দেখা গেছে। অলৌকিক চরিত্র নিয়েও কিছু গীতিকা রচিত হয়েছে দেখা যায়।

তুলনামূলকভাবে ইংরেজি ব্যালাডগুলি অনেক বেশি বাস্তবানুগ। তাছাড়া এগুলি

অপেক্ষাকৃতভাবে জটিল। রবিন হুড কেন্দ্রিক বেশ কিছু ব্যালাড আমরা পাই ইংরেজিতে, ইতিহাস কেন্দ্রিক ব্যালাডের সংখ্যাও অপ্রতুল নয়। তাছাড়া রোমান্টিক আবেগপূর্ণ প্রেম বিষয়ক গীতিকা ত আছেই। 'Standard Dictionary of Folklore' এ সর্বোত্তম ইংরেজি গীতিকা বলতে রবিন হুড কে নিয়ে রচিত গীতিকাগুলিকে বলা হয়েছে, 'The best known of all English ballads are the Robin Hood ballads.' Robin Hood জনপ্রিয় নায়ক। সে ধনীর সম্পদ অপরহণ করে দুঃস্থকে তা দান করে এবং দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা গ্রেফতার হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

স্কটিশ ব্যালাড একদিকে যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি আকৃতিতে স্বল্পায়তন বিশিষ্ট। অধিকাংশ অতিপ্রাকৃত অথবা অলৌকিক ঘটনা কেন্দ্রিক ব্যালাড হল স্কটিশ। তবে সর্বোত্তম স্কটিশ ব্যালাড হল বিষাদান্ত যেগুলি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল Sir Patrick Spens, The Twa sisters, The cruel Brother, Edward, Lord Randol, Babylon Twa corbies ইত্যাদি।

## মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশীয় গীতিকার তুলমামূলক আলোচনা

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল 'মহুয়া'। এই বহুপঠিত ও বহুল আলোচিত গীতিকাটির সঙ্গে ইউরোপের মধ্য যুগীয় রোমান্স 'ট্রিস্টান ও ইসল্ট' এবং 'অকাসিন ও নিকোলেটে'র অতুলনীয় প্রেম কাহিনীর গভীর সাদৃশ্য। বেদের দলের সঙ্গে খেলা দেখাতে এসেছিল মহুয়া। তাকে দেখে তার প্রেমে পড়েছে নদ্যার চাঁদ। যাকে বলে 'Love at first sight'। একইভাবে প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে—'ট্রিস্টান ও ইসল্ট' এবং 'অকাসিন ও নিকোলেটে'র মধ্যেও। নদ্যার চাঁদ ও মহুয়া আরণ্যক জীবন যাপন করছিল সুখে। 'ট্রিস্টান ও ইসল্টে' ও বর্ণিত হয়েছে দুজনে গাছের পাতা সংগ্রহ করে এনে ঘর বেঁধেছে। অরণ্য অভিসার চিত্রে দুটি কাহিনীর মধ্যে গভীর সাযুজ্য। 'ট্রিস্টান ও ইসল্টে'র সন্ধানে কিংমার্ক শিকারী কুকুরের সহায়তা নিয়েছিল। 'মহুয়া' পালাতেও মহুয়া ও নদের চাঁদের সন্ধান পেয়েছে হুমরা বেদে শিকারী কুকুরের সাহায্যেই। মহুয়ার আত্মহত্যা এবং বেদের দলের হাতে নদের চাঁদের মৃত্যুর পর হুমরা বেদের অনুতাপজনিত অশ্রু বর্ষণের সঙ্গে কিংমার্কের অনুতাপজনিত বেদনাশ্রু নির্গত হওয়ার সুগভীর মিল। কিংমার্ক যেমন ট্রিস্টান ও ইসল্টের কবর নির্মাণ করে দিয়েছিল, হুমরা বেদেও নদের চাঁদ ও মহুয়ার জন্য দুটি কবর প্রস্তুত করে দিয়েছে।

'দেওয়ানা মদিনা' পালাটির সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়—'Butcher Boy' গীতিকাটির। দেওয়ানা মদিনাকে ত্যাগ করে তার স্বামী দুলাল সেকেন্দর দেওয়ানের কন্যার পাণিগ্রহণ করে। পতিশোকে হতভাগিনী মদিনা উন্মাদিনী হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। 'Butcher Boy' গীতিকাতেও চর্মকার তনয় তার প্রেমিকাকে ত্যাগ করে অর্থের প্রলোভনে বিবাহ করেছে স্বতন্ত্র এক মেয়েকে। চর্মকার তনয়ের প্রেমিকা জানিয়েছে—

In London town where I did well,
A butcher boy that I loved him well,

He courted me for many a day;
He stole from me my heart away.

কিন্তু দুলালের মত সেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার প্রেমিকার প্রতি। বিশ্বাসঘাতকতার কারণটি প্রেমিকাই জানিয়েছে—

The reason is I will tell you why,
Because she has got more gold than I,

প্রেমিকার এরপর দার্শনিক সুলভ উক্তি :

But gold will melt and silver fly,
Because she has got more gold than I,

এই প্রথম প্রেমিকা প্রেমের কারণেই মৃত্যু বরণ করেছে অবশেষে। সে মৃত্যুর পূর্বে আবেদন জানিয়ে গেছে তার জন্য গভীর ও প্রশস্ত কবর খননের জন্য—

Go dig my grave both wide and deep
And on my grave place turtle dove,
To show the world that I died for love.

'দেওয়ানা মদিনা' গীতিকাটির সঙ্গে মিল লক্ষিত হয় 'Fair Anni' গীতিকাটিরও। 'Fair Anni'তেও দেখি নায়ক-নায়িকার সুখের সংসার, সুখের দাম্পত্যজীবন। সাত সাতটি সন্তানের জননী Fair Anni। পতিগত প্রাণা সে। স্বামীর সেবা যত্নই তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তথাপি এ হেন Fair Anni-কে ত্যাগ করে তার স্বামী পুনর্বিবাহের জন্য যাত্রা করেছে, Fair Anni-কে শোকাহত করে—

It is narrow, narrow make your bed,
And learn to lie your lane,
For I am going over the sea fair Anni
A brow bride to bring home

সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন Butchar Boy-এর প্রেমিকা কিংবা Fair Anni-র তুলনায় মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে—'মদিনাকে যেন আরও মাধুর্যমণ্ডিত মনে হয়—সে স্বামীর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে জানে না।' ইংরেজি Earl Brand বা The Douglas Tragedy'র সঙ্গে মিল রয়েছে 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবি' পালাটির। উমর খাঁ দেওয়ান জঙ্গলবাড়ির দেওয়ান ফিরোজ খাঁর সঙ্গে তার কন্যা সখিনার বিবাহ দানে অনিচ্ছুক ছিলেন। ফেয়ার মার্গারেটের পিতাও তাদের বংশানুক্রমিক শত্রু আর্লব্রাণ্ডের সঙ্গে ফেয়ার মার্গারেটের বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক। মার্গারেটের পিতা আর্লব্রাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, পুত্রদের উত্তেজিত করেছেন আর্লব্রাণ্ডের বিরুদ্ধে—

Rise up, rise up, my seven brave sons,
And dress in your armour so bright,
Earl Douglas will have lady Margaret away.
Before that it be light.

Arise, arise, my seven brave sons
And dress in your armour so bright
It shall never be said that a daughter of mine
Shall go with an Earl or a knight.

সখিনা যেমন মৃত্যুর শিকার হয়েছে, মার্গারেটও তেমনি অকাল মৃত্যু বরণ করেছে। ফিরোজ খাঁ যেখানে মৃত্যু বরণ করেনি, সেখানে আর্ল ডগলাস মৃত্যু বরণ করেছে। 'Earl Brand'-এ কবি নায়ক ও নায়িকাকে মৃত্যুর পরে প্রকৃতির সহায়তায় মিলন ঘটিয়েছেন—

The one was buried in Mary's kirk
The other in Mary's Quire.
The one sprang up a bonny bush
And other a bonny brier,
And when they could not further grow,
They coost the lover's knot.

'ধোপার পাঠে'র ধোপার কন্যাকে সিণ্ডেরেলার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিংবা 'চন্দ্রাবতী' পালায় চন্দ্রাবতী 'Jew's Daughter'-এর নায়িকার সঙ্গে তুলনীয়।

গীতিকা সংকলনে এবং গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনায় ও বিশ্লেষণে আমাদের তুলনায় পাশ্চাত্য জগতের অগ্রাধিকার প্রশ্নাতীত। এর স্বপক্ষে মাত্র দুটি উদাহরণই যথেষ্ট। Helen child Sargent সম্পাদিত English and Scottish popular Ballads-এর সংকলন এবং অবিমিশ্র গীতিকা সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত ও সমালোচকদের রচিত অসংখ্য গ্রন্থরাজি। সে তুলনায় আমাদের গীতিকার সংকলন বলতে দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা এবং তিন খণ্ডে পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা। পরবর্তীকালে মূলতঃ দীনেশচন্দ্রের সংকলনে ধৃত গীতিকাগুলির অপেক্ষাকৃত অধিকতর নির্ভরযোগ্য পাঠের সংকলনরূপে সাতটি খণ্ডে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সংকলনগুলি 'প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত। এছাড়া রয়েছে চিত্তরঞ্জন দেবের একটি সংকলন। সাকুল্যে আমাদেব গীতিকা কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ। আর আমাদের গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনাও যে খুবই সীমিত তার প্রমাণ গুটিকয়েক গ্রন্থে সীমিত পরিসরে গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনা। এ পর্যন্ত গীতিকা নিয়ে বাংলায় একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থও রচিত হয়নি। এতেই বোঝা যায় গীতিকা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিতজনদের মানসিকতা কিরূপ।

স্বভাবতঃই আমাদের সীমিত সংখ্যক গীতিকার সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশীয় বিরাট সংখ্যক গীতিকার তুলনামূলক আলোচনা তেমন ফলপ্রসূ হতে পারে না। তথাপি আমরা সীমিত পরিসরে সেই আলোচনা করব, নিজেদের গীতিকাগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছতর ধারণা গড়ে তোলার প্রয়োজনেই। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে আমাদের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশীয় গীতিকাগুলির সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'Gil Brenton' গীতিকাটির কাহিনী রোমাণ্টিক। এক পাষণ্ড একটির পর একটি নিরপরাধা রমণীকে বিবাহ করে তার পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে এসেছে। দেখা গেল সপ্তম নারী রাত্রে বরশয্যায় চাকরাণীকে প্রেরণ করে নিজের সতীত্ব রক্ষায় সক্ষম হয়েছে। 'Crow and Pie' গীতিকাটিতে একটি ধর্ষণের কাহিনীকে হাস্যরসাত্মকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'Willis Lyke-wake'-এ প্রেমিকের মৃতের বেশে প্রেমিকাকে শয্যায় উপস্থিত হতে প্রলুব্ধ করার কাহিনী বর্ণিত। 'The Bonny Earl of Murry'তে Huntly স্কটল্যাণ্ডের রাজার নির্দেশে Murry-কে হত্যা করে—কেননা রাণী Murry-র প্রেমাসক্ত ছিলেন। 'Young Johnstone'-এ Johnstone-এর প্রেয়সী আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন করেও শেষপর্যন্ত ভগ্নীসহ Johnstone-এর হাতে মৃত্যুবরণ করেছে। 'Jellon Grame' গীতিকায় নায়ক নায়িকাকে হত্যা করেছে যেহেতু নায়িকার অবৈধ শিশুর বিষয়টি প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। 'Glasgerion' যে ভৃত্য কর্তৃক রাজকুমারী ধর্ষিতা হয়েছিল সেই ভৃত্যকে হত্যা করেছে। Glasgerion নিজেও এরপর আত্মহননের পথ নিয়েছে। রাজকুমারী তো পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিল। 'The Cruel Brother' গীতিকায় John তার ভগ্নীর বিবাহের পর বিদায় গ্রহণের পূর্বে ভ্রাতাকে চুম্বন করতে এসে তাকে হত্যা করেছে। 'The Maid Freed From the Gallows'-এ বর্ণিত হয়েছে ফাঁসীতে মৃত্যু হচ্ছিল এমন একটি মেয়েকে তার মা, বাবা, ভাই-বোন কেউই মুক্তিপণ দিয়ে রক্ষা করেনি, রক্ষা করেছে তার প্রেমিক। ডেনমার্কের বিখ্যাত গীতিকা 'Sir Peter's Leman' গীতিকায় মাত্র ৪২টি পংক্তিতে বর্ণিত হয়েছে স্যার পিটরের বিবাহের ভোজসভায় তার প্রণয়িনী কার্সটিন (Kirsteen) পানপাত্রে মদ্য পরিবেশন করছিল যখন, তখন পিটারের নবোঢ়া পত্নী কার্সটিন সম্পর্কে একজন পরিচারিকার কাছ থেকে জানতে পারল যে সে স্যার পিটরের প্রেমিকা। বর্ণিত হয়েছে কার্সটিন বর-বধূর জন্য স্বহস্তে বিছানা রচনা করে দিয়েছে, তারপর নববিবাহিত দম্পতি শয়নগৃহে প্রবেশ করলে কার্সটিন জ্বলন্ত মশাল দিয়ে শয্যাগৃহে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। প্রণয় কিরূপে প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয়, তারই পরিচয় গীতিকাটিতে লভ্য। সংক্ষিপ্ততার গুণে গীতিকাটি যেমন তীব্র গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তেমনই এক জটিল ও নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'Fair Anni'তে (The Sister's Husband; Lady Elinor) লর্ড টমাস তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী অ্যানি ও তার সাত-সাতটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছে। পরে জানা গেছে দ্বিতীয়া স্ত্রী অ্যানিরই কনিষ্ঠা ভগিনী, যাকে এক Knight চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। এইভাবে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দুই ভগ্নীর মিলন হয়েছে। অ্যানির বোন অ্যানিকে তার স্বামীকে ফেরৎ দিয়ে শত জাহাজপূর্ণ ধন-সামগ্রী উপহার দিয়ে বিদায় নিয়েছে।

উত্তর আতলান্তিক প্রদেশের গীতিকা হল Fair sally। এক দরিদ্র যুবক অভিজাত

বংশীয় সেলীর প্রণয় যাচ্ঞা করে বসল। কিন্তু সেলীর পক্ষে যুবকটির আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। যুবকটি তার ভালবাসার পরিণতি সম্পর্কে অবশ্য পূর্বাভাষ করেছিল—

'I fear that your love and mine can not agree.' গীতিকাটিতে যুবকটির ভবিষ্যৎবাণীই ফলে গেল। তবে এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। সেলীর পরে ভাবান্তর ঘটে, সে দরিদ্র যুবকটির প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। সে যুবকটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু যুবকটি কিছুতেই তার প্রথম প্রার্থনা না-মঞ্জুর হওয়ার বিষয়টি বিস্মৃত হতে পারে না। সেলীর প্রতি তার প্রেম রূপান্তরিত হয় প্রতিহিংসায়। সেলীর মৃত্যু হয়। সেলীর মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত হৃদয় যুবকটির খেদোক্তি উচ্চারিত হয় 'I'll wed her in death, and I'll make her my wife.' ডেনমার্কের 'Robin and Guldborg' একটি অত্যন্ত পরিচিত ব্যালাড। এই ব্যালাডে বর্ণিত হয়েছে মূলতঃ 'dead-naming' এর প্রতিক্রিয়া। প্রচলিত সংস্কারে 'dead-naming' এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ব্যালাডের নায়ক Ribold সে তার প্রেমিকা Guldborg-কে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। Guldborg এর পিতা ভ্রাতারা Riboldকে অনুসরণ করতে লাগল, বলাবাহুল্য ধরা পড়লে Ribold এর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। Ribold Guldborg-কে বলল তার ঘোড়াটি ধরার জন্য। সাবধান করে দিল কোন অবস্থাতেই সে যেন তার নাম উচ্চারণ না করে। Ribold একে একে Guldborg-এর পিতা এবং ছয় ভ্রাতাকে হত্যা করল। তখন Guldborg এর একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি জীবিত। বেচারী Guldborg Ribold-এর নিষেধাজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে তার নাম ধরে ডেকে উঠে মিনতি জানাল যেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করা না হয়, কেননা সেই তাহলে তার মাকে গিয়ে সব ঘটনার কথা জানাতে পারবে। যেই Ribold-এর নাম উচ্চারিত হল সঙ্গে সঙ্গে Guldborg অন্তিম আঘাতটি লাভ করল।

Earl o Brand একটি বিখ্যাত স্কটিশ ব্যালাড। এই ব্যালাডটি সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

'Earl Brand has preserved most of the incidents of a very ancient story with, a faithfulness unequalled by any ballad that has been recovered from English oral tradition.'

Earl Brand-কে ধরে পড়ল এক পঞ্চম বর্ষীয়া রাজকন্যা। সে Earl Brand-এর অনুগামিনী হবে। Earl Brand জানাল তার একটি বৈ ঘোড়া নেই। কিন্তু রাজকন্যা জানাল তার দুটি ঘোড়া আছে এবং Earl তার মধ্যে ভাল ঘোড়াটি নিতে পারে। পথিমধ্যে উভয়ে নজরে পড়ল বৃদ্ধ Carl Hood-এর। কন্যা Earlকে পরামর্শ দিল Carl Hood-কে হত্যা করার জন্য। কিন্তু Earl জানাল 'I never killed one that wore grey hair.' সত্য সত্যই এই বৃদ্ধটিই তাদের পলায়নের খবর জানিয়ে দিল। শুরু হল তাদের ধরার প্রয়াস। কন্যা জানাল Earl-এর সঙ্গে পোশাক পরিবর্তন করে সে

তার পিতার লোকজনদের প্রতিরোধ করবে, কিন্তু Earl জানাল :

It's not the custom in our land
For ladies to fight and knights to stand

Earl শুধু কন্যাকে সাবধান করে দিল সে যেন তার আনন্দ পরিহার না করে যে পর্যন্ত না সে তার রক্তাক্ত দেহ দর্শন করে। একের পর এক সকলকে পর্যুদস্ত করে শেষ পর্যন্ত Earl বৃদ্ধ Carl Hood-এর হাতেই চরম আঘাতটি লাভ করল। মৃতপ্রায় Earl কন্যাকে নিয়ে পৌঁছাল তার মায়ের কাছে। মাকে জানিয়ে গেল যে কন্যাটি কখনই মন্দ প্রকৃতির নয় এবং তার সঙ্গে যেন Earl-এর ভ্রাতার বিবাহ দেওয়া হয়। ব্যালাডে Earl কন্যাকে তার ভগ্নী বলে যেমন পরিচয় দিয়েছে, তেমনি আদ্যন্ত তার মর্যাদাও রক্ষা করেছে। Earl Bran-এর মহৎ চরিত্রটিই আলোচ্য ব্যালাডে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই ব্যালাডটির সঙ্গে Douglas Tragedy-র গভীর সাদৃশ্য। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে বর্ণনাতেও সাদৃশ্যের সন্ধান লভ্য। Douglas Tragedy-তে আহত উইলিয়াম বলেছে :

'Tis naething but the shadow
of my scarlet cloak
The shines in the water sae plain'.

Earl Bran-কেও বলতে শোনা গেছে—

O it is but my scarlet hood,
That shines up on the water flood.

ব্যালাড হিসাবে বিশেষতঃ রোমান্টিক ব্যালাড হিসাবে Douglas Tragedy অনবদ্য। কিন্তু Earl Brand-এর যে রকম চরিত্র মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে তাতে The Douglas Tragedy'র তুলনায় 'The Earl o Bran'-এ এক ভিন্নতর মাত্রা যুক্ত হয়েছে স্বীকার করতে হয়।

The Three Ravens গীতিকাটি মাত্র ২৬টি পংক্তিতে সমাপ্ত। কোনো কাহিনী উপস্থাপিত হবার পরিবর্তে একটি বিশেষ ঘটনা এতে বর্ণিত হয়েছে। তিনটি কৃষ্ণ বর্ণের দাঁড় কাকের একটি জানতে চাইলে তারা তাদের দিনের প্রথম আহার কোথায় সারবে? এই সূত্রেই উল্লিখিত হয়েছে কাছের সবুজ প্রান্তরে একজন নাইটের মৃতদেহ পড়ে থাকার বিষয়টি। আরও বর্ণিত হয়েছে যে নাইটের কুকুরগুলির মৃত মনিবের পদতলে শায়িত থেকে তাকে রক্ষা করার ফলে কোনো প্রাণীর পক্ষেই নাইটের মৃতদেহের কাছে আসা সম্ভব হচ্ছিল না। নাইটের কাছে এসে হাজির হল একটি হরিণী। সে নাইটের রক্তাক্ত মাথাটি তুলে ধরল। নাইটের ক্ষতস্থানগুলিকে চুম্বন করল। তারপর পিঠে করে তাকে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করে মৃত্যুর কোলে নিজে ঢলে পড়ল। গীতিকাটির শেষে বর্ণিত হয়েছে—

God send every gentleman,
Such hawks, such hounds, and such a demon.

অর্থাৎ প্রতিটি সজ্জন ব্যক্তির জীবনেই যেমন অশুভ শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে

চায়, তেমনি বিশ্বস্ত ও উপকারী শক্তির সাহায্যও লাভ করা যায়। আলোচ্য গীতিকাটিতে নাইটকে সজ্জনরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু তার মৃত্যুর কারণ অনুল্লিখিত রয়েছে। হরিণীকে প্রায় নাইটের প্রেয়সীর ভূমিকায় দেখা গেছে।

The Douglas Tragedy কুড়িটি স্তবক সমন্বিত গীতিকা। Lord William-এর সঙ্গে এর কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহিত হলে বংশ মর্যাদার কারণে ডগলাস এই বিবাহকে স্বীকার করতে অসম্মত হন। তিনি এবং তাঁর সাতটি পুত্র উইলিয়াম ও তার সঙ্গে পলায়নপর কন্যাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। শুরু হল তুমুল সংগ্রাম। এই গীতিকায় লেডি মার্গারেটকে দেখা গেছে বীরাঙ্গনার ভূমিকায়। প্রেমিকের নির্দেশ মত শক্ত হাতে সে উইলিয়ামের সাদা ঘোড়াকে চেপে ধরে রেখেছে। এক ফোঁটা চোখের জল সে ফেলেনি 'never shed one tear'. প্রেমিকা সত্তার সঙ্গে কন্যা সত্তার দ্বন্দ্ব দেখান হয়েছে মার্গারেটের মধ্যে। তাই শেষপর্যন্ত সে উইলিয়ামকে বলতে বাধ্য হয়েছে উইলিয়াম যেন তার পিতাকে তেমনভাবে আঘাত না হানে, কেননা—

True lovers I can get many a one
But a father I can never get.

মার্গারেট নিজের রুমাল লর্ড ডগলাসের ক্ষতস্থানগুলিতে ধরেছে। কিন্তু এরপরও সে উইলিয়ামের সঙ্গী হয়েছে। ক্রমাগত চলতে চলতে এসে উপনীত হয়েছে এক নদীতে জল পানের জন্য। মার্গারেট চমকে উঠেছে উইলিয়ামকে দেখে, উইলিয়াম যে প্রায় নিহত। কিন্তু উইলিয়াম তার গুরুতর রূপে আহত হওয়ার সংবাদ গোপন রেখেছে, বলেছে জলে ছায়া পড়েছে তার পোশাকের। চাঁদের আলোয় তারা এসে পৌঁচেছে উইলিয়ামের মায়ের কাছে। মাকে সে উঠতে বলেছে, জানিয়েছে সে জয় করে নিয়ে এসেছে মার্গারেটকে। মাকে উইলিয়াম বলেছে বড় করে বিছানা করতে। লেডী মার্গারেটকে নিয়ে সে নিশ্চিন্তে ঘুমবে। মাঝরাতের অনেক আগেই লর্ড উইলিয়ামের মৃত্যু হয়েছে। এরপর মৃত্যু হয়েছে লেডী মার্গারেটের। লর্ড উইলিয়াম ও লেডী মার্গারেটকে সমাহিত করা হয়েছে। মার্গারেটের কবর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে রক্ত গোলাপ। আর লর্ড উইলিয়ামের সমাধি থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি ডাল। ফুল ও ডাল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কেননা—

'They were twa lovers dear.'

একটি ধাঁধাকেন্দ্রিক গীতিকায় বর্ণিত হয়েছে এক নাইট এক বিধবার গৃহে উপস্থিত হলে বিধবার তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা যে সে নাইটকে দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে— সব থেকে দীর্ঘ কি, সব থেকে গভীর কি, সব থেকে ভারী কি, সব থেকে সাদা কি, সব থেকে কোমল কি, সব থেকে উচ্চ গ্রামের শব্দ কি, সব থেকে সবুজ কি, সব থেকে উষ্ণ কি ইত্যাদি। নাইট দশটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছে। বলেছে—সব থেকে উঁচু হল স্বর্গ, সব থেকে নিম্নস্থানে অবস্থান পাতালের, সব থেকে ভারী হল পাপ, রুটির তুলনায় আশীর্বাদই শ্রেয়ঃ, বরফ দুধের থেকেও সাদা, কাঁটার থেকে তীক্ষ্ণতর হল

ক্ষুধা।

King Henry গীতিকাটি কুড়িটি স্তবকে বিভক্ত। বর্ণিত হয়েছে রাজা হেনরীর শিকারের বিবরণ. হরিণকে তিনি অনুসরণ করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা স্থূলাকৃতির একটি হরিণকে হত্যাও করেছেন। এদিকে তার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে এক ভয়ংকর দর্শন প্রেতাত্মা। প্রেতাত্মার বিবরণে বলা হয়েছে—

Her teath was a like teather stokes,
Her nose like club or mell;

সে হেনরীর কাছে মাংস খেতে চাইল। একে একে হেনরী তার সঙ্গের ঘোড়া এবং শিকারী কুকুর হত্যা করে তাকে দিলেন। এতেও প্রেতাত্মাটির আশ মিটল না। তার আরও মাংসের চাহিদা।—

Some meat, some meat, ye
King Henry
Some meat, ye, gie to me

হেনরী hawk মেরে তার মাংসও দিলেন। এরপর মৃত ঘোড়ার চামড়া সেলাই করে তাতে করে মদ্য দিলেন প্রেতাত্মাটিকে। এরপর রচনা করে দিলেন বিছানা। হেনরীকে আহ্বান জানাল সে তার সঙ্গে শয়নের জন্য।

প্রভাতে হেনরী দেখলেন তিনি শায়িত রয়েছেন সুন্দরী শ্রেষ্ঠার পাশে। হেনরী জানতে চাইলেন এভাবে কতদিন চলবে। প্রেতাত্মাটি জানাল হেনরীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত, কেননা তার মত নাইট সে আর আগে পায়নি যে নাকি তার সব চাহিদা মিটিয়েছে।

সমালোচক মন্তব্য করেছেন : 'The best known of all English ballads are the Robin Hood ballads'. অন্যত্রও আর এক সমালোচক বলেছেন 'Taken as a whole, the Robin Hood pieces afford materials of the highest interest for the study of ballad and epic', তাই Robin Hood সম্পর্কিত কয়েকটি ব্যালাডের পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে—

The Birth of Robin Hood গীতিকাটি আঠারটি স্তবকে বিন্যস্ত। Earl Richard-এর একমাত্র কন্যা ও Willie পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হল। এমন কি পিতার অজ্ঞাতে তারা মিলিত হতে লাগল। এক সময়ে নায়িকা সন্তানপ্রসব করল সবুজ অরণ্যের মধ্যে যেখানে অনেক লিলি ফুল ফুটেছিল। এদিকে Earl Richard কন্যার সন্ধান লাভের জন্য ব্যাকুল। শেষে তিনি কন্যার সন্ধান করতে গিয়ে সবুজ বনে সদ্যোজাত সন্তান সহ তাঁর কন্যার সাক্ষাৎ পেলেন। আর্ল তাঁর নাতিকে দু'হাতে তুলে নিলেন। কোমল ভাবে তাকে চুম্বন করলেন। জানালেন তিনি তাঁর কন্যার প্রেমিককে হত্যা করবেনই, কিন্তু কন্যাটি তাঁর বড় আদরের।

He kist him o'er and o'er again,
"My grandson I thee claim,

And Robin Hood in gude green wood,
And that shall be your name".

এইভাবে গীতিকাটিতে রবিন হুডের জন্ম ও তার নামকরণ আখ্যাত হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে Earl Richard-এর দ্বৈত সত্তা। একদিকে তাঁর কন্যা ও দৌহিত্রের জন্য গভীর মমত্ব বোধ, অপরদিকে কন্যার প্রেমিকের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র জেহাদ। স্নেহময়ী পিতা রূপে তাঁকে আমরা গীতিকাটিতে পাই।

Robin Hood and the curtal Friar ব্যালাডটিতে রবিন হুডের কাছে curtal Friar-এর পর্যুদস্ত হবার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। ব্যালাডটিতে সীমিত পরিসরে প্রকৃতির যে বিবরণ দান করা হয়েছে তা এক কথায় অনবদ্য—

In summer time, when leaves grow green,
And flowers are fresh and gay,

curtal Friar যদিও Robin Hood-এর অনুচর ক্ষুদ্র জনের কারণে রবিন হুডের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে, তথাপি তার প্রতি কোনো অসম্মানজনক আচরণ করা হয়নি, তাকে সম্মানীয় প্রস্তাব দান করে প্রকারান্তরে রবিন হুডের মহত্ত্ব, ঔদার্য ও বীর্যবত্তার প্রতি তার সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ব্যালাডটিতে মধ্যযুগীয় পরিবেশ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত।

Robin Hood and Alan a Dale গীতিকাটি সাতাশটি স্তবকে রচিত। প্রতিটি স্তবক চার পংক্তি সংবলিত। Alan a Dale-এর প্রেমিকাকে এক বৃদ্ধ নাইট বিবাহের জন্য যখন প্রস্তুত, তখন ভগ্ন মনোরথ Alan a Dale-এর সাহায্যার্থে এগিয়ে এল Robin Hood. শেষ পর্যন্ত Robin Hood-এর সহায়তায় Alan a Dale তার প্রেমিকাকে লাভ করল। বিনিময়ে Alan a Dale যোগ দিল Robin Hood-এর দলে। গীতিকাটির সূচনা হয়েছে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে—

Come listen to me, you gallants so free.
All you that love mirth for to hear
And I will tell of a blood out law,

গীতিকায় নায়িকার কোন বক্তব্য স্থান পায়নি, কিন্তু সে যে Alan a Dale-কে স্বামী রূপে লাভ করে তৃপ্ত হয়েছিল, একটি পংক্তির বর্ণনাতেই তা স্পষ্ট—

The bride lookt as fresh as a queen,

বিশপ Robin Hood-এর ইচ্ছামত বিবাহের আয়োজনে অসম্মত হলে Bishop-এর পোশাক খুলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র জনের গায়ে চাপিয়ে তাকে দিয়ে সে যেভাবে কাজ হাসিল করেছে, তা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে—

Robin Hood pull'd off the Bishop's coat,
And put it upon Little John;

প্রকৃতির সজীব বর্ণনাও গীতিকাটির আকর্ষণকে বৃদ্ধি করেছে—

And so they return'd to the merry green wood,

Amongst the leaves so green.

আসলে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনানন্দকেই প্রকৃতির আনন্দোজ্জ্বল রূপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'glistening gold','scarlet red' ইত্যাদির মত প্রচলিত উপমাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

Robin Hood and the Bishop of Hereford গীতিকাটি বাইশটি স্তবকে বিধৃত, প্রতিটি স্তবক চারটি পংক্তি সম্বলিত। এই গীতিকায় Hereford-এর Bishop-কে তার আচরণের উপযুক্ত শাস্তিদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। রবিন হুডের নির্দেশে রাজার হরিণ মারা হয়েছিল। Hereford-এর Bishop এই কারণে রবিন হুড ও মেষপালকের ছদ্মবেশে সজ্জিত তার সঙ্গী ছজনকে রাজার কাছে হাজির করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের শাস্তি হত মৃত্যু—লঘু পাপে গুরুদণ্ড। রবিন হুড করুণা ভিক্ষা করেছিল বিশপের কাছে, স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তার মত ধর্মাচরণকারী ব্যক্তির পক্ষে সাত সাতটি প্রাণের বিনাশের কারণ হওয়া অসঙ্গত—

'O pardon, I thee pray!
For it never becomes your lordship's coat
To take so many lives away'

ভগবান যীশু যেখানে ক্ষমা করার কথা বলে গেছেন, সেখানে বিশপকে দেখা গেছে তার বিপরীত আচরণ করতে।

এইবার নিজমূর্তি ধারণ করেছে রবিন হুড। তার ইঙ্গিতে সত্তর জন অনুচর এসে হাজির হয়েছে বিশপকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য। এইবার বিশপের প্রার্থনা জানানোর পালা—

'O pardon, O pardon', said the Bishop,
'O pardon, I thee pray!'

রবিন হুড ঠিক বিশপের পূর্বের ভাষাতেই তার প্রার্থনা না-মঞ্জুর করে বলেছে—

'No pardon, no pardon!' said Robin Hood;
'No pardon I thee owe,
Therefore make haste, come along with me,

শেষপর্যন্ত বিশপ রবিন হুডের সঙ্গে Bransdale-এ যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর কোট খুলে নেওয়া হয়েছে, নেওয়া হয়েছে তিনশত পাউণ্ড। তাতেও তাঁর রেহাই হয়নি, তাঁকে দিয়ে নাচানো হয়েছে, গাওয়ানো হয়েছে। বিশপের পদের অনুপযুক্ত ব্যক্তি বলে তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হয়েছে। গীতিকাটিতে বিশপকে হাস্যাস্পদ করে তোলা হয়েছে।

'Robin Hood and the Widow's three sons'-এও অত্যাচারী শেরিফের শাস্তিদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। রবিন হুড গিয়েছিল Nottingham-এ। সেখানে এক বৃদ্ধা রমণীকে সে ক্রন্দনরতা দেখতে পেল। জিজ্ঞাসা করে জানল তার তিন পুত্রকে

Nottingham শহরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। তাদের অপরাধ তারা রাজার হরিণ মেরেছে। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোনো অন্যায় তারা করেনি—

They have no parishes burnt, good sir,
No yet have ministers slain,
Nor have they robbed any virgin,
Nor other man's wives have ta'en.

রবিন হুড এরপর এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার পোশাক বিনিময় করে নিয়ে দেখা করেছে Nottingham-এর শেরিফের সঙ্গে। রবিন হুডের ইঙ্গিতে পার্বত্য সংকুল পথ থেকে উপস্থিত হয়েছে তার দেড়শত অনুচর। সমতল ভূমি থেকে হাজির হয়েছে যাট জন। সকলে মিলে অত্যাচারী শেরিফকেই ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়েছে। বৃদ্ধার তিন পুত্রের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। এই ব্যালাডটিতে রবিন হুডকে শুধু শাস্তিদাতা হিসাবেই উপস্থাপিত করা হয়নি, গরীবের যে সে পরিত্রাতা, সে পরিচয়ও প্রকাশিত। নটিংহামের বৃদ্ধকে সে চল্লিশ শিলিং ছাড়াও কুড়িটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তার শতছিন্ন পরিচ্ছদ নিজে গ্রহণ করেছে। ব্যালাডে বৃদ্ধের যে পোশাক তার বিবরণটি বিস্তারিতভাবে প্রদত্ত হয়েছে। এই ব্যালাডে একটি উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে—

'Whenever you go, whenever you ride,
Laugh ne'er an old man to scorn'

মোট বাইশটি স্তবকে ব্যালডটি রচিত।

Robin Hood and the Butcher ব্যালাডটিতে বর্ণিত হয়েছে রবিন হুডের অসীম সাহসী ভূমিকা। সে এক মাংস বিক্রেতার কাছ থেকে মাংস ও তার বাহন ঘোটকী কিনে নিয়ে নটিংহামে গেছে মাংস বিক্রেতারূপে। সুলভ মূল্যে অধিক পরিমাণে মাংস বিক্রয় করায় তার দ্রুত মাংস বিক্রীত হয়েছে। এরপর অন্যান্য মাংস বিক্রেতার সঙ্গে শেরিফের গৃহে উপস্থিত হয়েছে পান-ভোজনের জন্য। তার ব্যয় বাহুল্যে সকলে ধরে নিয়েছে সে অমিতব্যয়ী। শেরিফকে এরপর শিংওয়ালা জন্তু দেখাবার প্রলোভনে তাকে হাজির করেছে নিজের আস্তানায়, শেরহুডের জঙ্গলে। বেচারী শেরিফ তখনও বুঝে উঠতে পারেনি যে মাংস বিক্রেতার ছদ্মবেশ ধারণকারী ব্যক্তিটিই রবিন হুড। তাই শেরহুডের জঙ্গলে পৌঁছে প্রার্থনা জানিয়েছে শেরিফ—

'God bless us this day
From a man they call Robin Hood!'

বলাবাহুল্য শেরিফের প্রার্থনায় কৌতুক রসের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর শত খানেক রক্তিম বর্ণের হরিণ দেখে শেরিফের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে, সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে চেয়েছে, বলেছে—

I tell thee, good fellow, I would I were gone,
For I like not thy company!

কিন্তু তখন শেরিফের আর ফেরার উপায় নেই। রবিন হুডের নির্দেশে তার লোকজন

হাজির হয়েছে। স্বয়ং রবিন হুড শেরিফের পোশাকের ভেতর থেকে তিনশ পাউণ্ড মূল্যের সোনা আদায় করে নিয়েছে। তারপর অবশ্য শেরিফকে মুক্তি দিয়েছে। শেরিফকে বিদায় দিয়ে রবিন হুড যা বলেছে, তাতে তার রসিকতা করার পরিচয় মেলে—

'O have me commended, good sir to your wife!'

আমাদের গীতিকাগুলির সংখ্যাল্পতার কারণেই স্বাভাবিকভাবে বৈচিত্র্যহীনতা লক্ষিত হয়। তাছাড়া পাশ্চাত্যদেশীয় গীতিকাগুলি অনেকক্ষেত্রেই স্বল্পায়তনবিশিষ্ট। বিশেষ একটি মুহূর্তকেই সেখানে মূর্ত করে তোলার দিকে ঝোঁক, অপরপক্ষে আমাদের গীতিকাগুলি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ, কেননা আমাদের গীতিকাগুলিতে আনুপূর্বিকতা রক্ষার প্রয়াস সুস্পষ্ট। মোটামুটিভাবে পাঠকের সব প্রশ্নের জবাবগুলিই আমাদের গীতিকাগুলিতে লভ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য গীতিকাগুলিতে বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে গেছে। পাশ্চাত্য গীতিকায় চমকের আধিক্য। পাঠক এমন এক একটি ঘটনা অথবা পরিণতির সম্মুখীন হয়, যেজন্য সে পূর্ব থেকে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিল না।

পাশ্চাত্য গীতিকাগুলি অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ, objective। সেখানে 'there are no comments or reflections by the narrator....He merely tells what happened...'[৩] কিন্তু আমাদের গীতিকাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই যেমন শুরু হয়েছে বন্দনা দিয়ে, তেমনি গীতিকাগুলিতেও অনেক সময় নানা বিষয়ে যেমন যথার্থ সুখ-দুঃখের স্বরূপ, ঈশ্বর নির্ভরতা, জীবনের অনিত্যতা ইত্যাদি নিয়ে মন্তব্য সংযোজিত হয়েছে। ফলে পাশ্চাত্য গীতিকায় যেভাবে নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য প্রকট, সেখানে আমাদের গীতিকাগুলিতে Subjectivity অনেক বেশি।

পাশ্চাত্য গীতিকাগুলির ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলি পাঠান্তর পাই—'Variation is the crucial test of folklore'; কিন্তু আমাদের গীতিকাগুলির ক্ষেত্রে তার বড়ই অভাব। ফলে যথার্থ পাঠটি নির্ধারণ করা যেমন কঠিন, তেমনি প্রাচীনত্ব নিরূপণও তেমনভাবে সম্ভব হয় না।

পাশ্চাত্য গীতিকায় অলৌকিক উপাদানের রাজকীয় আধিপত্য। অশরীরী আত্মা, পরী ইত্যাদি খুব সুলভ। স্বপ্নাদেশ, যাদুকরী সঙ্গীত, নিষেধাজ্ঞা, ডাইনিবিদ্যা, রূপান্তর ইত্যাদির পরিচয় মেলে The Unquiet Grave, The Avenging Sword, The knight in Bird Dress, The Lind Worm, The Maiden Hind, The Fause knight upon the road, The Elfin knight, Lady Isabel, The Twa sisters, The cruel mother, Tamilin, Sweet William's Ghost ইত্যাদিতে। কিন্তু সে তুলনায় বাংলা গীতিকায় অলৌকিকতার সন্ধান সীমিত পরিসরেই লভ্য। প্রসঙ্গত Riddle Ballad-এর কথাও উল্লেখ্য। বাংলায় Riddle Ballad সুলভ নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যে বিশেষতঃ ইংরেজী ও জার্মানী গীতিকায় আমরা এই ধরনের ballad-এর সন্ধান পাই। সমালোচকের ভাষায় Riddle Ballad হল 'The basic theme of these is that of a mortal out witting a supernatural being by quickness of wit, and of the magic power of the world

embodied in riddles.'[৪] পাশ্চাত্য দেশে ধর্মীয় গীতিকা আছে যেমন স্যার হিউজ, দি চেরী ট্রি ক্যারল, জুডাস ইত্যাদি, আমাদের তেমনি রয়েছে নাথ-গীতিকা। অপরপক্ষে Brave wolf, The Last Fierce charge, Paul Jones-এর মত আমাদের রয়েছে রাজা রঘু, মুকুট রায়, তিলক বসন্ত, চৌধুরীর লড়াইয়ের মত ঐতিহাসিক গীতিকা। পাশ্চাত্য দেশের রবিন হুড, টম ডুলির মত আমাদেরও দস্যু কেনারামের পালা, মাণিক তারা, কাফন চোরা পালাগুলি বিদ্যমান। 'King of feo' গীতিকা orpheus ও Eurydiceকে নিয়ে রচিত, ক্ল্যাসিকাল কাহিনীর ছাপ এতে সুস্পষ্ট। আমাদের দস্যু কেনারামে রামায়ণের প্রভাব লক্ষণীয়। সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলতে হয় 'English ballads state but Bengali ballads relate'; ড. মযহারুল ইসলামের মূল্যবান মন্তব্য দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে—'ইংরেজি ব্যালাডগুলোর প্রকৃতি আর বাংলা গীতিকার প্রকৃতি ঠিক এক নয়। ইংরেজী ব্যালাডে যে সব বৈশিষ্ট্য না হলে ব্যালাড পদবাচ্য হতে পারে না, বাংলা গীতিকায় হয়তো তা একেবারেই অনুপস্থিত; আবার বাংলা লোকগীতিকায় যে সমস্ত বিষয় প্রায় অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়, সে সব হয়তো ইংরেজী ব্যালাডে খুঁজতে যাওয়া বৃথা'।[৫]

## তৃতীয় অধ্যায়

# গীতিকার প্রকাশ রীতি

গীতিকাগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যায় এগুলির রচয়িতারা নিরক্ষর হলেও, অশিক্ষিত ছিলেন না, ছিলেন না শিল্পসম্মত প্রকাশ ভঙ্গীর ব্যাপারে অসচেতন। বস্তুতপক্ষে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গীতিকাগুলিতে অনুসৃত হয়েছে যাতে রচনাগুলি যেমন আকর্ষণীয় হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে এগুলির শিল্পোৎকর্ষ, তেমনিই সঞ্চারিত হয়েছে এগুলিতে বৈচিত্র্য, যা পাঠক তথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে তৃপ্তিদান করে।

পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যালাডের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তথা আকর্ষণ হল সংযত প্রকাশভঙ্গী। সমালোচকেরা একবাক্যে ব্যালাডের 'economy of expression' এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। রচয়িতারা অনাবশ্যক ঘটনা, কাহিনী বা বর্ণনাকে বিবৃত করে তাঁদের কাহিনীর নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাননি, চাননি শিল্পগুণকে খর্ব করতে। পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যালাডের তুলনায় বাংলা গীতিকায় এই দৃঢ় সংহত রূপ তেমন সুলভ নয়, বাঙ্গালীর উচ্ছ্বাসপ্রবণতা মজ্জাগত, তাই আমরা সীমিত পরিসরে গীতিকার কাহিনীকে উপস্থাপিত হতে প্রায় দেখি নি। অনেক ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক বর্ণনার ভারে তা ভারাক্রান্ত। তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের গীতিকাতেও রচয়িতারা তাঁদের সংযম শক্তির প্রমাণ রেখেছেন। বিশেষতঃ দীর্ঘ সময়ের অনাবশ্যক বিবরণকে তাঁরা কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। যেমন—

(ক) এক দুই তিন করি শুল বছর যায়।
খেলা কছরত তারে যতনে শিখায়।। (মহুয়া)

(খ) এক দুই তিন করি আষাঢ়ি মাস যায়।
মাইর সরসিরে বিনোদ বেদনা জানায়।। (মলুয়া)

(গ) এক মাস দুই মাস তিন মাস যায়।
ছয় সাত আট করি বচ্ছর গোয়ায়।। (মলুয়া)

(ঘ) এক দুই করি দেখ তের বছর যায়।
আমার বিয়ার কথা কয় বাপ মায়।। (কমলা)

কত অবলীলাক্রমে দীর্ঘ এক বছর, তের বছর বা ষোল বছরের ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—অল্প কথায় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানকে হ্রাস করার এই রীতি আমাদের গীতিকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অভিশপ্ত যক্ষ নির্বাসিত অবস্থায় তার প্রিয়াব কাছে দূত রূপে প্রেরণ করেছিলেন মেঘকে। কবি কালিদাসের অদ্বিতীয় কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর বিদ্যমান রয়েছে তাঁর মেঘদূত কাব্যে। গীতিকার নিরক্ষর কবিরা কালিদাসের মত অলোকসম্ভরা কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না ঠিকই, তথাপি তাঁদেরও দেখা গেছে পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছ-পালা এমন কি বনের কুড়াকে দূত রূপে নিযুক্ত করতে। কখনও নায়ক নায়িকার সন্ধান লাভের জন্য উদগ্রীব

হয়ে তার জ্ঞাতব্য সংবাদাদির জন্য 'কুড়া'কে দূত রূপে নিয়োগ করেছে, কখনও বা নায়িকা তার দয়িতের সন্ধান লাভের জন্য শরণাপন্ন হয়েছে পক্ষী, তরু-লতা, বাঘ-ভাল্লুকের মত হিংস্র জন্তুর। প্রথমে নায়িকার জন্য নায়কের শরণাপন্ন হওয়ার বিবরণ—

ক. শুন শুন কুড়া আরে কহি যে তোমারে।
পরিচয়—কথা কন্যার আন্যা দেও আমারে।।
কার বা নারী কার বা কন্যা কোথায় বাড়ী ঘর।
উইরে যাওরে বনের কুড়া আন গিয়া উত্তর।। (মলুয়া)

এইবার নায়কের জন্য নায়িকার ব্যাকুল হওয়ার বিবরণ—

ক. কও কও কও পক্ষী আরে কও তরুলতা।
ঢেউয়ের কূলে পইড়া বন্ধু এখন গেল কোথা।।
শুন আরে বাঘ-ভালুক পরে আমায় খাও।
বন্ধুর উদ্দেশ মোরে পরখাইয়া জানাও।। (মহুয়া)

খ. শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিন্ পুরুষেরে।। (মলুয়া)

শুধুমাত্র দূতের সহায়তা গ্রহণ নায়ক-নায়িকার সংবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, মাতাপিতা ভগ্নীকে সংবাদ প্রেরণের ব্যাপারেও এই সহায়তা গ্রহণ চোখে পড়ে—

ক. বাপের আগে কইও ঘোড়া কইও মায়ের আগে।
তোমার কন্যা মহুয়ারে খাইছে জংলার বাঘে।।(মহুয়া)

খ. উইরে যাওরে বনের কুড়া কইও মায়ের আগে।
তোমার না চান্দ বিনোদে খাইছে জঙ্গলার বাঘে।।
উইরে যাওরে বনের কুড়া কইও বইনের ঠাই।
মইরা গেছে চান্দ বিনোদ আরত বাচ্যা নাই।। (মলুযা)

আবার নিছক মরমী রূপে কল্পনা করে নায়িকাকে তার মনের অতলান্ত বেদনার কথা প্রকাশ করতে দেখা গেছে নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের কাছে—

শুন শুন নদী আরে শুন আমার কথা।
তুমিত অভাগী লীলার জান মনের ব্যথা।
তুমিত দরিয়ারে নদী আরে নদী কূলে তোমার বাসা।
তুমি জান কঙ্ক-লীলার মনের যত আশা।। (কঙ্ক ও লীলা)

আমরা এখানে সর্বপ্রাণবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করি। সর্বপ্রাণবাদের প্রতিফলন লভ্য অন্যত্রও, গীতিকার নায়ক ও নায়িকা তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, সঙ্কল্প ইত্যাদির কথা 'চন্দ্র-সূর্য' কিংবা 'দিবস-রজনী', ইজল গাছকে উদ্দেশ করে বলেছে—

ক চন্দ্র সূর্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী।। (মহুয়া)

খ. সাক্ষী হইও চান্দ-সুরুয সাক্ষী হইও তুমি।
ঘর দোয়ার ছাড়িয়া আজি বৈদেশী হইলাম আমি।. (মহুয়া)

গ. সাক্ষী হইয়ো চান্দ-সুরুয দিবস-রজনী।
বন্ধুর লাগাল পাইলে কইয়ো দুখের কাহিনী।।(দেওয়ান ভাবনা)

ঘ. সাক্ষী হইও ইজল গাছ নদীর কূলে বাসা।
তোমার কাছে কইয়া গেলাম মনের যত আশা।। (চন্দ্রাবতী)

গীতিকায় নায়ক-নায়িকা প্রায় একই রূপ ভাষায় অনুরক্তি প্রকাশ করেছে, উচ্চারণ করেছে একে অন্যের প্রতি প্রশংসা—

ক. পাখী যদি হইতারে বন্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হৃদ্‌পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথা রাখতাম তোরে।।
চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগা সারা নিশি।
চান্দমুখ দেখিতাম নিরালায় বসি।। (কমলা)

খ. পক্ষী হইলে সোনার বন্ধুরে রাখিতাম পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোঁপায় রাখতাম তোরে।।
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান ভরিয়া।
তোমাব সঙ্গে যাইতাম বন্ধুরে দেশান্তরী হইয়া।। (দেওয়ান ভাবনা)

গ. তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা।
বেইরা রাখব যুগল চরণ ছাইড়া যাইব কোথা।।
...তুমি রে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়বাম জাতি কুল।। (কঙ্ক ও লীলা)

পাশ্চাত্য ব্যালাডে 'parallelism' বা সহচারবাদের অনুসরণ লক্ষণীয়। সমালোচক বলেছেন : 'Another rhetorical devices is "parallelism in phrase and idea".....and the favourite way of developing this parallelism is by incremental repetition. Each stanza repeats the one before it, but with some additions which leads on to the climax.'[১]

যেমন 'The cruel brother' ballad-এর এই স্তবকগুলি—

21. 'O what will you leave to your father dear'?
'The silver-shode steed that brought me here'

22. 'What will you leave to your mother dear'?
'My velvet pall and my silken gear'.

23. 'What will you leave to your sister Anne?'
'My silken scarf and my gowden fair'.

আমাদের গীতিকাতেও এই সহচারবাদের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

ক. শুন শুন প্রাণ পতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মতন বিদায় দেও এই মহুয়ারে।।

শুন শুন পালং সই শুন বলি কথা।
কিঞ্চিৎ বুঝিবে তুমি আমার মনের বেথা।।
শুন শুন বাপ মাও বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায়।। (মহুয়া)

খ. বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে মালতী-বকুল।
আঞ্চল ভরিয়া তুলব তোমার মালার ফুল।।
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে রক্তজবা সারি।
তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশা করি।।
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে মল্লিকা-মালতী।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার মতন পতি।।
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে কেতকী-দুস্তব।
কি জানি লেখ্যাছে বিধি কপালে আমার।। (চন্দ্রাবতী)

গ. কইও কইও কইও দূতী কইও মাযেব আগে।
আমারে যে লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার চরে।।
কইও কইও কইও দূতী কইও মাসীর আগে।
আমাব কাঁখের কলসী পইড়া (রৈলা) অইনা নদীর ঘাটে।।
কইও কইও কইও দূতী দুশমন মামার ঠায়।
বাউন্ন পুরা জমি লইয়া সুখে বস্যা খায়।।
কইও কইও কইও দূতী প্রাণ বন্ধুর আগে।
বন্ধুরে জানাইও সুনাইরে খাইছে ভাবনা-বাঘে।। (দেওয়ান ভাবনা)

পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যালাডে বহু প্রচলিত গতানুগতিক বাক্যাংশ, বিশেষত: বিশেষণ ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ রচয়িতারা স্বকীয়তা পরিস্ফুটনের পরিবর্তে একইরূপ বিশেষণ তথা বর্ণনার সাহায্য নিয়েছেন। জল সর্বদা বর্ণিত হয়েছে 'wan' রূপে, মাথার কেশ হরিদ্রা বর্ণের বলে বর্ণিত হয়েছে, ঘোড়া হয় দুধের মত সাদা অথবা লৌহের মত ধূসর বর্ণের, নতুবা কয়লার মত কৃষ্ণ বর্ণের, সোনা রক্তিম বর্ণের, বস্ত্র হল 'the finest pa'. তরুণীর কটিদেশ 'a middle sae jimp', মারণাস্ত্র হল 'the wae pen-knife', শিঙার শব্দ একই সঙ্গে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ 'brands are bright or brown.' যে সমস্ত বহুল প্রচলিত বাক্যাংশের প্রয়োগ সুলভ, তার কয়েকটি হল 'He honda gone a mile, a mile...,' 'He bent his bow and swam,' 'The cup and spoke the little foot-page' ইত্যাদি। সমালোচক যথার্থই বলেছেন 'The ballads use their own peculiar rhetoric and poetic diction to increase the dramatic pressure.'[২] Mathew Hadgard তাঁর 'The Faber Book of Ballads' গ্রন্থেও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, 'After the ballad's dramatic quality, the next most striking feature of their style is the 'commonplace' or 'formula.'[৩]

আমাদের গীতিকাতেও নূতন নূতন বিশেষণ কিংবা বাক্যাংশ ব্যবহারের পরিবর্তে একই রূপ বিশেষণ বা বাক্যাংশ প্রয়োগেই রচয়িতাদের ঝোঁক দেখা গেছে। যেমন 'চন্দ্রমুখী কন্যা', 'অঙ্গ কাঞ্চা সোনা', 'চান্দ বদন', 'হৃদ পিঞ্জরার পংখী', 'ম্যাঘ বরণ ক্যাশ', 'কইন্যা কনক চম্পা ফুল' ইত্যাদি। একইরূপ বাক্য ব্যবহারের নিদর্শন স্বরূপ তিনটি পৃথক পৃথক গীতিকা থেকে দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হল—

ক. সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।। (মলুয়া)

খ. জলের শেওলা সম ভাসিয়া বেড়াই।। (রূপবতী)

গ. সুতের সেওলা হৈয়া ভাসিয়া বেড়ায়। (কঙ্ক ও লীলা)

আরও কিছু নিদর্শন উদ্ধার করা গেল, যেগুলি কম-বেশি প্রায় সব গীতিকাতেই ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে—

ঘ. মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি (মহুয়া)

ঙ. আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা। (মহুয়া)

চ. আশমানের চান্দ যেমন জমিনে পড়িয়া। (মলুয়া)

ছ. তোমার ত যৌবন ছিল জোয়ারের পানি।।' (কমলা)

ঐতিহ্য পরম্পরায় যে সব গীতিকা চলে এসেছে সেগুলির রচনারীতির ক্ষেত্রে যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তা হল উপস্থাপিত চরিত্রগুলির প্রশ্নোত্তর তথা কথোপকথনের সহায়তায় কাহিনীর সম্প্রসারণ। অর্থাৎ রচয়িতা এক্ষেত্রে নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ। নাট্যকার যেমন নাটকের পাত্রপাত্রীর সংলাপ রচনা করলেও প্রত্যক্ষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন না, উপস্থাপিত চরিত্রগুলির বক্তব্য তাদের জবানীতেই শ্রোতা বা পাঠক অবহিত হয় তেমনি। আমরা জানি গীতিকা বা ব্যালাডগুলি পাঠের জন্য রচিত হয়নি, রচিত হয়েছে শ্রোতার কাছে সঙ্গীতরূপে পরিবেশিত হবার জন্য। স্বভাবতঃই গায়ক বা রচয়িতা কাহিনী নির্ভর এইসব সঙ্গীতগুলিকে শ্রোতার সম্মুখে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপিত করেন। নিজেরাই বিবৃতকারী রূপে আত্ম প্রকাশ করেন। কিন্তু কাহিনীর আনুপূর্বিক বিবরণ যদি গায়ক বা রচয়িতাই দেন, সেক্ষেত্রে কাহিনীর বৈচিত্র্য হানির অবকাশ থাকে। আমরা জানি গীতিকা ব্য ব্যালাডের নাটকীয়তা ধর্ম অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কথকতার ক্ষেত্রে কথক ঠাকুর যেমন নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য অনেক সময় নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে বক্তার ভূমিকায় না থেকে বর্ণিতব্য চরিত্রগুলিকেই তাদের প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে বক্তব্য পেশের সুযোগ করে দেন আর এইভাবে বর্ণিতব্য চরিত্রগুলির উপস্থিতির কিছুটা অন্ততঃ শ্রোতা অনুভব করতে পারে, তেমনি গীতিকাতেও গায়কেরা মাঝে মাঝেই প্রত্যক্ষ ভাবে বর্ণনাকারীর ভূমিকা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে যে সব চরিত্রের প্রসঙ্গে তিনি বলছেন সেগুলিকেই সরাসরি হাজির করেন শ্রোতাদের কাছে। পাশ্চাত্য সমালোচক ব্যালাডে অনুসৃত এই রীতিকে পত্রোধৃত উপন্যাসের আঙ্গিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন, বলেছেন এই রীতিতে কাহিনী অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ থেকে মুক্ত হয়ে উপস্থাপিত হয়—'A large proportion of popular ballads tell their

stories almost entirely through questions and answers. As in the epistolary novel, our information about events is limited to what we are told by the participants. Because the story is stripped of irrelevancies, the result can be highly dramatic.'[8] (The Literary Ballad; Anne Henry Ehrenpreis)। পাশ্চাত্য ব্যালাডের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'Edward', যেখানে এই রীতির অনুসরণ সর্বাধিক ঘটেছে। আমাদের গীতিকাগুলিতেও কম-বেশি এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। 'মহুয়া'র সর্বমোট ৭৮৯ পংক্তির মধ্যে ৩৫৯ পংক্তি সরাসরি পাত্রপাত্রীর নিজেদের কথোপকথনে রচিত। 'মলুয়া'য় সর্বমোট ১২৫৭টি পংক্তির মধ্যে এই রীতি অনুসৃত হয়েছে মোট ৫৪২ পংক্তিতে। 'চন্দ্রাবতী'তে ৩৭৯ পংক্তির মধ্যে এই পদ্ধতিতে ১৬৭টি পংক্তি রচিত। 'দেওয়ান মদিনা'য় ৮২২ পংক্তির মধ্যে ৪৮৩ পংক্তি উক্তি-প্রত্যুক্তিতে রচিত। 'রূপবতী' মোট ৪২০ পংক্তির রচনা। এর মধ্যে পাত্রপাত্রীর সরাসরি উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ব্যয়িত হয়েছে ২১৩ পংক্তি। 'দেওয়ান ভাবনা' ৩৭৮ পংক্তি সম্বলিত রচনা। তন্মধ্যে ১৭০ পংক্তি রচনায় রচয়িতা প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত। 'কমলা'য় ১১৯০ পংক্তির মধ্যে ৭১৫ পংক্তি অবিমিশ্রভাবে উপস্থাপিত চরিত্রগুলির দখলে। শতকরা হিসাবে দেখা যায় 'মহুয়া'য় ৪৫ শতাংশের অধিক, 'মলুয়া'য় ৪৩ শতাংশের অধিক, 'চন্দ্রাবতী'তে ৪৪ শতাংশের অধিক, 'দেওয়ানা মদিনা'য় ৫৮ শতাংশের অধিক, 'রূপবতী'তে ৫০ শতাংশের অধিক, 'দেওয়ান ভাবনা'য় ৪৪ শতাংশের অধিক, 'কমলা'য় ৬০ শতাংশের অধিক অংশ পাত্রপাত্রীদের সরাসরি বক্তব্যে রচিত। দুটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।—

'কমলা' পালায় গোয়ালিনী ও কারকুনের কথোপকথনের অংশবিশেষ—

গোয়ালিনী কয় "আমি নাহি বেচী পান।
বিনামূল্যে দেই পান সঙ্গেতে পরাণ।।
রসিক নাগর পাইলে রসে যাই ভাসি।"
গোয়ালিনীর কথা শুনি কারকুন কয় হাসি।।
"অত বয়স হইল তোমার নাহি যায় রস।
কত জানি গোয়ালিনী জান রঙ্গরস।।
তিনকাল গেছে তোমার এক কাল আছে।
কত রঙ্গ শিখ্যাছিলা তোমার গোয়ালের কাছে।।"

এক্ষেত্রে দ্বিজ ঈশান যদি সরাসরি নিজের জবানীতেই এই কথোপকথনটুকু বর্ণনা করতেন, সেক্ষেত্রে কারকুন এবং গোয়ালিনী চরিত্র দুটি তেমন সজীবতা প্রাপ্ত হত না। কিন্তু কারকুন ও গোয়ালিনীকে সরাসরি তাদের বক্তব্য পেশের সুযোগ করে দেওয়ায় কাহিনীর আকর্ষণ ও উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি গায়ক এই দুটির বক্তব্যকে চরিত্র দুটির সঙ্গে নিজেকে অঙ্গীভূত করে বর্ণনা করার সুযোগ পাওয়ার ফলে বর্ণনায় ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এইবার 'দেওয়ান ভাবনা' পালা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে। মাধব সুনাইর উদ্দেশে প্রেমপত্র প্রেরণ করলে সুনাইর উত্তর প্রত্যক্ষভাবে

প্রদত্ত হয়েছে—

এেকেত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই।
দারুণ দুঃখের জ্বালা কেমনে রইয়া সই।।
যেদিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে।।
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা।
অবলা যে নারী আমি মনে হইল ব্যথা।।
কইও কইও সল্লার কাছে তোমার মনের কথা।
কতদিনে পূরব আশা যাইব দারুণ ব্যথা।। (দেওয়ান ভাবনা)

এখানে সুনাইর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার অভিব্যক্তি অন্যভাবে হলে কখনই তেমন জীবন্ত হয়ে উঠত না। মাধবের প্রতি সুনাইর অমোঘ আকর্ষণ, অথচ নারী বলে সেই আকর্ষণের কথা মাতাকে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত সে—এই দ্বন্দ্ব সুনাইর প্রত্যক্ষ জবানীতে যেমন স্পষ্ট হয়েছে তেমন রচয়িতার প্রদত্ত বিবরণে হত না। আমরা বুঝতে পারি গীতিকা অথবা ব্যালাডের রচয়িতারা শিল্প সম্মত প্রকাশের ব্যাপারে কতখানি সচেতন। এই প্রসঙ্গে আমরা গীতিকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারি। বলাবাহুল্য, এই ধর্ম গীতিকার বর্ণনা-রীতি প্রসঙ্গে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা কোন ঘটনাকে আনুপূর্বিক পর্দায় প্রতিফলিত করেন না, তাঁরা সুনির্বাচিত কিছু দৃশ্যকে পরপর সাজিয়ে উপস্থাপিত করেন, যার ফলে চলচ্চিত্র শিল্পগুণ প্রাপ্ত হয়, মুক্ত হয় তা অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্যের ভার থেকে, আর এর ফলে সঞ্চারিত হয় একপ্রকার গতি। ব্যালাড বা গীতিকার ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্র শিল্পের 'Montage' অনুসৃত হতে দেখা গেছে। 'Montage' একটি বিশেষ শিল্প রীতি যেখানে ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত, এতে আনুপূর্বিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, অথচ মূল কাহিনী তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, প্রতিপাদ্য বিষয় অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট থাকে না। এই রীতিতে শুধু যে একটি দৃশ্য অপর দৃশ্যের সঙ্গে গ্রথিত থাকে না তাই নয়। কোনো ঘটনার ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয় না। অতি দ্রুত দৃশ্যগুলি উপস্থাপিত হওয়ায় মধ্যবর্তী দৃশ্যগুলির অনুপস্থিতির কথা দর্শকের মনে পড়ে না। দুর্বল রেল লাইনের ওপর দিয়ে দ্রুত রেলগাড়ী চলে গেলে যেমন গাড়ীর দুর্ঘটনায় পড়ার অবকাশ থাকে না, তেমনি। এই কারণেই সমালোচকের মন্তব্য, 'The ballad's method of narration has been aptly compared to the film techniques of Montage, the story is advanced by a series of quickness and distinct scene following another'.

আমাদের গীতিকায় রচয়িতারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রবাদের ব্যবহার করেছেন। এইসব প্রবাদ বাক্যের ব্যবহারে ব্যবহারকারীর মানসিকতা, গভীর অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে—

ক. কাটা ঘায়ে লুনের ছিটা আর কত সয়।। (মলুয়া)

খ. বিনা মেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাঘাত।। (চন্দ্রাবতী)
গ. মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল।। (কমলা)
ঘ. সময় বয়স যায় নাহি যায় রস। ( ” )
ঙ. মাছি মারিয়া করি কেনে দুই হাত কালা। ( ” )
চ. পায়ের গোলাম হইয়া শিরে উঠতে চায়। ( ” )
ছ. বেঙ্গে কবে শুনেছিস পদ্মের মধু খায়।। ( ” )
জ. কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে।। ( ” )
ঝ. চোরা নাহি শুনে দেখ ধর্ম্মের কাহিনী। (দস্যু কেনারামের পালা)
ঞ. শিরে কইলে সর্পাঘাত ওঝার কিবা করে। (রূপবতী)
ট. মায়ে জানে পুতের বেদন অন্যে জান্‌ব কি। (দেওয়ানা মদিনা)

সব শিল্পেই নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গী আছে। সাহিত্যেরও বিভিন্ন শাখার নিজস্ব আঙ্গিক আছে। অনুরূপভাবে গীতিকারও নিজস্ব একটা প্রকাশভঙ্গী আছে। গীতিকার আকর্ষণের নানা কারণের মধ্যে এগুলির অনন্য প্রকাশভঙ্গী নিঃসন্দেহে অন্যতম বলা চলে।

## চতুর্থ অধ্যায়

# গীতিকার রচয়িতার প্রসঙ্গ

লোকসাহিত্য ও শিষ্ট সাহিত্যের পার্থক্য প্রসঙ্গে দীর্ঘদিনের যে ধারণা তা হল—শিষ্ট সাহিত্য যেখানে ব্যষ্টি রচিত, লোকসাহিত্য সেখানে ব্যষ্টি রচিত নয়, সমষ্টির রচিত। প্রমাণ স্বরূপ উল্লিখিত হয় ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা ইত্যাদির প্রসঙ্গ যেখানে রচয়িতার কোন পরিচয় অনুপস্থিত-এ সবই অজ্ঞাতনামা রচয়িতার রচনা। বলা হয় ব্যষ্টি রচিত হলে অবশ্যই আমরা এসবের সকল ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই রচয়িতাদের নাম জানতে পারতাম। অবশ্য লোকসঙ্গীত কিংবা গীতিকার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই রচয়িতা হিসাবে আমরা কিছু কিছু নামের সন্ধান পাই। ছড়া বা ধাঁধার মত লোকসঙ্গীত কিংবা গীতিকাও লোকসাহিত্যের অন্তর্গত—তবে এক্ষেত্রে ব্যষ্টির রচিত হবার যৌক্তিকতা কিংবা রহস্যটি কি—সে প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতঃই জাগে। যেমন 'মহুয়া' পালাটির রচয়িতা হিসাবে 'দ্বিজ কানাই', 'চন্দ্রাবতী'র রচয়িতা হিসাবে নয়ানচাঁদ ঘোষ, 'কমলা'র রচয়িতা হিসাবে দ্বিজ ঈশান, চন্দ্রাবতী রচিত 'দস্যু কেনারামের পালা ও দেওয়ান ভাবনা', দামোদর দাস, রঘুসুত শ্রীনাথ বেনিয়া এবং নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত 'কঙ্ক ও লীলা'। মনসুর বয়াতি প্রণীত 'দেওয়ানা মদিনা', মোহন বংশীদাসের 'চম্পকলতা', নিবারণ দাস করের 'সোহাগী বাইদ্যানী' ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। কারো কারো মতে এইসব গীতিকা রচয়িতারা আসলে গায়ক। কিন্তু এই বক্তব্য স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়—তবে গীতিকাগুলি কি স্বয়ম্ভু না অপৌরুষেয়? এ কথা ত স্বীকার করতেই হবে যে ছড়া কিংবা ধাঁধা অথবা গীতিকা যাই হোক, তার রচয়িতা ছিলেন। রচয়িতা ব্যতিরেকে এসব ত রচিত হয়নি। প্রশ্ন, তাহলে রচয়িতাদের পরিচয় অজ্ঞাত থেকে গেছে কেন?

শিষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টারা যে সব কারণে সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হন, তার অন্যতম হল স্বীকৃতি লাভ, প্রতিষ্ঠা অর্জন। কিন্তু লোকসাহিত্যের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের সেরকম কোন উদ্দেশ্য থাকে না। আত্মপ্রচার অপেক্ষা তাঁদের গোষ্ঠীকে আনন্দ দানই মুখ্য অভিপ্রায় হয়ে দেখা দেয়। তাছাড়া শিষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টা তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনাকে রূপ দেন। তাই শিষ্ট সাহিত্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। একের সৃষ্টির সঙ্গে অন্যের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। কিন্তু লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর তরফেই একজন রচনা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা মুখপাত্রের। তাই তিনি নিজেকে স্রষ্টা রূপে পরিচিত করতে উৎসাহী হন না। মূলতঃ একটি বিশেষ গোষ্ঠীর গোষ্ঠী জীবনের বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনাই লোকসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। নতুবা গোষ্ঠী জীবন অতিরিক্ত কিংবা স্বতন্ত্র কিছু যদি প্রকাশিত হয় তবে গোষ্ঠী দ্বারা তা গৃহীত, স্বীকৃত হয় না, গোষ্ঠী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তার বিস্মৃতির অন্তরালে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা।

এইবার আমরা গীতিকার রচয়িতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করব। আমরা

লক্ষ্য করি অধিকাংশ গীতিকা রচয়িতারই পরিচয় অজ্ঞাত। কোন কোন সমালোচক ত আবার প্রামাণিক গীতিকার অন্যতম লক্ষণ রূপে এর অজ্ঞাতনামা রচয়িতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন—'The ballad proper has no known author'[১] এখন রচয়িতার অজ্ঞাতনামা থাকার কারণ কি? এই সম্পর্কে আমরা পূর্বেই সামান্য কিছু আভাস দিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা জানি সৃষ্টির আনন্দেই স্রষ্টা রচনা করেন। অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্র কিংবা ভাস্কর্য ত ইচ্ছাপূর্বক লোকচক্ষুর অন্তরালে রচিত হয়েছে, নিশ্চয়ই সাধারণের স্বীকৃতি লাভ অথবা প্রশংসা অর্জন স্রষ্টাদের সৃষ্টির পেছনে প্রেরণা রূপে কাজ করেনি। যদি স্বীকৃতি লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য হত, তাহলে লোকচক্ষুর সামনেই স্রষ্টারা তাঁদের সৃষ্টির পরিচয় রাখতেন। তবে সেইসঙ্গে এ সত্যও অনস্বীকার্য যে নিছক মানসিক তৃপ্তি বিধানেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ থাকে না বা রাখা যায় না। কে না চায় নিজের সৃষ্টির প্রশংসা শুনতে, উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করতে। তাহলে গীতিকার রচয়িতারা কি এমনই প্রচার বিমুখ ছিলেন যে নিজেদের সৃষ্টির আনন্দেই তাঁরা বিভোর থেকেছেন, অন্যের স্বীকৃতির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাননি?

মনে রাখতে হবে গীতিকাগুলি যখন রচিত হয়, তখন তাদের আশ্রয়স্থল ছিল মানুষের স্মৃতি। মুদ্রণযন্ত্রের সহায়তা লাভে বঞ্চিত হওয়ায় মৌখিক সাহিত্য স্বাভাবিক কারণেই বিস্মৃতির শিকার হয়েছে অনেকখানি। সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যেতে পারে, '...its author, if ever known, has been lost in the obscurity of the past and in the process of oral tradition.'[২]

লিখিত সাহিত্যের বিকৃতি সাধন সম্ভব নয়, কিন্তু মৌখিক সাহিত্য সেই তুলনায় সহজেই পরিবর্তিত হতে পারে, বংশ অথবা যুগ পরম্পরায় কোন মৌখিক সাহিত্যই অবিকৃতভাবে অথবা অপরিবর্তিত রূপে প্রচার লাভ করে না। বিশেষতঃ বিস্মৃতির কারণে এবং প্রকৃতিগতভাবে মানুষ যেখানে সচেতন অথবা অবচেতনভাবে সংযোজন ও বিয়োজন প্রক্রিয়ার অনুসারী—'It shows no evidence of authorship, and if an individual composer once existed, centuries of adoptation to the varying expressive needs and cultural backgrounds of singers and listeners have obliterated any trace of the original maker. If subsequent singers have fastened their marks to their versions, these have been sloughed off in the next generation.'[৩]

ধাঁধা বা প্রবাদ কিংবা লোকগীতি ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলে স্বীকার করে নিতে তেমন কোন আপত্তি না থাকলেও গীতিকার ক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির রচনা বলে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। আর এরূপ মনে করার অন্যতম কারণ হল গীতিকার আকৃতি এবং এতে পরিবেশিত শিল্প নৈপুণ্য। Evelyn Kendrickwells তাঁর 'The Ballad Tree' গ্রন্থে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'The ballad is not the work of one hand or mind, but of a sort of

composite authorship.' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'It is the product of no one time or person'। 'Communal Theory'র উদ্ভব হয়েছে এইভাবেই, যে মতবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে থাকে, '...the folk made the ballads by a kind of communal improvisation, a kind of co-operative composition'.

পরবর্তীকালে সমালোচকেরা 'Communal Theory'র কিছু কিছু বাস্তবতা অনুধাবন করে এই মতবাদকে কিছুটা সংশোধন করে বলেন, '...the folk is too indefinite, too unorganized for such concerted efforts, they suggested that ballads were composed by the folk under the direction of a leader who brought the necessary discipline into the composition and who functioned as organizor and selector.'[৪]

অর্থাৎ যে রচনা বহুজনের অংশগ্রহণে নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে, সেই রচনার ক্ষেত্রে একটি নাম রচয়িতা হিসাবে যুক্ত হতে পারে না। এমন কি যদি সত্য সত্যই ব্যক্তি বিশেষের তত্ত্বাবধানে গীতিকা রচিত হয়ে থাকে, তথাপি তিনিও কখন অবিমিশ্র রচয়িতা রূপে নির্দিষ্ট রচনার ক্ষেত্রে দাবী করেন না।

কিন্তু Communal Theory'র অবাস্তবতা তথা এর প্রয়োগগত দিকের ত্রুটির বিরুদ্ধে অনেক সমালোচকই মুখর হয়েছেন। বর্তমানে প্রায় সকলেই গীতিকা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনা বলে মত প্রকাশ করে থাকেন। অন্ততঃপক্ষে গীতিকার প্রথম পর্যায় ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাই রচিত হয়, পরবর্তীকালে তা নানা জনের দ্বারা পরিমার্জিত হয়, সংযোজিত অথবা অংশবিশেষ বা পংক্তিবিশেষ বিয়োজিত হয়। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন : 'After an individual ballad was composed, then the folk came in. Ballads were oral. The folk took them over. Through the years of singing them, improved them sometimes, sometimes debased them, but the folk had their way with them, and over the years put their mark upon them'[৫]

গীতিকা যে মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনা অন্যত্রও তার স্বপক্ষে মন্তব্য করতে দেখা গেছে : '...Whatever its merits, is but the work of an individual, striving to express his own views on the world about him. The true balladist, in other words, merges his identity in the mass of the people. and becomes, as it were but the mouth piece of his generation. The authorship of a ballad is, in this sense, as completely national as if it were a mosaic in words, every element of which has come from a different source in what we are pleased to call collectively....'[৬]

সমষ্টিগতভাবে গীতিকা রচিত—এই তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী অধ্যাপক Sir Walter Raleign তাঁদের উদ্দেশে একটি চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করে বলেছিলেন উচ্চ কবিতা রচনার ক্ষমতা সমন্বিত কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তিকে যদি একটি জায়গায় আবদ্ধ রেখে তাঁদের

একটি গীতিকা রচনার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে তাঁরা তা সম্পাদন করতে পারেন নি অথবা করলেও তা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কেননা কবিতা কখনই সমষ্টিগত ভাবে সৃষ্ট হতে পারে না। Sir Walter Raleign প্রশ্ন করেছিলেন সত্য সত্যই কেউ কি বিশ্বাস করেন যে 'Sir Patrick Spens' গীতিকাটি মূলতঃ একজনের রচনা নয়? Robert Graves চমৎকার ভাবে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সমষ্টিগতভাবে গীতিকা রচনার অবাস্তবতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'It is true that the highly gifted people selected at random and shut-up to compose a ballad as juries are impanelled to decide their 'guilty' or 'not guilty', would immediately create a Parish Council atmosphere of suppressed conflict, each individual or small combination of individuals trying to impress the piece with a particular character'; আর কোনক্রমে যদি বলপূর্বক এমনভাবে গীতিকা রচনা করানো হয়ও, সেক্ষেত্রেও যে গীতিকা রচিত হবে, তাকে কোনক্রমেই বিশেষ একটি গোষ্ঠীর রচনার মর্যাদা দেওয়া যাবে না—'It would not be the work of a group, but a number of separate minds, which is a very different thing' অর্থাৎ 'Sir Patrick Spens' একক কবির রচনা হিসাবেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা অনেকেরই দৃষ্টিতে পড়ে, অনেকেই এটিকে গ্রহণ করে নিজেদের মত করে পরিবর্তিত করে নেয়, তারই ফলশ্রুতিতে একটি গীতিকার অনেকগুলি পাঠান্তরের উদ্ভব। এইভাবেই মূল স্রষ্টা বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যান। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনার সূত্রপাতেই যে কথা বলেছি পুনরায় সেই কথারই উল্লেখ করে বলা যেতে পারে, 'Original author is merely acting as spokesman for the group and when the ballad is complete will not claim it as his own. The ballad is important, the group is important, but the individual counts for little.'[৭]

গীতিকার রচয়িতা সম্পর্কিত আলোচনা যে বিষয়টির উপর আলোকপাত ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য তা হল এগুলির রচয়িতারা কি সত্য সত্যই নিরক্ষর ও অশিক্ষিত ছিলেন? বর্তমানে অধিকাংশ সমালোচকই স্বীকার করে থাকেন যে উচ্চ শিল্পগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারাই গীতিকা বা ব্যালাড রচিত। 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : '...the ballad is certainly the product of the late Middle Ages, that it is certainly not a product of a primitive Society, that it is a highly artful and rather difficult form, that the music is intimately and fundamentally a part of it. All of this would argue for conscious trained authorship.'

Aytoun এর 'Introduction to the ballads of Scotland'-এও বলা হয়েছে, 'I do not regard as mere casual compositions dictated by the fancy of individuals who had a natural taste for poetry, or an

ambition for making themselves known as men of superior capacity in a small or obscure circle, but as professional works, undertaken both for livelihood and fame, which must even have some connection.[১৮]

গীতিকা বিশেষ এক শ্রেণীর প্রতিভাবান কবি, শিল্পীদের দ্বারা রচিত। এঁরা নিছক সৃষ্টির আনন্দে বিভোর থাকেন নি, বরং বলা চলে আপন গোষ্ঠীর মানুষকে আনন্দ দিতে, সেইসঙ্গে নিজেদের উপার্জনের মাধ্যম রূপে এবং তৎসহ সৃজনী প্রতিভার পরিচয় রাখতে গীতিকা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। গীতিকায় যে অনবদ্য শিল্পগুণের পরিচয় মেলে তাতেই বোঝা যায় গীতিকার রচয়িতারা অনভিজ্ঞ অবস্থাতেই এই বিশেষ শ্রেণীর মৌখিক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন নি, সুস্পষ্ট এক শিল্পবোধ এবং রচনারীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েই গীতিকা রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অবশ্যই কবি প্রতিভা তাঁদের এ ব্যাপারে সহায়ক ছিল।

## পঞ্চম অধ্যায়

# গীতিকা চর্চার ইতিহাস

বাংলার লোকসাহিত্য যে সবিশেষ সমৃদ্ধ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। লোকসাহিত্যের অপরাপর বিভাগগুলির মত আমাদের গীতিকা-সাহিত্যও বেশ পুষ্ট এবং এ পর্যন্ত সংগৃহীত গীতিকার সংখ্যাও তেমন তুচ্ছ নয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গীতিকাগুলিকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাচীনতম হল নাথ গীতিকা। এছাড়াও আমরা পেয়েছি ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

নাথ গীতিকার বিষয়বস্তু হল গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ। নাথ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে এইসব গীতিকার মাধ্যমে। নাথ গীতিকার আবার দুটি বিভাগ—গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী সম্বলিত গীতিকা যেমন গোর্খ বিজয়, গোরক্ষ বিজয়, মীনচেতন ইত্যাদি। আর গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী সম্বলিত গীতিকা হল অপর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস প্রভৃতি গীতিকাগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। মানবিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাথ গীতিকাগুলির গুরুত্বই অধিক। নাথ গীতিকাগুলির রচয়িতাদের মধ্যে রয়েছেন ভবানী দাস, সুকুর মামুদ, শেখ ফয়জুল্লা, দুর্লভ মল্লিক প্রমুখ।

বাংলা লোকসাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের অবদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।[১] গীতিকা চর্চার ক্ষেত্রেও আমাদের স্মরণ করতে হয় সর্বপ্রথমে একজন বিদেশীয়কে, তিনি স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন। রংপুরে কার্যোপলক্ষে অবস্থানকালে এখান থেকে তিনি সংগ্রহ করেন একটি গীতিকা এবং ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নাম দিয়ে তা প্রকাশ করেন। দেবনাগরী অক্ষরে সোসাইটির জার্নালে এটি মুদ্রিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের বংশোদ্ভুত, ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম ইংরেজী গল্প লেখক শশিচন্দ্র দত্ত ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে পনেরটি কবিতা লিখেছিলেন 'Indian Ballads' নাম দিয়ে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বহুখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে গ্রীয়ারসন সংগৃহীত গীতিকার কিছু অংশ উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করেন। সাধারণ পাঠকের সঙ্গে এই সূত্রে 'গোপীচন্দ্রের গানে'র পরিচিতি লাভ ঘটে।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে দুর্লভ মল্লিক রচিত 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' শিবচন্দ্র শীলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত এইটিই নাথ গীতিকা। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 'ময়নামতীর গানে'র একটি পাঠ সংগ্রহ করে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন (১৫শ ভাগ ; ২য় সংখ্যা)। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 'প্রবাসী' পত্রিকার ৯ম ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩১৬) 'গোপীচাঁদের মাতা' শীর্ষক প্রবন্ধে গোপীচাঁদ ও ময়নামতীর ঐতিহাসিকত্ব নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

রাজশাহী নিবাসী আব্দুল সুকুর মহম্মদ রচিত 'যোগীর পুঁথি' প্রকাশকাল ১৩১৯

বঙ্গাব্দ। ভবানী দাস 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। ১৩২১ বঙ্গাব্দে নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

আব্দুল সুকুর মহম্মদ বিরচিত কাব্যটি 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' নামে ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩৩২ বঙ্গাব্দে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় 'গোপীচন্দ্রের গানে'র ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯২৪। ১ম খণ্ডে ছিল 'গোপীচন্দ্রের গান', অপরপক্ষে দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'।

এরপর সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় নাথ গীতিকার সংকলন। শুধুমাত্র প্রকাশ কালের ব্যবধান কিংবা সম্পাদনার ক্ষেত্রে নামের পরিবর্তনের জন্যই নয়, সেই সঙ্গে গুণগত উৎকর্ষের বিচারেও—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের সঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংকলনের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান।[২]

এইবার ময়মনসিংহ গীতিকার প্রসঙ্গ। ময়মনসিংহ গীতিকার প্রসঙ্গে যে তিনজনের নাম আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তাঁরা হলেন 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার, গীতিকা সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ দীনেশচন্দ্র সেন।

"Mymensingh Gitika" owes its origin to Kedarnath", চন্দ্রকুমার দে স্বয়ং স্বীকার করেছেন, 'যে ময়মনসিংহের চাষাব গানগুলি আজ সাত সমুদ্র পার হইয়া সুদুর ইয়োরোপ আমেরিকায় আপন সম্মানিত আসনটি অধিকার করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার মূলে কেদারনাথের প্রাচীন সাহিত্যানুরাগ। তিনি সৌরভে তাহার সন্ধান না দিলে আদৌ তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরা দিত না।' চন্দ্রকুমার দে কেদারনাথেরই আবিষ্কার: সমালোচক যখন মন্তব্য করে বলেন, 'There cannot be any difference of opinion on the point that "Mymensingh Gitika" could not come into being unless the findings of Kedarnath were brought into play in it. Therefore if any credit is due to anybody for this collection besides the collector, it should primarily go to Kedernath and then to D.C. Sen.'[৩]

দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক রূপে নিযুক্ত করেন। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালাগুলি হল মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ানা মদিনা, ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, ভেলুয়া, কমলা রাণীর গান, ঈশা খাঁ মসনদ আলি, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, আয়না বিবি, শ্যাম রায়ের পালা, শীলা দেবী, আঁধা বন্ধু, বগুলার বারমাসী, রতন ঠাকুরের পালা, পীর বাতাসী, জিরালানি, সোনারায়ের জন্ম এবং

ভারাইয়া রাজার কাহিনী।

বাংলা গীতিকা চর্চার ইতিহাসে চন্দ্রকুমার দে'র নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে কেননা তিনি লুপ্তপ্রায় আমাদের গীতিকাগুলির আবিষ্কর্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। 'however great the merits of the editor D.C. Sen, it is necessary to mention with deep respect and admiration, the name of Chandra Kumar De, who is the real discoverer of this forgotten and neglected branch of Bengali literature....It was he who rescued these songs, literally at the last minute, from the threat of oblivion'[8]

দীনেশচন্দ্রের সহযোগী হয়ে চন্দ্রকুমার যে কেবল বেশ কিছু গীতিকা সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়, গীতিকার আলোচনাতেও তাঁকে ব্রতী হতে দেখা গেছে। 'ময়মনসিংহের পল্লীকবি' নামে তিনি একটি আলোচনা প্রকাশ করেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায়। এই আলোচনায় চন্দ্রকুমার 'ধোপার পাট' কাহিনীটি বিশ্লেষণ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন কাঞ্চনমালার স্বর্গীয় প্রেমের তাৎপর্য। চন্দ্রকুমার বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে 'ধোপার পাটে'র সাদৃশ্য নিয়ে আলোকপাত করেছেন। গীতিকা সংগ্রহের ব্যাপারে চন্দ্রকুমারের গৌরবময় ভূমিকার উল্লেখ করা হলেও একটি ক্ষেত্রে যে তাঁর প্রসঙ্গে বিরূপ সমালোচনার সুযোগ রয়ে গেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। চন্দ্রকুমার অবিকৃতভাবে পালাগুলি সংগ্রহ বা প্রকাশের পরিবর্তে সেগুলিকে অনেক সময়েই পরিমার্জিত রূপে প্রকাশ করেছেন। ড. সুকুমার সেনকে তাই তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলতে দেখা গেছে, 'চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, গাথাগুলির ভাষায় ছন্দে কলম চালাইয়া সেগুলিকে "ভাল করিয়া সম্পাদন" করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা তিনি একবারও বলেন নাই।'[৫] চন্দ্রকুমার নিজেও ছিলেন কবি-সাহিত্যিক। তাই প্রাপ্ত গীতিকাগুলির পরিমার্জনে তাঁর কোনো অসুবিধাই হয়নি। অমার্জিত গাথাগুলির পরিমার্জনে তিনি বিশেষ ভাবে প্রলুব্ধ হয়ে থাকবেন। এইভাবে লোকসাহিত্য সংগ্রহে ও প্রকাশে অবৈজ্ঞানিক রীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন।

এইবারে দীনেশচন্দ্র সেনের প্রসঙ্গ। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, '...বাংলার লোক-সাহিত্য ও দীনেশচন্দ্র সমার্থক।...রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর উদ্যম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের বহু লুপ্ত অধ্যায় বিশেষ করে লোকসাহিত্যের এক বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়।'[৬] দীনেশচন্দ্র একাই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে প্রয়োজনীয় প্রেরণা দান করেছিলেন তিনি। লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ ও প্রকাশের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলা লোকসাহিত্যকে এদেশের শিক্ষিত সমাজ এবং সেই সঙ্গে বিদেশীয়দেরও গোচরীভূত করেছিলেন তিনি। চন্দ্রকুমার অবিকৃতভাবে গীতিকা সংগ্রহ ও প্রকাশ না করলেও দীনেশচন্দ্র কিন্তু অবিকৃতভাবে লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই লোকসাহিত্যের উপাদান

সংগ্রহে সংগ্রাহক নিযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা গেছে। দীনেশচন্দ্রের অভিমত এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হওয়ার যোগ্য—'পাশ করা যুবকেরা চাষাদের সঙ্গে মিশিতে ঘৃণা বোধ করিবে ; তাহারা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতে স্বীকৃত হয় কিনা সন্দেহ। তারপর, নিরক্ষর চাষারা যেভাবে গানগুলি বলিবে ঠিক সেইভাবে টুকিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা ভাষার জটিলতা ও অপপ্রয়োগ দেখিয়া, গানগুলি সংশোধন করিতে চেষ্টা পাইবেন, হাজার বার বলিয়া দিলেও তাহারা যেমনটি, ঠিক তেমনটি পাঠাইবেন না।....আমাদের মতে যে সকল নিরক্ষর চাষা পুরুষানুক্রমে এই সকল গান রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদের সমশ্রেণীর লোক অথবা পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধ শিক্ষিত ভদ্রলোক, যাহারা এই সকল গানের সমজদার তাহারাই এই সংগ্রহ কার্যের উপযুক্ত।'[৭] দীনেশচন্দ্রের চেষ্টাতেই তৎকালীন ইংরেজ সরকার 'পল্লীগীতি সংগ্রহ ও ছাপাইবার' আংশিক ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। ময়মনসিংহ সহ বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে থাকা গাথা সংগ্রহের জন্য কয়েকজন সংগ্রাহক নিযুক্ত করা সম্ভব হয় এবং প্রতি বৎসর এ বাবদ তিন হাজার টাকার কিছু অধিক পরিমাণ অর্থ তৎকালীন সরকার ব্যয় করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা'। মৈমনসিংহ গীতিকা ব্যতীত ত্রিপুরা নোয়াখালি চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চল থেকে মুখ্যতঃ আশুতোষ চৌধুরী সংগৃহীত গীতিকাগুলি দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনাতেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য-পুষ্ট হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় গীতিকাগুলি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে Eastern Bengal Ballads–Mymensingh নামে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র মৈমনসিংহ গীতিকার সুদীর্ঘ ভূমিকায় চন্দ্রকুমার দে'কে তাঁর আবিষ্কার করার কাহিনী থেকে শুরু করে চন্দ্রকুমারের মাধ্যমে গীতিকা সংগ্রহের কাহিনী, গীতিকাগুলির সংগ্রহ স্থল, পূর্ব মৈমনসিংহের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, গীতিকায় বর্ণিত নারী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য, পূর্ব মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত গাথাগুলির বিশেষত্ব, গাথা সাহিত্যে প্রতিফলিত হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির পরিচয় সহ প্রকাশিত পালাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেছেন। দীনেশচন্দ্র গীতিকাগুলির ইংরেজি অনুবাদ ব্যতীত টীকা, টিপ্পনী ইত্যাদি সংযোজিত করেছেন। এমনকি পূর্ব মৈমনসিংহের সমস্ত গ্রামের নাম সম্বলিত মানচিত্রগুলি থেকে সাহায্য নিয়ে গীতিকায় বর্ণিত স্থানগুলি সম্পর্কে পাঠককে সুস্পষ্ট হদিশ দিতে মানচিত্রও অঙ্কন করেছেন। চন্দ্রকুমার দে মহাশয়কেও যে দীনেশচন্দ্রই বিশেষভাবে চালিত করেছিলেন সে বিষয়ে সেন মহাশয়ের বক্তব্যেই প্রমাণ মেলে, 'চন্দ্রকুমার দে গত তিন-চার বৎসর যাবৎ অক্লান্ত উদ্যমে নানা স্থান পর্যটন করিয়া এই পালাগুলি উদ্ধার করিয়াছেন ; তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়াছেন আমার চক্ষু দুইটি তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে, আমি প্রতিপদে তাঁহাকে দীর্ঘ উপদেশ-সম্বলিত পত্র লিখিয়া সহায়তা করিয়াছি—কি ভাবে কোন পালা সংগ্রহ করিতে হইবে, কোন্ কোন্ গাথার ঐতিহাসিক

মূল্য কি—কোন্ গুলির উদ্ধার আপাততঃ ক্ষান্ত রাখিয়া কোন্ দিকে বেশী চেষ্টা করিতে হইবে, কোথায় কোন্ পালার সন্ধান হইতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমার মন্তব্য লিখিয়া সুদীর্ঘ পত্রে তাঁহাকে জানাইয়াছি,....।'[৮]

দীনেশচন্দ্র গীতিকাগুলির নারীচরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, 'গীতিকাগুলির নারীচরিত্র সমূহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্ত ভাবে দেখাইতেছে। নারী প্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই—চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে। জননীরূপে তিনি জগতের বরেণ্যা, স্ত্রীরূপে তিনি জগতের প্রাণ। প্রকৃতি যেখানে সেই প্রাণ দান করেন, সেখানে সে প্রাণ অপূর্ব হইয়া দাঁড়ায়।'[৯]—তাকে অস্বীকার করা যায় না। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'দীনেশচন্দ্র সর্বপ্রথম রসিকের দৃষ্টি লইয়া এই সমস্ত নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ করেন এবং গাথা সাহিত্যের কাব্যরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহাদিগকে তথাকথিত 'ভদ্রসাহিত্যের' উপরে স্থান দান করেন।'[১০] কিন্তু দীনেশচন্দ্র অনেক সময় আবেগের আতিশয্যে এমন সব মন্তব্য করে বসেছেন যেগুলি নিরপেক্ষ বিচারে গ্রহণ যোগ্য হয় না। যেমন তাঁর মন্তব্য—পূর্ব ময়মনসিংহে যেহেতু ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রবেশ করতে পারেনি, তাই সেখানে প্রাচীন ভাবধারা দীর্ঘকাল অটুট ছিল—তথ্যনির্ভর ও ইতিহাসসম্মত নয়। কিংবা যখন দীনেশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে মন্তব্য করেন, 'আমরা এতকাল শুধু সীতা সাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি—এখন আমরা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে লইয়া তদপেক্ষা বেশী গৌরব করিতে পারিব--যেহেতু তাহারা ঘাগরা-পরা বিদেশিনী নহে, শাড়ী-পরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে।'[১১]—তখন বোঝা যায় দীনেশচন্দ্র তাঁর যুক্তিকে আবেগ সর্বস্বতার কাছে গচ্ছিত রেখে ফেলেছেন। ফলে সমালোচকের বিরূপ মন্তব্য তাঁর ভাববিলাসের আতিশয্যকে উদ্দেশ করে অভিব্যক্ত হতে দেখা গেছে স্বাভাবিক ভাবেই, '...রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সীতা সাবিত্রীকে "ঘাগরা পরা বিদেশিনী" এই আখ্যা দান করিয়া বাঙ্গালার হৃদয় হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন, বা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন ; তাঁহাদের স্থানে নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালা পল্লী গাথাবলীর নায়িকা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতা সাবিত্রীর সত্যকারের পোষাক যাহাই থাকুক, বাঙ্গালার মাটিতে তাঁহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্য মুহূর্তে পদক্ষেপ করা মাত্রই আমরা তাঁহাদের বাঙালী ধরনের শাড়ী পরাইয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।"[১২]

গীতিকা সংগ্রহকারীদের মধ্যে চন্দ্রকুমার দে ব্যতীত আশুতোষ চৌধুরী এবং কবি জসীমুদ্দীন, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, বিহারীলাল রায়, মনসুরউদ্দীন, শিবরতন মিত্র এঁদেরও ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আশুতোষ চৌধুরী সংগৃহীত গীতিকাগুলির মধ্যে রয়েছে নিজাম ডাকাতের পালা, কাফেন চোরা, ভেলুয়া, হাতী খেদা, কমল সদাগর, সুজা তনয়ার বিলাপ, নসর মালুম ইত্যাদি। বিহারীলাল রায় সংগৃহীত পালা হল মাণিক তারা, বারতীর্থের গান ; নগেন্দ্রচন্দ্র দে সংগৃহীত পালার মধ্যে রয়েছে মাঞ্জুর মা, রাজা রঘুর

পালা, বীর নারায়ণের পালা ; জসীমুদ্দিন সংগৃহীত পালা হল শান্তি ও লীলা ; মনসুরউদ্দীন সংগৃহীত পালাটি হল 'মহীপাল', মনোরঞ্জন চৌধুরী সংগৃহীত পালাটি হল চৌধুরীর লড়াই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে যে তিন খণ্ডে সমাপ্ত গীতিকার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তার দুই তৃতীয়াংশই মৈমনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাই মন্তব্য করেছেন, 'এই দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাও মৈমনসিংহ গীতিকারই অন্তর্ভুক্ত।'[১৩]

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ এই দশ বৎসরের মধ্যে দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব গীতিকার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঢাকার মুন্সী মোহাম্মদ আলি দীনেশচন্দ্রেরও পূর্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে একটি গীতিকা প্রকাশ করেছিলেন, গীতিকাটি 'ভেলুয়ার কাহিনী' অবলম্বনে রচিত।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় (১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) স্থান পেয়েছে মোট দশটি গীতিকা—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা এবং দেওয়ানা মদিনা। উল্লেখ্য এই দশটি গীতিকাই ছিল চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত। পূর্ববঙ্গ গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে মোট চোদ্দটি গীতিকা—ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, কাঞ্চন মালা, শান্তি, নীলা, ভেলুয়া, কমলা রানীর গান, মাণিকতারা বা ডাকাইতের পালা, মদনকুমার ও মধুমালা, সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, নেজাম ডাকাইতের পালা, দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলি, সুরৎ জামাল ও অধুয়া এবং ফিরোজ খাঁ দেওয়ান। পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে এগারোটি পালা—মাঞ্জুর মা, কাফেন চোরা, ভেলুয়া, হাতীখেদা, আয়না বিবি, কমল সদাগর, শ্যাম রায়, চৌধুরীর লড়াই, গোপিনী কীর্তন, সুজা তনয়ার বিলাপ ও বারতীর্থের গান। পূর্ববঙ্গ গীতিকার সর্বশেষ খণ্ডটি হল চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা। এতে সংকলিত হয়েছে মোট উনিশটি পালা—নছর মালুম, শীলা দেবী, রাজা রঘুর পালা, নুরন্নেহা ও কবরের কথা, মুকুট রায়, ভারাইয়া রাজার কাহিনী, আন্ধা বন্ধু, বগুলার বারমাসী, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, সন্নমালা, বীর নারায়ণের পালা, রতন ঠাকুরের পালা, পীরবাতাসী, রাজা তিলক বসন্ত, মলয়ার বারমাসী, জিরালনী, পরীবানুর হাঁহলা, সোনারায়ের জন্ম ও সোনাবিবির পালা।

ময়মনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার তিনটি খণ্ডে সংকলিত সর্বমোট ৫৪টি পালাগানের মধ্যে বেশ কয়েকটিই গীতিকা রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য নয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, গোপিনী কীর্তন, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, '...কাজলরেখার পালা পুরাপুরি রূপকথা জাতীয়...হাতীখেদার পালা বৈচিত্র্যপূর্ণ হইলেও এই পালাগানের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ অতি অল্প। বারতীর্থের গানও পালা গানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।'[১৪] আবার এক

বিদেশী সমালোচক 'দস্যু কেনারামের পালা'কেও গীতিকা বলে স্বীকার করেন নি।[১৫] 'কাজল রেখা' গদ্যে পদ্যে রচিত হলেও এতে পদ্যাংশই অধিক। প্রকৃতিতে এটি রূপকথা জাতীয় রচনা হলেও আদলের দিক থেকে গীতিকার সমধর্মী রচনা বলেই আমরা মনে করি। 'হাতীখেদার গান' এবং 'বারতীর্থের গানে' আনুপূর্বিক কোনো কাহিনী উপস্থাপিত না হলেও আখ্যানের আংশিক আমেজ দুটিতেই বিদ্যমান। আর 'দস্যু কেনারামের পালা'কে গীতিকা শ্রেণী ভুক্ত বলে বিবেচনা না করার কোনও যুক্তি নেই, সেক্ষেত্রে ত 'নেজাম ডাকাতের পালা'কেও বাদ দিতে হয়।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৪০) গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ময়মনসিংহ গীতিকা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তাতে একদিকে গীতিকায় প্রকাশিত একান্তভাবে মানবিক ভাব ও সেই ভাবের বলিষ্ঠতা ও স্বাভাবিকতার কারণে সাধুবাদ জানিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন প্রেমের জন্য নায়িকা-নায়কের নির্যাতন ভোগের, জীবন ধারণে অনতিক্রমনীয় তাগিদ তথা প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের, অপরদিকে আবার শব্দযোজনার নৈপুণ্য, যুগ্ম মিলের ব্যবহার, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বর্ণাশ্রম বিরোধিতা, আখ্যানে ধৃত মানবিক আবেদন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গীতিকাগুলির প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয় প্রকাশও করেছেন। কিন্তু গীতিকাগুলির প্রাচীনত্ব, বিশেষ অস্তিত্ব সম্পর্কিত সংশয়ের অবসান ঘটিয়েছেন এক বিদেশী গবেষক। তাঁর মন্তব্য উদ্ধার করে বলতে হয়, '....the doubts concerning the authenticity of the Mymensingh ballads are groundless, that these beautiful songs really belong to the sphere of the Bengali folk poetry.'[১৬]

মৈমনসিংহের বাসিন্দা পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক ১৩২১/২২ সালে সংগৃহীত 'বাদ্যানীর গানের পালা' প্রকাশিত হয় ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। এটি 'আসলে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত এবং দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশিত মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত প্রথম যে পালা সেই 'মহুয়া'র আর একটি পাঠ।' দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত 'মহুয়া পালাটি'র ছত্রসংখ্যা যেখানে ৭৮৯, সেখানে পূর্ণচন্দ্রের পালাটিতে ধৃত ছত্রসংখ্যা ১৫০৬। অর্থাৎ দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত 'মহুয়া'র তুলনায় পূর্ণচন্দ্রের সংগৃহীত পালাটি দীর্ঘতর। তাছাড়া এটি অনেক বেশী নির্ভরযোগ্যও। সমালোচকের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য, 'ময়মনসিংহ'-গীতিকাগুলির মধ্যে 'মহুয়া' নামের গাথাটি সব চেয়ে রোমান্টিক ও মনোরম। এই গীতিকার গায়কমুখে যথাশ্রুত একটি খাঁটি সংস্করণ ময়মনসিংহ জেলার মশোয়া গ্রাম-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩২২ সালে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা 'বাদ্যানির গান' নামে ১৩৫১ সালে (১৯৪৪) প্রকাশিত হইয়াছে।'[১৭] পূর্ণচন্দ্রের গৃহীত পাঠ থেকে জানা যায় যে 'মহুয়া' পালাটির নায়িকার প্রকৃত নাম 'মেওয়া' আর তার অপহরণকারী 'হুমরা' বেদের পরিবর্তে 'উন্দরা বাদ্যা'। পূর্ণচন্দ্র পালা সংগ্রহ ব্যতীত কি ধরনের আসরে এইরূপ পালা পরিবেশিত হত, অভিনয়ের আয়োজনই বা কিরূপ হত তারও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছেন। আলোচনা করেছেন বাদ্যানীর গানের প্রচারক শেখ

কাঙ্গালী চৌকিদার প্রসঙ্গে। পূর্ণচন্দ্রের আর একটি কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। গীতিকাগুলির সম্পর্কে কারো কারো ধারণা প্রচলিত এগুলি বুঝি বা শিক্ষিত পল্লীকবিদের লিখিত রচনা[১৮], কিন্তু পূর্ণচন্দ্র সেই ধারণার নিরসনে ব্রতী হয়েছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য পূর্ণচন্দ্রের সংগৃহীত পাঠটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন,—

'কাহিনীর দিক দিয়া ইহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পাঠের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই ; তবে এই পাঠটি সংগ্রাহক কর্তৃক কোন প্রকার সংস্কার করা হয় নাই বলিয়া অধিকতর নির্ভরযোগ্য।'[১৯]

ডঃ ভট্টাচার্যের মন্তব্যের প্রথমাংশ সম্পর্কে তেমন কিছু বলার না থাকলেও দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালাটির তুলনায় পূর্ণচন্দ্র সংগৃহীত পালা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হলেও তা একেবারে আনুপূর্বিক সংস্কার বিহীন ভাবে প্রকাশিত হয়নি—

'পূর্ণচন্দ্র বাবুর পাঠে যে সংস্কার চিহ্ন একেবারেই নাই তা নয়, তবে তাঁহার সংস্কার অনেকটা প্রুফ সংশোধনের মত, তাহাতে পালিশ চড়াইবার প্রযত্ন নাই।'[২০]

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বহুখ্যাত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে (৪র্থ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯) বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্বের সন্ধান করতে গিয়ে মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করেছেন, 'অকৃত্রিম বাস্তব-প্রীতি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি, প্রতিবেশের ও সমাজ-আবেষ্টনের নিখুঁত চিত্রাঙ্কন ভাবপ্রকাশে কথ্যভাষার প্রয়োগ ইহাদিগকে উপন্যাসের আরও নিকটবর্তী করিয়াছে।'[২১] শ্রীকুমার বাবু মৈমনসিংহ গীতিকাগুলিতে যে প্রকৃতি বর্ণনা কিংবা রূপ বর্ণনা অথবা চরিত্র চিত্রণ স্থান পেয়েছে তাতে বাস্তবতার সন্ধান করেই ক্ষান্ত হন নি ; কিংবা গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে গীতিকাগুলির নায়িকাদের শাস্ত্রীয় অনুশাসন ব্যতিরেকেই সতীত্বের প্রকৃত মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা করতে দেখেন নি, সেইসঙ্গে গীতিকাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্বেরও সন্ধান করেছেন, 'কৃত্তিবাস-কাশীদাস-মুকুন্দরামের যুগ ও ভারতচন্দ্রের যুগের মধ্যে যে একটি বৃহৎ ব্যবধান অনুভূত হয়, 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' তাহা পূরণ করিয়াছে। ...সুতরাং ইতিহাস-সংগঠনের দিক দিয়া ইহাদের মূল্যায়ন সামান্য নহে। ইহারা মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের ব্যবধানের উপর সংযোগ সেতু নির্মাণ করিয়াছে...।'[২২] সর্বোপরি ড. বন্দ্যোপাধ্যায় গীতিকাগুলির সঙ্গে রূপকথার সাযুজ্যের অনুসন্ধান করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন—

'আমাদের সাহিত্যিক আকাশে নিশীথ-তারকার ন্যায় রূপকথার যে অপরূপ ফুল ফুটিয়াছে, এই আখ্যানগুলি তাহার বৃন্ত ও মূল ;'[২৩]

ড. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলা গাথা কাব্য' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৬২। লেখিকা এই গ্রন্থে বাংলায় রচিত বিভিন্ন ধরনের গাথা কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাংলা গাথা কাব্যগুলি নিয়ে আলোচনার পূর্বে তিনি আলোকপাত করেছেন গাথা কাব্য রচনার পূর্ববর্তী পর্যায়ের রচনা সম্পর্কে যেগুলি গাথা কাব্য রচনার পথকে

প্রশস্ত করেছে :

'বাংলা ভাষার উন্মেষকাল হইতেই বাংলা দেশের গ্রাম্য কবিগণ কর্তৃক গান এবং ছড়ার আকারে বিভিন্ন ধর্মমূলক এবং ঐতিহাসিক কাহিনী রচিত হইয়া গ্রাম্য জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ রচয়িতা অথবা গায়েনের মুখে মুখে গীত হইয়া প্রচারিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত গান ও ছড়াই বাংলা গাথা কাব্যের অগ্রদূত।'

আমরা জানি আমাদের সাহিত্য ধর্মকে কেন্দ্র করেই উদ্ভূত হয়েছে। প্রাক-চৈতন্য যুগ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্য একান্তভাবেই অধ্যাত্ম বিষয়ক, চৈতন্যদেবই প্রথম রক্ত মাংসের ঐতিহাসিক ব্যক্তি যিনি বাংলা সাহিত্যে স্থান পেলেন। আমাদের লৌকিক গীতিকাগুলিতে যে মানুষেরই রাজকীয় আধিপত্য, প্রথমাবধিই তা কিন্তু ছিল না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিভাবে ধর্মীয় কাহিনী লৌকিক রূপ পরিগ্রহ করল লেখিকা তার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, বলেছেন :

'...যখন বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারগত বিরোধ থামিয়া গেল, তখন ধর্মমূলক কাহিনীগুলি দেবপূজার সঙ্গে নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য বিবর্জিত হইয়া কেবলমাত্র জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ চিত্তাকর্ষক লৌকিক কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করিল। কালক্রমে গ্রাম্যকবিগণের রচনা গুণে এই সকল কাহিনী পরিবর্তন লাভ করিতে করিতে সম্পূর্ণভাবে লৌকিক সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া পড়িল। প্রাচীন দেব-দেবী ও ক্ষমতাশালী যোগী-ঋষিগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের সরল উদ্দেশ্যহীন কল্পনার আশ্রয়ে সাধারণ মানব-মানবীর রূপে কাহিনীগুলির পাত্রপাত্রীর স্থান অধিকার করিলেন।'

ড. ভট্টাচার্য ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে গাথা কাব্যের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে করেছেন।

গাথাকাব্যকে মোট পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করে লেখিকা প্রতিটি বিভাগের পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন। তবে মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্গত গীতিকাগুলি মূলতঃ আলোচিত হয়েছে প্রণয় গাথা পর্যায়ে, ইতিহাসাশ্রিত গাথা পর্যায়ে ও বারমাসী গাথা পর্যায়ে। সর্বাধিক গীতিকা আলোচিত হয়েছে স্বভাবতই প্রণয় গাথা পর্যায়ে। মোট ৩২টি গীতিকা আলোচিত হয়েছে। তবে আলোচনার পরিবর্তে মূলত: গীতিকাগুলির কাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশিত হয়েছে। লেখিকা পূর্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহ গীতিকার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন ফকিররাম কবিভূষণের সখীসোনা, খলিল রচিত চন্দ্রমুখীর পুঁথি, সৈয়দ হাসজার মধুমালতী, দ্বিজ পশুপতির চন্দ্রাবলী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ইতিহাসাশ্রিত গাথা পর্যায়ে ১২টি লোকগীতিকার বিষয়বস্তু যেমন উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি গঙ্গারাম বিরচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ, মদনমোহনের ঐতিহাসিক গান, দ্বিজ দ্বারকানাথের গোরার গান, নফরদাসের বানভাসীর গান, রাইকৃষ্ণ দাসের সাঁওতাল বিদ্রোহের গান ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ একই সঙ্গে লৌকিক ও পরিশীলিত পালাগুলি আলোচিত হয়েছে, ফলে পাঠকের পক্ষে কিছুটা বিভ্রান্তির

সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে (৩য় সংস্করণ, ১৯৬২) গীতিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে ড. ভট্টাচার্যই প্রথম সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বাংলা গীতিকাগুলির বিশ্লেষণে প্রয়াস পেয়েছিলেন। মৈমনসিংহ গীতিকাগুলিতে মূলতঃ কুমারী কন্যাদের প্রাক্ বিবাহ প্রেম ও ব্যক্তিগত হৃদয় বেদনা অভিব্যক্ত হয়েছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে গীতিকাগুলিতেই বা কেন বিশেষভাবে নারীর স্বাধীন প্রেমাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ড. ভট্টাচার্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে পূর্ব মৈমনসিংহের সাধারণ জনসমাজ যে ক'টি প্রবল আর্যেতর জাতি দ্বারা গঠিত, কোচ হল তাদেরই অন্যতম। ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির অন্যতম শাখা বোড়ো জাতি থেকে কোচেরা উদ্ভুত। বোড়ো জাতি হল মাতৃতান্ত্রিক, ফলে গীতিকাগুলিতে নারীদের প্রাধান্য। প্রসঙ্গত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যে নারীর স্থানের তুলনায় মৈমনসিংহ গীতিকায় উপস্থাপিত নারী চরিত্রগুলির পার্থক্য।

'অন্যান্যদের আলোচনায় সাধারণভাবে গীতিকার বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সূত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু ড. ভট্টাচার্যই একমাত্র পাশ্চাত্য দেশের গীতিকাগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি ভারতীয় গীতিকাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোকপাত করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গীতিকাগুলির আলোচনা স্থান পাওয়ায় বাংলা গীতিকাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাঠকের পক্ষে আরও স্পষ্টতর ভাবে জানা সম্ভব হয়।'[২৪]

আশুবাবু বাংলা গীতিকাগুলির শ্রেণী বিভাগ করেছেন এবং পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি শ্রেণীর আলোচনা করেছেন। পাঠক প্রতিটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেমন অবহিত হবার সুযোগ পান, তেমনি একটির সঙ্গে অপর বিভাগের তুলনামূলক আলোচনার সুযোগও লাভ করা যায়। যে তিনটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে গীতিকাগুলির উদ্ভব, সেই সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন লেখক। গীতিকাগুলিতে বর্ণিত চরিত্রগুলির বিশেষত্ব, আখ্যান তথা ঘটনা সংস্থানের বৈশিষ্ট্য, নাটকীয়তা, কবিত্বশক্তি, ধুয়া এমন কি ছন্দ নিয়েও আলোচনা করেছেন লেখক। বিস্তারিতভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গেও গীতিকাগুলির তুলনা করা হয়েছে।

ড. সুকুমার সেন তাঁর সুবিখ্যাত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র ১ম খণ্ডের অপরার্ধের (২য় সং, ১৯৬৫;) চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে 'গাথা ও গীতি' অধ্যায়ে সীমিত পরিসরে গীতিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ড. সেন গীতিকার তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্রতী হন নি। মূলতঃ মহুয়া পালাটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। তাঁর আলোচনায় তিনি নির্ভব করেছেন পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ সংগৃহীত 'বাদ্যানীর গানে'র উপর। ড. সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'ময়মনসিংহ গীতিকাগুলির মধ্যে মহুয়া

নামিত গাথাটি সবচেয়ে রোমাণ্টিক ও মনোরম।' সুকুমার সেন অবশ্য মহুয়া পালাটির কাহিনীতে আধুনিক কালোচিত রোমাণ্টিক রূপ দানের সর্বাধিক প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন। তবে তুলনামূলকভাবে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত মহুয়া পালার তুলনায় পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সংকলিত 'বাদ্যানীর গান'কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন। তাঁর অভিমত যুক্তি সঙ্গত। তবে পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহ সম্পর্কে ড. সেনের মন্তব্য কিছুটা স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করেছে। একবার তিনি মন্তব্য করেছেন, 'এই গীতিকার (মহুয়া) গায়ক মুখে যথাশ্রুত একটি খাঁটি সংস্করণ...পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩২২ সালে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।'[২৫] পুনরায় অন্যত্র মন্তব্য করেছেন, 'মনে হয় পূর্ণচন্দ্রবাবুর সংগ্রহই আকারে মূলের (অর্থাৎ শোনা গান—পালার) কাছাকাছি। পূর্ণচন্দ্রবাবুর পাঠে যে সংস্কার চিহ্ন একেবারেই নাই তা নয়, তবে তাঁহার সংস্কার অনেকটা প্রুফ সংশোধনের মত, তাহাতে পালিশ চড়াইবার প্রযত্ন নাই।'[২৬]

বাংলা গীতিকা চর্চার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হলে ক্ষিতীশচন্দ্র এই পালাগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। অবশ্য এর পূর্বেই তিনি মৈমনসিংহ গীতিকার কয়েকটি পূর্ববঙ্গের গায়েন ও বয়াতীদের মুখে শুনেছিলেন। তাই দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত পালাগুলির অসম্পূর্ণতা সহজেই তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে। তাঁর ভাষায়, 'প্রকাশিত পালাগুলিতে দেখিলাম কোনো স্থানে ঘটনার কিছু অংশ বাদ গিয়াছে। বহু জায়গায় বর্ণনা পারম্পর্যহীন, একজনের উক্তি আর একজনের মুখে চলিয়া গিয়াছে। বহু গানের শব্দ সজ্জা ও বানান বিভ্রাটের ফলে ভাটিয়ালী গানের কোনো ধাঁচও নজরেই পড়ে না।' তাই ক্ষিতীশবাবু নিজেই পালা সংকলনে ব্রতী হন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ থেকেই শুরু হয় তাঁর প্রয়াস। মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা পর্যটন করে এবং বয়াতী ও গায়েনদের কাছ থেকে তিনি পালাগুলি সংগ্রহ করেন। 'গানের সুর তাল ও ছন্দ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ কবিযাছেন। ইহা ছাড়া পালাগুলির কাহিনী বর্ণনায় অস্পষ্ট স্থানে তিনি কথ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সহজবোধ্য করিয়াছেন। পাঠান্তর দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ—তাৎপর্য ও প্রতিটি পালার পরিচয়—ভূমিকা দ্বারা শ্রীমৌলিকের সম্পাদনা সমৃদ্ধ।'[২৭]

ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দ। এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে সর্বমোট ছয়টি পালা—বাইদ্যা কন্যা মহুয়া, সুন্দরী মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দস্যু কেনারাম, আয়না বিবি এবং শ্যাম রায়ের পালা। এর মধ্যে বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালাটি সংকলিত হয়েছে ৯৮৬টি ছত্রে। দীনেশচন্দ্রের মৈমনসিংহ গীতিকায় সংকলিত 'মহুয়া' পালার তুলনায় ২৩১টি অতিরিক্ত ছত্র সংকলিত হয়েছে। ক্ষিতীশবাবুর সংগৃহীত এই পালায় দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ৭৭টি ছত্রের পাঠান্তর ঘটেছে। সম্পাদক পাঠান্তরগুলিকে পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। দীনেশচন্দ্র 'মহুয়া' পালায় যেখানে একটি মাত্র বন্দনাকে স্থান দিয়েছেন, সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁর পালায় দুটি

বন্দনাকে গ্রথিত করেছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলিত 'মলুয়া' পালাটির ছত্রসংখ্যা ১৭৯৯। অর্থাৎ দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত ঐ একই নামের পালার ১২টি ছত্র ব্যতিরেকে অবশিষ্ট ১১৩৫টি ছত্রই মৌলিকের সংকলনে বিদ্যমান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্ষিতীশচন্দ্রের পালায় নূতন ৫৫৪টি ছত্র সংযোজিত হয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলিত 'চন্দ্রাবতী' পালার ছত্রসংখ্যা ৫৪৬, অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের সংকলিত 'চন্দ্রাবতী' পালার তুলনায় ১৯২টি ছত্র অধিক। দীনেশচন্দ্রের সংকলনের সঙ্গে পার্থক্য থাকায় ক্ষিতীশচন্দ্র পাদটীকায় ১৯টি ছত্রের উল্লেখ করেছেন। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় দস্যু কেনারামের পালায় ধৃত ছত্রসংখ্যা ৬০২। এর মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকায় সংগৃহীত ৪৫৬টি ছত্র বিদ্যমান। ৪৫৬টি ছত্রের মধ্যে ৪০টি ছত্রের সঙ্গে পার্থক্য লক্ষিত হয় মৈমনসিংহ গীতিকার তুলনায়। দীনেশচন্দ্রের সংকলনে 'আয়নাবিবি' পালাটি ধৃত হয়েছে ৫১৯টি ছত্রে, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৩য় খণ্ডে। সে তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগৃহীত পালাটির ছত্র সংখ্যা হ'ল ৭৫২, তার মধ্যে নূতন ছত্রের সংখ্যা হল ২৩৩। ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত এই পালায় যে দশম ও একাদশ নামে দুটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে, দীনেশচন্দ্রের সংকলনে তা অনুপস্থিত। দীনেশচন্দ্র নিজের ভাষায় এই দু'টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বিবৃত করেছেন। দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে স্থান পেয়েছে শ্যামরায়ের পালাটি। মোট ছত্রসংখ্যা যেখানে ৩৯৬, সেখানে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় ধৃত শ্যামরায়ের পালা'র ছত্রসংখ্যা ৪১২, ১৬টি ছত্র নূতন সংযোজিত। উল্লেখ্য, ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত পালাটির ৪১২টি ছত্রের মধ্যে পালায় সংযোজিত গান কিংবা ধুয়ার ছত্র অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দ। এই খণ্ডে গ্রথিত হয়েছে কাঞ্চনকন্যা, কমলারাণীর পালা, রাজকন্যা রূপবতী, পীর বাতাসী কন্যার পালা, সদাগর কন্যা বগুলা, দেওয়ানা মদিনা, আমিনাবিবি ও নছর মালুম পালা এবং মণির ওঝা—মাঞ্জুর মাও। দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে ধৃত 'ধোপার পাট' পালাটিই বর্তমান খণ্ডে 'কাঞ্চনকন্যা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্রের সংকলনে 'ধোপার পাট' পালাটির ছত্রসংখ্যা যেখানে ৪৬৬টি, সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্রের পালাটির ছত্রসংখ্যা ৭৫০। দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্র সংগৃহীত পালার ৭৭টি ছত্রের পাঠান্তর লক্ষিত হয়। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে 'কমলারাণী' পালাটির ছত্রসংখ্যা হল ৬৬০, দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে ধৃত এই পালাটির ছত্রসংখ্যা সেখানে ৩৪১। অর্থাৎ ক্ষিতীশচন্দ্রের পালায় ৩১৯টি নূতন ছত্র সংযোজিত। দীনেশচন্দ্রের সংকলনে 'কমলারাণী' পালার প্রথম দিকের চারটি অধ্যায় অনুপস্থিত। দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগৃহীত পালার ৩৮টি ছত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগৃহীত 'রাজকন্যা রূপবতী' পালার ছত্রসংখ্যা ৬৩৩। দীনেশচন্দ্রের ঐ একই নামের পালার ছত্রসংখ্যা সেখানে ২৯৯। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগ্রহে নতুন ছত্র সংখ্যা সংযোজিত হয়েছে ৩৩৪টি। দীনেশচন্দ্রের ঐ

পালায় অনুল্লিখিত রয়েছে ক্ষিতীশচন্দ্র প্রকাশিত এই পালাটির যথাক্রমে ৮ম, ১১শ ও ১২শ অধ্যায় তিনটি। ক্ষিতীশচন্দ্র প্রকাশিত 'পীর বাতাসী' পালাটির ছত্র সংখ্যা ৬১৯। পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ খণ্ডে দীনেশচন্দ্রের সংকলনে ধৃত এই পালাটির ৫০৫টি ছত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগ্রহে বিদ্যমান। ক্ষিতীশচন্দ্র 'সদাগর কন্যা বগুলা' পালাটি প্রকাশ করেছেন ৬২৭টি ছত্রে ; দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ২০২টি ছত্র অতিরিক্তভাবে সংযোজিত হয়েছে। মৈমনসিংহ গীতিকায় ধৃত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার ২য় খণ্ডে 'আলাল দুলালের পালা' নামে স্থান পেয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্রের গ্রন্থে এই পালাটি প্রকাশিত হয়েছে ১০১৪টি ছত্রে অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ১৯৪টি ছত্র এখানে অধিক সংযোজিত। ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত 'দেওয়ানা মদিনা' সাতটি অধ্যায় সম্বলিত, ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে সেক্ষেত্রে তা তেরটি অধ্যায় সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত। পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত 'নছর মালুম' পালাটি বর্তমান সংকলনে 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংকলনে পালাটির ছত্রসংখ্যা ৯৩৮, দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ৮৪টি ছত্র অধিক। ক্ষিতীশচন্দ্র 'মণির ওঝা-মাঞ্জুর মাও' পালাটি ২৪০টি ছত্রে প্রকাশ করেছেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৩য় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে। এই খণ্ডে ধৃত পালাগুলি হল লীলা কন্যা কবি কঙ্ক, ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধু, কমলা কন্যা, কাফেন চোরা, সুনাই সুন্দরী, ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী ও শীলাদেবী। দীনেশচন্দ্রের 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় ধৃত 'লীলা কঙ্কে'র তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে ধৃত পালাটিতে দীনেশচন্দ্রের সংকলনের ১০০৬টি ছত্র ত আছেই, তাছাড়াও অতিরিক্ত ৪৯২টি ছত্র বিদ্যমান। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে প্রকাশিত পালাটির মোট ছত্র সংখ্যা ১৪৯৮। দীনেশচন্দ্র 'ভেলুয়া' নামে যে পালাটি প্রকাশ করেছেন তার ছত্র সংখ্যা ১২১৯। ক্ষিতীশচন্দ্রের পালাটির ছত্র সংখ্যা সেখানে ১২৭৪। প্রসঙ্গত, ক্ষিতীশচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধারযোগ্য, 'পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রাম নোয়াখালি ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার পল্লী অঞ্চলে দুইটি 'ভোলুয়া সোন্দরীর পালা' প্রচলিত আছে। দুইটি পালার কাহিনী, নায়ক-নায়িকা, ঘটনাস্থল ও ঘটনার কাল পৃথক। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দুইটি পালাই 'ভেলুয়া' নামে প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা পার্থক্য বুঝাইবার জন্য 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা' নাম দিলাম।'[২৮] 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে ধৃত 'কমল কন্যার পালা'র ছত্রসংখ্যা ১৪২৬, দীনেশচন্দ্রের সংকলিত এই পালাটির ছত্র সংখ্যা সেখানে ১২০৮। দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে ১৮টি ছত্রে পার্থক্য ঘটেছে তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সংকলনে ধৃত পালাটিতে। দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ২১৮টি নূতন ছত্র বর্তমান পালায় সংযোজিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে প্রকাশিত 'আয়না বিবির পালা' ক্ষিতীশবাবুর সংকলনে 'কাফেনচোরা' নামে প্রকাশিত। 'কাফেন চোরা'র ছত্র সংখ্যা ৫৩৬, তার মধ্যে ৫২৪টি ছত্র দীনেশচন্দ্রের সংগ্রহে স্থান পেয়েছে, অর্থাৎ ১২টি নূতন ছত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের

সংকলনে সংযোজিত। ক্ষিতীশচন্দ্রের সম্পাদিত 'সুনাই সুন্দরী' পালাটি আসলে দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশিত 'দেওয়ান ভাবনা' পালা। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগৃহীত পালায় অতিরিক্ত ১৭১টি ছত্র স্থান পেয়েছে। দীনেশচন্দ্রেব পালায় এর ছত্র সংখ্যা ৩৭৪। দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্রের পালাটিতে ৭০টি ছত্রের পাঠান্তর লক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'ভারুইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী'র পালা, ৫০১ ছত্রে। ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত এই পালাটির ছত্রসংখ্যা ৬২০, তন্মধ্যে দীনেশচন্দ্র সংগৃহীত পালাটির ৪৯৮টি ছত্র ক্ষিতীশবাবুর সংকলনে বিদ্যমান। ৫৮টি ছত্রে তাৎপর্যগত পাঠান্তর দেখা যায় ক্ষিতীশচন্দ্রের পালাটিতে। পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ খণ্ডে গ্রথিত 'শীলাদেবী' পালাটির ছত্র সংখ্যা যেখানে ৫০৬, সেখানে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় এই পালাটিই ৬২৮ ছত্রে প্রকাশিত। দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালাব সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত পালার ৬১টি ছত্রে পার্থক্য ঘটেছে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে। এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই, ভরার মেয়ের গান, মাণিক তারা ডাকাইত, নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি, মইযাল বন্ধু-সাঁজুতী কন্যা ও শান্তি কন্যার হাঁহলা। দীনেশচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৩য় খণ্ডে প্রথম পালাটি 'চৌধুরীর লড়াই' নামে প্রকাশিত হয়েছে. ২৭৫৭টি ছত্রে, সেক্ষেত্রে ক্ষিতীশচন্দ্রের সম্পাদনায় এই পালাটি প্রকাশিত হয়েছে ৩০০২ ছত্রে। দীনেশচন্দ্রের পালার ২৬৩২টি ছত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের পালায় বিদ্যমান। দীনেশচন্দ্রের পালার ১২৫টি ছত্র পরিত্যক্ত হয়েছে, আর ১৫২টি ছত্রে দীনেশচন্দ্রের পালার সঙ্গে পার্থক্য লক্ষণীয়। দীনেশচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ গীতিকার ২য় খণ্ডে 'মাণিকতারা ডাকাইতের পালা'র ছত্র সংখ্যা ৮৩২(?), কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্রের সংগৃহীত পালাটির ছত্রসংখ্যা সেক্ষেত্রে ৯৮২। দীনেশচন্দ্র সেনের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে প্রকাশিত নেজাম ডাকাইত-পীরের কেরামতি পালাটি 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় বিধৃত হয়েছে ৫৪২ ছত্রে, তন্মধ্যে ৪৩৪টি ছত্র দীনেশচন্দ্রের পালায় লভ্য। ক্ষিতীশচন্দ্র ১০৮টি নূতন ছত্র সংযোজিত করেছেন। দুটি পালার মধ্যে ৫৫টি ছত্রে পার্থক্য লক্ষণীয়। 'মইষাল বন্ধু সাঁজুতী কন্যার পালা' ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে ৮০৬টি ছত্রে বিধৃত, দীনেশচন্দ্রের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে এই পালাটিতে তার মধ্যে ৫৮০টি ছত্র বিদ্যমান। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলিত পালায় নূতন সংযোজিত ছত্রের সংখ্যা ২০৬। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে ধৃত শেষ পালাটি হল 'শান্তি কন্যার হাঁহলা', ছত্র সংখ্যা ১৪৬, দীনেশচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ গীতিকার ২য় খণ্ডে ধৃত এই একই পালায় এর ১১৮টি ছত্র লভ্য, দুইয়ের সংকলিত পালায় পার্থক্য লক্ষিত হয় ২৫টি ছত্রে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৫ম খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯৭৩। এতে সংকলিত হয়েছে কমল সদাইগরের পালা, আন্ধাবন্ধু, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সখিনা বিবির পালা, পরীবানু বেগমের পালা, সুজাতনয়ার বিলাপ, ছুরত্ জামাল-অধুয়া সুন্দরী পালা, কবরের কান্না এবং বারো তীর্থের গান বা রাজা ভগদত্তের পালা। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে ধৃত

'কমল সদাইগর' পালাটির ৮৬৪টি ছত্র ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত ১০৮৪ ছত্র সম্বলিত পালায় স্থান পেয়েছে। মৌলিক মহাশয় ২২০টি নূতন ছত্র সংযোজন করেছেন। দুজনের সংকলিত পালায় ধৃত ১২০টি ছত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। 'আন্ধা বন্ধুর বাঁশি' পালার ছত্র সংখ্যা ৫৯০, দীনেশচন্দ্রের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে এই পালাটি সংকলিত হয়েছে ৪৭০ ছত্রে। উভয়ের সংকলিত পালার ২৯টি ছত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সাখিনা বিবির পালা'র ছত্র সংখ্যা দীনেশচন্দ্রের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে ৯১৬, তার মধ্যে ৮৪৪টি ছত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলিত পালায় লাভ করা যায়। মৌলিক মহাশয় দীনেশচন্দ্র সেনের সংকলিত পালার ৭২টি ছত্র সামঞ্জস্যহীন জ্ঞানে মূল পালায় স্থান দেননি, আর তাছাড়াও উভয়ের পালার মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে ৫২টি ছত্রে। 'পরীবানু বেগমের পালা' দীনেশচন্দ্রের এবং ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে একইভাবে প্রকাশিত হয়েছে, ১৯২টি ছত্রে, কেবল ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে শব্দের বানানে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় মাত্র। দীনেশচন্দ্রের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে বিধৃত হয়েছে 'সুজা তনয়ার বিলাপ' ৩০টি ছত্রে। ক্ষিতীশচন্দ্র দীনেশচন্দ্রের পালাটিকেই হুবহু উদ্ধার করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য— 'এই গানের কিছুই আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই ; মাননীয় সেন মহাশয় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই গান সম্পর্কে জ্ঞাতব্য যাহা তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম'।[২৯] 'ছুরত জামাল অধুয়া সুন্দরী পালা'র ছত্র সংখ্যা ১০১৭, দীনেশচন্দ্রের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে পালাটি ৮৭২ ছত্রে গ্রথিত। উভয়ের সংকলনে ধৃত পালাদ্বয়ের ৭৭টি ছত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। 'কবরের কান্না' পালাটির ছত্র সংখ্যা ৬৬৮। দীনেশচন্দ্র 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে এই পালাটিকেই 'নুরন্নেহা কবরের কথা' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন, সেখানে ছত্র সংখ্যা ৬২৪। উভয়ের সংকলনে ধৃত পালায় ১৪টি ছত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। মোটামুটিভাবে বলা যায় দীনেশচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত 'বারো তীর্থের গানে' গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে। এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে কুমার বীরনারায়ণের পালা, ভেলুয়া সুন্দরী মদন সাধুর পালা, বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা, মলয়া কন্যার পালা, হাতি খেদার গান ও মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এর মধ্যে শেষোক্ত রচনাটি গীতিকা শ্রেণীভুক্ত নয়। আলোচ্য সংকলনে কুমার বীরনারায়ণের পালাটি ৬৯০টি ছত্রে প্রকাশিত। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় (৪র্থ) সেখানে মাত্র ৪৬০ ছত্রে তা উপস্থাপিত, যদিও দীনেশচন্দ্র বলেছেন ছত্র সংখ্যা ৫৫৭ বলে। আলোচ্য সংকলনে দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালার ৪৬০টি ছত্রই বিদ্যমান। ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত এবং দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত পালাদ্বয়ের মধ্যে ৮৬টি ছত্রের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষিত হয়।

ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালাটির ছত্র সংখ্যা ১৭৪০। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার ২য় খণ্ডে পালাটি ১৪৩৪ ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান

পালায় তন্মধ্যে ১৪১২টি ছত্র বিদ্যমান। দুটি পালায় ১৩১টি ছত্রে পার্থক্য লক্ষিত হয়। দীনেশচন্দ্রের সংকলনে 'বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি' পালাটি অনুপস্থিত। ক্ষিতীশচন্দ্রই এই পালাটির একমাত্র সংগ্রাহক ও প্রকাশক। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে মলয়া কন্যার পালাটি ৮৫৪টি ছত্রে বিধৃত হয়েছে। দীনেশচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ খণ্ডে এই পালাটি সংকলিত হয়েছে ৪৩০টি ছত্রে। ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে এই ৪৩০টি ছত্রই বিদ্যমান। তবে উভয়ের পালায় ৯২টি ছত্রে পার্থক্য ঘটতে দেখা গেছে। দীনেশচন্দ্র তাঁর পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৩য় খণ্ডে 'হাতি খেদার গান'কে সংকলিত করেছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রও একই পালা সংকলিত করেছেন। উভয়ের পালায় ৫৮টি ছত্রে তাৎপর্যে পাঠান্তরে ও কিছু ছন্দ ঘটিত পার্থক্য লক্ষিত হয়।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার সপ্তম খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯৭৫। এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে রতন ঠাকুরের পালা, হরিণকুমার জিরালনী কন্যার পালা, সন্নমালার পালা, দেওয়ান ঈশা খাঁর পালা, রাজা রঘুর পালা, কবি চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ ও একালের গান বাল্য স্মৃতি স্মরণে উদ্বাস্তুর কান্না। শেষোক্ত রচনাদ্বয় গীতিকা শ্রেণীভুক্ত নয়।

রতন ঠাকুরের পালাটির ছত্রসংখ্যা ৩৩২। দীনেশচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ খণ্ডে পালাটি সংকলিত হয়েছে ২৫৮ ছত্রে। উভয়ের পালার বহু ক্ষেত্রেই গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়। হরিণকুমার-জিরালনী কন্যা পালাটির ছত্র সংখ্যা ৯৩৪। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ খণ্ডে পালাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ৫১০ ছত্রে প্রকাশিত। বলাবাহুল্য ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলিত পালাটি সম্পূর্ণ। তাঁর সংকলনে দীনেশচন্দ্রের সংকলিত পালাটির ৫০৮টি ছত্রই বিদ্যমান। তবে উভয়ের পালায় ৭৮টি ছত্রে পার্থক্য লক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে সন্নমালার পালা। দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালাটি অসম্পূর্ণ, সেক্ষেত্রে ক্ষিতীশচন্দ্র পালাটির সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ করেছেন। দীনেশচন্দ্র ঈশা খাঁর পালাটিকে স্থান দিয়েছেন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে। দীনেশচন্দ্র নামকরণ করেছেন 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি'। ক্ষিতীশচন্দ্র 'দেওয়ান ঈশা খাঁর কেচ্ছা' নামে মুদ্রিত এক পুস্তিকা অবলম্বনে বর্তমান পালাটি প্রকাশ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সংকলিত ও ক্ষিতীশচন্দ্র প্রকাশিত পালা দুটি মোটামুটি একই। উভয়েই পালার অশ্লীল অংশ বাদ দিয়েছেন। 'রাজা রঘুর পালা'র ছত্র সংখ্যা ২১৫। তন্মধ্যে দীনেশচন্দ্র এর ১৮৩টি ছত্র 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র' ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ এই দীর্ঘ সাতাশ বৎসরের পরিশ্রমে দীনেশচন্দ্রের মৈমনসিংহ গীতিকা ও তিন খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সংকলিত মোট ৫৪টি পালার মধ্যে ছেচল্লিশটি পালা 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সাতটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন অনেক বেশি ত্রুটিমুক্ত ও সম্পূর্ণ করে। যে পালাগুলি ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলন করেন নি, সেগুলি হল 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ২য় খণ্ডে ধৃত কাঞ্চনমালা, নীলা ; মদনকুমার ও মধুমালা ; ৪র্থ খণ্ডে ধৃত মুকুটরায়, রাজা তিলক বসন্ত, সোনা রায়ের জন্ম, সোনাবিবির পালা ইত্যাদি। অপরপক্ষে দীনেশচন্দ্রের সংকলনে অনুল্লিখিত রয়ে

গেছে বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালাটি। দীনেশচন্দ্র এবং ক্ষিতীশচন্দ্র উভয়ের সংকলনেই 'ভরার মেয়ে' স্থান পেয়েছে, তথাপি গীতিকা শ্রেণীভুক্ত না হওয়ায় এটি আমাদের আলোচনা থেকে বাদ গেছে। ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, একালের গান বাল্যস্মৃতি স্মরণে উদ্বাস্তুর কান্না রচনা দুটিও গীতিকা শ্রেণীভুক্ত নয়। গীতিকার শ্রেণীভুক্ত নয় চন্দ্রাবতীর রামায়ণও। ক্ষিতীশচন্দ্র নিজেই বলেছেন, '১৯৩৪ হইতে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া তাঁহার প্রকাশিত (দীনেশচন্দ্র সেনের) ছেচল্লিশটি পালা আমরা পাইয়া প্রকাশ করিলাম'।[৩০]

দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে ধৃত পালাগুলি যে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া দীনেশচন্দ্রের কোনো কোনো অসম্পূর্ণ পালার ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পূর্ণ রূপ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'হরিণকুমার জিরালনী কন্যার পালা' 'সন্নমালার পালা', বীরনারায়ণের পালাগুলির উল্লেখ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। অসিতবাবু তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে (পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮১) পাঁচটি পর্যায়ে গীতিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রথম পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'ballad' শব্দটির ব্যুৎপত্তি, গীতিধর্মী লোককাহিনীর লোকগাথায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রসঙ্গ, লোকগাথার মহাকাব্যে পরিণতি লাভ। এই পর্যায়ে লেখক বাংলা গীতিকার উদ্ভবের সূত্রটিরও সন্ধান করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার আবিষ্কার কাহিনী। তৃতীয় পর্যায়ে সংগৃহীত পালাগুলির রচয়িতার প্রসঙ্গ, সংগ্রহ সূত্র, পালাগুলির রচনাকাল, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে লেখক গীতিকার বিষয়বস্তু ও কাব্যধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, বিষয়বস্তুর নিরিখে প্রাপ্ত গীতিকাগুলির শ্রেণী বিভাগ করেছেন, গীতিকাগুলিতে প্রকাশিত কবিত্বশক্তি এবং নারী চরিত্রের অসামান্যতা বিষয়েও আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

সুখময় মুখোপাধ্যায় 'ময়মনসিংহ গীতিকা' দুটি খণ্ডে সম্পাদনা করেছেন, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণটির প্রকাশকাল ১৯৮২। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকায় ধৃত সবকটি পালাই সুখময়বাবুর সম্পাদিত দুটি খণ্ডে লভ্য। সম্পাদক পালাগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পালাগুলিতে ধৃত দুরূহ অথবা স্বল্প পরিচিত শব্দগুলির অর্থ, ক্ষেত্র বিশেষে টীকা ইত্যাদির সংযোজন করেছেন। ১ম খণ্ডে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে. এই দীর্ঘ ভূমিকায় সম্পাদক বিভিন্ন পালার কাহিনী, গীতিকাগুলির কাব্যমূল্য, নায়ক-নায়িকার চরিত্র চিত্রণ, প্রকৃতি চিত্রণ, গীতিকাগুলির ভাষা, রচনাকাল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুখময়বাবুর মন্তব্য বিতর্কমূলক হয়ে উঠেছে স্বীকার করতে হয়। যেমন তাঁর মতে মৈমনসিংহের গীতিকাগুলি বিশেষ বিশেষ কবির রচনা হওয়ায় এগুলি 'সার্বজনীনতা অর্জন করেনি', কিংবা 'ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলি অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা। যেগুলি

প্রাচীনতর সেগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রচনা।'[৩১]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকার ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত সংখ্যায় দুটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে যাতে গীতিকা আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধ দুটির একটি হল বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা গীতিকা সাহিত্যে লোকজীবনধারা' এবং দ্বিতীয়টি ধীরেন্দ্র দেবনাথের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায় জনজীবন'। মূলত: দুটি প্রবন্ধেরই বিষয় এক। তবে প্রথম প্রবন্ধে বিমলবাবু গীতিকাগুলি অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিকে উপস্থিত করেছেন, সেক্ষেত্রে ধীরেনবাবু দৃষ্টি দিয়েছেন পালাগুলির পৃথক পৃথক বিশ্লেষণে। ধীরেনবাবু 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পালাগুলিকে সমকালীন সমাজজীবনের দলিলরূপে স্বীকার করতে অসম্মত, বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত কিছু সত্যকেই তিনি স্বীকার করতে চান। তাঁর ভাষায় : 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র কবিরা সমকালীন রাজনৈতিক দেশ-ইতিহাস সম্পর্কে ঠিক সেভাবে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না।...পূর্ববঙ্গে প্রচলিত গীতিকা মাত্রেই যে বাস্তব ঘটনা নির্ভর এ ধারণা ঠিক নয়।'[৩২]

অপরপক্ষে বিমলবাবু গীতিকাগুলিতে সন্ধান পেয়েছেন ইউরোপীয় বণিকতন্ত্র ও এদেশীয় বণিকদের সহায়তায় এ দেশে পুঁজিবাদ বিকশিত হবার, অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজ বিভাগের প্রতিফলন, শ্রেণী শোষণের অকপট অভিব্যক্তির—'য়ুরোপীয় বণিকতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও প্রাগাধুনিক যুগে আমাদের দেশীয় বণিকেরাও যে একদা আমাদের এ দেশের পুঁজিবাদকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছে তার প্রমাণ বাঙলার লোককাহিনীতে মেলে, বিশেষ করে গীতিকা সাহিত্যে।'[৩৩]...'সনাতন হিন্দুধর্ম ও তার চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে যাবতীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদ ছিল গীতিকার আখ্যানগুলি।...মধ্যযুগের গীতিকার পালা রচয়িতারা অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজ বিভাগকে প্রতিফলিত করেছিলেন গীতিকার মধ্যে।..উন্নততর লিখিত সাহিত্যে শক্তিমানের আনুকূল্য ধন্য সাহিত্যিকেরা শ্রেণীশোষণকে আভাসে ইঙ্গিতে রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে ফুটিয়ে তুলতেন। কিন্তু গীতিকায় তা স্পষ্টোচ্চারিত।'[৩৪]

চিত্তরঞ্জন দেবের 'বাংলার লোক-গীত-কথা'র প্রকাশকাল ১৩৯৩ (১৯৮৬)। ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ মোট এই তিরিশ বছরের মধ্যে উভয় বঙ্গ থেকে সংগৃহীত মোট নয়টি গীতিকার সংকলন এটি। সংকলিত গীতিকাগুলির মধে রয়েছে চম্পকলতা, আসমান তারা, ফুলবানু, সোহাগী বাইদ্যানী, সাকিনা বিবি, ক্যাশবতী কইন্যা, রূপধন কইন্যা, রূপবান কইন্যা এবং সতী রুমুনা ঝুমুনার পালা। সংকলিত গীতিকাগুলির ছয়টি পূর্বেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম গীতিকাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের 'স্বাধীনতা' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় ; দ্বিতীয়টির প্রথম প্রকাশস্থল 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার ১৩৭০ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যা, তৃতীয় গীতিকাটির প্রথম প্রকাশ 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার ১৩৭০ বঙ্গাব্দের মাঘ-চৈত্র সংখ্যা ; চতুর্থ পালাটির প্রথম প্রকাশস্থল 'লেখা ও রেখা'

পত্রিকার ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, পঞ্চমটির প্রকাশ ক্ষেত্র 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার ১৩৭১ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যা এবং শেষ গীতিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮১ বঙ্গাব্দের 'লেখা ও রেখা' পত্রিকার সাধারণ সংখ্যায়।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'লোক সংস্কৃতি'র ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় (অষ্টাদশ বর্ষ) মুহম্মদ আয়ুব হোসেন একটি লোকগাথা প্রকাশ করেছেন, লোকগাথাটির নাম 'দোলেহার'। এটিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। সংকলক তুলনামূলক আলোচনায় সেই প্রভাব সহ বিশেষ করে পালাটিতে বৈষ্ণব প্রভাব দেখিয়েছেন।

মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন ভবানীপুর শাখার উদ্যোগে যে 'কবিশেখর কালিদাস রায় জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছে (১৯৯১), তাতে বিদ্যালয় পত্রিকা 'মৈত্রী'তে বিভিন্ন সময়ে কবিশেখর কালিদাস রায়ের প্রকাশিত কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা সংকলিত হয়েছে। কালিদাসবাবু গীতিকাগুলিকে 'বাঙ্গালার লোকসাহিত্যের সর্বপ্রধান সম্পদ' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, 'রসের দিক হইতে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর পরই এগুলির স্থান'। গীতিকাগুলিতে চেষ্টাকৃত পারিপাট্য নেই, তাই কালিদাস রায়ের মন্তব্য, 'কোন পারিপাট্য বা কলাশ্রী সম্মত আভরণ নাই বলিয়া এগুলি যেন জেলের মেয়ে মৎস্যগন্ধ্যা সত্যবতী। সত্যবতীর মতই এগুলি রাজরাণী হইবার যোগ্য। মানব জীবনের চিরন্তন সত্যই এইগুলির রসশ্রী সম্পাদন করিয়াছে বলিয়াই এইগুলি সত্যবতী। দেবতাকে মানুষ বানাইয়া—অথবা মানুষকে দেবতা বানাইয়া সভ্য বাঙ্গলা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সত্যকে পূর্ণরূপে আশ্রয় করে নাই। এই গীতগুলি মানুষকে মানুষ রাখিয়াই তাহার শক্তি-সামর্থ্য, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার সুখ দুঃখ, তাহার ভুল ভ্রান্তি ও উত্থানপতনের কথাকেই রূপদান করিয়াছে।'[৩৫]

# ষষ্ঠ অধ্যায়

# গীতিকার শ্রেণী বিভাগ

গীতিকা বা ব্যালাডের সিংহভাগ অধিকার করে আছে প্রেম বা প্রণয়। তাই বলে অবিমিশ্র প্রেমকাহিনীই গীতিকাগুলির একমাত্র উপজীব্য নয়। সেই কারণে গীতিকাগুলির বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। নানা ভাবেই গীতিকাগুলির বিভাগ করা সম্ভব। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল তিনটি—বিষয়বস্তু অনুসারে গীতিকার বিভাগ, জনপ্রিয়তার নিরিখে কৃত বিভাগ এবং ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে কৃত বিভাগ। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা গীতিকাগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—'প্রথমত: নাথ-গীতিকা, দ্বিতীয়ত: মৈমনসিংহ গীতিকা ও তৃতীয়ত: পূর্ববঙ্গ গীতিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে যে তিন খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাও মৈমনসিংহ-গীতিকারই অন্তর্ভুক্ত।'[১]

এক্ষেত্রে ড. ভট্টাচার্য এক শ্রেণীর গীতিকাকে বিশেষ ধর্মীয় ভাবনা প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক বিভাগে স্থাপন করেছেন, অপরদিকে অন্য দুটি শ্রেণী রচনায় যে ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে গীতিকাগুলি সংগৃহীত, সেই অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে বিভাজন করেছেন। নাথ গীতিকাগুলির ক্ষেত্রেও সংগ্রহস্থল বা ভৌগোলিক অঞ্চল বিবেচিত হতে পারত, তা কিন্তু হয়নি। স্পষ্টত:ই বোঝা যায় ড. ভট্টাচার্য কৃত শ্রেণী বিভাগটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

ড. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা গাথা কাব্যে' (১৯৬২) গাথা কাব্যকে সর্বমোট পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। ড. ভট্টাচার্য অবশ্য তাঁর আলোচনায় লোকগীতিকার সঙ্গে অন্যান্য আখ্যানকাব্যগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি যে পাঁচটি শ্রেণীতে গাথাকাব্যগুলিকে বিভক্ত করেছেন তা হল প্রণয় গাথা, ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত, ধর্মাশ্রিত গাথা, নীতিকথাশ্রিত গাথা এবং বারমাসী গাথা। প্রণয় গাথা পর্যায়ে তিনি ফকিররাম কবিভূষণের 'সখীসোনা', খলিল রচিত 'চন্দ্রমুখীর পুঁথি', দ্বিজ পশুপতির 'চন্দ্রাবলী বিশ্বকেতু', সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী' ইত্যাদি আখ্যানকাব্যগুলির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছেন মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত বত্রিশটি গীতিকাকে। ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াবলম্বনে বারটি গীতিকা রচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ধর্মাশ্রিত গাথা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন নাথ গীতিকাগুলিকে। আর বারমাসী গাথা পর্যায়ে মলয়ার বারমাসী, বগুলার বারমাসী ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। বহ্নিকুমারী কৃত বিভাগে 'মৈমনসিংহ' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় ধৃত সবগুলি গীতিকাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

M.J.C. Hadgart কৃত ব্যালাডের বিভাগটি হল নিম্নরূপ[২] :—

ক. Ballads belonging to the common stock of international folksong.

(i) Ballads of magic

(ii) Romantic and tragic ballads.

খ. Ballads from the repertoire of late mediaeval minstrelsy.

গ. Ballads of yeoman minstrelsy.

ঘ. Historical Ballads.

(i) Fully historical, dealing with real national events;

(ii) Semi-historical, dealing more vaguely with minor and local events.

ঙ. Comic Songs.

অর্থাৎ হুডগার্ট গীতিকার একটি শ্রেণীকে পরিচিত আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই বিভাগকে পুনরায় দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—যাদুকরী বিষয় অবলম্বনে রচিত গীতিকা এবং রোমান্টিক ও বিষাদান্তক গীতিকা। দ্বিতীয় বিভাগটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের, মধ্যযুগীয় চারণ গীতি থেকে রচিত গীতিকা ; তৃতীয় বিভাগটির অন্তর্গত হল জোতদার-তালুকদার শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে রচিত চারণদের গীতিকাগুলি ; চতুর্থ শ্রেণীর গীতিকাগুলি হল ঐতিহাসিক। এই বিভাগটিকে আবার দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথার্থ জাতীয় ঘটনা অবলম্বনে রচিত প্রকৃত ইতিহাসাশ্রিত গীতিকা এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থানীয় ঘটনা অবলম্বনে রচিত ইতিহাসকল্প গীতিকা। পঞ্চম ও সর্বশেষ বিভাগটি হল ব্যঙ্গাত্মক সঙ্গীত।

কেউ কেউ গীতিকাগুলিকে অন্যভাবে বিভক্ত করার পক্ষপাতী—যেমন ঐতিহ্যাশ্রয়ী গীতিকা এবং শহুরে গীতিকা বা অনৈতিহ্যাশ্রয়ী গীতিকা। Traditional Anglo Scottish songs are country ballads. Town ballads are chiefly represented by the 'Broad sides.'[৩]

George Clinton Densmore Odell সাধারণভাবে ব্যালাডগুলিকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করার পক্ষপাতী[৪]—

ক. Historical Ballads

খ. Ballads of the Affections

গ. Ballads of superstitions

ঘ. Humorous Ballads.

জর্জ ক্লিনটন ডেন্সমোরি ওডেল কৃত বিভাগগুলির প্রথমটি হল ঐতিহাসিক গীতিকা। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত গীতিকাগুলি জাতীয় যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কিত অথবা ব্যক্তিগত জাতিবিবাদ কেন্দ্রিক রচনা। স্নেহ ভালবাসা বিষয়ক গীতিকাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রেম ও বিচ্ছেদ তথা দুঃখ কেন্দ্রিক রচনাগুলিতে। সংস্কার কেন্দ্রিক গীতিকাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অশরীরী আত্মা এবং পরী বিষয়ক রচনাগুলিতে। হাস্যরসাত্মক গীতিকাগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিশেষ রাজনৈতিক সঙ্কট এবং জনপ্রিয় ধাঁধা কেন্দ্রিক রচনা। কিন্তু লক্ষণীয় যে জর্জ ক্লিনটন কৃত বিভাগগুলি ছাড়াও গীতিকার আরও অনেকগুলি বিভাগই হওয়া সম্ভব। আধুনিককালে গীতিকাগুলিকে

আমরা বিষয়ানুসারে মোট তেরটি বিভাগে বিভক্ত করতে পারি। যথা—ক. অলৌকিক কাহিনীকেন্দ্রিক গীতিকা (Ballads of the supernatural) ; খ. ধর্মীয় গীতিকা (Religious Ballads) ; গ. রোমান্টিক বিয়োগান্ত গীতিকা (Romantic Tragedies) ; ঘ. প্রেম কেন্দ্রিক (Love and sentiments) ; ঙ. রাখালী গীতিকা (Pastorals) ; চ. গৃহবিবাদ সম্পর্কিত (Domestic Tragedies) ; ছ. ঐতিহাসিক গীতিকা (Historical Ballads) ; জ. অর্ধ-ঐতিহাসিক গীতিকা (Semi Historical Ballads) ; ঝ. অপমৃত্যু ও বিপদ বিষয়ক (Accident and Disasters) ; ঞ. দস্যু (out laws, pirates) ; ট. আঞ্চলিক গীতিকা (Regional Ballads) ; ঠ. লোক-নায়ক (Folk-hero) ; ড. ধাঁধাকেন্দ্রিক গীতিকা (Riddle Ballads) ; ঢ. হাসির কাহিনী (Humorous)।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী প্রেম কেন্দ্রিক গীতিকাগুলির মধ্যেও কয়েকটি শ্রেণী বিভাগের পক্ষপাতী। যেমন—খাঁটি প্রেম কাহিনীমূলক, ধর্মভিত্তিক প্রেম, রূপক-প্রণয় গীতিকা, বিবাহোত্তর প্রেম।[৫] আমরা আমাদের আলোচ্য গীতিকাগুলির শ্রেণী বিভাগ করতে পারি। মহুয়া, মলুয়া, কমলা, সুরৎ জামাল, অধুয়া সুন্দরী, ভেলুয়া, মইষাল বন্ধু, শ্যাম রায়, কমল সদাগর, পীরবাতাসী, সন্নমালা, আয়না বিবি, রূপবতী, দেওয়ান ভাবনা, মঞ্জুর মা, নুরন্নেছা—এগুলি ড. সিদ্দিকী কথিত খাঁটি প্রেমমূলক কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত। ফেরাই এনি, চাইল্ড ওয়াটাব ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশীয় গীতিকাগুলির সমপর্যায়ভুক্ত।

ধর্মভিত্তিক প্রেম মূলক গীতিকাগুলির মধ্যে রয়েছে চন্দ্রাবতী, আমেরিকান গীতিকা Jew's Daughter-এর সমগোত্রীয়। কঙ্ক ও লীলা, ধোপার পাট পালাগুলি রূপক-প্রণয়-গীতিকা পর্যায়ের। 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি বিবাহোত্তর প্রেম নিয়ে রচিত একটি আদর্শ গীতিকার দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক গীতিকার পর্যায়ে পড়ে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, ঈশা খাঁ মসনদে আলী, সোনা বিবি, রাজা রঘু, বীরনারায়ণ, মুকুট রায়, তিলক বসন্ত, চৌধুরীর লড়াই, সুজা-তনয়ার বিলাপ ইত্যাদি পালাগুলি। এগুলি ইংরেজি গীতিকা Brave wolf ; The last tierce charge, Queen Jane ইত্যাদির সমগোত্রীয়।

অবশ্য ঐতিহাসিক গীতিকা সম্বন্ধে সমালোচকেরা সকলে সঙ্গত কারণেই ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেননি। কেননা আক্ষরিক অর্থে কোনো গীতিকাকেই ঐতিহাসিক বলে স্বীকার করা চলে না, 'No ballad can be called truly historical, for none is reliable on matters of fact. There is rarely any proof that such ballads have been written within living memory of the events they describe.'[৬] অবশ্য সমালোচক বহুখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত গীতিকাকে ঐতিহাসিক গীতিকার মর্যাদা দানের স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এইরূপ গীতিকা হল The battle of otterburn; The hunting of the cheviot ইত্যাদি। দস্যুতা বিষয়ক গীতিকাগুলির মধ্যে রয়েছে দস্যু কেনারামের পালা, কাফন চোরা, নিজাম ডাকাতের পালা, মানিকতারা ডাকাতের পালা। এগুলি রবিন হুড, টম ডুলি, জন হেনরি ইত্যাদির

মত ইংরেজি গীতিকার শ্রেণীভুক্ত। 'বারতীর্থের গান' জায়গার নাম বা place name কেন্দ্রিক গীতিকার নিদর্শন। 'হাতীখেদার গান'কে অরণ্যভূমির গান বা 'Songs of the Forecastle and Lumber Shanti'র পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। গীতিকথার পর্যায়ভুক্ত হল কাজলরেখা, রূপবতী, কাঞ্চনমালা। 'বারমাসী'র পর্যায়ভুক্ত হল মলয়ার বারমাসী, বগুলার বারমাসী, শান্তি ও নীলার বারমাসী শীর্ষক রচনাগুলি।

গীতিকার শ্রেণী বিভাগ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। একদিকে যেমন কোন রচনাকে গীতিকার শ্রেণীভুক্ত করা হবে সে বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মত পার্থক্য প্রকট, তেমনি যতই শ্রেণী বিভাগ করা হোক, তথাপি বিশেষ এক গীতিকাকে যে শ্রেণীভুক্ত একজন সমালোচক করবেন, সকলেই যে সেই বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হবেন তা নয়। বিশেষতঃ এক বিভাগের গীতিকা অন্য বিভাগের অন্তর্ভুক্তও হতে পারে, হবার যোগ্যতা রাখে। ডুশান জাভিটেল 'দস্যু কেনারামের পালা'কে গীতিকা রূপে স্বীকার করতে রাজি হননি, অথচ ড. আশরাফ সিদ্দিকী. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এটিকে গীতিকার মর্যাদা দান করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গ গীতিকার ২য় খণ্ডে সংকলিত করেছেন 'মদনকুমার ও মধুমালা'কে। এটি যেহেতু আনুপূর্বিক গদ্যে রচিত, গীতিকা যেহেতু গীত হবার জন্যই রচিত তাই আমরা আমাদের আলোচনা থেকে এটিকে বাদ দিয়েছি। অথচ ড. আশরাফ সিদ্দিকী 'মদনকুমার ও মধুমালা'কে 'গীতিকথা'র পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাজলরেখা' রূপকথা বলে একে গীতিকা বলে স্বীকার করেন নি। কিন্তু ড. সিদ্দিকী 'কাজলরেখা'কে গীতিকার মর্যাদা দিয়েছেন এবং একে গীতিকথার পর্যায়ভুক্ত করেছেন। অসিতবাবু 'কাজলরেখা'কে গীতিকার মর্যাদা দিতে অসম্মত হলেও 'কাঞ্চনমালা'কে গীতিকার মর্যাদা দিতে অসম্মত নন। আমাদের বক্তব্য হল যদি 'কাজলরেখা' রূপকথা হয়, তবে 'কাঞ্চনমালা'ও তাই। 'কাঞ্চনমালা'কে যদি গীতিকা রূপে গ্রহণ করা হয়, তবে কোন যুক্তিতেই 'কাজলরেখা'কে গীতিকার আলোচনায় বাদ দেওয়া সমীচীন হবে না। যেহেতু 'কাজলরেখা', 'কাঞ্চনমালা' গদ্য পদ্যে রচিত, 'মদনকুমার-মধুমালা'র মত অবিমিশ্র গদ্যে রচিত নয়, তাই এ দুটিকে আমরা গীতিকার তালিকা থেকে বাদ দিতে রাজি নই। তবে সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, গোপিনী কীর্তন, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, কিংবা ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংকলিত মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, উদ্বাস্তুর কান্না ইত্যাদি যে গীতিকার শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না, এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্যে উপনীত। ড. আশরাফ সিদ্দিকী আবার 'রূপবতী' পালাটিকে একদিকে যেমন খাঁটি প্রেমমূলক কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত করেছেন, তেমনি অপরদিকে ঐ একই পালাকে আবার গীতিকথা বা Cante Fable-এর শ্রেণীভুক্ত করেছেন। আসলে একই পালায় এমন অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লভ্য, যার ফলে একটি পালাকে অনেক সময়েই অবিমিশ্র একটি শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

## সপ্তম অধ্যায়

# গীতিকার 'বন্দনা' অংশ

মৈমনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ পালাতেই বন্দনা সংযোজিত হয়নি। অথচ আমরা জানি গীতিকা মূলত: সঙ্গীত, শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে পরিবেশনের জন্য এগুলি রচিত। আর সবকিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যই ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে শুরু করতেই আমরা অভ্যস্ত। এই হল আমাদের দীর্ঘদিনের সংস্কার। বিশেষত: কাব্য রচনার প্রারম্ভে ঈশ্বরের বন্দনা গান আমাদের চিরন্তন রীতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে আমাদের গীতিকা গুলিতে বন্দনা অংশ আবশ্যিকভাবে সংযোজিত হয়নি কেন? আসর অংশের অনুপস্থিতি সেই কারণেই বিস্ময়কর। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কখনই একেবারে সরাসরি কোন পালা গীত হত না। পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবেই বন্দনা গান গীত হত, বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের পূর্বে গীত হওয়া গৌরচন্দ্রিকার মত। কিন্তু যেহেতু সরাসরি আসর থেকেই পালাগুলি সংগৃহীত হয়নি, বিচ্ছিন্নভাবে লোককবি কিংবা শ্রোতার কাছ থেকে গীতিকাগুলি সংগৃহীত হয়েছে, স্বভাবত:ই সেক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বন্দনা অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে যিনি গীতিকার পালা সরবরাহ করেছেন তাঁর দ্বারা।

আর একটি কারণ উল্লিখিত হবার যোগ্য। সকল ক্ষেত্রেই যে গীতিকা রচয়িতারাই গায়ক বা পালার পরিবেশনকারীরূপে আসরে অবতীর্ণ হতেন তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পালাগুলির কবিরা পালা রচনা করেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করতেন, আর সুকণ্ঠের অধিকারী সঙ্গীত শিল্পীরা শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে তা সুর সংযোগে উপস্থাপিত করতেন। এক্ষেত্রে পরিবেশনকারী নিজের রুচিমত বন্দনা গান রচনা করে গাইতেন। মূল পালা রচয়িতার সঙ্গে তাই 'বন্দনা' রচনার কোন সম্পর্ক থাকত না। যে সব পালা সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই সম্ভবত: কবি বা রচয়িতাদের সূত্রে সংগৃহীত হয়েছে, ফলে তাঁদের সঙ্গে শ্রোতৃবর্গের সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় স্বাভাবিক কারণেই 'বন্দনা' অংশ বাদ পড়ে গেছে।

আমরা যে সব পালায় বন্দনা অংশ সংযোজিত হতে দেখেছি, সেগুলি থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান লভ্য। গীতিকাগুলিতে যেহেতু দেবদেবীর লীলা মাহাত্ম্যের পরিবর্তে মূলত: রক্ত মাংসের মানুষের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে, বিশেষত: পরিবেশিত হয়েছে রোমান্টিক কাহিনী, তাই এসবের শ্রোতাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। ধর্মীয় প্রসঙ্গের আধিক্য থাকলে হিন্দু কবির রচিত পালা মুসলমান শ্রোতার পক্ষে শ্রুতি-সুখকর হত না, বিপরীতক্রমে মুসলমান কবির রচিত পালা হিন্দুদের আকৃষ্ট করত না। মানুষের প্রকৃতপক্ষে সেই অর্থে কোন জাত নেই, সবই আমাদের উপর কৃত্রিমভাবে আরোপিত, আবার রোমান্টিক ঘটনার আবেদন ত শাশ্বত। এইজন্য মহুয়া পালাটির বন্দনায় অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রতিফলন

লক্ষণীয়। দ্বিজ কানাই 'মহুয়া' পালার বন্দনা অংশে বলেছেন :

উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পর্বত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের পাথ্থর।।
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উর্দিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান।।

পালার রচয়িতা দ্বিজ কানাই, কিন্তু তিনি কৈলাস পর্বতের বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে মক্কারও বন্দনা করেছেন। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর শ্রোতৃমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করতেই কবি সচেষ্ট হয়েছিলেন বোঝা যায়।

'মহুয়া'র বন্দনায় মনসামঙ্গলের প্রভাব লক্ষণীয়। বন্দনা অংশে একমাত্র সূর্যদেবের প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে, অন্য কোন দেবতার নাম উল্লিখিত হয়নি—

পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর।
একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর।।
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বাণিজ্জি করে চান্দ সদাগর।।

'কঙ্ক ও লীলা'য় সংযোজিত বন্দনাংশে বসুমাতার বন্দনা গাওয়া হয়েছে, বন্দনা করা হয়েছে পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও, এমনকি তরুলতার প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে, কিন্তু অন্য কোন দেবদেবীর নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়নি—

চারকোণা পৃথিবী বন্দুম বন্দুম তরুলতা।
উপরে আকাশ বন্দুম নীচে বসুমাতা।।
পিতা বন্দুম মাতা বন্দুম বন্দুম জ্যেষ্ঠ ভাই।
যা হৈতে সুহৃদ এই ত্রিভুবনে নাই।।

'কমলা'য় সরস্বতীর আবাহন করা হয়েছে, বলা হয়েছে দেবী ভারতীর অনুকম্পায় এবং সানুগ্রহ উপস্থিতিতে গীতানুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করবে।—

আইস মাগো সরস্বতী তোমার গুণ গাই।
তোমার গান আমি অমৃত মধু পাই।
তুমি হও তালযন্ত্র আমি বাদ্যকর।
আজিকার আসরে মোর কণ্ঠে কর ভর।।

'মলুয়া'য় অনাদি ঈশ্বর, মহেশ্বর, শ্রীদুর্গা ভবানী এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী বন্দিত হয়েছেন—

আদিতে বন্দিয়া গাই অনাদি ঈশ্বর।
দেবের মধ্যে বন্দি গাই ভোলা মহেশ্বর।।
দেবীর মধ্যে বন্দি গাই শ্রীদুর্গা ভবানী।
লক্ষ্মী-সরস্বতী বন্দুম যুগল নন্দিনী।।

'পীর বাতাসীর পালা'য় কবি রজনীগোপাল বন্দনা অংশে সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত

হিন্দু-মুসলমান উভয়শ্রেণীর শ্রোতাকেই যেমন আহ্বান জানিয়েছেন, তেমনি বন্দনা করেছেন উভয় সম্প্রদায়ের পবিত্র ক্ষেত্রগুলির :

সভাজনে বন্দুম রে ভাই হেন্দু-মোছলমান।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
মক্কা মদিনা বন্দুলাম মুঁই কাশী গয়া খান।।

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত 'মলয়া কন্যার পালা'য় সংযোজিত বন্দনা অংশটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। কবি এই অংশে মূলত: হিন্দুদের দেব-দেবীর বন্দনা করেছেন—বন্দনা করেছেন সত্যনায়ারণের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সুরধুনী, পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতার :

তেত্রিশ কোটি দেবতা বন্দি জানি বা না জানি।।

কবি সেই সঙ্গে বন্দনা করেছেন তরুলতার, জন্মদাতা পিতা ও মাতার এমনকি তাঁর ওস্তাদেরও। বন্দনার শেষাংশে কবি বলেছেন :

সভা কইরা বইছ ভাইরে হিন্দু মোসলমান।
তোমার জনাবে জানাই অধমের সেলাম।।

'হাতি খেদার গানে'র কবি যে মুসলমান, বন্দনা অংশ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। কবি বলেছেন :

পরথমে আল্লার নাম করিয়া স্মরণ।
দরুদ সালাম ভেঞ্জি নবীর চরণ।।

সৃষ্টির রহস্যভেদে অক্ষম কবি স্মরণ করেছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের, যিনি ইচ্ছা করলেই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম :

পরভুর অসাধ্য কর্ম নাইরে দুনিয়াইত্।
দিনরে কর্তি পারেন পর্ভু আঁধারিয়া রাইত।।

বন্দনা অংশে কবি জীবনের অনিত্যতা ও ঐশ্বর্যের ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন :

ঘরবাড়ী ট্যাকা পইসা মিছা জিন্দি গানি।
টলমল করে যেমন কচুর পাতার পানি।।

'কমল সদাইগরের পালা'য় যে বন্দনা অংশ সংযোজিত, তাতে শুধুমাত্র সরস্বতীকে বন্দনা করা হয়েছে। তবে সরস্বতীকে যে সব উপচারে আপ্যায়িত করার কথা বলা হয়েছে, তাতে মনসা পূজার প্রভাবই লক্ষিত হয় :

ধবল আসন ধবল বসন ধবল সিঙ্গাসন।
দুধকলা দিয়া মাতা তোমারে করিব পূজন।

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান—সখিনা বিবির পালা'য় পৃথকভাবে কোনো বন্দনা সংযোজিত হয়নি। তবে সরাসরি পালা আরম্ভের পূর্বে আল্লার নাম স্মরণ করতে দেখা গেছে কবিকে :

পরথমে আল্লাজীর নাম করিয়া স্মরণ।
জঙ্গলবাড়ীর কথা সবে শুন দিয়া মন।

'ছুরত্ জামাল—অধুয়া সুন্দরীর পালা'র কবি যে মুসলমান তা তাঁর বন্দনাংশের প্রথমেই আল্লা নিরঞ্জনের উল্লেখেই বোঝা যায়। গুরুবাদী কবি উল্লেখ করেছেন :

সার কেবল আল্লার নাম অসার দুনিয়াই।।

কিন্তু কবি যখন বলেন :

হিন্দু ভাই মইরা গেলে নিব গাঙ্গের ভাটি।
মোছলমান মইরা গেলে তারে পাইড়া দিব মাটি।।

—তখন বোঝা যায় তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না, কেননা তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের পরিণতি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন। পরিণতিতে উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন তিনি।

'কবরের কান্না' বা 'নুরুন্নিছা ও মালেকের পালা'য় কবি প্রথমেই আল্লা রসুলের বন্দনা গাইলেও হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যে তেমন গুণগত পার্থক্য নেই, যুক্তির সাহায্যে তা বুঝিয়েছেন, বুঝিয়েছেন আল্লা রসুল হরি আসলে এক :

হেঁদু আর মোছলমান একই পিণ্ডর দড়ি।
কেও বলে আল্লারছুল কেউ বলে হরি।।
দোনো জনের জিকির রে ভাই একই জন শুনে।
ইমান ঠিগ্ রাইখ্‌লে ভাই বুঝবা আপন মনে।।
বিছ্‌মিল্লা আর ছিরিবিষ্টু একই গিয়ান।
দোফাক্ করি দিলা পর্‌বু রাম রহিমান।।

বন্দনাংশ কখনও দীর্ঘ হয়ে ওঠেনি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বন্দনাংশগুলি রচিত হয়েছে। গীতিকাগুলি চৈতন্যোত্তর যুগের রচনা হওয়া সত্ত্বেও বন্দনায় শ্রীচৈতন্যের অনুল্লেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## অষ্টম অধ্যায়

# গীতিকায় সমাজচিত্র

গীতিকায় প্রকাশিত সমাজচিত্র সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে প্রয়োজন গীতিকাগুলির রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, কোন্ সময়ের সমাজচিত্র গীতিকাগুলিতে পরিস্ফুট, সে সম্পর্কে যদি অবহিত হওয়া না যায়, তবে সমাজজীবন সম্পর্কিত আলোচনার গুরুত্বই তেমন থাকে না। আমরা জানি গীতিকাগুলি মুদ্রিত রূপের পরিপ্রেক্ষিতে অর্বাচীন কালের রচনা বলে পরিগণিত হবে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে অনেকেই আমাদের গীতিকাগুলির, বিশেষত: মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির অর্বাচীনত্বের পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে গীতিকাগুলি মৌখিকভাবেই প্রচারিত হয়েছে, গীত হয়েছে, ফলে এগুলির ভাষারূপে যতই অর্বাচীনত্বের ছাপ থাকুক, মূলত: কাহিনীগুলি তেমন অর্বাচীনকালের নয়। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'এইসব কাহিনীর জন্মকাল, পালাকারের কাল এবং সংগ্রহের কাল সবই পৃথক।'[১] পাথুরে প্রমাণের অভাবে এক একজন সমালোচক আমাদের গীতিকাগুলির রচনাকাল সম্পর্কে এক এক রূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারো মতে, 'কাহিনীগুলির জন্ম যে নয়া বণিকতন্ত্রের আগেকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে, তাতে সংশয় নেই।'[২] দীনেশচন্দ্র সেন অভিমত প্রকাশ করেছেন,

'এগুলি অন্ধকার যুগের ঐতিহাসিক রহস্যের অনেকটা সমাধান করিবার উপকরণ বহন করিতেছে।'

লক্ষণীয়, দীনেশচন্দ্র 'অন্ধকার যুগ' বলতে সুনির্দিষ্ট কোন কালসীমাকে নির্দেশ করেন নি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'প্রাগ্ ব্রিটিশ যুগের ঐতিহাসিক উপাদানের দিক হইতে এই প্রাচীন পল্লীগাথা সাহিত্য বিশেষ মূল্যবান।' ধীরেন্দ্র দেবনাথের এই সম্পর্কিত মন্তব্য হল—

'পূর্ববঙ্গ গীতিকার বেশীর ভাগ পালাই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে লেখা। বাংলা এসময়ে মুঘল শাসনাধীনে। কিছু পালা হয়তো আরও আগেকার—চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এই পশ্চাৎ-সীমা হতে পারে। ...গীতিকাগুলির অধিকাংশ পালাই—বিশেষত প্রণয় গাথাগুলি মুঘল শাসনকালের রচনা বলেই মনে হয়।'[৩]

যতই কেন গীতিকাগুলির অর্বাচীনত্বের পক্ষে সাফাই গাওয়া হোক, এগুলি যে কোনমতেই ব্রিটিশ যুগ বা তার পরবর্তীকালের রচনা নয় সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ মাত্র নেই। অর্থাৎ স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে এগুলি প্রাগ্ ব্রিটিশ যুগের রচনা, কিংবা আরো একটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় মুঘল যুগের রচনা। তবে ঠিক মুঘল যুগের কোন কালসীমায় রচিত সে সম্পর্কে জোর দিয়ে বলা কঠিন।

সমাজচিত্রের প্রসঙ্গে কালসীমার পরেই যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তা হল কোন্ অঞ্চলের সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে গীতিকাগুলিতে? নিশ্চয়ই

সমগ্র বাংলাদেশ মূর্ত হয়ে ওঠেনি গীতিকাগুলিতে। দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির অধিকাংশই পূর্ব মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র যথার্থ নাম 'পূর্ব মৈমনসিংহ-গীতিকা'ই হইতে পারে। ...'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে তিন খণ্ড গীতিকা-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাই মৈমনসিংহ...অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, অবশিষ্ট গীতিকাগুলির মধ্যে একটি মাত্র ব্যতীত সকলগুলিই উত্তরবঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।'[৪] সমালোচক গীতিকাগুলিতে প্রতিফলিত সমাজজীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আরও স্পষ্ট ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'কেবলমাত্র পূর্ব মৈমনসিংহের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লইয়াই যে ইহার গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা নহে—ইহার বৈশিষ্ট্য সামাজিক ভিত্তির উপরও ইহারা পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও সমাজই ইহাদের লক্ষ্য।'[৫]

পূর্ব মৈমনসিংহের জনগোষ্ঠীর প্রধান উপাদান কোচ, এরা উদ্ভূত হয়েছে ইন্দো-মোঙ্গ-লয়েড জাতির অন্যতম শাখা বোড়ো জাতি থেকে। মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) বোড়ো জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ স্ত্রী-প্রধান, গীতিকাগুলিতে তাই স্ত্রী চরিত্রের প্রাধান্য। স্ত্রী-প্রধান সমাজে স্বাধীন প্রেমের মর্যাদা স্বীকৃত। গীতিকাগুলিতে অনূঢ়া কন্যাদের নিজেদের পছন্দমত জীবনসঙ্গী নির্বাচন, নির্বাচিত সঙ্গীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তার ভিত্তি এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।

বিদেশী সমালোচক মৈমনসিংহ গীতিকায় শ্রেণী সচেতনতার সন্ধানে অসম্মত হয়েও মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন,

"but the individual stories are based, in many cases, on social emotions deriving from the inequality prevailing in this society"[৬]

গীতিকার অনেকগুলিতেই যেমন সুখী, সম্পন্ন পরিবারের চিত্র উপস্থাপিত, তেমনি দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারও গীতিকায় উপস্থাপিত। প্রথম শ্রেণীভুক্ত পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মলুয়া, ভেলুয়া, মানিকতারা, বিপরীতক্রমে দ্বিতীয় পর্যায়ের গীতিকার মধ্যে রয়েছে আয়না বিবি, দেওয়ান ভাবনার মত পালা। যে সমাজজীবন গীতিকাগুলিতে চিত্রিত হয়েছে, তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ছিল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। অবশ্যই মুখ্য স্থান ছিল কৃষির এবং গুরুত্বের বিচারে এরপরই উল্লেখ করতে হয় বাণিজ্যের। 'ভেলুয়া' পালার ভোলা সদাগর, 'কমল সদাগর' পালার কমল সদাগর, আয়না বিবির স্বামী উজ্জ্যাল বণিক, আর এক 'ভেলুয়া'র মদন সাধু, 'নছর মালুম' পালার মাফো সদাগর, 'বগুলার বারমাসী'র সাধু, সেকালে বাণিজ্যের প্রসারকেই সূচিত করে। সমালোচক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,

'য়ুরোপীয় বণিকতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও প্রাগাধুনিক যুগে আমাদের দেশীয় বণিকেরাও যে একদা আমাদের এ দেশের পুঁজিবাদকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছে তার প্রমাণ বাঙলার লোককাহিনীতে মেলে, বিশেষ করে গীতিকা সাহিত্যে।'[৭]

গীতিকাগুলিতে যে সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়েছে, সে সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। এরই নিদর্শন মেলে গীতিকাগুলিতে সংযোজিত বন্দনা অংশগুলিতে। 'বন্দনা'য় হিন্দু ও মুসলমানের দেবতা ও পীরের সহাবস্থান লক্ষণীয়। তাছাড়া গায়েন বা কবি নিজে ধর্মে হিন্দু হয়েও যেমন একদিকে মুসলমান পীরের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন, তেমনি মুসলমান গায়েনকেও দেখা গেছে হিন্দু দেব-দেবীর বন্দনা রচনা করতে। গীতিকাগুলি যখন গীত হত, তখন সেগুলি যে হিন্দু-মুসলমান একত্রে আস্বাদন করত, তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে বন্দনা অংশে। অথচ বিবাহে কিংবা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ছুৎমার্গ মেনে চলার রেওয়াজ ছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'রূপবতী' পালায় মুসলমান নবাব, হিন্দু জমিদার কন্যার পাণিপ্রার্থী হলে হিন্দু জমিদারকে বলতে শোনা গেছে, 'জাতিনাশ ধর্মনাশ বাইচ্যা কাজ নাই।' মলুয়াকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলমান দেওয়ান ধরে নিয়ে গিয়ে তার হাউলীতে রেখেছে। মলুয়া অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার সতীত্ব রক্ষা করলেও হিন্দু সমাজ তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেছে, 'মুসলমানের অন্ন খাইয়া গেল তার জাতি'। ভাটুক ঠাকুর লোভের বশবর্তী হয়ে ভাগ্নী সুনাইকে দেওয়ান ভাবনার হাতে তুলে দিতে রাজি হয়েছে এই কথা জেনেই, 'জাতি মাইরা বিয়া দিব মনেতে গুছায়'। বিপরীতক্রমে 'ঈশা খাঁ মসনদালি' পালায় নবাব-কন্যা মন্ত্রী কালিদাসের প্রেমাসক্ত হলে কালিদাস জানিয়েছে, 'ধর্ম না ডুবাইবাম কইরা মুছলমানে বিয়া'। শেষ পর্যন্ত গো-মাংস ভক্ষণ করিয়ে কৌশলে কালিদাসের জাত মেরে তারপর নবাবকন্যার সঙ্গে কালিদাসের বিবাহ সংঘটিত হয়েছে।

সমাজের মাথা ছিলেন মুসলমানরাই। বিশেষত: প্রশাসনে ও বিচার ব্যবস্থায় মুসলমানদের ছিল আধিপত্য। নবাব, দেওয়ান, কাজী, কারকুনের ছড়াছড়ি গীতিকাগুলিতে। তবে এইসব বিবেকবর্জিত, বিলাসিতাপ্রিয় রাজপুরুষদের যে চারিত্রিক শৈথিল্য প্রদর্শিত হয়েছে, রক্ষক হয়েও নীতি বিগর্হিতভাবে এদের ভক্ষকের ভূমিকায় দেখা গেছে, তা থেকে নিছক মুসলমান রাজপুরুষ বা বিচারকদের সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হলে একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হবে। মুসলমান বলে নয়, রাজপুরুষ হিসাবেই এদের দেখতে হবে, দেখতে হবে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী রূপে। 'মলুয়া'তে বর্ণিত হয়েছে কাজী চোরকে আশ্রয় দিয়ে সাধু ব্যক্তিকে কয়েদ করে। শুধু কি তাই?

> ভালো মন্দ নাহি জানে বিচার আচার।
> কুলের বধূ বাহির করে অতি দুরাচার।।

দস্যু কেনারামের পালায় বর্ণিত হয়েছে—'উজার হইল দেশ কাজীর শাসনে'।।

'মলুয়া' পালায় বর্ণিত হয়েছে মুসলমান দেওয়ান মলুয়াকে বলপূর্বক হাউলীতে ধরে নিয়ে গেছে।

সাধারণ মানুষ একদিকে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, অপরদিকে অক্ষম রাজপুরুষদের

কুশাসন ব্যবস্থায় জর্জরিত হয়েছে, যেখানে দেওয়ান কোটাল থেকেও না থাকার সামিল সেখানে যে অরাজকতা দেখা যাবে তা বলাবাহুল্য। 'দস্যু কেনারামের পালা'তে এরই ইঙ্গিতটি লভ্য—'ডাকাইত দেশের রাজা বাদশারে না মানে'। আর মনে রাখতে হবে শুধু হিন্দু নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে মুসলমানও পড়ে—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই চরম দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে—

হিন্দু মোছলমান পরজ্যা কারও রেহাই নাই।
আশমানে তাকায়্যা কয় যা করে গোঁসাই।।

মানুষ যে কেন ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়, দৈব নির্ভরতা যে অসহায়ত্বের অনিবার্য ফলশ্রুতি, আমরা সেই সত্য উপলব্ধি করি গীতিকাগুলি থেকে।

গীতিকাগুলিতে যে পরিবার জীবন উপস্থাপিত, তা থেকে পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তারই পরিচয় মেলে। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে অসহায়া বিধবা রমণী কিংবা রাজপুরুষের চক্রান্তের শিকার অসহায়া রমণীকে পিত্রালয়ে আশ্রয় নিতে দেখা গেছে। 'দেওয়ান-ভাবনা' পালায় সুনাইকে নিয়ে তার বিধবা মা ভাটুক ঠাকুরের আশ্রিত হয়েছে। 'আয়না বিবি' পালাতেও আয়না মাতৃহীনা হয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় লাভ করেছে। 'কমলা'য় কারকুনের চক্রান্তের শিকার হয়ে কমলার মা সকন্যা ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় নিয়েছে। ভাই-বোনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, এ সম্পর্ক বিবাহোত্তর কালেও দেখা গেছে। শাশুড়ী-পুত্রবধূর মধ্যেকার সম্পর্কও অনভিপ্রেত থাকেনি, অন্ততঃ বাংলা ছড়ায় যে তিক্ত সম্পর্ক লক্ষিত হয় তার বৈপরীত্যই এখানে দৃশ্যমান।

আমরা গীতিকাগুলি থেকে সমাজ জীবন সম্পর্কিত খুঁটিনাটি যে সব তথ্যাদি জানতে পারি, নানাবিধ সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি, পূজার্চনা, বিধি-নিষেধ, লোকাচার বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হই, এবারে তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

সর্প অধ্যুষিত বাংলা দেশের মানুষ বিশেষ করে মনসার অনুরাগী, মনসার আরাধনা করে সর্প দংশন থেকে মুক্ত হতে প্রয়াসী। একাধিক পালায় মনসার আরাধনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। 'মলুয়া' পালায় বর্ণিত হয়েছে—

শায়ন মাসেতে লোকে পূজে মনসা।

'দেওয়ান ভাবনা' পালাতেও মনসা পূজার উল্লেখ লক্ষণীয়—

শায়ন মাসেতে দূতি পূজিলা মনসা।
সেইতে না পূরিল গো আমার মনের আশা।।

'কমলা' পালাতেও দেখি—

কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়ান্যা সংক্রান্তে রাজা মনসার পূজে।।

কার্তিক মাসে সন্তান কামনায় কার্তিক পূজা করার রীতির কথা বর্ণিত হয়েছে একাধিক পালায়। 'মহুয়া' পালায় শুধুমাত্র কার্তিক পূজা এবং তার উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে—

কার্তিক মাসে কার্তিক বরত পুত্রের লাগিয়া।

কিন্তু 'কমলা' পালায় কার্তিক পূজা উপলক্ষে আড়ম্বরানুষ্ঠানের পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে—

কার্তিক মাসেতে দেখ কার্তিকের পূজা।
পরদিমের ঘট আকি বাতির করে সাজা।।
সারারাত্রি হুলামেলা গীত বাদ্যি বাজে।
কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে সাজে।।

মনসা, কার্তিক ছাড়াও দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, বনদুর্গা, রক্ষাকালী ইত্যাদির পূজানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হতে দেখা গেছে। 'চন্দ্রাবতী' পালায় বর্ণিত হয়েছে—

একে একে কৈল পূজা যত দেব আর।
শ্যামাপূজা একাচুড়া বনদুর্গা মার।

'কমলা'য় নরবলি সহকারে রক্ষাকালী পূজার কথা উল্লিখিত হয়েছে। নরবলি দানের প্রথা যে চালু ছিল, এর থেকেই তা অনুমিত হয়—

নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পূজে।

শ্যামাপূজায় জোড়া পাঁঠা বলিদানের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে 'কমলা' পালাতেই—

জোড়া পাঁঠা দিয়া বলি শ্যামাপূজা করে।

এছাড়া 'ডরাই' নাম্নী এক গ্রাম্য দেবতার প্রসঙ্গও লক্ষিত হয়েছে 'কমলা'য়

মইষ দিয়া পূজা দিল দেবী ডরাইরে।।

পূজার্চনার পর লোকাচার ও প্রথা সম্পর্কিত তথ্যাদির প্রসঙ্গ। বিবাহ সব মাসে অনুষ্ঠিত হয় না। পৌষ মাস বিবাহের পক্ষে বিহিত নয়, দেশাচারের কারণে তাই এই মাসে বিবাহের মত শুভ সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না। 'মলুয়া' পালায় বর্ণিত হয়েছে—

পৌষ মাসে পোষা আন্দি দেশাচারে দোষ।

বাংলাদেশের মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষি। চরম অনিশ্চয়তায় ভরা কৃষিকার্য। সম্পূর্ণ প্রকৃতির করুণার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় বলে কৃষিজীবী মানুষ কত সংস্কারই না মেনে চলে যাতে তাদের পরিশ্রম ব্যর্থ না হয়। 'মলুয়া' পালায় বর্ণিত হয়েছে—

পাঞ্চ গাছি বাতার ডুগল হাতেতে লইয়া।
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া।।

কৃষকেরা প্রথম দিন ধান কাটবার সময় পাঁচটি বাতা গাছের শীর্ষদেশ জমিতে নিয়ে যায়। এগুলি সিঁদুর ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্যে অনুলিপ্ত হয়। বাতার পাঁচটি ডুগল বা অগ্রভাগের সঙ্গে পাঁচটি ধানের ছড়া বাঁধা হয়। কৃষকেরা একে লক্ষ্মীর আসন বিবেচনা করে ঘরের কোণে বিশিষ্ট স্থানে তুলে রাখে।

আগেকার দিনে এক ধরনের মাপ প্রচলিত ছিল—একে বলা হত 'আড়া'। চার মনে

এক আড়া হত। 'মলুয়া'য় আকালের বিবরণ দান প্রসঙ্গে লোককবি বলেছেন :

টাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে আকাল।
কি দিয়া পালিব মায় কুলের ছাওয়াল।।

বিবাহের সময় দেওয়ানকে নজর দিতে হত বাধ্যতামূলক ভাবে, এর নাম ছিল 'নজর মরেচা'। 'মলুয়া'য় নজর মরেচার উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

সাদি কইরাছ তুমি গেছে ছয় মাস।
নজর মরেচা রইছে তোমার অপরকাশ।।

সেকালে অল্প বয়সে বিবাহ দানের রীতি ছিল। 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় তারই ইঙ্গিত লভ্য। সুনাই দশ অতিক্রম করে এগারোয় পদার্পণ করলে তার জননী অনূঢ়া কন্যার বিবাহ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছে—

দশ বচ্ছর গিয়া সুনাইগো এগারোতে পড়ে।
কন্যার যৈবন দেখ্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে।।
এতেক সুন্দর কন্যাগো তাহেত যুবতী।
কেবা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গতি।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মায়েগো কোন কাম করে।
আশ্রয় মাগিতে গেলগো ভাইয়ের গোচরে।।

কন্যা যাতে শ্বশুরালয়ে সোহাগের মধ্যে থাকতে পারে, সেজন্য কন্যার জননী ও জননী স্থানীয়ারা এক ধরনের লৌকিক আচার পালন করতেন। 'মলুয়া' পালায় তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে—

তবে ত মলুয়ার মাও খুড়ী জেঠী লইয়া।
সোহাগ মাগিতে মাও বিয়ার মঙ্গল চাইয়া।।
খুড়ীর সোহাগ জেঠীর সোহাগ আর মাসী পিসী।
সোহাগ মাগে কন্যার মাও মঙ্গল উদ্দেশ্যি।।
শ্বশুরবাড়ী গিয়া কন্যা থাকুক সোহাগে।
তেকারণে কন্যার মাও ভাল সোহাগ মাগে।।
মাথায় লক্ষ্মীর কুলা অঞ্চলে ঘুড়িয়া।
সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া।।

'চন্দ্রাবতী'তেও সোহাগ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—

আবাধিক হইল শেষ জানি এই মতে।
সোহাগ মাগিল আর মায় বিধিমতে।।
আগে চলে কন্যার মায় ডালা মাথায় লইয়া।
তার পাছে কন্যার খুড়ী লোটা হাতে লইয়া।।
তার পরে যত নারী গীত জুকারে।
সোহাগ মাগিল কত বাড়ী বাড়ী ফিরে।।

ধনী, বিলাসী ব্যক্তিরা পুষ্করিণীর মধ্যে এক প্রকার বিলাস ও আমোদাগার তৈরী করে সেখানে গ্রীষ্মকালে শ্রমবিনোদন অথবা আমোদপ্রমোদে রত হতেন। 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় মাধব সুনাইকে প্রলোভন দেখাতে গিয়ে, তার প্রতি আসক্ত করাতে বলেছে—

বাপের বাড়ীতে আছে গো জলটুঙ্গীর ঘর।
সেই ঘরে বসিয়া তুমি করিবা পশর।

এই জলটুঙ্গীই হল সেই পুষ্করিণীর মধ্যে নির্মিত আমোদাগার।

কন্যা ও পাত্রের স্বগোত্র বিবাহ ছিল অবিহিত। 'দস্যু কেনারামের পালা'য় তাই লখীন্দরের বিবাহের সম্বন্ধ করতে গিয়ে ভরদ্বাজ গোত্রীয় যক্ষসেনের কন্যা চন্দ্রকলার কথা বললে চান্দ বলে, 'সগোত্রতে উচিত না হয়।'

একই পালায় বর্ণিত হয়েছে—

কাঁচা মৃত্তিকার সরা তাতে ভর করি।
দেবেতে মোহিতে নাচে ঊষা যে সুন্দরী।।

আগেকার দিনে কাঁচা মাটির সরার উপর নৃত্য কৌশল প্রদর্শনের প্রথা প্রচলিত ছিল। এরূপ ক্ষিপ্র চরণে নৃত্য প্রদর্শনকারিণী নৃত্যরত হত, যে মনে হত যেন বায়ুতে ভর করে নৃত্য প্রদর্শিত হচ্ছে, কাঁচা মাটির সরার উপর পা পড়ত কিনা সন্দেহ। এখানে ঊষার নৃত্যের প্রসঙ্গে তারই ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়েছে।

পূর্ববঙ্গে এক প্রকার উৎকৃষ্ট ঘনীভূত দধি প্রস্তুত করা হত যা ছানার মত শক্ত হত এবং এই দধি গামছায় বন্ধন করে নিয়ে যাওয়া চলত। 'দস্যু কেনারামের পালা'য় এই দধির উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

আহারে প্রাণের বন্ধু তুমি ছিলে কৈ।
তোমার লাইগ্যা ছিকায় তোলা গামছা বান্দা দৈ।।

বিবাহাদির মত শুভ সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্রাদি কখনও কালো কালিতে রচিত হয় না। তাছাড়া এইসব পত্রে মাঙ্গলিক চিহ্ন স্বরূপ বিজোড় সংখ্যায় সিঁদুরের ফোঁটা অঙ্কিত করার রীতি। 'কমলা' পালায় কমলার বিবাহোপলক্ষে যে নিমন্ত্রণ পত্র রচিত হয়েছিল তার বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে—

সোনার কালীতে পত্র সকলি লিখিল।
সিন্দুরের সাত ফোঁটা তার মাঝে দিল।।

নামকরণে কতই না রীতি অনুসৃত হত, নামকরণের মধ্য দিয়ে নবজাতক সম্পর্কে তার মাতা-পিতা বা অভিভাবক স্থানীয়দের মনোভাব অথবা জাতকের জন্মসূত্র নির্দেশিত হত। 'দস্যু কেনারামের পালা'য় বলা হয়েছে—

দেবীর পূজার কিঁনা তাই কেনা রাম।।

দেবীর পূজার দ্বারা ক্রীত, এই অর্থে এখানে 'কেনারাম' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পালাগুলিতে সেকালের ব্যবহার্য ও জনপ্রিয় বসন-ভূষণেরও উল্লেখ লক্ষণীয়।

'কমলা'তে বেশ কিছু ভূষণাদির উল্লেখ রয়েছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে কানে পরার চম্পক ঝুমকা, নাকে পরার বলাকা, বেসর, গলায় পরার হাসুলি, পায়ে পরিধানের গুঞ্জরী, হাতে পরার বাজু, মস্তকে পরিধানের সিথিপাটী ইত্যাদি। সখীরা কমলাকে বিবাহের উপযোগী সজ্জায় সজ্জিত করেছিল এইভাবে—

কানেতে পরাইল দুল চম্পক ঝুমুকা।
নাকেতে সোনার বেসর আর বলাকা।।
গলাতে পরাইল এক হীরার হাসুলি।
পায়েতে পরাইল খারু গুজরী আর পাচুলী।।
হস্তেতে সোনার বাজু সোনার বাস্তেনা।
মস্তকেতে সিথিপাটী সুবর্ণের দানা।।

পালাগুলি থেকে আমরা সেকালের নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যাদির সন্ধানও পাই। বলাবাহুল্য এসবের অধিকাংশই আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। 'কমলা' পালায় বর্ণিত হয়েছে সাধু হীরাধর কি ভাবে নানা উপচারে অভ্যাগতদের আতিথ্য করেছিল—

একে একে রান্ধে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি।
শুকনা মাছ পুইড়া রান্ধে আগল বেসাতি।।
*　　　*　　　*
শুকত খাইল বেনুন খাইল আর ভাজা বরা।
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শিস্যায় ভরা।।
পাত পিঠা বরা পিঠা চিত চন্দ্রপুলি।
পোয়া চই খাইল কত রসে ঢলঢলি।।

নূতন বধূকে গৃহে পান ও ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়ার রেওয়াজের কথা জানা যায় 'মলুয়া' পালাটি থেকে—

পান ফুল দিয়া কন্যায় তুইল্যা লও ঘরে।।

কৌলীন্য প্রথা সমাজে বিদ্যমান ছিল। 'চন্দ্রাবতী'তে তার প্রমাণ লভ্য—

ঘটক কহিল কথা সুন্ধা গ্রামে ঘর।
চক্রবর্ত্তী বংশে খ্যাতি কুলীনের ঘর।।

সেকালে পাল্কীর প্রচলন ছিল ব্যাপক। বিশেষতঃ অন্তঃপুরিকাদের যাতায়াতে পাল্কীই অধিক ব্যবহৃত হত। 'কমলা'য় কারকুনের চক্রান্তের শিকার অসহায়া কমলা মাতাকে সঙ্গে নিয়ে পাল্কীতে চড়ে মাতুলালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল বলে বর্ণিত হয়েছে—

পাল্কী চড়িয়া দোহে যাই মামার বাড়ী।

বাজিকরেরা খেলা দেখাবার সময় অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন রাও চণ্ডালের হাড় সঙ্গে নিত। 'মহুয়া' পালায় বর্ণিত হয়েছে হুমরা বেদে খেলা দেখাবার জন্য অন্যান্য উপকরণাদির সঙ্গে এই হাড় সঙ্গে নিয়েছিল—

ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর।

সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড়।।

জাতিভেদ প্রথার তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতেই 'কঙ্ক ও লীলা'য় বর্ণিত হয়েছে—

জন্মিয়া চণ্ডালের অন্ন খায় যেই জন।
যে তারে সমাজে তুলে নহে সে ব্রাহ্মণ।।

'মহুয়া'তে বেদের কন্যার হাতে ভোজনের পরিণাম সম্পর্কে নদ্যার ঠাকুর নিজেই বলেছে : জাতি নাশ করলাম কন্যা তোমারে পাইবার তরে।।

কারণ হিসাবে লোককবি বর্ণনা দিয়েছেন :

জাতি দিয়া নদীয়ার ঠাকুর করিল ভোজন।

ষষ্ঠীর দিনে নবজাতকের নামকরণ করার রীতি প্রচলিত ছিল, আর এই ব্যাপারে তালপাতা ছিল অপরিহার্য উপকরণ। 'কঙ্ক ও লীলা'র বর্ণনা থেকে জানা যায় কঙ্কের নামকরণ প্রসঙ্গে—

সাটারিয়া দিনে তালপাতায় লিখিয়া।
কঙ্ক নাম রাখে মাতা আদর করিয়া।।

বিবাহাদি সম্পর্কিত নানা আচার-আচরণ, বিশেষত: স্ত্রী-আচারের বহুবিধ তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে পালাগুলিতে। বিবাহে নান্দীমুখ অবশ্য পালনীয় এক আচার, আর এতে নারীদের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। তারাই মাটি কাটত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ সঙ্গীত গাইত। 'কমলা' পালায় বর্ণিত হয়েছে—

নান্দীমুখের মাটী কাটে যত নারীগণ।
তার গীতেতে যেমন ছাইল গগন।।

গীত সহকারে এয়োস্ত্রীদের জল সইবার কথাও বর্ণিত হয়েছে ঐ একই পালায়—

কাকেতে কলসী লইয়া যতেক যুবতী।
জল ভরিয়ে যায় সবে পাছে বাদ্যগীতি।।
নদীর ঘাটে জল ভরিয়া পন্থে মেলা দিয়া।
গীত-জুকারে আইল বাড়ীতে ফিরিয়া।

শুভ অনুষ্ঠানের কিছুই সঙ্গীত ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হত না। বর-কন্যা জলের ঘটের সামনে নূতন বস্ত্র পরিধান করে উপবিষ্ট হলে নাপিত কামানোর কার্য করত, আর সেই উপলক্ষ্যে গীত হত কামানির গান—

সমুখে জলের ঘট নতুন কাপড় পরি।
বরকন্যা বসিল যে হইতে খৌরী।।

*    *    *

জয় জুকারে দেখ যতেক যুবতী।
হরষ অন্তরে গায় কামানির গীতি।।

স্নানের সময় হরিদ্রা-মর্দনের প্রথা প্রচলিত ছিল, আর স্নানের সঙ্গীত ত গীত হতই—

হলুদ মাখিয়া গায়ে যতেক সুন্দরী।

ভরা কলসীর জল ঢালে ত্বরা করি।।
সিনানের গীত হইল যত জানা ছিল।
ছান করি বরকন্যা ঘরেতে আসিল।।

কন্যার বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরালয়ে যাবার সময় পিত্রালয় থেকে সঙ্গে নানা উপকরণাদি দেওয়ার রীতি ছিল। মলুয়াকেও দেওয়া হয়েছিল—

ঝাইল পেটেরা দিল সঙ্গেতে করিয়া।
সজ মসলা দিল থলেতে ভরিয়া।।
আরও সঙ্গে দিল মাও চিকনের চাইল।
তৈল সিন্দূর দিল খৈয়াবিন্নির ধান।

**সংস্কার ও বিশ্বাস**

গীতিকার কাহিনীগুলি গ্রামীণ জীবনকে উপস্থাপিত করেছে। গ্রামীণ জীবন নানাবিধ সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়। যাত্রা, বিবাহ, কন্যা-নির্বাচন—সকল ক্ষেত্রেই মানুষ সংস্কারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বাংলা গীতিকাগুলিতেও তাই নানাবিধ সংস্কারের কথা স্থান পেয়েছে। বলাবাহুল্য কাহিনীকে বাস্তবানুগ হতে সহায়তা করেছে এইসব সংস্কারের সংযোজন। প্রথমেই আমরা বিভিন্ন গীতিকায় যাত্রা (গমন) সম্পর্কিত সংস্কারগুলির উল্লেখ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারি।

আমরা জানি লোকসংস্কারের সঙ্গে অশিক্ষা বা শিক্ষাহীনতার যেমন যোগ, তদপেক্ষা হয়ত অধিক যোগ অনিশ্চয়তার। জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, সেই সব ক্ষেত্রে অভিলষিত সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে অসহায় মানুষ সংস্কারের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই আমরা যাত্রার উল্লেখ করতে পারি। মানুষ গৃহ থেকে অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানের উদ্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে যথাযথভাবে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটি চরম অনিশ্চয়তায় ভরা। পথে যেমন নানা বিপদ, প্রতিকূলতা দেখা দিতে পারে যার ফলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোই সম্ভব হয় না, অথবা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পরেও নানা অকল্পনীয় প্রতিকূলতার কারণে অভিলষিত সাফল্য লাভ ঘটে না। এইজন্য যাত্রাকে সার্থকতায় মণ্ডিত করতে, ফলপ্রসূ করে তুলতে মানুষ সংস্কারকে মেনে চলে।

শুক্রবার মুসলমানদের পক্ষে শুভ দিন, কারণ এইদিন জুম্মাবার। তাই 'মহুয়া' পালায় মহুয়ার পালক পিতা হুমরা বাইদ্যা খেলা দেখাবার জন্য বিদেশে যাবার প্রস্তাব করলে মাইনকিয়া বাইদ্যা বলেছে—বৈদেশেতে যাব আমরা শুক্কুর বাইর‍্যা দিন।

সত্য সত্যই সকলে শুক্রবারেই বিদেশে খেলা দেখাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে—

শুক্কুর বাইর‍্যা দিন আইল সকালে উঠিয়া।
দলের লোক চলে যত গাট্টি বুচ্‌কা লইয়া।।

যাত্রার দিন যাত্রা শুভ করার জন্য দধি ভোজনের সংস্কার প্রচলিত আছে। 'মহুয়া'

পালায় বিনোদ তার যাত্রাকে শুভ করতে, সার্থক করে তুলতে দধি ভোজন করেছে বলে বর্ণিত হয়েছে—দধি ভোজন করি বিনোদ যাত্রা যে করিল।

যেদিন বিবাহ হয় ঠিক তার পরের দিনকে বলা হয় কালরাত্রি। কালরাত্রির দিন যাত্রা নিষেধ। 'মলুয়া' পালায় এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

কালরাতে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা।
এই দিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখাশুনা।।

কালরাত্রির দিন নব পরিণীত স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ নিষেধ, কালরাত্রি কালক্ষয়েরও কারণ এই বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে এখানে।

নানাবিধ অসুখ নিরাময়ের ব্যাপারে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং এখনও তা নানাস্থানে প্রচলিত আছে। সেই সঙ্গে এইসব উদ্ভিদ আহরণের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ তিথি, দিন মেনে চলার রীতি। বিশ্বাস, এতে আহৃত ভেষজ-উদ্ভিদ অনেক বেশি কার্যকরী হবে। 'মহুয়া' পালায় অসুস্থ নদ্যার ঠাকুরের কারণে মহুয়াকে ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে সন্ন্যাসী প্রস্তাব দিয়ে তাই বলেছে—

আজি পূর্ণিমার নিশা আরে শনিবার িনে।
ঔষধ তুলিতে কন্যা চল গহীন বনে।।

যাত্রার সময় হাঁচি হলে যাত্রায় বাধা পড়ে বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী সেক্ষেত্রে কিছু সময় অতিবাহিত করে তবে যাত্রা করতে হয়, নতুবা যাত্রা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। 'দেওয়ান মদিনা' পালায় বর্ণিত হয়েছে—

যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল।
কতক্ষণ দুলাল মিএগ বার যে চাহিল।।

এমন কিছু প্রাণী আছে যাদের দেখলে অশুভ কিছু ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত, অনুরূপভাবে কিছু কিছু শব্দ, দৃশ্য ইত্যাদি আছে, যা সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ সচরাচর শুনতে চায় না বা অশুভকে পরিহারের জন্য দেখতে অনিচ্ছুক। 'দেওয়ান মদিনা' পালায় এরকম বেশ কিছু অশুভ প্রাণী বা দৃশ্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে তেলী, শিয়ালীর দর্শন, কাক-চিলের ডাক ইত্যাদি—

তারপরে মেলা দিয়া সামনে দেখে তেলী।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন শিয়ালী।।
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া চিল রইয়া।
নানা অলক্ষণ দেখে পন্থে মেলা দিয়া।।

এ ছাড়াও বর্ণিত হয়েছে শুষ্ক ডালে বসে কাকের আর্তনাদ করার কথা, যা অশুভ বলে বিবেচিত হয়, বর্ণিত হয়েছে হাঁচি, টিকটিকির কথা—

শুকনা ডলেতে বস্যা কাগায় করে রাও।
হাঁচি আর টিকটিকি আর যত অলক্ষণ।।

'কঙ্ক ও লীলা' পালাতেও অশুভ লক্ষণের বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কাক সাচান করে দিবসেতে রা।
ডাক শুনি মুনির কাপিল সর্ব গা।।
পথ কাটি শিবা ধায় না চায় ফিরিয়া।

যাত্রাপথে কোন কিছুর কারণে বাধার সৃষ্টি হলে অনুমিত হয়, যাত্রা বিফলে যাবে অথবা পরবর্তীকালে অনভিপ্রেত কোন মন্দ ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে। 'কমলা' পালায় সেই ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়েছে—

চরণে ঠেকিল মাটি বাধা পড়ে পথে।
আজি কেন হিয়া মোর কাপিল চলিতে।।

ছেলেদের ক্ষেত্রে যদি বাম চোখ নাচে তবে তা অশুভের ইঙ্গিতবহ বলে মনে করা হয়, বিপরীতক্রমে মহিলাদের ক্ষেত্রে ডান চোখের স্পন্দনকে গণ্য করা হয় অশুভ বলে। 'দেওয়ানা মদিনা'য় বাম চোখ নাচায় অশুভের সম্ভাবনায় ভীতি প্রকাশ করে বলা হয়েছে—

বাঁও আঁখি করে মোর তরাসে কাঁপে বুক।

বিবাহ শুভ কার্য কিন্তু বিবাহের পরিণতি চরম অনিশ্চয়তায় ভরা। একটি পুরুষ আর একটি নারীর মিলন সার্থক হয়ে উঠবে কিনা, সেই ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না। আর বিবাহ যদি সার্থক না হয় তবে দুটি নর-নারীর জীবন যে কতখানি ব্যর্থ ও বিড়ম্বনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তা সহজেই অনুমেয়। আর সেই কারণে বিবাহের মাস নির্বাচনেও নানা সংস্কার মেনে চলার রীতি। আসল উদ্দেশ্য বিবাহিত জীবন যেন সার্থক হয়—তা সুনিশ্চিত করে তোলা। 'মলুয়া' পালায় বর্ণিত হয়েছে—

শায়ন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
কারণ, এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা রাঁড়ি হইছে।।

ভাদ্র মাস অকাল বলে পরিচিত। এই মাসে বিবাহের মত শুভ ও পবিত্র কার্য নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে—

ভাদ্র মাসে শাস্ত্রমতে দেবকার্য মানা।
এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগুনা।।

যে নারীর পা মাটিতে ঠিকমত পড়ে না, সেই নারী অলক্ষ্মণা বলে বিবেচিত, এদের বলা হয় খড়মপেয়ে। 'রূপবতী' পালায় সুলক্ষণা কন্যার প্রসঙ্গে তাই বর্ণিত হয়েছে—

হাঁটিয়া যাইতে গোছ যেমন চিরুণী।
এই লক্ষণ থাকলে কন্যা হয় রাজরাণী।।

বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য মানসিক করার প্রথা দীর্ঘকালের, বিশ্বাস এতে বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হয়। 'মহুয়া' পালায় বর্ণিত হয়েছে খেতে বসে নদ্যার ঠাকুরের গলায় কাঁটা লাগলে মহুয়া নদ্যার ঠাকুরের বিপন্মুক্তির জন্য মানসিক করেছে।—

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাঁটা।
বাদ্যার ছেরি মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা।।

জোড়া প্রাণী বলিদানের সংস্কারও দীর্ঘদিনের। 'মলুয়া' পালাতেও জোড়া প্রাণী বলিদানের মানসিক করার কথা বলা হয়েছে—

জোড়া মইষ দিয়া যায় মানসিক করে।।

'দস্যু কেনারামের পালা'তেও জোড়া প্রাণী বলি দেবার কথা বলা হয়েছে।

যোড়া পাঁঠা দিয়া বলি পূজা যে করিয়া।
নির্মাল্য ধরিল শিরে ভক্তিযুথ হৈয়া।।

সমাজ জীবনের নানা খুঁটিনাটি তথ্যের উল্লেখে গীতিকাগুলির সাহিত্যিক গুরুত্ব ছাড়াও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে স্বীকার করতে হয়।

## নবম অধ্যায়

# গীতিকায় কবিত্ব

সমুদ্রের বেলাভূমিতে পতিত অসংখ্য উপলখণ্ডের মধ্যে মাঝে-মধ্যেই যেমন আকর্ষণীয় প্রস্তরখণ্ডের সন্ধান মেলে এবং সন্ধানকারী সেইসব রমণীয় প্রস্তরখণ্ড সঞ্চয় করে সযতনে, তেমনি সচেতন পাঠক মাত্রই গীতিকার মধ্যে এমন কিছু কিছু পংক্তি, বর্ণনা, উপমা অথবা বিশ্লেষণ কিংবা চিত্রকল্পের সন্ধান লাভ করেন, যা তাকে চমৎকৃত করে। রীতিমত প্রতিষ্ঠিত কবিরা যে সব অলংকার ব্যবহার করতে পারলে শ্লাঘা বোধ করতেন, কিংবা চিত্রকল্পের উপস্থাপনায় সহজেই রসিক পাঠকের চিত্তকে অধিকার করে নিতেন, তেমনি কিছু কিছু চিত্রকল্প, বর্ণনা অথবা বিশেষণের পরিচয় গ্রহণ করা হবে গীতিকাগুলি থেকে। 'মহুয়া' পালায় নদ্যার চাঁদ মহুয়াকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে মহুয়া সুন্দরী কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে নদ্যার চাঁদকে যখন বলেছে—

লজ্জা নাই নিলর্জ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।

তখন প্রত্যুত্তরে নদ্যার চাঁদ বলেছে—

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।।

নদ্যার চাঁদ মহুয়া সুন্দরীর প্রেমাসক্ত। তাই তাকেই সে গভীর স্রোতস্বিনী হবার আহ্বান জানিয়ে তাতেই নিমজ্জিত হবার বাসনা প্রকাশ করেছে নদ্যার ঠাকুর। প্রেমিকার কাছে আত্মনিবেদনের জন্য এমনতর অভিব্যক্তির প্রকাশ বাস্তবিকই তুলনাহীন। মহুয়া সুন্দরীর প্রেমে নদ্যার ঠাকুরের গভীর আসক্তি যেমন এক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি মহুয়ার কৃত্রিম ভর্ৎসনার উপযুক্ত জবাবও হয়ে উঠেছে নদ্যার চাঁদের বক্তব্য! অথচ কত শিল্পমণ্ডিতভাবেই তা উপস্থাপিত।

দীর্ঘ বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর নদের চাঁদ মহুয়াকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল। তার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন কবি এইভাবে--পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল।

এখানে সুন্দরী মহুয়াকে পদ্মফুলের সঙ্গে এবং নদ্যার চাঁদকে উন্মত্ত ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পদ্মফুলের মধু উদ্ভিন্ন যৌবনকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দীর্ঘ বিচ্ছেদ বেদনায় প্রেমিকার জন্য প্রেমিকের ব্যাকুলতা এ অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর রূপে আর প্রকাশ করা যেত কি?

মণিহারা ফণী যেমন মণিলাভে তৃপ্ত হয়, কিংবা পিপাসার্ত ব্যক্তি দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর শীতল পানীয় লাভে যেমন প্রসন্ন হয়, অনুরূপভাবে বহু অভিলষিত জনের উষ্ণ সান্নিধ্যেও মানুষ তৃপ্তিলাভ করে। মহুয়া এবং নদ্যার চাঁদের দীর্ঘ বিচ্ছেদ বেদনা ভোগের পর তাদের মিলনানন্দ প্রকাশে লোককবি অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বলেছেন—

সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।

নদ্যার চাঁদের অসামান্য সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান।
আসমানে তারার মধ্যে পূর্ণ মাসীর চান।।

কবি এই প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করে সভায় উপস্থিত অন্যান্যদের তুলনায় নদ্যার চাঁদের আকর্ষণীয় এবং অতুলনীয় পার্থক্যটি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন।

'দেওয়ান ভাবনা' পালায় নায়িকা সুনাইর ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—অঙ্গের লাবণি সুনাইরগো বাইয়া পড়ে ভূমে।

সুনাইর অঙ্গের লাবণ্যকে তরল রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা পদকর্তা জ্ঞানদাস বিরচিত একটি বহুল প্রচলিত পংক্তির উল্লেখ করতে পারি, কেননা দুইয়ের মধ্যে ভাবগত সাযুজ্য অনেকখানি।—

'ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি অবণী বহিয়া যায়।'

চন্দ্রকলা যেমন প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়, তেমনি সুনাইর যৌবনাগমে তার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেতে লাগল, লোককবির বর্ণনানুযায়ী--দিন দিন বাড়ে যেমন চাঁদের লাবণী।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের আধার রূপিণী সুনাইয়ের উপস্থিতিতে পদ্মবনের সৌন্দর্য পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল, অর্থাৎ পদ্মবনের সম্মিলিত সৌন্দর্যের তুলনায় সুনাইয়ের সৌন্দর্যকে অধিকতর বলে কবি কল্পনা করেছেন, বলেছেন সুনাইয়ের উপস্থিতিতে যেন পূর্ণিমার চন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে এই ধরণীতে—

কন্যার রূপেতে উজলা পদ্মবন।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিল ধরায়।।

'চন্দ্রাবতী' পালায় বর্ণিত হয়েছে :

আবে কবে ঝিলিমিলি সোনার বরণ ঢাকা।
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা।

সূর্যদেবের স্বর্ণ বর্ণ, অভ্র অর্থাৎ আকাশকে বিদীর্ণ করে ঝিলমিল করছে। কল্পিত হয়েছে, সূর্য যেন হলুদ দ্বারা স্নাত হয়ে উদিত হয়েছে। সূর্যের কিরণকে এখানে হরিদ্রা বর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যদিও সচরাচর প্রভাতকালীন সূর্যকে রক্তিম বর্ণের বলেই কল্পনা করা হয়ে থাকে। চন্দ্রাবতীর যৌবন উদ্‌গমের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

যৈবন আইল দেহে জোয়ারের পানি।

পূর্ণ যৌবনের সূত্রে 'ভরা যৌবন' কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, লোককবি চন্দ্রাবতীর দেহে সেই পূর্ণ যৌবনের উপস্থিতিকে জোয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে লক্ষণীয়, কবি চন্দ্রাবতীর দেহকে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

'কমলা' পালাতেও কমলার যৌবনের বর্ণনাদানে প্রায় একইরূপ কবি-কল্পনার সাক্ষাৎ মেলে—

তোমার ত যৌবন ছিল জোয়ারের পানি।।

কিংবা, আষাইঢ়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে।।

চন্দ্রাবতীর আকর্ষণীয় বর্ণের উল্লেখে কবি বলেছেন :

সোনার বরণ তনু কন্যা চম্পক বরণী।।

স্বর্ণ চম্পার বর্ণকে চন্দ্রাবতী যেন আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

'মলুয়া' পালায় মলুয়ার মেঘবরণ কেশরাজির বর্ণনায় কবি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন—মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায়।

এক্ষেত্রে শুধু কেশরাজির বর্ণের সঙ্গে মেঘের তুলনা করা হয়নি, সেই সঙ্গে মলুয়ার কেশরাজির দৈর্ঘ্যকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'কমলা' পালাতেও কমলার দীঘল কেশের বর্ণনায় একইরূপ কবিকল্পনা কাজ করেছে—

শ্রাবণ মাসেতে যেন কাল মেঘ সাজে।
দাগল দীঘল কেশ বায়েতে বিরাজে।।

'দেওয়ান ভাবনা'য় মাধব তার প্রেমিকাকে নিজের হাতে মালা গেঁথে সাজাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, কিন্তু সে মালা ফুলের মালা নয়—

গলায় গাঁথিয়া দিবাম জোনাকীর মালা।

প্রেমিকাকে প্রেমিক নানাভাবে সাজাবার কথা বলে, সাজাবার কথা চিন্তা করে, কিন্তু জোনাকীর মালা দিয়ে সাজানো একান্তই অভিনব। অভিনব হলেও জোনাকীর মালার সৌন্দর্য অনস্বীকার্য।

দ্বাদশ বর্ষীয়া সুনাই সবে যৌবনবতী হয়েছে, তার যৌবনকে গতিময় করে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে কবি যে উপমার আশ্রয় নিয়েছেন তা কবিকল্পনা হিসাবে উপভোগ্য হয়েছে নিঃসন্দেহে—

আষাঢ় মাসে দীঘলা পান্‌সীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে।।

'কমলা' পালায় স্নানরতা কমলাকে বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—

জলেতে সুন্দরী কন্যা ফুটা পদ্মফুল।

স্নানরতা কমলার সৌন্দর্য এমনই যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে রক্তমাংসের কোনো মানবী নয়, একটি মনোহর পদ্মফুল জলে প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। চিত্রকল্পটি বাস্তবিকই অনবদ্য। এই একই পালায় বিগত যৌবনা চিকন গোয়ালিনীর বর্ণনা করা হয়েছে :

শুখাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল।

যৌবনের সঙ্গে কবি কমলের অভিন্নতা প্রকাশ করেছেন। যৌবনের সৌন্দর্য এবং তার ক্ষণস্থায়িত্ব উভয়ই ব্যঞ্জিত হয়েছে রূপক অলঙ্কারটির মাধ্যমে।

'কঙ্ক ও লীলা' পালায় লীলার সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি ব্যতিরেক অলঙ্কার ব্যবহার

করেছেন। বলেছেন কুসুম চয়নে রত লীলার সৌন্দর্যে লজ্জিত কুসুম আত্মগোপন করেছে বৃক্ষের পত্ররাজির মধ্যে—

পুষ্প না বাগানে কন্যা পুষ্প তুলতে যায়।
মৈলান হইয়া ফুল পাতাতে লুকায়।।

'চন্দ্রাবতী'তে ব্যর্থ প্রেমে ভগ্ন মনোরথ জয়ানন্দ জলে ডুবে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করছে। যে চন্দ্রাবতী বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তার অন্তরের মানুষ জয়ানন্দের শেষ সাক্ষাৎকারের আবেদন মঞ্জুর করেনি, জলে ভাসমান তারই মৃতদেহ তার কাছে কিন্তু প্রতিভাত হয়েছে জলে প্রতিবিম্বিত পূর্ণিমার চাঁদ বলে--

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নমাসীর চান।।

আকাশের পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্যের তুলনায় জলে প্রতিবিম্বিত পূর্ণিমার চাঁদের লাবণ্য অনেক বেশি। এখানে সেই ইঙ্গিতটিই প্রদত্ত হয়েছে। তদুপরি জলে ভাসমান মৃতদেহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্ত বর্ণনাটি অনেক বেশী বাস্তব হয়েছে স্বীকার করতে হয়।

## দশম অধ্যায়

# গীতিকায় প্রকাশিত মনস্তত্ত্ব

লোক-কবিরা গীতিকার কাহিনী-কল্পনায়, চরিত্র-চিত্রণে, অলঙ্কার প্রয়োগে অথবা উপস্থাপনাতেই কেবল নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেননি, বিভিন্ন চরিত্রের আচার-আচরণকে যেভাবে মনস্তত্ত্বসম্মত করেছেন, তাতে তাঁদের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় মেলে।

আমরা জানি দেহের সঙ্গে মনের নিবিড় সম্পর্ক, অনুরূপভাবে প্রতিটি মানুষের আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াশীলতা মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ প্রেরণা এবং উদ্দেশ্যে যেমন মানুষ ক্রিয়া সম্পাদন করে, তেমনি বিপরীতক্রমে প্রতিটি ক্রিয়া উপযুক্তভাবে মানুষের অন্তরে অভিঘাত সৃষ্টি করে। সার্থক জীবন-শিল্পী এই মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেন চরিত্র চিত্রণে। যে চরিত্র যত বেশি মনস্তত্ত্ব সম্পন্ন আচরণ করে, সেই চরিত্রের বাস্তবতা তথা গ্রহণযোগ্যতা তত অধিক হয়। মানুষ যন্ত্র নয়, বিনা কারণে এবং বিনা আন্তর প্রেরণায় যান্ত্রিকভাবে সে কিছু করে না, করতে পারে না। তবে মানুষ যেমন যন্ত্র নয়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যেই যেমন মানুষের পরিচয়, তেমনি প্রতিটি মানুষের আচার-আচরণের পার্থক্যও লক্ষণীয়, কেননা মানুষ একইভাবে সব ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। এক একজনের ক্ষেত্রে বিশেষ ঘটনা বা চরিত্র এক এক ধরনের অভিঘাত সৃষ্টি করে থাকে। সার্থক শিল্পীকে এই পার্থক্য অনুধাবন করতে হয় এবং তাকে যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করতে হয়।

আমরা নির্দিষ্ট কিছু দৃষ্টান্তের সাহায্যে বাংলা গীতিকায় প্রকাশিত লোক কবিদের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচয় গ্রহণ করব।

নদ্যার ঠাকুর মহুয়াকে দেখেই যাকে বলে Love of first অর্থাৎ প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছিল। কবি সেই পরিচয় দিলেন নিপুণভাবে। মহুয়া যখন খেলা দেখাতে শুরু করেছে, তখন যেভাবে নদ্যার ঠাকুর আচরণ করেছে, তাতেই পাঠক বুঝতে পারে মহুয়ার প্রতি নদ্যার ঠাকুরের দুর্বলতার প্রসঙ্গ।

যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি বাশে মাইলো লাড়া।
বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা ঐল খাড়া।।
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজী করে।
নইদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর‍্যা নাকি মরে।।

মানসচক্ষে আমরা যেন দণ্ডায়মান অবস্থায় নদ্যার ঠাকুরকে দেখি আর সেই সঙ্গে তার অতি দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দও শুনতে পাই। অন্যান্যরা যখন বেদের কন্যার আকর্ষণীয় খেলার উত্তেজনা ও আনন্দের রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত, তখন একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেছে নদ্যার ঠাকুরকে। বেচারীর পক্ষে আনন্দ উপভোগের অবকাশ ছিল না, দুশ্চিন্তায় তাকে টান টান দেখা গেছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে তার উপবিষ্ট অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ার মধ্যে।

জল সংগ্রহে গিয়েছে মহুয়া, নদ্যার ঠাকুর তাকে পূর্বেই জানিয়েছে সে যেন সন্ধ্যা বেলায় জ্যোৎস্নাপূর্ণ রাত্রে জলের ঘাটে আসে, কেননা মহুয়াকে সে তার কিছু মনের কথা বলবে। সেইমত মহুয়া জলের ঘাটে গিয়েছে, নদ্যার ঠাকুর তাকে বলেছে—

'জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।।'

মহুয়া জবাব দিয়েছে—

'শুন শুন ভিন দেশী কুমার বলি তোমার ঠাই।
কাইল বা কি কইছিলা কথা আমার মনে নাই।।"

সত্যিই কি মহুয়ার মনে ছিল না? মোটেই সে সত্য বলেনি। তার ঠিকই মনে ছিল নদ্যার ঠাকুরের কথা, নতুবা সে নদ্যার ঠাকুরের কথামত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হবে কেন? আসলে আপাত বিস্মরণের ছলনায় সে তার প্রকৃত মানসিকতাকে গোপন রাখতে চেয়েছে। সহজে সে নদ্যার চাঁদের প্রতি তার দুর্বলতাকে প্রকাশ করতে চায়নি। দেখাতে চেয়েছে নদ্যার ঠাকুরের মনের কথা শোনার জন্য যেন সে মোটেই উদগ্রীব নয়, নদ্যার ঠাকুরের ব্যক্তিগত কথায় তার যেন কিছুই যায় আসে না। নদ্যার চান্দ মহুয়ার মাতৃ-পিতৃ পরিচয় জানতে চাইলে মহুয়া বলেছে—

নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।

মহুয়া তার এই বক্তব্যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি করেনি। কিন্তু নিছক নিজের অনিশ্চিত জীবনের কথা বলতেই সে শুধু নিজেকে স্রোতের ভাসমান শ্যাওলার সঙ্গে তুলনা করেনি, এক্ষেত্রে নদ্যার ঠাকুরের সহানুভূতি লাভের প্রয়াসও যুক্ত ছিল। মহুয়া জানত তার অসহায় অবস্থার কথা বললে নদ্যার ঠাকুরের সহানুভূতি আকর্ষণে সে সক্ষম হবে, আর এই সহানুভূতিই রূপান্তরিত হবে প্রেমে।

নদ্যার ঠাকুরকে মনে ধরেছে মহুয়ার। নতুবা তার আহ্বানে তাকে সাড়া দিতে দেখা যেত না, কিন্তু যার জীবনের সঙ্গে সে তার জীবনকে যুক্ত করতে চলেছে, তার পারিবারিক জীবন বিশেষত: দাম্পত্য জীবন কিছু আছে কিনা, সে বিষয়ে মহুয়া প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিতে চেয়েছে। যতই বেদের কন্যা সে হোক, তারও আত্মমর্যাদাবোধ আছে, সেও স্বপ্ন দেখে সুখী দাম্পত্য জীবনের। সোজাসুজি নদ্যার ঠাকুর বিবাহিত কিনা, তা না জিজ্ঞাসা করে সে ঘুরিয়ে বলেছে—

মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্দিয়া।।

মহুয়ার উদ্দেশ্য চরিতার্থতা লাভ করেছে। সে জেনেছে নদ্যার ঠাকুর অবিবাহিত। হুমরা বেদে তার ভাই মানিককে যখন মহুয়াকে নদ্যার ঠাকুরের হাত থেকে রক্ষার জন্য বামুনকান্দা গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাবার প্রস্তাব দিয়েছে, তখন মানিক বলেছে—

ছাইড়া যাইতে মন না চলে সোনার বাড়ী জমি।।

বেদে হয়ে অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল মানিক। কিন্তু একবার ঘটনাচক্রে যখন বামুনকান্দায় স্থায়ীভাবে জীবনযাপনের সুযোগ মিলেছিল, তখন সেই গৃহস্থ জীবনের আস্বাদ লাভে তৃপ্ত মানিক পুনরায় নতুন করে পূর্বের মত অনিশ্চয়তায় ভরা বেদের জীবনকে অঙ্গীকার করে নিতে পারছিল না, অন্তত: স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তার উক্তি থেকে তারই পরিচয় লভ্য।

মহুয়াও সমানভাবে ভালবেসেছিল নদ্যার ঠাকুরকে। তথাপি সে যখন নদ্যার ঠাকুরের উদ্দেশে বলে—

আমি মরি জলে ডুব্যারে বন্ধু আমার মাথা খাও।
ছাড়ান দিয়া আমার আশা ঘরে চল্যা যাও।।

তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এবংবিধ আবেদনের তাৎপর্য সম্পর্কে। মহুয়া হুমরা বেদেকে জানে, জানে তার শ্যেন দৃষ্টি এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে। তাকে ফাঁকি দিয়ে নদ্যার ঠাকুরকে বিবাহ করা একপ্রকার অসম্ভব কার্য ছিল। লাভে থেকে উভয়ের মিলন বাস্তবায়িত হবে না, পরিণামে হতভাগ্য নদ্যার ঠাকুরের জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই প্রাণের দয়িতকে রক্ষা করতেই মহুয়ার এবংবিধ আবেদন।

হুমরা বেদে মহুয়াকে নির্দেশ দিয়েছে স্বহস্তে নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করতে। সেই মত মহুয়া নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করতে উপস্থিত হয়ে খেদোক্তি করেছে—

তোমার সুখের ঘরে আমি হইলাম কাল।।

ভালবাসার লক্ষণই এই, ভালবাসার জনের সব দুঃখ, দুর্দশা, লাঞ্ছনার জন্য প্রেমিক বা প্রেমিকা নিজেকে দায়ী করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মহুয়া ভেবেছে নদ্যার ঠাকুরের সকল দুর্গতির মূলে সে নিজে। তার নিশ্চিত জীবনে সেই মূর্তিমান বিগ্রহের মত উপস্থিত হয়ে চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

নদ্যার ঠাকুর জলে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এই বিশ্বাসে মহুয়া অঙ্গীকার করেছে :

এই না নদীর জলে ডুবিয়া মরিব।
বৃক্ষ ডালে ফাঁস দিয়া পরাণ তেজিব।।

অর্থাৎ দয়িতবিহীন মহুয়ার জীবনে কোন আকর্ষণ নেই। তাই তার এমনতর পণ। কিন্তু তারপরেই তাকে মত পরিবর্তিত করে বলতে শোনা গেছে—

না দিব না দিব পরাণ আরও দেখি শুনি।

কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। জীবন বিসর্জন দিলে দয়িতের সঙ্গে মিলন তার ঘটবে না, সে তুলনায় যদি নদ্যার ঠাকুরের জীবিত অবস্থায় সন্ধান লাভ সম্ভব হয়, তবে মহুয়ার পরম প্রাপ্তি লাভের সম্ভাবনা। এই দোলাচলচিত্ততা আসলে মহুয়ার নদ্যার ঠাকুরের প্রতি তার অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগেরই পরিচয়বাহী। যাইহোক, শেষপর্যন্ত মহুয়া নদ্যার ঠাকুরের সন্ধান পেয়েছে।

নদ্যার ঠাকুর একদা খেতে বসে এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হল—

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা।
বাদ্যার ছেরি মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা।।

সংস্কারের বশবর্তী হয়ে মহুয়া কাল এবং সাদা পাঠা মানত করেছে যাতে তার প্রাণাধিক প্রিয় দয়িতের অশুভ কিছু না হয়। গলায় বেঁধা কাঁটা যেন তার জীবনকে বিপন্ন করতে না পারে। প্রেমের এও এক ধরনের অভিব্যক্তি। দয়িতের সামান্য ব্যাপারেই উদ্বিগ্ন হয়েছে সে।

'চন্দ্রাবতী' পালাতেও আমরা দেখি জয়ানন্দ প্রেমের আবেদন জানিয়ে চন্দ্রাবতীকে পত্র প্রেরণ করলে সেই পত্র পাঠে চন্দ্রাবতীর নিম্নোক্ত রূপ প্রতিক্রিয়া—

পত্র পইড়ে চন্দ্রাবতীর চক্ষে বয়ে পানি।

যা অভাবনীয় অথচ অভিলষিত এমনতর ঘটনার সংস্পর্শে মানুষ ভাবপ্রবণ না হয়ে পারে না। চন্দ্রাবতীর জীবনে এই প্রথম প্রেমের আবেদন। এ আবেদনে তারও অন্তরের সায় ছিল। তাই তার আনন্দাশ্রু নির্গতি হতে দেখা গেছে। তাছাড়া যে জয়ানন্দকে সে ছোটবেলা থেকে 'প্রাণের দোসর' বলে জ্ঞান করে এসেছে, পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে চন্দ্রাবতীর পক্ষে সেই প্রেমিকের আবেদনে সার্থকভাবে সাড়া দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। এক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তাও থেকে গিয়েছিল। যদি না মিলন সম্ভব হয়, সেই ভাবনারও ছায়াপাত ঘটে থাকবে চন্দ্রাবতীর মানসলোকে। তারও অভিব্যক্তি হতে পারে তার চোখের জল। চন্দ্রাবতী যখন অবহিত হয়েছে তার প্রেমিক জয়ানন্দ যবনীকে বিবাহ করেছে—

না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী।।

মানসিক আঘাত যদি গুরুতর হয়, তখন মানুষ সেই আঘাতে কাঁদতেও ভুলে যায়। হৃদয় হয়ে যায় পাষাণবৎ। জয়ানন্দ যে চন্দ্রাবতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এ ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর। তাই সে হা হুতাশ করেনি, কিংবা জয়ানন্দের বিরুদ্ধে ক্ষোভেও ফেটে পড়েনি। নীরব হয়ে গিয়েছিল। সাময়িকভাবে সে তার বাক্‌শক্তি হারিয়েছিল।

পরবর্তীকালে চন্দ্রাবতীর নানা স্থান থেকেই বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু তার ধনুকভাঙ্গা পণ—

'জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।।'

জীবনের প্রথম প্রেম শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায়, আশাহত চন্দ্রাবতীর বিবাহ তথা দাম্পত্য জীবন সম্পর্কেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। সেইজন্যই তার এমনতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

· নদীতে জয়ানন্দের মৃতদেহ দর্শনে চন্দ্রাবতীর প্রতিক্রিয়া—

আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই যে বাণী।
পাড়েতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী।।

যতই চন্দ্রাবতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকুক, তথাপি তার প্রতি চন্দ্রাবতীর

হৃদয় দৌর্বল্য ছিল অটুট। তাই তার একদা প্রেমিকের করুণ পরিণতিতে সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারেনি, সমাজের ভয় ত ছিলই, তাছাড়া এমন অবিশ্বাস্য আকস্মিক ঘটনায় বিমূঢ় চন্দ্রাবতীকে তাই নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার অন্তরের বেদীমূলে যে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে দেখা গেছে, দেখা গেছে বাক্যহীনা রূপে।

জলের ঘাটে জল ভরতে গিয়ে মলুয়া কদমতলে নিদ্রিত বিনোদকে দেখে ভেবেছে—

বাড়ী নাই ঘররে নাই নাই বাপ মাই।
রাত্রি পোহাইতে কেবা দিব একটুক ঠাঁই।।

অপরিচিত, অদৃষ্টপূর্ব বিনোদের জন্য মলুয়ার এই যে চিন্তা, একি নিছকই কর্তব্যবোধ সঞ্জাত মানবিকতা? পরবর্তী ঘটনায় এবং মলুয়ার আচরণেই প্রমাণিত হয়েছে তা নয়। অপরিচিত যুবকের জন্য তার এই চিন্তাতেই যুবকের প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা সূচিত।

প্রথম প্রেমে পড়লে দেখা যায় উদাসীনতা, অন্যমনস্কতা। মলুয়ার ক্ষেত্রে সেই উদাসীনতা লক্ষ্য করেছে তার ভ্রাতৃবধূরা—

আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।
আইজ যে দেখি ফোটা ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি।।

মলুয়া গিয়েছিল জল ভরতে, কিন্তু মন তার পড়েছিল বিনোদে, তাই জল ভরা হয়ে গিয়েছিল গৌণ ব্যাপার। কলসী অর্দ্ধেক খালি থাকলেও তা তার চোখে পড়েনি।

মলুয়ার সঙ্গে বিনোদের বিবাহের পর মলুয়া যখন পতিগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেছে, তার মা তখন বিলাপ করে বলেছে—

বড় দুঃখু পাইছ মাগো থাক্যা আমার বাড়ী।
এই জন্মের লাগ্যা যাইবা অভাগী মায় ছাড়ি।।
ভালা কইরা থাক্য মাও শ্বশুরের ঘরে।
পাড়া পড়শি যাতে মন্দ না কহিতে পারে।।

বিবাহের পর আজন্ম পালিতা কন্যা পরের হয়ে যায়। তাই যতই মলুয়া স্বাচ্ছন্দ্যে তার পিত্রালয়ে লালিতা পালিতা হোক. তথাপি তার জননীর মনে হয়েছে কন্যাকে যথোচিত ভাবে পরিচর্যা করা হয়নি। একটা অহেতুক অপরাধবোধ কাজ করেছে তার মনে। গোত্রান্তরিত কন্যার সঙ্গে পিত্রালয়ের পূর্বেকার সম্পর্ক আর থাকে না, তাই যেন কন্যাকে চিরকালের মত হারানোর মনোবেদনা এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে মায়ের প্রাণ তো, তাই স্নেহের পুত্তলি যেন প্রতিবেশীদের দ্বারা নিন্দিত না হয়, সেজন্যও প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়ে দিয়েছে। প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের বিরূপ সমালোচনা যদি কানে আসে, তবে অন্যের মনে যে প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করুক, মায়ের প্রাণ তাতে সর্বাধিক আহত হয়।

সংসারে মাতা ও সন্তানের সম্পর্কই যে অতুলনীয়। তারও পরিচয় এখানে বিধৃত।

অবর্ণনীয় দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে বিনোদ মলুয়াকে পিত্রালয়ে যাবার পরামর্শ দিলে মলুয়া বলেছে :

বাপের বাড়ীর যত সুখ বিয়া হইতেই গেল।।

*     *     *

শাক ভাত খাই যদি গাছতলায় থাকি।
দিনের শেষে দেখলে মুখ হইবাম সুখি।।

বাঙ্গালী সমাজের এ এক বড় বিচিত্র রীতি। বিবাহের পর কন্যার আর যেন পিত্রালয়ের ওপর সেই পূর্বের অধিকার থাকে না। তখন সে পিত্রালয়ে নিছক অতিথিরূপে পরিগণিত হয়। কন্যাও অনূঢ়া অবস্থার অধিকার ফলাতে পারে না। তাই মলুয়া বলেছে যত দুঃখেই সে থাকুক, তথাপি শ্বশুরালয়ই তার প্রকৃত আশ্রয়স্থল, কোনো অবস্থাতেই সে পিত্রালয়ে যাবে না। সাধ্বী স্ত্রীর কাছে পতিই সব। দুঃখের দিনে পতিকে ত্যাগ করে যদি স্ত্রী পিত্রালয়ের সুখভোগে চলে যায়, তবে সে স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী এবং সহকর্মিনী হল কি ভাবে? তাই বিপদের দিনে মলুয়া কোনমতেই পিত্রালয়ে যেতে সম্মত হয়নি। শত দুঃখ ও অভাব সত্ত্বেও সে স্বামী সন্নিধানেই অবস্থান করতে চেয়েছে।

মলুয়ার পাঁচ পাঁচটি ভাই তাদের আদরের বোনকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু মলুয়া নারাজ। তার বক্তব্য—

পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে দেখ্যা তারার মুখ।
কিছু ত মায়ের তবু ঠাণ্ডা রইবে বুক।।
বুড়ো শাশুড়ী আমার পুত্র নাই ঘরে।
কি দেখ্যা মায়ের কও দুঃখু পাশরে।।

মলুয়ার স্বামী গৃহত্যাগী হয়েছে, গৃহে মলুয়া আর তার বৃদ্ধা শাশুড়ী। বেচারী বৃদ্ধা শাশুড়ী ত এমনিতেই পুত্র শোকাতুরা। তদুপরি কন্যাপ্রতিম মলুয়া যদি এই সময়ে পিত্রালয়ে যায়, তার ত দেখার পর্যন্ত কোন লোক থাকবে না। বিপদের দিনে মলুয়াই বৃদ্ধাব একমাত্র আশ্রয়। তাছাড়া পতির অবর্তমানে তার বৃদ্ধা শাশুড়ীর পরিচর্যার দায়িত্ব যে পুত্রবধূতেই বর্তায়। পাতিব্রত্যেরই এ এক অবশ্য আচরণীয় কর্তব্য। মলুয়া সেই কর্তব্যবোধেরই পরিচয় দিয়েছে।

প্রতিটি জননীই চায় তার পুত্র বিবাহাদি করে সংসারী হোক, সুখী দাম্পত্য জীবনের অধিকারী হোক। তাই বিনোদ মলুয়াকে বিবাহ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে পুত্রবধূকে লাভ করে বিনোদ-জননী খুবই প্রীত হয়েছে। লোককবি বর্ণনা করেছেন—

বাড়ীর শোভা বাগ বাগিচা ঘরের শোভা বেড়া।
কুলের শোভা বউ—শাশুড়ীর বুক জুড়া।
বউ পাইয়া বিনোদের মা পরম সুখী হইল।
ঘর গিরস্থি যত সব যতনে পাতিল।।

বাংলা ছড়ায় পুত্রবধূ শাশুড়ীর বিষতিক্ত সম্পর্কই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র লক্ষিত হয়েছে গীতিকায়। যে শাশুড়ীর গৃহে পুত্র ব্যতীত দ্বিতীয়

কোন সঙ্গী নেই, কন্যারা ইতিমধ্যেই পাত্রস্থ, সেই শাশুড়ীর কাছে পুত্রবধূ কন্যারূপেই পরিগণিতা হয়। শাশুড়ী একজন সঙ্গী পায়। তাই বিনোদ-জননীর মলুয়াকে লাভ করে অত আত্মপ্রসাদ, এতখানি পরিতৃপ্তি।

কবি কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যে বলেছেন মেঘের উদয় হলে নিতান্ত সুখী ব্যক্তিরও চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—

'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যথ্যথা বৃত্তি চেতঃ'।

এরই প্রতিফলন দেখি 'মলুয়া'তে। বর্ষা সমাগমে পতি বিরহে কাতরা মলুয়ার বর্ণনায় লোক কবি বলেছেন :

আইল আষাঢ় মাস মেঘের বয় ধারা।
সোয়ামীর চান্দ মুখ না পায় পাশরা।।
মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ারা ডাকে রইয়া।
সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া।।

একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বামীর বিপদাশঙ্কা, অপরদিকে বর্ষার দিনে স্বামীর উষ্ণ সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ লাভে বঞ্চিতা মলুয়ার মনোবেদনা—দুইয়েরই পরিপ্রেক্ষিতে লোককবির এ বর্ণনা তাঁর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচায়ক নিঃসন্দেহে।

ষড়যন্ত্রের অন্যতম অঙ্গস্বরূপ কমলার মাতুলের পত্র আসে তার মাতুলানীর কাছে। কমলা অভিযুক্ত হয় চরিত্রহীনা রূপে। পত্রে তার মাতুল মাতুলানীকে নির্দেশ দিয়েছে আশ্রিতা কমলাকে গৃহ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। মাতুল প্রেরিত পত্রটি পাঠ করে কমলা কি করল—

একবার না গেল কন্যা আপন মায়ের কাছে।।
একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে।
একবার না চাইল কন্যা মায়ের মুখপানে।।

কমলা পত্রপাঠ করেই স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগী হবার সংকল্প করেছিল। মাতুলালয় ত্যাগে করে যাবার পূর্বে সে স্নেহময়ী জননীকে শেষবারের মত দর্শন করেনি। আর বুকভরা অভিমান নিয়ে সে মাতুলানীর সদনেও উপস্থিত হয়নি। জননীর সঙ্গে শেষ দেখা করতে গেলে সে নিজেকে হয়ত সংযত রাখতে পারত না। মাতুলানীকে সে তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ যে মিথ্যা সে কথা বলতেও উপস্থিত হয়নি. তার মর্যাদাবোধে বেধে থাকবে।

কমলা প্রদীপকুমারের গৃহে স্থান লাভ করেছে। প্রদীপকুমারের সঙ্গে তার বিবাহ হবার কথা। এখানেই শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে মনসাপূজার আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে তার বারংবার মনে পড়েছে পিত্রালয়ের কথা—

কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়ানা সংক্রান্তে রাজা মনসারে পূজে।।
বাড়ীর কথা মনে পড়ে পড়ে মায়ের কথা।

শক্তিশেলে হানি বুকে নিদারুণ ব্যথা।
বাপের বাড়ীর মণ্ডপ শূণ্যি কেবা পূজা করে।
অভাগিনী মাও মোর কান্দ্যা কান্দ্যা ফিরে।।

মনসাপূজার মত দুর্গা পূজার সময়েও কমলার একই প্রতিক্রিয়া হয়েছে—

ভাদ্র গেছে আশ্বিন আইল দুর্গাপূজা দেশে।
আনন্দে সায়রে ভাস্যা বসুমাতা হাসে।।
বাপের মণ্ডপ খালি রইল কেবা পূজা করে।
বাপ ভাই মুক্ত হোক দুর্গা মায়ের বরে।।

দুটি'ই 'Laws of Association'-এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে গীতিকার রচয়িতারা আধুনিক লেখকদের মত মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের ব্যাপারে পুঁথিগত বিদ্যার আশ্রয় নেননি, তাঁদের সে অধিকার ছিল না। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক আচরণের বিবরণ দিয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রের, তাতে তাঁদের বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় মেলে। আর এইসব মনস্তাত্ত্বিক আচরণের বিবরণে একদিকে চরিত্রগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বৈচিত্র্য সৃষ্টির কারণে গীতিকাগুলির উৎকর্ষও বৃদ্ধি পেয়েছে।

## একাদশ অধ্যায়

# গীতিকায় প্রকৃতিচিত্র

প্রকৃতিকে কাব্যে সাহিত্যে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহারিক উদ্দেশ্যকে আমরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি—ক) বৈচিত্র্য সৃষ্টি, খ) প্রেক্ষিতরূপে প্রকৃতির ব্যবহার, গ) মানব চরিত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গ।

আধুনিক দৃষ্টিতে শেষোক্ত প্রকৃতি চিত্রণের গুরুত্বই সর্বাধিক। আমরা গীতিকায় প্রকৃতি কতখানি ব্যবহৃত হয়েছে এবং কি উদ্দেশ্যে সেই আলোচনায় প্রয়াস পাবো। তৎপূর্বে স্বীকার করে নেওয়া ভাল প্রকৃতি চিত্রণেও লোককবিরা সংযম রক্ষা করেছেন। প্রকৃতি বর্ণনার সুযোগ পেয়েও তাঁরা তার অপব্যবহার করেননি।

**মহুয়া :**

মহুয়া পালায় ভিলেনরূপে উপস্থাপিত হুমরা, যে ভয়ঙ্কর অরণ্যে সে বাস করতো তার বিস্তারিত বিবরণ দান করা থেকে বিরত থেকে কবি শুধু এইটুকু হদিস দিয়েছিলেন যে, সাংঘাতিক সব হিংস্র প্রাণীর বাস এখানে। সেই অরণ্যে চন্দ্র সূর্য দৃষ্ট হয় না, সে অরণ্য গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সাধুর কবল থেকে মুক্ত মহুয়া সাধু ও তার লোকজন দ্বারা নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত নদের চাঁদের সন্ধানে যে অরণ্যে উপস্থিত হয়েছে কবি সেই অরণ্যের বর্ণনায় জানিয়েছেন—

> বড় বড় বাঘ ভালুক দূরে সইরা যায়।
>
> *　　　*　　　*
>
> অকাল মাকাল অজগইরা হরিণ ধইরা খায়।

বলাবাহুল্য এক্ষেত্রেও লোককবি বর্ণনাকে বিস্তারিত করতে পারতেন কিন্তু তা করেন নি। কেননা কবির উদ্দেশ্য ছিল সন্ন্যাসীর দ্বারা মৃতপ্রায় নদের চাঁদের জীবন রক্ষিত হওয়ার পর মহুয়ার যৌবন সৌন্দর্যে সন্ন্যাসীর আকৃষ্ট হওয়া এবং তার কাছে তার যৌবন যাচঞা করা, অসুস্থ নদের চাঁদকে নিয়ে মহুয়ার নিরাপদ স্থানে গমন ইত্যাদি বর্ণনা।

**মলুয়া :**

অসময়ে চাঁদ বিনোদ কুড়া শিকার করতে গেছে। লোককবি ইচ্ছা করলে এই প্রসঙ্গে অরণ্য প্রকৃতির বিবরণ বিস্তৃত পরিসরে দান করতে পারতেন। কিন্তু অনাবশ্যক বিবেচনায় কবি তা করেন নি। সর্প দংশনে মৃতপ্রায় চাঁদ বিনোদকে নিয়ে মলুয়া গাড়রী ওঝার বাড়ি গেছে জলপথ ধরে। আমরা জানতে পারি যে জলপথটি সাত দিনের, কিন্তু কবি এক্ষেত্রেও অনাবশ্যক বিবেচনায় জলপথের বিবরণ দান করা থেকে বিরত থেকেছেন। আমরা শুধু জেনেছি 'একদিন গেল মলুয়া গাড়রীর বাড়ি'। চাঁদবিনোদ মৃতপ্রায় অবস্থা

প্রাপ্ত সর্বাগ্রে তার চিকিৎসার প্রয়োজন এইকারণে লোককবি প্রকৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে অনাবশ্যক কালক্ষেপ করেন নি।

**কমলা :**

কমলা পালাতে দেখি কমলা তার মাতুলালয় থেকে অনিশ্চয়তার পথে যাত্রা করে বসেছে। শেষপর্যন্ত কমলা হাওরে উপনীত হয়েছে। কবি কমলার বিপদের বর্ণনা দান করেছেন কিন্তু বিরত থেকেছেন হাওরের বর্ণনা থেকে।

**দস্যু কেনারামের পালা :**

কবি দ্বিজ বংশীদাসের জালিয়া হাওরে উপস্থিত হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। জালিয়া হাওরের বর্ণনায় এইটুকুই বলা হয়েছে—

"চারিদিকে বেড়িয়াছে নলে আর খাগরে
মানুষের নাই নামগন্ধ অষ্ট প্রহর জুড়ি।
নল আর খাগড়ে সব রহিয়াছে বেড়ি।।"

কবি এখানেও প্রকৃতির বর্ণনা বিশদ করতে পারতেন, সে অবকাশ তাঁর ছিল কিন্তু তা তিনি করেন নি।

**রূপবতী :**

রূপবতী পালাতে গভীর অরণ্যে রূপবতী এবং তার স্বামী মদন নির্বাসিত হয়েছে। কবির বর্ণনা অনুযায়ী—

"গাও গেরাম নাই কাছে অলছ্ তলছ্ পানি।
বনে ডাকে বাঘ-ভালুক জলে কুম্ভরিণী।।

রূপবতী এবং মদনের বনবাস জীবন অঙ্কনের সূত্রে কবি বিশদে প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করতে পারতেন, সে অবকাশ তাঁর ছিল, কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে আখ্যানের দ্রুত গতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সংক্ষিপ্ততা ধর্ম বজায় রাখার তাগিদে সংযত থেকেছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন--পরিশীলিত সাহিত্যের স্রষ্টারা এইসব ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে বিশাল পটভূমি রূপে উপস্থাপিত করে তার যান্ত্রিক বিবরণ দান করে গেছেন—

"Long and monotonous accounts of mornings and evenings, with a catalogue of flower plants, not omitting the butterflies and the bees sucking honey from them... stereotyped and hackneyed figures of speech, copied from the earlier writers of what is worse, from Sanskrit classics...exhausting all resources of culture and obstructing the course of the narrative by wearisome diversions..." ১
গীতিকার রচয়িতা লোককবিরা কিন্তু সেই দীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন প্রকৃতির বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকে যথার্থই বিরল শিল্পবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন—

"In the course of a narrative of human action, Nature serves the purpose of a background, never made obtrusively prominent..."[২]

আমরা এইবার গীতিকার বিভিন্ন পালা থেকে নির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখে এই বক্তব্যের সমীচীনতার প্রমাণ গ্রহণ করব।

মহুয়া পালার প্রসঙ্গই ধরা যাক। আখ্যানের সূচনাতেই যে প্রকৃতি চিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা হল–

উত্তর‍্যা না গারো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ।
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পরবত।।
হিমানী পরবত পারে তাহারই উত্তর।।
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর।।
চান্দ সরুজ নাই আন্দারিতে ঘেরা।
বাঘ ভালুক বইসে মাইন্‌সের নাই লরাচরা।।

এখানে লক্ষণীয় প্রকৃতির দৃষ্টিগ্রাহ্য তিনটি প্রধান উপাদানের সমাবেশ বর্ণিত হয়েছে। এগুলি হল–হিমানী পর্বত, সপ্তসমুদ্র এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্য প্রদেশ। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে সূচনাতেই কবি এমনতর বিবরণ সন্নিবিষ্ট করলেন কেন। আমরা একটু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলেই বুঝতে পারবো দ্বিবিধ কারণে এই বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। প্রথমত, দূরত্ব বোঝাতে, দ্বিতীয়ত, হুমরা বেদের ভয়ংকর প্রকৃতির পরিচয় দান। প্রথমেই কবি তাঁর পাঠকদের জানিয়ে দিলেন যে, যে কাহিনী তিনি বর্ণনা করতে চলেছেন তার ঘটনাস্থল বহু দূরবর্তী।

চন্দ্রসূর্যালোক বর্জিত অন্ধকারাচ্ছন্ন যে অরণ্য বাঘ ভাল্লুকের কারণে শ্বাপদ সঙ্কুল সেখানে বসবাসকারী হুমরা বেদের প্রকৃতি যে হিংস্র হতে বাধ্য তারও আভাস দিয়েছেন। আমরা মহুয়া পালাতেও তার প্রমাণ পেয়েছি। হুমরা বেদে এক ব্রাহ্মণের ছয় মাসের শিশু কন্যাকে চুরি করেছে, মহুয়া যার নাম। যাকে পালায় আমরা কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে পাই। হুমরার অমানবিক আচরণ প্রমাণিত হয়েছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহুয়া নদের চাঁদকে তার জীবনসঙ্গী রূপে পেতে চেয়েছিল। হুমরার বিরূপতায় এই দুটি তরুণ তরুণীর অর্ধ পরিস্ফুট জীবনে অকারণ সমাপ্তি ঘটেছে।

গভীর নিশীথে মহুয়ার সঙ্গে নদ্যার ঠাকুর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলিত হয়েছে, কবি এর উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছেন এইভাবে–

"ফাল্গুন মাসে চল্যা যাররে চৈত্র মাসে আসে।
সোনার কুইল কু ডাকে বইস্যা গাছে গাছে।।
আগ রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া
মধ্যরাত্রে নদ্যার চান উঠিল জাগিয়া।

*   *   *

আসমানেতে চৈতার বউ ডাকে ঘন ঘন।।"

নদের চাঁদের বাঁশীর সুরে ঘুম ভাঙ্গে মহুয়ার। মিলনেব জন্য যে এক আদর্শ পরিবেশের প্রয়োজন লোককবি তা জানতেন। সময়টি নির্দিষ্ট হয়েছে বসন্তকাল। বৃক্ষে উপবিষ্ট কোকিল তার সুমিষ্ট কুহুতানে সমগ্র পরিবেশকে আনন্দিত করছে। সাইলের ধান পেকে সমগ্র পরিবেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এর উপর আবার চৈতার বৌ পাপিয়া বৌ কথাকও ডাকে আসন্ন মিলনের আদর্শ পরিবেশ রচনা করেছে। চৈতার বৌ যেন এখানে নদের চাঁদের মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাই প্রেমিকাকে অর্থাৎ মহুয়াকে বধূ সম্বোধন করে তাকে বাঙ্ময় হওয়ার প্রার্থনা জানাচ্ছে। জনৈক সমালোচক কোকিলের কণ্ঠনিঃসৃত কু ডাককে অশুভ ইঙ্গিতবহ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন—

"...মহুয়া-নদের চাঁদের প্রণয়াবেগ অকলুষিত, পবিত্র, কিন্তু তা সফল হওয়ার নয়, তারই ইঙ্গিতময় শব্দ হিসেবে সোনার কোকিলের কণ্ঠ থেকে 'কুডাক' উচ্চারিত হয়েছে।"[৩]

আমরা কিন্তু সমালোচকেব বক্তব্যের সঙ্গে একমত ়ই। উদ্ধৃত মন্তব্যে আমরা আরোপিত ব্যাখ্যারই সন্ধান পাচ্ছি। কেননা 'কু' এবং 'ডাক' একত্রে ব্যবহৃত হয়নি, 'কু'কে বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হয় নি। কবি কোকিলের কুহুডাকের সংক্ষিপ্ত রূপের উল্লেখ করেছেন মাত্র।

আকাশের চাঁদ এবং তারার ঔজ্জ্বল্য অন্তর্হিত হবার বিবরণ দিয়েছেন কবি। একদিকে যেমন সময় অতিবাহিত হওয়াকে বোঝান হয়েছে তেমনি অন্যদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের প্রসঙ্গ ব্যঞ্জিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানের পর নদের চাঁদ এবং মহুয়ার পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছে। স্বভাবতঃই তারা আনন্দিত । কবির বর্ণনা—

অন্ধকাইরা রাইতের নিশি আরে ভালা আসমানে জ্বলে তারা।

*   *   *

নদীর পারে হিজল গাছ পাতার বিছানা।
নদীয়ার ঠাকুর শুইয়া আছে হইয়া মইতানা।।

হুমরার নির্দেশে মহুয়া ছুরি নিয়ে চলেছে নিজ হাতে প্রেমিকের বক্ষে আঘাত হানতে। লোককবি এরই বর্ণনায় বলেছেন—

ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা।।

লোককবি প্রদত্ত সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনামণ্ডিত প্রকৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্যটি করেছেন সেটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—'In Mahuya, before going on to describe the despair of the heroine who has been commanded to kill her

lover, the poet inserts a single verse : stars disappeared from the sky, the moon is not to be seen[8] (xv. 23.)

নদের চাঁদকে নিয়ে মহুয়া দেশত্যাগী হয়েছে। বাহন বলতে ঘোড়া। চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে তারা পালিয়েছে। সময় গভীর রাত্রিকাল। এই সময়ের প্রকৃতির বর্ণনায় বলা হয়েছে—

'আবে করে ঝিলিমিলি নদীর কূলে দিয়া।'

অসাধারণ কাব্যিক প্রকাশ এখানে লক্ষ্য করা গেছে। কবি পাতলা মেঘের আস্তরণকে অভ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাতলা মেঘের ওপর চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত হয়ে ঝিকমিক করছিল। এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে—'নিছক সৌন্দর্যময় বর্ণনার জন্যই এমনতর পংক্তির অবতারণা, ভাবতে মন চায় না। বরং বাস্তব প্রয়োজনেই এবংবিধ পংক্তির সংযোজন ঘটিয়েছেন কবি, এমন ভাবা যেতে পারে। মেঘমুক্ত আকাশ যদি হত, চন্দ্রালোকে যদি ধরণী আলোকোজ্জ্বল হয়ে থাকত, তবে পলায়নরত প্রেমিক-প্রেমিকার হুমরার কাছে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। তাই মেঘের আস্তরণে চন্দ্রালোকের দীপ্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে কবি প্রেমিক-প্রেমিকার আত্মগোপনের, পলায়নের আদর্শ পরিবেশ রচনা করে দিয়েছেন'। নদের চাঁদ এবং মহুয়া কিছুদূর যাওয়ার পর পৌঁচেছে এক খরস্রোতা নদীর তীরে—

বিস্তার পাহাড়িয়া নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি।
এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিবাম পাড়ি।।

এখানে লক্ষ্য করার, কবি নদী যে তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ এবং তা প্রকৃতিতে দুরতিক্রমণীয় এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে যেন পলায়নপর দুটি তরুণ তরুণীর আত্মগোপনের পথও দুরতিক্রমণীয় এমন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। এই নদীর বুকেই দেখা দিয়েছে সাধুর নৌকা তাতে উভয়েই আশ্রয় পেয়েছে কিন্তু শেষপর্যন্ত এই নৌকা থেকেই নদের চাঁদ নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং কামুক সাধু অসহায়া মহুয়ার সতীত্ব লুণ্ঠন করতে গিয়েছিল, কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে মহুয়া অরণ্যে উপনীত হয়েছে এবং নদ্যার ঠাকুরের সন্ধানে নেমেছে। বিক্ষিপ্তভাবে কবি কিছু কিছু যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে অরণ্যের মোটামুটি একটি গ্রহণযোগ্য ধারণা আমরা করে নিতে পারি। যেমন—

ক) ডালেতে বসিয়া আছে ময়ূর-ময়ূরী।
খ) বড় বড় বাঘ ভালুক দূরে সইর‍্যা যায়।
গ) আকাল মাকাল অজগইরা হরিণ ধইর‍্যা খায়।

এই অরণ্য মধ্যে একাকিনী মহুয়া প্রেমিকেব সন্ধানরতা। স্বভাবতই তার অসহায়ত্ব আমাদের নজর কাড়ে। সমগ্র পালা মধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও মহুয়া এবং নদের চাঁদ সুখী দাম্পত্যজীবন আস্বাদন করেছে। কবি এদের এই ক্ষণস্থায়ী দাম্পত্য জীবনের অনুকূল পরিবেশ আমাদের উপহার দিয়েছেন -

সামনে পাহাড়িয়া নদী সাঁতার দিয়া যায়।

বনের কোহিল পক্ষী ডালে বইসা গায়।।

* * *

সামনে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি।

* * *

চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল ডালে পাকা ফল।।

—আমরা এইবার মলুয়া পালার প্রসঙ্গে আসি। প্লাবন এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল চাঁদ বিনোদের গ্রাম। নিরুপায় চাঁদ বিনোদ উপার্জনের জন্য গৃহত্যাগী হল। জল প্লাবন এবং দুর্ভিক্ষের বিস্তারিত চিত্র কবি উপস্থিত করতে পারতেন। কিন্তু সেই প্রলোভন থেকে তিনি নিজেকে সংযত রেখেছেন। অগ্রহায়ণ মাসে সালীধান ফলার কথা। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেই সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেল। কবি বর্ণনা করেছেন—

মেঘ ডাকে গুরু গুরু ডাক্যা তুলে পানি।
আশমান ছাইল কালা মেঘে দেওয়ায় ডাকে রইয়া।

* * *

আইল আইশ্‌নারে পানি উভে করল তল।
ক্ষেত কিশ্যি ডুবাইয়া দিল না রইল সম্বল।।

* * *

আশ্বিন্যা পানিতে দেখে মাঠে নাইক ধান।

চাঁদ বিনোদকে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নামতে হল, অনিশ্চযতার পথের পথিক হল সে। কবি বিপর্যস্ত চাঁদ বিনোদের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বললেন—

আগরাঙ্গ্যা সাইলের খেত পাক্যা ভূমে পড়ে।

কি অসাধারণ বৈপরীত্য। চাঁদ বিনোদের নিজের গ্রামে ক্ষেত কৃষি জলের তলে। আর এই বর্ণনা অনুসারে সালিধানের অগ্রভাগ সুপক্ক হয়ে রাঙা বর্ণ ধারণ করে ভূমিতে আনত। এই বিপরীত চিত্র উপস্থিত করে কবি একঢিলে দুই পাখী মেরেছেন। চাঁদ বিনোদের স্থানান্তরে গমন সুস্পষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে প্রকৃতির প্রসন্ন চিত্রের মাধ্যমে সহোদরার সাক্ষাৎলাভে গমনরত চাঁদ বিনোদের মানসিক প্রসন্নতাও ব্যঞ্জিত হয়েছে। চাঁদ বিনোদ গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর পুত্রের অনুপস্থিতিতে মাতৃ হৃদয় বর্ণনায় কবি বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির বর্ণনার সাহায্য নিয়েছেন—

কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে।
জমিনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে।।
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিল্কি ঠাণ্ডা পড়ে।

* * *

আইল আষাঢ় মাস জলের বাড়ে ফেনা।
কুড়ার ডাকেতে শুনে বর্ষার নমুনা।।

এই প্রেক্ষিতে হতভাগিনী জননী হৃদয় পুত্রের কারণে দগ্ধ হয়েছে।

পূর্বরাগ পর্যায়ে আড়ালিয়া গ্রামের বিবরণ দিয়েছেন কবি—

গাঁয়ের পাছে আন্ধ্যাপুখুর ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা।
চাইর দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া।।
*　　*　　*
ঘাটেতে কদম গাছে ফুট্যা রইছে ফুল।
*　　*　　*
সন্ধ্যা মিলাইয়া যায় রবি পশ্চিম পাটে।।

এটি গ্রামবাংলার অতিপরিচিত একটি সাধারণ চিত্র। এই প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটেই মলুয়া নিদ্রাচ্ছন্ন চাঁদ বিনোদকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। সকলের দৃষ্টির অগোচরে মলুয়া যেমন চাঁদ বিনোদকে বেশ অনেক সময় ধরে দেখার সুযোগ পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত চাঁদ বিনোদ নিশ্চিন্তে ঘুমোবার একটি আশ্রয় পেয়েছে।

কবি প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে চাঁদ বিনোদের কারণে মলুয়াকে চিন্তান্বিত করেছেন। চাঁদ বিনোদের প্রতি তার প্রেমবোধ জাগ্রত হওয়ার আভাস দিয়েছেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, "চান্দ বিনোদকে পুকুরঘাটে প্রত্যক্ষ করে মলুয়ার যুবতী মনে যে পূর্বরাগ সঞ্চারিত হয়, আষাঢ় মাসের বর্ষণসিক্ত ধরণী ও কানায় কানায় পূর্ণ নদীর উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটানো হয়। মেঘের ডাকের মধ্যে মলুয়া তার প্রিয়তমের কণ্ঠধ্বনি যেন শুনতে পায়।"[৫]

যে চাঁদ বিনোদের জন্য মলুয়া তার অসাধারণ প্রেমের নিদর্শন রেখেছে, সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে সে যখন চাঁদ বিনোদের সান্নিধ্য লাভ টুকু থেকেও বঞ্চিত হয়েছে তখন মহাশূন্যতার শিকার হতভাগিনী মলুয়া আত্মহননের পথ নিয়েছে। মলুয়ার এই ট্রাজিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃতির রূপচিত্র কবি উপহার দিয়েছেন।—

পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া।।

কবি এখানে দাম্পত্য জীবন আস্বাদনে ব্যর্থ মলুয়ার জীবনের শূন্যতাকে কূলহীন সাগরের রূপকে উপস্থিত করেছেন। আর প্রকৃতির যে বিক্ষুব্ধতা তা যেন মলুয়ার প্রতি যে অবিচার হল তারই প্রতিবাদ।

কমলা পালায় আমরা একটি বারোমাসি পাই। এই বারোমাসিতেও স্বাভাবিক নিয়মে কিছু কিছু প্রকৃতি চিত্রণ এসেছে। যেমন বসন্তের বর্ণনা দান প্রসঙ্গে কমলা জানিয়েছে—

আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার।
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার।।
ধনু হাতে লইয়া মদন পুষ্পেতে লুকায়।
*　　*　　*

ভ্রমরা কোকিল কুঞ্জে গুঞ্জরি বেড়ায়।
সোনার খঞ্জন আসি আঙ্গিন জুড়ায়।।

কমলার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি এই কমলাই তার বাবা ও মাকে বিবাহের প্রসঙ্গে আলাপ করতে শুনেছে। ঋতু শ্রেষ্ঠ বসন্ত যে বিবাহের মত বিষয় আলোচনার উপযুক্ত সময় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মাত্র দুটি পংক্তিতে বৈশাখের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে—

"বৈশাখ মাসেতে গাছ আমের কড়ি।
পুষ্প ফুটে পুষ্পডালে ভ্রমর গুঞ্জরি।"

আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে কমলার বাবা এবং ভাই দুজনেই বিদেশে বন্দীদশা গ্রস্ত। অতএব এই অবস্থায় কমলার পক্ষে প্রকৃতির বিস্তারিত বিবরণ দান সম্ভব ছিল না, যদি দিত তবে তা দৃষ্টিকটু ঠেকত।

মাধবের সঙ্গে সোনাই-এর প্রথম সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে দিয়েছেন কবি—

"গাঙ্গের পারে কেওয়া পুষ্প গন্ধেতে হ'ল।"

আবার সুনাই-এর ট্রাজিক পরিণতির বিবরণ দিতে গিয়েও কবি আশানুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—

"নিশি রাইত মেঘে আন্ধা আসমানে নাই তারা।"

সুনাই গাগরি নিয়ে নদীতে গেছে জল ভরতে। পরনে তাব নীলাম্বরী শাড়ি। এ শাড়ি তার মাতুল তাকে কিনে দিয়েছে। স্বভাবতই সুনাই খুব আনন্দিত। তার সেই মানসিক আনন্দের প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবি প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে—

"নদীর পারে কেওয়া বনরে ফুটলো কেওয়া ফুল।
তার গন্ধে উইরা করে ভমরারা রুল।"

ঘটক এসেছে সুনাই-এর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। এই প্রসঙ্গে কবি প্রকৃতির প্রত্যাশিত চিত্র উপহাব দিয়েছেন—

"ঝইরা পড়ছে সোনার বকুল গো ঐনা গাছের তলা।"

যে পথ দিয়ে প্রেমিকের উদ্দেশে সন্ধ্যাকালে যাতায়াত সেই পথের সৌন্দর্যও কম আকর্ষণীয় নয়।

"এই না বিরক্ষে সোনার ফুল গো ফুটে বারমাস।।
বারো মাসের বার ফুলরে ফুট্যা থাকে ডালে।"

এইবার 'চন্দ্রাবতী' পালার প্রসঙ্গ। চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের প্রতি প্রেমাসক্ত বোঝাতে কতকগুলি ফুলের আশ্রয় নিয়েছে। আসলে কুসুমগুলির উল্লেখ তত প্রয়োজনীয় ছিল না। চন্দ্রাবতীর মানসিকতাকে উদ্‌ঘাটিত করতেই কবি কুসুম নিচয়ের উল্লেখ করেছেন।

(ক) "বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে মালতী বকুল।

আঞ্চল ভরিয়া তুলব তোমার মালার ফুল।।"

(খ) "বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে মল্লিকা-মালতী
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার মতন পতি।"

ঘটক উপস্থিত হয়েছে চন্দ্রাবতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। শীত যেতে বসেছে। বসন্তের আর বিলম্ব নেই। এই সময়ের বিবরণ দিয়ে ঘটক জানিয়েছে—

পশ্চিম মাস বাতাসে দেখ শীতে লাগে কাটা।
এখনে ধইরাছে দেখ মধ্যি গাঙ্গে ভাটা।।
আম গাছে নয়া পাতা ধরিয়াছে বউল।।

বর্ণিত হয়েছে আমগাছে নতুন পাতা ধরেছে এবং গাছে বোলও ধরেছে। চন্দ্রাবতীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হতে চলেছে তারই ইঙ্গিতবহ। বিবাহের আয়োজনের বর্ণনাতেও প্রকৃতি গুরুত্ব পেয়েছে। স্বল্প পরিসবে হলেও—

"দক্ষিণের হাওয়া বয় কুকিল করে রা
আমের বউলে বস্যা গুঞ্জে ভ্রমরা।।
নয়া পাতা যত গাছে নয়া লতা ঘিরে।।"

"কঙ্ক ও লীলা" পালাতে গর্গ গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে সর্বত্র অশুভের ছায়াপাত লক্ষ করেছেন। আর এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্ণিত হয়েছে—

"মালতী মল্লিকা পড়ে ঝরিয়া ভূতলে।
ভ্রমরা উড়িয়া যায় নাহি বসে ফুলে।।
নাহি খায় পুষ্প মধু না দেয় ঝঙ্কার।।"

এরপরই গর্গ গৃহে উপস্থিত হয়ে সুরভির মৃত্যু ঘটনার সংস্পর্শে এসেছে। "কঙ্ক ও লীলায়" ষান্মাসিকী প্রদত্ত হয়েছে এবং তাতে লীলার মানসিক প্রতিক্রিয়া স্থান পেয়েছে। এ ষান্মাষিকীর সূচনা হয়েছে ফাল্গুন দিয়ে। আর সমাপ্তি টানা হয়েছে শ্রাবণে। বারমাসিব পরিবর্তে ষান্মাসিকী সন্নিবিষ্ট হলেও আকৃতিতে দীর্ঘ। মোট ৯০টি পংক্তিতে তা বিধৃত।' আমরা কিছু কিছু পরিচয় নেব। যেমন ফাল্গুন মাসের পরিচয়ে বলা হয়েছে—

দারুণ ফাল্গুন মাস গাছে নতুন ফুল।
মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী বকুল।
মধু লোভে যাওরে উড়ে ভ্রমর-ভ্রমরী।।

চৈত্র মাসের বিবরণে দেখি—

গাছে গাছে সোনার পাতা ফুটে সোনার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জরী উঠে ভ্রমরার রোল।।
ডালে বসে কোকিল ডাকে পুষ্পেতে ভ্রমর।

নববর্ষের বর্ণনা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী স্বতঃস্ফূর্ত।—

নতুন বৎসর আইল ধরি নব সাজ।

কুঞ্জে ফুটে রক্তজবা আর গন্ধরাজ।।
গাছে ধরে নবপত্র নবীন মুকুল।
চারিদিকে শুনি মধুমক্ষিকার বোল।।

বিচ্ছেদ বেদনার সঙ্গে বর্ষার গভীর সম্পর্ক। এই কারণে বারমাসিতে বর্ষাঋতুর রাজকীয় আধিপত্য। "কঙ্ক এবং লীলা" পালাতেও দেখি বর্ষা বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপিত। আষাঢ় মাসের প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে।।
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরুলতা উঠিল নাচিয়া।।
শুকনা নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।

শ্রাবণ মাসের ি[illegible]ণ তুলনামূলকভাবে কিছু অধিক গুরুত্বপূর্ণ :

[illegible] আসিল সাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা।।
জলেতে কমল ফুটে আর নদী কূল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল।।
দিন রাত ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি।।

অতএব গীতিকাগুলিতে প্রকৃতির বর্ণনা স্থান পেয়েছে নিছক বৈচিত্র্য সৃষ্টির কারণে নয় কিংবা কোন ঘটনার পটভূমিরূপে নয়, স্থান পেয়েছে চরিত্র বিশেষের আচরণের পূর্বাভাস দান প্রসঙ্গে। তবে একথা মানতেই হবে যে যেখানে প্রকৃতি নিছক পটভূমিরূপে চিত্রিত সেখানে যেন গতানুগতিকতার ছাপ লক্ষিত হয়। মূলতঃ গীতিকাগুলি অঞ্চলবিশেষে রচিত। তাই কবিরা একই অঞ্চলবিশেষের। কাজেই অভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। এইজন্যই সম্ভবতঃ নিছক প্রকৃতির বর্ণনায় কবির শক্তি অপব্যয় করেননি। কেউ কেউ মনে করেন যে পাঠকবর্গের কাছে প্রকৃতির বর্ণনা উপস্থাপিত হবে, সেই প্রকৃতির সঙ্গে তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ যোগ। তাই সেই বিবরণে লোক কবিরা সংগত কারণেই সংযত—

—"The folk-listeners prefer the extra-ordinary to the well-known, and for the village folk, Nature as such is a part of their every-day life."[৬]

## দ্বাদশ অধ্যায়

# বাংলা গীতিকায় প্রতিবাদী মানসিকতা

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গীতিকার অনন্যতা মূলত: মানবিকতার উজ্জ্বল উপস্থিতির কারণে। পদাবলী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য কিংবা মঙ্গলকাব্যগুলিতে যখন কবিরা বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত অথবা তাঁদের রচনাকে দৈব নির্ভর করে তুলেছিলেন, প্রশ্রয় দিয়েছিলেন অলৌকিকত্বকে, রক্ত মাংসের মানুষ যেখানে হয়েছিল অবহেলিত, সেখানে গীতিকাসাহিত্যে রক্তমাংসের মানুষের রাজকীয় আধিপত্য মিলবে।

আমরা জানি জড় জগতের ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। নিউটনের তত্ত্ব আমাদের সেই সত্যকেই জানায়। কিন্তু এই তত্ত্ব কি জীব জগতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়? বিশেষত মানুষের ক্ষেত্রে, যে মানুষ অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন। আদর্শ সমাজের স্বপ্ন আমরা দেখে এসেছি, দেখিয়েছি কিন্তু আজ পর্যন্ত একে বাস্তবায়িত করে তোলা সম্ভব হয়নি। শোষণ, পীড়ন অসাম্যের উপস্থিতি আজও সমাজে রয়ে গেছে। সবল দুর্বলকে অত্যাচারিত হতে বাধ্য করে, বিত্তবান তার বিত্তের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে চলে, সাধারণ মানুষ তার ন্যূনতম অধিকার লাভে বঞ্চিত হয়। শোষক শোষণের রোলার চালিয়েই যায়, দুর্বল অসহায় মানুষ এসব কিছুকে তার ভাগ্যের লিখন বলে সান্ত্বনা লাভে সচেষ্ট হয়। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমাকে অতিক্রম করে প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে সকলে না হোক অনেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে পারে না। গীতিকায় আমরা নীরব নয়, সোচ্চার প্রতিবাদের প্রসঙ্গেই আলোচনা করব।

'মহুয়া' পালায় হুমরা বেদে ছ' মাসের শিশু কন্যা মহুয়াকে চুরি করেছিল। ব্রাহ্মণ কন্যা হওয়া সত্ত্বেও বেদের কন্যারূপে সে প্রতিপালিত হয় এবং সেই মত সামাজিক পরিচিতি লাভ করে। নদের চাঁদের সঙ্গে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় কিন্তু বাধ সাধে হুমরাবেদে। ষোড়শী কন্যা মহুয়া পতি নির্বাচনের প্রসঙ্গে সোচ্চারে হুমরাবেদেকে জানিয়ে দিয়েছে—

> তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া।।
> আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
> তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জ্যোনি যেমন জ্বলে।।

এক্ষেত্রে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর খুবই উচ্চগ্রামে বেধেছিল মহুয়া, কেননা তার কাছে পতি নির্বাচনের প্রসঙ্গটি ছেলেখেলা ছিল না, ছিল জীবন মরণের প্রশ্ন। আর এতেই নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে হুমরাবেদের প্রস্তাবিত পাত্র। যেখানে নদের চাঁদ চন্দ্র সূর্যের মত দেদীপ্যমান, কাঁচা সোনার মত যার দীপ্তি তার কাছে সুজন জোনাকি পোকা।

মহুয়াকে আমরা আর একবার প্রতিবাদে বাঙ্ময় হতে দেখেছি একেবারে তার অন্তিম

সময়ে। আত্মঘাতিনী হবার পূর্বে হুমরাকে অভিযুক্ত করে মহুয়া বলেছে—

'শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায়।।
ছুট কালে মা-বাপের কুল শুন্য করি।
কার কুলের ধন তোমবা কইরে ছিলে চুরি।।
জন্মিয়া না দেখিলাম কভু বাপ আর মায়।'

মহুয়ার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সমগ্র পালায় দুবার সোচ্চার হয়ে দেখা দিয়েছে। এ দুবারই নিতান্ত নিরুপায় হয়ে প্রতিবাদে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল মহুয়া। একবার জীবন সঙ্গী নির্বাচনের প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়বার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যে অভিযোগ সে এতদিন হুমরাবেদেব বিরুদ্ধে করে উঠতে পারেনি এখন সে দিব্বি তা করে বসেছে। অকুতো ভয়ে, কেননা পরমুহূর্তে সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে।

'মলুয়া' পালায় কামুক কাজী মলুয়ার যৌবন সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে পাবার আশায় কুটনিকে নিযুক্ত করেছিল। কুটনি মলুয়ার কাছে কাজীর হয়ে দৌত্য করে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। কাজীকে বিবাহ করলে মলুয়া কি পরিমাণে লাভ করবে তা জানায়, জানায় তার কাঁখের কলসি সোনাতে বাধিয়ে দেবে, নাকের বেসর হীরায় গড়িয়ে দেবে, গলায় গেঁথে দেবে মোহরের থান। শাশুড়ীহীনা গৃহে স্বামীশূন্য অবস্থায় একাকিনী মলুয়া ফুঁসে উঠেছে ; বলেছে তার গৃহে স্বামী থাকলে পক্ককেশযুক্ত শিরে সে ঝাঁটা মারত। সে আরও বলেছে—

'ফুল বেচ্যা খাইছ তুমি বয়সের কালে।
সেই মত দেখ বুঝি নাগরিয়া সকলে।।
কাজীরে কহিও কথা নাহি চাই আমি।'

অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী যে কাজী তাকেও ছেড়ে কথা বলেনি অকুতোভয় মলুয়া।

দুষমন কুকুর কাজী পাপে দিল মন।
ঝাটার বাড়ী দিয়া তারে করতাম বিরম্বন।।
বাচ্যা থাকুন সোয়ামী আমার লক্ষ পরমাঈ পাইয়া।
থানের মোহর ভাঙ্গি কাজীর পায়ের লাথি দিয়া।।
আমার স্বামী কাঞ্চাসোনা অঞ্চলের ধন।
তার সঙ্গে কাজীর সোনার না হয় তুলন।।
জাতে মুসলমান কাজী তার ঘরে নারী।
মনের আপছুস মিটাক তারা সাত নিখা করি।।
সেই মতে আমারে যে ভাব্যাছে লম্পটা।
কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাটা।।

প্রতিবাদ সর্বদাই যে বাঙ্ময় হবে তার কোন মানে নেই। নীরব বা মনের হাসির

মতো নীরব প্রতিবাদও সম্ভব। এমন অনেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যেখানে আমরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে পারি না ভয়ে অথবা সঙ্কোচে কিংবা পরবর্তীকালে লাভের কথা ভেবে। কিন্তু আমাদের যা অপছন্দ কিংবা যাকে আমরা অন্যায় বলে বিবেচনা করি, অন্তত মনে মনে তার প্রতিবাদ করি। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে জয়ানন্দের প্রাক্ প্রণয় হয়েছিল। পরে সেই সম্পর্ক যখন বিবাহে উত্তীর্ণ হবার পথে, সেই সময় জানা গেল জয়ানন্দ অন্য একজনের পাণিগ্রহণ করেছে। প্রথম প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। চন্দ্রাবতী মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে সে আর বিবাহ করবে না, অনূঢ়া থেকে যাবে চিরকালের জন্য। নানা স্থান থেকে সম্বন্ধ এলে পিতা বংশীদাসকে চন্দ্রাবতী জানিয়েছে—

"চন্দ্রাবতী বলে "পিতা, মম বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।।"

তার এই প্রতিজ্ঞার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তার প্রতিবাদ। জয়ানন্দ যেহেতু তার প্রেমের মর্যাদা দেয়নি, তাই সমগ্র পুরুষজাতির প্রতি চন্দ্রাবতী তার অনাস্থা প্রকাশ করেছিল।

জয়ানন্দ শেষবারের মত দেখা করতে এসেছিল চন্দ্রাবতীর সঙ্গে। চন্দ্রাবতী তা টের পায়নি। পরে ধ্যান ভাঙার পর মন্দিরের দ্বার খুলে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় সে বুঝতে পারে জয়ানন্দের উপস্থিতি সম্বন্ধে—

"কপাটে আছিল লেখা পড়ে চন্দ্রাবতী।
অপবিত্র হইল মন্দির হইল অধোজাতি।।
কলসী লইয়া জলের ঘাটে করিল গমন।
করিতে নদীর জলে স্নানাদি তর্পণ।।"

চন্দ্রাবতীর এবংবিধ আচরণই তো প্রতিবাদেরই সামিল।

কমলা পালায় গোয়ালিনী কমলার প্রতি আসক্ত কারকুনের দৌত্য করতে গিয়ে নানাভাবে কমলাকে কারকুনের প্রতি আসক্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার নষ্টামিতে ক্ষুব্ধ কমলা মৌখিক প্রতিবাদ জানায়নি। দস্তুর মত তাকে প্রহার করে তার কু-প্রস্তাবের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে—

"চুলেতে ধরিয়া কন্যা নিকটে আনিল।
গোয়ালিনীর গালে তিন ঠোকর মারিল।।
ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সান্নিকের জোরে।
ভূমিতলে পড়ে দাঁত কন্যার ঠোকরে।।
চুলেতে ধরিয়া তার শিরে দিল ঢিল।
পৃষ্ঠেতে মারিল তার পাঁচ সাত কিল।।
লাথি ভেদা' দিয়া তারে মাটিতে ফালায়।
গোসায় ফুলিয়া কেবল উষ্টা মারে গায়।।

চুলেতে ধরিয়া তার দিল তিন পাক।
লাথি মাইরা গোয়ালিনীর ভাঙ্গিলেক নাক।।”

গোয়ালিনী কমলা কর্তৃক প্রহৃত হয়ে কারকুনকে একহাত নিয়েছে, তার নির্যাতিত হওয়ার জন্য দায়ী করেছে কারকুনকে। সে সতর্ক করে দিয়েছে তাকে সে যেন আর তার গৃহে না আসে। এক্ষেত্রেও আমরা গোয়ালিনীর প্রতিবাদী ভূমিকার পরিচয় পাই।—

‘কারকুনকে দেইখ্যা কয় “আট-কুরীর” বেটা।
মোর বাড়ীতে আইলে তোর মুখে মারবাম ঝাটা।
তোর লাগিয়া মোর এতেক অপমান।
পুরুষ হইলে তোর কাইট্যা দিতাম কান।।
' আর একবার যদি আইস আমারে ডাকিয়া।
শূলে দিবাম তোরে আমি কন্যারে বলিয়া।।”

কমলার পিতা এবং ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে রকুন স্বয়ং কমলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছে কারকুনকে। নরপিশাচ বলে গালি দিয়েছে। কমলার পিতাকে বিনা দোষে চক্রান্ত করে জমিদার কর্তৃক বন্দী ক ালে সেই প্রেক্ষিতে কমলা কারকুনকে বলেছে—

“আমার বাপের লুন খাইয়া বাচিলা পরানে।
তার গলায় দিতে দড়ি না বাধিল প্রাণে।।”

অনেক সময়ই আমরা সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠতে পারি না অথবা প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের পথও অবলম্বন করি না। “দেওয়ান ভাবনা” পালায় অর্থ এবং সম্পদের প্রলোভনে ভাগ্নী সোনাইকে দেওয়ান ভাবনার হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সোনাইর মাতুল, দূতি মারফত এই তথ্য প্রেমিক মাধবকে জানাবার জন্য অনুরোধ করেছে সোনাই। স্বভাবতই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেওয়ান ভাবনার সঙ্গে তার বিবাহ প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেনি। পত্রে সে এই প্রসঙ্গে যা জানিয়েছে তাতে প্রতিবাদের সুরই ধ্বনিত হয়েছে।—

“দুর্জন দুষ্মন মামা দুষমনি করিয়া।
দেওয়ান ভাবনার কাছে মোর দিবে আজি বিয়া।।”

মামার বিরুদ্ধে সে অন্যত্র প্রতিবাদ জানিয়েছে যখন সত্যসত্যই ভাবনা তাকে নিয়ে পালিয়েছে—

“কইও কইও কইও দূতী কইও মামীর আগে।
আমার কাঁখের কলসী পইড়া (রৈলা) অইনা ঘাটে।।”

ভাবনা যখন সুনাইকে পানসীতে করে নিয়ে চলেছে, তখন সুনাই কাঁদতে শুরু করেছে। তার ক্রন্দনের শব্দ মাধবের কানে এসে পৌঁছেছে। সে বুঝেছে বলপ্রয়োগে কোন যুবতীকে পানসীতে করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বজ্রকণ্ঠে মাধব হেঁকেছে—

“কেবা যাওরে নদী দিয়া বাইয়া পানসী নাও।

কার ঘরের যুবতী নারী ধইরা লইয়া যাও।।"

মাধব আক্রমণ করেছে দেওয়ান ভাবনাকে। জলের ওপর অনুষ্ঠিত হয়েছে যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পেয়েছে সোনাই।

'দস্যু কেনারামের পালা'য় দস্যু কেনারামের জীবন যে অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, সেজন্য সে তার অভিভাবক গুরুজনদের ভূমিকার সমালোচনা করেছে। দ্বিজ বংশীদাসের কাছে সে জানিয়েছে—জন্মাবধি সে মা-বাবাকে দেখেনি। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে কেউ এমন ছিল না। তাকে সুশিক্ষা দানের কেউ ছিল না। এ দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল তার বাবার —কিন্তু তিনি সে দায়িত্ব পালন করেননি—

"আগেতে মরিলা মাও বাপ গেলা ছাড়ি।"

বিপাকে পড়ে কেনারাম মাতুলালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সে মামা মাতুলোচিত আচরণ করেনি—

'দুরন্ত আকালে মামা কোন কার্য্য করে।
জানিয়া পরের পুত্র বেচিল আমারে।
পাঁচ কাঠা শালি ধান কিম্মত আমার।
কুসঙ্গে মজিয়া হইছি হেন দুরাচার।।"

এখানে কেনারাম স্পষ্টতই অভিযোগ উত্থাপন করেছে তার অভিভাবকদের বিরুদ্ধে। তার বক্তব্য সে যদি উপযুক্তভাবে প্রতিপালিত হত তবে হয়ত তাকে দুরাচার হতে হত না।

'রূপবতী' পালায় রামপুর শহরের রাজা রাজচন্দ্র নিজের একমাত্র কন্যার ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষার জন্য রূপবতীকে বিয়ে দিয়েছিলেন বাড়ির নফর মদনের সঙ্গে। এই মদনকেই পরবর্তীকালে তিনি বন্দী করেন। তাকে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পিতা-মাতার সমালোচনা করে এই প্রেক্ষিতে রূপবতী বলেছে—

দুষমন হইল বাপ
চিত্তে মোর দিল তাপ
মাও বাপ হইয়া হইল পর।।

তবে প্রতিবাদের কণ্ঠটি অনেক উচ্চগ্রামে শোনা গেছে পুনাই-এর ক্ষেত্রে—

শুন শুন রাজা আরে কহি যে তোমায়।
ঘর বান্ধিয়া কেবা তায় আগুন লাগায়।।
বাগোয়ান লাগাইয়া বল কেবা গাছ কাটে।
পায় আছাড়িয়া কেবা ভাঙ্গে পূজার ঘটে।।
নিশি রাইতে রাণী যারে কন্যা দিল দান।
সেইত জামাই তোমার পুত্রের সমান।"

"কঙ্ক ও লীলা" পালায় যখন গর্গ মনে মনে স্থির করলেন কঙ্ককে ঘরে তুলে নেবেন, জাতিতে তুলবেন, তখন গর্গের এই প্রয়াসে বাধ সেধেছে দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী। তাদের প্রতিবাদ ছিল যে নাকি চণ্ডালের অন্ন খেয়েছে, সেই কঙ্ককে কখনই জাতিতে তোলা যাবে না। এমনকি তারা এমনও হুঙ্কার দিয়েছে—

"আমরা সম্মত নহি, আরও শুন সবে কহি
লহ কঙ্কে মোদেরে ছাড়ি।।
জন্মিয়া চণ্ডালের অন্ন খায় যেই জন।
যে তারে সমাজে তুলে নহে সে ব্রাহ্মণ।।
অনাচারে জাতি নষ্ট, নষ্ট হয় কুল।
মাটিতে পড়িলে কেহ নাহি তুলে ফুল।।"

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এই যুক্তি নিশ্চয়ই গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু যে সময়ে পণ্ডিত সমাজ এই প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন এবং গর্গের উদারতাকে উদার মনে মেনে নিতে পারেননি, তাদের মানসিকতাকে আমরা আজকের প্রেক্ষিতে বিচার করলে সুবিচার করা হবেনা।

এইভাবে বিভিন্ন পালায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন জনের মাধ্যমে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কখনও সে প্রতিবাদ উচ্চরবে শোনা গেছে, কখনও বা তা শোনা গেছে মৃদু কণ্ঠে। প্রতিবাদ কখনও যথার্থ হয়েছে। কখনও বা সে প্রতিবাদ হয়েছে অমানবিক, অযৌক্তিক। যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কখনও তার সংশোধন হয়েছে, আবার কখনও বা প্রতিবাদ নীরবে নিভৃতে কেঁদে মরেছে। তবু প্রতিবাদী চরিত্রগুলি বিভিন্ন গীতিকাকে যে আকর্ষণীয় করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

# গীতিকায় পত্রগুচ্ছের ব্যবহার

আমাদের গীতিকাগুলিতে পত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়। এই ব্যবহারের শিল্পোৎকর্ষ নিয়ে আলোচনার পূর্বে পত্রের ব্যবহারিক গুরুত্ব নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব। পত্র মূলতঃ দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়ে থাকে। এখন যেমন দূর অবস্থানকারী ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ সাধনের নানা মাধ্যমের চল যেমন টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ইমেল ইত্যাদি। কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত পত্রই ছিল একমাত্র অবলম্বন। শুধু দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তির কাছেই নয়, নিকটে অবস্থানকারী ব্যক্তি অথবা নাগালের মধ্যে থাকা ব্যক্তিকেও অনেক সময় পত্র লিখি। যে তথ্য সরাসরি জানাতে অস্বস্তিবোধ হয়, সেক্ষেত্রে পত্রের সহায়তা নিয়ে থাকি।

সাহিত্যে পত্র ব্যবহার রীতিমতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক রূপেই স্বীকৃত। পত্রোপন্যাস তারই নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে অত্যন্ত সার্থকভাবে পত্রের ব্যবহার করেছেন। সচরাচর লেখক আনুপূর্বিক একটি কাহিনীকে বর্ণনা করে চলেন অথবা চরিত্র বিশেষের মাধ্যমে আখ্যান উপস্থাপিত হয়। এই প্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে পত্রের ব্যবহারে শুধু বৈচিত্র্যই সৃষ্টি হয় না, এক ধরনের নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়।

প্রতিটি গীতিকাতেই অনিবার্যভাবে পত্র ব্যবহৃত হয় না। কয়েকটি গীতিকাতে পত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়। যে ক'টি পালাতে পত্রের ব্যবহার দেখা গেছে সেগুলি হল, 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'কমলা', 'দেওয়ান ভাবনা', 'রূপবতী' ইত্যাদি। প্রথমে 'মলুয়া' পালায় ব্যবহৃত পত্রের প্রসঙ্গ।

কাজীর নির্দেশে মলুয়ার স্বামী বিনোদকে নিরলইক্ষার ময়দানে জীবন্ত অবস্থায় কবর দিতে ধরে নিয়ে গেলে বিপন্ন মলুয়া তার পঞ্চভাইকে পত্র লিখেছে। এ পত্র রচিত হয়েছে অত্যন্ত স্বল্পকথায়। মাত্র আড়াই অক্ষরে। পত্রের বিষয় পেয়াদাদের দ্বারা বিনোদের বন্দী হওয়ার সংবাদ—

"বিনোদ ধরিয়া নিল কাজীর পেয়াদায়।
কাজীর হুকুম কথা লিখে সমুদায়।।"

আমরা জানতে পারি 'মলুয়া' তার চিঠিটি প্রেরণ করেছে চার পালিত কোড়ার মাধ্যমে—

কোড়ার মুখে দিল পত্র অতি যতন করে।।
বহুকালের পালা কোড়া ইসারাতে জানে।
উইরা গেলে সোনার কোড়া ভাইয়ের বিদ্দমানে।।

মলুয়ার পত্রলিখন ফলপ্রসূ হয়েছে, তার প্রমাণ বন্দীদশা থেকে বিনোদ মুক্তি পেয়েছে।

জাহিরপুরে বসবাসকারী দেওয়ান জাহাঙ্গির তার হাউলিতে অন্তরীণ মলুয়ার সঙ্গে

দৈহিক মিলনের জন্য যখন চরম ব্যগ্রতা দেখিয়েছে তখন আত্মরক্ষার্থে মলুয়া দেওয়ানকে কোড়া শিকারের আয়োজনে প্ররোচিত করেছে। শিকারের দিন নির্দিষ্ট হলে তা জানিয়ে দিয়েছে মলুয়া তার ভায়েদের, বলাবাহুল্য পত্রের মাধ্যমে। তারা বিপন্ন ভগ্নীকে উদ্ধারের জন্য যথাসময়ে পান্‌সি নিয়ে হাজির হয়েছে অকুস্থলে—

"পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয়ে পানসী নাও করে।।
ছল করিয়া তারা কোড়া শিকার ধরে।।"

এরপর শিকারে যাওয়া দেওয়ানকে আক্রমণ করে মলুয়াকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ 'মলুয়া' পালায় মলুয়া যে দুবার পত্র লিখেছে, সে পত্রলেখা সার্থক হয়েছে। পত্রের মাধ্যমে সে বিনোদকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। পত্রের মাধ্যমেই সে দেওয়ান জাহাঙ্গিরের হাত থেকে সতীত্ব রক্ষায় সক্ষম হয়েছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার মধ্যে 'চন্দ্রাবতী' পালাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক পত্র ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। আমরা একে একে পত্রগুলির বিষয় আলোচনা করব। প্রথম পত্রটি প্রেমপত্র। জয়ানন্দ কর্তৃক এটি লিখিত হয়েছিল। এই পত্রে জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে তার প্রেম অনুরাগের কথা জ্ঞাপন করেছে। প্রথমেই সে স্বীকার করেছে যে চন্দ্রাবতীকে তার মনের কথা বলতে সংকোচ বোধ করে—

কইতে গেলে মনের কথা কইতে না জুয়ায়।
সকল কথা তোমার কাছে কইতে কন্যা দায়।।

চন্দ্রাবতীর কাছে সহানুভূতি পাওয়ার আশায় সে তার অসহায়ত্বের কথা জানিয়েছে। বলেছে সে মাতৃপিতৃহীন তাই মাতুলালয়ে তার অবস্থান। কিন্তু যেদিন সে চন্দ্রাবতীকে দেখেছে সেইদিনই তার প্রতি সে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছে—

যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন।
সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন।।

জয়ানন্দ পত্রে জানতে চেয়েছে, চন্দ্রাবতীর সিদ্ধান্তের কথা—

তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই।
সর্বস্ব বিকাইবাম পায় তোমারে যদি পাই।।

এই পত্রপাঠে চন্দ্রাবতী ভাববিহ্বল হয়ে পড়েছে। দুচোখে তার ধারা নেমেছে—

পত্র পইড়ে চন্দ্রাবতীর চক্ষে বয়ে পানি।
কিবা উত্তর দিব কন্যা কিছুই না জানি।।

পিতার বর্তমানে নিজের বিবাহের ব্যাপারে চন্দ্রাবতী নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হয়েছে। পাঠক জানতে পারে যে, জয়ানন্দের ভালোবাসা এক তরফা ছিল না। চন্দ্রাবতীও জয়ানন্দকে ছোটবেলা থেকেই তার প্রাণের দোসর করেছিল, পত্রোত্তরে সে তার মনের দুর্বলতার কথা না জানিয়ে শুধু এইটুকু জানিয়েছে—

ঘরে মোব বাপ আছে আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী।।

জয়ানন্দের লেখা প্রথম পত্রটি চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে রচিত হলেও তার দ্বিতীয় পত্রটি লিখিত হয়েছে এক মুসলমান কন্যার উদ্দেশে। মুসলিম যুবতীটিকে নদীর কূলে কলসীসহ জল নিতে দেখে তার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে। শরম বশত জয়ানন্দ মুসলিম রমণীকে সরাসরি প্রেমের কথা জানাতে পারে নি। পত্রের মাধ্যমে সে তার প্রেম নিবেদন করেছে—

কে তুমি সুন্দরী কন্যা জলের ঘাটে যাও।
আমি অধমের পানে বারেক ফির‍্যা চাও।।
নিতি নিতি দেখ্যা তোমায় না মিটে পিয়াস।
প্রাণের কথা কও কন্যা মিটাও মনের আশ।।

জয়ানন্দ তার এই পত্রটি রেখে গিয়েছে হিমল গাছের তলে। মুসলিম যুবতীটি এই পত্রের উত্তরে কোন পত্র লেখেনি তবে তারই সঙ্গে জয়ানন্দের বিবাহ হয়েছে। অতএব বোঝা যায় তাকে উদ্দেশ করে জয়ানন্দের পত্র লিখন ব্যর্থ হয়নি।

জয়ানন্দ রচিত তৃতীয় পত্রটি আকৃতিতে দীর্ঘতর। এ পত্রটি অনুশোচনার অনলে দগ্ধ অনুতপ্ত জয়ানন্দের হৃদয়ের অকপট প্রকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পত্রটি ২৬ পংক্তি সম্বলিত। পত্রটির দুটি অংশ—প্রথমাংশে জয়ানন্দ তার অবিমৃষ্যকারিতার কথা জ্ঞাপন করেছে—

অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হলাহল।।
জানিয়া ফুলের মালা কাল সাপ গলে।
মরণে ডাকিয়া আমি আন্যাছি অকালে।।
তুলসী ছাড়িয়া আমি পূজিলাম সেওরা।
আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পসরা।।

পত্রের দ্বিতীয়াংশে জয়ানন্দ তার শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছে এবং সেই সঙ্গে প্রাক্তন প্রণয়িনীর কাছে বিদায় যাচঞা করেছে—

শিশুকালের সাথী তুমি যৈবন কালের মালা।
তোমারে দেখিতে কন্যা মন হইল উতলা।
জলে ডুবি বিষ খাই গলাই দেই দড়ি।
তিলেক দাঁড়াইয়া তোমার চান্দমুখ হেরি।।
ভাল নাহি বাস কন্যা এই পাপিষ্ঠ জনে।
জন্মের মতন লইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে।।

সচেতনভাবে চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু জীবনের প্রথম প্রণয়ের স্মৃতিকে কি অত সহজে ভোলা সম্ভব? স্বভাবতই পূর্বতন প্রেমিকের পত্র পেয়ে সে ব্যাকুল হয়েছে। বারবার পত্রটি পাঠ করেছে সে এবং চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে—

একবার দুইবার তিনবার করি।
পত্র পড়ে চন্দ্রাবতী নিজ নাম স্মরি।।
নয়নের জলে কন্যার অক্ষর মুছিল।
একবার দুইবার পত্র যে পড়িল।।

বিমূঢ় চন্দ্রাবতী শেষপর্যন্ত তার পিতৃদেব দ্বিজ বংশী দাসের শরণাপন্ন হয়েছে। তাঁকে সে জয়ানন্দের পত্রের প্রসঙ্গে জানিয়েছে এবং তার কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করেছে—

জয়ানন্দ লিখে পত্র আমার গোচরে।
তিলেকের লাগ্যা চায় দেখিতে আমারে।।

দ্বিজ বংশীদাস কন্যাকে পরামর্শ দিয়েছেন চিত্তচাঞ্চল্য থেকে মুক্ত থেকে রামায়ণ রচনা এবং শিবপূজায় নিজেকে পবিত্র রাখার। এই প্রেক্ষিতে চন্দ্রাবতী জয়ানন্দকে পত্র লিখেছে। গীতিকায় এটুকুই উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত হয়নি পত্রের বক্তব্য—

পত্র লিখে চন্দ্রাবতী জয়ের গোচরে।

জয়ানন্দের শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি! তার প্রথম প্রণয়িনী, চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ মেলেনি। ব্যর্থকাম জয়ানন্দ আত্মঘাতী হয়েছে। তবে আত্মঘাতী হওয়ার পূর্বে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে চার পংক্তির একটি পত্র লিখে রেখে গেছে চন্দ্রাবতী যে মন্দিরে অবস্থান করছিল তার কপাটে—

শৈশব কালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালেব সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী।।
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত।।

চন্দ্রাবতী মন্দিরের কপাট খুলে জয়ানন্দের লিখিত পত্রটি পেয়েছে। জয়ানন্দের উপস্থিতিতে মন্দির অপবিত্র হয়েছে বলে মনে করে সে কলসী নিয়ে জলের ঘাটে গেছে কিন্তু অবচেতনভাবে জয়ানন্দের জন্যই যে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল তা কোন মতেই গোপন করতে পারে নি।

'জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি।'

'কমলা' পালায় পত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়। চিকন গোয়ালিনীর মাধ্যমে কারকুন কমলার উদ্দেশে লিখেছে—

তোমারে না দেখলে আমার মন হয় যে উতলা।
প্রাণে বাঁচাও মোরে কন্যা খাও মোর মাথা।।

কারকুনের আকাঙ্ক্ষিত ছিল কমলার ভরা যৌবন। সে জানিয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেলে সেও তার যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। চিকন গোয়ালিনী পত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে কমলার কাছে। পত্র পাঠ করে ক্ষুব্ধ কমলা গোয়ালিনীকে মেরেছে। কারকুন প্রতিহিংসা বশত রঘুপুরে বসবাসকারী জমিদাবের উদ্দেশে পত্র লিখেছে, কমলার পিতার বিরুদ্ধে, যে

সে সাত ঘড়া মোহর মাটি খুঁড়ে পেয়েছে কিন্তু জমিদারকে সে তা জানায় নি।

চাকলাদার পাইছে ধন মাটি খুড়িয়া।
সাত ঘড়া মোহর কেবল গণিয়া বাছিয়া।।
না জানায় এই কথা মালিক গোচরে।
জমিদারের ধন আইন্যা রাখছে নিজ ঘরে।।

বেচারি মানিক চাকলাদার, কমলার পিতা অকারণে শাস্তি ভোগ করেছেন। এদিকে কৌশলে কারকুন চাকলাদারী সনদ লাভ করেছে। কমলা আশ্রয় নিয়েছে তার মাতুলালয়ে। কিন্তু কারকুন মাতুলকে ভয় দেখিয়েছে কমলাকে আশ্রয় দিলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।—

নাপিতে ছাড়িব তোমার ছাড়িব ঠাকুরে।
এক ঘইরা হইবা তুমি কইলাম সুবিস্তরে।।
চাড়াল বেটার লাগ্যা কমলা হইল পাগল।
কামেতে মাতিয়া দুষ্টা ভাসাইল কুল।।
কলঙ্কিনী হইল তার গেল কুল জাতি।
এই পাপের নাহি জান্য পরাচিত্তির পাতি।।

নিরুপায় মাতুল নিজের স্বার্থরক্ষার তাগিদে স্ত্রীর কাছে পত্র লিখে কমলাকে বহিষ্কৃত করার নির্দেশ দিয়েছে—

"বিয়া না হইতে কন্যা কুল মজাইল।
ভাড়াই নাগর সঙ্গে ঘরের বাইর হইল।।
এমন কন্যারে তুমি ঘরে নাহি দিবে স্থান।
ঘরের বাহির কইরা দিবা কইরা অপমান।।"

মাতুল লিখিত পত্রের বিষয় অবগত হয়ে কমলা স্বেচ্ছায় মাতুলালয় ত্যাগ করে গেছে। শেষপর্যন্ত এই পালায় কমলা কারকুনের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। কমলার অনুরোধে আয়োজিত ধর্মসভায় কমলা কারকুনের চক্রান্ত সবিস্তারে জানিয়েছে এবং নিজের বক্তব্যের সমর্থনে দাখিল করেছে কারকুনের প্রেমপত্র, গুপ্তধন রাখার অভিযোগে মানিক চাকলাদারকে অভিযুক্ত করে জমিদার লিখিত নির্দেশনামা, সর্বোপরি কমলার মাতুলকে কারকুনের লিখিত পত্র এবং কারকুনের নির্দেশ মত কমলার মাতুলের স্ত্রীকে উদ্দেশ করে লেখা পত্র। কারকুন শাস্তি পেয়েছে, তার মৃত্যু হয়েছে। যে পত্রগুলির কারণে কমলার দুর্ভাগ্য ঘনীভূত হয়েছিল সেগুলির সাহায্যেই সে দুর্ভাগ্য মুক্ত হয়েছে।

দেওয়ান ভাবনা পালাতেও পত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নায়ক মাধব নায়িকা সুনাইকে উদ্দেশ করে এই প্রেমপত্রটি প্রেরণ করেছিল। সুনাই এই পত্র বারংবার পাঠ করেছে এবং অন্তর তার আপ্লুত হয়েছে। এই দীর্ঘ পত্রে মাধব সুনাইকে আহ্বান জানিয়েছে—

জলের ঘাটে যাইও কন্যাগো কইবাম মনের কথা।।

গাঙ্গের পারে আছে কন্যা কেওয়া পুষ্পের বন।
নিরালা বসিয়া করবাম গো প্রেম আলাপন।।

পত্রটি ৩১ পংক্তি সম্বলিত। এই পত্রের উত্তর দিয়েছে সুনাই ২০ পংক্তিতে। স্বভাবতই এ পত্রে সেও উপযুক্ত ভাবেই মাধবের বক্তব্যে সাড়া দিয়েছে—

একেত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই।
দারুণ দুঃখের জ্বালা কেমনে রইয়া সই।।
যেদিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে।।

সুনাইও যে মাধবের ইচ্ছাপূরণে আগ্রহী সেকথা জানাতে সে ভোলেনি।

দেওয়ান ভাবনা পালায় আর একটি পত্রের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তবে লোককবি বাহুল্যজ্ঞানে আনুপূর্বিক সেটি বর্ণনা করেন নি। এই পত্রটির উপলক্ষ্য এবং বিষয় সুনাই জানিয়েছে সল্লাদূতীকে—

দুর্জন দুষ্মন মামায় দুষ্মনি করিয়া।
দেওয়ান ভাবনার কাছে মোরে দিবে আজি বিয়া।।
এই কথা কহিয়া আইস বন্ধুর গোচরে।।

'রূপবতী'তেও পত্র ব্যবহৃত হয়েছে। রামপুরের রাজা রাজচন্দ্র মুর্শিদাবাদে নবাবের কাছে গিয়েছেন। তিন বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরেও যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন না তখন রাণী তাঁকে অবিলম্বে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন।

তিনবছর যায় রাজা আছত বৈদেশে।
ঘরেতে তোমার কন্যা আছে কোন্ বেশে।।
পরথম যৌবন কন্যার লোকে কানাকানি।
তা শুন্যা কেমনে সহে মায়ের পরানি।।

রাণী লিখেছেন—শীঘ্র চলিয়া আইস আপনার ঘর। এই পত্রের কারণেই পালায় এক নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, নবাব রাজচন্দ্রের কন্যার কথা জেনে তাকে বিবাহ করতে চেয়েছেন। রাজা রাজচন্দ্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

গীতিকায় সব পালাতেই পত্র ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত পত্রগুলির কোনটি দীর্ঘ কোনটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পত্রগুলি আখ্যানের বৈচিত্র্যই শুধু সৃষ্টি করেনি অনেক সময়ই তা আখ্যানের নিয়ামক শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে; তাছাড়া চরিত্র বিশ্লেষণেও পত্র সহায়ক হয়ে উঠেছে। কোন পত্র ব্যবহৃত হয়েছে চক্রান্তের অনুষঙ্গে কোনটি বা অন্তর্বেদনা প্রকাশের অনুষঙ্গে, আবার কোনটি দূরে অবস্থিত প্রিয়জনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে। চন্দ্রাবতী পালাতেই সর্বাধিক পত্র ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা যুক্তি সংগত কারণে। জয়ানন্দ এবং চন্দ্রাবতী দুজনেই লেখাপড়া জানে এই কারণে উভয়ে পত্রালাপ করেছিল। সব থেকে সংক্ষিপ্ত পত্র সংযোজিত হয়েছে রূপবতী পালাতে।

# চতুর্দশ অধ্যায়

## গীতিকায় ব্যবহৃত বারমাসী

সাহিত্য সৃষ্টিতে যে ক'টি উপাদান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তন্মধ্যে প্রকৃতি অন্যতম। আমরা সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই প্রকৃতির ব্যবহার লক্ষ করে এসেছি। আমাদের মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও প্রকৃতিচিত্রণ দুর্লভ নয়. দীর্ঘকালাবধি মূলত: প্রকৃতিকে প্রেক্ষাপট রূপেই ব্যবহার করে আসা হয়েছে! তাছাড়া রচনার পরিমাণকে দীর্ঘায়িত করতেও প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সমালোচকেরা সেই প্রকৃতি চিত্রণকেই প্রশংসা করেন যেখানে মানবমনের সঙ্গে তা সম্পর্কান্বিত। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, মানবমন যেমন প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তনশীল, তেমনি প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল। অন্যভাবে বলতে গেলে পরিবর্তনশীল প্রকৃতি মানব মনেও প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণেই সব কবি বর্ষা ঋতুর সঙ্গে বিরহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পনা করেন। এমনকি কবি কালিদাসও মন্তব্য করেছেন মেঘের উদয় হলে নিতান্ত সুখী জনেরও চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়। কই তিনি তো গ্রীষ্ম অথবা শীতের সঙ্গে সুখী ব্যক্তির চিত্তবৈকল্যকে যুক্ত করেন নি।

আমরা জানি প্রতিটি ঋতুর যেমন নিজস্বতা আছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিশেষত্ব রক্ষিত হয়, তেমনি প্রতিটি ঋতুই মানবমনে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে। এর চমৎকার নজির পাই আমাদের বারমাসীগুলিতে। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলি বারমাসে সমৃদ্ধ। আপাতভাবে মনে হবে বারমাসী বুঝিবা পরিশীলিত সাহিত্যেরই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু বিস্মৃত হলে চলবে না বারমাসী প্রথম লোক ঐতিহ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। পরে—তা গৃহীত হয়েছে পরিশীলিত কাব্যে—

"The Baromasi originated in folk poetry; that owing to its intrinsic attractiveness and its great popularity in Bengal, it found a place again and again in the classical literature, being of course, always reshaped and remoulded by various Poets according to their poetic aims, imagination and poetic ability."[১]

আমাদের গীতিকাগুলিতে বারমাসী ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বারমাসী মানে যে, বারমাসকেই উপজীব্য করা হয়েছে এমন নয়, কোন গীতিকায় বাবমাসীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ষান্মাসিকী গীতি কোথাও বা দশমাসী, এগুলির প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে প্রথমে বারমাসীর বিষয়টি কি সেটা স্পষ্ট করা যাক।

"সমগ্র বৎসর বা বারমাস ব্যাপী পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক পটভূমিকায় প্রধানতঃ প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার মনোভাবের অভিব্যক্তিই বারমাসীর বর্ণনামূলক সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। প্রেমে নৈরাশ্যের ভাবটাই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ কবিয়া থাকে।"[২]

আমরা বারমাসীতে পাই একদিকে প্রকৃতির বর্ণনা অন্যদিকে এই প্রেক্ষিতে প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার অন্তর্প্রকৃতির অবস্থা। সাধারণত প্রকৃতির বর্ণনায় যে মাস বা

ঋতুর কথা বর্ণিত হচ্ছে সীমিত পরিসরে, সেই মাস বা ঋতুসম্পৃক্ত প্রকৃতির সীমিত পরিচয় দান করা হয়। বিস্তারিত বর্ণনা দেখা যায় বিরহাকাতরা নায়িকার।—

"The majority of the Bengali folk-Baromasis...describe the sorrows of a woman separated for a full year from her husband or her beloved and they usually devote the first part of each month's portion to a short description of a natural scene, characteristic of the month in question."[৩]

'কঙ্ক ও লীলা' পালায় বারমাসীর পরিবর্তে ষান্মাসিকী সন্নিবিষ্ট। এটির সূচনা হয়েছে বসন্তকালের ফাল্গুন মাসে আর সমাপ্তি টানা হয়েছে—শ্রাবণে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে কেন ছয়মাসেই কবি লীলার বিরহাকাতরা জীবনের কথা সীমিত রাখলেন। কঙ্কের প্রণয়িনী লীলা যে পর্যন্ত কঙ্কের প্রত্যাবর্তন আশা করে অপেক্ষমান ছিল, সে পর্যন্ত সে বিরহগাথা রচনা করেছে। কঙ্কের সন্ধানে বেরিয়ে গর্গ শিষ্য মাধব ব্যর্থ কাম হয়ে ফিরে এল, যখন লীলার আর কোন আশা ভরসা রইল না, তখন তার বিরহ গাথার রচনায় লোককবি ছেদ টেনেছেন। লক্ষণীয়ভাবে ষান্মাসিকী গীতি রচনার পরেও লীলা কিন্তু জীবিত ছিল। অর্থাৎ লোককবি ইচ্ছা করলেই তাকে দিয়ে বারমাসী রচনা করিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার বিচ্ছেদবেদনার তীব্রতা তেমনভাবে হয়ত প্রকাশ পেত না।

দ্বিতীয়ত: লীলা প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে তার বিরহ বেদনার কথা যা জানিয়েছিল তাকে বারমাসীতে রূপান্তরিত করে লোককবি তার বিরহ যন্ত্রণার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাননি।

লীলার ষান্মাসিকী গীতি নব্বই পংক্তিতে সীমাবদ্ধ। পংক্তির হিসাবে চল্লিশটি পংক্তি ব্যয়িত হয়েছে প্রকৃতির বর্ণনায়। অপরপক্ষে পঞ্চাশ পংক্তি ব্যবহার করেছেন লীলার বিরহ যন্ত্রণার বর্ণনায় অথবা কঙ্কের জন্য প্রকাশিত ব্যাকুলতায়। ছয়মাসের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রাবণমাসকে। শ্রাবণ মাসের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে ২৮ পংক্তিতে, অন্যদিকে আষাঢ় মাস সীমাবদ্ধ থেকেছে ষোলো পংক্তিতে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বর্ষা ঋতুর সঙ্গে বিরহের যোগ ঘনিষ্ঠ। এই কারণে লীলার ষান্মাসিকী গীতিতে বর্ষার প্রাধান্য। আমরা লক্ষ করি লীলা নিজেই বর্ণনাকারীর ভূমিকা নিয়েছে যেমন তেমনি তার বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ের বর্ণনায় লোককবিও তার হয়ে বর্ণনা করেছেন। বলাবাহুল্য লীলার বিচ্ছেদ ব্যথায় কঙ্কের প্রতি তার গভীর আসক্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে কঙ্কের অনুপস্থিতিজনিত যে শূন্যতা লীলার চিত্তকে অধিকার করে বসেছিল, তাও অভিব্যক্ত হয়েছে—

"প্রকৃতির পট পরিবর্তনে প্রকৃতি নবতর সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে, প্রকৃতির কোলে লালিত জীবকুল আনন্দে মাতোয়ারা। তাদের কলধ্বনিতে দিক বিদিক মুখরিত, সে তুলনায় লীলাই একমাত্র নিরানন্দের শিকার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বরং তার বিষণ্ণতাকেই বাড়িয়ে তোলে। তার দুর্ভাগ্যের কথা বেশি করে মনে করিয়ে দেয়। মনস্তাত্ত্বিক ভাবেই

প্রাকৃতিক প্রভাবে বিরহিনী লীলার বিরহ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৪]

লীলার ষান্মাসিকী গীতি যেন তার আত্মকথন, প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে—

"শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্রধরি মাথে।
'বউ কথা কও' বলি কান্দি ফিরে পথে।।
কাহারে সুধাও রে পাখী আমি নাহি জানি।
আমিও তোমার মত চির বিরহিনী।।

'মহুয়া' পালায দশমাসের বিচ্ছেদগাথা সন্নিবিষ্ট হতে দেখি। তবে উল্লেখযোগ্য হল এটি নায়িকার নয়, নায়কের—নদের চাঁদের। আর এই দশমাসিটি প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ষোলোটি পংক্তিতে। সূচনা হয়েছে বৈশাখে আর সমাপ্তি টানা হয়েছে কার্তিকে। এই দশমাসিতে মহুয়ার জন্য নদের চাঁদের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলেও প্রকৃতির বর্ণনা কিংবা প্রকৃতির প্রেক্ষিতে তাদের মানসিক পরিবর্তন তেমন ভাবে ধরা পড়েনি। সমালোচক মন্তব্য করেছেন : "belonging to the epic type of Baromasi, the method of which is to relate a certain action which lasted for a year by the method of describing the months in turn"[৫] আমরা কিন্তু এই বারমাসীকে মোটেই মহাকাব্যিক বারমাসীর মর্যাদা দিতে রাজি নই। এ দশমাসী আসলে দ্রুত কালক্ষেপণের জন্যই ব্যবহৃত।

'মলুয়া' পালাতেও একটি দশমাসী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ দশমাসীর সূচনা হয়েছে মাঘ মাস থেকে। এটির সমাপ্তি ঘটেছে কার্তিক মাসে। 'মলুয়া' তার বৃদ্ধা শাশুড়িকে নিয়ে কঠিন জীবন সংগ্রামের ব্রতে যুক্ত। মাঘ এবং ফাল্গুন মাস নিঃশেষিত হয় ভাবনা চিন্তাতেই। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকে। কাকের কর্কশ ধ্বনি জানিয়ে দেয় জ্যৈষ্ঠের উপস্থিতি। মলুয়া ভাবতে থাকে চাঁদ বিনোদ না জানি কোথায় অবস্থান করছে সেই সময়। আষাঢ়ের অঝোর ধারায় স্বভাবতই চাঁদবিনোদের মুখ বারংবার ভেসে উঠেছে। শ্রাবণ মাসে যখন প্রায় প্রতিটি ঘরে মনসাপূজার আয়োজন, তখন মলুয়া আশা করে বুঝিবা তার প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে। বিনোদ ফিরবে বাড়ি। একে একে শ্রাবণ এবং ভাদ্রমাস অতিবাহিত হয়। আশ্বিন মাসে যখন দুর্গাপূজা তখনও বিনোদের দেখা না মেলায় মলুয়া দুঃখিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত বিনোদ বিদেশ থেকে উপার্জিত অর্থ নিয়ে ফিরে এসেছে কার্তিক মাসে। মলুয়ার দশমাসীটি শেষ হয়েছে মিলনের বাতাবরণের মধ্য দিয়ে।

সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যায় :

"The very principle is the same to connect some natural phenomenon with either an element of action or, even more frequently, with a certain mood or emotional state."[৬]

'কমলা' পালায় আক্ষরিক অর্থেই বারমাসীর সংযোজন লক্ষণীয়। তবে কমলা পালায় বারমাসীকে প্রচলিত অর্থে বারমাসীর মর্যাদা দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কেননা কমলা প্রোষিতভর্তৃকা নয়। পতির সান্নিধ্যে থেকেই সে বারমাসী বর্ণনা করেছে। অতএব

একে কোনমতেই প্রোষিতভর্তৃকার বেদনাগাথা বলা যাবে না। কমলার বারমাসী কমলার বিপর্যস্ত জীবনকাহিনী। স্মৃতিচারণার সূত্রে রাজসভায় সর্বসমক্ষে বর্ণিত হয়েছে। এই বারমাসীটি অনেকগুলি প্রয়োজন মিটিয়েছে। কমলার বন্দী পিতা এবং ভ্রাতার মুক্তি লাভ ঘটেছে। যাদের চক্রান্তে কমলাদের পরিবার বিপর্যস্ত, তারা উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। সর্বোপরি কমলার ভাবি পতি প্রদীপকুমারের কমলা সম্পর্কে যে কৌতূহল, তারও নিরসন ঘটেছে। কমলার বারমাসীটি শুরু হয়েছে পৌষ মাসে। বিভিন্ন মাস সম্পর্কে কমলা যে উল্লেখ করেছে তার কিছু নিদর্শন উল্লেখ্য। যেমন মাঘ মাস সম্পর্কে সে বলেছে—

"শীতের দীঘল রাতি পোহাইতে না চায়"

কিংবা

"ভাদ্র মাসে তালের পিঠা খাইতে মিষ্টি লাগে।"

'দেওয়ান ভাবনায়' সুনাই-এর বারমাসী সংযোজিত হয়েছে। মাত্র ৩৬ পংক্তিতেই এই বারমাসী শেষ হয়েছে। বারমাসীর সূচনা হয়েছে আষাঢ়ে এবং সমাপ্তি টানা হয়েছে জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রোষিতভর্তৃকার বিরহ বেদনা স্নাত এই বারমাসী। আষাঢ় মাসে দয়িতের আশাতেই সময় কেটে যায়। শ্রাবণে মনসাপূজা, সুনাই-এর মনোবাসনা অচরিতার্থ থেকে যায়। আশ্বিনের দুর্গাপূজাতেও দয়িতের অনুপস্থিতি সুনাই-এর আক্ষেপের কারণ হয়ে দেখা দেয়। অগ্রহায়ণ মাসে বন্ধু বিদেশে অবস্থান করায় সুনাই-এর আশা বাস্তবায়িত হয় না। পৌষমাসে সুনাই একাকিনী শয্যায় শয়ন করতে বাধ্য হয়। ফাল্গুনে তার যৌবনজ্বালা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।—

"একি বুঝিবা আরে দূতী কাল বসন্তের জ্বালা।
যার ঘরেতে নাই সে পতি যৈবতী একেলা।।"

চৈত্র মাসে বিচ্ছেদ বেদনায় সুনাই এর পাগলিনী দশা প্রায়। সুনাই এর বারমাসী তেমন বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত না হলেও সুনাই এর মানস প্রকৃতির উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

পূর্ববঙ্গ গীতিকায় 'বগুলার বারমাসী' সংকলিত হয়েছে। মোট ৪২৩ পংক্তিতে সমগ্র পালাটি রচিত সেখানে ১৮৫ পংক্তি শুধু বারমাসী রচনাতেই ব্যয়িত হয়েছে। অর্থাৎ এটি মূল রচনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতিতে এই বারমাসী একটু ভিন্ন ধরনের। পরিত্যক্ত স্ত্রীর চারিত্রিক সততা পরীক্ষিত হয়েছে। বারমাসীটির সূত্রপাত হয়েছে রাজকুমারের প্রথম পত্রের সূত্রে। প্রতিটি মাসের অনুষঙ্গে প্রকৃতির বর্ণনা সহ—সেই মাসে ধর্মীয় উৎসবাদি বগুলার দুঃখবেদনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে অতএব আমরা লক্ষ করি গীতিকায় বারমাসীগুলি নানা উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছে। কখনও কালক্ষেপণের জন্য, কখনও বা নায়িকার চরিত্র পরীক্ষার উদ্দেশ্যে—আবার কখনও নায়িকার মনোবেদনা প্রকাশের নির্দিষ্ট লক্ষে তা ব্যবহৃত হয়েছে।।

আমাদের গীতিকাগুলির রসাস্বাদনে এই বারমাসী বা ষান্মাসিকী বা দশমাসীগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

# গীতিকায় রামায়ণ প্রসঙ্গ

বাঙালির দুই প্রিয় কবির একজন শ্রীরামপাঁচালী রচয়িতা কৃত্তিবাস, অপরজন মহাভারত অনুবাদক কাশীরাম দাস। তুলনামূলক ভাবে আবার কৃত্তিবাস বাঙালির একটু বেশি কাছের। কেননা রাম পাঁচালীকে বাঙালি পাঠক তার ঘরের আখ্যান বলে গ্রহণ করেছে। সীতা বাঙালি ঘরের কুলবধূ, লক্ষ্মণ বাঙালির আদর্শ দেবর, রামচন্দ্র আদর্শ পতি ইত্যাদি।

লোকসমাজের পুরাণ জ্ঞান পুরাণ পাঠের মাধ্যমে হয়নি। যাত্রা কথকতা, পাঁচালী ইত্যাদি শুনে লোকসমাজের আমাদের পুরাণ সম্পর্কিত কিছু কিছু ধ্যান ধারণা তৈরি হয়েছে। গীতিকায় আমরা এই সুবাদে রামায়ণ প্রসঙ্গ পাই। 'মলুয়া' পালায় দেখি মলুয়ার পত্র পাওয়া মাত্র তার পাঁচ ভাই ভগ্নিপতি বিনোদকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। তারপর তারা হাজির হয়েছে বোনের ভিটেয়। কিন্তু গিয়ে দেখে—

শূন্যঘর পইড়্যা রইছে নাহিক সুন্দরী।
রাবণে হরিয়া নিছে শ্রীরামের নারী।।

এখানে রামায়ণের প্রসঙ্গ এসেছে তুলনা প্রসঙ্গে। রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে যেমন সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল রাবণ, তেমনি মলুয়া অপহৃতা হয়েছে কাজীর চক্রান্তে। তার স্থান হয়েছে দেওয়ান সাহেবের হাউলিতে। এখানে মলুয়াকে সীতার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আর রাবণেব স্থালাভিষিক্ত করা হয়েছে কাজীকে।

মলুয়া পালাতেই রামভক্ত-সীতার প্রসঙ্গ এসেছে আর একবার—মলুয়ার পরামর্শ মত পাঁচভাই কোড়া শিকাররত দেওয়ানকে প্রতারিত করে তার কাছ থেকে মলুয়াকে উদ্ধার করেছে। এরপর স্বামীর সঙ্গে মলুয়া পিত্রালয়ে গমন করেছে। তার এই পিত্রালয়ে গমনকে লোককবি বর্ননা করেছেন—

'ছীরাম উদ্দার করে যেন আপনার নারী।'

এখানে রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা উদ্ধারের প্রসঙ্গটি মলুয়া উদ্ধারের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। তবে মলুয়া পালায় চাঁদ বিনোদ মলুয়াকে উদ্ধার করেনি। তাকে দেওয়ানের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল তার পাঁচ ভাই। কিন্তু তার উদ্ধারের সমস্ত কৃতিত্ব ন্যস্ত হয়েছে চাঁদ বিনোদের উপর।

চন্দ্রাবতী পালায় উল্লিখিত হয়েছে চন্দ্রাবতীর প্রথম প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে দ্বিজ বংশীদাস যখন তাকে বিবাহে সম্মত করাতে পারেননি, তখন চন্দ্রাবতীকে পরামর্শ দিয়েছেন—

'শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে'

পিতৃ নির্দেশ পালন করেছেন চন্দ্রাবতী—

"অবসর কালে কন্যা লেখে রামায়ণ
যাহারে পড়িলে হয় পাপ বিমোচন।"

এখানে কোন তুলনা দেওয়া হয়নি কিন্তু রামায়ণ সম্পর্কে লোকসমাজের যে ধারণা তা ব্যক্ত হয়েছে। সে ধারণা হল রামায়ণ যে পাঠ করে তার পুণ্য হয় এবং পাপের স্খলন হয়। চন্দ্রাবতী পালাতে আর একবার রামায়ণ প্রসঙ্গ পাই। বিবেক দংশনে ক্ষতবিক্ষত জয়ানন্দ তার জীবনের শেষ বারের মত দেখা করতে চেয়েছিল চন্দ্রাবতীর সঙ্গে। চন্দ্রাবতী তখন মন্দির মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। তাঁর তখন সমাধিস্থ অবস্থা। মন্দিরের দ্বার বন্ধ। অনেক চেষ্টা করেও জয়ানন্দ মন্দিরের কপাট খুলতে পারেনি। কাউকে দেখতেও পেলে না। এই সময় সে কতখানি মানসিক আঘাত পেয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

'মনেত লাগিল যেমন শক্তিশেলের ব্যথা'

এখানে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের প্রসঙ্গ পরোক্ষে উল্লিখিত হয়েছে। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে যেমন আহত হয়েছিলেন তেমনি আঘাত পেয়েছে জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর অদর্শনে।

'কমলা' পালায় রামায়ণ প্রসঙ্গ এসেছে। কারকুন কমলার ভাই সুধনকে প্ররোচিত করেছে পিতার উদ্ধার কার্যে আত্মনিয়োগ করতে। জানিয়েছে তার বাবাকে বেঁধে নিয়ে গেছে এবং পিতার শয্যায় গাছের কাঁটা বিছিয়ে তাতে শুতে বাধ্য করিয়েছে। তার হাত বেঁধে বুকে পাটা দিয়েছে। অথচ সুধন এমনই কুপুত্র যে পিতার উদ্ধারে তার কোন আগ্রহই নেই। কারকুন তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এই বলে—

পিতার লাগিয়া দেখ শ্রীরাম লক্ষ্মণ
চৌদ্দ বছর ভরা গোয়াইল বনে।

হিন্দু বাঙালি মাত্রই রামায়ণের নির্বাচিত চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে এদের আদর্শ অনুসরণ করে থাকেন। সুধনকে পিতার উদ্ধারের জন্য পাঠাতে কৃতসংকল্প কারকুন তাই পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রামচন্দ্রের অযোধ্যার সিংহাসন ত্যাগ করে চতুর্দশ বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করার কথা জানিয়েছে। রামচন্দ্র যদি পিতৃ সত্য পালনের জন্য চতুর্দশ বৎসর ব্যাপী বনবাসী হতে পারেন, তবে সুধন অন্তরীণ এবং নির্যাতিত পিতাকে উদ্ধারের জন্য সামান্য চেষ্টাটুকুও ত করবে।

'লীলা'য় একটি অংলকার ব্যবহৃত হয়েছে, 'যেমন লঙ্কা ধাওয়ায়্যা আসে বীর হনুমান।' 'দস্যু কেনারামের পালাতেও রামায়ণ প্রসঙ্গ পাই। কেনারামের সুস্বাস্থ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

রাবণের মত হৈল অতি বলবান।

দ্বিজ বংশীদাস কেনারামকে প্রথম দিকে প্রভাবিত করতে অসন্তুষ্ট হয়ে খেদোক্তি করে বলেছেন—

লৌহের বাড়াই দেখ মানুষের প্রাণ।
শাপেতে হইয়াছে যেমন অহল্যা পাষাণ।।
একটি প্রবাদ বাক্যেও রামের প্রসঙ্গ লভ্য
পিশাচে না শুনে রদ অন্তরেতে গ্লানি।
এইভাবেই রাম-রামায়ণ প্রসঙ্গ গীতিকাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে দেখি।

## ষোড়শ অধ্যায়

# গীতিকায় শ্লীলতা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্থূলতার প্রতিফলন সহজেই দৃষ্টিতে পড়ে। শালীনতা বোধের অভাব ছিল সে যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এতদ্ব্যতীত পাঠকের তথা শ্রোতার তাৎক্ষণিক মনোরঞ্জনের জন্য অনেকেই এই সহজ মাধ্যমটির সহায়তা নিয়েছিলেন সে যুগে। বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'বিদ্যাসুন্দর', রামপ্রসাদ সেন বিরচিত 'কালিকামঙ্গল', নাথ গীতিকা, লোর চন্দ্রাণী ইত্যাদি তারই কয়েকটি নিদর্শন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে লক্ষিত হয় আমাদের মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি এই স্থূলত্ব থেকে মুক্ত। মোটামুটিভাবে গীতিকাগুলিতে নায়ক-নায়িকার প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকার মিলন দৃশ্যও উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ লোক কবিরা দেহজ বর্ণনার সুযোগকে কাজে লাগান নি। শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য সহজ পথটি পরিহার করে গেছেন। স্বভাবত:ই এই বিষয়টি আমাদের চমৎকৃত করে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে।

'মহুয়া' পালায় বর্ণিত হয়েছে গভীর রাত্রে নদ্যার ঠাকুরের বংশীর ইঙ্গিতে মহুয়া নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়েছে, মিলিত হয়েছে তার প্রেমিকের সঙ্গে—

কোলাকোলি গলাগলি করে দুইজন।

সাধু অসহায়া মহুয়াকে পেয়ে বলেছে—

এমন সোনার পানসী তাতে মাঝি নাই।
যৌবন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাঁই।।

সে আরও বলেছে :

এমন যৌবন কন্যা যায় অকারণে,
অথবা, বিধি আজি মিলাইল মধু ভরা ফুল।।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, সাধু একাকিনী মহুয়াকে তার নৌকায় পেয়েও তার ওপর শারীরিক বলপ্রয়োগ করেনি, শুধুই দেহ ভোগের প্রস্তাব উচ্চারিত হয়েছে তাও শিল্পসম্মত ভাবে।

যে মুনি গুরুতর পীড়িত নদ্যার ঠাকুরকে বাঁচিয়েছে, তারও উদ্ভিন্ন যৌবনা মহুয়াকে দেখে উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা। পূর্ণিমার রাত্রে গভীর বনের উদ্দেশে ভেষজের সন্ধানে যাত্রা করে মহুয়াকে নদীর তীরে এনে সে প্রস্তাব দিয়েছে—

পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যইবন।
তোমার রূপেতে আরে কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যুগ।।
এমন ফুলের মধু করাও মোরে ভোগ।।

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মুনি নির্ভর করেছে মহুয়ার সিদ্ধান্তের উপর, মুনিকে কিন্তু বল প্রয়োগ করতে দেখা যায় নি, যদিও তার পূর্ণ সুযোগ ছিল।

কবি মহুয়া এবং নদ্যার ঠাকুরের নিদ্রার বিবরণ দিয়ে বলেছেন—

মালাম পাথরে দুইয়ে শুয়ে নিদ্রা যায়।।
রাত্রিতে থাকয়ে ঠাকুর কন্যা লইয়া বুকে।

উভয়ের মিলন দৃশ্যের বর্ণনাতেও শালীনতার সীমা লঙ্ঘিত হয়নি লক্ষিত হয়—

পড়িয়াছে মালাম পাথর তাহার উপর।
সুন্দর কন্যা কোলে লইয়া বসিল ঠাকুর।।

'মলুয়া' পালায় কালরাত্রির অবসানে শুভরাত্রিতে মলুয়ার দৈহিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট বিনোদের প্রতি মলুয়ার উক্তি—

কি কর পরাণের বন্ধু শুন মোর কথা।
আজি রাতে মানা দেও খাও মোর মাথা।।
না ফুটিতে ফুল কেন তুল্যা লও কলি।
মধু না আসিতে ফুলে নাহি আসে অলি।।
খিদা লাগলে তাপ্তা ভাত জুড়াইয়া সে খায়।।
এমন হইতে বন্ধু তোমায় না জুয়ায়।।

মলুয়ার এই উক্তি বিনোদের দৈহিক ক্ষুধার নিরসন ঘটিয়েছে। দীর্ঘ তিনটি মাস মলুয়া দেওয়ান সাহেবের হাউলীতে অতিবাহিত করেছে. দেওয়ান তাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মলুয়া কৌশলে তার সতীত্ব রক্ষা করেছে। নানা স্তোক বাক্যে সে দেওয়ানকে নিবৃত্ত করেছে। এ ক্ষেত্রেও মলুয়ার সতীত্ব নাশের সুবর্ণ সুযোগ ছিল।

'চন্দ্রাবতী' পালায় যে চন্দ্রাবতী জয়ানন্দকে ছোটবেলা থেকেই তার 'প্রাণের দোসর' বলে জ্ঞান করে এসেছে, সে তাকে প্রেমপত্র লেখার পরেও এবং চন্দ্রার তাকে হৃদয় দান করা সত্ত্বেও সে কিন্তু জয়ানন্দকে তার দেহ দান করেনি, বরং কবি বর্ণনা করেছেন যে জয়ানন্দের প্রস্তাবের পর চন্দ্রাবতী পুষ্প চয়নের জন্য আর বের হয়নি। চন্দ্রাবতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জয়ানন্দ মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে। মুসলমান কন্যার সৌন্দর্য বর্ণিত হলেও পূর্ণ মাত্রায় শালীনতা যেমন এক্ষেত্রে রক্ষিত হতে দেখা গেছে, তেমনি তার সঙ্গে জয়ানন্দের দৈহিক মিলনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কবি কৌশলে তা এড়িয়ে গেছেন।

'কমলা' পালায় উদ্ভিন্ন যৌবনা কমলার বিবরণ কবি দিয়েছেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তা শালীনতার মাত্রাকে অতিক্রম করেনি। কমলার মুখ বর্ণিত হয়েছে চাঁদের সমান বলে, তার রক্তিম ওষ্ঠদ্বয় তেলাকুচা কলির অনুরূপ, আঁখিদ্বয় অপরাজিতার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেছে, তার যুগ্ম ভুরু, তার আদর্শ কটিদেশ মুষ্টিতে ধরার উপযোগী। তার বাহুলতা, তার সুন্দর গমন, অনবদ্য কণ্ঠস্বর, এমনকি তার দীঘল কেশের কথা বর্ণিত হয়েছে, লক্ষ্য করার কমলার বক্ষোদেশের বর্ণনা কিন্তু লোককবি এড়িয়ে গেছেন। শুধুমাত্র এইটুকু বর্ণিত হয়েছে—

আষাইঢ়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে।।

কবির সংযমবোধের পরিচয় মেলে কমলার স্নানের বিবরণ দানের ক্ষেত্রেও। কামুক কারকুন গোপনে কমলার স্নান করা দেখে, কিন্তু কবি ভুলেও স্নানরতা কমলার দৈহিক সৌন্দর্যের উল্লেখ করেন না, শুধু এইটুকুই বলেন—

জলেতে সুন্দরী কন্যা ফুটা পদ্মফুল।
কন্যারে দেখিয়া কারকুন হইল আকুল।।
লুকাইয়া বকুলের ডালে মিটায় চক্ষের আশ।
যত দেখে তত তার বাড়ে যে পিয়াস।।

অথচ স্নানরতা কমলার দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনার যথেষ্ট সুযোগ যে এক্ষেত্রে ছিল, তা স্বীকার্য।

কমলা দীর্ঘ তিনটি মাস প্রদীপকুমারের গৃহে অবস্থান করেছে, তার রূপে প্রদীপকুমার পাগল, অকপট তার স্বীকারোক্তি—

জীবন যৌবন সইপ্যা দিছি কন্যা তোমার করে।
বলেছে : পাগল হইয়াছি কন্যা তোমার অনুরাগে।।

কমলাও প্রদীপকুমারকে তার জীবন যৌবন উৎসর্গ করতে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত এবং সেই উৎসর্গ করতে না পারার জন্য সে সীমাহীন মনোকষ্টের শিকার হয়েছে—

বিফলে ফিরিয়া আরে বন্ধু যাও নিজ ঘরে।
একেলা শুইয়া বন্ধু আরে বন্ধু কান্দি আপন মন্দিরে।।

কিন্তু তথাপি মুহূর্তের দুর্বলতায় সে বিবাহের পূর্বে প্রদীপকুমারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেনি। বন্দী পিতা এবং ভ্রাতার যতক্ষণ না মুক্তির ব্যবস্থা করতে সে সক্ষম হয়েছে, ততদিন সে তার ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাকে সংযত রেখেছে। পালাটিতে কবি কমলার সঙ্গে প্রদীপকুমারের বিবাহের বিবরণ দিয়েছেন। এমনকি বিবাহের পর প্রদীপকুমারের উদ্দেশে 'কমলার স্বগত সঙ্গীত' দিয়ে পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে, কিন্তু উভয়ের মিলন দৃশ্যের বর্ণনা দানে কবিকে বিরত দেখা গেছে।

'দেওয়ান ভাবনা'য় দ্বাদশ বর্ষীয়া সুনাইয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

বার বছরের কন্যাগো পইড়াছে যৈবনে।।
আষাঢ় মাসে দীঘলা পান্‌সীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে।।

দ্যোতনার সাহায্যে যা বলার কবি তা বলেছেন, কিন্তু কোথাও তা কামোদ্দীপক হয়ে ওঠেনি।

'রূপবতী' পালায় মুসলমান নবাবের প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচাতে রূপবতীর

জননী গোপনে মদনের সঙ্গে রূপবতীর বিবাহ দেয়। বিবাহের পর তাদের জঙ্গলেতে নির্বাসিত করা হয়। মদন স্বীকার করেছে সে রূপবতীর যোগ্য নয়, সে কেবল রূপবতীকে ক্ষুধায় বন্য ফল, তৃষ্ণার জল এনে দেবে, প্রস্তুত করে দেবে গাছের পাতা দিয়ে বিছানা। সে রূপবতীর বনবাসে নিছক তার সঙ্গীরূপে থাকার কথা বলেছে। রূপবতী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছে—

বনে জঙ্গলায় থাকি তুমি মোর স্বামী।
তুমি বিনা অন্য কারে নাহি জানি আমি।।

অতঃপর একসঙ্গে দুজনের বনে অতিবাহিত হয়েছে, অতিবাহিত হয়েছে কাঙ্গালীয়া জাঙ্গালীয়াদের গৃহেতে আতিথ্য গ্রহণে। কিন্তু কবি বারেকের জন্যও রূপবতী ও মদনের মিলনের কথা বলেন নি। মিলন দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনায় তিনি কিন্তু সহজেই এক শ্রেণীর শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে পারতেন।

'কঙ্ক ও লীলা' পালাতে যে লীলা মুহূর্তের জন্যও কঙ্কের বিচ্ছেদের বেদনা সহ্য করতে অপারগ বলে বর্ণিত হয়েছে, সেই লীলা এবং তার প্রেমিক কঙ্কের দৈহিক মিলনের প্রসঙ্গ বারেকের জন্যও উল্লিখিত হয়নি। যে লীলা কঙ্ককে উদ্দেশ করে বলেছে—

তুমি রে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়বাম জাতি কুল।।

কঙ্কের জন্য লীলার উদ্বিগ্ন হওয়ার বিবরণে বলা হয়েছে—

ঘর না ছাড়িয়া কঙ্ক থাকে যতক্ষণ।
কঙ্কের বিরহে লীলার মন উচাটন।।

অথচ সেই লীলা কিন্তু কঙ্ককে কখনও দেহ সম্ভোগের আহ্বান জানায়নি, কিংবা লীলার দুর্বলতার সুযোগ নিতে কঙ্ককেও প্রয়াসী হতে দেখা যায় নি। কবি সদ্য যৌবনবতী লীলার আনুপূর্বিক বিবরণ দান করেছেন. তার দীর্ঘ কেশরাজি, সুন্দর গমন, আঁখি, ভুরু, অধর, দন্ত, সব কিছুই বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কামোদ্রেককারী দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গের বর্ণনা দানে কবিকে বিরত দেখা গেছে। শুধুমাত্র এইটুকুই ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন--

মুষ্টিতে আটয়ে লীলার চিকন কাকালী।
হাটিয়া যাইতে কন্যার যৈবন পরে ঢলি।।

গর্গের ক্রোধবহ্নি থেকে রক্ষা করতে লীলা কঙ্ককে দূর দেশে যাবার পরামর্শ দিয়েছে, কঙ্কও সেই পরামর্শ মেনে নিয়েছে, কিন্তু দূরদেশে যাত্রার প্রাক্‌কালে দুজনকে আলিঙ্গনাবদ্ধও দেখা যায় নি।

'দেওয়ানা মদিনা'য় দুলালের সঙ্গে মদিনার আদর্শ সম্পর্কের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, মদিনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে উভয়ের একসঙ্গে ক্ষেতের কাজে যুক্ত হওয়ার বিবরণ, শীতে একসঙ্গে দুজনের আগুন পোহানো, দুলালের জন্য ভাত রেঁধে মদিনার অপেক্ষা

করা, তার জন্য হুঁকা প্রস্তুত করা ইত্যাদি। কিন্তু উভয়ের কামকলা কুতূহল চরিতার্থতার কোন বিবরণ উল্লিখিত হয়নি, যদিও তা উল্লিখিত হবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

এইভাবে লক্ষণীয় আমাদের মৈমনসিংহ গীতিকার কবিরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন স্থূল রুচির পরিচয় দেননি, নারীর লাগাম ছেঁড়া দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় শ্রোতাদের উত্তেজিত করতে তাঁরা চাননি। সূক্ষ্ম রসবোধ এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। কবিদের মার্জিত রুচি প্রশংসনীয়। লোক কবিরা আস্থাবান ছিলেন তাঁদের বর্ণনা শক্তি, অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্য, আকর্ষণীয় কাহিনী বয়ন নৈপুণ্য বিষয়ে। তাই সহজতর কোনো পথের সাহায্য এদের নিতে হয়নি। সর্বোপরি মূলতঃ গীতিকায় আদর্শ প্রেমের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এ প্রেম নিছক দেহ নির্ভর নয়। তাই রতিকলার লাগামহীন বিবরণে গীতিকাগুলি ভারাক্রান্ত হয়নি। বরং নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি যে আন্তরিক অনুরাগ, যথার্থ প্রেমের জন্য তাদের চরম কৃচ্ছ্রসাধন, কঠিন ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদিকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। দেহজ প্রেমের গুরুত্বকে কবিরা তাই অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে গেছেন, যদিও নানা উপলক্ষ্যেই সেই বিবরণ দানের সুযোগ তাঁদের ছিল। তাছাড়া নায়িকাদের উন্নত আদর্শের পরাকাষ্ঠারূপে উপস্থাপিত দেখা গেছে গীতিকাগুলিতে। সেই কারণে তারা একদিকে যেমন তাদের নায়ক তথা প্রেমিকদের নিছক দেহ সৌন্দর্যতে আকৃষ্ট করে নিজেদের উন্নত আদর্শ তথা মানসিকতাকে কোনো ক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ করেনি, তেমনি নায়কদের তরফে ক্ষেত্র বিশেষে প্রকাশিত দুর্বলতাকেও কখনই প্রশ্রয় দেয় নি। এতে গীতিকাগুলির শিল্প সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে স্বীকার করতে হয়।

## সপ্তদশ অধ্যায়

# গীতিকার সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বোধকরি সর্বাপেক্ষা অবহেলিত গীতিকা। গীতিকার নির্ভরযোগ্য সংকলনের যেমন অভাব, তেমনি গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনাও নিতান্ত সীমিত। কিন্তু সে তুলনায় পাশ্চাত্যের গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনার প্রাচুর্য আমাদের মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে। তাই গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনায় আমাদের পাশ্চাত্য সমালোচকদের উপর নির্ভর করতে হয় বহুলাংশে। লোকসঙ্গীত রূপে গীতিকার আলোচনার পূর্বে আমরা কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি—

(ক) Robert Graves ব্যালাডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'It is incomplete without music, music of a repeatitive kind that exists and sustains' (page-9); 'The ballad proper is best understood not primarily as a narrative poem or as a song, but as a song and chorus evolved by the group mind of a community.[১]

(খ) Gordon Hall Gerould বলেছেন, 'Defined in simplest terms, the ballad is a folk-song that tells a story, a ballad is always a narrative, is always sung to a rounded melody.....'[২]

(গ) M.J.C. Hadgart মন্তব্য করেছেন, 'There is no doubt that the ballads are songs and are incomplete without music.....'[৩]

(ঘ) 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology And Legend' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ব্যালাড সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাতেও অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে :

'Almost without exception ballads were sung; often they were accompanied by instrumental music.'[৪]

(ঙ) Evelyn Kendrickwells মন্তব্য করেছেন, 'The traditional ballad is a song that tells a 'story' in single verse and to a simple tune.'[৫]

(চ) Mathew Hadgart মন্তব্য করেছেন : 'In fact, the ballads are essentially music and come to life fully when they leave the printed page.....'[৬]

(ছ) R. Brimley Johnson মন্তব্য করেছেন : 'The word 'ballad' is admittedly of very wide significance meaning originally 'a song intended as the accompaniment to a dance, it was afterwards applied to a light simple song of any kind.....'[৭]

(জ) 'a simple sentimental song composed of several verses, sung to the same melody'-The New English Dictionary.

এ পর্যন্ত গেল পাশ্চাত্য সমালোচকদের অভিমত, এ দেশীয় গবেষক ও পণ্ডিতেরাও প্রায় একই মন্তব্য করেছেন গীতিকার সাঙ্গীতিক দিক প্রসঙ্গে—

(ক) 'গীতিকা সর্বত্রই গীত হয়, কোথাও কেবলমাত্র আবৃত্তি করা হয় না,'[৮]— ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

(খ) 'ময়মনসিংহ গীতিকায় ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় যাকে গীতিকা বলা হয়, সেই শ্রেণীর লোকসঙ্গীত সংখ্যাধিক্যে আর সব সংগ্রহকে হার মানিয়েছে'[৯]-ড. মযহারুল ইসলাম[৯]।

বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যালাড এবং এ দেশীয় গীতিকা, গীতিকা ব্যষ্টি না সমষ্টি রচিত কিংবা ব্যালাড মূলত: নৃত্যসঙ্গীত কিনা, ওদেশের ব্যালাডে ব্যবহৃত refrain-এর সঙ্গে আমাদের গীতিকার ধুয়া, সাযুজ্য ইত্যাদি নিয়ে কতই না বিতণ্ডা হয়েছে অথবা বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু গীতিকা যে মূলত: লোকসঙ্গীত—এই একটি বিষয়ে সমালোচকদের মতৈক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মূলত: ব্যালাড অথবা গীতিকা মৌখিক রচনা, লোকগীতির মতই তা গীত হবার জন্য রচিত হয়েছে। প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, স্বল্পায়তন বিশিষ্ট, মানুষ একবার কিংবা দু'একবার শুনলেই স্মৃতিতে তা ধরে রাখতে পারে। কিন্তু গীতিকার মত দীর্ঘাকৃতির রচনা সুর সংযোগে গীত না হলে কখনই তা স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব হত না। মুদ্রণ যন্ত্রের কল্যাণে ওদেশে অথবা এদেশে লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের মত গীতিকাও লোকমুখ থেকে সংগৃহীত হয়ে মুদ্রিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুরই এক্ষেত্রে গীতিকার মত দীর্ঘাকৃতির রচনাকে স্মৃতিতে ধরে রাখার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। গীতিকাগুলি কখনই নিছক আবৃত্তি বা পাঠের জন্য রচিত হয়নি। সুর সংযোগে গীত না হলে গীতিকার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না।

সঙ্গীত রূপে ব্যবহারেব জন্য রচিত বলেই ব্যালাডেব পংক্তিগুলি যেমন ক্ষুদ্র চরণ বিশিষ্ট তেমনি আমাদের গীতিকাগুলিও ক্ষুদ্রাকৃতির চরণ সম্বলিত। গানের পক্ষে দীর্ঘ চরণ অসুবিধাজনক। এতদ্ব্যতীত আমাদের গীতিকাগুলি মূলত: অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত এবং পয়ার ছন্দে রচিত, তাই সঙ্গীত রূপে ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে আনুকূল্য লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় আমাদের গীতিকাগুলির চরণগুলিতে মাত্রা সমতা রক্ষিত হয়নি। পাঠের ক্ষেত্রে এত অসুবিধার সৃষ্টি করে, তাল ভঙ্গ হয়। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা হয় না, সুরকে হ্রস্ব, দীর্ঘ করে মাত্রার অসম্পূর্ণতা দূর করা হয়। ব্যালাডের refrain এবং আমাদের গীতিকায় ব্যবহৃত ধুয়াও সঙ্গীতরূপে এগুলির ব্যবহৃত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ।

ব্যালাড বা গীতিকা এমনই লোকগীতি যেগুলি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হবার রীতি প্রচলিত ছিল। ব্যালাডের সঙ্গে সম্ভবত: ড্রাম বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রথম দিকে, '...it is probable that the drum was the first musical

accompaniment of the primitive ballad.....', আবার কারো কারো মতে বীণা যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে ব্যালাডের সঙ্গে। মোটের উপর দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের যে সহায়তা নেওয়া হত গীতিকার পরিবেশনে তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্যই ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যাধিক্য ঘটত না। আর সুরের ব্যাপারেও কখনই জটিলতা, সূক্ষ্মতা কিংবা বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলত না। গতানুগতিক বৈচিত্র্যহীন সুরেই এগুলি গীত হত। এইখানেই অন্যান্য লোকসঙ্গীতের সঙ্গে গীতিকার পার্থক্য। অন্যান্য লোকসঙ্গীত প্রধানত: কোন না কোন সামাজিক অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গীত হয়। নিদেনপক্ষে বিশেষ কোন কার্যোপলক্ষ্যে লোকগীতি গীত হবার রীতি, যা কর্মসঙ্গীত নামে পরিচিত। কিন্তু গীতিকার ক্ষেত্রে অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষ্যে তা গীত হয় নি। অন্যান্য লোকগীতির অধিকাংশই স্বল্পায়তন বিশিষ্ট, কিন্তু সে তুলনায় গীতিকা দীর্ঘাকৃতির রচনা। অন্যান্য লোকগীতির সুর বৈচিত্র্য শ্রোতাকে যেখানে লোকগীতির প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে, সেখানে গীতিকার কাহিনীর আবেদনই শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমতের পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে,—

'সাধারণ লোক-সঙ্গীত (Folk-song) বিভিন্ন সুরে গীত হয়—তাহাতে সুরই মুখ্য, কথা গৌণ মাত্র, বরং কথা সুরের অধীন, কথার অধীন সুর নহে, কিন্তু গীতিকায় ইহার বিপরীত—ইহাতে কথাই মুখ্য, সুর গৌণ মাত্র ,'[১০]

অবশ্য একথাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে বিশেষ সুর ও ছন্দ গীতিকার কাহিনীর আবেদনকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে—

"A ballad's life depends not only on theme and attitude, but on tune,.....Melody and rhythm, acting as a background for the tale....' (The Ballad Tree)

সকল সমালোচকই ব্যালাড বা গীতিকার নাটকীয় ধর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কিন্তু সেই নাটকীয় ধর্ম পরিস্ফুটনের ব্যাপারেও ছন্দ, সুর ও গায়কের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান,

'The musical and metrical form helped to produce their uniquely dramatic style...The singer dramatizes the action in the most emphatic manner he knows,...' (The Faber Book of Ballads).

আর একটি ক্ষেত্রেও অন্যান্য লোকসঙ্গীতের তুলনায় গীতিকার পার্থক্য লক্ষণীয়, তা হল অন্যান্য লোকসঙ্গীত যেখানে লোক সমাজের যে কোন জনের দ্বারা গীত হতে পারে, এজন্য কারো বিশেষ শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন হয় না, কিন্তু গীতিকা বা বালাড বিশেষ এক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মানুষের দ্বারাই পরিবেশিত হয়। এই গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মানুষরা ব্যালাড বা গীতিকা পরিবেশনেই বিশেষভাবে পারদর্শী—

'they were not composed casually or from the caprice of Writers, but were the production of minstrels, who in remote time followed this craft as a regular profession or means or livelihood.'

অন্যভাষায় প্রায় একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ভিন্ন গ্রন্থে,

'The ballad belongs to the folk, but it is by no means primitive or barbaric, rather it is the product of accomplished and often literary conscious poets,...All of this would argue for conscious trained authorship. Minstrels, Clerks, Clericals, wandering scholars have all been suggested as the professionals who originated and perfected the form.'

আমাদের গীতিকায় সংযোজিত 'বন্দনাগীতি' থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে গীতিকার গায়ক-রচয়িতারা গুরুর কাছে তালিম নিতেন—

কিবা গান গাইবাম আমি বন্দনা করলাম ইতি।
উস্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিন্নতি।।

'কঙ্ক ও লীলা' পালাতে শিবু গাইনের যে বন্দনা সংযোজিত হয়েছে তাতেও ওস্তাদের চরণ বন্দনা করা হয়েছে—

খোল করতাল বন্দুম যজ্ঞ যত ইতি।
ওস্তাদের চরণ বন্দি করিয়া মিনতি।।

গীতিকা পরিবেশন করে এক শ্রেণীর মানুষ যে জীবিকা নির্বাহ করতেন, এই সব বন্দনা গীতিতেও তার প্রমাণ সুলভ—

গাহনা গাহিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী।
সভার প্রসাদে কিছু পাই চাউল-কড়ি।।
ইনাম বক্‌সিস্ কিছু সভাপদে চাই।
কর্মকর্তার কাছে এক খান নব-বস্ত্র চাই।। (শিবু গাইনের বন্দনা)

## ২. গীতিকার সুর

গীতিকাগুলি সর্বোপরি সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত। নির্দিষ্ট সুরে গীতিকাগুলি গীত হত। অর্থাৎ প্রতিটি পর্যায়ের লোকসঙ্গীত যেমন নির্দিষ্ট সুরে গীত হতে শোনা যায়, কোন ক্ষেত্রেই সুরবিকৃতি ঘটানোর অধিকার কারো নেই, তেমনি গীতিকাগুলির ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। গীতিকাগুলি নির্দিষ্ট সুবে গীত হবার প্রথা।

আমরা লক্ষ্য করি আমাদের লোকসঙ্গীতের সংকলন কিংবা লোকসঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনা-প্রবন্ধাদিতে সমালোচকদের নিছক এ সবের উপলক্ষ্য, সঙ্গীতের বাণীরূপ, সাহিত্য গুণ, সঙ্গীতে প্রতিফলিত সমাজ জীবন ইত্যাদি প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে দেখা যায়, অথচ সঙ্গীতের যে প্রাণ সুর, সেই বিষয়টি অনুল্লিখিত রয়ে গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। দেহ ও প্রাণ নিয়ে যেমন মানবদেহের সম্পূর্ণতা, তেমনিই বাণী ও সুর নিয়ে সঙ্গীতের পূর্ণতা। তাই নিছক বাণী সম্পর্কিত আলোচনায় সঙ্গীতের আলোচনা সার্থকতা লাভ করতে পারে না। প্রয়োজন এর সুরের আলোচনারও।

দুঃখের বিষয় আলোচকগণ সঙ্গীতজ্ঞ নন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ফলে তাঁদের পক্ষে

সুর, তাল ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা করা সম্ভব হয় না।

এমনিতেই গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনা উল্লেখযোগ্যভাবে সীমাবদ্ধ। আমাদের গীতিকাগুলির সুর, তাল কিংবা ছন্দ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন আলোচকগণ তাঁদের সীমাবদ্ধতার কারণে। একমাত্র ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয়।

ক্ষিতীশচন্দ্র কেবল স্বয়ং পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গীতিকাই সংগ্রহ করেননি, বয়াতী ও গায়েনদের সঙ্গে আলোচনা করে গীতিকাগুলির সুর, তাল ও ছন্দ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং আলোচনাও করেছেন।

মূলতঃ গীতিকাগুলি পয়ার ছন্দে রচিত এবং রামায়ণ গায়ক যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুরে তা পাঠ করেন, গীতিকাগুলিও সেই পাঁচালী সুরে গীত হয়। গীতিকাগুলি গীত হবার সময় ব্যবহৃত হয় বেহালা, সারিন্দা, দোতারা, ঢাক ঢোল, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। বলা হয় লোকসঙ্গীতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ভাটিয়ালী। ভাটিয়ালী একান্তভাবেই পূর্ববঙ্গের বর্তমান বাংলাদেশের প্রচলিত লোকসঙ্গীত। মৈমনসিংহ. ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে ভাটিয়ালীর রাজকীয় আধিপত্য। অঞ্চল ভেদে ভাটিয়ালী সুরের পাঁচটি ধাঁচ প্রচলিত—এগুলি হল সুষঙ্গী, ভাওয়াইল্যা. বিক্রমপুইর্যা, বাখরগঞ্জ্যা, গোপালগঞ্জ্যা। সমালোচক জানিয়েছেন, 'এই ধাঁচের পার্থক্য কিন্তু গানের ছন্দ রচনার উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে গায়কের কণ্ঠস্বর, উচ্চারণভঙ্গী ও শিক্ষার উপরে।' স্বভাবতঃই সব গায়ক সব ধাঁচের গান গাইতে পারেন না। বিশেষতঃ অঞ্চল ভেদে এই ধাঁচের পার্থক্য প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এক এক অঞ্চলের গায়ক বিশেষ এক এক ধাঁচের গান গাইবার স্বাভাবিক পটুত্ব অর্জন করেন।

ভাটিয়ালী গানের প্রতিটি ধাঁচে চারটি করে লহর বিদ্যমান। লহর 'টান' নামেও পরিচিত। লহর চারটি হল—ফেরুসাই, ঝাঁপ, সারি ও বিচ্ছেদ। লহর গানের ছন্দ রচনার উপর নির্ভরশীল। ফলে গায়ক প্রয়োজনমত শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে অথবা নূতন শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে লহরের ছন্দ ঠিক করে নেন। মূলত: গীতিকাগুলি ভাটিয়ালী সুরেই গীত হয়।

ভাটিয়ালীর বিচ্ছেদ লহর ব্যবহৃত হয় করুণ রসাত্মক গানে। অপরপক্ষে হাস্য রসাত্মক গান গীত হয় সারি লহরে। ঝাঁপ লহরে নানা রসের গান পরিবেশিত হতে পারে। তবে সচরাচর করুণ রস পরিবেষণে—মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার কারণে ঝাঁপ লহরে করুণ রসাত্মক পালার অন্তিম গানগুলি গীত হয় না। বিচ্ছেদ, সারি ও ঝাঁপ ব্যতীত ভাটিয়ালী সুরের অন্য সব ফেরুসাই লহরের অন্তর্ভুক্ত।

ভাটিয়ালী ব্যতীত অপর যে সুরগুলি গীতিকায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, সেগুলি হল হাল্দাফাটা, সাইগরী ও মুড়াই। চট্টগ্রামে হালদাফাটা সুরের গান শ্রুত হয়। মুড়াই সুরের গান গীত হয় ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে। মুড়াই সুরের গান গাওয়ার জন্য গায়কের উচ্চগ্রামের কণ্ঠের প্রয়োজন। এই সুরের দোলা চমৎকার। সাইগরী সচরাচর

দক্ষিণাঞ্চলের মাঝিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা যায়। নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এই সুরের গান শোনা যায়।

বিভিন্ন গীতিকা বিভিন্ন সুরে গীত হয়ে এসেছে। যেমন-'সদাগর কন্যা বগুলা' পালার কয়েকটি গান হাঁওলা সুরে গীত হয়। 'মণির ওঝা মাঞ্জুর মাও পালা'টি ভাওয়াইয়া ছন্দের সাগরী ঝাঁপ লহরে রচিত। পালাটি মুড়াই সুরে গীত হয়। 'সুনাই সুন্দরী' এর ছন্দ ভাওয়ালি টিয়ালী। এই পালায় মাধবের মনোভাব অংশটি গীত হয় ভাটিয়ালী ঝাঁপ ছন্দে। 'শীলাদেবীর পালা'র গানগুলি নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ঢাকার দক্ষিণ পূর্বাংশ ও চট্টগ্রামে প্রচলিত মুড়াই ও সাইগরী ব্যতীত কোনো ভাটিয়ালী ধাঁচে গীত হয় না।

হাঁহলার প্রচলন পূর্ববঙ্গে অধিক ছিল। মূলত: পৌরাণিক কাহিনী হাঁহলায় গীত হত। হাঁহলা গীত হয় বিবাহের মত শুভ সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে। করুণ রসাত্মক ঘটনা কখন হাঁহলা সুরে গীত হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভাওয়াইয়ার মত হাঁহলা নারী কণ্ঠের উপযোগী সুর। 'শান্তিকন্যার হাঁহলা' গীত হয় হাঁহলা সুরে। 'আন্ধা বন্ধুর বাঁশি' পালাটি আদ্যন্ত গীত হয় ভাটিয়ালী সুরের বিচ্ছেদ ও সারি লহরে। 'কবরের কান্না' পালাটির প্রথম গানটি বিশুদ্ধ মুড়াই সুরে রচিত। পালাটির অন্তর্গত অপরাপর গানগুলি সাইগরী ও মিশ্র মুড়াই সুরের। 'হাতি খেদার গান' পালাটির পয়ার ছন্দে রচিত অংশটি গীত হয় 'পূবাইল মাইয়নী সুরে', অপরপক্ষে সার্ধ দ্বিমাত্রাব গানগুলি গীত হয় মুড়াই সুরের ঝাঁপ লহরে। 'রতন ঠাকুরের পালা'টি গীত হয় ঝাঁপ ও সারি লহরে। 'সন্ন মালার পালা'টির পদ্যাংশ সুষঙ্গী ও ভাওয়ালী ভাষার মিশ্রণ। এই পালাটি গায়েনদের কাছে যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। 'পরীবানু' পালাটি গীত হয় মুড়াই সুরে।

মহুয়া, মলুয়া. চন্দ্রাবতীর মত করুণ রসাত্মক পালাগুলি বিচ্ছেদ লহরে গীত হয়। কদাপি এসব পালার গান ঝাঁপ কিংবা সারি লহরে গীত হয় না।

আর একটি কথা। যেহেতু ভাটিয়ালী, মুড়াই সাইগরী ইত্যাদি নারীকণ্ঠে সুষ্ঠুভাবে গীত হয় না, তাই গীতিকাগুলি নারীকণ্ঠে গীত হত না। পুরুষ কণ্ঠেই এগুলি গীত হয় বা হত।

### ৩. গীতিকার 'ধুয়া'

ইংরেজী এবং জার্মানী গীতিকায় আমরা 'Refrain'-এর প্রাচুর্য লক্ষ্য করি। ড্যানিশ গীতিকাতেও 'Refrain' এর সন্ধান লভ্য, তবু 'refrain' গীতিকার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়। ইংরেজী 'refrain' শব্দটিকে বাংলায় 'ধুয়া' বলে বলা হয়ে থাকে, যদিও এই দুইয়ের চরিত্র অভিন্ন নয়। যাইহোক বাংলা গীতিকায় আমরা ধুযাব সন্ধান ভাল ভাবেই পাই। কিন্তু সেই সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে 'ধুয়া' বা 'refrain' সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বাংলায় 'ধুয়া' শব্দটি এসেছে 'ধ্রুব' শব্দ থেকে। অভিধানকার জানিয়েছেন ধুয়া হল 'কীর্তনাদি গানের যে পদ

দোহারগণ বারবার গায়'। অর্থাৎ 'ধুয়া' কীর্তন গানের একটা বিশেষ গায়ন রীতি বা ভঙ্গী। কিন্তু কীর্তন গানে মূল গায়কও অনেক সময় একই পদের পুনরাবৃত্তি করেন। এও ধুয়া। ইংরেজী 'refrain'-এর সঙ্গে দোহারদের গীত ধুয়ারই সাদৃশ্য, কিন্তু মূল গায়ক যে ধুয়া গান, তা 'refrain'-এর সমগোত্রীয় নয়। গীতিকাও মূলত: গান, সেই সূত্রে গীতিকায় ধুয়ার ব্যবহার মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কীর্তন গানে ধুয়া ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মূল গায়ককে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ দান। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গের মনে ভাবাবেগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক গীতির ক্ষেত্রে, বৈচিত্র্যহীন সুরের একঘেয়েমিতা দূরীকরণ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'ধুয়ার পদ সাধারণতঃ একটিমাত্র হইয়া থাকে, ইহার অধিক হয় না, ইহা অনেক সময় গীত-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্রও হইয়া থাকে। কিন্তু 'refrain'-এ অনেক সময় অধিক সংখ্যক পদও থাকে এবং পদগুলি গীত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।'[১১] ডঃ ভট্টাচার্য অন্যত্র বলেছেন, 'গীতিকায় যে ধুয়া ব্যবহৃত হইত, তাহার সঙ্গে কাহিনীর বিষয়বস্তুর কোন যোগ থাকিত না।......সেইজন্যই একই ধুয়া বিভিন্ন গীতিতে এবং বিভিন্ন গীতিকার বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত হইতে পারিত।...সমগ্র মৈমনসিংহ গীতিকায় বিভিন্ন পালাতেই প্রায় একটি অভিন্ন ধুয়া শুনিতে পাওয়া যায়।'[১২] পাশ্চাত্য সমালোচকও 'refrain'-এর অবয়ব সম্পর্কে জানিয়েছেনঃ

'... many ballads contain a refrain–a word, phrases, line or several lines....।' ডঃ ভট্টাচার্যের বক্তব্য কিন্তু আমরা একবাক্যে মেনে নিতে পারি না। কেননা ধুয়ার তুলনায়, 'refrain'-এর অবয়ব অনেক সময়েই লক্ষণীয়ভাবে দীর্ঘ। কিন্তু বাংলা গীতিকায় ধুয়া স্বরূপ যা ব্যবহৃত হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে যেমন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তা আবার দীর্ঘ। অর্থাৎ ধুয়ার সংক্ষিপ্ততম রূপের সাক্ষাৎ যেমন আমাদের গীতিকায় লভ্য, তেমনি ইংরেজি refrain এর অনুরূপ দীর্ঘ অবয়ব যুক্ত পুনরাবৃত্তিমূলক বাক্য বা বাক্যাংশের সাক্ষাৎও লভ্য। এতদ্ব্যতীত আশুবাবু যে বলেছেন ধুয়া অনেক সময়ে গীত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিন্তু refrain-এর ক্ষেত্রে তা হয় না, refrain গীত-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তার ব্যতিক্রম আমাদের গীতিকার ক্ষেত্রে যেমন লভ্য, তেমনি ইউরোপীয় ব্যালাড বা গীতিকায় ব্যবহৃত refrain-এর ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত ডেনমার্কের গীতিকায় প্রযুক্ত refrain সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য–

'It is interesting to see that the refrains in the Danish ballads are usually irrelevant to the story; they are almost certainly fragments or the earlier non narrative caroles.'

আসলে গীতিকায় refrain বা ধুয়ার ব্যবহারগত বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিষয়ের সঙ্গে তা সম্পৃক্তও হতে পারে এবং স্তবক মধ্যে স্থান পেতে পারে, আবার মূল ধুয়ার অসম্পৃক্ত ব্যবহারও সম্ভব এবং তা স্তবক শেষে ব্যবহৃত হতে পারে।

'The refrain occurs in various relationships to the stanzas : it may be internal, interspersed with the lines of the stanza; external sung after each stanza; or both internal and external, with an extra flourish at the end.' (The Ballad Tree by Evelyn Kendrickwells; Chapter IV)

কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ধুয়ার নিদর্শন স্বরূপ 'The Cruel Mother' ব্যালাডটির উল্লেখ করা যেতে পারে, উল্লেখ করা যেতে পারে 'The Bonny Banks of Virgle o' ব্যালাডের কথা। অপরপক্ষে অসম্পৃক্ত refrain-এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য 'The Two Magicians', 'Robin Hood and the Tanner'; অপরপক্ষে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্তের একত্র সমাবেশ লক্ষণীয় যে সব ব্যালাডে সেগুলি হল 'The Two Sisters', 'Robin Hood and the Bishop of Hereford', 'The Gypsy Laddie', 'The Three Ravens.' গীতিকাগুলি। তাছাড়া, বিভিন্ন গীতিকায় একই অভিন্ন ধুয়ার ব্যবহার হত, এ বক্তব্যও যথার্থ নয়।

গীতিকায় ধুয়া বা refrain ব্যবহৃত হয় নানা উদ্দেশ্যেই। কয়েকটির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। আরও কয়েকটি উল্লিখিত হল। প্রথমত: গীতিকায় বর্ণিত কাহিনীর পরিবেশকে সমৃদ্ধ করতে ধুয়ার সহায়তা গ্রহণের নিদর্শন মেলে। দ্বিতীয়ত: গীতিকার গল্পরসকে সমৃদ্ধ করতেও ধুয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৃতীয়ত: আপাত অসংলগ্ন বলে বিবেচিত যে ধুয়া তা রিলিফের কাজ করে, অনেকটা ট্রাজেডিতে ব্যবহৃত কমিক রিলিফের মত। চতুর্থত:, একটানা কাহিনী পরিবেশিত হলে যেখানে শ্রোতার আকর্ষণ হ্রাস পাবার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে ধুয়ার ব্যবহারে কাহিনীর ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ায় তাদের আকর্ষণ তথা কৌতূহল বৃদ্ধি পায় বা তা অটুট থাকে—

'One's interest is held by a singer who, with every other line, pauses for the refrain; the tale is dignified by the interruptions. Suspense mounts and mounts rhythomically with the regular recurrences of the refrain.' (The Ballad Tree by Evelyn Kendrickwells)

পঞ্চমত:, ক্ষেত্রবিশেষে গীতিকায় পরিবেশিত কাহিনীর যে মেজাজ, ধুয়াকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেজাজের করে রচনা ও ব্যবহার করায় গীতিকায় একপ্রকার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি ধুয়া বিশেষ অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং সুর ও লয় সংযোগে গীত ধুয়া কাহিনীকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করে তোলে—

'The refrain supplies feeling, melody and rhythm, enhancing the narrative by emphasis or contrast.'

ধুয়া বা refrain-এর গুরুত্ব সম্পর্কিত আলোচনার পর এর প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ধুয়া ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোন রীতি নেই। তবে সচরাচর প্রতিটি স্তবকের শেষে তা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আবার কখনও কখনও স্তবকের

মধ্যেও ধুয়ার ব্যবহার লক্ষিত হয়।

ধুয়া যে এক বা একাধিক পদের অবিকৃত পুনরাবৃত্তি তা নয়। অনেক সময় একই পংক্তির পদ বিশেষের রূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে বা তার স্থানগত পরিবর্তন ঘটিয়েও ধুয়া রচনা করতে দেখা যায়।

মৈমনসিংহ গীতিকার কম বেশি সব পালাতেই ধুয়ার ব্যবহার লক্ষণীয়। 'মহুয়া'তে ধুয়ার ব্যবহার যেমন অধিক, তেমনিই প্রয়োগগত বৈচিত্র্যও সহজেই সচেতন পাঠককে আকৃষ্ট করে। গারো পাহাড়-বন প্রদেশে হুমরার সদলবলে উপস্থিত হয়ে তার ভাইকে বিদেশে খেলা দেখাবার প্রস্তাব দান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে--'হুমড়া বাইদ্যাকে ডাক দিয়া কয় মাইন্কিয়া ওরে ভাই'।

পুনরায়, মহুয়ার আত্মঘাতিনী হবার পর দেশে ফিরে যাবার প্রস্তাব সহ হুমরা তার ভাইকে একই ভাষায় বলেছে--'হুমরা বাদা ডাক দিয়া কয় মাইন্ক্যা ওবে ভাই।' হুমরার সঙ্গে তার ভাইয়ের আত্মিক সম্পর্ক এতে যেমন পরিস্ফুট, তেমনি হুমরার মাইনকার ওপর নির্ভরতাও প্রমাণিত। নদের চাঁদকে বেদের দলের উপস্থিতি জানিয়ে 'লেংরা' একাধিকবার প্রায় একই ভাষায় বলেছে--

ক. নতুন একদল বাইদ্যা আইছে তাম্সা দেখাইবারে।।

খ. নতুন একদল বাইদ্যা আইছে তাম্সা করিবারে।।

গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে বেদের দলের উপস্থিতিতে এবং তাদের ক্রীড়া প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তারই ইঙ্গিত এখানে লভ্য। কবি সেই সঙ্গে বেদের দলের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে নদের ঠাকুর ও মহুয়ার মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলেছে সেই বিষয়ে পাঠককে প্রস্তুত করে দিতে প্রয়াস করেছেন এইভাবে।

মহুয়া নদ্যার ঠাকুরকে এবং সেই সঙ্গে তার মাতা-পিতাকে কঠিন প্রাণের বলে সমালোচনা করেছে, কারণ সময়ে নদ্যার ঠাকুরের বিবাহ হয় নি, সামান্য কিছু পরিবর্তন করে প্রায় একই পংক্তির ব্যবহার করে মহুয়া বলেছে--

ক. কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ।।

খ. কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।।

নদ্যার ঠাকুরকেও মহুয়ার অভিযোগ মেনে নিয়ে বলতে দেখা গেছে--

কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।

মহুয়াকে কবি নদ্যার ঠাকুরের অবিবাহিত থাকার ব্যাপারে অসুখী দেখিয়ে প্রকারান্তরে নদ্যার ঠাকুরের প্রতি তার অনুরক্তিকেই প্রকাশ করেছেন।

নদ্যার ঠাকুরের বাড়ী খেলা দেখিয়ে সকলকে আনন্দ দান করে হুমরা বেদে ইনাম বক্শিস্ প্রার্থনা করেছে, প্রার্থনা করেছে একখানি বাড়ি। নদ্যার ঠাকুরও সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে। উলুয়া কান্দায় বাড়ী করে বেদের দলকে থাকতে বলেছে। যে বেদেদের স্থায়ী কোন বসতি নেই, তারা স্থায়ীভাবে থাকার জায়গা পেয়ে স্বভাবত:ই খুশী হয়েছে।

তাদের সেই খুশী ধরা পড়েছে নতুন বাড়ীতে নানা তরি-তরকারীর গাছ লাগানোর বিবরণ দানে এবং তা মোটামুটি একই রূপ ভাষায় বর্ণিত হওয়ার কারণে—

ক. নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা লাগাইল বাইঙ্গন।

খ. নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো উরি

গ. নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কচু।

ঘ. নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কলা।

অর্থাৎ মূল কাহিনীর অংশ রূপেই ধুয়াগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল একটি ক্ষেত্রে 'আরভাইরে' এই সম্বোধন সূচক ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে শ্রোতৃবর্গকে উদ্দেশ করে।

'মলুয়া', 'মহুয়া'র মতই দীর্ঘ পালা, কিন্তু এতে 'মহুয়া'র মত ধুয়া ব্যবহারের আধিক্য লক্ষিত হয় না। পালার শেষ দৃশ্যে কেবল ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রায় একই পংক্তি মোট চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। যে মলুয়া তার মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করেছে, তথাপি তার অত্মীয়-পরিজন তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে অন্তহীন অভিমানে মলুয়া ভাঙ্গা নৌকার আরোহী হয়েছে এবং বলেছে—

উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।

এই ধুয়া ব্যবহারের মাধ্যমে একদিকে যেমন মলুয়ার অন্তহীন অভিমান অভিব্যক্ত, তেমনি অভিব্যক্ত হয়েছে সমাজ জীবন সম্পর্কে তার বীতশ্রদ্ধ হবার মানসিকতা, যার ফলে সে আত্মঘাতিনী হতে চেয়েছে।

'চন্দ্রাবতী' পালায় যে ধুয়ার ব্যবহার করা হয়েছে, তার মাধ্যমে চন্দ্রাবতীর জয়ানন্দের প্রতি আসক্তি প্রকাশিত। শুধু ফলের নামে পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ধুয়া প্রায় অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত—

ক. বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে চম্পা-নাগেশ্বর।

খ. বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে মালতী-বকুল।

গ. বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে রক্তজবা-সারি।

ঘ. বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে মল্লিকা-মালতী।

ঙ. বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে কেতকী-দুস্তর।

এই ধুয়ার প্রতিটির সঙ্গেই সামঞ্জস্যসূচক অব্যবহিত পরবর্তী পংক্তিতে দয়িতের প্রতি চন্দ্রাবতীর অকৃত্রিম দুর্বলতা এবং প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ দয়িতের প্রতি প্রেম প্রকাশের অনুষঙ্গ স্বরূপ ধুয়াগুলি ব্যবহৃত।

'কমলা' পালায় কারকুনের চক্রান্তের শিকার কমলা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানেও চক্রান্তের জাল সম্প্রসারিত হওয়ায় বেচারী মাতুলালয় ত্যাগ করতে দৃঢ় সংকল্প হয়। তার সেই মানসিকতার অভিব্যক্তিতে ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে—

ক. একবার না ভাবিল কন্যা জাতিকুলমান।

খ. একবার না ভাবিল কন্যা পথের আন্ধান।।

গ. একবার না ভাবিল কন্যা কি হইবে আমার গতি।

ঘ. একবার না ভাবিল কন্যা আশ্রয় কেবা দিবে।

প্রতিটি ধুয়ার শেষাংশে কমলার অনিশ্চয়তায় ভরা জীবন এবং তার করুণ অবস্থা পরিস্ফুট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম তিনটি ধুয়া পরপর ব্যবহৃত হয়েছে, কোন পংক্তির ব্যবধান ব্যতিরেকেই।

'দেওয়ান ভাবনা'য় সুনাইকে দেওয়ান ভাবনার অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে কীর্তনে দোহারদের ব্যবহৃত ধুয়ার মত ব্যবহৃত হয়েছে 'ভাবনায় লইয়া যায় রে' বাক্যাংশটি মোট চারবার। আর এইভাবেই ভাবনার অপকর্ম এবং সুনাইয়ের ভাগ্যাহত হওয়ার বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সুনাইয়ের প্রত্যক্ষ উক্তিতে তার ভাগ্যাহত হওয়ার বিবরণ যথাস্থানে পৌঁছে দেবার অনুরোধ উচ্চারিত হয়েছে এইভাবে—

ক. কইও কইও কইও দূতী কইও মায়ের আগে।

খ. কইও কইও কইও দূতী কইও মামীর আগে।

গ. কইও কইও কইও দূতী দুষ্মন মামার ঠায়।

ঘ. কইও কইও কইও দূতী প্রাণ-বন্ধুর আগে।

এখানে চারটি পংক্তির প্রতিটির প্রথমাংশ অবিকৃত রূপে ব্যবহৃত, রূপান্তরিত হয়েছে সুনাইয়ের সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় অংশটি।

'রূপবতী' পালাতেও ধুয়ার ব্যবহার লক্ষণীয়। কাঙ্গালীয়া ও জাঙ্গালীয়ার আশ্রিতা রূপবতী যখন অবগত হয়েছে তার পিতা তার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে বলিদানের উদ্দেশ্যে, তখন রূপবতী তার জীবনেতিহাস বর্ণনা করেছে এবং সুনাইকে সকরুণ কণ্ঠে আবেদন জানিয়েছে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য (ছাইড়া দে) যাতে সে ব্যাপারটি সরেজমিনে দেখে আসতে পারে। এ ক্ষেত্রেও কীর্তন গানে ব্যবহৃত ধুয়ার মতই 'ছাইড়া দে' পদ এগারবার ব্যবহৃত হয়ে রূপবতীর বেদনাজীর্ণ হৃদয়কে জীবন্ত করে প্রকাশ করেছে।

বাংলা গীতিকায় যে ধুয়ার ব্যবহার লক্ষিত হয় তার সিংহভাগই মূল গায়কের দ্বারা গীত হবার জন্য রচিত, দোহারদের দ্বারা গীত হবার উপযোগী ধুয়া তুলনামূলকভাবে কমই ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য,—

'...লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গীতিকায় এই ধুয়া রচনার সঙ্গে মূল কবির কোন সম্পর্ক থাকিত না, কিংবা তাহার দোহারেরা ইচ্ছামতই তাহা যোগ করিত।'[১৩]

—একবাক্যে মেনে নেওয়া যায় না। মূল গায়কের দ্বারা গীত হবার জন্য রচিত ধুয়া মূল কবির দ্বারা রচিত হবার সম্ভাবনাই অধিক।

### ৪. গীতিকার ছন্দ

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করেছেন, 'গীতিকামাত্রই প্রচলিত রচনারীতির অনুগামী ; ছড়ার বিষয় বস্তুর মধ্যে যেমন আকস্মিকতা ও অভিনবত্ব অনেক সময়

চোখে পড়ে, তেমনই ছন্দের দিক দিয়াও অনেক সময় নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গীতিকার রচনা-রীতিতে কোন বৈচিত্র্য নাই। একই ছন্দে ইহা আনুপূর্বিক রচিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র একটি গীতিকাই যে আনুপূর্বিক অভিন্ন ছন্দে রচিত হয়, তাহা নহে—ইহা রচনার দ্বিতীয় আর কোন ছন্দই নাই ; একই পরিচিত ছন্দ ইহার সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।'[১৪] আশুতোষবাবু বলতে চেয়েছেন গীতিকাগুলি আনুপূর্বিক ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ ৪+৪+৪+২ এই মাত্রা সীমায় রচিত। অবশ্য তিনি আরও বলেছেন, 'ক্বচিৎ কোন গীতিকায় মধ্য বাংলার অন্য কোন রচনার প্রভাববশত: চারিমাত্রার পর্বকে ছয়মাত্রা কিংবা আট মাত্রার পর্বে বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নহে।'

আশুতোষবাবুর মন্তব্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশের পূর্বে আমরা বিভিন্ন গীতিকার অংশ বিশেষ উদ্ধার করে সেগুলির ছন্দোনির্মিতি কৌশল আগে লক্ষ্য করব।

ক. নাগরিয়া সবে মিলে । চক্রান্ত করি সকলে । ৮+৮
ছল করি কঙ্কে খেদাইল । ১০
বুঝিতে পারিয়া তবে । ডাকাইয়া শিষ্য সবে । ৮+৮
কঙ্করে আনিতে যুক্তি দিল । ১০ (কঙ্ক ও লীলা)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে অক্ষরবৃত্তে 'বিজোড়ে বিজোড় গাথ, জোড়ে গাথ জোড়', রীতির অনুসরণ 'চক্রান্ত করি সকলে' হয়নি। তারই প্রমাণ 'চক্রান্ত' এই তিন মাত্রার শব্দটির পরে ব্যবহৃত হয়েছে 'করি' এই জোড় মাত্রার শব্দটি।

খ. কহিলা রাজার পুত্র । মনেতে ভাবিয়া ।। ৮+৬
কা-।। ,গ্রা করে বাপে । নরবলি দিয়া ।। ৮+৬ (কমলা)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতিটি চরণের প্রথম পর্ব আটমাত্রা বিশিষ্ট, অপরপক্ষে দ্বিতীয় পর্বটি ছয় মাত্রার।

গ. এদিকে হইল কিবা । শুন দিয়া মন ।। ৮+৬
দুষ্মনি করিল যত । জ্ঞাতি বন্ধুগণ ।। ৮+৬ (মলুয়া)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পর্বটি আটমাত্রার এবং দ্বিতীয় পর্বটি ছয়মাত্রার।

ঘ. কাইন্দ না । কাইন্দ না । কন্যারে না । কান্দিয়ো আর। ৪+৪+৪+৪

। । । । । । । । । । । । । ।
নিশি রাইতে | কইবাম কন্যা | তোমার সমা | চার।। ৪+৪+৪+১ (কাজলরেখা)

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে রচিত। প্রতিটি পর্ব চারমাত্রার।

। । । । । । । ।
ঙ. বনে থাকে | কাঠুরিয়া ।| ৪+৪
। । । । । । । ।
বুক ভরা | দয়া মায়া ।। | ৪+৪
। । । । । । । ।
গাছ কাটে | বিরিক্ষ কাটে । | ৪+৪
। । । । । । । ।
বিকায় নিয়া । দূরের হাটে ।। । ৪+৪ (রাজা তিলক বসন্ত)

স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতিটি পর্ব এখানে চারমাত্রার। তৃতীয় পংক্তিতে ব্যবহৃত 'গাছ' শব্দটি আপাতভাবে একমাত্রার, কিন্তু বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের জন্য দুই মাত্রা ধরা হয়েছে। তৃতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্বটিতে ছন্দসন্ধি হয়েছে। তাছাড়া 'বিরিক্ষ' মূলে তিনমাত্রার শব্দ, কিন্তু সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের জন্য এখানে দুই মাত্রা ধরা হয়েছে।

চ. । ।।। ।। ।। । । । । ।। । । । ।
রূপ ধনোকে | কঙ যায়া, | আর এক ঘড়িও | এটে না থা | কিম মুই, ।
৪+(৩=৪)+৪+৪+২

। । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
জবো করবার | বাদে হাটোং | বেচে ফেলাইবে | রহিমোক | কী কাথা মুই। কই।
৪+৪+(৫=৪)+৪+৪+১ (রূপধন কইন্যা)

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে রচিত। 'ফেলাইবে', দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় পর্বে এখানে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয়েছে। তাই মূলে পাঁচমাত্রার হওয়া সত্ত্বেও এখানে চারমাত্রা ধরা হয়েছে।

ছ. । । । । । । । । । । । । । । ।
বাপের বাড়ীর | তাজী ঘোড়া | আরে আমার | মাথা খাও ।
৪+৪+৪+৩

। ।।। । । । ।।। ।
যেই দেশেতে | বাপ মাও | সেই দেশেতে | যাও ।। ৪+ (৪)+৪+১
। । । । । । । । । । । । । ।
বাপের আগে | কইও ঘোড়া | কইও মায়ের | আগে । ৪+৪+৪+২
। । । । । । । । । । । । । ।
তোমার কন্যা | মহুয়ারে | খাইছে জংলার | বাঘে ।। ৪+৪+৪+২ (মহুয়া)

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে রচিত। প্রতি চরণের প্রথম তিনটি পর্ব চার মাত্রার। তবে

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্বটির 'বাপ মাও' এই রুদ্ধদল দুটি বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হবে। তার ফলে ২+২= চার মাত্রার পর্ব হয়ে উঠেছে।

জ. (আরে) দুই আঙ্খি | অপরাজিতা ৪+৪
কইন্যা তর | বদন চম্পার । ফুল । ৪+৪+১
ডালুম রাঙা | ঠোট দুইখানি । ৪+৪
গালে ঢাইলাছে | সিঁদুর ।। ৪+২
এই না ফুলে | গাইন্থ্যা মালা । ৪+৪
আজি পরিবাম | গলায় । ৫+২
চোরের ধন | কাইড়া লইলে । (৩)+৪
নাই সে বড়ো | দায় ৪+১ (রতন ঠাকুরের পালা)

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে রচিত। প্রথম চরণের প্রথম পর্বের—'দুই' শব্দটির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ হবে। দ্বিতীয় চরণের প্রথম পর্বের অন্তর্গত 'তর' শব্দটিরও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ। চতুর্থ পংক্তির প্রথম পর্বের অন্তর্গত 'ঢাইলাছে' কথাটির ছন্দসন্ধির ফলে উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে 'ঢাইল্‌ছে'। সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের কারণে। সপ্তম চরণের প্রথম পর্বের অন্তর্গত 'ধন' এর ক্ষেত্রেও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয়েছে।

অতএব গীতিকার রচনারীতি বৈচিত্র্যহীন, কিংবা গীতিকা মাত্রই একই রূপ ছন্দে রচিত হয়, অথবা গীতিকাগুলি আনুপূর্বিক ছড়ার ছন্দে রচিত হয়, বক্তব্যকে আমরা এক বাক্যে মেনে নিতে পারিনা। ঝোঁক শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে থাকলেও, গীতিকা আনুপূর্বিক বৈচিত্র্যহীন, ছড়ার ছন্দে রচিত—তা যথার্থ নয়।

সংস্কৃত ছন্দের লঘুগুরু উচ্চারণ প্রাকৃত স্তরে বিলুপ্ত। প্রাকৃতে সংস্কৃতের মত ধ্বনিস্পন্দ না থাকায় অন্ত্যমিলের প্রতি কবিরা ক্রমান্বয়ে আসক্ত হয়েছেন। বাংলায় এই অন্ত্যমিল আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং শব্দ উচ্চারণে ক্রমান্বয়ে দল নির্ভরতা বেড়েছে। ফলতঃ দলের ধ্বনি পরিমাণ বাংলা কবিতার আদি পর্ব থেকেই কবিতা রচনায় কবিরা হিসাবের মধ্যে রেখেছেন। লৌকিক কবিরা রীতিনিষ্ঠ ভাবে ছন্দ নির্ভর ছিলেন এমন নয়, কিন্তু তাঁদের স্বাভাবিক ছন্দ বোধই কবিতা রচনায় তাঁদের চালিত করেছে। গীতিকা মূলত: গান, তাই রীতিনিষ্ঠ ভাবে ছন্দ বিচারের সময় সে কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

# অষ্টাদশ অধ্যায়

# গীতিকার অলংকার

ডক্টর ভেরিয়ার এলউইন তাঁর 'Folk-Song of Chhattisgarh' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: 'Symbolic method is found every where in Indian folkpoetry!' তত্ত্বসঙ্গীতে ও প্রেমসঙ্গীতে আমরা রূপকের বহু ব্যবহার লক্ষ্য করলেও গীতিকায় দেখা যাবে লোককবিরা অলংকার প্রয়োগে যথার্থই মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই নৈপুণ্যের পরিচয় গ্রহণ করব। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যালাডে প্রযুক্ত অলংকারের সঙ্গে তুলনায় আমাদের কবিদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করব।

সোনা

ক. আন্দাইর ঘরে থুইলে সোনা কন্যা জ্বলে কাঞ্চন সোনা। (মহুয়া) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

খ. কিবা মুখ কিবা সুখ ভুরুয় ভঙ্গিমা।
আন্ধাইর ঘরেতে যেমন জ্বলে কাঞ্চা সোনা।। (মলুয়া) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, উপমা।

গ. তুমি ত ঘরের বধূ অঙ্গ কাঞ্চা সোনা। (মলুয়া) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

ঘ. আমার স্বামী কাঞ্চা সোনা অঞ্চলের ধন। (মলুয়া) "

ঙ. সোনার অঙ্গেতে তার সোনার সাজন। (কমলা) (যমক?)

চ. সোনার কলি আলাল দুলাল আর তারার দিকে চাইয়া। (দেওয়ানামদিনা), লুপ্তোপমা।

ছ সোনার মন্দির দেখ আন্ধাইর করিয়া।
সন্ধ্যাকালের বাতি যেন গেল রে নিবিয়া।।
(দস্যু কেনারামের পালা) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

জ. অঙ্গে মাখিয়া তার থইছে কাঞ্চা সোনা। (রূপবতী) নিদর্শনা

ঝ. রক্ত গৌর তনু তার কাঞ্চনের কায়া। (কঙ্ক ও লীলা) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

মুক্তা

ক. দুর্লভ মুকুতা যেমন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা। (কঙ্ক ও লীলা) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

হীরামতি

ক. ছয় না বচ্ছরের সুনাই গো ইরামতী জ্বলে। (দেওয়ান ভাবনা) নিদর্শনা।

**মানিক**

ক. মানিকের কাছে দেখ ছিসের মতন।। (দস্যু কেনারামের পালা) দৃষ্টান্ত।

খ. সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল। (মহুয়া) উপমা।

গ. সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী।। (মহুয়া) দৃষ্টান্ত।

আমাদের গীতিকায় মূল্যবান খনিজ পদার্থের মধ্যে সোনার উল্লেখ সর্বাধিক। পাশ্চাত্য গীতিকাতেও সোনা এই ধাতুটির প্রসঙ্গ বারংবার এসেছে তুলনা দানের ক্ষেত্রে। দুটি ক্ষেত্রেই মহার্ঘতা ও বিশেষত: সোনাব বর্ণের কারণেই লোককবিদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে সোনা, তবে পাশ্চাত্য গীতিকায় যেখানে সোনা কেশের বিবরণ দান প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে আমাদের গীতিকায় নায়িকার অঙ্গের বর্ণ, দীপ্তি, যৌবন অথবা নায়কের মহার্ঘতা প্রসঙ্গে সোনার তুলনা প্রদত্ত হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে পাশ্চাত্য গীতিকা থেকে—

ক. The very hair O'my love's head
was like the threads O' gold.–James Herrieo, 99-100 (i,209)

খ. And gowden was her hair.–The Lass of Lochroyan, (142, (ii), 112)

গ. How gowden yellow is your hair–Lady Elspot, 2
(iv, 308)

ঘ. The hair that hung owre Johnie's neck shined
Like the links o'yellow gold.–Johnie Scot, 75-76 (iv, 54)

সমালোচক এই কারণেই মন্তব্য করেছেন—

'The greater number of the figures suggested by resemblances to gold are used of the hair of individuals.'

পাশ্চাত্য গীতিকায় crystal, pearl, Jewel ইত্যাদিও তুলনায় এসেছে, তবে নিতান্ত সীমিত সংখ্যায়। আমাদের গীতিকাতেও মুক্তা, হীরামতি বা মানিকের প্রসঙ্গ এসেছে তুলনা দানের প্রসঙ্গে, তবে তা সোনার তুলনায় নিতান্তই সীমিত সংখ্যায়। মুক্তার তুলনা করা হয়েছে নায়িকার চোখের সঙ্গে :

Her comely eyes, like orient pearls–Fair Rosemond, 11 (vii, 284)

মানিকের ব্যবহার হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব অর্থে :

Ye are my jewel–Blancheflour and Jelly florice 85 (iv, 298)

**পদ্মফুল**

ক. পদ্মের মতন দেখি দুখানি চরণ। (রূপবতী) লুপ্তোপমা।

খ. পদ্মের সমান কন্যার যেমন মুখখানি। (রূপবতী) উপমা।

গ. সুন্দর বদন লীলার ফোটা পদ্মফুল। (কঙ্ক ও লীলা) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

ঘ. বদন সুন্দর লীলার পদ্মের সমান। (কঙ্ক ও লীলা) উপমা।

ঙ. গোবরে ফুটিল পদ্মফুল। (কঙ্ক ও লীলা) অতিশয়োক্তি।

চ. বেঙ্গে কবে শুনেছিস পদ্মের মধু খায়। (কমলা) কাকুবক্রোক্তি।

ছ. মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইর গো শতেক পদ্মফুল। (দেওয়ান ভাবনা) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

জ. সাপে যেমন পাইল 'মণি' পিয়াসী পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল। (মহুয়া) মালোপমা।

ঝ. শুকাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল। (কমলা) রূপক।

ঞ. জলেতে সুন্দরী কন্যা ফুটা পদ্মফুল। (") প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

### অপরাজিতা

ক. জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আঁখি। (কমলা) ্যতিরেক।

### ধুতুরা

ক. সর্বাঙ্গ হইয়াছে তোমার ধুতুরার ফুল। (মলুয়া) লুপ্তোপমা ; সামান্য ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দযুক্ত।

### চাঁপা

ক. শাউনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি।
অঙ্গে নাহি ধরে রূপে চম্পক বরণী।। (কঙ্ক ও লীলা) উপমা।

### রক্তজবা

ক. রক্তজবা আখি কেনা পাগলের প্রায়। (দস্যু কেনারামের পালা) উপমা।

খ. রক্তজবা আখি কন্যা কুট্টুনিরে কয়। (মলুয়া) উপমা।

### মহুয়ার ফুল

ক. এই ত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল।। (মলুয়া) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

খ. সুন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফুল। (") লুপ্তোপমা।

### মল্লিকা

ক. পরথম যৌবন কন্যা সদা হাসিখুশী।।
হাসিলে বদনে ফুটে মল্লিকার রাশি।। নিদর্শনা।

**ফুল**

ক. ভমর হইলাম আমি তুমি বনের ফুল।। (মহুয়া) ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপক।

খ. বনফুলে মনফুলে পূজিব তোমায়। (চন্দ্রাবতী) রূপক।

গ. পুষ্প না বাগানে কন্যা পুষ্প তুলতে যায়।
মৈলান হইয়া ফুল পাতাতে লুকায়।। (কঙ্ক ও লীলা) ব্যতিরেক।

ঘ. একেশ্বরী হইয়া লীলা থাকয়ে বিজনে।
ফুটিয়া বনের ফুল থাকে যেমন বনে।। (কঙ্ক ও লীলা) উপমা।

ঙ. এমন ফুলের মধু মানুষে না দিব। (কমলা) অতিশয়োক্তি।

চ. পুষ্প বনেতে যেমন লাগিল আগুনি।
শিরে রক্ত উঠে কন্যার অন্তর বাগুনি।। (") বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

মৈমনসিংহ গীতিকায় ফুলের প্রসঙ্গ বারংবার যেমন এসেছে, তেমনি নির্দিষ্টভাবে নানাবিধ ফুলের প্রসঙ্গও উপস্থাপিত হয়েছে। পাশ্চাত্য গীতিকাতেও দেখি একই ব্যাপার অর্থাৎ সাধারণভাবে ফুলের প্রসঙ্গ যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনিই নির্দিষ্টভাবে কয়েকটি ফুলের প্রসঙ্গও লোককবিরা এনেছেন। যেমন সাধারণভাবে ফুলের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে এইভাবে–

The flower of my affected heart,
whose sweetness doth excell.
–Fair Rosamond, 53-54 (vii, 286)

পাশ্চাত্য গীতিকার মত আমাদের গীতিকায় নায়িকাকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আবার প্রিয়জনকে বনফুলে পূজা করার অভিলাষ অথবা নায়িকা কর্তৃক কুসুম উদ্যান থেকে কুসুম চয়নের প্রসঙ্গেও পুষ্পের অনুষঙ্গ এসেছে।

কুসুম বিশেষের উল্লেখে আমাদের গীতিকার বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশের সুপরিচিত অনেক ফুলের প্রসঙ্গই গীতিকাগুলিতে লভ্য। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লিখিত হয়েছে পদ্ম, তারপরে সংখ্যার বিচারে স্থান চাঁপার। এতদ্ব্যতীত মল্লিকা, অপরাজিতা, ধুতুরা, মহুয়ার ফুল, এমনকি রক্তজবাও উল্লিখিত হয়েছে। আবার অনুল্লিখিত ফুলের সংখ্যাও যে নেহাৎ কম নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশ্চাত্য গীতিকায় নায়িকাকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে–

Come ben, come ben, my lily flower.–Young Akin, 207 (i, 188)

অথবা Gang to your bower, my lily flower.–Blanche flour and Jelly florice, 81 (iv 298)

কিংবা, She brightened like the lily flower–The Gay Goss-Hawk, 47-48 (iii, 283)

কিন্তু আমাদের গীতিকায় সাধারণভাবে যেমন নায়িকাকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তেমনি অনেক সময়েই নায়িকার হস্ত, পদ, মুখমণ্ডল ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গেও পদ্মের তুলনা করা হয়েছে। নায়িকার যৌবনকেও পদ্মের সঙ্গে

অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য গীতিকায় পদ্মের মত গোলাপ ফুলের প্রসঙ্গও বারংবার এসেছে কখনও বা সুমিষ্ট গন্ধের তুলনা দান প্রসঙ্গে, কখনও বা শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে। যেমন–

ক. A breath as sweet as rose–Gilderoy, 10 (vi, 198)

খ. But like the rose among the throng was the lady and her maries fair.–The Hireman Chiel, 214-215 (viii, 241)

গ. The feurist rose in all the world.
–Fair Rosamond, 51, (vii, 286)

বাংলাদেশে গোলাপ ফুল অপরিচিত না হলেও গীতিকায় এর স্থান হয় নি।

নদী

ক. শাউনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি। (কঙ্ক ও লীলা) উপমা।

খ. তোমার ত যৌবন ছিল জোয়ারের পানি।। (কমলা) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

গ. আষাইঢ়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে।। (কমলা) রূপক।

ঘ. যৈবন আইল দেহে জোয়ারের পানি। (চন্দ্রাবতী) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

পাহাড়

ক. পাহাড়িয়া দেহ যেন কাল মেঘের সাজ।
যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ।। (দস্যুকেনারামের পালা) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

খ. কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্বত প্রমাণ।। (দস্যু কেনারামের পালা) লুপ্তোপমা।

গ. আমার সোয়ামী সে যে পর্বতের চূড়া। (মলুয়া) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

ঘ. শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন।। (চন্দ্রাবতী) লুপ্তোপমা।

পাহাড়-পর্বতের তুলনা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব গীতিকাতেই লভ্য। নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পর্বত—শীতলতা, সমুচ্চতা, বিশালতা, মৌনতার কারণে পর্বত লোককবিদের সহজেই আকৃষ্ট করেছে। বাতাস ক্ষিপ্রতার প্রতীক, কিন্তু তা পরিবর্তনশীল, অপরপক্ষে পর্বত অপরিবর্তনীয়। এও তাকে লোককবিদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

পর্বত যেমন মৌন, শোকে দুঃখে মানুষও অনেক সময় নিথর বাক্‌শক্তিহীন হয়ে পড়ে, যেমন 'চন্দ্রাবতী'তে চন্দ্রার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। অনুরূপ বিবরণ পাশ্চাত্য গীতিকাতেও আমরা লাভ করি–

The young men answer'd never a word,
They were dumb as a stane.–Robin Hood and the
Beggar. 215-216 (v, 202)

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসাবে পর্বত ব্যবহৃত হয়েছে 'মলুয়া' পালায়, যেখানে স্বামীকে

পর্বতের চূড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য গীতিকাতেও অনুরূপ বিবরণ লক্ষ্য করি—

To lift him as high as a rock–The Dragon of Wantley,
132 (viii, 133)

বিশালাকৃতির তুলনা প্রসঙ্গে আমাদের গীতিকায় যেখানে পর্বত বা পাহাড়ের অনুষঙ্গ এসেছে, পাশ্চাত্য গীতিকায় সেক্ষেত্রে নিথর থাকা এবং কাঠিন্য বোঝাতেই তা প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন—

ক. He stood as still as rock of stane.
–Kinmont willie, 178 (vi, 66)

খ. Her heart's hard as marble–willow, willow, willow, 19 (iv, 235)

গ. her heart as hard as stone.–Queen Dido, 50 (viii, 209)

প্রতিক্রিয়াশূন্য শীতলতার প্রসঙ্গেও পাশ্চাত্য গীতিকায় পর্বত ব্যবহৃত হয়েছে—

He kissed her cold lips, which were colder than stane.
–Lord Salton and Auchanarchie, 55 (ii, 170)

অর্থাৎ পাশ্চাত্য গীতিকায় পর্বতের অনুষঙ্গ নানা বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে স্বীকার করতে হয়।

### বৃক্ষলতা

ক. প্রথম যৈবন কন্যা কমনীয় লতা। (কঙ্ক ও লীলা) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

খ. বিরক্ষ মইরা গেলে যেমুন গো ঝুইরা পড়ে লতা।
লতা যদি শুক্যা গেল গো ঝরে পুষ্প পাতা।। (দেওয়ান ভাবনা) উপমা।

পাশ্চাত্য গীতিকায় বৃক্ষের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে কখনও লঘুতা বোঝাতে, আবার কখনও বা কাঠিন্য বোঝাতে। যেমন—

ক. Robene on his way is went,
As licht as leif of tre–Robene and Makyne, 65-66 (iv, 248)

খ. "They say" quoth Thomas, "women's tongues
Of aspen leaves are made"–Wanton wife of Both, 77-78 (viii, 155)

গ. They are as stiff as any tree.--Rookhope Ryde, 9-12 (vi, 122)

কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকায় অবলম্বন অর্থেই বৃক্ষের ব্যবহার লক্ষণীয়।

### চাঁদ

ক. সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান।
আসমানে তারার মধ্যে পূর্ণ মাসীর চান।। (মহুয়া) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

খ. শুন চন্দ্রমুখী কন্যা কহি যে তোমারে। (মলুয়া) উপমা।
গ. ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন। (") উপমা।
ঘ. কোথায় তনে আইল পুরুষ চান্দের মতন।। (") " ।
ঙ. দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান।। (") উপমা।
চ. চান্দের সমান রূপ করে ঝলমল।। (") " ।
ছ. যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন। (চন্দ্রাবতী) উপমা।
জ. কুলে শীলে তুমি ঠাকুর চন্দ্রের সমান। (") " ।
ঝ. দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নুমাসীর চান্।। (চন্দ্রাবতী) উপমা।
ঞ. চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল। (কমলা) উপমা।
ট. নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন।
রূপেতে রোসনাই করে চান্দমা যেমন।। (কমলা) উপমা।
ঠ. নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে।
আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে।। (কমলা) সমাসোক্তি।
ড. দেখহ আমার রূপ চান্দের কিরণ। (কমলা) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।
ঢ. তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া।
আশমানে চান্দ যেমন আমারে পাইয়া।। (কমলা) উপমা।
ণ. সন্ধ্যাকালের তারা কিম্বা নিশাকালের চান্দ। (") সন্দেহ।
ত. পূর্ণিমার চান্দ যেমন দেখি মায়ের কোলে।
সর্ব দুঃখ দূর হইল জনমের কালে।। (কমলা) অতিশয়োক্তি।
থ. মায়ের কোলে উঠে সুনাই গো পুন্নিমার শশী।।
(দেওয়ান ভাবনা) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।
দ. চান্দের সমান কন্যাগো বর যে কালা হয়। (দেওয়ান ভাবনা) লুপ্তোপমা।
ধ. সোনার কাত্তিক অইব জামাই গো যেমন চান্দের ছটা। (দেওয়ান ভাবনা) উপমা।
ন. দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সমান। (দেওয়ান ভাবনা) উপমা।
প. দেখিতে যৈবতী কন্যা পূর্ণিমার চান।। (") প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।
ফ. কন্যার রূপেতে উজলা পদ্মবন।।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিল ধরায়। (দস্যু কেনারামের পালা) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।
ব. মায়ের অঞ্চলের নিধি গো মায়ের পরাণী।
দিন দিন বাড়ে যেমন চান্দের লাবণী। (") লুপ্তোপমা।
ভ. গণ্ডেতে সিন্দুরের মালা চান্দের বরণ। (রূপবতী) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।
ম. পালঙ্কে ঘুমায় কন্যা চান্দের সমান। (") উপমা।
য. জিনিয়া চান্দের ছটা যেন হুরপরী।। (রূপবতী) ব্যতিরেক।
র. ভাদ্রমাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা।

বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা।। (কঙ্ক ও লীলা) উপমা।

ল. চান্দের সমান রূপ দেখিতে অপ্সরী।। (") লুপ্তোপমা।

ব. চান্দমুখ দেখিয়া চান্দ আন্ধাইরেতে লুকে। (") রূপক, যমক, সংসৃষ্টি।

শ. মেঘেতে ঢাকিল যেমন পুন্নমাসী চান।। (") উপমা।

মৈমনসিংহ গীতিকায় চাঁদকে নিয়েই সর্বাধিক অলংকার রচিত হয়েছে। লক্ষণীয় মূলত নায়ক এবং নায়িকার সৌন্দর্য বর্ণনাতেই চন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে নায়ক অপেক্ষা নায়িকার সৌন্দর্য বর্ণনাতেই চন্দ্রের প্রসঙ্গ অধিকতর এসেছে, তবে নায়কের প্রসঙ্গও মোটেও অকিঞ্চিৎকর থাকেনি। পাশ্চাত্য গীতিকাতেও চন্দ্রের প্রসঙ্গ লক্ষণীয়—Gaed as licht as a glint o' the moon–Lord John, 20 (i, 135)

একটি ক্ষেত্রে 'বাড়ী'র সঙ্গে চাঁদের তুলনা করা হয়েছে। সীমিত ক্ষেত্রেই সূর্যের সঙ্গে চাঁদের তুলনা করা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামগ্রিক সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গেই চাঁদ উল্লিখিত হয়েছে।

### সূর্য

ক. মশালের তেজে হইল বন যে উজালা।
সূর্যের পরশে যেমন দিন হইল আলা।। (দস্যু কেনারামের পালা) প্রতিবস্তূপমা।

খ. দুইজনে চলিল ভালা ঘোড়ার সুয়ার হইয়া।।
চান্দ সুরুজ যেন ঘোড়ায় চড়িল।। (মহুয়া) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

গ. প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা। (চন্দ্রাবতী) সমাসোক্তি।

ঘ. সূর্যের সমান রূপ বংশের দুলাল। (চন্দ্রাবতী) লুপ্তোপমা।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য গীতিকা নির্বিশেষে সূর্য ঔজ্জ্বল্য অথবা দীপ্তির বর্ণনা প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে। চাঁদের তুলনায় আমাদের গীতিকাগুলিতে সূর্যের উল্লেখ উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। নারী কমনীয়তার প্রতীক, তাই নারী প্রসঙ্গে সূর্যকে লোককবিরা ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকেছেন। তবে পাশ্চাত্য গীতিকায় নারীর দৃপ্ত দৃষ্টিকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

She cast an eye on little Musgrave,
As bright, as the summer sun.
–Little Musgrave and the Lady Bernard, 13–14 (ii, 16)

### তারা

ক. মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি। (মহুয়া) উপমা।

খ. আসমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া (মলুয়া) নিদর্শনা।

গ. স্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে। (কমলা) ব্যতিরেক।

ঘ. সন্ধ্যাকালের তারা কিম্বা নিশাকালের চান্দ। (কমলা) সন্দেহ।
ঙ. সুন্দর কুমার সে যে প্রভাতিয়া তারা।। (রূপবতী) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।
চ. দেখিতে সুন্দর রূপ আসমানের তারা।। (") " ।

**কোকিল**

ক. কন্যার কণ্ঠস্বরে কোইলে পায় লাজ। (কমলা) ব্যতিরেক।
খ. সুধা মাখা গানে তার কুকিলায় মানে হার,
বীণাতন্ত্রী লাজেতে মৈলান। (কঙ্ক ও লীলা) ব্যতিরেক।
গ. কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কোকিলে কয় কথা।। (কমলা) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

**পাখী**

ক. তুমি যে আছিলা আমার হৃদ্-পিঞ্জরার পংখী। (দেওয়ানা মদিনা) নিরঙ্গরূপক।
খ. পংখী মোর উড়্যা গেছে আছে কেবল কায়া।। (দেওয়ানা মদিনা) বিরোধাভাস।
গ. বনের পংখী অইয়া যেমন উইড়া গেলে চইলে।। (দেওয়ানা মদিনা) পরিণাম।
ঘ. পরাণের পংখী আমার পরাণ লইয়া গেলা। (দেওয়ানা মদিনা) নিরঙ্গরূপক।

**বক**

ক. বগা যেমন চউখ বুজএ্যা পগারের ধারে।
সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে।। (দেওয়ানা মদিনা) দৃষ্টান্ত।

**খঞ্জন**

ক. চক্ষু দুইটি দেখি ভাল নাচয়ে খঞ্জনী।। (রূপবতী) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।
খ. আঁখির ফাঁকেতে তার নাচয়ে খঞ্জনা। (মলুয়া) " ।
গ. চলনে খঞ্জন নাচে বলনে কুকিলা। (চন্দ্রাবতী) " ।

**তোতাপাখী**

ক. মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
এই দেশেনি উইড়া আইছে আমার তোতাপাখী।। (মহুয়া) অতিশয়োক্তি।

পাশ্চাত্য গীতিকায় তুলনামূলকভাবে পাখী অপেক্ষা অন্য জন্তু-জানোয়ারের প্রসঙ্গ অনেক বেশি এসেছে—অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে। আমাদের গীতিকায় পাখীর কণ্ঠস্বরের মিষ্টতাকেই তুলনা করা হয়েছে নায়িকার কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্বের বিবরণ দান প্রসঙ্গে, আবার কখনও কখনও নায়িকাকে পাখীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তার প্রতি অন্তরের তীব্র আকর্ষণ ও আসক্তি বোঝাতে। বিশেষ বিশেষ পাখীর অঙ্গ বিশেষের উল্লেখে নায়িকার অঙ্গের বিবরণ দানও লক্ষণীয়। কিন্তু পাশ্চাত্য গীতিকায় দ্রুততা

বোঝাতে ভীত পাখীর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে—

ক. And he's gone skipping down the stair,
Swift as the bird that flew–The Hireman Chiel, 31-32 (viii, 234)

খ. As blyth as any bird on tree–The Laird of waristoun, 16, (iii, 319)

গ. He has gone whistling o'er the knowe,
Swift as the bird that flow.–The Hireman Chiel, 192-193 (viii, 240)

পাখীর সুমিষ্ট কলতানের তুলনায় নায়িকার কণ্ঠস্বরের, সঙ্গীতের উৎকর্ষ বোঝাতেও পাখীর অনুষঙ্গ পাশ্চাত্য গীতিকায় এসেছে। যেমন—

The bird in the bush sung not so sweet
As sung this bonny lady–The Rantin Laddie, 95-96 (iv, 101)

**দেব দেবীর চরিত্র**

ক.. মদনের ঘাটে আমি খেওয়া দিয়া যাই। (কমলা) রূপক, মদন, যৌবন অর্থে।

খ. তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া। ( " ) অতিশয়োক্তি।

গ. মদন-আগুনে আমি পুড়ি রাত্রি দিন। ( " ) রূপক, যৌবন অর্থে।

ঘ. কার্তিক দেখিল যেন দাঁড়াইয়া পাশে। ( " ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

ঙ. লক্ষ্মীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ। ( " ) ব্যতিরেক।

চ. কার্তিকের সমান রূপ তাহারে দেখিয়া।
পরাণে মজিলাম আমি দগ্ধ হৈল হিয়া।। ( " ) তুল্যযোগিতা।

ছ. লক্ষ্মীপূজা করে লোকে লক্ষ্মীর কারণ।। ( " ) যমক।

জ. রূপেতে জিনিল যেমন রতির মদন।। ( " ) ব্যতিবেক।

ঝ. সোনার কার্তিক অইব জামাই গো যেমন চান্দের ছটা। (দেওয়ান ভাবনা) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

ঞ. দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সমান। ( " ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

ট. কিবা রূপ জিনিয়া মদনে।। (কঙ্ক ও লীলা) ব্যতিরেক।

ঠ. এক পুত্র হইল তার নামেতে সুধন।
রূপেতে জিনিয়া যেন রতির মদন।। (কমলা) ব্যতিরেক।

ড. তার আগে এক কন্যা হৈল রূপবতী।।
স্বর্গ ছাড়িয়া উপনীত যেমন সরস্বতী।। (কমলা) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

কি আমাদের গীতিকায়, কি পাশ্চাত্য ব্যালাডে বর্ণের ব্যবহার চোখে পড়ার মত। পাশ্চাত্য সমালোচক মন্তব্য করেছেন : Every thing sparkles, the lawn is green, the sky is fair, the lady's hand is milk-white, her dress is

green as grass, her cheek is rosy...,' বিভিন্ন দৃষ্টান্তের উল্লেখে আমরা এই মন্তব্যের যাথার্থ্যের সন্ধান নিতে পারি।

লাল

ক. গণ্ডেতে সিন্দুরের ঝালা চান্দের বরণ। (রূপবতী)।

খ. আগণ মাসে রাঙ্গা ধান জমীনে ফলে সোনা।
রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা।। (মলুয়া)।

পাশ্চাত্য ব্যালাডে রক্তিমতা প্রসঙ্গে গোলাপের অনুষঙ্গ লক্ষিত হয়—

ক. Sometimes her cheek is rosy red–Burd Ellen, 90 (iii, 217)

খ. The lady blush'd a rosy red–The cruel Brother, 21 (ii, 252)

গ. And redder than rose her ruddy heart's blood–Jellon Grame, 75 (ii, 289)

গোলাপের অনুষঙ্গ ব্যতীত মাঝে মাঝে রক্তিমতার প্রসঙ্গে অন্য উপমানও এসেছে--

ক. She hath lost her cherry red–Fair Margaret and Sweet William, 48 (ii, 143)

খ. Her lippes like to a Corrall red–Fair Rosamond, 73 (vii, 287)

গ. With rosy cheek and ruby lip–The Gay Goshawk, 139 (iii, 283)

উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাশ্চাত্য গীতিকায় রক্তের রক্তিমতা কেবল মদের প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে।

সাদা

ক. রক্ত গৌর তনু তার কাঞ্চনের কায়া। (কঙ্ক ও লীলা)

খ. সর্বাঙ্গ হইয়াছে তোমার ধুতুরার ফুল।। (মলুয়া)

গ. কাজল বরণ ভ্রমরের রূপার বরণ আঁখি। (রূপবতী)

ঘ. পাশলি কপাল কন্যার মুক্তা দন্ত পাট। (রূপবতী)

ঙ. ফটিকের মত জল (মাণিকতারা)

অর্থাৎ আমাদের গীতিকায় শুভ্রতার বর্ণনায় উপমান হিসাবে গৃহীত হয়েছে কখনও ধুতুরার ফুল, কখনও বা রুপা, আবার কখনও বা মুক্তা। স্ফটিকও এসেছে শুভ্রতা ও স্বচ্ছতা বোঝাতে।

পাশ্চাত্য গীতিকায় শ্বেত বর্ণটির ব্যবহার বেশ অধিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে—

ক. His beard was all on a white, a,

As white as whale's bone–By Lands dala Hey Ho, 33-34 (v, 432)

খ. Your body's whiter than milk–clerk colvill, 20 (i, 193)

গ. And milk-white was his weed–Willie and Lady Maisry 12 (ii, 57)

ঘ. She took me up in her milk white hands Alison Gross 49 (i, 170)

ঙ. O where were ye, milk milk–white steed?
–The Brown field Hill, 33 (i, 133)

চ. Her Comely eyes, like orient pearles–Fair Rosamond, (vii, 284)

ছ. Her eyes like crystal clear–Lord Thomas of Wines berry, 46 (iv, 307)

জ. The Crystal tears ran down her fall–The Cruel Black, 81 (iii, 373)

পাশ্চাত্য গীতিকায় তিমি মাছের হাড় থেকে শুরু করে দুগ্ধ, স্ফটিক সবই শুভ্রতার বর্ণনায় উপাদান রূপে গৃহীত হয়েছে। তবে তুলনামূলক বিচারে দুগ্ধের শুভ্রতার প্রতিই পাশ্চাত্য কবিদের দুর্বলতার আধিক্য।

কাল

ক. মাছি মারিয়া করি কেনে দুই হাত কালা। (কমলা)
খ. কন্যার যইবন হইল কালি। (মহুয়া)
গ. মুনির মুখ হইল কালি। (মহুয়া)
ঘ. আশমানের কাল মেঘ তোমার মাথার চুল। (বীরনারায়ণ)
ঙ. কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্বত প্রমাণ। (দস্যু কেনারামের পালা)
চ. পাহাড়িয়া দেহ যেন কাল মেঘের সাজ। (")

কৃষ্ণবর্ণ আমাদের গীতিকায় সব সময় অলঙ্কার হিসাবেই যে ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়, বিশেষণ রূপেও প্রযুক্ত হয়েছে। তবে মাথার চুলকে যখন আকাশের কাল মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তখন তা অলঙ্কার হিসাবেই এসেছে এবং কেশের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গেই। পাশ্চাত্য গীতিকায় বর্ণিত হয়েছে–

He mounted on his coal–black stead–Willie and May Margaret, 50 and 61 (ii, 172-174)

এখানে কয়লা উপাদান রূপে উল্লিখিত হয়েছে। কয়লা উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এমন আর একটি দৃষ্টান্ত হল–

O laith, laith were our scots lord's sons

To weet their coal-black shoon-Sir patrick Spens, 97-98 (iii, 341)

কাক, রাত্রি ইত্যাদিকেও উপাদান রূপে গ্রহণ করতে দেখা গেছে—

ক. When the swan is black as night-The Youth of Rosen good, 38 (ii, 348)

খ. Their horse's black as any crow-The Battle of Pentland Hills, 2 (vii, 241)

**আগুন**

আগুন কখনও নিছক বিশেষণ, আবার কখনও বা উপমান রূপে ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের গীতিকাগুলিতে।

ক. পুষ্পবনেতে যেমন লাগিল আগুনি। (কমলা)
খ. কন্যা অগ্নির সমান (ভেলুয়া)
গ. মদন-আগুনে আমি পুড়ি রাত্রি দিন। (কমলা)
ঘ. মনের আগুন মনে জ্বলে না করে পরকাশ। (কমলা)
ঙ. অগ্নি পাটের শাড়ী কন্যা যখন নাকি পরে। (কমলা)

পাশ্চাত্য গীতিকাতেও আগুনের উল্লেখ লক্ষ্য করার মত। তবে সেখানে মূলত: ক্রোধের বর্ণনা কিংবা ঔজ্জ্বল্য বোঝাতেই আগুন উদাহৃত হয়েছে—

ক. As bright as fire-Sir Canlini 148 (ii, 180)

খ. He glanced like the fire-Lord Thomas of wines berry, 43-44 (iv, 307)

গ. But he was hail and het as fire-The Raid of Reids wire, 38 (vi, 133)

ঘ. With wrath as hot as fire-The wanton wife of Both, 104 (viii, 156)

**বিবিধ**

**ক. বজ্র**

নাকের নিশ্বাস তার দেওয়ার ডাক শুনি।। (মহুয়া)

For a canon's roar, in a summer's night,
Is like thunder in the air-Bonny John seton, 59-60 (vii, 236)

**খ. শিসে**

মানিকের কাছে দেখ ছিসের মতন।। (দস্যু কেনারামের পালা)

And all his body lyke the lede-Thomas of Ersseldoune 96 (i, 102)

**গ. মানিক**

সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মণি (মহুয়া)
Ye are my jewel–Blanche flour and Jelly florice 85 (iv, 298)
cum well cum wae, my jewels fair–Edom o Gordon, 63 (vi, 157)

**ঘ. কুকুর**

দুষমন কুকুর কাজী পাপে দিল মন। (মলুয়া)
দেবের নৈবেদ্য করে কুক্কুরে ভোজন।। (রূপবতী)
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে।। (কমলা)
That ye drew up wi'an English dog–Lady Maisry, 55 (ii, 82)

## উনবিংশ অধ্যায়

# গীতিকায় শাশুড়ী-বধূর সম্পর্ক

শাশুড়ী বধূর সম্পর্ক চিরকালই অহি-নকুল সম্পর্কের সমগোত্রীয়। শাশুড়ী যেমন বধূকে বিষ নজরে দেখে তেমনি বধূও শাশুড়ীর প্রতি বিরূপ। এই পারস্পরিক বিদ্বেষের মূলে কাজ করে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব। বিবাহের পূর্বে পর্যন্ত পুত্র জননীর খুব অনুগত থাকে। উপার্জনের অর্থ জননীর হাতে তুলে দেয়, কোথাও যেতে হলে জননীকে বলে তবে বের হয়। এমনকি জননীর পাশে অনেকে রাত্রে শয়নও করে। যে পর্যন্ত পুত্র বিবাহ না করে সে পর্যন্ত সংসারের সর্বময় কর্তৃত্ব জননীর হাতেই থাকে। কিন্তু পুত্রের বিবাহের পরই এই দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্তন ঘটে। পুত্র জননীর তুলনায় বধূর প্রতি অধিকতর অনুগত হয়ে পড়ে। উপার্জনের টাকা পত্নীর হাতে তুলে দেয়। সংসারের কর্তৃত্ব বধূর হাতে চলে আসে। বলা বাহুল্য রাতে বধূর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করে। এই সব কারণে জননীর মনে হয়, এতদিনকার অনুগত পুত্র তার পর হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে জননী যত না দোষ দেখে পুত্রের, তদপেক্ষা বেশী দোষ দেখে পুত্রবধূর। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয় বধূই তার কাছ থেকে পুত্রকে পর করে দিয়েছে। স্বভাবতই পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ীর একটা জাতক্রোধ গড়ে ওঠে। শুরু হয় পুত্রবধূর প্রতি মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন। স্বভাবতই বধূও নীরবে শাশুড়ীর এই সব আচরণ মেনে নেয় না, সে প্রতিবাদ করে। কখনও সে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়, কখনও বা নীরবে সহ্য করে। কিন্তু ছড়ায়, প্রবাদে অথবা গানে তার বিরূপতাকে রূপ দেয়। শাশুড়ী-বধূর তিক্ত সম্পর্ক প্রবাদেই বুঝি সব থেকে বেশী করে প্রকাশিত।

প্রথমে আমরা শাশুড়ী বধূকে কি বিষ দৃষ্টিতে দেখে তার পরিচয় দেখব।

ক) "বউয়ের চলন ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিক চেঁচায় যেমন।।"

খ) "বউ নারে বউ না গরল ডাকিনী
দিন হলে মানুষের—ছা, রাত হলে বাঘিনী।।"

গ) "বউমা, ক্ষীর রইল খাবে।
যদি খাবে ত যমের বাড়ি যাবে।।"

ঘ) "হাতের খাড়ু বেচে আমি কিনে এনেছি বাঁদি
সে হল গিন্নী, আর আমি বসে রাঁধি।।"

ঙ) পুতের বিয়ে আপনি দিলাম, বউ ঘরে এল।
সঁপে দিলাম গেরস্থালী, গিন্নীপনা গেল।।"

এইবার বধূ শাশুড়ীকে কি দৃষ্টিতে দেখে তার পরিচয় নেব—

ক) "শাশুড়ী মল সকালে
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে।।"

খ) "ভাতারের মা শাশুড়ি, তারেই বড় মানি।
কোথা থেকে এলেন আমার খুড়শাল-ঠাকুরাণী।।"

গ) জা জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর।
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর।

ঘ) শাশুড়ী নেই, ননদ নেই, কার বা করি ডর।
আগে খাব পান্তা ভাত, শেষে লেপি ঘর।।

গীতিকাতেও শাশুড়ী-বধূর প্রসঙ্গ এসেছে। প্রবাদের উল্লেখে আমরা ভূমিকা পর্বটি সেরেছি। এইবার আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করব।

মলুয়া পালায় লোককবি বর্ণনা করেছেন—

বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা বেড়া।
কুলের শোভা বউ-শাশুড়ীর বুকজুড়া।।

এখানে বধূকে কুলের শোভা শুধু বলা হয়নি সে যে শাশুড়ীরও বুকজোড়া তাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত হয়েছে, বিনোদের মা পুত্রবধূ পেয়ে খুব খুশী—

"বউ পাইয়া বিনোদের মা পরম সুখী হইল।
ঘরগিরস্থি যত সব যতনে পাতিল।"

মলুয়ার যখন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেছে ইচ্ছা করলেই সে তার সম্পন্ন পিতৃ গৃহে আশ্রয় নিতে পারে, তা কিন্তু সে নেয়নি। এই না নেওয়ার পেছনে তার যুক্তি হল—

'শাশুড়ীর সেবা কইরা ধর্ম আমি চাই।'

মলুয়া তার শাশুড়ীর দুঃখের কথা বলতে গিয়ে বলেছে—

বুড়া শাশুড়ী আমার পুত্র নাই ঘরে
কি দেখ্যা মায়ের কও এই দুঃখ পাশরে।

অসতী এই অপপ্রচার করে মলুয়াকে যখন সুখী দাম্পত্য জীবন ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা হল সে চাঁদ বিনোদের প্রতি টানে তবুও রয়ে গেল শ্বশুর বাড়ী। এবং স্বামীকে পুনরায় নিবাহ দেওয়ার পরামর্শ দিল সে এই যুক্তিতে,

বুড়ি শাশুড়ী মোর না দেখে না শুনে।
কেমন কইর‍্যা কাটবে দিন এমন গুজরাণে।।

সত্যসত্যই চাঁদ বিনোদের দ্বিতীয়বার বিবাহ হল, আর মলুয়ার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে--'যতন করিয়া সেবে সোয়ামী শাশুড়ী।'

মলুয়া সর্পদষ্ট চাঁদ বিনোদকে গাড়ুরী ওঝার সহায়তায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু তবুও চাঁদ বিনোদের সংসারে তার স্থান হয় না। শেষ পর্যন্ত মলুয়া আত্মঘাতিনী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একটি ভাঙা নৌকায় সে চড়ে বসে। শাশুড়ী ছুটে আসে মলুয়াকে তার সংকল্প প্রত্যাহার করাতে। শাশুড়ীর এই অনুরোধেই প্রমাণিত হয় মলুয়া তার হৃদয়ে কতখানি স্থান অধিকার করেছিল—

"দৌইড়া আইল শাশুড়ী আউলা মাথার কেশ।
বস্ত্র না সম্বরে মাও পাগলিনীর বেশ।।
'শুন গো পরাণ বধূ কইয়া বুঝাই তরে।
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে।।
ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকিবাম এক দিবারাতি।।"

শাশুড়ী মলুয়াকে বলেছে তার 'পরাণ বধূ'. 'ঘরের লক্ষ্মী বউ', 'ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো', 'আঁধার ঘরের বাতি'। মলুয়া শাশুড়ীর অনুরোধে সাড়া দেয়নি ঠিকই কিন্তু অত্যন্ত বিনীতভাবে সে শাশুড়ীর কাছে চিরতরে বিদায় যাজ্ঞা করেছে—

'বিদায় দেও মা জননী ধরি তোমার পাও।'

ভাঙা নৌকায় জল উঠেছে প্রভূত। মলুয়ার পরিণতি দেখে শাশুড়ীকে পাড়ে ক্রন্দনরত দেখা গেছে—

'ভাঙ্গা নায়ে উঠল পানি করি কলকল।
পাড়ে কান্দে হাউড়ী নাও অর্দ্ধেক হইল তল।।'

লক্ষণীয় সলিল সমাধি হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে মলুয়া শাশুড়ীর উদ্দেশে শেষ প্রণতি নিবেদন করেছে এই বলে--

শুনগো শাশুড়ী মোর শত জন্মের মাও।
এইখানে থইক্যা পন্নাম আমি জানাই তোমার পাও।।

আয়না বিবি পালায় কুরুঙ্গিয়া নারীর ছদ্মবেশে আয়না বিবি তার স্বামী মামুদ উদ্দ্যালের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছে। দুঃখিনী আয়না বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়াতে তার শাশুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছে—

কার বা কন্যা কার ঝি তুমি লো
আলো কন্যা, তর কেবা বাপ মাও।
মাথা খাও সুন্দর কন্যা লো
আমারে পরিচয় দেও।।

আয়না বিবির শাশুড়ীর এই প্রশ্ন করার কারণ পরেই জানা গেছে—

হায় ভালা, অনেক দিনের কথা লো কন্যা,
আমি দেখি বা না দেখি।
আয়নার লাইগ্যা কাইন্দ্যা আমার
আন্ধাইর দুইডা আঁখি।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যেটা তা হল আয়নার জন্য কেঁদে কেঁদে তার শাশুড়ীর দুটি চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। চতুরা আয়না আত্মপরিচয় গোপন রেখে শাশুড়ীকে জানিয়েছে—

আমি কান্দি তোমারে দেইখ্যা
আমার মায়ের মতন লাগে।
ছুটু বেলার কথারে আমার
ভালা, মনের মধ্যে জাগে।।

আমরা বুঝতে পারি শাশুড়ীর উপস্থিতি এবং স্নেহার্দ্র কণ্ঠের প্রশ্নেই আয়না বিবির দুচোখে জল দেখা দিয়েছিল।

শাশুড়ীকেও সে নিজের মায়ের মতই দেখত। অর্থাৎ আয়না বিবি পালা'তেও দেখি শাশুড়ী এবং বধূর সম্পর্ক কখনোই তিক্ত ছিল না, ছিল সুখময়।

'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর' পালায় ভেলুয়া মন্তব্য করেছে—

"শাশুড়ী ননদী হইল কাল পরাণের বৈরী।।"

এমনকি আমির সাধুর অনুপস্থিতিতে ভেলুয়া সুন্দরীর উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়েছে। তার চরিত্রে কলঙ্ক দিয়ে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছে। ভেলুয়ার সুন্দরীর কথায়—

"কলঙ্ক রুইয়া মোরে যত দুখু দিলা।
তারপর মায়ে বইনে পাড়াপড়শী মিলি।
ঘরের বাইর করল মোরে বানাইল কামুলী।"

যখন আমির সাধু ফিরে এলো বাণিজ্য থেকে তখন ভেলুয়া সুন্দরীর শাশুড়ী এবং ননদ জানাল তার নাকি মৃত্যু হয়েছে।

"মায়ে বইনে কইল তোমার হইয়াছে মরণ।।"

উভয়ে অকল্পনীয় চক্রান্ত করেছিল, তারও পরিচয় মিলেছে আমির সাধুর অভিজ্ঞতার মধ্যে—

"সাইগরের পাড়ে যাইয়া কুড়িলাম কয়ব্বর।
কালা কুত্তা পাইলাম এক তাহার ভিতব।।"

তবে তুলনামূলকভাবে গীতিকায় শাশুড়ী-বধূর সুন্দর সম্পর্কই চিত্রিত হয়েছে, বৈরিতামূলক সম্পর্ক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবেই উপস্থাপিত হয়েছে।

## বিংশ অধ্যায়

# গীতিকার পাঠান্তর

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংকলনগুলিতে আমরা বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পাঠান্তরের সন্ধান লাভ করি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধার করা গেল—

**রতন ঠাকুরের পালা**

ক. এই না ফুলের মালা গাইন্থ্যা পাঠাইবাম রাজার বাড়ী।।
পাঠান্তর : এই না ফুল দিয়া আমি মালা খানি গাঁথি।।
খ. তিরপুরার হাটখানি বইসে বিয়াল বেল।
পাঠান্তর : তিরপুরার হাটখানি বইসে বিয়ান বেলা।
গ. পূবের বাতাস পাক মাইরল্ বয়ারে নদীর বাড়ে ঢেউ।
পাঠান্তর : পূবের বাতাস পাইক্ মাইল বয়ারে নদী বাড়ে ঢেউ।
ঘ. চোরের ধন কাইড়া লইলে নাইসে বড়ো দায়—
পাঠান্তর : চোরের ধন চুরি করলে নাই সে বড়ো দায়।

**হরিণকুমার-জিরালনী কন্যার পালা**

ক. হাতি ঘোড়া সঙ্গে রাজার দাও দা সুবিস্তারে।।
পাঠান্তর : হাতী ঘোড়া আছে রাজার দাওয়া সুবিস্তর।
খ. ঘুমায় রাজপুরীর লোক পুরীর দুয়ারে পওরা।
পাঠান্তর : ঘুমায় রাজ্য না বাসী না জানে সে তারা।।
গ. বারো বচ্ছর গেল আমার বন-জংলায় ঘুরিয়া।
পাঠান্তর : বার বছর যায় কন্যা কান্দিয়া কান্দিয়া।

**সন্ন মালার পালা**

ক. রাজ ভাণ্ডারের লক্ষ্মী রাজা, তোমার যাইব ছাড়িয়া।
পাঠান্তর : রাজ ভাণ্ডারের ধন রাজা ফুঁয়ে যাইব উড়ি।
খ. দিনে দিনে হইব রে তোমার সগ্গল আশায় নৈরাশা।।
পাঠান্তর : দিনে দিনে আশা তোমার হইব নৈরাশা।।

**দেওয়ান ইশা খাঁর পালা**

ক. নয়ান ভরিয়া কইন্যা দেওয়ানরে দেখিল।
দেইখ্যা সুন্দর কইন্যা উন্মত্ত পাগল হইল।।

পাঠান্তর : তারে দেইখ্যা কইন্যা অইল উন্মত্ত পাগল।
নয়ান ভরিয়া তার সর্বাঙ্গ দেখিল।
খ. পন্থ হইতে দেওয়ানরে আনিল ধরিয়া।।
পাঠান্তর : পন্থ হইতে কালিদাসে আনে ধরাইয়া।।
গ. এই কথা শুইন্যা দেওয়ান চিন্তে মনে মনে।
পাঠান্তর : এই সগল কথা শুন্যা চিন্তে মনে মনে।।

**রাজা রঘুর পালা**

ক. দুধের পুনাই থইয়া গেলা গো রাণী,
এ গো রাণী, কি দ্যা পালি তারে।।
পাঠান্তর : দুধের বাচ্চা থইয়া গেছে গো রাণী কি দ্যা পালি তারে।।
খ. সেই কারণে না পাইলাম দেখা রে
আরে আমি ঘোমের তন্ জাইগে।।
পাঠান্তর : সেই কারণ না পাইলাম রে আরে রাণী আপন কর্মদোষে।

আমরা প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকদের রচিত পরিশীলিত সাহিত্যের পাঠান্তরের সঙ্গে সুপরিচিত। বলাবাহুল্য এই পাঠান্তর ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সম্পাদিত। প্রথম সৃষ্টির কৃতিত্ব যাঁর, তাঁর দ্বারাই পরবর্তীকালে পরবর্তী সংস্করণে পাঠান্তর সাধিত হয় কাব্যিক অথবা সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধনের অভিপ্রায়ে। মূল স্রষ্টা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কারো দ্বারা সম্পাদিত বা সাধিত পাঠান্তর গ্রাহ্য হয় না। অর্থাৎ লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না, তেমনি কোন রচনাটি আদিমতম পাঠ আর কোনটিই বা পাঠান্তর তা বোঝার উপায় অনেক সময়ই থাকে না। পরিশীলিত সাহিত্যের মত লোকসাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের সম্পদ বলে গ্রাহ্য হয় না বলেই তার পাঠান্তরেও কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। যে লোকসাহিত্যের জনপ্রিয়তা যত বেশি, তার পাঠান্তরের সংখ্যাও তত বেশি। সত্য কথা বলতে কি যে লোকসাহিত্যের যত বেশি পাঠান্তর লাভ করা সম্ভব হয়, তার গ্রহণযোগ্যতাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, 'Variation is the crucial test of Folklore'

পরিশীলিত সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের এই বিষয়ের পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

'An artistic poem receives its final form at the hands of the author at the time of composition. The form is fixed and authoritative. Nobody either has or supposes that he has right to modify it. Any such alteration is an offence, a corruption, and the critic's duty is to restore the text to its integrity so that we may have before us what the poet wrote and nothing else.'[১]

গীতিকা লোকসাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ বিভাগ। লোকসাহিত্যের অন্যান্য

উপাদানের মত গীতিকার ক্ষেত্রেও পাঠান্তর যে সুলভ তার দৃষ্টান্ত আমরা প্রথমেই দেখেছি। গীতিকার পাঠান্তর প্রসঙ্গে সমালোচক যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন সেটি উদ্ধার করে আমরা পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। সমালোচক বলেছেন,

'The composition of an ode or a Sonnet,....may be regarded as a single creative act. And with the accomplishment of this creative act, the account is closed, once finished the poem is a definite entity, no longer subject to any process of development. Not so with the popular ballad. Here the mere act of composition is not the conclusion of the matter; it is rather the beginning. The product as it comes from the author is handed over to the folk for oral transmission and thus passes out of his control...As it passes from singer to singer, it is changing unceasingly. Old stanzas are dropped and new ones are added rhymes are altered; the names of the characters are varied.'[২]

এই পরিপ্রেক্ষিতেই সমালোচক সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন :

'a genuinely Popular ballad can have n fixed and final form, no sole authentic versions. There are texts, but there is no text.[৩]

Robert Groves ও তাঁর 'The English Ballad'-এ (London : 1927) গীতিকার পাঠান্তর বিষয়ে প্রায় একই রূপ মন্তব্য করেছেন :

"The ballad is every body's song. That is why there is never any actual correct text of a ballad proper. Singers are allowed to alter it to their liking,...'[8]

'The Ballad Tree' গ্রন্থে (Newyork; 1950) Evelyn Kendrick Wells-কেও মন্তব্য করতে দেখা গেছে—

'It has no original text, being freshly created by each successive singer as he makes his own versions.'[৫]

সকল সমালোচকই গীতিকার পাঠান্তরকে গীতিকার এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল পাঠান্তর সৃষ্টির কারণ কি? আমরা জানি গীতিকা মূলত: একজন রচনা করেন, পববর্তীকালে তা সমষ্টির দ্বারা পরিমার্জিত, পরিবর্দ্ধিত কিংবা পরিশীলিত হয়ে ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে সমষ্টির সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। একেই বলা হয়েছে 'Communal recreation' বা সমষ্টিগতভাবে কৃত নবতর সৃষ্টি। এইভাবে কৃত নবতর সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে গীতিকা তার ব্যক্তিগত রচনার ছাপকে হারিয়ে ফেলে সমষ্টিগত ভাবে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গীকার করে নেয়—

'Communal recreation is the means by which a ballad, however learned its origin, loses the signs of individual authorship and

takes on impersonality and the other ballad characteristics.'

এইভাবে পরিবর্তনের ফলে অনেক সময় যেমন উন্নততর পাঠের সৃষ্টি হয়, তেমনি বিপরীত ক্রমে নিকৃষ্ট পাঠ সৃষ্টিও হতে পারে। কেননা পরিবর্তন সকল ক্ষেত্রেই, বিশেষত: সমষ্টিগত ভাবে কৃত পরিবর্তনের ফল সর্বদাই উন্নততর মানের হয় না। তবে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের স্বাক্ষর দৃষ্ট না হলেও নাটকীয়তা ধর্ম রক্ষায় 'Communal recreation' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা 'Sir Lionel' ব্যালাডটির উল্লেখ করতে পারি। যতই এই ব্যালাডের পাঠান্তর সৃষ্টি হয়েছে, ততই এর কাহিনী সরল থেকে সরলতর রূপ লাভ করেছে। এই ব্যালাডের ইংরেজী, স্কচ এবং আমেরিকান পাঠ লভ্য। আমেরিকান পাঠে একটিমাত্র নাটকীয় ঘটনা স্থান পেয়েছে। তাছাড়াও সমষ্টিগত ভাবে সৃষ্ট পাঠান্তরে অধিক পরিমাণে কথোপকথন সন্নিবিষ্ট হতে দেখা যায়। M. J. C. Hodgart উল্লেখ করেছেন,

'The changes it produces are usually greater compression, the disappearance of links in the narrative, and a higher ratio of dialogue to explanation'.[৬]

এইবার পাঠান্তরের দ্বিতীয় কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রভাবে এবং প্রতিভাবান কবিদের দ্বারা গীতিকার নবতর-রূপদানের কারণেও পাঠান্তর লক্ষিত হয়ে থাকে।

তৃতীয় কারণের প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়—গায়কদের বিস্মৃতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গীতিকার রচয়িতা এবং গায়ক অভিন্ন ব্যক্তি নন। একজনের রচনা অন্য জনের দ্বারা গীত হয়। গায়ক স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেই গান করে থাকেন। স্মৃতিশক্তি গায়কদের সবসময় অটুট থাকবে আশা করা যায় না। মাঝে মাঝে তা বিশ্বাসঘাতকতা করলে গায়ককে অংশবিশেষ বা শব্দবিশেষ নিজের মত করে পূরণ করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে গায়কেরা পূর্বপাঠের পরিবর্তন করেন না, বাধ্য হয়েই পাঠ পরিবর্তিত হয়।

পাঠান্তরের আর একটি কারণ হল গায়কদের সৃজনীকল্পনা। অন্যের রচনা গাইলেও গায়কদেরও কখনও কখনও ইচ্ছা হয় রচনা করার। স্বয়ং সম্পূর্ণ রচনা করার শক্তি এঁদের সকলের না থাকলেও পংক্তি বিশেষ বা অংশ বিশেষকে পরিবর্তিত করেন, স্বকপোলকল্পিত অংশ সংযোজিত করেন অনেকেই। এইভাবে গায়কের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবেই গীতিকার পাঠান্তর রচিত হয়। Mathew Hodgart তাঁর 'The Faber Book of Ballads'-এ যা বলেছেন, প্রসঙ্গত: তা প্রণিধানযোগ্য। Hodgart বলেছেন,

'The singers could not read, and although they had wonderful memories, they did not aim at reproducing a text exactly, but simply at telling the old stories in the old way.'[৭]

পাঠান্তরের ব্যাপারে এগুলিই প্রধান কারণ। তাছাড়াও এক মানসিক ভাব থেকে অন্য মানসিক ভাবের পরিবর্তন বর্ণনার কারণেও পাঠান্তর ঘটে, পাঠান্তর ঘটে প্রাচীন সুরে নূতন শব্দ সংযোজনার পরিণামে।

এই জন্যই বলা হয়—লোক সঙ্গীতের গায়ক শুধুমাত্র ঐতিহ্যেরই ধারক নন, একজন স্রষ্টাও বটে—

'every singer is both a transmitter of tradition and an original composer.'[৮]

## পাদটীকা

### প্রথম অধ্যায়

### গীতিকার উদ্ভব ইতিহাস ও সংজ্ঞা

১. The Ballad, M. J. C. Hodgart ; chap IV page 73.
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস , ১ম খণ্ড ; পূর্বার্ধ ; ৫ম সংস্করণ ; ১৯৭০, পৃ. ৮৯।
৩. বিশ্বভারতী পত্রিকা ; ৪র্থ বর্ষ ; ২য় সংখ্যা ; পৃ: ১১০-১১৪
৪. জর্জ গ্রীয়ার্সন কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৮৭৭।
৫. বাংলা গাথা কাব্য ; ড. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য ; ১৯৬২ ; পৃ. ৪।
৬. English and Scottish Popular Ballads ; Helen Child Sargent and George Lyman Kittredge ; 1904
৭. The Literary Ballad, Anne Henry Ehrenpreis ; London ; 1966 ; page 10.
৮. Dr Murray
৯. The English Ballad; Robert Groves, London; 1927; page 9
১০. The Ballads; chap I, M.J.C Hodgart, London; 1950, page 10.
১১. The Ballad of Tradition ; G. H. Gerould ; Oxford; 1932; page 11.
১২. Simile and Metaphor in the English and Scottish Ballads; George Clinton Densmoreo dell; Newyork : 1892; page 6, 7.
১৩. Wily Ritson.
১৪. Standard Dictionary or Folklore, Mythology And Legend; Vol I; Maria Leach : Newyork; 1949; page 106-111.
১৫. The Ballad Tree; Evelyn Kendrick wells; New york, 1950. page-5.
১৬. The New English Dictionary.
১৭. History of the Ballads proceedings of the British; Professor W.P, Ker; vol IV.
১৮. The Faber Book of Ballads : Mathew Hodgart; London; 1965; p. 12.

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## ব্যালাড ও গীতিকা


১. লোক-সাহিত্য ; ২য় খণ্ড ; ২য় সং ; ১৯৮০ ; পৃ. ৪৪
২. Standard Dictionary of Folklore, Mythology And Legend; Vol I, 1949; page 106-111.
৩. English and Scottish Popular Ballads; Edited by Helen Child Sargent and George Lyman Kittredge; U.S.A. 1904.
৪. The Ballads; M.J.C. Hodgart; 1950; page 14
৫. ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠনপাঠন ; ২য় সং ; ১৯৭৪ ; পৃ. ৪২৬।


## তৃতীয় অধ্যায়
## গীতিকার প্রকাশ রীতি


১. The Ballads; M.J C Hodgart; page 28.
২. Ibid, page 28.
৩. The Faber Book of Ballads, Mathew Hodgart; page 14
৪. The Literary Ballad; Anne Henry Ehrenpreis, London; 1966, page 10.


## চতুর্থ অধ্যায়
## গীতিকার রচয়িতার প্রসঙ্গ


১. The English Ballad; Robert Groves, London. 1927; page 9.
২. The Ballad Tree; Evelyn Kendrickwells; page 5
৩. Ibid, page 91
৪. Standard Dictionary of Folklore, Mythology And Legend, Vol I; Edited by Maria Leach, Page 106-111
৫. Ibid.
৬ Simile and Metaphor in the English and Scottish Ballads; George Clinton Densmore odell; Newvork; 1892, page 7
৭. The English Ballad; Robert Groves; London; 1927; page 9.
৮. Simile and Metaphor in the English and Scottish Ballads; George Clinton Densmore odell; New york; 1892; page 7


## পঞ্চম অধ্যায়
## গীতিকা চর্চার ইতিহাস


১. লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ ; বাংলা লোকসাহিত্য চর্চায় বিদেশীয়দের দান ; ১৩৮৭ ; ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী ; পৃ. ৭৪-৮২ দ্রষ্টব্য।
২ বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস ; ২য় সংস্করণ ; ১৯৮৬ ; পৃ. ৪৭৬।

৩. Folklorists of Bengal ; Sankar Sengupta ; 1965; page 153.
৪. Bengali Folk-Ballads from Mymensingh; Dr Dusan Zbavitel, 1963; P.X.
৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ১ম খণ্ড ; অপরার্ধ ; ২য় সং, ডঃ সুকুমার সেন ; ১৯৬৫ ; পৃ. ৫৮১।
৬. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোকসংস্কৃতি চর্চা ; ১৯৭৩ ; ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ১
৭. আশুতোষ স্মৃতিকথা ; ড. দীনেশচন্দ্র সেন ; ১৯৩৬ ; পৃ. ১৩৭
৮. মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকা : ৪র্থ সং ; ১৯৭৩ ; পৃ. ১।।
৯. " " " " ; পৃ.দ/.
১০. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ; ৩য় খণ্ড ; ২য় পর্ব ; পুনর্বিন্যস্ত ২য় সং ; ১৯৮১ ; ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ৪৪৮।
১১. মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকা ; ৪র্থ সং ; ১৯৭৩ ; পৃ.।
১২. জাতি-সংস্কৃতি ও সাহিত্য ; ১৯৩৮, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ৯-১০।
১৩. বাংলাব লোক-সাহিত্য ; ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৯৬২ ; পৃ. ৩৬৩।
১৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ; ৩য় খণ্ড ; ২য় পর্ব ; ১৯৮১ ; পৃ. ৪৩৯
১৫. Dr Dusan Zbavitel তাঁর Bengali Folk Ballads from Mymensingh and the problems of their Authenticity গ্রন্থে (১৯৬৩) দস্যু কেনারামের পালার আলোচনা করেন নি।
১৬. Bengali Folk-Ballads from Mymensingh, 1963, Dr Dusan Zbavitel; page 22.
১৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ১ম খণ্ড ; অপরার্ধ ; ২য় সং (১৯৬৫) ; পৃ. ৫৮২।
১৮ ময়মনসিংহ গীতিকা ; সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; ২য় সং ; ১৯৮২, পৃ. i, ii
১৯. বাংলার লোক-সাহিত্য ; ১ম খণ্ড · ৩য় সং ; ১৯৬২ ; পৃ. ৪০৬।
২০. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ১ম খণ্ড ; অপরার্ধ ; ২য় সং ; ১৯৬৫ ; পৃ. ৫৮৮।
২১. পৃ. ১৬
২২. পৃ. ১৩
২৩. পৃ. ১৩
২৪. বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস ; ২য় সং ; ১৯৮৬ ; ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী , পৃ. ৪৯০।
২৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ১ম খণ্ড ; অপরার্ধ ; ২য় সং ; ১৯৬৫ ; পৃ. ৫৮২।
২৬. ঐ ঐ পৃ. ৫৮৮।
২৭. প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ; ১ম খণ্ডের (১৯৭০) পরিচয় অংশে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য ; পৃ. √.
২৮. প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ; ৩য় খণ্ড ; ১৯৭১ ; পৃ. ১০৫।
২৯. " ৫ম খণ্ড ; ১৯৭৩ ; পৃ. ২২৮।
৩০. " ৭ম খণ্ড ; ১৯৭৫ ; পৃ. iii

৩১. ময়মনসিংহ গীতিকা ; ২য় সং ; ১৯৮২ ; পৃ. i ও ii
৩২. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ; ১৯৮৫ ; পৃ. ৭৮।
৩৩. " " " পৃ. ৬২।
৩৪. " " " পৃ. ৬৯।
৩৫. মৈত্রী ; কবিশেখর কালিদাস রায় জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা ; ১৯৯১ ; পৃ. ১৫১।


## ষষ্ঠ অধ্যায়
## গীতিকার শ্রেণীবিভাগ


১. বাংলার লোক-সাহিত্য ; ১ম খণ্ড ; ৩য় সং ; ১৯৬২ : পৃ. ৩৬৩।
২. The Ballads; London; 1950 ; page 13
৩. The Faber Book of Ballads; Edited by Mathew Hodgart, London; 1965; page 12.
৪. Simile and Metaphor in the English and Scottish ballads; New york; 1892; page 9
৫. লোক-সাহিত্য ; ২য় খণ্ড ; ২য় সং ; ১৯৮০ ; পৃ. ৬৫-৬৭।
৬. The Ballads, M J. C Hodgart, London, 1950, chap I; page 16


## অষ্টম অধ্যায়
## গীতিকায় সমাজচিত্র


১. 'বাংলা গীতিকা-সাহিত্যে লোকজীবন ধারা' ; বিমল মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৮৫, পৃ. ৬০।
২. ঐ, পৃ. ৬০।
৩. 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায় জনজীবন', ধীরেন্দ্র দেবনাথ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ; ১৯৮৫ ; পৃ. ৭৬।
৪. বাংলার লোক-সাহিত্য ; ১ম খণ্ড, ৩য় সং , ১৯৬২ ; পৃ. ৩৬৯।
৫ ঐ " " পৃ. ৩৯২-৯৩।
৬. Bengali Folk-Ballads From Mymensingh; Dr Dusan Zbavitel; 1963; page 120.
৭. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ; ১৯৮৫ ; পৃ. ৬২।


## একাদশ অধ্যায়
## গীতিকায় প্রকৃতিচিত্র


১. Bengali Folk-Ballads From Mymensingh; Dusan Zbavitel 1963; Cal; Page 141.
২. " " Page 142.
৩. ময়মনসিংহের গীতিকা জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য, সৈয়দ আজিজুল হক, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৪১৯।

৪. Bengali Folk Ballads from Mymensingh; Dusan Zbavitel; Page 142.

৫. ময়মনসিংহের গীতিকা জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য ; সৈয়দ আজিজুল হক, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৪১৪।

৬. ৪ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য; Page 145.

## চতুর্দশ অধ্যায়
## গীতিকায় ব্যবহৃত বারমাসী

১. The Development of the Baromasi in the Bengali literature. Archiv Orientani 29, 1961 No 4 Page 582-619.

২. বাংলার লোক সাহিত্য (৩য় খণ্ড) ১৩৭২ ; আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৫৪১।.

৩. Bengali Folk-Ballads From Mymensingh; Dusan Zbavitel ; 1963 (Cal); Page 144.

৪. ফোকলোর (বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটির মুখপত্র), ঢাকা ; জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যা ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 'গীতিকায় বারমাসী' ; পৃ. ৪০।

৫. Bengali Folk-Ballads From Mymensingh; Dusan Zbavitel; 1963 (Cal), Page 145

৬. Ibid Page 144

## সপ্তদশ অধ্যায়
## গীতিকার সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য

১. The English Ballad, London, 1927, page 9.

২. The Ballad of Tradition, New York, 1957, page 3.

৩. The Ballads, London, 1950, page 11

৪. Maria Leach সম্পাদিত, New York 1949, page 106-111.

৫. The Ballad Tree, New York, 1950

৬. The Faber Book of Ballads, London, 1965, page 13.

৭. Popular British Ballads, Cambridge 1894.

৮. বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড ; ৩য় সং, ১৯৬২, পৃ. ৩৫৪।

৯. ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠনপাঠন, ৩য় সং, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৮১।

১০. বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২ ; পৃ. ৩৫৫।

১১. বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃঃ ৩৫৮।

১২. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ; ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৫ ; পৃ. ২৫।

১৩. ঐ ঐ পৃ. ২৫।

১৪. বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সং ; ১৯৬২ ; পৃ. ৩৬৯-৭০।

১৫. বাংলার-লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৯৬২, পৃ. ৩৬৯-৭০।

## বিংশ অধ্যায়
## গীতিকার পাঠান্তর

১. English and Scottish Popular Ballads; Edited by Helen Child Sargent and George Lyman Kittredge; 1904; page xvii (Introduction).

২. Ibid ............. page xvii (Introduction).

৩. Ibid........... page xvii ( " ).

৪. page-13.

৫. page-5.

৬. The Ballads; London; 1950; page 97.

৭. London; 1965; page 14.

৮. " " 14.

# একবিংশ অধ্যায়

# নাথ গীতিকা

আমরা এ পর্যন্ত গীতিকা সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলাম, এইবার গীতিকাগুলির পৃথক পৃথক বিশ্লেষণে আমরা প্রয়াসী হতে পারি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে আমাদের গীতিকাগুলি সাধারণভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত—নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা। নাথ গীতিকা যেহেতু প্রাচীনতম, তাই প্রথমে নাথ গীতিকা বিষয়েই আমরা আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে পারি।

নাথ-ধর্ম প্রভাবিত গীতিকার দুটি শ্রেণী—গোরক্ষ-বিজয়, মীনচেতন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হল 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গান', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' ইত্যাদি। নাথ গীতিকা সম্পর্কে বাংলার লোক-সাহিত্য গ্রন্থে (১ম খণ্ড ; ৩য় সং ; ১৯৬২) কৃত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যগুলিকে সংকলন করে দিলে দাঁড়ায়—

ক. 'নাথ-গীতিকাগুলি বিষয়ের দিক দিয়া বৈচিত্র্যহীন' (পৃ. ৩৬৪)।

খ. 'প্রথমোক্ত শ্রেণীর গীতিকার মধ্যে (গোরক্ষ বিজয়, মীনচেতন) একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে' (পৃ. ৩৬৫)।

গ. 'সমুচ্চ আদর্শের প্রভাবে 'গোরক্ষ-বিজয়ে'র বাস্তব মূল যদি কতকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াও থাকে, তথাপি মাণিকচন্দ্র-গোপীচন্দ্রের গানে তাহার অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবেই অনুভব করা যায়' (পৃ. ৩৬৭)।

ঘ 'এই গীতিকাগুলি সম্পর্কে (গোরক্ষ-বিজয়, মীনচেতন) একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক সমাজের চিত্র খুব স্পষ্ট নহে' (পৃ. ৩৬৬)।

ঙ. 'নাথ গীতিকাগুলি একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের উচ্চ নৈতিক আদর্শ অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের মধ্যে মানব মনের স্বাধীন অনুভূতিসমূহ সহজভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই,...' (পৃ. ৩৮৮)।

ড. সুকুমার সেন গোরক্ষবিজয়ের মূল ভাবটি সংক্ষেপে বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন—'জীবন্মুক্ত শিষ্য কর্তৃক মোহমগ্ন গুরুকে চৈতন্যদান' (প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯৮, পৃ. ১৯৬) অর্থাৎ গোরক্ষবিজয়, মীনচেতনের সমাজ চিত্র, বিষয় বৈচিত্র্য, বাস্তবতা সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই সমালোচকগণ নেতিবাচক মন্তব্যই করেছেন। উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠাই এই শ্রেণীর গীতিকা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় এর সাহিত্যিক মূল্য হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে গোপীচন্দ্রের গানের তুলনায়। তত্ত্বকথার প্রাচুর্য গোরক্ষবিজয়ের কাব্যগুণকে নিষ্প্রভ করেছে। অলৌকিকতার আধিক্য গোরক্ষবিজয় ও মীনচেতনেব জনপ্রিয়তার অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

সংক্ষেপে আমরা গোরক্ষনাথ—মীননাথের কাহিনীটি বর্ণনা করে এ অলৌকিকতার

প্রাচুর্য বিষয়ে আলোকপাত করব।

আদ্যদেব এবং আদ্যদেবীর থেকে সৃষ্টি হল দেবতাদের, উৎপত্তি ঘটল চার সিদ্ধের। এরপর এক কন্যা হল, নাম গৌরী। আদ্যনাথের আদর্শে শিব গৌরীকে বিবাহ করে পৃথিবীতে চলে এলেন। চার সিদ্ধ বায়ু মাত্র ভক্ষণ করে যোগাভ্যাসে রত হলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের, এবং কানুপা বা কাণপা হাড়িপার পরিচর্যায় রত হলেন ভৃত্যরূপে। শিবের অনুচর রূপে থেকে গেলেন মীননাথ এবং হাড়িপা।

শিবকে গৌরী একদিন প্রশ্ন করলেন তিনি কেন হাড়ের মালা ধারণ করে আছেন। শিব গৌরীকে জানালেন যে চণ্ডী সাতবার মৃত্যুবরণ করেছেন এবং প্রতিবার মৃত্যুর পর তাঁর একটি করে হাড় থেকে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি রক্ষার্থেই শিবের গলায় হাড়ের মালা। গৌরী শিবের কাছে জানতে চাইলেন :

তুহ্মি কেনে তর গোসাঞিঃ আহ্মি কেনে মরি

শিব গৌরীকে এই সম্পর্কিত গুহ্যকথা ক্ষীরোদ সাগরে জলমধ্যে টঙ্গের উপর উপবিষ্ট হয়ে নির্জনে বলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেইমত ব্যবস্থাদি হল। মীননাথ টের পেয়ে কৌশলে মাছের পেটে থেকে শিব প্রদত্ত মহাজ্ঞান লাভ করলেন। পরে মীননাথ ধরা পড়লেন শিব তাকে অভিসম্পাৎ দিলেন যে সঙ্কটকালে মীননাথ চুরির দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বিস্মৃত হবে।

সিদ্ধ অনুচরদের পরিত্যাগ করে শিব উপনীত হলেন কৈলাসে। চার সিদ্ধ বিচরণ করতে লাগলেন। গৌরী শিবকে বললেন শিব নিজে দুটি পত্নী নিয়ে যেখানে সংসারী, সেখানে শিষ্যরা বিবাহাদি না করলে তা ভাল দেখায় না। শিব জানালেন তাঁর শিষ্যরা কামমুক্ত, তাই তারা বিবাহাদি করবে না। গৌরী এরপর শিবের অনুমতি নিয়ে মোহিনী রূপ ধারণ করে চার সিদ্ধকে কামাসক্ত করতে প্রয়াসী হলেন। মীননাথ ভাবলেন এমন সুন্দরী পেলে তার সঙ্গে কেলি-কৌতুকে জীবনযাপন করতেন। দেবী তাকে কদলীপত্তনে গিয়ে যোলশত নারী সমভিব্যাহারে জীবনযাপনের বর দিলেন। হাড়িসিদ্ধা ভাবলেন এমন সুন্দরী নারী পেলে তার কাছে থেকে হাড়ির কাজও করতে পারেন। দেবী তাকে হাড়ির রূপ ধারণ করে ময়নামতীর গৃহে যাবার বর দিলেন। কানুপা ভাবলেন এমন সুন্দরী রমণী লাভ করলে তিনি মৃত্যুকেও ভয় পাবেন না। দেবী তাকে ডাহুকা হয়ে যাবার বর দিলেন। গোরক্ষনাথ কিন্তু কামভাব মুক্ত রইলেন। ভাবলেন—

এরূপ জননী যদি থাক এ আহ্মার।।
তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই।

গোরক্ষনাথ দেবীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এবং পার্বতীর ছলনা নিষ্ফল হবার কারণে দেবী নানা ভাবে গোরক্ষনাথকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। শিব তখন বিরহিনী নাম্নী এর রাজকন্যাকে গোরক্ষনাথকে স্বামী রূপে লাভ করার বর দিয়ে বসলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ এ বারেও জয়ী হলেন—ছয় মাসের শিশুতে পরিবর্তিত হয়ে রাজকন্যাকে মাতৃ সম্বোধন করলেন। গোরক্ষনাথ বকুলতলায় উপবিষ্ট, এমন সময়ে

আকাশ পথে উড্ডীয়মান দেখা গেল কানুপাকে। কানুপার কাছেই গোরক্ষনাথ জানলেন তাঁর গুরু নারীর মোহে পড়ে জরাজীর্ণ ও মৃতপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত। বহু কৌশলে তিনি মোহগ্রস্ত গুরুর সম্মুখবর্তী হবার সুযোগ পেলেন। শিষ্য প্রদত্ত কঠোর তত্ত্ব উপদেশে গুরু মীননাথের চৈতন্য হল। পুনরায় তিনি যোগ সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

এই কাহিনীতে অবাস্তবতা এবং অলৌকিকতা অপর্যাপ্ত পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করেছে। চার সিদ্ধের বায়ু ভক্ষণ করে যোগাভ্যাসে নিরত থাকা, মীননাথের মাছের পেটে থেকে শিব প্রদত্ত মহাজ্ঞান লাভ, গৌরীর মাছি রূপে গোরক্ষনাথের পেটে অনুপ্রবেশ পুনরায় রাক্ষসী রূপে তাঁর নরবলি গ্রহণ, গোরক্ষনাথের ছয় মাসের শিশুতে রূপান্তরিত হওয়া, গোরক্ষনাথের কৌপীন ধোয়া জল খেয়ে বিরহিনী নাম্নী রাজকন্যার দশদণ্ডের মধ্যে গর্ভধারণ ও পুত্র সন্তান প্রসব. আকাশপথে কানুপার গমন, গোরক্ষনাথ নিক্ষিপ্ত পাদুকা কর্তৃক কানুপাকে গোরক্ষনাথের কাছে ধরে আনা, গোরক্ষনাথ কর্তৃক বিন্দুনাথকে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গিয়ে আছড়ে মেরে ফেলা এবং পুনরায় তুড়ি মেরে তাকে বাঁচিয়ে তোলা, কদলীদের শাপের সাহায্যে বাদুড়ে পরিণত করা তারই কিছু নিদর্শন মাত্র। 'গোরক্ষবিজয়ে'র মেরুদণ্ডস্বরূপ গোরক্ষনাথকে রক্তমাংসের মানুষ অপেক্ষা অতিমানব বলেই বেশি মনে হয়।

অবশ্য গোরক্ষবিজয়ে'র তুলনায় মাণিকচন্দ্র-গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনীর মানবিক আবেদন যে অধিক তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। আমরা তাই কিছু বিস্তারিতভাবে এই কাহিনীর আলোচনায় ব্রতী হব। তবে তার পূর্বে 'গোপীচন্দ্রের গানে'র শ্রেণী চরিত্র নির্ধারণ জরুরী।

'গোপীচন্দ্রের গান'কে আমরা কোন পর্যায়ভুক্ত করব—ইতিকথা না গীতিকা, 'গোপীচন্দ্রের গান' কি—এ নিয়েই পণ্ডিত মহলে সমস্যা, বিতর্ক। কারণ 'গোপীচন্দ্রের গানে' যেমন ইতিকথার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে, তেমনিই গীতিকারও কিছু বৈশিষ্ট্য এতে লভ্য। তাই অবিমিশ্রভাবে গোপীচন্দ্রের গানকে কি ইতিকথা বা legend জাতীয় রচনা বলে গণ্য করা হবে, নাকি একে গীতিকা শ্রেণীভুক্ত রচনা বলে মেনে নেওয়া হবে—সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য Maria Leach প্রদত্ত সংজ্ঞার নিরিখে গোপীচন্দ্রের গানকে ইতিকথা বা Legend শ্রেণীভুক্ত রচনা নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

লিজেণ্ডের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'originally something to be read at religious service or at meals, usually a saint's or martyr's life', কিন্তু লিজেণ্ডের সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে '...a narrative supposedly based on fact, with an inter mixture of traditional materials told about a person, place or incident.'

একথা ঠিকই যে গোপীচন্দ্রের গানের নায়ক হাড়িসিদ্ধা অথবা ময়নামতীর মত অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন চরিত্র নন, নায়ক মাণিকচন্দ্র রাজার মরণোত্তর জাতক

গোপীচন্দ্র। কাব্যে তাঁকে শহীদ রূপে চিত্রিত করা হয়নি। তাঁকে সাধু বা saintও বলা যায় না। দ্বাদশ বৎসরের জন্য যদিও তাঁকে সন্ন্যাস নিতে হয়েছিল, কিন্তু তা নিতে হয়েছিল জননী ময়নামতীর নির্দেশে, একান্তভাবে গোপীচন্দ্রের নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে গোপীচন্দ্র ছিলেন জীবন-রসিক, তাই তাঁর পক্ষে saint বা সাধু হওয়া সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত Maria Leach প্রদত্ত সংজ্ঞার নিরিখে গোপীচন্দ্রের গানকে ইতিকথার শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় সংজ্ঞার নিরিখে, এর ইতিকথা শ্রেণীভুক্ত হবার দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না। কেননা গোপীচন্দ্রের গান বর্ণনা মূলক রচনা, narrative ত বটেই, এই কাব্যের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে ঐতিহ্য থেকে এবং মূলত: গোপীচন্দ্রের বিষয়েই কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি কাব্যের যে মূল ঘটনা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ—তাও ত ইতিকথারই উপযোগী বিষয়। Joseph Fontenrose তাঁর 'The Ritual Theory of Myth'-এ লিজেণ্ডের সংজ্ঞায় বলেছেন :

'I define legends as traditional tales of the deeds of heroes, men of a distant past. Heroes may be warriors, kings founders, benefactors, ancestors, or even robbers and pirates. It matters not whether the legendary hero is a dimly remembered historical person or a faded god or purely imaginary in his inception, in the legend he is a mortal man who was born and who died, although he did super human deeds and gods helped him.'

'Fontenrose'-এর বক্তব্য অনুযায়ী ইতিকথা হল ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনী, যাতে বীরদের কার্যাবলী, অতীতের মানুষের কাহিনী পরিবেশিত। ইতিকথার নায়ক যোদ্ধা হতে পারেন, রাজা হতে পারেন, উপকারী এমনকি দস্যুও হতে পারেন। বিস্মৃত ভগবান কিংবা বিস্মৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অথবা সম্পূর্ণ রূপে কাল্পনিক চরিত্র—ইতিকথার নায়ক কে হবেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। মোটের ওপর ইতিকথার নায়ককে হতে হবে একজন রক্তমাংসের মানুষ, যদিও তিনি অলৌকিক ক্রিয়া কর্মাদি সম্পাদন করবেন আর এক্ষেত্রে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর সহায়ক হতে পারেন। এই বক্তব্যের নিরিখে গোপীচন্দ্রের গানের ইতিকথা রূপে বিবেচিত হতে কোনো বাধা থাকে না। গোপীচন্দ্র ছিলেন রাজা, এঁর কাহিনী ঐতিহ্যাশ্রিত। গোপীচন্দ্রকে বিস্মৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও বলা চলে।

গোপীচন্দ্র যে একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, অন্তত: কাব্যে বর্ণিত তাঁর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকার কথা নয়। যে ভাবে হীরা নটীর শত প্রলোভন তিনি জয় করেছেন, তাঁর সেই আচরণ অলৌকিক মর্যাদা দাবী করতে পারে, অবশ্য ময়নামতী কিংবা হাড়ি সিদ্ধার মত তাঁর অলৌকিক আচরণের পরিচয় কাব্য মধ্যে অনুপস্থিত।

Mary Barker এবং Christopher Cook সম্পাদিত 'Pears Encyclopaedia of myths and legends' গ্রন্থে ইতিকথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'Legends are stories embedded in some elements of facts and

history, however tenuous, concerning heroes and events. They overlap with myths in that fancy and exaggeration tended to elevate the heroes to super human status. In addition the gods often played a role, sometimes major, sometimes minor, in the legends, as in the tales of the Trojan war. Also the central figures of legend, in many cases, assumed divine power.'

অর্থাৎ ইতিকথায় কিছু সত্য, কিছু তথ্য এবং ইতিহাস থাকবে। গোপীচন্দ্রের গানের নায়ক গোপীচন্দ্রকে অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে মনে করে থাকেন। অনুমিত হয় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'বঙ্গল দেশে' 'গোবিন্দ চন্দ্র' নামে যে রাজা ছিলেন, তিনিই গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের গুরু হাড়িপা, যিনি 'গোপীচন্দ্রের গানে'র একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র, তাঁর প্রকৃত নাম জালন্ধরী পা। বৌদ্ধ গ্রন্থে এঁর নাম লভ্য। ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইনি জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ এটি ঐতিহাসিক চরিত্র। কঠিন চরিত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গোপীচন্দ্রের চরিত্রটিকে অনেক উন্নত মানের করে তোলা হয়েছে। বলা যায় Superhuman পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন তিনি। ইতিকথায় দেবতাদের কম-বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। গোরক্ষনাথের ভূমিকা কাব্যমধ্যে যে অনেকখানি, তা আমাদের জানা। গোপীচন্দ্রের গানের মুখ্য চরিত্রগুলির মধ্যে ময়নামতী, হাড়িপা এবং গোপীচন্দ্রের উল্লেখ করতে হয়। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুজন যে 'divine power'-এর অধিকারী ছিলেন, কাব্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। অতএব ইতিকথার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যই গোপীচন্দ্রের গানে বিদ্যমান দেখা গেল।

ইতিকথার নায়কদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'The heroes, modeled after the gods, displayed superhuman characteristics, and many were of semidivine origin.'

গোপীচন্দ্রকে দেবতা হিসাবে উপস্থাপিত হতে দেখা না গেলেও কঠিন চরিত্র পরীক্ষায় এবং দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সন্ন্যাস জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর দেবোপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়েছে।

Thomas keightley (1789-1872)-র মতে ইতিকথার উপাদান হল 'the true or fabulous events which are believed to have occurred either among the people itself, as its own adventures, or those of its princes and heroes.'

তর্কের খাতিরে বলা যায়, গোপীচন্দ্রের গানে আমরা সত্য ঘটনার সন্ধান যদি বা নাও পাই, এতে 'fabulous' বা কল্পিত অবিশ্বাস্য ঘটনার উপস্থিতি সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। গোপীচন্দ্রের গানের শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে এর কাহিনী সত্য এবং বাস্তব ঘটনা বলেই গৃহীত হয়েছে, যেমন রামায়ণের কাহিনী সত্য বলেই অনেকের বিশ্বাস। গোপীচন্দ্রের কাহিনী মূলত: গোপীচন্দ্রকে নিয়েই, তিনিই এই উপাখ্যানের নায়ক, আবার তিনি রাজকুমারও বটে।

ইতিকথার বিষয়বস্তু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'the false stories deal with marvellous adventures of the national hero, a youth of humble birth, the saviour of his people, freeing them from monsters delivering them from famine and other disasters and performing other noble deeds'. (World perspective 21), Myth and Reality; Mircea Eliade; New York (1963).

Maria Leach প্রদত্ত সংজ্ঞার সঙ্গে এই বক্তব্যের গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে এখানে 'false stories' বলতে 'legend'কেই বোঝানো হয়েছে। গোপীচন্দ্রের গানে কবি যে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করেছেন, এ সত্য অনস্বীকার্য। সুতরাং 'marvellous adventures' যা নাকি legend-এর মূল বর্ণিতব্য বিষয় হওয়া উচিত, সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোপীচন্দ্রের গানের ইতিকথার শ্রেণীভুক্ত হতে বাধা নেই। গোপীচন্দ্র নিজে বয়সে তরুণ, তবে তিনি 'humble birth' বা সাধারণ বংশের সন্তান নন, রাজবংশোদ্ভূত, যাকে বলে 'noble birth'-এর অধিকারী। তাছাড়া তিনি তাঁর রাজ্যের জনগণকে রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করেননি, দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকেও রক্ষা করেননি, তাঁকে জনগণের রক্ষাকর্তা রূপেও আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এদিক দিয়ে দেখলে গোপীচন্দ্রের গানের ইতিকথারূপে বিবেচিত হবার দাবী কিছুটা পূরণ হলেও, অন্যদিকে শর্ত পূরণে অনেকটা ঘাটতি থেকে গিয়েছে স্বীকার করতে হয়। তবে Maria Leach যেমন Legend-এর প্রসঙ্গে বলেছেন, 'originally something to be read at religious service or at meals'—মূলত: ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অথবা ভোজন অনুষ্ঠানে ইতিকথা পঠিত হবার জন্য বচিত, Mircea Eliade তা অস্বীকার করেছেন, বলেছেন, 'False stories can be told anywhere and at any time,' অর্থাৎ ইতিকথা পাঠের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান বা সময় ছিল না, তাঁর মতে সেই স্থান বা সময় নির্দিষ্ট ছিল মিথের ক্ষেত্রেই কেবল, 'myths must not be recited except during a period of sacred time usually in autumn or winter and only at night,' অর্থাৎ গোপীচন্দ্রের গান যে কোন সময়ে পঠিত হতে পারত, কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার সংযোগ রক্ষার বাধ্যবাধকতা ছিল না। লক্ষ্য করার যে সমালোচক এবং পণ্ডিতমণ্ডলী নিজেদের সংজ্ঞা অথবা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছান নি। তাই পরস্পর বিপরীত বক্তব্য ইতিকথা সম্পর্কে লক্ষিত হতে দেখা গেছে। মোটামুটিভাবে ইতিকথার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল : (ক) 'Myths and legends handed down from generation to generation, enriched the lives of all who listened giving them value and a sense of security linking them with the heroic and divine wisdom that seemed to real to them. In this way, thev became traditional stories, with changes due to the passage of time and variations given them by the narrators resulting in many

cases as modifications and in different versions many quite divergent but always with the same purpose–to clarify and explain the narrative'.

(খ) 'We are concerned with only those traditional tales which introduce supernatural characters and events although they may not be the principal characters or events.'

(গ) 'Legends are prose narratives...'

(ঘ) 'When the hero is a man rather than a god, myth becomes legend...'.

লোকপুরাণ এবং ইতিকথার মধ্যেকার গভীর সাদৃশ্যের কারণে পণ্ডিতমণ্ডলী অনেক সময়েই এই দুটি বিষয়কে নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করেছেন, অথবা উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে দুটি বিষয়ের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্পষ্ট করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। মিথ এবং লিজেণ্ড–উভয়কেই ঐতিহ্যাশ্রিত হতে হবে। প্রজন্ম পরম্পরায় তা হস্তান্তরিত হতে থাকে। আর এগুলির পাঠান্তর লক্ষিত হয় সময়ের ব্যবধানের কারণে। লোকপুরাণ, ইতিকথা প্রভৃতিতে অলৌকিক চরিত্রাবলী চিত্রিত হয়, উপস্থাপিত হয় অলৌকিক ঘটনাবলী, যদিও এইসব চরিত্র বা ঘটনা ইতিকথায় মুখ্য ভূমিকা নাও পালন করতে পারে। ইতিকথা গদ্যে রচিত আখ্যান। সর্বোপরি নায়ককে রক্তমাংসের মানুষ হতে হবে।

আমরা জানি, গোপীচন্দ্রের গানের নায়ক গোপীচন্দ্র কোন অর্থেই দেবতা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি নন, যদিও গোপীচন্দ্রের গানে অলৌকিক চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে বেশ ভালভাবেই। এই আখ্যান ঐতিহ্যাশ্রিত এবং প্রজন্ম পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে এসেছে। এই আখ্যানের অনেকগুলি পাঠান্তরও লভ্য যেমন সুকুর মামুদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসী', ভবানী দাস রচিত 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী', জর্জ গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', সর্বোপরি মৌখিক সংগ্রহে 'গোপীচন্দ্রের গান' ত আছেই। পাঠান্তরগুলির মধ্যে যে নানা পার্থক্য বিদ্যমান তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'গোপীচন্দ্রের গান' কিংবা 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' অথবা 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' কোনটিই গদ্যে রচিত নয়, সব ক'টিই রচিত হয়েছে পয়ার ছন্দে। তাই ইতিকথার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যেমন রয়েছে, তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্যের অভাবও লক্ষিত হয় 'গোপীচন্দ্রের গানে'।

এইবার আমরা 'গোপীচন্দ্রের গানকে' গীতিকা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া যায় কিনা সেই সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। Helen Child Sargent and George Lyman Kittredge তাঁদের সম্পাদিত 'English and Scottish popular Ballads' গ্রন্থে বলেছেন, 'A ballad is a song that tells a story, as to take other point of view–a story told in song,' 'গোপীচন্দ্রের গান' মূলত: লোকগীতি এবং এতে একটি কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। অতএব 'story told in

song' এই শর্ত 'গোপীচন্দ্রের গান' পূরণ করেছে। সেদিক দিয়ে একে গীতিকা বলে স্বীকার করে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। G. H. Gerould তাঁর 'The Ballad of Tradition' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'A ballad is a folk song that tells a story which stress on the crucial situation....'.

অর্থাৎ গীতিকা এমন এক কাহিনী নির্ভর লোক সঙ্গীত যাতে বিষম পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব প্রদত্ত হয়। এদিক দিয়ে 'গোপীচন্দ্রের গান'কে গীতিকা শ্রেণীভুক্ত বলে মানতেই হয়, কেননা 'গোপীচন্দ্রের গানে' গোপীচন্দ্রেব সন্ন্যাস গ্রহণ সংক্রান্ত বিষম পরিস্থিতিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

'The Faber Book of Ballads' এ বলা হয়েছে, 'A ballad is a song that comments on life by telling a story in a popular style.'

গোপীচন্দ্রের গানে পরিচিত ঢঙে কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে এবং জীবন বিষয়েই ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস নিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু নাছোড়বান্দা জননীর জন্য তাঁকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়েছে, সন্ন্যাসের পূর্বে তার সংসার আসক্তি প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সন্ন্যাস অবসানে যখন তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখনও তাঁর জীবনাসক্তি দেখা গেছে। জননীর কাছে গুরুর নির্দেশ মত প্রথমে উপস্থিত না হয়ে উপস্থিত হয়েছেন স্ত্রীদের কাছে, আর সন্ন্যাস জীবনযাপন করলেও তিনি রাণীদের স্মৃতিকেই অবলম্বন করে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। বলা চলে 'গোপীচন্দ্রের গানে' সন্ন্যাসের পরিবর্তে জীবনের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। Anny Henry Ehrenpreis তাঁর 'The Literary Ballad'-এ বলেছেন, 'It deals with a single situation revealed dramatically with little intrusion on the part or the story teller'.

মৈমনসিংহ গীতিকার তুলনায় গোপীচন্দ্রের গান বিশালাকৃতির সন্দেহ নেই, বেশ কয়েকটি চরিত্র এবং ঘটনাও এতে চিত্রিত, কিন্তু মূলত: গোপীচন্দ্রের গানে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ এই ঘটনাকেই বিবৃত করা হয়েছে। তরুণ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণে তীব্র অনীহা, মাতার আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে এই অপ্রিয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়েছে, কিন্তু সহজে তাই বলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। শেষ সময় পর্যন্ত নানাভাবে মাকে প্রতিরোধের সম্মুখীন করেছেন তিনি। শেষে নিরুপায় হয়ে তাকে মাতৃ ইচ্ছাকে বরণ করে নিতে দেখা গেছে। মোটামুটি এই সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাটি বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর নাট্যকারের মতই এর রচয়িতার সরাসরি আত্মপ্রকাশ কাব্যে ঘটেনি। আদর্শ গীতিকার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য কিন্তু 'গোপীচন্দ্রের গানে' অনুপস্থিত স্বীকার করতে হয়। আদর্শ গীতিকার অন্যতম লক্ষণ হল 'Simplicity and economy of expression', সাবল্য এবং সংযত প্রকাশ ভঙ্গী। কিন্তু গোপীচন্দ্রের গানকে আর যাইহোক সংযত প্রকাশ ভঙ্গীর নিদর্শন বলা যাবে না। তুলনামূলকভাবে বড়ই দীর্ঘ। তাছাড়া নাথ ধর্মতত্ত্ব এবং অলৌকিক শক্তির বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হওয়ায় এর

সারল্য গুণটুকু অন্তর্হিত। Dr. Murray বলেছেন, 'a simple spirited poem in short stanzas in which some popular story is graphically told'— গীতিকা ক্ষুদ্রাকৃতির স্তবক সম্বলিত রচনা। M.J.C. Hodgart ও বলেছেন '...nearly always written down in short stanzas of two or four lines,', কিন্তু গোপীচন্দ্রের গান স্তবক সম্বলিত রচনা নয়। এইসব কারণেই গোপীচন্দ্রের গানকে আদর্শ গীতিকার পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। 'গোপীচন্দ্রের গানে' যেমন ইতিকথা এবং গীতিকা উভয় শ্রেণীর রচনারই কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তেমনি কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতিও এতে লক্ষ্য করার মত। তাই 'গোপীচন্দ্রের গান'কে আমরা ইতিকথা ও গীতিকা উভয়ের বৈশিষ্ট্যে বচিত একপ্রকার মিশ্র রচনা বলে অভিহিত করতে পারি।

### গোপীচন্দ্রের গান নাথ ধর্মাশ্রিত হলেও শেষপর্যন্ত তা কাব্য

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—"গোপীচন্দ্রের গানের মূল্য ইহার ধর্ম প্রচারেও নহে কিম্বা ইতিহাসেও নহে, ইহার মূল্য ই়ার কাব্যগুণে। কাব্য যদি জীবনসত্যের অভিব্যক্তি হয়, তবে নিরক্ষর পল্লী কবির রচনা সত্ত্বেও গোপীচন্দ্রের গান সার্থক কাব্যগুণের অধিকারী হইয়াছে, এবং এই গুণেই ইহার কাহিনীটি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচার লাভ করিয়াছিল।"

আমরা জানি নাথ সাহিত্যের দুটি ধারা—গোরক্ষবিজয়--মীনচেতন এবং মাণিকচন্দ্র ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গান। শেষোক্ত ধারাটি অনেকবেশি মানবিক গুণ সমৃদ্ধ। এতে সন্ন্যাসের কাহিনী থাকলেও কোন উচ্চতর আধ্যাত্মিক কাহিনী সামনে রেখে এই সন্ন্যাস পালন করা হয়নি, অর্থাৎ গোপীচন্দ্রের গানকে নিমাই সন্ন্যাসের অনুরূপ কাহিনী বলা যায় না বরং 'এটি রাম বনবাসের কাহিনীরই সমধর্মী'। রামচন্দ্রের বনবাস যেমন ভারতের এক জাতীয় মহাকাব্যের প্রেরণা দিয়েছিল, গোপীচন্দ্রেব সন্ন্যাসও তেমনি বাঙালী জাতির এক সার্থক মৌলিক কাব্য রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে।

গোপীচন্দ্রের গানের কাহিনীটি মোটেই আদর্শমূলক নয় আনুপূর্বিক বাস্তব জীবন কেন্দ্রিক। এতে নানা অলৌকিকতার সমাবেশ ঘটেছে তা সত্ত্বেও এর মূল কাহিনীর ধারাটি স্বাধীনভাবেই অগ্রসর হয়েছে। সমগ্র কাহিনী জুড়ে গোপীচন্দ্র তার বাস্তবজীবন সচেতনতা কখনও বিসর্জন দেননি। 'তিনি ভোগী, মঙ্গলকাব্যের নায়কদের মতো, সংসারের ভোগের মধ্যে আসক্ত হয়ে থাকতে চান'। পূর্ণ যৌবনে প্রচণ্ড ভোগের প্রতি অপরিসীম তৃষ্ণা নিয়ে জননীর শাসন মাথায় করে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন। পত্নীপ্রেমকে অন্তরের মধ্যে অনির্বাণ রেখে সন্ন্যাস জীবনে সমস্ত প্রলোভনকে জয় করেছেন। তারপর তাঁর নির্দিষ্ট সন্ন্যাস জীবন সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভোগের জীবনে ছুটে এসেছিলেন। সন্ন্যাস জীবনের কোন সংস্কার তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। গোপীচন্দ্রের চরিত্রের এই পরিকল্পনা বলাবাহুল্য, উচ্চাঙ্গ কাব্য সম্মত। এই চরিত্রটির ঐতিহাসিক

ভিত্তি যাই হোক না কেন, পল্লী কবিগণ আনুপূর্বিক একে একটি কাব্য সৌষ্ঠব দিয়েছেন। 'ইতিহাসের চরিত্রকে কাব্যের রূপে রসে মণ্ডিত করেছেন'।

নাথধর্ম এবং তত্ত্বের কিছু কিছু কথা থাকলেও লক্ষ্য করবার বিষয় জীবনাসক্তি, বাস্তবতা, তীব্র অনুভূতি এবং সেগুলির কাব্যিক প্রকাশ গোপীচন্দ্রের গানকে অন্য মূল্য এনে দিয়েছে। ময়নামতীর স্বামী রাজা মাণিকচন্দ্রের কথাই ধরা যাক্। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পাঁচটি বিবাহ্ করেছিলেন, এই পাঁচজনই অপরূপ সুন্দরী এবং যুবতী। রাজার মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে ময়নামতী তাঁকে তাঁর লব্ধজ্ঞান শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজা মাণিকচন্দ্র অস্বীকৃত হয়েছেন এই কারণে যে, সেক্ষেত্রে পত্নীকে গুরু বলে স্বীকার করতে হয়। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ সহজে যে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চায় না মাণিকচন্দ্রের আচরণ তারই প্রমাণ। ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস নেবার জন্য বলেছেন। এ কোন মুক্তি মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে নয়। ময়নামতী বুঝেছিলেন গোপীচন্দ্রের অকালমৃত্যু আসন্ন। এই কারণেই তাকে বারো বৎসর সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য তার এত জেদাজেদি। আসলে অপত্য স্নেহই ময়নামতীকে পুত্রসন্তানকে গৃহত্যাগী হতে পরামর্শ দিয়েছিল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন ধারণ করে কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ভোগাসক্ত গোপীচন্দ্র তরুণ যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বাধ্য হন। অদুনা-পদুনার কাতর ক্রন্দনে রাজপুরী পরিণত হল শ্মশানে। সন্ন্যাসের পথে দাঁড়িয়েও রাজপুত্র বার বার পরিত্যক্ত রাজপুরীর দিকে তাকাতে লাগলেন। অদুনা-পদুনার কাতর অশ্রুসিক্ত চোখদুটি বার বার তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। রাজপ্রাসাদকে বহুদূরে ফেলে তপ্ত মরুভূমি, দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করে সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে হাড়ি সিদ্ধা' অগ্রসর হতে লাগলেন। হীরা নাম্নী এক গণিকার গৃহে গোপীচন্দ্র বারো বৎসরের জন্য বাঁধা থাকলেন। গণিকা তার যৌবনের বিনিময়ে আকৃষ্ট করতে চাইল গোপীচন্দ্রকে, কিন্তু ব্যর্থ হল। সন্ন্যাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গোপীচন্দ্র রাজধানীতে ফিরে এলেন, পুনরায় স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন, দুঃখের অগ্নিতে প্রেমের যে সোনা জ্বলে উজ্জ্বল হয়েছিল তার দীপ্তিতে তাঁর জীবন অধিকতর ভাস্বর হল।

কাহিনীটি অনুসরণ করলে দেখা যায় এর মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ বিকাশ লাভ করেছিল। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, এ কাহিনী যে কোন আধুনিক কাব্যের বিষয় হতে পারে। মাণিকচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সকলের চরিত্রের মধ্যেই বাস্তবধর্মিতা অক্ষুণ্ণ আছে। 'ঐহিক ভোগাসক্তি, জীবন লালসা, মানবিক ভুলত্রুটি এবং অন্ধ সংস্কার' প্রিয়তা এ সবের উপর ভিত্তি করেই গোপীচন্দ্রের গান রচিত হয়েছে। 'মানুষের প্রত্যক্ষ আশা-নৈরাশ্য ও আশঙ্কা বেদনার কথাতেই এই কাব্য সার্থক।' গোপীচন্দ্রের গান প্রকৃত বিচারে একটি অনবদ্য প্রেম কাহিনী। এ কাব্যের শিক্ষা হল—'নর-নারীর মন রূপজ মোহের আকর্ষণে প্রথম যে আকৃষ্ট হয় তার মত্ততা অধিককাল স্থায়ী হয় না কিন্তু রূপজ মোহমুক্ত প্রেমকে যদি জীবনের ভিতর দিয়ে কল্যাণে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় তবে তাকে দুঃখের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়'। অদুনা-পদুনার

যখন মাত্র সাত বৎসর বয়স তখন তাদের বিবাহ হয়েছিল গোপীচন্দ্রের সঙ্গে। রাজপুত্র তখন নাবালক, অপরিণত বয়স্ক বালক এবং বালিকাদের প্রথম মিলনের মত্ততা জীবনের কল্যাণ নির্দেশ স্বভাবতঃই করতে পারে না, সেইজন্য আবশ্যক হয়েছিল বিচ্ছেদের। ময়নামতীর সন্ন্যাসের আদেশ সেই অভিলষিত বিচ্ছেদ এনে দিল। সেই বিচ্ছেদে পরস্পরের প্রতি আরও আকর্ষণ অনুভব করল তারা।

এইবার আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দৃষ্টান্তের প্রেক্ষিতে কাব্যত্ব কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় নেবো। সন্ন্যাসে যাবার পূর্বে গোপীচন্দ্র মুণ্ডিত মস্তক, কৌপীন পরিহিত অবস্থায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে হাজির হলেন, পুত্রকে এই অবস্থায় দেখে ময়নামতী জননীর হৃদয় বিগলিত হল—

"এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ধন করিয়া
সুবর্ণের থালত রন্ন দিল পারশা করিয়া।।
চৌকিয়া পিড়া দিলে বসিবার লাগিয়া।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে গঙ্গাজল দিল আগা করিয়া।।
ছাইলাক ডাকায় বুড়ী ময়না কান্দিয়া ।টিয়া।
আইস, আইস, যাদুধন, দুখিনীর দুলালিয়া।।
রন্ন খাইয়া যাও, যাদু, বৈদেশ লাগিয়া।"

—জননীর কণ্ঠে স্নেহ সম্বোধন শুনে গোপীচন্দ্রের কণ্ঠ অভিমানে রুদ্ধ হয়ে আসল—

"রাহ্নিক করিয়া রাজা রন্নের কাছে গেল।
সুবর্ণের থালে রন্ন দেখি কান্দিতে লাগিল।।
যখনে আছিলাম মা রাজ্যের ঈশ্বর।
সুবর্ণের থালে রন্ন মা খাইয়াছি বিস্তর।।
এখন হইলাম কপীন পিন্দা কড়াকের ভিখারী।
সুবর্ণের থালে রন্ন খাইতে না পারি।।
সুবর্ণের থালেব রন্ন কদুর থালে নিয়া।
সুবর্ণ ভৃঙ্গাবের গঙ্গাজল করঙ্গ তুম্বায় নিয়া।
রন্ন খায় ধর্মিরাজ পত্রে বসিয়া।।"

—এই চিত্রটি বিশিষ্ট কাব্যগুণের অধিকারী। কাব্য বর্ণিত যেসব বিষয় পাঠকের চিত্তকে অধিকার করে এর মধ্যে তার সার্থক প্রেরণা আছে। মানুষের জীবনে নিয়তির নির্মম পরিহাসের এর তুলনায় উজ্জ্বলতর চিত্র আর কি হতে পারে। অতুল ঐশ্বর্যভোগী রাজা নিজের প্রাসাদ দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত। ভিক্ষাপ্রদত্ত অন্ন দীনহীন ভিক্ষুকের মত আভিজাত্য ত্যাগ করে নিজের জননীর কাছ থেকে গ্রহণ করে পাতায় বসে আহার করছেন। বনগামী রামচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন সীতা এবং লক্ষ্মণ কিন্তু হতভাগ্য গোপীচন্দ্র নিঃসঙ্গ। তার সন্ন্যাসের দুঃখ ভাগ করে নেবার কেউ নেই। যেখানে দুঃখ ভাগ করে নেবার কেউ থাকে না সেখানে দুঃখ শতগুণ ভারী হয়ে ওঠে।

রাণী ময়নামতী পুত্রকে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করলেন অথচ তিনিই আবার গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার অব্যবহিত পূর্বে গোপনে গোপীচন্দ্রের ঝুলিতে বারো কাহন কড়ি গুঁজে দিয়েছিলেন এবং গুরুকে কড়ির কথা না বলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ময়নামতীর মধ্যে আমরা স্নেহ সতর্ক মাতৃহৃদয়ের সন্ধান পাই। অদুনা এবং পদুনার গোপীচন্দ্রকে গৃহে রাখার শত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল এমনকি তাঁর সন্ন্যাস অবলম্বনের সময়কে বিলম্বিত করতেও তারা ব্যর্থ হল। শেষে দুজনে ধরে পড়ল তারাও সঙ্গী হবে গোপীচন্দ্রের, কিন্তু গোপীচন্দ্র তাতে অসম্মত হলেন—

"কান্দে রদুনা রাণী ধরিয়া রাজার পাও।
এ হেন বয়সের বেলা ছাড়িয়া না যাও।।
ছাড়িয়া না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার জন্য বান্ধিলেন শয়ন—মন্দির ঘর।।
শয়ন-মন্দির ঘর বান্ধিছ নাই পড়ে কালি।
এমত বয়সে ছাড়িয়া যাও বৃথায় গাভুরালি।।"

—পার্থিব বেদনায় কাতর নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক করুণরসের অভিব্যক্তিতে এই রচনাংশটি অপূর্ব সার্থক হয়ে উঠেছে।

গোপীচন্দ্র তাঁর পিতার অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন ময়নামতীকে। এমনকি তাঁকে ব্যভিচারিণীও বলেছেন কিন্তু তার জ্ঞানের পরিচয় নিতে গিয়ে খেতুর মুখ থেকে ভুল খবর শুনেছেন জননী মারা গেছেন। তখন গোপীচন্দ্রের প্রকৃত আচরণ প্রকাশ পেয়েছে—

"পাটতে বসিয়া রাজা এ কথা শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে লাগিল।।
বাম হস্তে মাথার পাগ রাজা টালাইয়া ফেলিল।
কাটা বৃক্ষের লাকান রাজা ঢলিয়া পড়িল।।
কি কথা শুনালি খেতু আবার বল শুনি।
নিভা কাষ্টতে যেমন জ্বলাই আগনি।।
দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননী।
সবাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী।।"

—অতএব যতই ধর্ম ও তত্ত্বাশ্রিত হোক লোককবি সেই ধর্ম এবং তত্ত্বের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে গোপীচন্দ্রের গানকে অভিপ্রেত উপভোগ্য কাব্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। এই কারণে গোপীচন্দ্রের গানের এবংবিধ আকর্ষণ।

### গোপীচন্দ্রের গানে প্রকাশিত নাথ ধর্ম

সমালোচক মনে করেছেন—"গোপীচাঁদ আখ্যায়িকাই নাথ সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্য"। যেহেতু বিশেষ ধর্মাশ্রিত কাব্য তাই অবিমিশ্র সাহিত্য সৃষ্টির

উদ্দেশ্য নিয়ে যে গোপীচন্দ্রের গান রচিত হয়নি তা বলাই বাহুল্য। তবে যেহেতু গোরক্ষ বিজয় নাথ সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ তাই সেখানে তত্ত্বের প্রাধান্য বেশী। তুলনামূলকভাবে গোপীচন্দ্রের গানে তত্ত্বের অংশ কম, গল্পাংশের সেখানে প্রাধান্য। ফলে গোরক্ষবিজয়ের তুলনায় গোপীচন্দ্রের গানে মানবিক আবেদন অনেক বেশী। আমরা গোপীচন্দ্রের গানে নাথধর্ম ও তত্ত্ব সীমিত পরিসরে হলেও যেটুকুর প্রকাশ ঘটেছে তার পরিচয় নেব।

গোপীচন্দ্রের গানে বর্ণিত হয়েছে ময়নামতী রাজা মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে থাকতেন না। কাব্যের বর্ণনায় আপাতভাবে মনে হবে মাণিকচন্দ্র রাজার অন্যান্য পত্নীদের সঙ্গে ময়নামতীর বনিবনা হত না। ঝগড়া বিসম্বাদ লেগেই থাকত। এই কারণে মাণিকচন্দ্র রাজা তার অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে দেন। আসলে ময়নামতী ছিলেন একজন সিদ্ধা। তিনি মর্মে মর্মে নাথধর্মের মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করেন। তিনি জেনেছিলেন কায়া সাধনে সিদ্ধি লাভ করলে অমরত্বের অধিকারী হওয়া যায়। এ কারণে একদিকে তিনি স্বামী মাণিকচন্দ্র ও পুত্র গোপীচন্দ্রকে যোগী হবার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যদিকে ময়নামতীর মত নারীর পক্ষে স্বামী সহবাস করা অসম্ভব ছিল। নাথেদের মধ্যে এই প্রবল সংস্কার ছিল যে সিদ্ধা ময়নামতী কখনই প্রাকৃত নারীর মত দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারেন না। একারণে কৌশলে কাব্যে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ময়নামতীর একটিই সন্তান গোপীচন্দ্র। কিন্তু গোপীচন্দ্রের জন্মের ব্যাপারে ময়নামতীর সঙ্গে রাজা মাণিকচন্দ্রের দৈহিক সংসর্গের কথা যুক্ত করা হয়নি। বর্ণিত হয়েছে ময়নামতী অলৌকিক উপায়ে সন্তান লাভ করেছেন। তার স্বামীর অকাল মৃত্যু তিনি মেনে নিয়েছেন বিনিময়ে পুত্র সন্তান লাভের বর পেয়েছেন। এক্ষেত্রে কেউ কেউ রুচি বিকারের প্রশ্ন তুলতে পারেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নাথধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই গোপীচন্দ্রের অলৌকিক উপায়ে জন্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও সমালোচক এক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— "মহাপুরুষদের জন্মের সম্বন্ধে এইরকম অলৌকিক কাহিনী প্রচার সব জাতিরই স্বভাব। খ্রীষ্টানরা বলেন যীশুখ্রীষ্টের জননী মেরী ঐশ্বরিক প্রভাবে সন্তানবতী হয়েছিলেন। কোনও মানুষ তাঁর জনক নন। তাঁদের এইরকম বলার পিছনে যে মনোভাব ছিল, নাথ সম্প্রদায়ও সেই একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে গোপীচাঁদের জন্ম সম্বন্ধে এইসব অতিপ্রাকৃত কাহিনী প্রচার করেছিলেন। একে রুচির বিকার বলে মনে করা যায় না বলেই আমাদের ধারণা।"

গোপীচন্দ্রের গানে ময়নামতী ব্যতীত আর দুজন উল্লিখিত হয়েছেন। গোরক্ষনাথ ও হাড়িপা। গোরক্ষনাথ ছিলেন ময়নামতীর গুরু আর হাড়িপা সে সুবাদে গুরুভাই। গোপীচন্দ্রকে ময়নামতী পরামর্শ দিয়েছেন হাড়িপাকে গুরুরূপে গ্রহণ করতে। নাথ সম্প্রদায় সংসার বিমুখ ছিলেন। তাঁরা প্রথমে দুটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন এর মধ্যে একটি নারীসঙ্গ বর্জিত যোগমার্গ অবলম্বী, এদের সাহিত্য হল গোরক্ষবিজয়। দ্বিতীয়

শাখার লোকেরা যোগ মার্গের পথিক হলেও নারী সাধিকাকে মেনে নেন। আমরা গোপীচন্দ্রের গানের কিছু পংক্তি উদ্ধার করে দেখব কেমন করে নাথধর্মের প্রকাশ এতে ঘটেছে।

নাথধর্ম গুরুবাদী ধর্ম। এ ধর্মে সিদ্ধি লাভ করতে গেলে গুরুর সহায়তা আবশ্যক। ময়নামতী গুরু বন্দনার উপর জোর দিতে পরামর্শ দেন পুত্র গোপীচন্দ্রকে। রাজ্যের মায়া ত্যাগ করতে বলেন—"ছাড় বেটা এলা মেলা ছাড় উত্তম ভোজ। / রাজ্যের মায়া তেজিয়া চল গুরুর সাথ।। / গুরু সাচা পিণ্ডি কাচা সংসারে কয়। / গুরু না ভজিলে দেহ শৃগালে না খায়।। / অপমৃত্যু দেহ হইলে কাকে ছাড়ি যায়।।

ময়নামতী যোগীধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন গোপীচন্দ্রের কাছে ও যোগীধর্মের দাবী মেনে তাকে সন্ন্যাস নেবার পরামর্শ দেন—"হিন্দুস্থানি পড়ি বুঝোঁ ভাগবত পুরাণ। / মোছলমানে পড়েছিলাম কিতাব কোরাণ।। / যোগীধর্মে পড়িয়া বুঝিলাম এই যোগ ধ্যান। / বেদ বিধি পড়িয়া শাস্ত্রেব পাওঁ ঠাঞি। / বিনে সন্ন্যাস না হইলে তোর ভাগুর নিস্তার নাই।। /

নাথধর্মে নারীকে বাঘিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে। অদুনা পদুনায় আসক্ত গোপীচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছেন ময়নামতী—

"বধূর কথা কলু যাদু তোর মায়ের কথা শোন।
এ সব কথা তুলিলে পঞ্জরে বিন্ধে ঘুন।।
বধূ বধূ বল বেটা বধূ আপ্ত নয়।
কলিজা ফাড়িয়া দিলে স্ত্রী আপনার নয়।।
হাকিম নয় আপনার কোটোয়াল নয় রিশ।
ঘরে স্ত্রী তোর আপনার নয় যার চঞ্চল চিত।"

সরাসরি বধূকে বাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

"বাঘিনী বধূর কথা শোনেক মায়ের ঠাঞি
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস যা নির্বুদ্ধি কেনাই।।"

স্ত্রীলোক যে পুরুষের মৃত্যুর কারণ এই নির্মম তথ্য প্রকাশে ময়নামতী কার্পণ্য করেননি—"চক্ষের আড় হৈয়ে দ্যাখ তোর ঐ বধূর থ্যাকার। / নাকসিরিয়া রণ্যের বাঘ তোক লইলে ঘিরিয়া / খাইলে কলাগাছের মধু বগদুলে চুসিয়া। / সরু সরু কথা বধূ তোর কানের কাছে কয়। / হাড় মাংস ছাড়ি তোর পরাণ কাড়ি লয়।।"

যে কোনও ধর্মাশ্রিত কাব্যেই অলৌকিকত্বের প্রাচুর্য থাকবেই। আমাদের আলোচ্য গোপীচন্দ্রের গানও এর ব্যতিক্রম নয়। এই অলৌকিকত্বের সন্ধান মিলবে মাণিকচন্দ্র রাজার জীবন রক্ষার্থে ময়নামতী যমকে তাড়া করলে তাব কায়া পরিবর্তনে; গোপীচন্দ্র এবং অদুনা পদুনা প্রস্তাবিত কঠিন সতীত্বেব পরীক্ষাদানে। এমনকি গোপীচন্দ্রের গুরুর আচরণেও। তবে সুখের কথা এই যে তত্ত্বের প্রাধান্য গোপীচন্দ্রের গানকে তেমন ভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলেনি। ফলে কাব্যরস আস্বাদনগম্য হয়ে উঠেছে।।

**গোপীচন্দ্রের গানে অলৌকিকতা :**

গোপীচন্দ্রের গান অবিমিশ্র সাহিত্য নয়, এটি হল ধর্মাশ্রিত সাহিত্য। আরও একটু বিশদ করে বললে বলতে হয় নাথধর্মাশ্রিত সাহিত্য। ধর্মাশ্রিত সাহিত্যে স্বভাবতই অলৌকিকত্বের বাড়াবাড়ি থাকবেই। এর দৃষ্টান্ত আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলি। বিশেষ দেবদেবী বা বিশেষ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গেলে তাকে বড় করে তুলতে তার অলৌকিক ক্ষমতাকে প্রদর্শন করতেই হয়। গোপীচন্দ্রের গান ও এর ব্যতিক্রম নয়।

সাহিত্যে আমরা কার্যকারণ সম্পর্ককে রক্ষা করে চলি অন্ততঃপক্ষে illusion of reality-কে মানতেই হয়। কিন্তু অলৌকিকত্ব এর বাইরের ব্যাপার। তাই সাহিত্যে অলৌকিকত্ব যেহেতু যুক্তি এবং ব্যাখ্যার অতীত, তাই কাব্য সাহিত্যে তার প্রকাশ বিশেষত আধিপত্য সাহিত্যের নেতিবাচকতাকেই প্রতিপন্ন করে। আমরা প্রথমে গোপীচন্দ্রের গানে কি পরিমাণে এবং কি উপলক্ষে অলৌকিকত্বের প্রকাশ ঘটেছে তার পরিচয় নেব, তার পরে সেই অলৌকিকত্ব কাব্যের অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে কিনা সেই বিচারে প্রয়াস পাব।

নির্যাতিত প্রজারা মাণিকচন্দ্রকে লেংটি চেপে অভিশাপ দিয়েছে। তাব ফলে মাণিকচন্দ্র রাজার পরমায়ু হ্রাস পেয়েছে—

> "লেংটি চিপিয়া শাপ দিল সকলে মাণিকচান বলিয়া।
> আঠার বছরের পরমাই ছিল রাজার ফেলাইল টুটিয়া।।"

এক্ষত্রে অভিশাপের যে পরিণতি দেখানো হয়েছে তাতে স্পষ্টতই অলৌকিকত্বকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

অলৌকিকত্বের বিস্তারিত বিবরণ পাই যমের সঙ্গে ময়নার ক্ষমতার প্রতিযোগিতায়। যম মাণিকচন্দ্রের জীবন নিতে গেলে নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেন নি। এরপর আমরা দেখেছি যম কখনো বিড়ালের রূপ ধারণ করেছে, কখনোও সোনার ভোমরা হয়েছে, কখনো ইঁদুর হয়েছে, কখনও কবুতর হয়েছে—প্রয়োজন মত ময়নামতীকেও দেখা গেছে কায়াবদল করতে।

> "মহামন্ত্র গিয়ান নিল হৃদয়ে জপিয়া।
> চ্যাঙ্গা বোড়া সাপ হৈল বুড়ি ময়না কায়া বদলিয়া।।
> চ্যাঙ্গা বোড়া হইয়া ময়না এক ঝম্প দিল।
> চটকি যাইয়া গোদা যমর ঘাড়তে বসিল।।
> ইন্দুর হৈয়া গোদা যম খালতে সোন্দাইল।
> এঠে বুড়ী ময়না দিশাহারা হৈল।।
> ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল।
> ধিয়ানতে বুড়ী ময়না ইন্দুরের লাগ্য পাইল।।
> মহামন্ত্র গিয়ান নিল বুড়ী ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
> লক্ষ গোণ্ডা বার বিলাই হৈল কায়া বদলিয়া।।

এক এক করি খালের ইন্দুর খায়ছে গিলিয়া
মুঞি যখন ইন্দুর বেটাক ফ্যালানু গিলিয়া
বাম গাল্‌সি দিয়া বেটা পড়িল হস্‌কিয়া।।
কইতর হইয়া গোদা যম সগ্‌গে উড়াইল।
ওঠে ময়না বুড়ী দিশাহারা হৈল।।"

জন্মখণ্ডে বিস্তৃত পরিসরে অলৌকিকত্বকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বুঝান খণ্ডেও অলৌকিকত্বের ছড়াছড়ি। এই খণ্ডে ময়নামতীর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি পরীক্ষাতেই ময়নামতী সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন আর এই উত্তীর্ণ হয়েছেন অলৌকিক শক্তির জোরে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল—

"একপাকের কড়ার ছিল দুই পাক্ ঘুরিল।
তুষের নৌকা বৈঠা ময়না খোঁপায় গুঁজি নিল।।
সোনার খড়ম নিলে ময়না চরণে লাগেয়া।
জলের উপরে উপরে ময়না গেল পার হইয়া।।
এপার হতে বুড়ী ময়না ওপার চলি গেল।
গাঙ্গিক তরে বলিতে লাগিল।।
কিবা কর গাঙ্গি বেটি নিশ্চিন্তে বসিয়া।
তিন ভাগের জল যা তুই বালুচর করিয়া।
ডাকিনী ময়না যাওঁ মুঞি দরিয়া পার হৈয়া।।
সোনালিয়া খড়ম নিলে ময়না চরণে লাগেয়া।
জলের উপরে উপরে ময়না গেল পার হৈয়া।।
হায় হায় করে দেবগণ চিৎকার দেখিয়া।।
এক পাকের কড়াব ছিল তিন পাক হৈল।
জয় জোকার দিয়া নৌকা দরিয়াত ছাড়িয়া দিল।।
পার হইয়া পাইল ময়না গোকুল ঘাটের কূল।
ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বান্ধিল মাথার চুল।।"

আরেকটি দৃষ্টান্তে দেখি তুলসী পত্রের পরীক্ষা দিতে হয়েছে ময়নাকে---

"সোনার নিক্তি নিল হস্তে তুলিয়া।।
এক পাকে তুলিয়া দিল তুলসীর পাত।
আর এক পাকে বসিল গিয়া রাজার মা ময়না।।
নিক্তির কাঁটা ধরি রাজা তুলিল টান দিয়া।
তুলসীর পত্র থাকিল আবার মৃত্তিকায় পড়িয়া।।
ডাকিনী ময়না উঠিল স্বর্গক লাগিয়া।।"

এই সব অস্বাভাবিক কার্যগুলি যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা হবার নয়।

সন্ন্যাস খণ্ডেও অলৌকিকত্বের পরিচয় লভ্য ঃ

"কপাল ফাড়িয়া হাড়ি ফুল বড়ি বসাইল।
সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি পাতাল ভেজি হইল।।
চৌদ্দ তাল জলেত যাইয়া ধিয়ানে বসিল।
উড্ডা ভাবনি হাড়ির মস্তকে গজাইল।।
ব্রহ্মতাল ভেদিয়া হাড়ির একটা তালের গাছ ব্যারাইল।"

এখন প্রশ্ন হল এত সব অলৌকিকত্বের জন্য কাব্যের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা। অবিশ্বাস্য এবং যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন অনেক ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে গোপীচন্দ্রের গানে। এ সবই করা হয়েছে নাথধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। যদি কাব্যটি সম্পূর্ণরূপে অলৌকিকত্ব বিমুক্ত হতো তবে নিঃসন্দেহে তার শিল্পগুণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেত। আমরা যদি একথা বলি অলৌকিকত্বকে প্রশ্রয় দিয়ে কাব্যের শিল্পগুণের কোনই ক্ষতি করা হয়নি তবে সত্যের অপলাপ হবে। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে মূলতঃ কাব্যের পরিসর বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই অলৌকিক ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, নাথধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে এগুলি যে বিশেষ সহায়ক হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কাব্যের মুখ্য উপজীব্য তো প্রেম ময়নামতীর রাজা মাণিকচন্দ্রের প্রতি প্রেম, অদুনা-পদুনার গোপীচন্দ্রের জন্য প্রেম। আবার গোপীচন্দ্রের অদুনা-পদুনার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম এই কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। ময়নামতী তার স্বামীকে বাঁচাতেই অলৌকিকত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন, অন্যদিকে ময়নামতীর জ্ঞান এবং সতীত্বের পরীক্ষা নিতে অদুন-পদুনা কিংবা গোপীচন্দ্র যে সব কঠিন পরীক্ষার প্রস্তাব দিয়েছেন এবং যেগুলিতে ময়নামতী সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন অবশ্যই অলৌকিক শক্তির সাহায্যে, মনে রাখতে হবে সেখানে মূল উদ্দেশ্য কাজ করেছে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনকে বিলম্বিত করা অথবা একেবারে নাকচ করা। এর মূলেও সেই পতিপ্রেমই কার্যকরী হয়েছে। গোপীচন্দ্রের গান প্রেমের কাব্য, অলৌকিকত্ব এ ব্যাপারে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।

এইবার আমরা কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির আলোচনা করব।

**মাণিকচন্দ্র রাজার চরিত্র**

রাজা মাণিকচন্দ্র ছিলেন অতিশয় ধার্মিক। তবে সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন 'বিবাহ বিলাসী'। ময়নামতী তাঁর পাটরাণী, এছাড়াও তাঁর ছিল আরও পাঁচটি রাণী। এরা সব ছিল দেবপুরের।

রাজার রাজত্বে প্রজারা সুখেই দিন অতিবাহিত করছিল। এদের রাজস্বের পরিমাণ ছিল নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ, প্রতি হালের জন্য মাত্র দেড় বুড়ি কড়ি। প্রজারা ছিল সৎ, এবং সকলেরই অবস্থা ছিল সচ্ছল। যে রাইয়ত ছিল 'পাতবেচা', সেও হস্তী ক্রয়ের পরামর্শ করত ; 'ঘড়িবেচা' রাইয়ত দালান দেবার কথা ভাবতে পারত। বেতনভোগী মানুষের দরজায় বাঁধা থাকত ঘোড়া। রাইয়তের সন্তানের ক্রীড়ার উপকরণ ছিল সোনার ভাটা। সাধারণ দাসীও পাটের পাছড়া পরিধান করত না। কিন্তু যবে থেকে রাজা দক্ষিণ

দেশাগত দীর্ঘ শ্মশ্রু সম্বলিত এক বাঙ্গালকে দেওয়ানগিরিতে নিযুক্ত করলেন, সেইদিন থেকে প্রজাদের কপাল পুড়ল। 'সুখিত রাইয়ত প্রজা দুঃখিতা হইল।' রাজা প্রচণ্ড পরিমাণে অর্থ পিশাচ হয়ে উঠলেন। দেড় বুড়ির পরিবর্তে খাজনা হল পনের গণ্ডা। রাজা দুঃস্থ প্রজাদের অর্থে নিজের বিত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চললেন।

কৃষক নিরুপায় হয়ে রাজস্ব মেটাতে হালের গরু বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হল। সদাগরকে রাজস্ব মেটাতে বিক্রয় করতে হল নৌকা। এমন কি ফকির-দরবেশও রেহাই পেল না। তারা ঝোলার কাঁথা বিক্রয় করে রাজস্ব মেটাতে লাগল। অসহায় প্রজা রাজস্ব মেটানোর তাগিদে 'দুধের ছাওয়াল' পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হল। অত্যাচারিত প্রজাদের কারণেই রাজার দীর্ঘ আয়ু নিঃশেষিত হয়। শিব গোরক্ষনাথের আদেশে রাজার অকাল মৃত্যু হল।

মাণিকচন্দ্রের আত্মমর্যাদা বোধ ছিল প্রবল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পৌরুষ সম্পন্ন। মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী ময়নামতীর কাছ থেকে তিনি জীবন রক্ষার্থে কোন জ্ঞান শিক্ষা করতে চাননি। মহাজ্ঞানী ময়নামতী বারংবার মাণিকচন্দ্রকে অনুরোধ করেছেন তাঁর লব্ধ অমর জ্ঞান শিক্ষা করে জীবন রক্ষা করতে। কিন্তু মাণিকচন্দ্র রাজার এক্ষেত্রে উক্তি ছিল—

আইজ স্ত্রীর জ্ঞান যদি মুই নেও শিখিয়া।
কেমন করি তোক ভক্তি করিম গুরুমা বলিয়া।।

মাণিকচন্দ্রের ভয় ছিল, স্ত্রীর কাছে জ্ঞান শিক্ষা করলে ময়নামতী তাঁকে 'শিষ্য' বলে সম্বোধন করতে পারেন, তাতে তাঁর পদ মর্যাদার হানি ঘটবে—

এমনি যদি আমার জাহান যায় মোক ছাড়িয়া।
তবু মাইয়ার গিয়ান না নিমু শিখিয়া।।
আইজ যদি তোমার গিয়ান নেই শিখিয়া।
কাইলকে ডাকাবেন হামাক শিষ্য বেটা বলিয়া।।

মাণিকচন্দ্রের মরণ তৃষ্ণা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দাসীদেব হাতের জল পানে অনীহা দেখিয়েছেন দৃঢ়তার সঙ্গে ; তিনি ময়নামতীর হাতে জলপান করতে চেয়েছেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই বাঁদীদের হাতের জল পান করতে চাননি—

রাজা বোলে শোন ময়না আমি বলি তোরে।
এখনি যদি আমার প্রাণ যায় চলিয়া।
তবু বান্দীর হাতের জল খাব না পালঙ্কে শুতিয়া।।

নিজের জিদ বজায় রাখতে শেষপর্যন্ত তিনি মৃত্যুকে বরণও করেছেন। তথাপি সঙ্কল্পচ্যুত হতে দেখা যায়নি তাঁকে।

### অদুনা ও পদুনার চরিত্র

অদুনা হরিশচন্দ্র রাজার কন্যা। গোপীচন্দ্রের গানে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লিখিত না হলেও বোঝা যায় যে পদুনা তারই ভগিনী। গোপীচন্দ্রের সঙ্গে অদুনার বিবাহ হয়েছিল

বটে, আর সেই সূত্রে তিনি লাভ করলেন পদুনাকে। দুই ভগিনী রূপান্তরিত হলেন দুই সতীনে। কাব্য মধ্যে অদুনা পদুনার সুনির্দিষ্ট বয়স উল্লিখিত হয়নি, তথাপি তাদের আচার আচরণে এবং সেই সঙ্গে গোপীচন্দ্রের বয়সের প্রেক্ষাপটে সহজেই বোঝা যায় যে তারা নিতান্তই বালিকা, সরল হৃদয়া। সংসারের জটিলতা বিষয়ে তাদের কোনই ধারণা ছিল না।

গোপীচন্দ্র তার দুই রাণী অদুনা-পদুনাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন, বিপরীতক্রমে অদুনা-পদুনাও ছিল স্বামী অন্ত প্রাণ।

অদুনা ও পদুনা এই দুই ভগিনীর মধ্যে ভাব ছিল খুব। সতীন বিদ্বেষ তাদের অন্তরে স্থান পায়নি। দুজনের মধ্যে অদুনা ছিল অপেক্ষাকৃত অকপট। তাই গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবেন শুনে সে পদুনাকে ধরে পড়েছে—

কি বুদ্ধি কর দিদি কিবা চরিত্তর।।
কড়াটিকের বুদ্ধি নাই মোর শরীরের ভিতর।।

এরপর দুই ভগিনীতে দুটি পানের খিলি হস্তে উপস্থিত হয়েছে গোপীচন্দ্রের সমীপে, তারপর রাজাকে উদ্দেশ করে একজন বলেছে—

আমাকে বিবাহ কল্লেন পুষ্প শাখা দিয়া।
আমার হস্তের পান এক দিন না খাইলেন বসিয়া।।

আরও বলেছে, রাজা তাঁর জননীর নির্দেশে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করলেন, রাণীদের ত্যাগ করে সত্য সত্যই যদি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তবে সেক্ষেত্রে রাণীও রাজাকে অনুগমন করবে—

তুমি যদি যান রাজা রুদাসিনী হৈয়া।
আমি যাব তোমার পাছে বৈরাগিনী হৈয়া।।

রাণী এরপর গোপীচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছে, রাণী ময়নামতীর জ্ঞানের পরীক্ষা গ্রহণের, বয়সে বালিকা হলে কি হবে, অদুনা পদুনার এ সত্য জানা ছিল যে গোপীচন্দ্রের কাছে মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য তবে কোনক্রমে যদি রাজমাতার অজ্ঞানতা প্রমাণিত হয় তবে হয়ত গোপীচন্দ্রকে রাজমাতার নির্দেশ পালনে বিরত রাখা যাবে, সন্ন্যাস গ্রহণ আটকানো যাবে। এই বুদ্ধি পরীক্ষার কথা কিন্তু অদুনার মাথাতেই প্রথম এসেছিল, যদিও সে নিজেকে নির্বোধ বলে স্বীকার করেছে। আসলে প্রিয়তম স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে সে হতচকিত হয়ে পড়েছিল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, কেননা এমন এক ঘটনার জন্য সে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিল না। আবার পতিপ্রেমই তাকে রাজমাতার বুদ্ধি পরীক্ষা করার পরামর্শ জুগিয়েছিল গোপীচন্দ্রকে।

অদুনা যে বুদ্ধিমতী তার প্রমাণ মেলে খেতুর আনন্দিত আচরণ থেকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে—

যদি কালে বুড়ী গেইছে মরিয়া।
খেতু কেনে নাচে মোর কাছত আসিয়া।।

বারংবার উল্লিখিত হয়েছে, 'ছোট রাণী আছে রাজার বুদ্ধির নাগর'। সে অদুনাকে যে উত্তর দিয়েছে, তাতে তার সেই বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর স্পষ্ট—

শব্দে শুনাছি মোরা বুড়ী গেয়ানে ডাঙ্গর।
আগুনত না যায় পোড়া জলও না যায় তল।।
লোহার খাড়া না বইসে তার গর্দানার উপর।
কেমন করিয়া বধিবে তার বুড়ীর পরাণ।

অতএব যতই ময়নামতীকে তপ্ত তেলের কড়াইয়ে বসিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হোক, তাতে তাঁর কিছুই হবাব নয়। তবু নিজেদের চোখে শাশুড়ীর পরিণতি দেখার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারেনি তারা। এক্ষেত্রেও পদুনার পরামর্শটি তার তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক—

একটা করি ঘিব হাড়ি আমরা নেই কাঁখত করিয়া।
জল ভরিবার আলে আমরা চলি হাঁটিয়া।।

যাই হোক তারা কুলবধূ একেবারে বিনা প্রয়োজনে নিছক শাশুড়ীকে পরীক্ষা করার ফলাফল দেখতে ত আর অন্তঃপুরের বাইরে যাওয়া যায় না, তাই জল ভরার ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে উভয়কে।

তেলপূর্ণ কড়াইয়ে শাশুড়ীকে দেখতে না পেয়ে প্রথমে দুই ভগিনী খুব উল্লসিত হয়েছে ; কিন্তু পদুনা বুদ্ধিমতীই শুধু নয়, তার পর্যবেক্ষণ শক্তিও তীক্ষ্ণ, তাই সে ঠিকই লক্ষ্য করেছে ময়নামতী দুবলাতে আত্মগোপন করে আছেন, তাঁর মৃত্যু হয়নি--

নাই যায় মরিয়া শাসুর নাই যায় মরিয়া।
হুগুই দেখ শাসুর আছে দুবলায় লুকাইয়া।।

তৈল পরীক্ষায় ময়নামতী সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু অদুনা সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়, তার মতে ময়নামতীকে যে তৈল পরীক্ষা দিতে হয়েছে তা কোন পরীক্ষাই নয়। সে তাঁর নৌকা পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে। শুধু প্রস্তাবই নয়, কেমন করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে তাও বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে—

সর্ষার কুটি দেও নৌকা সাজাইয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা দেও বৈঠা বানাইয়া।।
ভোটা একেনা পিকিড়া দেও কাণ্ডারী ধরিয়া।।
নাই দাঁড়ি নাই মাঝি নাই তাব কাণ্ডারী।
ঐ নৌকায় চড়ি পার হউক মা ময়না সুন্দরী।

ময়নামতী নৌকা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছেন। অদুনা-পদুনা কিন্তু তাতেও দমবার পাত্রী ছিল না। যেভাবেই হোক স্বামীকে সন্ন্যাস অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তাই পুনরায় তারা পরীক্ষার প্রস্তাব দিয়েছে—

তুল পরীক্ষা নিয়া রাজা ছাড় বাড়ি ঘর।।

সেইমত ময়নামতীকে পোস্ত দানা দিয়ে ওজন করে পরীক্ষা কবা হয়েছে। এতেও ময়নামতী উত্তীর্ণ হলে অদুনা পদুনা নতুন পরীক্ষার কথা বলেছে—বলেছে তুলসী পত্রের

দ্বারা তাকে ওজন করার কথা সোনার নিক্তিতে। আপাতভাবে এইসব পরীক্ষা থেকে দুই রাণীকে শাশুড়ী বিদ্বেষী বলে মনে হবে। আসলে পতিপ্রেমই তাদের শাশুড়ীকে পরীক্ষা করানোয় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তবে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তাব দিয়ে অদুনা পদুনা যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, তা স্বীকার করতে হয়।

শাশুড়ীকে কিছু করতে না পেরে দুজনে তখন সচেষ্ট হয়েছে কোনমতে যদি গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তুতিতে বাধ সাধা যায় তাতে। যে গণক ঠাকুর গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের দিন ক্ষণ স্থির করবেন, তাঁকে পাঁচশত টাকা ঘুষ পাঠিয়ে প্রভাবিত করেছে যাতে তিনি বলেন যে পরবর্তী দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের শুভ দিন নেই। গণকের মিথ্যা গণনা ধরা পড়ে গেলে দুই ভগ্নী তখন যে নাপিত রাজার মস্তক মুণ্ডন করবে, তাকে পাঁচশত টাকা ঘুষ দিয়ে চেষ্টা করেছে মস্তক মুণ্ডন কার্যকে অন্তত: দিন আষ্টেকের মত বিলম্বিত করতে। এতেও ব্যর্থ হয়েছে অদুনা-পদুনা। অবশ্য গণক ঠাকুর কিংবা নাপিতকে ঘুষ দিয়ে রাজার সন্ন্যাস প্রতিহত করার মধ্যে যতই তাদের পতিপ্রেম প্রকাশ পাক, সেই সঙ্গে তাদের যে বালিকাসুলভ সারল্য প্রকাশিত হয়েছে, এ সত্য অনস্বীকার্য।

শেষ চেষ্টা হিসাবে অদুনা গোপীচন্দ্রকে ধরেছে তাদের দুই বোনকে যেন তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। অদুনা যুক্তির জাল বিস্তার করে বলেছে, তাদের সঙ্গে নিলে গোপীচন্দ্রের কত সুবিধা—

আমি নারী সঙ্গে গেলে আন্ধিয়া দিব ভাত।।
ভোকের কালে রন্ন দিব তিয়াস কালে পানি।
হাসিয়া খেলিয়া প্রভু পোহাব রজনী।।
জারের কালে গুড়ন দিব গিরিস কালে বাও।
সন্ধ্যাকালে দুই বইনে ঠাসিব হস্ত পাও।।
পাও খানি ডাবিব রাজা হাতখানি ডাবিব।
রঙ্গ কৌতুকের ডালায় খিলি জোগাব।।

গোপীচন্দ্র যখন ভয় দেখিয়েছেন বনে বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা, তখন অদুনা যে উত্তর দিয়েছে, তারপর গোপীচন্দ্রের আর কিছু বলার থাকল না—

খাক না কেনে বনের বাঘে তাক না করি ডর।
নিষ্কলঙ্কে মরণ হউক সোয়ামীর পদতল।
সোয়ামীর পদে মরণ হৈলে মরবার সফল।।
সোয়ামীর পদে মরণ হউক কলঙ্ যেন না ওঠে।

অদুনার চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। তাই গোপীচন্দ্র যখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে ভ্রাতা খেতুর জিম্মায় রাণীদের রেখে যাবেন বলেছেন, তখন প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে অদুনা। হতে পারে সে বালিকা, তাই বলে সে কি গোপীচন্দ্রের কথার মর্ম বোঝে না? তার চরিত্র কি এমনই যে পতির অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষকে সে পতিত্বে বরণ করে

নেবে? এই প্রসঙ্গে অদুনার স্পষ্টোক্তি—

অন্য গাছের ছাল যেন অন্য গাছে লাগে।
পরের ছাওয়া নাকি পরেকে বাবা বোলে।।
হস্ত পদ বান্ধিয়া মোরে ডুবাও সাগরে।
তবুও সঁপিয়া না যাও গোলাম খেতুর ঘরে।।

কবি অদুনা-পদুনাকে নিছক নিষ্প্রাণ প্রতীকে পরিণত করেন নি. বরং তাদের রক্ত মাংসের জীবন্ত চরিত্র রূপেই আমরা পেয়েছি। আপাতভাবে মনে হতে পারে অদুনা বুঝিবা অকৃতজ্ঞ। কেননা সে বলেছে—

বাপ মরে ভাই মরে তাও না ন্যাওঁ মনে।
তুই সোয়ামী ছাড়িয়া গেলে পাসরিব কেমনে।।

কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে দেখলে অদুনার বক্তব্যকে ত কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। ভরা যৌবনে কি পতির সান্নিধ্য সুখ লাভ থেকে কোন নারী বঞ্চিত থাকতে পারে? গোপীচন্দ্রের মনে যদি এমনই ছিল যে তিনি সন্ন্যাস নেবেন, তবে যৌবনের জোয়ার রাণীদের মধ্যে আসার পূর্বেই তিনি তা নিতে পারতেন, কেননা সেক্ষেত্রে পতি বিরহ তেমনভাবে ওদের অনুভূত হত না—

যখন ছিলাম আমরা আঁচলে শিশুমতি।
তখন কেনে ধর্ম্মিরাজা না হইলেন সন্ন্যাসী।।
এখন হইলাম আসিয়া আমি তোমার যোগ্যমান।
মোক ছাড়িয়া হবু বৈরাগ মুঞি তেজিম পরাণ।

অদুনা যখন রাজাকে শোকাহত চিত্তে বলে—

ছাড়িয়া না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার জন্যে বান্ধিলেন শয়ন-মন্দির ঘর।।
শয়ন মন্দির ঘর বান্ধিছ নাই পড়ে কালি।
এমত বয়স ছাড়ি যাও বৃথায় গাভুরালি।।

তখন অদুনার জন্য পাঠকের মনও সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। অকপটে সে তার মনোবাসনার কথা প্রকাশ করেছে। সব নারীই হতে চায় জননী, কেননা জননী হওয়াতেই নারী জীবনের সার্থকতা। অদুনাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাই ঠিক যে সময়ে সন্তান লাভের সম্ভাবনা, সেই ভরা যৌবনে গোপীচন্দ্র কিনা অবস্থান করবেন অন্যত্র সন্ন্যাস নিয়ে। গোপীচন্দ্রের না হয় সন্ন্যাস নিয়ে দিন অতিবাহিত হবে, কিন্তু ঐহিক সুখের প্রত্যাশী, অদুনাদের দীর্ঘ বারটি বৎসর অতিবাহিত হবে কেমন করে? অন্তরের সুপ্ত বাসনাকে মূর্ত করে তাই অদুনার শাশ্বত জননী সত্তা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে—

তোমার কোলার একটি ছাইলা দেও আমার কোলায় দিয়া।
যাইগ কেনে ধর্ম্মিরাজ সন্ন্যাস লাগিয়া।।

পালিব পালিব ছাইলাক কোলে তুলি নিব।
পুত্র ধনক দেখি সোয়ামী তোমাকে পাসরিব।।
একটি পুত্র দে মোক সোয়ামী, একটা পুত্র দে।

তখন তার এই আবেদনে আমরা বিচলিত না হয়ে পারি না। কোন অন্যায় না করেও অদুনা অথবা পদুনা যে সন্তানবতী হবার সুযোগ লাভে বঞ্চিতা হতে চলেছে, স্বভাবত:ই সেজন্য তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা উৎসারিত না হয়ে পারে না। সন্তানের জন্য তাদের আর্তি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

'গোপীচন্দ্রের গানে' অদুনার প্রসঙ্গই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সে তুলনায় পদুনার প্রসঙ্গ নিতান্তই সীমিত পরিসরে উপস্থাপিত, আসলে অদুনা এবং পদুনার মধ্যে কবি কোনো পার্থক্য দেখেন নি, পদুনা অদুনারই ছায়া স্বরূপিনী, অদুনার বক্তব্য তারও বক্তব্য। পদুনার মুখপাত্র রূপেই অদুনার বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা নামে ভিন্ন হলেও প্রকৃতিতে উভয়ে অভিন্ন, একই দুর্ভাগ্যের শিকার উভয়েই, তাই একই প্রতিক্রিয়াও উভয়ের।

**ময়নামতীর চরিত্র**

ময়নামতী মাণিকচন্দ্র রাজার পত্নী। মাণিকচন্দ্রের আরও মহিষী ছিল। দেবপুরের পাঁচটি কন্যারও তিনি পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এদের সঙ্গে ময়নামতীর বনিবনা না হওয়ায় মাণিকচন্দ্র ময়নামতীকে ফেরুসা নগরে পৃথক থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

ময়নামতী ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্যা, অপরপক্ষে হাড়ি ছিল তার গুরুভ্রাতা। ময়নামতী ছিলেন মহাজ্ঞানের অধিকারিণী। তাই যখন তাঁর স্বামীর জীবন বিপন্ন হয়েছে, তখন তিনি স্বামীকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেছেন—

উঠ উঠ প্রাণপ্রিয় শীতল মন্দির যাই।
আমার শরীরের জ্ঞান তোমারে শিখাই।।
সাচা করি দেই জ্ঞান তুমি মিছা করি ধরো।
সুখে দুঃখে ধর্মী রাজা তোকে রাজাই করাবো।।

ময়নামতীর ছিল মহাজ্ঞান। তিনি ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্যা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলি হারাননি। স্বামীর প্রাণ বিপন্ন দেখে যেমন তাঁকে বিচলিত দেখা গেছে, তেমনি মাণিকচন্দ্রের জীবনরক্ষার জন্য তাকে যমের বিরুদ্ধে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে দেখা গেছে। কখনও নিজের হস্তী, কখনও বা নিজের বাঁদি আবার কখনও বা উৎকোচ প্রদানের দ্বারা গোদা যমকে প্রভাবিত করতে দেখা গেছে।

ময়নামতী জানতেন যে তিনি যদি বৈতরণীতে রাজার তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে যান, তবে তার অনুপস্থিতির সুযোগে যম মাণিকচন্দ্রের প্রাণ হরণ করবে। তথাপি ময়নার

সংগৃহীত জল পানের জন্য রাজা ক্রন্দন শুরু করলে ময়না নিষ্ঠুর হতে পারেন না। সোনার ঝারি নিয়ে স্বয়ং বৈতরণীতে জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। কিন্তু যেই জেনেছেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বামীর প্রাণ অপহৃত হয়েছে, তিনি শোকাভিভূত হয়েছেন—

সোনার ঝারি ভাঙ্গি ময়না কপালে ভাঙ্গিল।

*  *  *

একটা আমের পল্লব হস্তে করিয়া।
সোয়ামী সোয়ামী বলিয়া চলিল কান্দিয়া।।

হাতে আমের ডাল ধারণ করে ময়নামতী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। এ তাঁর পাতিব্রত্যেরই পরিচায়ক। স্বামীর মৃত্যুর পরও তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে ময়নামতীকে অশেষ প্রয়াস করতে দেখা গেছে। শেষপর্যন্ত স্বয়ং গোরক্ষনাথের অনুরোধে তিনি তাঁর প্রয়াস বন্ধ করেছেন, শূন্য হাতে তাই বলে তিনি ফিরে আসেননি। তাঁর মরণোত্তর জাতকের দীর্ঘ জীবন লাভের গোপন রহস্য সংগ্রহ করেছেন। কাব্যমধ্যে ময়নামতীর অলৌকিক ক্ষমতার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এক প্রস্থ এই বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে তাঁর স্বামীর জীবন রক্ষার প্রসঙ্গে, আর এক প্রস্থ বর্ণিত হয়েছে পুত্র এবং পুত্রবধূদের কথামত কঠিন পরীক্ষা দানের প্রসঙ্গে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ময়নামতীর চরিত্রটি অবাস্তব হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর চরিত্রের দুটি স্পষ্ট বিভাগ একদিকে তিনি জায়া, স্বামীর কল্যাণকামী, অপরদিকে তিনি স্নেহময়ী জননী। আমরা এ পর্যন্ত ময়নামতীর স্বামীর প্রতি অনুরাগের পরিচয় লাভ করেছি, এইবার আমরা তাঁর অপত্য স্নেহের পরিচয় গ্রহণ করতে পারি।

ময়নামতী জানেন তাঁর প্রিয় সন্তান গোপীচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটবে। তাই সেই মৃত্যুকে প্রতিহত করে পুত্রকে দীর্ঘজীবী করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। যথাসময়ে ময়নামতী পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যার সঙ্গে। গোপীচন্দ্রকে রাজ্য পাটে অভিষিক্ত করেছেন। কিন্তু গোপীচন্দ্রের পরমায়ু নিঃশেষিত হবার সম্ভাবনায় ব্যাকুলচিত্ত ময়নামতী স্বয়ং রাজ দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। পরামর্শ দিয়েছেন :

শীঘ্র যাইয়া গুরু ভজ সিদ্ধা হাড়ির চরণ।
সিদ্ধা হাড়িক ভজলে গুরু না হবে মরণ।।

রাজকার্য এবং দাম্পত্য জীবনের সুখে মগ্ন গোপীচন্দ্র জননীর প্রস্তাব প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি জননীর প্রস্তাবে ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন। বলেছেন ময়নামতীর সঙ্গে হাড়ির অবৈধ সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ে মিলে চক্রান্ত করে মাণিকচন্দ্রকে মেরেছেন, এখন গোপীচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণের প্রস্তাবও সেই একই চক্রান্তের অঙ্গ—

হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে, জননি. একত্র করিয়া।
আমার পিতাকে মারিছেন মা জহর বিষ খাওয়াইয়া।।

বুদ্ধি পরামিশে আমায় বনবাসে পাঠাইয়া।
শেষে বিটি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি লৈয়া।।

স্বভাবত:ই পুত্র কর্তৃক আনীত এই অভিযোগে ময়নামতী প্রথমে মর্মাহত হয়েছেন, তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পুত্রকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন এই বলে—

বেটা হইয়া কলঙ্ক দিলে মায়ের বরাবরে।।
মাক বলে ভোমা বুড়ি বাপক বলে শালা।
দুষ্ট পুত্রের কার্য নাই আটকুড়াক আপন ভালা।।

সন্তানের হাতে নির্যাতিত কিংবা অভিযুক্ত জননী মাত্রেরই ত এইরূপই খেদোক্তি শ্রুত হয়। গোপীচন্দ্র একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার জননীর বিরুদ্ধে (ক) তাঁর পিতৃহন্তা ; (খ) হাড়ির সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ; (গ) পুত্রকে অকারণে নির্বাসিত করে রাজ্য সুখভোগের প্রয়াস। এতসব অভিযোগের পরেও যদি ময়নামতী অবিচলিত থাকতেন, তবে তাঁর স্বাভাবিকত্ব সম্পর্কেই সংশয়ের সৃষ্টি হত। যাই হোক, ক্রোধের বশবর্তিনী হয়েও সাময়িকভাবে উত্তেজিত ময়নামতী গোরক্ষনাথের পরামর্শে তাঁর ক্রোধ বহ্নিকে প্রশমিত করেছেন। পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণে অনিচ্ছুক গোপীচন্দ্রকে বুঝিয়েছেন সন্ন্যাস অবলম্বনের সার্থকতা, গুরু ভজনার প্রয়োজনীয়তা। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নারী সংসর্গ ত্যাজ্য।

গোপীচন্দ্র ময়নামতীর পরামর্শ সহজে স্বীকার করে নেননি। নানাভাবেই তিনি জননীকে পরীক্ষা করেছেন। যেমন গোপীচন্দ্র জানতে চেয়েছেন –

চারি চকরি পুকুরখানি মা মধ্যে ঝলমল।
কোন বিরিখের বোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল।

*　　*　　*

আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কোনখানি।।
কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বারাণসী।
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসী।।

ময়নামতী জবাব দিয়েছেন :

ওরে যাদুধন চার চকরি পুকুরখানি মধ্যে ঝলমল।
মন বিরিখের বোটা তুই তন্ বিরিখের ফল।।

*　　*　　*

আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপালখানি।।

*　　*　　*

হিদ্দি গয়া হিদ্দি গঙ্গা হিদ্দি বারাণসী।
মুখ হলো তোর জপতপ মস্তকে তুলসী।।

ময়নামতী যে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন এই উত্তরেই তা প্রমাণিত।

বারংবার পুত্র ও পুত্রবধূদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েও ময়নামতী যে নিজের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হননি, অর্থাৎ পুত্রকে সন্ন্যাস অবলম্বন করানোর ব্যাপারে যে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেননি, এতেই প্রমাণিত হয় তাঁর সুগভীর অপত্য স্নেহ। তিনি বারংবার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত, কিন্তু কোন অবস্থাতেই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে তিনি অকাল মৃত্যুর শিকার হতে দিতে রাজি নন। বারংবার তৈল পরীক্ষা, নৌকা পরীক্ষার মত অসম্মানজনক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও কেবল অপত্য-স্নেহের কারণেই ময়নামতী পুত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাকে ত্যাগ করেন নি। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে ময়নামতী বুঝিবা খুবই নির্দয় প্রকৃতির ছিলেন, স্নেহ, মমতা কোমল প্রবৃত্তিগুলির খুব অভাব ছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু বিস্মৃত হলে চলবে না সন্তানের কল্যাণ বিধানের জন্যই নিরুপায় হয়েই তাঁকে পুত্রের দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্নাস গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা গেছে। বারংবার তাঁকে গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে দেখা গেছে—

> ময়না বলে, হারে বিধি, মোর করমের ফল।
> কেমন করি সন্ন্যাস করাও ময়না সুন্দর।।

কিংবা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বেশ ধারণের পর, ময়নামতীর প্রতিক্রিয়া—

> পুত্রশোকে ময়না বুড়ী কান্দিতে লাগিল।
> কান্দি কাটি ছেইলাক নিগি হাড়ির হস্তে দিল।।
> নিগা নিগা আমার পুত্র তোমার হৈল শিস্।
> বার বছর পুরিয়া গেলে আমাকে আনিয়া দেইস।।

গুরুর আদেশে সন্ন্যাস গ্রহণকারী গোপীচন্দ্র প্রথম ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য ময়নামতীর কাছে উপস্থিত হলে—

> ছাইলাক ডাকায় বুড়ী ময়না কান্দিয়া কাটিয়া।।
> আইস, আইস যাদুধন, দুখিনীর দুলালিয়া।
> রন্ন খাইয়া যাও যাদু বৈদেশ লাগিয়া।।

ময়নামতীর অপত্য স্নেহের প্রতিফলন বারংবারই ঘটেছে। যেমন তিনি বার কাহন কড়ি হরিদ্রায় মাখিয়ে গোপীচন্দ্রের ঝোলায় অর্পণ করে বলেছেন :

> কড়ির কথা না বলিস্ তোর গুরুর বরাবর।।

সন্ন্যাসী গোপীচন্দ্রের উদ্দেশে ময়নামতী যে উপদেশ দান করেছেন তাতে যেমন তাঁর গভীর জ্ঞান, কর্তব্যবোধ ইত্যাদির পরিচয় মেলে, তেমনি সর্বোপরি তাঁর অপত্য স্নেহেরও পরিচয় পাই—

> আগে মা বলিয়া যাদু পাছত ভিক্ষা নিও।
> তোর গুরুদেবের সঙ্গে বেটা দর্প না করিও।।
> বৈরাগী বৈষ্টমক দেখি না করিও হেলা।

গড় হইয়া প্রণাম জানাইস যার গলায় হরিনামের মালা।।
দম্ভ কথা না বলিস তোর গুরুর বরাবর।
ছাই ভস্ম করিয়া তোকে পাঠাইবেক যমের ঘর।।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যেতে পারে—"তাঁহার (ময়নামতীর) মধ্যে এক স্নেহ-সতর্ক মাতৃহৃদয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার মধ্যে সন্তানস্নেহের অভাব ছিল না...,।"

### রাজা গোপীচন্দ্রের চরিত্র

'গোপীচন্দ্রের গানে'র নায়ক গোপীচন্দ্র। তিনি মাণিকচন্দ্র রাজার মরণোত্তর জাতক। তাঁর জননী হলেন রাণী ময়নামতী। গোপীচন্দ্রের যখন মাত্র এক বছর বয়স তখনই ময়নামতী পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন। ময়নামতী পুত্রের বিদ্যাভ্যাসেরও আয়োজন করেছিলেন এবং বর্ণিত হয়েছে—

"বিদ্যা পড়িয়া রাজার হরষিত মন।"

গোপীচন্দ্র যে বিদ্যানুরাগী ছিলেন এই পংক্তি থেকেই তা প্রমাণিত হয়। গোপীচন্দ্রের যখন মাত্র সাত বছর বয়স, তখনই জননী ময়নামতী হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের বন্দোবস্ত করেন। বিবাহসূত্রে গোপীচন্দ্র অদুনার কনিষ্ঠা ভগিনী পদুনাকে লাভ করেন। নিশ্চিন্তে রাজ্যসুখ ভোগ করা গোপীচন্দ্রের কপালে ছিল না। অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যুযোগ ছিল বলে মহাজ্ঞানের অধিকারিণী ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস অবলম্বনের পরামর্শ দিলেন এবং হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণের কথাও বললেন।

গোপীচন্দ্র তাঁর আত্মমর্যাদা ও বিশেষত বংশমর্যাদা সম্পর্কে ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন, তাই হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা শুনে তিনি প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন। ময়নামতীকে তিনি বলেছেন—

'ওগো মা জননি—ডুবালু মা জাত কুল আর সর্ব নাও।
বাইশ দণ্ড রাজা হইয়া হাড়ির ধরব পাও।।

শুধু হাড়ি অন্ত্যজ বলেই নয়, যুক্তি প্রয়োগেও গোপীচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন যে হাড়ির গুরু হওয়ার কোনও যোগ্যতা নেই, কেন না—

"তেই যদি হাড়ি আছে গিয়ানে ডাঙ্গর।
তবে কেন খাটি খায় আমায় মাঠের তল।।
মোর নুনে মোর তৈলে রসুই করি খায়।
গুরুর ঘরে মহামন্ত্র কোথা হৈতে পায়।।"

গোপীচন্দ্র মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন, কেননা জন্মের পর থেকেই তিনি তাঁর জননীকেই দেখে এসেছেন, পিতাকে দেখেন নি। তাই বলে চোখ-কান বুজে জননীর নির্দেশ পালন করার মানসিকতা তাঁর ছিল না। যুক্তিবাদী গোপীচন্দ্রের কাছে তার

জননীও যদি অযৌক্তিক কথা বলেন, তবে তা মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাই ময়নামতী যখন বোঝাতে চেয়েছেন যে হাড়ির স্বরূপ গোপীচন্দ্র চিনতে পারেননি, আসলে তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী, অপরিমেয় শক্তি তাঁর, কিন্তু গোপীচন্দ্র জননীর বক্তব্য মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি অকপটে বলেছেন—

"ইগলা কথা মিথ্যা তোমার বিশ্বাস না পাই।।
এতৈক যদি গিয়ান ছিল হাড়িপা লক্ষেশ্বর।
তার চেতে অধিক গিয়ান জাত মা ময়না সুন্দর।
তবে কেন আমার পিতা গেল যমের ঘর।।"

পিতার অকালমৃত্যুর ব্যাপারে গোপীচন্দ্র সন্দেহ করেছেন তাঁর গর্ভধারিণীকে। তাঁর বিশ্বাস তাঁর জননীর সঙ্গে হাড়ির অবৈধ সম্পর্ক আছে এবং ময়নামতী যে গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস অবলম্বনের জন্য বলেছেন তা এক বৃহৎ চক্রান্তের অঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। জননীকে গোপীচন্দ্র নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন—

'হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে, জননি, একত্র করিয়া।
আমার পিতাক মারিছেন মা জহর বিষ খাওয়াইয়া।
বুদ্ধি পরামিশে আমায় বনবাসে পাঠাইয়া
শেষে বিটি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি লৈয়া।।"

ময়নামতী পুত্রের অভিযোগে সাময়িকভাবে উত্তেজিত হলেও পরে সংযত হয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন তার পাঁচ-সাতটি নয় একটি মাত্র সন্তান। তা সত্ত্বেও তাকে যে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বনের জন্য বলেছেন তা তারই কল্যাণের জন্য। সন্ন্যাস অবলম্বনে গোপীচন্দ্রের ছিল ঘোরতর আপত্তি। দাম্পত্য জীবনের সবেমাত্র আস্বাদ পেতে শুরু করেছেন তিনি, স্ত্রী-সংসর্গ তাঁর কাছে বড় মধুর বলেই অনুভূত হয়। এমতাবস্থায় তিনি কেমন করে সংসার জীবন ত্যাগ করবেন? তবে হ্যাঁ, মাতৃআজ্ঞা পালনে তিনি প্রস্তুত আছেন যদি সন্ন্যাসী হয়েও তিনি তাঁর সঙ্গে অদুনা ও পদুনাকে নিয়ে যেতে পারেন। অদুনা পদুনা গোপীচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে কতখানি যুক্ত ছিলেন, গোপীচন্দ্রের স্বীকারোক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে—

"রদুনা পদুনা রাণীর ঘরকে দেখি বটবৃক্ষের ছায়া।
ছাড়ি যাইতে রঙ্গের জরুকে মোর বড় লাগে দয়া।।

ময়নামতী বোঝাতে চেয়েছেন যে, বধূ আসলে শত্রু, প্রাণ হরণকারিণী, তখন গোপীচন্দ্র ময়নামতীকে তাঁরই যুক্তিতেই পর্যুদস্ত করেছেন, বলেছেন—

এত যদি জান মাতা জরু প্রাণের বৈরী।
তবে কেন বিবাহ দিলেন একশত সুন্দরী।।
এক শত রাণীকে মোর গলায় বান্ধ দিয়া।
এখন নিয়া যাইতে বল সন্ন্যাসক নাগিয়া।।

তাছাড়া এই প্রশ্ন থেকে বধূদের প্রতি গোপীচন্দ্রের কর্তব্যবোধেরও পরিচয় মেলে।

জননীকে এরপর পরীক্ষা করেছেন গোপীচন্দ্র—একবার জ্ঞানের, অপরদিকে অলৌকিক শক্তির। এইসব পরীক্ষা করার মূলে রয়েছে গোপীচন্দ্রের সংসারের প্রতি সীমাহীন আসক্তি। নাথধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত কাব্যের নায়কের এই সংসার অনুরক্তি বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত। কেননা প্রকারান্তরে তাই কাব্যটিকে মানবিক গুণসম্পন্ন করে তুলেছে।

গোপীচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন :

চারি চকরি পুকুরখানি মা মধ্যে ঝলমল।
কোন বিরিখের বোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল।
কেন আস্কি কেন বাড়ি মা কেবা বসিয়া খাই।
কারে লইয়া শুইয়া থাকি মা কেবা নিদ্রা যাই।।
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কোনখানি।।
কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বারাণসী।
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসী।।
কোনঠে রইল বঁড়শী মা কোনঠে রইল সূতা।
কোনঠে রইল বঁড়শীর ছিপ কোনখানি ফুলতা।। ইত্যাদি

জ্ঞানের পরীক্ষা করতে গেলে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ গোপীচন্দ্র যতই অল্প বয়সী হোন, জননীর তুলনায় তাঁর অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব জীবনবোধ দুইই কম, তথাপি জ্ঞানের দিক থেকে তিনি যে কোন অংশে কম ছিলেন না, তার পরিচয় তাঁর প্রশ্নাবলী। তাঁর প্রশ্নাবলীর প্রসঙ্গে ময়নামতীকেও স্বীকার করতে হয়েছে :

এতেক যদি গেয়ান ছিল তোর শরীরের মাঝারে।
তবে কেন কলঙ্ক দিলি মায়ের বরাবরে।।

গোপীচন্দ্র এরপর জননীর কাছে জানতে চেয়েছেন—

হাট গেছেন বাজার গেছেন কিনিয়া খাইছেন খই।
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই।।

ময়নামতী নিজেকে সতী সাধ্বী রমণীরূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, জানিয়েছিলেন স্বামীকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি যথাসাধ্য করেও নিছক মাণিকচন্দ্রের অনমনীয় মনোভাবের জন্য সাফল্যলাভ করেননি। গোপীচন্দ্রের জন্ম হয়েছে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, তার উপর তাঁর সন্ন্যাসের জন্য জেদাজেদি—সব মিলিয়ে জননীর চরিত্র বিষয়ে একটা সংশয় তাঁর মনে জেগেছে। পূর্বেই সেই সংশয়ের প্রকাশও ঘটেছে হাড়ির সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে গোপীচন্দ্রের প্রশ্নবাণে। ময়নামতী নিজেকে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তবু গোপীচন্দ্রের মন যেন সংশয় থেকে মুক্ত হতে পারে না, তাতেই তাঁর এই প্রশ্ন। এতই যদি ময়নামতীর পতিভক্তি, তবে পতির মৃত্যুতে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর অনুগামিনী হলেন

না কেন? তবে কি হাড়ির জন্য তাঁর পিছুটান রয়ে গেছিল? গোপীচন্দ্রের সংশয়ের অবসানকল্পে ময়নামতী যথাযথ উত্তর দিয়েছেন, তারপর শুরু হয়েছে তাঁর তেল পরীক্ষা, নৌকা পরীক্ষা, তুলাদণ্ডের পরীক্ষা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে গোপীচন্দ্র স্পষ্টত:ই তাঁর কথার খেলাপ করেছেন লক্ষিত হয়। কেননা জননী তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হলেই তিনি সন্ন্যাস নেবেন বলে সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন, তবে পুনরায় একের পর এক পরীক্ষা কেন? পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, এ পরীক্ষা ছিল ময়নামতীর অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা। আর গোপীচন্দ্র এসব পরীক্ষার আয়োজন করেছেন অদুনা-পদুনার প্ররোচনায়। আপাতভাবে মনে হতে পারে এতে, বুঝিবা গোপীচন্দ্র স্ত্রৈণ ছিলেন, কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, তা নয়। যে নবোঢ়া পত্নীদের ফেলে তিনি চলে যাবেন, তাদের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতেই গোপীচন্দ্রেব এইসব পরীক্ষা গ্রহণ। অদুনা-পদুনা বলেছিল—

শব্দ শুনছি তোমার জননী গিয়ানে ডাঙ্গর।
একটা পরীক্ষা দেও প্রভু দরবারের উপর।।
তাহাকে দেখি আমরা দুনয়ন ভরিয়া।
দেখিয়া শুনিয়া যাও তোরা রুদাসিনী হৈয়া।।

যতই ময়নামতীর পরীক্ষার আয়োজন করুন গোপীচন্দ্র কিংবা নির্মম প্রশ্নবাণে তাঁকে তিনি জর্জরিত করুন, জননীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও দুর্বলতা ছিল অপরিসীম। যখন উষ্ণ তেলের কড়ার থেকে ময়নামতী আত্মগোপন করেছেন কৌতুক করার জন্য, তখন গোপীচন্দ্র যে আচরণ করেছেন, তা বিশেষভাবে স্মর্তব্য :

পাটতে বসিয়া রাজা একথা শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে লাগিল।
বাম হস্তে মাথার পাগ রাজা টালাইয়া ফেলিল।
কাটা বৃক্ষের লাকান রাজা ঢলিয়া পড়িল।।
কি কথা শুনালি খেতু আবার বল শুনি।
নিভা কাষ্টতে যেমন জ্বলাই আগনি।।
দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননী।
সবাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী।।

গোপীচন্দ্র গণনাতেও পারদর্শী ছিলেন। যখন পাঁচশত টাকা ঘুষ খেয়ে গণক ঠাকুর জানালেন পরের সুদীর্ঘ বারো বৎসরের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত দিন ক্ষণ নেই, তখন গোপীচন্দ্র নিজেই গণনায় বসেছেন—

আমার বাপকালিয়া পাঞ্জি পুস্তক জোগাও ত আনিয়া।।
কেমন গণনা গণিল ঠাকুর আমি নিজে গণি বসিয়া।।

তিনি গণক ঠাকুরের কারসাজিও ধরে ফেলেছেন :

আপনার পাঞ্জি রাজা বাইর কৈল্ল টানিয়া।

আপন ধর্মের পাঞ্জি বোলে রাও দিয়া।।
গণিতে গণিতে রাজা এক দুপুর করিল।
পাঁচশ টাকা খোসা দিছে পণ্ডিতক পুস্তকে ধরা পাইল।।

গোপীচন্দ্র ছিলেন জরবদস্ত শাসক, কাব্যে তাঁর সেই সুশাসনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নেই। গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস নিয়ে যাত্রা করলে রাইয়ত প্রজারা ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর অনুগামী হয়েছে, এই আচরণ রাজার জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক। গোপীচন্দ্রের জবানীতে দেখি—

যেগুলার জন্য যাই—গুরু রুদাসিনী হৈয়া।
সেই আইয়ত প্রজা আসছে আমার পাছতে কান্দিয়া।

প্রয়োজনে তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেও ইতস্তত: করেননি—

যখনে আছিলাম আমি আজ্যের ঈশ্বর।
আমার হুকুমে নরবলি কাটেছে বিস্তর।।

গণক, ক্ষৌরকার ঘুষ নিয়ে মিথ্যাচার অথবা প্রবঞ্চনা করলে গোপীচন্দ্র তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। পুনরায় তারা নিজ নিজ দে া স্বীকার করে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে শাস্তি প্রত্যাহার করে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

হাড়ির নির্দেশে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম ভিক্ষা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছেন ময়নামতীর কাছে। অপত্যস্নেহবশত: ময়নামতী রাজকীয়ভাবে তাঁর আহারাদির আয়োজন করেছেন। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণে অনিচ্ছুক গোপীচন্দ্র ইতিপূর্বে যতই তাঁর জননীর ইচ্ছার বিরোধিতা করে থাকুন, একবার সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তিনি সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাই দেখি তিনি জননীকে বলেছেন—

যখন আছিলাম মা রাজ্যের ঈশ্বর।
সুবর্ণের থালে রন্ন মা খাইয়াছি বিস্তর।।
এখন হইলাম কপীন পিন্দা কড়াকের ভিখারী।
সুবর্ণের থালে রন্ন খাইতে না পারি।।

গোপীচন্দ্র ছিলেন অনাচার বিরোধী। হাড়ি গোপীচন্দ্রের কাছে বার কড়া কড়ি যাচঞা করলেন গাঁজা খাবেন বলে। এর উত্তরে গোপীচন্দ্র তাঁকে বলেছেন :

আমিত না জানি তোমরা অনাচারে খাও।
অনাচারের সঙ্গে আইস কোন জন।
অনাচারের সঙ্গে আইলে অবশ্য মরণ।।

এক্ষেত্রে গোপীচন্দ্রের অকপটতাও লক্ষ্য করার মত। হাড়িকে তিনি গুরু পদে বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু গুরুর যে আঁচরণ তাঁর নিন্দনীয় বলে মনে হয়েছে, তিনি নীববে তা সহ্য করার পরিবর্তে সোচ্চার কণ্ঠে তার সমালোচনা করেছেন।

পরিশেষে গোপীচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তার বিষয়ে উল্লেখ করতে হয়। হাড়ি তাঁকে

বার কড়ার কড়ির বিনিময়ে হীরা নটীর কাছে বন্ধক রেখে গেছেন। হীরা নটি কত ভাবেই না গোপীচন্দ্রকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে, যেমন—

যতকে ধর্মী রাজা সরি সরি যায়।
অভাগিয়া হীরা নটী গাও ঘেঁসিয়া যায়।।

এরপর সে মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেছে, কিন্তু তাতেও গোপীচন্দ্রকে পরাস্ত তথা করায়ত্ত করতে পারেনি। তাই তাকেই শেষে বলতে হয়েছে—

নারী হৈয়া ফল দেই তোমাক পুরুষ যাচিয়া।
এই ফল কেন ফেলি দেন পায় লুটিয়া।

গোপীচন্দ্র হীরা নটীকে কি ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন দেখা যাক—

যেমন রদুনা রাণীক ছাড়ি আইছোঁ নাট মন্দির ঘরে।
তার বান্দীর পায়ের রূপ নাই তোর কপালের মাঝারে।।

গোপীচন্দ্রের যে শত প্রলোভনেও পদস্খলন হয়নি, তার মূলে ছিল তাঁর বিবাহিতা পত্নীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম। এই প্রেমের দুর্জয় শক্তিই তাঁকে হীরা নটীর কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করেছিল। গোপীচন্দ্রের পত্নীপ্রেমের পরিচয় কাব্যের শেষেও প্রকাশিত। সন্ন্যাস শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে গুরু তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন সর্বপ্রথম জননীর কাছে উপস্থিত হবার জন্য, কিন্তু গোপীচন্দ্র সেই নির্দেশ লঙ্ঘন করে হাজির হয়েছিলেন রাণীদের মহলে। এই প্রসঙ্গে গোপীচন্দ্রের উক্তি :

গুরু আমার যাবার কইছে মায়ের বরাবর।
মুঞিও কেনে আসনু সুন্দরীর মহল।

রাণীদের মহলে আত্মপরিচয় গোপন করে গোপীচন্দ্র ভিক্ষা প্রার্থী হয়েছেন। এইভাবে একদিকে যেমন রাণীদের চারিত্রিক সততার পরীক্ষা করেছেন, তেমনিই সেই সঙ্গে তাঁর পরিহাসপ্রিয়তাও প্রকাশিত হয়েছে।

কাব্যের সমাপ্তিতে দেখা গেছে গোপীচন্দ্র পুনরায় শাসন ভার গ্রহণ করেছেন।

### গোপীচন্দ্রের গানে সমাজচিত্র

গোপীচন্দ্রের গানে পরিবেশিত সমাজ চিত্র প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে প্রথমেই আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই সমাজচিত্র কোন সময়ের। নতুবা সমাজচিত্র সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্বহীন হতে বাধ্য। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেছেন গোপীচন্দ্রের গান দশম-একাদশ শতাব্দীর রচনা। অতএব এই কাব্যে পরিবেশিত সমাজ জীবনসম্পর্কিত তথ্যাদিও দশম-একাদশ-শতাব্দীর। কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্যকে সমর্থন করেন নি। তাঁর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য. "গোপীচন্দ্রের গানে'র ভাষায় যেমন প্রাচীনত্ব নাই, তেমনই ইহার মধ্য দিয়া যে সকল তথ্য পরিবেষণ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও অবিমিশ্র প্রাচীন উপাদান রহিয়াছে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই।...ইহার মধ্যে যে সামাজিক তথ্য পরিবেষণ করা

হইয়াছে, তাহা প্রায় সকলই ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক প্রথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।" আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, গোপীচন্দ্রের গান মৌখিক সাহিত্য আর পরিবর্তনশীলতাই হল মৌখিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। তাই নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গোপীচন্দ্রের গান মৌখিক ঐতিহ্যের সূত্রে আমাদের হস্তগত হয়েছে! এইবার আমরা আলোচ্য কাব্যে উপস্থাপিত সমাজজীবন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করতে পারি।

'গোপীচন্দ্রের গানে' বহুবিবাহ প্রথার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। মাণিকচন্দ্র রাজার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তাঁর বহু ভার্যা ছিল—

মাণিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্মী বড় রাজা
ময়নাক বিভা করি তার নওবুড়ি ভার্যা।

এরপরও আমরা দেখি তিনি ময়নামতীকে বিবাহ করেছেন। কিন্তু তাতেও তার পরিণয় স্পৃহা মেটেনি। দেবপুরের পাঁচ কন্যাকেও তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। মাণিকচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র গোপীচন্দ্র বিবাহের ব্যাপারে পিতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তাঁর একশতটি সুন্দরী পত্নী ছিল। ময়নামতী পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করলে গোপীচন্দ্র মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন পত্নী প্রাণের বৈরী যদি হবে, "তবে কেন বিবাহ দিলেন একশত সুন্দরী।"

কাব্যে কড়ির ব্যবহার লক্ষণীয়। মাণিকচন্দ্র রাজাকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল "দেড় বুড়ী কড়ি"। অন্যত্র বর্ণিত হতে দেখা গেছে এক বাঙ্গাল দক্ষিণ দেশ থেকে এসে দেওয়ানগিরি নিয়ে প্রজাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। 'পনর গণ্ডা কড়ি রাইয়তের রসাদিতে নাগিল।'

বাড়ীতে অতিথি এলে কর্পূর এবং তাম্বুল যোগে আপ্যায়ন করার রীতি প্রচলিত ছিল। সমাজে মারণ উচাটন ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। অত্যাচারী মাণিকচন্দ্রের পরমায়ু বিনাশ করতে অত্যাচারিত রায়তেরা 'লাংটিচিপি শাপ রাজাকে মঙ্গলবার দেন।'

কাব্যের বিবরণে পুরোহিত সম্প্রদায়ের তেমন প্রতিপত্তি মেলে না। ভগবৎ বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় জাগরুক ছিল। কিন্তু পূজার উপচার সহ মানুষ তাদের পূজিত দেবতার কাছে নিজেরাই উপস্থিত হয়েছে, উপচার সমর্পণ করেছে এবং দেবতার উদ্দেশে নিজেদের আবেদনের কথা জানিয়েছে। মানুষজন ছিল অতি সৎ। চৌর্যবৃত্তির কোন বালাই ছিল না। স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র দেশের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়—

কারও পুষ্করিণীর জল কেহ না খায়।
আথাইলের ধনকড়ি পাথাইলে শুকায়।।
সোনার ভাটা দিয়া রাইয়তের ছাওয়াল খেলায়।
হেন দুঃখী কাঙ্গাল নাই যে ধরিয়া পালায়।

সহমরণ প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকার পরিচয় আমরা পাই মাণিকচন্দ্র রাজার মৃত্যুর

পর ময়নামতীর মৃত স্বামীর অনুগামী হওয়ার প্রয়াসের বর্ণনায়।

একটা আমের পল্লব হস্তে করিয়া।
সোয়ামী সোয়ামী বলিয়া চলিল কান্দিয়া।।

বাল্যবিবাহ প্রথা সমাজে যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সপ্তবর্ষীয় গোপীচন্দ্রের জন্য পাত্রীর সন্ধানে—

সাত বছরকার বয়স হৈল পাটত বসিয়া।
এখন পাত্রী দেখে বুড়ী ময়না ধিয়ানত বসিয়া।।

ঘুষ প্রদান করার রীতি দিব্বি প্রচলিত ছিল। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণকে বিলম্বিত করতে গণক ঠাকুর নাপিত এদের অদুনা পদুনা ঘুষ দিয়েছিল।

ভুমিগৃহ ব্যবহারের চল ছিল, এগৃহ থাকত ভূমির অভ্যন্তরে। নাপিত বলেছে ঘুষ নিয়ে সে এই গৃহে লুকিয়েছিল, 'খোসা খাইয়া আছিলু আমি ভুঞি ঘরার ভেতর'।

কেশচর্চার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই। হীরা নটী কর্তৃক নানাবিধ খোঁপা বাঁধার বিষয়ে বলা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'হাটে ট্যাংরা', 'চ্যাং আর ব্যাং', 'নাটি আর নটি', 'ভ্রমর গুঞ্জর'।

নানাবিধ নামের ধুতির ব্যবহার ছিল। যেমন 'শালকিরাণি', 'চটক ও মটক'। স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ নামের শাড়ী ব্যবহার করতেন। যেমন 'নটীর পরবার হইল আগুন পাটের শাড়ি'।

মানুষ কাঁথার ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। সেই কারণেই উল্লিখিত হয়েছে 'সেই যে মোর গুরুর কাঁ্যাথা আগল দীঘল'। কিংবা 'দুই বইনের শাড়ি চিরি কাঁ্যাথা বানাইয়া নিব'।

মঙ্গলবার দিনটি শুভ বলে বিবেচিত হত—

এক মঙ্গলবারে শুভাশুভ বুঝিল।
ফের মঙ্গলবার দিনা দরগুয়া করিল।।
ফের মঙ্গলবার দিনা বিবাহ সাজাইল।।

মাঙ্গলিক কার্যাদি অনুষ্ঠিত হত মঙ্গলবার দেখে।

সমাজে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা লক্ষিত হয়। ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন হাড়িকে গুরুরূপে বরণ করার, গোপীচন্দ্র তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এই বলে :

ও গো মা জননী—ডুবালু মা জাত কুল আর সর্ব গাও।
বাইশ দণ্ড রাজা হইয়া হাড়ির ধরব পাও।।

মরণোন্মুখ রাজা মাণিকচন্দ্র তৃষ্ণার্ত তবু জানিয়েছেন—

এমনি যদি আমার প্রাণ যায় চলিয়া।
তবু বান্দীর হাতের জল খাব না পালঙ্কে শুতিয়া।।

অভিজাত সমাজের অন্যতম যান ছিল চৌদল। মৃত রাজা মাণিকচন্দ্রকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চৌদলে করে—

রাজাক নৈল জ্ঞাতা চৌদলে করিয়া।

হাটে নারীরা ক্রয়-বিক্রয়ে রত ছিল। তারই প্রমাণ লবণ বেচি, সুপারি বেচি, হলদি বেচিদের উল্লেখ–

হলদিবেচি বলে, দিদি, কোমরক ছাড়েক তুই।
হলদির দোকান থুইয়া কোমর আগে ধরছোঁ মুঞি।।
তেইলানি বলে, ওগো জ্যাঠাই, কোমর ছাড়েক তুই।
তেলের দোকান থুইয়া কোমর আগে ধরছোঁ মুঞি।।

সমাজে বন্ধকী প্রথার প্রচলন ছিল, তারই ইঙ্গিত লভ্য নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে-

বার কড়া কড়িদেও ছাইলাক বান্ধা থুই।
বান্ধা নেও বান্ধা নেও সুপারিবেচি বাই।।

মানুষ নানা সংস্কার মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিল।

ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিতে টাকা হাত করিল।
হাঁচি জেঠি বাধা গুলা পড়িতে লাগিল।

কিংবা,

ও বেলাকাব যাত্রা ঠাকুরের না দেখিলাম ভাল।
পালঙ্ক হইতে দাঁড়াইতে মাথায় ঠেকিল চাল।।
তবু আরো দৈব ঠাকুর যাত্রা করিল।
খালি কলসী মেলা চুল দুয়ারে দেখিল।।
চন্দন বিরিখের ডালোত কাগা আছেত পড়িয়া।
কুসাইত দেখি নিষেধ করে ঠাকুরক লাগিয়া।।

মানুষ ধাঁধার ব্যবহার করত। গোপীচন্দ্র তাঁর জননীকে প্রশ্ন করেছেন :

চারি চকরি পুকুর খানি মা মধ্যে ঝলমল।
কোন বিরিখের বোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল।

ময়নামতী উত্তর দিয়েছেন :

ওরে যাদুধন চার চকরি পুকুর খানি মধ্যে ঝলমল।।
মন বিরিখের বোটা তুই তন্ বিরিখের ফল।।

নৌ বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল, তাই উল্লেখ মিলেছে–

এক পাকের কড়ার ছিল তিন পাক হৈল।
জয় জোকার দিয়া নৌকা দরিয়াত ছাড়িয়া দিল।।

কিংবা, তুষের নৌকা পূজিতে হবে বৈতরণীর ঘাটে গিয়া।

ময়নামতী গরম তেলের কড়ায় নানা ধরনের নৃত্য করেছেন–

গড় খ্যামটা নাচে ময়না হাতে তালি দিয়া।
আড় খ্যামটা নাচে ময়না মাথায় ঘোঙ্গর দিয়া।।

ডোমনা কাওড়া নোটন নাচে ময়না বুড়ী ছাপরিয়া ছাপরিয়া।।

শোনা যায় এসব নৃত্যের প্রচলন ছিল সমাজে। পাশা খেলা হত, ময়নামতীকে পাশা খেলতে দেখা গেছে। ঢেঁকি ঘরে ধান ভাঙ্গা হত।

জনসাধারণকে কিছু জানাতে গেলে ঢ্যাড়া দেওয়া হত। গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস যাওয়ার পূর্বে খেতুর উপর রাজ্য শাসনের ভার ন্যস্ত করে সাধারণকে তা জানাবার জন্য ঢ্যাড়া দিয়েছিলেন। রাজ্যশাসনে প্রজাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকতো। রাজা অত্যাচারী হলে প্রজারা তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে কোন একটা পথের সন্ধান করতো। অত্যাচারী মাণিকচন্দ্রকে মারবার জন্য প্রজারা মোড়লকে নিয়ে পরামর্শ করেছে এবং ব্যভিচার দ্বারা বধ করার প্রয়াস করেছে।

চারিত্রিক শৈথিল্যের পরিচয় আমরা পাই। গোপীচন্দ্র আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর। পদুনাকে বলেছেন—

আমার নাম বলি ভাই খেতুক ডাকাইও।
তিনদিন রঙ্গ তামাসা হইলে আমাক পাসরিবু।।

অন্যত্র গোপীচন্দ্র বলেছেন—

খেতুক দিম রাজ্যভার খেতুক দিম বাড়ি।
ভাই খেতুক সঁপিয়া যাইম তোমা হেন সুন্দরী।।

গোপীচন্দ্রের গানে পদ্মিনী নারীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এদের আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

কোনদিকে ভাল পুরুষ পন্থ বৈয়া যায়।
হাতের হিঞালি দিয়া বধূ ভ্রমরা ভুলায়।।
আপনার স্বামীকে দেখে নিম যেন তিতা।
পরার পুরুষ দেখে যেন সংসারের মিতা।

গোপীচন্দ্র নিজেও ময়নামতীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থাপিত করেছেন তাতেও আমরা চারিত্রিক শিথিলতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই—

বুদ্ধি পরামিশে আমায় বনবাসে পাঠাইয়া।
শেষে বিটি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি লৈয়া।

এইরূপে সমাজ জীবনের নানা তথ্যের সমাবেশে গোপীচন্দ্রের গান অনেক বেশী বাস্তবতা লাভ করেছে স্বীকার করতে হয়।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

# মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

### মহুয়া

গীতিকার প্রসঙ্গ উঠলেই সর্বাগ্রে যে সব গীতিকার কথা মনে জাগে, 'মহুয়া' তাদেরই অন্যতম। দ্বিজ কানাই প্রণীত 'মহুয়া' পালাটিকে সমালোচকেরা একটি আদর্শ গীতিকার মর্যাদা দিয়েছেন। কাহিনীর আকর্ষণে, আদর্শ প্রেমের নিদর্শনে, সংক্ষিপ্ততার গুণে, কথোপকথনের সাহায্যে কাহিনীকে উপস্থাপনের আঙ্গিকের পরিপ্রেক্ষিতে, সর্বোপরি যথার্থ কবিত্বমণ্ডিত প্রকাশের গুণে ও উপস্থাপনা নৈপুণ্যে 'মহুয়া' গীতিকা-প্রেমিক পাঠকের কাছে এক ভিন্ন মাত্রা বহন করে এনেছে।

প্রথমেই ধরা যাক এর ষোড়শ পংক্তি সম্বলিত 'বন্দনা গীতি'টি। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত, উদার মানসিকতার প্রতিফলনে হিন্দু ও মুসলমানের দেবতা ও পীরের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনে, উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতৃমণ্ডলীকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে সে পরিচয় লভ্য—

পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উর্‌দিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান।।
সভা কইর‍্যা বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম।

সর্বমোট চব্বিশটি পরিচ্ছেদে গীতিকাটি বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে ডাকাত সর্দার হুমরা বেদে কর্তৃক কাঞ্চনপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যার অপহরণ বৃত্তান্ত, পরে যার নামকরণ সে করে 'মহুয়া সুন্দরী'। সংক্ষিপ্ততা ধর্ম এই প্রথম পরিচ্ছেদেও রক্ষিত হয়েছে। যে গভীর বনে হুমরা বেদের বাস, তার বর্ণনায় কবি দুটি মাত্র পংক্তি ব্যয় করেছেন—

চান্দ সুরয নাই আন্দারিতে ঘেরা।
বাঘ ভালুক বইসে মাইন্‌সের নাই লরা চরা।।

দূরত্বের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কবি শুধু বললেন—

উত্তর‍্যা না গারো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ।

হুমরা ডাকাতের সর্দার, কিন্তু পালায় তার ডাকাতির কোন বিবরণ প্রদত্ত হয়নি অপ্রাসঙ্গিক হবে এই বিবেচনায়। শুধু ব্রাহ্মণ কন্যা অপহরণের বিষয়টিই উল্লিখিত হয়েছে। কোন পরিবেশে হুমরা কন্যা চুরি করেছিল তাও অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। শুধু বর্ণিত হয়েছে—'রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরি'।।

কন্যা অপহরণের প্রতিক্রিয়ায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কি হয়েছিল, অনাবশ্যক বিবেচনায় তাও উল্লিখিত হতে দেখা যায় না। মূল আখ্যান ষোড়শী মহুয়াকে নিয়ে। কবি একটিমাত্র

পংক্তিতেই ছয় মাসের কন্যাকে ষোড়শীতে রূপান্তরিত করেছেন—

এক দুই তিন করি শুল বছর যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হুমরার সদলবলে খেলা দেখাবার জিনিসপত্র সহ গারো পাহাড় সংলগ্ন বনভূমি ত্যাগ করে বামনকান্দা গ্রামের উদ্দেশে যাত্রার কথা বর্ণিত হয়েছে। গারো পাহাড় সন্নিহিত বনদেশ অতিক্রমণ করতে তাদের সময় লাগল ঠিক একটি মাস। কবির ভাষায়—

এক দুই তিন করি মাস গুয়াইল।
বামনকান্দা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল।।

আখ্যানের মূল পটভূমি এই গ্রাম, এখানেই মহুয়ার সঙ্গে তার প্রেমিকের সাক্ষাৎ ঘটবে। তাদের প্রেমের কাহিনী ও তাদের পবিণতি বর্ণনাই মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই দীর্ঘ এক মাস ব্যাপী বন অতিক্রমণের কোন অভিজ্ঞতার কথা কবি উল্লেখ করেন নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে নদ্যার ঠাকুর সভামধ্যে আসীন থাকা অবস্থায় অবহিত হয়েছে গ্রামে একদল বেদের আগমন বৃত্তান্ত। যার মাধ্যমে নদ্যার ঠাকুর এই বিষয়ে অবগত হয়েছে সে জানাতে ভোলেনি বেদের দলের সঙ্গে আসা পরমা রূপবতী কন্যার প্রসঙ্গ—

পরম এক সুন্দরী কইন্যা সঙ্গেতে তাহার।
জন্মিয়া ভন্মিয়া এমুন দেখি নাইকো আর।।

নদ্যার ঠাকুর এরপরই তার মার কাছে বেদের দলের খেলা দেখাবার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ যাচঞা করেছে—খুব সূক্ষ্মভাবে কবি ইঙ্গিত দিয়েছেন নদ্যার চাঁদ বেদের দলের খেলা অপেক্ষা তাদের সঙ্গের রূপবতী কন্যার কারণেই অধিকতর প্রলুব্ধ হয়েছিল বাড়ীতে তাদের খেলা দেখানোর আয়োজন করতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বেদের দলের খেলা দেখানোর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত। এই পরিচ্ছেদে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ লক্ষ্য করার। নদ্যার ঠাকুর যে খেলা অপেক্ষা বেদের দলের সঙ্গে আসা রূপবতী কন্যার বিষয়েই অধিকতর মনোযোগী, তার পরিচয় কবি দিয়েছেন সুকৌশলে—

চাইর দিকেতে রইল লোকজন তাম্‌সা দেখিবারে।
মধ্যে বইয়া নদ্যার ঠাকুর উকি ঝুকি মারে।।

এ উকি ঝুকি কিসের কারণে? পরের পংক্তিতেই তা পরিষ্কার রূপে জানা গেছে—

যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি বাশে মাইলো লাড়া।
বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা ঐল খাড়া।।

বেদের মেয়ে বাঁশ ধরে নাড়া দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় নদ্যার ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর মহুয়া যখন দড়ি বেয়ে উঠে খেলা দেখাতে শুরু করল, তখন নদ্যার ঠাকুরকে মহুয়ার বিপদাশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কবি এই পর্যায়ে বেদের দলের অন্য কারোর কোনো খেলার বিষয়ে উল্লেখ করেননি, কেবল যার খেলার বিষয়ে নদ্যার

ঠাকুরের আকর্ষণ তার বিষয়েই উল্লেখ করেছেন। খেলা দেখানোর পরে যখন ইনাম বখশিসের কথা উঠেছে, তখন নদ্যার ঠাকুর আশাতীত পুরস্কার দিয়েছে—দিয়েছে হাজার টাকা মূল্যের শাল, টাকাকড়ি, বেদেদের বসতি করার জন্য গৃহ, আরও দিয়েছে চাল ডাল ইত্যাদি রন্ধন করে খাওয়ার জন্য। এসবই যে সে মহুয়ার মুখ চেয়ে দিয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে নদ্যার ঠাকুর মহুয়াকে অনুরোধ জানিয়েছে সন্ধ্যাবেলায় সে যেন জলের ঘাটে যায় এবং অবশ্যই একাকিনী। মহুয়া যথাসময়ে উপস্থিত হলে নদ্যার ঠাকুর তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে চেয়েছে, মহুয়া জবাবে বলেছে—

নাহি আমার মাতা পিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।

সে যে হুমরার কন্যা নয়, কপালের লিখন বশতঃ বেদের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাধ্য হয়ে, তা জানিয়েছে, আরও জানিয়েছে—

এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোনজন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা।।

মহুয়া দুঃখী ছিল ঠিকই, একটু সহানুভূতির স্পর্শেই সে তার মনের চাপা বেদনাকে আর অপ্রকাশিত রাখতে পারেনি, তবু সেই সঙ্গে একজন প্রকৃত সমব্যথীর সহানুভূতি লাভেও কি তার চিত্ত' দুর্বার হয়ে ওঠেনি? সেই জন্যেই কৌশলে নদ্যার ঠাকুর বিবাহিত কিনা সে জেনে নিতে ভোলেনি—

মনো সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্দিয়া।।

নদ্যার ঠাকুর এই সুযোগে জানিয়ে দিয়েছে যে সে অবিবাহিত এবং মহুয়ার মত একজনকে পেলে সে বিবাহ করতে রাজি। কৃত্রিম ক্ষোভ দেখিয়ে মহুয়া নদ্যার ঠাকুরকে বলেছে তার মৃত নির্লজ্জেব উচিত গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরা। নদ্যার ঠাকুর জবাব দিয়েছে উপযুক্তভাবে, একেবারে কবির লড়াইয়ে যোগ্য কবির যোগ্য প্রত্যুত্তরের মত—

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।।

মহুয়া যদি গহিন গাঙ্ হতে বাজি থাকে তবে তাতেই নদ্যার ঠাকুর নিমজ্জিত হতে পারে। এমন কবিত্বমণ্ডিত প্রেমের অভিব্যক্তি বাস্তবিকই দুর্লভ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মহুয়া তার প্রাণের দোসর পালং সইয়ের কাছে অকপটে নদ্যার ঠাকুরের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণের বিষয়ে উল্লেখ করেছে। পালং সই তাকে পরামর্শ দিয়েছিল সাতদিন সে যেন জলের ঘাটে না যায়, সাতদিন তাহলে নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে তার দেখা হবে না, কিন্তু মহুয়া বলেছে সাতদিন ত অনেক বেশি, একদিনও তার পক্ষে নদ্যার ঠাকুরের অদর্শনে বেঁচে থাকা অসম্ভব—

আগে আমি যাইবাম মইর‍্যা মুরতেক না দেখিলে।।

এরপর চন্দ্র সূর্য ও পালঙ্ক সখীকে সাক্ষী রেখে মহুয়া ঘোষণা করেছে—

নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী।

প্রেম যতই গোপনে রাখার চেষ্টা করা যাক, শেষপর্যন্ত তা ত প্রকাশ পাবেই, কুসুম প্রস্ফুটিত হলে তার সুগন্ধকে কি গোপন রাখা সম্ভব? অনুরূপভাবে নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে ষোড়শী মহুয়ার প্রেমের সম্পর্ক শেষপর্যন্ত হুমরা বেদের গোচরীভূত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই এর সূত্র অনুল্লিখিত রয়ে গেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে হুমরা মানিককে প্রস্তাব দিয়েছে উলুয়াকান্দা ছেড়ে চলে যাবার। কেননা—

আমার কন্যা পাগল হইছে নদ্যার ঠাকুরের লাগে।।

কিন্তু সুদীর্ঘ অনিশ্চয়তায় ভরা যাযাবরের জীবনযাপনে ক্লান্ত মানিক হুমরার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেনি। গৃহস্থ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বাদ একবার পেয়েছে সে, স্বেচ্ছায় এই গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করতে সে তাই সম্মত হয়নি। জীবনাসক্তির কারণে সে তাই ভাইকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে—

এই দেশ না ছাইরো ভাইরে আমার মাথার কিরা।

অষ্টম পরিচ্ছেদে নদ্যার ঠাকুরের বংশী স্বরের ইঙ্গিতে গভীর রাত্রে একাকিনী যাত্রা করেছে মহুয়া এবং নদীর ঘাটে এসে সে তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উভয়েই উভয়ের জন্য পাগল। আকণ্ঠ প্রেমে নিমজ্জিত। নদ্যার ঠাকুর মহুয়াকে জানিয়েছে তার জন্য সে তার মা, বাবা, এমন কি ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। মহুয়াও জানিয়েছে যে তিলেক মাত্র নদ্যার ঠাকুরের অদর্শনে সে কিরূপ উন্মাদিনী হয়ে ওঠে। হুমরা গোপনে উভয়ের প্রেমালিঙ্গন দেখে ও প্রেমালাপ শোনে।

হুমরার পক্ষে ভাই মানিকের অনুরোধ রক্ষা আর সম্ভব হয়নি। সে পত্রপাঠ মহুয়াকে নিয়ে যাত্রা করতে মনস্থ করেছে। এখনও পর্যন্ত মহুয়ার প্রেমের ব্যাপারে হুমরা সরাসরি তাকে কিছু জানায় নি। এমনকি নব বাসস্থান ত্যাগ করে যাবার নির্দেশও তার দ্বারা সরাসরি উল্লিখিত হয়নি। আমরা জানতে পারি তা মহুয়ার শেষ বিদায়ের উক্তি থেকে।

নবম পরিচ্ছেদে সে নদ্যার ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়েছে। জানিয়ে যেতে ভোলেনি তাদের বাড়ীর নিশানার কথা, প্রেমিককে অতিথিরূপে উপস্থিত হবার আবেদন জানিয়ে বিদায় নিয়েছে সে।

বেদের দলের পলায়নের সংবাদে নদ্যার ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে দশম পরিচ্ছেদে। ভোজনরত অবস্থায় মহুয়ার চলে যাবার সংবাদে নদ্যার ঠাকুরের মুখের গ্রাস ভূমিতে পড়ে গেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদে নদ্যার ঠাকুর তীর্থ ভ্রমণে যাবার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে তার জননীকে। আসলে তার প্রেমিকের সন্ধানে সে যাত্রা করতে উদ্যত। জননী তাকে নানা ভাবেই মিনতি করেছে সে যেন গৃহত্যাগী না হয়। কিন্তু মন যার উচাটন, তার পক্ষে

গৃহে অবস্থান করা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই জননীকে নিদ্রিতাবস্থায় রেখেই নদ্যার ঠাকুর গভীর রাত্রে গৃহত্যাগী হয়েছে। মহুয়ার সন্ধানে নানা স্থান পর্যটন করেছে সে। মহুয়াকে কাছে না পেয়ে তার স্মৃতিযুক্ত স্থানগুলিকে অবলম্বন করে নদ্যার ঠাকুর বিচ্ছেদের জ্বালা প্রশমনে ব্যর্থ প্রয়াস করে। শেষে সে নাগাল পায় মহুয়ার।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার সাক্ষাৎকারের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। যে মহুয়া প্রেমের জ্বালায় জ্বলছিল, ত্যাগ করেছিল আহার, জীবন যার বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, দেখা গেল দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রেমিকের সাক্ষাতে সে যেন নবজীবন লাভ করেছে। নদ্যার ঠাকুরের উপস্থিতি নব সঞ্জীবনী সুধার কাজ করেছে। কবি সঞ্জীবিত মহুয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন—

ছয় মাইস্যা মরা যেন উঠ্যা হইল খারা।।

হুমরা বেদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি মহুয়া, তার ভাবান্তরই হুমরাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। আবার নদ্যার ঠাকুরের উপস্থিতি ঘটেছে, তার মানে তার সুদীর্ঘ ষোল বৎসরের পালিতা কন্যা নিশ্চিতভাবে হাতছাড়া হবার উপক্রম। শেষে নিদ্রিত মহুয়াকে তুলে তার হাতে বিষযুক্ত ছুরি দিয়ে হুমরা নির্দেশ দিয়েছে স্বহস্তে মহুয়া যেন নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করে। ইচ্ছা করলে হুমরা নিজেই নিদ্রিত নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করতে পারত অনায়াসে। কিন্তু তা সে করেনি। নদ্যার ঠাকুরকে হত্যার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে মহুয়ার উপর। কি কঠিন পরীক্ষা তার। মহুয়া ছুরি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু পিতৃ নির্দেশ পালনের পরিবর্তে সে নিজেই আত্মঘাতিনী হতে চেয়েছে, এমন সময় নিদ্রিত নদ্যার ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। তখন তাকে মহুয়া আনুপূর্বিক সব জানিয়ে সত্বর দেশে ফিরে যাবার অনুরোধ জানিয়েছে, বলেছে—

পলাইয়া মায়ের ধন নিজের দেশে যাও।<br>সুন্দর নারী বিয়া কইরা সুখে বইসা খাও।।

একে ব্রাহ্মণ পুত্র, তার ওপর রাজপুত্র নদ্যার ঠাকুর, তার ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য মহুয়া নিজেকেই দায়ী করেছে—

তোমার সুখের ঘরে আমি হইলাম কাল।।

কিন্তু যে মহুয়ার জন্য নদ্যার ঠাকুর তার সব কিছু ত্যাগ করে পথে এসে নেমেছিল, তাকে ছাড়া সে গৃহে প্রত্যাবর্তনে অস্বীকার করে এবং জানায়—

তোমায় যদি না পাই কন্যা আর না যাইবাম বাড়ী।<br>এই হাতে মার লো কন্যা আমার গলায় ছুরি।।

এই কথাতেই মহুয়া তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করে নদ্যার ঠাকুরকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দেশান্তরি হয়েছে।

পথে একটির পর একটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তারা। প্রথম বিপদের কারণ হয়েছে সাধু। এরই ডিঙ্গায় চড়ে পলায়নপর নদ্যার ঠাকুর ও মহুয়া নদী অতিক্রম করছিল। সাধু মহুয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নদ্যার ঠাকুরকে কৌশলে নদীবক্ষে নিক্ষেপ

করল। সাধু কতই না সুখৈশ্বর্যের প্রলোভন দেখাল মহুয়াকে, মহুয়া তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পাহাড়ী তক্ষকের বিষ মিশ্রিত পান খাইয়ে সাধু ও তার সঙ্গী সাথীদের হত্যা করল। অসহায় ষোড়শী এত মানসিক শক্তি পেল কোথা থেকে? সে এই শক্তি সংগ্রহ করেছিল তার আন্তরিক প্রেম থেকে।

সাধুর হাত থেকে রক্ষা পাবার পর নবোদ্যমে মহুয়ার শুরু হল নদ্যার ঠাকুরের সন্ধান পর্ব। কখনও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে সে আত্মঘাতিনী হতে চেয়েছে, আবার পরক্ষণেই জীবনাসক্তি তাকে নূতন প্রেরণা জুগিয়েছে নদ্যার ঠাকুরের সন্ধান লাভের ব্যাপারে। শেষপর্যন্ত এক ভাঙ্গা মন্দিরে সে আবিষ্কার করেছে নদ্যার ঠাকুরকে। নদ্যার ঠাকুরের অস্থি মাত্র সে পেয়েছে—

শুকাইয়া গেছে মাংস পইড়া রইছে হাড়।
মন্দিরের মাঝে দেখে কন্যা মড়ার আকার।।

এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সহযোগিতায় এ হেন নদ্যার ঠাকুরকে সে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কিন্তু তার পরই দেখা দিয়েছে অন্য বিপত্তি। সন্ন্যাসী মহুয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে তার যৌবন-ঐশ্বর্য কামনা করেছে। কৌশলে স্বামীকে সুস্থ করে সে সন্ন্যাসীর নাগাল থেকে দূরে সরে গেছে। এরপর ছটি মাস তাদের বেশ সুখেই অতিবাহিত হয়েছে। বনের মধ্যে উভয়ে পরমানন্দে থেকেছে। কবি তাদের এই সময়কার সুখভোগের বিবরণ দান প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

বনের ফল তুইল্যা আনে দুইজনে খায়।
মালাম পাথরে দুইয়ে শুয়ে নিদ্রা যায়।।
রাত্রিতে থাকয়ে ঠাকুর কন্যা লইয়া বুকে।
দিনেতে উঠিয়া দোহে ভরমে নানা সুখে।।
হস্ত ধরি সুন্দর কন্যা ফিরে বনে বন।
পাড়িয়া আনে বনের ফল করিতে ভক্ষণ।।

কিন্তু সুখ যে তাদের কপালে লেখা নেই। তাই মূর্তিমান বিভীষিকা হুমরা বেদে তাদের সন্ধান করে ফিরতে ফিরতে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে। বিষযুক্ত ছুরি দিয়ে নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে সে মহুয়াকে। আর প্রস্তাব করেছে তার পালকপুত্র সুজন খেলোয়াড়কে বিবাহ করতে। এ দুই নির্দেশের কোনটিই পালন করেনি মহুয়া। নদ্যার ঠাকুরের পরিবর্তে সুজনকে বিবাহ করা যেমন তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনিই অসম্ভব ছিল স্বহস্তে নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করা। শিশুকালেই যে তার মাতাপিতাকে হারিয়েছিল, যে তার মনোমত ব্যক্তিকে স্বামীরূপে লাভ করে স্বাচ্ছন্দ্যে দাম্পত্য জীবনযাপনের সুখ ভোগ থেকেও বঞ্চিত হল—সবেরই মূলে দুষ্ট গ্রহের মত হুমরা বেদে। নিরুপায় এবং অসহায় মহুয়া শেষে আত্মঘাতিনী হয়েছে এক বুক অভিমান নিয়ে। হুমরার নির্দেশে এরপর নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করেছে বেদের দল। কবর খুঁড়ে একসঙ্গে উভয়কে কবরস্থ করেছে বেদেরা। জীবিতাবস্থায় যে মিলন দীর্ঘস্থায়ী হল না,

মৃত্যুর পর দুটি দেহ বাঞ্ছিত সান্নিধ্য লাভ করল। পালং সই কবর ছেড়ে আর যেতে পারল না। সে তার প্রিয় সখী ও তার প্রেমিকের কবরের কাছেই রয়ে গেল।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ময়মনসিংহ গীতিকায় বাংলা উপন্যাসের বীজের সন্ধান পেয়েছেন। বাস্তবিক, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যেখানে সব কিছুই দৈব তাড়িত এবং অলৌকিকতা মণ্ডিত ও নিয়ন্ত্রিত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যেখানে পরিত্যক্ত, সেখানে ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলিতে অবিশ্বাস্য রূপে বাস্তবতার প্রতিফলন আমাদের মুগ্ধ করে। 'মহুয়া' পালাটিতেও সেই বাস্তবতার স্বাক্ষর বিদ্যমান। আমরা এই বাস্তবতার সন্ধান পাই নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি বর্ণনায়, অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায় এবং সর্বোপরি নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রচিত্রণে। 'মহুয়া'র আখ্যানটি একটি সার্থক উপন্যাস রচনার উপযোগী। আংশিকতা দোষে দুষ্ট হলেও সমসাময়িক সমাজ জীবনকে আমরা এতে মূর্ত হতে দেখেছি। এই প্রসঙ্গে হুমরা বেদেদের অনিশ্চয়তাময় জীবনযাপন ও জীবিকা, কিংবা ব্রাহ্মণ সন্তান নদ্যার ঠাকুরের মহুয়ার হাতের রান্না খেয়ে জাতিচ্যুত হওয়ার উল্লেখ, দুশ্চরিত্র সাধু কর্তৃক মহুয়াকে প্রলুব্ধ করার সময়েও আমরা সেকালের প্রচলিত আভরণ ও পরিচ্ছেদের বিষয়ে অবগত হই। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কামরাঙ্গা শাঁখা, উদয়তারা শাড়ী, চন্দ্রহার ইত্যাদি।

সমালোচকের মন্তব্যের অনুসরণে 'মহুয়া' সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, 'শাস্ত্রের অনুশাসন-বাহুল্যের দ্বারা বিড়ম্বিত না হইয়া সতীত্বের আসল মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, দেশাচার লঙ্ঘন করিয়া নিজ হৃদয় বাণীর অনুবর্তন করিয়াছেন।'

নায়িকা মহুয়ার রূপ বর্ণনাতে কবি সংস্কৃত কাব্য অলংকারের সহায়তা নেন নি। গতানুগতিকতাহীন বাস্তবতার সন্ধান মেলে তাই নায়িকার রূপ বর্ণনাতে। যেমন

ক. মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।

খ. চাঁচর চিকণ কেশ কন্যার পরমা সুন্দরী।।

গ. কালো না ডাঙ্গর আঁখি লম্বা মাথার চুল।

ঘ. ফুলে ভরা মধু কন্যা ফির একেশ্বরী।।

ঔপন্যাসিকের মত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়ও পালাটিতে লভ্য। একমাত্র অলৌকিকতার হয়ত কিছু সন্ধান মেলে সন্ন্যাসী কর্তৃক নদ্যার ঠাকুরকে বনজ ভেষজে পুনরুজ্জীবিত করার মধ্যে! ব্যবহৃত ভাষার তীক্ষ্ণতা, অকুণ্ঠিত সরলতা, ভাব প্রকাশের সার্থক মাধ্যমে রূপান্তরিত।

### মহুয়ার চরিত্র

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন উমা লাস্যময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করে তার অভিলষিত শিবের মনোরঞ্জন তথা আকর্ষণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস ফলবতী হয় নি। মদনভস্মের মধ্য দিয়ে সে প্রয়াসের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে উমাকে দেখা গেছে কঠিন তপশ্চর্যায় রত

হতে, কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন করায় তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়েছে, তিনি লাভ করেছেন মহাদেবকে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—সহজেই যদি উমা শিবকে পেতেন তাহলে প্রেমের মহিমা ক্ষুণ্ণ হতো। সেক্ষেত্রে নিছক দৈহিক আকর্ষণই বড় হয়ে দেখা দিত। বৃহৎকে পেতে গেলে বৃহৎ ত্যাগের প্রয়োজন আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ময়মনসিংহ গীতিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা আমরা লক্ষ্য করি গীতিকার নায়ক-নায়িকারা বিশেষত নায়িকারা তাদের স্বর্গীয় প্রেমের জন্য কতই না কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। পার্বতীর তুলনায় তাদের প্রেমের জন্য তপশ্চর্যা কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু হতভাগিনীরা শেষপর্যন্ত তাদের বহু অভিলষিত প্রেমিককে লাভ করতে পারেনি। তাদের সমস্ত ত্যাগ, তিতিক্ষা, কৃচ্ছ্রসাধন ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবে একথা সত্য যে, তারা স্মরণীয় হয়েছে, মহীয়সীরূপে আমাদের স্বীকৃতি লাভের অধিকারিণী হয়েছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার শুভ সূচনা হয়েছে যে পালাটি দিয়ে, সেটি দ্বিজ কানাই প্রণীত 'মহুয়া'। লোককবি নায়িকার নাম নির্বাচনে তাঁর কবিত্বময় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন স্বীকার করতে হয়। আমরা জানি মহুয়া ফুলের গন্ধে একপ্রকার মাদকতা আছে। এবং মহুয়া ফুল থেকে প্রস্তুত মদ্য পান করে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ষোড়শী মহুয়ার দৈহিক সৌন্দর্যেরও একপ্রকার মাদকতা ছিল। তা না হলে অভিজাত পরিবারের বিত্তবান নদের চাঁদ মহুয়ার প্রথম দর্শনেই প্রেমাভিভূত হয়ে পড়ত না—যাকে বলে Love at first sight, কিন্তু নিপুণ কৌশলে কবি দেখিয়েছেন মহুয়া শুধু দৈহিক সৌন্দর্যেরই আধার ছিল না, তার আত্মিক সম্পদও ছিল অপর্যাপ্ত। তার কাছে প্রেম মানে নিছক দৈহিক মিলনমাত্র নয় কিংবা দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তিতেই তা শেষ হয় না, তার আবেদন স্বর্গীয় এবং সুদূরপ্রসারী। প্রেমের আবেদন সচরাচর পুরুষের কাছ থেকেই প্রথমে আসে। লজ্জাশীলা রমণী এই ব্যাপারে কখনই প্রথমে সোচ্চার হয় না। মহুয়াব ক্ষেত্রেও আমরা তাই লক্ষ্য করেছি। নদের চাঁদ মহুয়াকে তার প্রেম নিবেদনের কথা বলতে গেলে প্রথমে মহুয়া তার লজ্জাশীলতার পরিচয় দিয়েছে যদিও সে বেদের দলেরই অন্তর্ভুক্ত তবু লজ্জা তার মজ্জাগত।

তুমি তো ভিন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি।।

যতই তার অন্তর্মুখীনতা থাক, তবু অনুকূল পরিবেশ কিভাবে একজন অন্তর্মুখীন নারীকে (Introvert) বাঙ্ময় করে তোলে তার পরিচয় পাওয়া যায় মহুয়ার ক্ষেত্রে। নদের চাঁদ জানতে চেয়েছে মহুয়ার মাতা-পিতার প্রসঙ্গ, তার পূর্ববর্তী বাসস্থানের প্রসঙ্গ। আর মহুয়ার পক্ষে তার অন্তর্লীন বেদনাকে গোপন রাখা সম্ভব হয় নি। বোধকরি ইতিপূর্বে তার কাছে এমন করে তার জীবনকথা কেউ জানতেও চায়নি। সে যে আসলে হুমরা বেদের আত্মজা নয়, ভাগ্যের পরিহাসে ব্রাহ্মণ কন্যা হয়েও তাকে বেদের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে নিতান্ত শৈশব অবস্থা থেকে, সেই পুঞ্জীভূত অভিযোগ, বেদনাবোধ সবই প্রকাশ পেয়েছে একটু সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্পর্শে—

নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর ভাই
সুতের হেওলা ঐয়া ভাইস্যা বেড়াই।।
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইড়্যা মরি।।

এরপরই মহুয়া নদের চাঁদের কাছে যেন একটু বেশী অকপট হয়ে পড়েছে। বলেছে—

'এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা।।

কিন্তু মহুয়া নির্বোধ নয়, তার প্রতি নদের চাঁদের দুর্বলতা সে টের পেয়েছে, বিপরীতক্রমে সেও হয়তো নদের চাঁদের প্রতি কিছুটা অনুরক্ত হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ঘরের বিত্তবান সন্তান সে। তার প্রকৃত অভিপ্রায়টুকু আগে তো বুঝে নেওয়া চাই তবে তো অগ্রসর হওয়া। তাই সে প্রশ্নবাণ কৌশলে নিক্ষেপ করেছে—

মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া।।

আপাতভাবে মনে হবে মহুয়ার এমন হঠাৎ করে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার কারণটা কি? আসলে নদের চাঁদের উত্তরের ওপরেই যে তার পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভরশীল। নদের চাঁদ আহ্বান করলেই যে তাকে সাড়া দিতে হবে এমন তো নয়। মূঢ়া, বিমুগ্ধা, ষোড়শী কন্যা না হয়ে সে এক্ষেত্রে অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। কৌশলে জেনে নিতে চেয়েছে নদের চাঁদ বিবাহিত কিনা। মনে মনে স্বভাবতই মহুয়া এই উত্তরে খুশী হয়েছে। কিন্তু মনের হাসির মতই মনের খুশীকে সে প্রকাশ করেনি। শুধু কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নদের চাঁদের মা বাবার প্রসঙ্গে—

কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।।

নদের চাঁদ মহুয়ার অভিযোগকে শিরোধার্য করে নিয়েছে, স্পষ্টতই ঘোষণা করেছে যে সে মহুয়ার মত কন্যাকে পেলে দার পরিগ্রহ করে। কৃত্রিম ভর্ৎসনা প্রকাশ পেয়েছে নদের চাঁদের এই সরাসরি প্রস্তাবে. মহুয়ার কণ্ঠে—

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।

মহুয়ার ভর্ৎসনা যে কৃত্রিম তার পরিচয় আমরা এরপরেই পেয়েছি—প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তার জলের ঘাটে উপস্থিত হওয়ার বর্ণনায় এবং সারাটি রাত তার বেদনাশ্রু ত্যাগে। তার সখী মহুয়ার ভাবান্তর লক্ষ্য করে তাকে পরামর্শ দিয়েছে বেশী নয় মাত্র সাতটি দিন সে যেন জলের ঘাটে না যায়, নদের চাঁদের সঙ্গে সে যেন দেখা না করে। পালং সই আরো বলেছে নদের চাঁদকে সে জানিয়ে দেবে মহুয়ার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এ প্রস্তাবে কোনোমতেই সম্মত হতে পারেনি মহুয়া সুন্দরী, হওয়া সম্ভবও ছিল না। কেননা সে যে ইতিমধ্যেই গভীরভাবে নদের চাঁদের প্রেমে আসক্ত হয়েছে। তাই অকপটে তাকে সখীর কাছে স্বীকার করতে হয়েছে যে একমুহূর্ত যদি না সে প্রেমিককে দেখতে

পায় তবে সে নিজেই মারা যাবে। জানিয়েছে নদের ঠাকুরকেই সে স্বামীত্বে বরণ করেছে। তার কাছ থেকে তার মনকে সরিয়ে রাখতে পারে এমন কিছু নেই। বন্ধুর জন্য, প্রেমিকের জন্য পারে না এমন কোনো কাজ তার নেই—

বন্ধুরে লইয়া আমি অইবাম দেশান্তরি।
বিষ খাইয়া মরবাম কিংবা গলায় দিয়াম দড়ি।।

মহুয়ার এই ঘোষণা যে নিছক কথার কথা মাত্র নয়, নদের চাঁদের জন্য তার কাছে যে কিছুই করা অসম্ভব ছিল না, নদের চাঁদের প্রতি তার আকর্ষণ যে মোহমাত্র ছিল না, এর প্রমাণ আমরা পরবর্তী ঘটনা পরম্পরাতেই পেয়েছি। আসন্ন বিচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে মহুয়া এবং নদ্যার ঠাকুর শেষবারের মত মিলিত হয়েছে। মহুয়া তার প্রেমিকের উদ্দেশে জানিয়েছে—

তিলেকমাত্র না দেখিলে হইরে পাগলিনী।
পিঞ্জরায় বাইন্ধ্যা রাখছে পাগলা পঙ্খিনী।।

কিন্তু এতসব বলার পরেও মহুয়া নদ্যার চাঁদকে অনুরোধ করেছে, তাকে লাভ করার আশা ত্যাগ করে সে যেন ঘরে চলে যায়। কারণ হুমরা বেদে যেখানে তাদের মিলনকে স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয়, সেখানে মিলন ফলবতী হবার নয়। অতএব অনর্থক আশা করে লাভ নেই। আসলে মহুয়া নিজেও জানে না তার কর্তব্য কি? তাকে দ্বন্দ্বের শিকার হতে দেখা গেছে। মহুয়ার পরপর কয়েকটি উক্তি আমরা উদ্ধার করতে পারি এই প্রসঙ্গে—

(ক) 'তোর সঙ্গে যাইয়াম রে বন্ধু হইয়া দেশান্তরি।'
(খ) 'তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে রে বন্ধু এই না শেষ দেখা।'
(গ) 'দেখা করতে যাইও রে বন্ধু খাওরে আমার মাথা।'

বাস্তবিকই হুমরা বেদে নদের চাঁদের হাত থেকে মহুয়াকে বাঁচাবার জন্য নতুন বসতি পরিত্যাগ করে চলে গেছে। আর নদের চাঁদের বিচ্ছেদ বেদনায় বেচারী মহুয়া খাদ্য এমনকি জলগ্রহণেও বিরত হয়েছে। দীর্ঘ ছয়টি মাস তার চরম কৃচ্ছ্রসাধনে কেটেছে। এই সময়ে তার চোখে ঘুম ছিল না, সর্বাঙ্গে তার যন্ত্রণা, কোনো কিছুতেই তার মন নেই। নদের চাঁদের কথা ভেবে দেহও কালিবর্ণ হয়ে গেছে। লোককবি জানিয়েছেন—

'এইরূপ হইয়াছে কন্যা সংশয় জীবন।'

তার কৃচ্ছ্রসাধন, তার আন্তরিক কামনা শেষপর্যন্ত ফলবতী হল। দীর্ঘ ছয় মাসের পর নদের চাঁদের উপস্থিতি ঘটল মহুয়ার কাছে। কিন্তু তার ভাগ্যে সুখ নেই। কেননা হুমরা বেদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সোজা ব্যাপার নয়। সে ঠিকই বুঝেছে দীর্ঘদিন পর মহুয়ার পুলকিত হবার কারণ। মহুয়ার হাতে সে ছুরি তুলে দিয়েছে, আর নির্দেশ করেছে স্বহস্তে সে যেন নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করে। পালক পিতার নির্দেশ অগ্রাহ্য করার পরিণতি সম্পর্কে সে সম্যকরূপে সচেতন। প্রাণাধিক প্রিয় নদের চাঁদকে সে তিন তিনবার ছুরিকাঘাত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত পারেনি। মহুয়ার ভাষায়—

তুমারে মারিয়া আমি কেমনে যাইবাম ঘরে।
পাষাণ হইয়া মাও বাপে বধিল আমারে।।

শেষপর্যন্ত মহুয়া সমস্যার একটা সমাধান ঠিক করে নিয়েছে। সে আত্মঘাতিনী হবে বলে মনস্থির করেছে। কিন্তু তৎপুর্বেই নদ্যার ঠাকুরের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আত্মহননের পথ থেকে বিরত করেছে মহুয়াকে। ধরা পড়ে গিয়েছে মহুয়া নদ্যার ঠাকুরের কাছে। সবিস্তারে সে সব ঘটনা বিবৃত করেছে অকপটে। তারপর আবেদন জানিয়েছে নদ্যার চাঁদ যেন তার মায়ের কাছে ফিরে যায়, সুন্দরী রমণী বিবাহ করে সে যেন সুখে দাম্পত্য জীবন ভোগ করে। মহুয়া নদের চাঁদকে যে কতখানি ভালবাসে তার প্রমাণ পাই যখন নদের চাঁদের শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ ভোগের জন্য সে নিজেকে দায়ী করে।

বরামণের পুত্র তুমি রাজার ছাওয়াল।
তোমার সুখের ঘরে আমি হইলাম কাল।।

কিন্তু নদ্যার চাঁদ নাছোড়বান্দা। সে স্পষ্ট জানিয়েছে, মহুয়াকে ছেড়ে তার পক্ষে দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। মহুয়ার কারণেই সে পিতামাতাকে ত্যাগ করেছে। এমনকি স্বেচ্ছায় সে জাতি খুইয়েছে মহুয়ারই জন্য। এর পরেও যদি মহুয়াকে লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে সে যেন তাকে ছুরিকাবিদ্ধ করে। এরপর মহুয়ার পক্ষে আর হুমরা বেদের ইচ্ছামতো চালিত হওয়া সম্ভব হয়নি। প্রেমিককে নিয়ে সে দেশান্তরি হওয়ার পরিকল্পনা করেছে। কিছু পথ হুমরা বেদের ঘোড়ায় চড়ে অতিক্রম করেছে। কিন্তু তারপর সামনে পড়েছে নদী। এক বণিকের সহায়তা গ্রহণ করেছে নদী অতিক্রমণের ব্যাপারে। অসৎ প্রকৃতির সাধু মহুয়ার যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে তাকে লাভের আশায় কৌশলে নদের চাঁদকে নৌকা থেকে জলে ফেলে দিয়েছে। মহুয়া জলে ঝাঁপ দিতে গেছে, কিন্তু সাধুর কুটকৌশলে তার সেই প্রয়াস ফলবতী হয়নি। এরপর সাধু কতভাবে তাকে প্রলোভন দেখিয়েছে—প্রলোভন দেখিয়েছে বসন, ভূষণের. প্রলোভন দেখিয়েছে প্রাচুর্যের, সুখ সম্ভারের, কিন্তু যে মহুয়া তার সর্বস্ব সমর্পণ করে বসে আছে নদের চাঁদকে, সহজে তাকে প্রলুব্ধ করা সম্ভব হয় নি। মহুয়া অসহায়া, তাই বলে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিনাশ হয় নি। সে বুঝেছে এমন ষড়যন্ত্রের শিকার সে হয়েছে যেখান থেকে তার মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। অগত্যা সে প্রেমের অভিনয় করে বিষ মিশ্রিত পান খাইয়ে সাধু ও তার সঙ্গীদের অচৈতন্য করে নিজে জলে ঝাঁপিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। স্পষ্টতই আমরা বুঝতে পারি প্রেমের অমোঘ শক্তির সাহায্যেই মহুয়া সাধুর নিশ্ছিদ্র চক্রান্তের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শুরু হয়েছে তার নদের চাঁদের অনুসন্ধান পর্ব। বারবার তার নিজেকেই দোষী বলে মনে হয়েছে, কেননা তারই জন্য নদের চাঁদের কপালে এত দুঃখ। একবারও সে নিজের দুঃখ কষ্টের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেনি—

'আমার লাগিন ছাড়ল সে যে সুখের ঘর বাসা।
আমার লাগিন লইল নদীর কূলে বাসা।।'

এমনকি সাধু যে অসদাচরণ করেছে সে ব্যাপারেও মহুয়া নিজেকেই দায়ী সাব্যস্ত করেছে—

'দুষমন হইল সাধু আমার লাগিয়া।
পরাণ হারাইল বন্ধু জলেতে ডুবিয়া।।'

প্রেমের লক্ষণই এই যে সর্বদাই নিজের তুলনায় প্রেমিক বা প্রেমিকার দুঃখ কষ্ট বেদনাকে অনুভব করতে এবং সেজন্য নিজেকে দায়ী সাব্যস্ত করতে ইচ্ছা হয়। মহুয়া ভেবেছিল সত্যই বুঝিবা নদের চাঁদের মৃত্যু হয়েছে। নদের চাঁদহীন জীবনে তার কোনো আসক্তি ছিল না। তাই মহুয়া আত্মঘাতিনী হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কথায় বলে 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ'—জঙ্গলের মধ্যে কোনো একজনের কাতরোক্তি শুনে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখার প্রেরণা সে পেয়েছে। ভাঙ্গা মন্দিরে মৃতপ্রায় নদের চাঁদের হদিস মিলেছে। আকস্মিকভাবে বনমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছে মহুয়া। তার পায়ে পড়ে চোখের জলে তার মনকে দ্রবীভূত করে বন্য ভেষজের রসে সন্ন্যাসীর সহায়তায় নদের চাঁদকে বাঁচিয়ে তুলেছে সে। কিন্তু বেচারী মহুয়ার কপালে সুখ তো নেই—'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'।

ষোড়শী মহুয়ার উদ্ভিন্ন যৌবনই তার কাল। এরই জন্য সে ইতিপূর্বে সাধুর দৃষ্টিতে পড়েছিল। এখন আবার নদের চাঁদের প্রাণরক্ষাকারী রূপে যে সন্ন্যাসী আবির্ভূত হল, তাকেও দেখা গেল মহুয়ার দেহজ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তার প্রতি প্রেমভিক্ষা করতে—

'মুনি বলে 'কন্যা তুমি আমার কথা শুন দিয়া মন।
পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যইবন।।
তোমার রূপেতে আরে কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যুগ।
এমন ফুলের মধু করাও মোরে ভোগ।।'

আবার নতুন পরীক্ষা শুরু হল মহুয়ার। কিন্তু সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী সে নয়। সন্ন্যাসীকে সে জানিয়ে দিল আগে সে তার স্বামীকে তো বাঁচাক, তারপর না হয় সন্ন্যাসীর আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করা যাবে। মহুয়া বুঝলো সন্ন্যাসীর দৃষ্টি যখন তার উপর একবার পড়েছে, তখন তার আর রেহাই নেই। শেষপর্যন্ত অসুস্থ নদের চাঁদকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে মহুয়া গভীর রাতে পলায়ন করলো। দীর্ঘ ছয় মাসের সেবা শুশ্রূষায় অসুস্থ নদের চাঁদ সুস্থ হল। লোককবি সংক্ষেপে হলেও অত্যন্ত ব্যঞ্জনামণ্ডিত করে নদের চাঁদের জন্য মহুয়ার উদ্বিগ্নতার এবং সেবাপরায়ণতার চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন—

'নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায লাগল কাঁটা
বাদ্যার ছেরি মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা।।
নদ্যার চাঁদের জ্বর উঠ্ছে মাথায় বেদনা তাত।
বাদ্যার ছেরি কাছে বস্যা শিরে বোলায় হাত।।

কিছুদিন মনের সুখে দুজনে দাম্পত্য জীবনযাপন করে প্রকৃতির বুকে, নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু এ সুখভোগ যে হতভাগিনী মহুয়ার কপালে লেখেনি, তাই

তাদের সন্ধান করে প্রতিহিংসাপরায়ণ হুমরা বেদে অকুস্থলে হাজির হয়েছে। পালং সই বাঁশি বাজিয়ে মহুয়াকে হুমরা বেদের উপস্থিতি জানিয়ে দিয়েছে। মহুয়া আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। না পাওয়ার বেদনা যত, সে তুলনায় পেয়ে হারানোর বেদনা তীব্রতর। দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনের পর সবে মহুয়া তার বহু অভিলষিত নদের চাঁদকে নিয়ে সুখের বাসর সজ্জা সাজিয়েছিল—তা ভেঙে যাবার সম্ভাবনায় স্বভাবতই সে বিকলচিত্ত হয়ে পড়েছে। লোভী সাধু এবং সন্ন্যাসীর হাত থেকে যে মহুয়া রক্ষা পেয়েছে, রক্ষা করেছে নদের চাঁদকে, কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ হুমরা বেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো আশা সে দেখেনি। নিরুৎসাহে আশাভঙ্গে সে বিলাপ করে উঠেছে—

'আইজ নিশি থাকরে বন্ধু আমার বুকে শুইয়া।<br>
আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়া।।<br>
বনের খেলা সাঙ্গ হল যাব যমের দেশ।<br>
এই কথা কহি আমি শুনহ বিশেষ।।'

মহুয়ার আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছে। হুমরা বেদে মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে বিষলক্ষের ছুরি নিয়ে হাজির হয়েছে মহুয়ার কাছে। তার নির্দেশ, তার পালক পুত্র সুজনকে বিবাহ করতে হবে এবং তৎপূর্বে স্বহস্তে নদের চাঁদকে ছুরিকাঘাত করতে হবে। এর উত্তর কি তা আমাদের জানা। পালক পিতার নির্দেশ পালন অপেক্ষা মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গন লাভ করাই ছিল মহুয়ার পক্ষে অধিকতর কাম্য। তাইই সে করেছে--

'কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।<br>
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি।।'

মহুয়া কোনোমতেই নদের চাঁদের তুলনায় হুমরা বেদের পালক পুত্র সুজনকে উৎকৃষ্টতর পাত্র বলে মেনে নেয়নি, নেওয়া সম্ভবও ছিল না। কেননা নদের চাঁদ যে তার প্রেমের দেবতা, তার থেকে বড় কি আর কেউ হতে পারে? মহুয়া প্রেমের মর্যাদা রক্ষার্থে আত্মঘাতিনী হয়েছে।

**মাতৃচরিত্র**

আমরা সকলেই ময়মনসিংহ গীতিকার প্রসঙ্গে মূলত: প্রেমিকা চরিত্রগুলির উপরে স্বাভাবিক কারণে গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। কাব্যে উপেক্ষিতার মতো আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায় অভাগিনী জননী চরিত্রগুলি। সীমাহীন মমত্ববোধের প্রতীক, নিঃস্বার্থপরতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি সন্তানগতপ্রাণা জননীরা। সম্পূর্ণ অকারণে সন্তানের কারণে যে অন্তহীন দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়েছে তারা সেই বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করি না। যে সন্তানকে তারা কত যত্নে কত কৃচ্ছ্রসাধনে লালন পালন করেছে, প্রেমের অমোঘ আকর্ষণে তারা সহজে জননী হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করে অভিলষিতজনের উদ্দেশে যাত্রা করেছে, মাতার মনোকষ্ট, মানসিক আঘাত কোনোকিছুরই গুরুত্ব তারা দেয় নি। আমরা প্রসঙ্গতঃ মহুয়া পালায় উপস্থাপিত নদের চাঁদের অভাগিনী জননীর

প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে পারি। 'মহুয়া'র তৃতীয় সর্গে নদের চাঁদ বেদের খেলা দেখাবার আয়োজন প্রসঙ্গে মাতৃ আদেশ যাচঞা করেছে—

'তোমার আদেশ পাইলে মাগো আর না কিছু চাই।
আদেশ যদি করো মাগো তাম্‌সা করাই।।

কিন্তু মায়ের প্রতি নদের চাঁদের এই ভক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মহুয়া দর্শনের পর থেকেই সে যখন মহুয়াগত প্রাণ হয়ে উঠেছে তারপর মায়ের জন্য তার আন্তরিকতা আর তেমনভাবে লক্ষিত হয়নি। মহুয়া যখন কৌশলে জানতে পেরেছে যে নদের চাঁদ অবিবাহিত, তখন সেজন্য সে দোষারোপ করেছে নদের চাঁদের পিতামাতাকে। নদের চাঁদও সেই অভিযোগকে দিব্বি মেনে নিয়েছে পাছে মহুয়া রুষ্ট হয়। তাই সে কোনো প্রতিবাদ করেনি।

'কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।'

মহুয়া তার পালক পিতা হুমরা বেদের সঙ্গে যখন বামনকান্দা গ্রাম পরিত্যাগ করে গেছে তখন তার বিরহে কাতর নদের চাঁদ গৃহত্যাগী হয়েছে। জননীর প্রতি সে মিথ্যাচরণ করেছে। বলেছে সে তীর্থ কবতে দেশান্তর যাচ্ছে। তার বিদেশ গমনের ব্যাপারে তার জননী যেন বাধা না দেয়, নদের চাঁদ একটিমাত্র সন্তান তাই তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা জননীর পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। সে জানিয়েছে নদের চাঁদ শুধু তার পুত্র নয়, তার আঁখি তারার সদৃশ। আঁখি তারা ব্যতিরেকে আমরা যেমন অন্ধ হয়ে যাই তেমনি পুত্র বিনা তার জীবন্মৃত অবস্থা হবে। তার ভাষায়—

'তিলেক দণ্ড না দেখিলে হই যে পাগল পারা।।'

পুত্রশোকে তার আত্মঘাতিনী হওয়া ছাড়া যে গতি থাকবে না অকপটে তাও প্রকাশ করেছে—

'তোমারে না দেখিলে পুত্র গলে দিবাম কাতি।।'

জননী নদের চাঁদকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কত কষ্টে সে তার সন্তানকে পালন করেছে—

'আধপিঠ খাইলো মায়ের গুয়ে আর মুতে।
আধপিঠ খাইলো দারুণ মাঝ মাস্যা শীতে।।"

অর্থাৎ ছেলেকে পালন করতে গিয়ে তার মলমূত্রে জননীর অর্ধেক পৃষ্ঠদেশ ক্ষয় হয়েছে। তাছাড়া মাঘ মাসের শীতেও সন্তানের জন্য তাকে কম ক্লেশ স্বীকার করতে হয়নি। বিদেশে যদি সন্তান মারা যায় তবে সেই সংবাদ আর কেউ না জানুক অভাগিনী জননীর হৃদয় ঠিকই টের পেয়ে যায়। করুণ কণ্ঠে নদের চাঁদের জননী নিবেদন করেছে—

'পরবুধ না মানে পরাণ কেম্‌'ন থাকবাম ঘরে।
তুমি পুত্র ছাড্যা গেলে আমি যাইয়াম মইরে।।'

কিন্তু মাতার কোন কাকুতি-মিনতি কার্যকরী হয়নি। নদের চাঁদ তার সিদ্ধান্তে অবিচল। সে গভীর রাতে জননী যখন নিদ্রাচ্ছন্ন তখনই গৃহত্যাগী হয়েছে মহুয়ার

কারণে।

হুমরা বেদে মহুয়ার সঙ্গে নদের চাঁদের মিলনের ব্যাপারে তখন তীব্র বিরোধিতা করেছে, এমনকি মহুয়ার হাতে বিষ মাখানো ছুরি তুলে দিয়েছে তাকে হত্যা করার জন্য, তখন মহুয়া নদের চাঁদকে অনুরোধ করেছে মায়ের সন্তান মায়ের বুকে যেন ফিরে যায়। মহুয়ায় আসক্ত নদের চাঁদ কিন্তু মহুয়ার এই পরামর্শে কর্ণপাত করেনি। সে ঘোষণা করেছে—

'তোমায় যদি না পাই কন্যা আর না যাইবাম বাড়ী।'

এরপর যখন দুশ্চরিত্র সাধুর চক্রান্তে তার ডিঙি থেকে নদের চাঁদ জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, মৃত্যু আসন্ন ভেবে নদের চাঁদ বিলাপ করে বলেছে—

'না দেখিল বাপে আরে না দেখিল মায়।
পড়িয়া দুষমনের হাতে আমার প্রাণ যায়।।'

তখনই তার মৃত্যু না হলেও পরবর্তীকালে হুমরা বেদের আদেশে তার সঙ্গীরা নদের চাঁদকে হত্যা করেছে। গীতিকায় অবান্তর বিবেচনায় লোককবি নদের চাঁদের অনুপস্থিতিতে তার মায়ের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার ।ববরণ কখনই দেন নি, কিন্তু আমরা তা সহজেই অনুমান করতে পারি।

মাতাপিতার প্রসঙ্গে মহুয়ার মাতাপিতার দুর্ভাগ্যের কথাও উল্লেখ করতে হয়। মাত্র ছয় মাস বয়সেই হুমরা বেদে কর্তৃক মহুয়া অপহৃত হয়েছিল। মহুয়া নিজেকে জনম দুখিনী বলে অভিহিত করেছে। সে জনমদুখিনী ঠিকই কিন্তু তার জননীও কি এই বিশেষণে বিশেষিত হবার যোগ্য নয়? আত্মঘাতিনী হবার অব্যবহিত পূর্বে মহুয়া হুমরা বেদেকে তীব্র ভাষায় অভিযুক্ত করে গেছে—

'শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায়।।
ছুটকালে মা ও বাপের কুল শূন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইরেছিলে চুরি।।'

'মহুয়া' গীতিকায় মহুয়ার পিতামাতার প্রসঙ্গ সরাসরি আসেনি। মহুয়ার মাধ্যমেই তাদের দুর্ভাগ্যের কথা আমরা জেনেছি। এক দিক দিয়ে নদের চাঁদের জনক-জননীর সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য। নদের চাঁদ তার মা ও বাপকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। অপর পক্ষে মহুয়া অপহৃতা নারী ছিল। সন্তান হারানোর বেদনা দুই মাতা পিতাকেই যে বিশেষভাবে দগ্ধ করেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

## মলুয়া

কুড়া শিকার করতে গিয়ে চাঁদ বিনোদের সঙ্গে মলুয়ার দেখা হল, দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হল। কিন্তু আর্থিক অবস্থা চাঁদের তেমন নয়, তাই মলুয়ার সঙ্গে তার বিবাহ হল না। চাঁদ পরিশ্রম করে তার আর্থিক অবস্থার

উন্নতি ঘটালে আর বিবাহে কোন বাধা থাকল না। কিন্তু বিধি বাম। মুসলমান কাজী মলুয়াকে দেখে তাকে পেতে চাইল, নানাভাবে মলুয়াকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে কাজী অন্য পথ নিল। বিবাহের সময় চাঁদ বিনোদ দেওয়ানকে 'নজরানা' দেয়নি, এই অজুহাতে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য চাঁদ বিনোদ গেল বিদেশে। প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে মলুয়া ও তার শাশুড়ীর দিন কাটে। কাজী দেওয়ানের কাছে চাঁদ বিনোদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল, তার গৃহে সুন্দরী রমণী থাকার কারণে এবং তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেওয়ানকে সমর্পণ না করায় বিনোদের প্রাণ দণ্ডাদেশ হল। মলুয়ার প্রয়াসে তার ভায়েরা বিনোদকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল বটে, কিন্তু রক্ষা পেল না মলুয়া, দেওয়ান সাহেব তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। মলুয়া এরপর বুদ্ধি করে দেওয়ানকে দিয়ে কাজীকে শাস্তি দিইয়েছে আর কৌশলে শিকারের বুদ্ধি দিয়ে দেওয়ানের হাত থেকে নিজেও মুক্তি পেয়েছে। এতেও কিন্তু বাঞ্ছিত সুখ বেচারীর মিলল না। সর্প দংশনে চাঁদ বিনোদের মৃত্যু হলে মূলতঃ মলুয়ার প্রয়াসে সে জীবন ফিরে পেয়েছে। অথচ বিনোদের মামার আপত্তিতে মলুয়া বিনোদ কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছে। শেষপর্যন্ত স্বামীর মুখ চেয়ে মলুয়া ভাঙ্গা নৌকায় পাড়ি জমিয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে।

মলুয়ার পতি ভক্তি, কর্তব্যবোধ, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ বরণই পালাটির মুখ্য আকর্ষণ সন্দেহ নেই এবং তার তুলনায় চাঁদ বিনোদ পালাটির নায়ক অত্যন্ত নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। লোকাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করে যে ভাবে সে তার সতী সাধ্বী ও জীবন রক্ষাকারিণী স্ত্রীকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তাতে সে নিজেকে কলঙ্কিত ও ক্ষুদ্র স্বার্থের দাসে পরিণত করেছে। মলুয়া চরিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা পালাটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করে নিতে পারি।

শাশুড়ী ও ননদের সঙ্গে মলুয়ার যে মধুর ও প্রীতিঘন সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, বাস্তবিকই তা বিরল, বিশেষতঃ বাংলা ছড়ায় আমরা এর বিপরীত চিত্রই লক্ষ করি। কবি বলেছেন :—

বাড়ীর শোভা বাগ বাগিচা ঘরের শোভা বেড়া।
কূলের শোভা বউ—শাশুড়ীর বুক জুড়া।।

আত্মঘাতিনী হতে চলেছে যখন মলুয়া, তখন তার উদ্দেশে শাশুড়ীর আহ্বান—

শুন গো পরাণ বধূ কইয়া বুঝাই তরে।
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে।।

ননদিনীর আবেদনেও সেই বিরল সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে—

শুন শুন বধূ ওগো কইয়া বুঝাই তরে।
ভাঙ্গা নাও ছাইড়া তুমি আইস মোদের ঘরে।।

অবশ্য একথা ঠিকই, শাশুড়ী ননদ যদি কিছু আগে তাদের যোগ্য ভূমিকা পালন করত, বিনোদের মামার দুরভিসন্ধিমূলক নির্দেশকে বাতিল করায় সক্রিয় ভূমিকা নিত, তবে

বেচারী মলুয়ার জীবন ব্যর্থ হত না। মলুয়ার জীবন ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে মূলত: দায়ী চাঁদ বিনোদ, সেই সঙ্গে শাশুড়ী ও ননদও তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

চাঁদ বিনোদ মলুয়ার পিত্রালয়ে আতিথ্য গ্রহণ করলে তাকে যে বিভিন্ন আহার্য দ্রব্যের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়েছে, তা থেকে সেকালের রন্ধন বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানা যায়। কবি, মলুয়ার সঙ্গে চাঁদ বিনোদের সাক্ষাৎকারটি ঘটিয়েছেন অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে, ক্রমে ক্রমে উভয়ের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে এরপর। গীতিকায় প্রায়ই দেখা যায় চরিত্রগুলি তাদের মনোবাসনা প্রকাশ করে থাকে চাঁদ, সূর্য, বৃক্ষ অথবা ইতর শ্রেণীর পশু-পক্ষীকে সম্বোধন করে। আলোচ্য পালায় দেখি নিদ্রিত চাঁদ বিনোদকে জাগ্রত করতে মলুয়া অনুরোধ করেছে তার সঙ্গের পিতলের কলসীকে, অপরপক্ষে মলুয়ার পরিচয় প্রকাশ করার জন্য চাঁদ বিনোদ অনুরোধ করেছে কুড়াকে।

গীতিকায় রামায়ণের প্রভাব সীমিত পরিসরেই লক্ষিত হয়। আলোচ্য পালায় দুটি অলঙ্কারে রামায়ণের প্রভাব পড়েছে দৃষ্ট হয়। দেওয়ান কর্তৃক অপহৃতা হয়েছে মলুয়া। এই প্রসঙ্গে কবির বর্ণনা—

শূন্য ঘর পইড়্যা রইছে নাহিক সুন্দরী।
রাবণে হরিয়া নিছে শ্রীরামের নারী।।

পুনরায়, সোয়ামী সহিত মলুয়া যায় বাপের বাড়ী
ছীরাম উদ্ধার করে যেন আপনার নারী।।

সৌন্দর্য, বিশেষ চরিত্র কিংবা বিশেষ সম্পর্কের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণে গীতিকায় বিশেষ এক ধরনেব টেকনিক অবলম্বিত হতে দেখা যায়, এই টেকনিক ছড়া ও লোকসঙ্গীতে অবশ্য বহুল ব্যবহৃত। আলোচ্য পালায় দীর্ঘ বিচ্ছেদ বেদনার পর বহু অভিলষিত নায়ক-নায়িকার মিলনকে বর্ণনা করা হয়েছে এই টেকনিকের সাহায্যে—

মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল।।
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ।
তার থাকা মিঠা যখন ভরে খালি বুক।।
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন।
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন।।

পুনরুক্তি লোকসাহিত্যের এক অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষত: গীতিকার ক্ষেত্রে এর প্রাচুর্য লক্ষিত হয় এবং তা মূলতঃ স্মৃতিকে ভার মুক্ত করার প্রয়োজনে। কাজী নেতাই কুটুনিকে বলেছে—

সোনা দিয়া বেইরা দিবাম, সর্বাঙ্গ শরীর।
সাত খুন মাপ তার বিচারে কাজীর।।
সোনার পালঙ্ক দিবাম সাজুয়া বিছান।
গলায় গাথিয়া দিবাম মোহরের থান।

নেতাই কুটুনি মলুয়াকে প্রায় হুবহু এই কথাগুলিই বলেছে—

সোনা দিয়া বেইরা দিব সর্বাঙ্গ শরীর।
সাত খুন মাপ তোমার বিচারে কাজীর।।
সোনার পালঙ্ক দিব সাজুয়া বিছান।
গলায় গাথিয়া দিব মোহরের থান।।

একটি ক্ষেত্রে কবি বাগ্‌ধারা প্রয়োগ করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। কুটুনি মলুয়াকে তার অবস্থার বৈগুণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় কাজীকে বিবাহ করার প্রস্তাব বিবেচনা করতে বললে মলুয়া বলেছে—

কাটা গায়ে লুনের ছিটা আর কত সয়।।

অলংকারে কবি প্রায়শই মহুয়া, পদ্ম, রক্তজবা ইত্যাদিকে উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অপরপক্ষে দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় চাঁদকে উপমানের ভূমিকায় দেখা গেছে অনেকবার।

### মলুয়ার চরিত্র

মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত পালাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। প্রথম দর্শনেই নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রেমে আসক্ত হয়েছে। গীতিকার সীমিত পরিসরে উপন্যাসের মতো নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগের বিবরণ বিস্তৃততর পরিসরে উপস্থাপিত হয় নি, হওয়ার অবকাশও ছিল না। স্বভাবতই মনে হতে পারে নায়ক এবং নায়িকার দুটি উন্মুখ হৃদয় যেন পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়ার জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। 'মহুয়া'য় বর্ণিত হয়েছে মহুয়ার খেলা দেখতে গিয়ে নদের চাঁদ তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। 'মলুয়া'য় দেখা গেছে বিনোদ শিকারে বেরিয়ে কদমতলায় নিদ্রিতাবস্থায় যখন পড়েছিল তখন তাকে দেখে মলুয়া যাকে বলে প্রথম দর্শনেই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। 'মহুয়া'য় পাছে খেলা দেখাতে গিয়ে মহুয়ার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে সেইজন্য নদের চাঁদ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। লোককবি এর মাধ্যমে যেমন মহুয়ার প্রতি নদের চাঁদের দৌর্বল্যকে প্রকাশ করেছেন, তেমনি 'মলুয়া'য় নিদ্রিত বিনোদের কারণে মলুয়াকে চিন্তাগ্রস্ত করে তার দৌর্বল্যকে সূচিত করা হয়েছে। বিনোদের পরিচয় তার কাছে জানা নেই তথাপি তার জন্য কতই না দুশ্চিন্তা।

'রাত্রি নিশাকালে যদি ভাঙ্গে নিদ্রা তার।
ভিনদেশী পুরুষ বল যাইবে কোথায় আর।।
বাড়ী নাই ঘররে নাই, নাই বাপ মাই।
রাত্রি পোহাইতে কেবা দিব একটুক ঠাঁই।।'

মলুয়ার বড় ইচ্ছা করছিল বিনোদের পরিচয় জানতে, তার ঠিকানার সন্ধান করতে। কিন্তু যতই হোক সে রমণী, কথায় বলে 'বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না'।

'মনে লয় পুরুষে আমি জাগাই ডাকিয়া।
বাপের বাড়ীর পথ আমি তারে দেই দেখাইয়া।।'

একি শুধুই অসহায় ভিনদেশী এক পথিকের প্রতি করুণা প্রদর্শন নাকি আর কিছু! এর জবাব সুস্পষ্ট ভাবেই মিলেছে।

'একলা অবলা আমি কুল মানের ভয়।
পন্থ-হারা ভিনপুরুষের দুঃখ নাহি সয়।।'

এরপরই সে তার জল ভর্তি করে নিয়ে যাবার জন্য আনীত কলসীকে অনুরোধ করেছে নিদ্রিত বিনোদকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য। কলসীতে জল ভরার শব্দে নিদ্রাভিভূত বিনোদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে। চোখ মেলে তাকিয়েই সে কি দেখেছে? দেখেছে মেঘের বরণ কন্যা মলুয়াকে। যার মাথার চুল লুটচ্ছে, চোখ দুটি ডাগর, তার উপলব্ধিতে—

'এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন।
তার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন।।'

এতক্ষণ নিদ্রিত বিনোদের পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল মলুয়া। এইবার দেখা গেল মলুয়ার পরিচয় জানার জন্য বিনোদকে ব্যাকুল হতে।

'কার বা নারী কার বা কন্যা কোথায় বাড়ী ঘর।
উইরে যাওরে বনের কুড়া আন গিয়া উত্তর।।'

কুড়া শিকার করতে এসে সে নিজেই প্রেম শরে বিদ্ধ হলো। কিন্তু আপাতত সে প্রসঙ্গের কথা মূলতুবি রেখে আমরা মলুয়ার প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি। মলুয়া জল ভরে বাড়ী এসেছে ঠিকই, কিন্তু মনটি রেখে এসেছে কদমতলায় যেখানে বিনোদ অবস্থান করেছে। তার বিক্ষিপ্ত মানসিকতার পরিচয় ধরা পড়ে গেছে তার পাঁচ ভাজের কাছে। বিনোদের সঙ্গে তার এখনও পর্যন্ত বাক্যালাপ হয়নি, তাতেই সে বিনোদের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। নিজের বেশবাসের প্রতি নজর নেই, জল ভরতে গিয়ে সে আধ কলসী জল নিয়েই ফিরে আসে। পাঁচ ভাজের অনুরোধ সত্ত্বেও সে তাদের সঙ্গে পুকুর ঘাটে যায় না, একা যেতেই তার আগ্রহ। শয্যায় শায়িত অবস্থায় নিষ্পলক চোখে বিনোদের জন্য ভাবনায় সারা হয় মলুয়া। বয়স তার মাত্র বারো, হৃদয় দানের ব্যাপারে সে বয়সোচিত চাপল্য দেখিয়েছে। বর্ষাকালে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে আর সেই কারণে সে বড় বেশি চিন্তিত কদমতলার অপরিচিত মানুষটির জন্য।

'গাং ভাসে নদী ভাসে শুকনায় না ধরে পানি।
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি।।'

মনে মনে ভেবেছে সে যদি তার-বাড়ীতে অতিথি হতো তবে—

'আইত যদি সোনার অতিথ যৌবন করতাম দান।'

স্নান করার ছুতোয়, জল আনার ছুতোয়, মলুয়া একাকিনী ঘাটে যায় কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য বিনোদের দর্শন লাভ। লোককবির ভাষায়—

'কিসের ছান কিসের পানি কিসের জল ভরা।
দুইয়ের প্রাণে টান পইড়াছে এমন প্রেমের ধারা।।'

চাঁদ বিনোদও তার প্রতীক্ষায় ছিল, সরাসরি সে মলুয়ার পরিচয় জানতে চেয়েছে। মলুয়া মুখে যদিও বিনোদকে ভিনদেশী পুরুষ বলে অভিহিত করেছে, তথাপি যেহেতু এই পুরুষকেই সে মন প্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে, তাই রাত্রে তাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের আবেদন জানিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের গৃহে অবস্থানের কথা জানিয়েছে, জানিয়েছে অনুকূল আতিথ্য লাভের সম্ভাবনার কথাও। যদিও এই প্রথম বিনোদের সঙ্গে তার বাক্যালাপ, কিন্তু সেই সুযোগেও মলুয়া বিনোদের জন্য দুশ্চিন্তার কথা গোপন রাখতে পারেনি।

'বনে আছে বাঘ-ভালুক তোমার ভয় নাই।
এমন কইরা কেমনে তুমি ফির ঠাই ঠাই।।
আন্ধুয়া পুষ্কনির পাড় কালনাগের বাসা।
একবার ডংশিলে যাইব পরাণের আশা।।'

এদিকে মলুয়ার বিবাহের নানা সংবাদাদি আসতে থাকে, নানা কারণে কোনো পাত্রই মনোমত হয় না। চাঁদ বিনোদের সঙ্গে মলুয়ার বিবাহের প্রস্তাব এল কিন্তু তার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে মলুয়ার সঙ্গে তার বিবাহদানের বিষয়টি বাতিল হয়ে গেল। বিনোদও নাছোড়বান্দা। কঠিন পরিশ্রমে সে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলল। তারপর আর মলুয়ার সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে মলুয়াদের বাড়ীর তরফে কোনো বাধা রইল না। দুটি বুভুক্ষু হৃদয়ের মিলন ঘটলেও বিনোদের তুলনায় মলুয়াকে দেখা গেছে অনেক বেশি সংযমী এবং সাবধানী। মনের মতন স্বামী জুটলো বটে কিন্তু বেচারীর সুখী দাম্পত্য জীবন ভোগ করা কপালে ছিল না। কাজীর নজরে পড়ে গেল সে। আর যায় কোথায়। মলুয়াকে পাওয়ার জন্য সে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলো। কার্য সিদ্ধির জন্য সে নিযুক্ত করলো কুটনিকে। মলুয়া নাবালিকা কিন্তু সতীত্ববোধের বিচারে এবং বিনোদের প্রতি আনুগত্য এবং ভালবাসার পরিপ্রেক্ষিতে তার মানসিক সাবালকত্ব আমাদের অভিভূত না করে পারে না। কুটনি তাকে লোভ দেখিয়েছে কাজীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে কাজী তার সর্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে ভরিয়ে দেবে, তার জীবনযাত্রা হয়ে উঠবে স্বাচ্ছন্দ্যময়। ঘাটে একাকিনী ছিল বলে কুটনির প্রস্তাবের বিরোধিতা করার সাহস হয়নি মলুয়ার। বাড়ী ফিরেই কিন্তু এই একরত্তি মেয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে যেন শুরু হয়েছে অগ্ন্যুৎপাত। কু-প্রস্তাব নিয়ে আসা কুটনিকে সে বলেছে—

'স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবাম তরে।
থাকিলে মারিতাম ঝাঁটা তর পাক্‌না শিরে।।

... ... ...

কূল বেচ্যা খাইছ তুমি বয়সের কালে।
সেই মত দেখ বুঝি নাগরিয়া সকলে।।

শুধু কুটনিকে ভর্ৎসনা করেই সে নিশ্চুপ থাকেনি, তার স্বামী যে তার কাছে কতখানি তাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, জানিয়ে দিয়েছে সবদিক দিয়ে তার স্বামীর তুলনায় কাজী কতই অকিঞ্চিৎকর ও অনভিজ্ঞ—

'আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান।
না হয় দুষমন কাজীর নউখের সমান।
... ... ...
বাচ্যা থাকুন সোয়ামী আমার লক্ষ পরমাঈ পাইয়া।
থানের মোহ ভাঙ্গি কাজীর পায়ে লাথি দিয়া।।
আমার স্বামী কাঞ্চা সোনা অঞ্চলের ধন।
তার সঙ্গে কাজীর সোনার না হয় তুলন।।'

প্রতিহিংসাপরায়ণ কাজী ছাড়বার পাত্র নয়। সেও যতদূর সম্ভব বিনোদের উপর দমন-পীড়ন চালিয়েছে। ভেবেছে অসহায় দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাটি তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু কাজী মলুয়াকে বুঝতে পারেনি। বিনোদের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ মলুয়া কোন প্রতিকূলতার কাছেই মাথা নোয়াবার পাত্রী নয়, যতই অভাব অনটন অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে তার মানসিক দৃঢ়তাও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিন্দুমাত্র দৌর্বল্য প্রকাশ পায়নি মলুয়ার আচরণে অথবা কথাবার্তায়। নিরুপায় বিনোদ সব খুইয়ে মলুয়াকে বাপের বাড়ী চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছে। বলেছে—

'মাও আছে বাপ আছে, আছে সোদর ভাই।
ভালবাস্যা রইবে তুমি তাহাদের ঠাই।।
কড়ার ভিখারী আমি রইবাম গাছের তলে।
অত দুঃখ তোমার নাহি সহিবে শরীলে।।'

কিন্তু এককথায় বিনোদের প্রস্তাব নাচক করে দিয়েছে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে মলুয়া। তার সোজা কথা--

'বাপের বাড়ীর যত সুখ বিয়া হইতেই গেল।।'

সীতা সতী সাধ্বী, রামচন্দ্রের চতুর্দশ বৎসর ব্যাপী বনবাসে তিনি স্বেচ্ছায় তার অনুগামিনী হয়েছিলেন। রাজকন্যা এবং রাজকুলবধূ হয়েও স্বেচ্ছায় দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর ব্যাপী বনবাসের কৃচ্ছ্রসাধনকে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু মলুয়ার কৃচ্ছ্রসাধন কি সে তুলনায় কোন অংশে কম। সেও তো সচ্ছল পরিবারেরই কন্যা। ইচ্ছা করলেই স্বামীর দুর্ভাগ্যের অংশীদার হওয়া থেকে দূরে সরে থাকতে পারত, কিন্তু তা সে পারে নি। সে স্পষ্টই জানিয়েছে—

'বনে থাক ছনে থাক গাছের তলায়।
তুমি বিনে মলুয়ার নাহিক উপায়।।
সাতদিনের উপাস যদি তোমার মুখ চাইয়া।
বড় সুখ পাইবাম তোমার চন্নামিতি খাইয়া।।

রাজার হালে থাকে যদি আমার বাপের বাড়ী।
মলুয়া নহে তো সেই সুখের আশারী।।
শাক ভাত খাই যদি গাছতলায় থাকি।
দিনের শেষে দেখলে মুখ হইবাম সুখী।।
পিরিথিমির সুখ মোর তোমার পায়ের ধূলা।
বাপের বাড়ী না যাইবাম আমি ত একেলা।।'

আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে উচ্ছ্বাসে গা ভাসিয়ে আমরা অনেক সময় অনেক কথা বলি, উদারতার পরিচয় দিই, আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা প্রকাশ করি কিন্তু প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হয় বাস্তব পরিবেশে। শুরু হয়েছে মলুয়ার চরম কৃচ্ছ্রসাধন, আদর্শের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠার পরীক্ষা, নিদারুণ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়েছে সে, একে একে সে বিক্রয় করেছে নাকের নথ, গলার মোতির মালা, পায়ের খাড়ু, বাঁধা দিয়েছে হাতের বাজু, বিক্রয় করেছে পরিধানের পাটের শাড়ী, কানের ফুল, অঙ্গের সোনাদানা সবকিছু। শতছিন্ন বস্ত্র তার পরিধানে। অন্নাভাবে তার উপবাস চলতে থাকে। কিন্তু নিজের চরম কষ্টের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই, তার যত দুঃখ তার স্বামী আর শাশুড়ীর দুঃখের জন্য—

'দেখিয়া সোয়ামীর মুখ বুক ফাট্যা যায়
আপনি উবাস থাক্যা পরে নাহি কয়।।
সোয়ামী-শাশুড়ীর দুঃখ আর কত সয়।'

বিপদের দিনে আবার মলুয়ার একমাত্র অবলম্বন তার স্বামী চাঁদ বিনোদ তাকে না জানিয়েই নিরুদ্দেশ হয়। বিনোদের অনুপস্থিতিজনিত সুযোগে হাজির হয়েছে শয়তান কাজী। পুনরায় সে নেতাই কুটনিকে কাজে লাগিয়েছে। নেতাই কুটনি নানা প্রলোভনে মলুয়াকে প্রলুব্ধ করেছে। মলুয়া কিন্তু তার সিদ্ধান্তে অবিচল। কুটনির সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে সতী-সাধ্বী মলুয়ার দৃঢ়তার কাছে।

'আন্ধাইরে কাটিব আমি দুঃখের দিবা রাতি।
কাজীরে কহিও তার মুখে মারি লাথি।।'

মলুয়ার জননী, কন্যার অপরিমেয় দুঃখের কথা অবহিত হয়ে মলুয়ার পাঁচ ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে মলুয়াকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য। পিত্রালয়ের প্রাচুর্যের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে তার চরম দুরবস্থার তুলনা করে মলুয়ার ভায়েরা বিলাপ করেছে :

'পঞ্চ বইয়ের অঙ্গে নাহি ধরে সোনা।
তোমার অঙ্গ খালি দেখ্যা হইয়াছি ফানা।।
অঙ্গেতে মৈলান বসন শত জোরাতালি।
ধূলা মাটী লাগ্যা বইনের অঙ্গ হইছে কালি।।
খালি ভূমে পইরা বইন শুইয়া নিদ্রা যায়।
শীতল পাটি ঘরে দেখ তুল্যা রাখছে মায়।।

ঘুমাইতে না পার বইন মশার কামরে।
আবের পাঙ্খা ঝালুয়াইর মশইর টাঙ্গাইল তোমার ঘরে।।
ভাত ফালাইয়া ভাত খাও বাপের বাড়ী।
উবাস কইরাছ বইন শুন্যা দুঃখে মরি।।'

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও পাঁচ পাঁচটি ভায়ের আগ্রহাতিশয্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছে মলুয়া। সে জানিয়েছে তার শ্বশুর বাড়ীই তার কাছে গয়া কাশী বৃন্দাবনের সমান। তাছাড়া স্বামীর ভিটেতে থাকার অন্যবিধ কারণেরও সে উল্লেখ করেছে।

'পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে দেখ্যা তারার মুখ।
কিছু ত মায়ের তবু ঠাণ্ডা রইব বুক।।
বুড়া শাশুড়ী আমার পুত্র নাই ঘরে।
কি দেখ্যা মায়ের কও এই দুঃখু পাশরে।।'

আমরা বাংলা ছড়া প্রবাদে সচরাচর শাশুড়ী-পুত্রবধূর মধ্যেকার বিষতিক্ত সম্পর্কই প্রত্যক্ষ করি। মলুয়া পালায় এর বিরল ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। পুত্রের অনুপস্থিতিতে হতভাগিনী বিনোদ-জননীর সেবায় মলুয়া নিজেকে উৎসর্গ করে তার বিরল কর্তব্যপরায়ণতার পবিচয় রেখেছে। মলুয়ার অপার কষ্টসহিষ্ণুতার কিছু ইঙ্গিত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। পরে তার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সে নির্ভর করেছে সূতা কাটার উপর, ধান ভানার উপর। কিছুকাল পরে বিদেশ থেকে কিছু উপার্জন করে নিয়ে বিনোদ গৃহে ফেরে। কিন্তু তথাপি হতভাগিনী মলুয়ার দুঃখ ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটলো না। কাজী অন্যভাবে মলুয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রয়াসী হল। দেওয়ান সাহেবকে দিয়ে মলুয়ার উপর দাবি জানিয়েছে। বিনোদ দেওয়ানের হাতে মলুয়াকে তুলে দেয়নি এই অপরাধে শুরু হয়েছে বিনোদের উপর অত্যাচার। বিনোদকে বন্দী করা হয়েছে। তাকে জীবন্ত কবর দেবার আয়োজন যখন চলছে তখন মলুয়ার অবলম্বিত কৌশলেই তার পাঁচ ভাই সেই সংবাদ অবহিত হয়ে বিনোদকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এদিকে মলুয়াকে এনে হাজির করা হয়েছে দেওয়ান সাহেবের কাছে। কতভাবেই দেওয়ান সাহেব মলুয়াকে তার প্রতি আসক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

'আরাম খানা খাইয়া বস পালঙ্ক উপরে।
পিত্থিমীর সুখ আইন্যা দিবাম তোমারে।।
দিল্লী হইতে আইন্যা দিবাম অগ্নি পাটের সাড়ি।
নাকের বেসর দিবাম তোমায় কাঞ্চা সোণায় গড়ি।
বান্দী দাসী আছে যত লেখা যুখা নাই।
অনুগত হইয়া তারা মানিবে ফরমাই।।'

কিন্তু মলুয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে দেওয়ানও হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সে জানিয়েছে যে সে এক বৎসরেব ব্রত পালনে রত। তার মধ্যে ন'টি মাস তার

অতিবাহিত হয়ে গেছে, ব্রত সমাপ্তির আর তিনটি মাস বাকি। এই তিনটি মাস সে কারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করবে না, এক জ্বালের রান্না গ্রহণ করবে, পালঙ্কের বদলে ভূতলে শয়ন করবে এবং পর পুরুষের মুখদর্শন করবে না। তিনটি মাস গত হলে সে দেওয়ান সাহেবের কাছে খবর পাঠাবে। দেওয়ানও মলুয়ার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে, অপেক্ষা করেছে তিনটি মাস। তিন মাস গত হলে দেওয়ান এসে উপস্থিত হয়েছে মলুয়ার কাছে। মলুয়া তখন অন্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। প্রথমেই সে তার আক্রোশ মিটিয়েছে কাজীর উপর। সে দেওয়ানকে বলেছে কাজী জীবিত থাকতে দেওয়ানের সঙ্গে তার মনের মিল সম্ভব নয়। কিছুতেই সে কাজীর অত্যাচার বিস্মৃত হতে পারছে না। অতএব দেওয়ানের নির্দেশে কোটাল নিযুক্ত হয়েছে কাজীকে শূলে দেবার জন্য। এরপর মলুয়া জানিয়েছে সে কোড়া শিকারে যেতে ইচ্ছুক। সেজন্য উপযুক্ত জলযানের ব্যবস্থা করতে বলেছে। কৌশলে মলুয়া তাব ভায়েদের দ্বারা খবর পাঠিয়েছে। দেওয়ানের কামনা চরিতার্থতা লাভ করেনি। মলুয়া ভায়েদের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে। কিন্তু এত দুর্ভাগ্যের পরেও মলুয়ার সুখভোগ আর সম্ভব হয় নি। তার আত্মীয় পরিজন তার সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। বিজাতীয় দেওয়ানের বাড়ীতে তিনটি মাস তার অবস্থান সুনজরে দেখা হয় নি। বিনোদের মামা, পিসেমশাই প্রভৃতি পরামর্শ দিয়েছে বিনোদকে প্রায়শ্চিত্ত করে সে যেন জাতে ওঠে এবং মলুয়াকে যেন চিরতরে ত্যাগ করে সে। তার পাঁচ ভাই মলুয়াকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার কথা বললে মলুয়া তাতে সম্মত হয় নি। স্বামী পরিত্যক্তা হয়েও সে দাসীরূপে স্বামীর গৃহে থাকবার অভিলাষ জানিয়েছে।

'বাইর কামুলী হইয়া আমি থাকবাম সোয়ামীর বাড়ী।
গোবর ছিড়া দিয়াম আমি সকাল সন্ধ্যাবেলা।
বাইরের যত কাম আমি করিবাম একালা।।

সত্যসত্যই বিনোদ পুনর্বার বিবাহ করেছে। সমাজের নির্দেশ মেনে ত্যাগ করেছে মলুয়াকে। পতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা মলুয়া এত অপমান এবং বিশ্বাসভঙ্গের পরেও স্বামীকে ত্যাগ করতে পারেনি। স্বামী শাশুড়ীর সেবা করেছে এবং সতীনেরও যত্ন করেছে। তার পাতিব্রত্যের পরীক্ষা এখনও বাকি। কোড়া শিকারে গিয়ে বিনোদ সর্প দংশনে মৃত্যু বরণ করলে মলুয়া বিলাপ করেছে—

'বাইরে থাকি বাইর কামুলী বাইরের কাম করি।
সোয়ামীর মুখ চাইয়া আমি সকল পাশরি।।
সেও সাধে বিধাতা মোর উড়াইল ছাই।
জীবন রাখিতে মোর আর ইচ্ছা নাই।।'

মলুয়া প্রাণ ত্যাগের সংকল্প করলেও আগে প্রয়াসী হয়েছে মৃত স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে। বেহুলার ঐকান্তিকতায় মৃত লখীন্দর যেমন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, মলুয়ার প্রয়াসে গাড়রী ওঝার সহায়তায় বিনোদকে প্রাণে বাঁচিয়েছে মলুয়া। এতেও কিন্তু তার নাকি সতীত্বের প্রমাণ হল না। বিনোদের মামা হুঁশিয়ার করে দিয়েছে

মলুয়াকে যে ঘরে স্থান দেবে সেই জাতিচ্যুত হবে। মলুয়া ভেবে দেখেছে সে জীবিত থাকতে তার স্বামীর দুঃখাবসান হবে না, কলঙ্কের অবসান হবে না, তাই সে আত্মহননের পথ অবলম্বন করতে মনস্থ করেছে। ভাঙা নৌকায় সে আরোহণ করেছে। মলুয়ার অশুভ পরিণতির আশঙ্কায় তাকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছে তার শাশুড়ী, তার ভাইয়েরা, তার স্বামী চাঁদ বিনোদ, কিন্তু কারও কোনো অনুরোধেই মলুয়া কর্ণপাত করে নি। এমনকি বিনোদ তাকে জানিয়েছে—

'ঘরে তুইল্যা লইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই।
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্মের দোহাই।।'

তথাপি আত্মীয় পরিজনের সমালোচনার হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করতে মৃত্যুকেই স্বীকার করে নিয়েছে মলুয়া। তার অকাল মৃত্যুর জন্য সে তার ভাগ্যকে দোষী সাব্যস্ত করলেও স্বামীকে কিন্তু বেকসুর মুক্তি দিয়েছে—

'খোটা উঁষ্ঠা যত দোষ আমার সকলি।
কপালে আছিল দুঃখ না যায় খণ্ডনে।
কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামী।।'

পাতাল প্রবেশের মধ্য দিয়ে সীতার অন্তহীন দুঃখভোগের সমাপ্তি ঘটেছিল। সলিল সমাধির মধ্য দিয়ে মলুয়ারও অন্তহীন জীবনের অবসান ঘটেছে।

## চন্দ্রাবতী

নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী' পালাটির প্রধান গুণ সংক্ষিপ্ততা। জয়ানন্দ এবং চন্দ্রাবতী উভয়ে উভয়কে ভালবেসেছিল, পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছিল। ঘটকের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে বিবাহ যখন স্থির, এমন সময়ে জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমাসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করে বসে। স্বভাবতই জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর আর বিবাহ হয় না। জীবনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হওয়ায় চন্দ্রাবতী আর বিবাহ করতে সম্মত হল না অন্যত্র, পিতার পরামর্শে সে শিব আরাধনায় ব্রতী হল, আর আত্মনিয়োগ করল রামায়ণ রচনায়। জয়ানন্দ তার ভুল বুঝতে পেরে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে শেষবারের মত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানিয়ে পত্র লিখল। চন্দ্রাবতী পত্রপাঠ বিশ্বাসঘাতক জয়ানন্দের অনুরোধ বাতিল করে দিতে পারত। কিন্তু যতই সে পূজার্চনায় রত থেকে জয়ানন্দের স্মৃতি বিস্মৃত হতে চেষ্টা করুক, জীবনের প্রথম প্রেমের স্মৃতিকে সে কোনোমতেই মুছে ফেলতে পারেনি। আর সেই কারণেই সে জয়ানন্দের অনুরোধ সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য পিতার শরণাপন্ন হয়েছে। পিতার পরামর্শেই সে জয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি। জয়ানন্দ তখন উন্মাদ। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে সে জলাশয়ে তার জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে। চন্দ্রাবতী যখন জয়ানন্দের মৃতদেহ দেখেছে, তখন সে দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে। পালাটির পরিসমাপ্তি এইখানেই।

'চন্দ্রাবতী' পালাটি বিনা ভূমিকাতেই অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে শুরু হয়েছে। শুরু

হয়েছে জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর কথোপকথন দিয়ে। অথচ জয়ানন্দের নামটি উল্লিখিত হয়েছে গীতিকাটি শুরুর পর চতুর্দশ পংক্তিতে। কবি শ্রোতৃমণ্ডলীর কৌতূহলকে কিছুটা সময় জাগরুক রেখেছেন এইভাবে চন্দ্রাবতীর নায়কের প্রসঙ্গে। উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কুসুম উদ্যানে। প্রেমও তো কুসুমের মতই, তাই তার বিকাশ কিংবা প্রস্ফুটনের আদর্শস্থল হিসাবে কবি কুসুম উদ্যানকে নির্বাচন করে যথার্থ রসিক মনেরই পরিচয় দিয়েছেন স্বীকার করতে হয়।

জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী একই সঙ্গে কুসুমচয়ন করে সকাল ও সন্ধ্যা। কখনও আবার জয়ানন্দ গাছের ডাল ধরে থাকে, আর চন্দ্রাবতী তা থেকে কুসুম চয়ন করে। পালাটিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়—তা হল জয়ানন্দ ও চন্দ্রার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর চন্দ্রাবতীর পিতার কাছে ঘটক জয়ানন্দের সংবাদ দিয়েছে আদর্শ পাত্র বলে এবং জয়ানন্দকেই চন্দ্রার যোগ্য বর রূপে মনোনীত করেছে তার পিতা।

মুসলমান কন্যার পানিগ্রহণের ফলে জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর আর বিবাহ হতে পারল না। প্রথম প্রেম ব্যর্থ হওয়ায় চন্দ্রা আজীবন অনূঢ়া থাকার সিদ্ধান্ত নিল। অপর দিকে কবি জয়ানন্দকে উন্মাদে পরিণত করে poetic Justice দেখিয়েছেন। এমনকি কুসুমের মত একটি নিষ্পাপ জীবনকে নষ্ট করার পরিণতি স্বরূপ জয়ানন্দকে আত্মঘাতী হতে দেখা গেছে। আত্মঘাতী হবার পূর্বে তাকে তার ভুল স্বীকার করতে হয়েছে অকপটে—

> অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
> কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হলাহল।।
> জানিয়া ফুলের মালা কালসাপ গলে।
> মরণে ডাকিয়া আমি আন্যাছি অকালে।।

যদিও জয়ানন্দের চন্দ্রাবতীর প্রতি প্রেমাসক্ত হবার পর এবং তার সঙ্গে বিবাহ স্থির হওয়ার পর মুসলমান কন্যার প্রেমে পড়া উচিত হয়নি, তথাপি কবি এক ব্রাহ্মণ পুত্রের সঙ্গে এক যবন কন্যার বিবাহ দিয়ে অন্য এক দিক দিয়ে যথেষ্ট প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

পালাটিতে অলৌকিকত্বের কোন ছাপ পড়েনি। চন্দ্রাবতীর পিতাকে দেখানো হয়েছে আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে, এমনকি চন্দ্রাবতীকেও প্রেমে ব্যর্থ হবার পর পূজার্চনা ও রামায়ণ রচনায় ব্রতী করা হয়েছে, কিন্তু পালাটিতে জীবনাসক্তিই শেষপর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে। নতুবা জয়ানন্দের শেষ সাক্ষাৎলাভের প্রার্থনাযুক্ত পত্রলাভের প্রতিক্রিয়া অন্য ভাবে বর্ণিত হত। যতই পূজার্চনায় রত থাকুক, চন্দ্রা জয়ানন্দকে মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে পারেনি। তাই পত্রপাঠরত চন্দ্রাবতীর বর্ণনায় কবি বলেছেন—

> পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষের জলে ভাসে।
> শিশুকালের স্বপ্নের কথা মনের মধ্যে আসে।।

চন্দ্রাবতী নিজেও তার পিতাকে বলেছে—

শুন শুন বাপ আগো শুন মোর কথা।
তুমি সে বুঝিবে আমি দুঃখিনীর ব্যথা।।
জয়ানন্দ লেখে পত্র আমার গোচরে।
তিলেকের লাগ্যা চায় দেখিতে আমারে।।

পূর্বেই পালাটির সংক্ষিপ্ততা ধর্মের বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে। চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীর শিবপূজার কোনো বিবরণ প্রদত্ত হয়নি। এমনকি বিগ্রহের বর্ণনা অনুপস্থিত। চন্দ্রাবতী জয়ানন্দকে উদ্দেশ করে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেনি। পালাটিতে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচনার বিষয়ে উল্লিখিত হলেও রামায়ণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ অনুপস্থিত। জয়ানন্দের শেষ ইচ্ছাযুক্ত পত্রের প্রাপ্তিতে চন্দ্রাবতীর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সীমিত পরিসরে ব্যক্ত হয়েছে। জয়ানন্দের মৃতদেহ দর্শনে চন্দ্রার প্রতিক্রিয়াও মাত্র দু'টি পংক্তিতে আবদ্ধ থেকেছে। বাস্তবতার নিরিখেও পালাটি উল্লেখযোগ্য। অনূঢ়া কন্যার বিবাহের ব্যাপারে চন্দ্রাবতীর পিতার আকুতিতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সন্ধান মেলে। জয়ানন্দের প্রেরিত প্রেমপত্রের প্রাপ্তিতে চন্দ্রার যে প্রতিক্রিয়া তাও বাস্তবানুগ, বাস্তবানুগ হয়েছে চন্দ্রাবতীর বিবাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত স্ত্রী আচারাদির বিবরণ দান। ব্যর্থ প্রেমের কারণে চন্দ্রাবতীর যে অস্থিরচিত্ততা ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে তাও খুবই বাস্তব সম্মত হয়েছে—

পাতেতে রাখিয়া কন্যা কিছু নাহি খায়।
রাত্রিকালে শর-শয্যা বহে চক্ষের পানি।।
বালিস ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি।
*　　　*　　　*
নয়নে না আসে নিদ্রা অঘুমে রজনী।
ভোর হইতে উঠে কন্যা যেমন পাগলিনী।।

অলংকার প্রয়োগে একদিকে যেমন বাস্তবতাবোধের পরিচয় মেলে, তেমনি সৌন্দর্য চেতনা ও কবিত্বশক্তির পরিচয়ও লভ্য।

প্রত্যূষকালে চন্দ্রাবতী কুসুম চয়নে বের হচ্ছে, তখনকার বর্ণনায় কবি বলেছেন—

আবে করে ঝিলিমিলি সোণার বরণ ঢাকা।
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা।।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তার ইষ্টদেবকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

বনফুলে মনফুলে পূজিব তোমায়।
বর দিয়া পশুপতি ঘুচাও কন্যাদায়।।

'মনফুল' এই রূপক অলংকারের প্রয়োগটি অভিনব। 'বর' শব্দটির ব্যবহারে শ্লেষ অলংকার লক্ষণীয়—এর এক অথ আশীর্বাদ, অন্য অর্থ পতি। যৌবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং তার আকস্মিকভাবে উপস্থিতি বোঝাতে বলা হয়েছে—

জৈবন আইল দেহে জোয়ারের পানি।

প্রকৃতির বর্ণনাতেও বাস্তবতার ছাপ লভ্য। যেমন—

দক্ষিণের হাওয়া বয় কুকিল করে রা।
জামের বউলে বস্যা গুঞ্জে ভ্রমরা।।

**চন্দ্রাবতী চরিত্র**

'চন্দ্রাবতী' পালাটিতেও চন্দ্রাবতীর একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় প্রকাশিত। 'মহুয়া' পালায় তাও প্রেমিকারও একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু আলোচ্য চন্দ্রাবতীতে এর বিপরীত চিত্র দেখা গেছে। পূজার জন্য ফুল তোলা উপলক্ষ্যে যে জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর পরিচয় হল, সেই জয়ানন্দের প্রেম নিবেদনেই সে সাড়া দিল। আবার সেই জয়ানন্দই চন্দ্রাবতীর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। জয়ানন্দের প্রতি চন্দ্রাবতীর অমোঘ আকর্ষণের পরিচয় কবি চমৎকার ভাবে দিয়েছেন—

'বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে রক্তজবা-সারি।
তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশা করি।।
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে মল্লিকা-মালতী।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার মতন পতি।।'

কার্তিকের মত জয়ানন্দের কন্দর্পকান্তি দেহ, নানা শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য, বংশ মর্যাদাও তার নেহাৎ কম নয়। জয়ানন্দ প্রস্তাব করার বহু আগে থেকে চন্দ্রাবতী তাকে ভালবাসতো। শৈশব অবস্থা থেকেই চন্দ্রাবতী জয়ানন্দকে প্রাণের দোসর বলে জ্ঞান করতো। সুপাত্র বলে চন্দ্রাবতীর পিতা জয়ানন্দকে তার কন্যার জন্য মনস্থ করলেন। বিবাহের প্রস্তুতি যখন পুরোদমে চলছে, এমন সময় প্রকাশ পেল সুন্ধা নদীর কূলে এক সুন্দরী মুসলমান তনয়ার প্রতি জয়ানন্দ প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছে। তাকে বিবাহও করেছে সে। এই দুঃসংবাদে চন্দ্রাবতী ভীষণ ভেঙে পড়ল। তার হাসি কান্নার বালাই রইল না। মনের ভাব সে মনেতেই গোপন করে রাখল। খাওয়াও ত্যাগ করল। রাত্রিবেলা তার শয্যা চোখের জলে ভিজে যায়। জয়ানন্দের সঙ্গে যুক্ত স্মৃতিগুলি তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। বিনিদ্র রজনীযাপন করে সে। এমতাবস্থায় তার পিতা দ্বিজ বংশীদাস চন্দ্রাবতীব অন্যত্র বিবাহের জন্য সচেষ্ট হন। চন্দ্রাবতী বিবাহে তার অনীহা প্রকাশ করল। সে পিতাকে সাফ জানিয়ে দিল—

'পিতা, মম বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।।
শিব পূজা করি আমি শিব পদে মতি।
দুঃখিনীর কথা রাখ কর অনুমতি।।'

বংশীদাসও চন্দ্রাবতীর অনূঢ়া থাকার বাসনা মেনে নিলেন। অতঃপর শিবপূজায় মন প্রাণ ঢেলে দিল চন্দ্রাবতী। আর পিতৃ নির্দেশে ব্যাপৃত রইল রামায়ণ রচনায়। এদিকে জয়ানন্দ তাব ভুল বুঝতে পেরেছে। অমৃত জ্ঞানে সে যে গরল পান করেছে তা স্বীকার

করে শেষবারের মত চন্দ্রার দর্শনপ্রার্থী হল—

পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষের জলে ভাসে।
শিশুকালের স্বপ্নের কথা মনের মধ্যে আসে।।
একবার দুইবার তিনবার করি।
পত্র পড়ে চন্দ্রাবতী নিজ নাম স্মরি।।
নয়নের জলে কন্যার অক্ষর মুছিল।
একবার দুইবার পত্র যে পড়িল।।

চন্দ্রাবতী যে জয়ানন্দের জন্য কতখানি ব্যাকুল ছিল, জয়ানন্দের প্রতি তার ভালবাসা যে অকৃত্রিম ছিল তা এই বিবরণেই জানা যায়। জয়ানন্দ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের প্রতি তার দুর্বলতাকে ত্যাগ করতে পারেনি। জয়ানন্দের আবেদনের কথা সে তার পিতার গোচরীভূত করে। পিতা তাকে নিষেধ করেন জয়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে। শিব পূজায় আত্মমগ্ন হয় চন্দ্রাবতী। অতএব জয়ানন্দ শেষ দেখা করতে এসেও চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ পায় না। পূজা সমাপনান্তে কলসীসহ জলের ঘাটে উপস্থিত হয় চন্দ্রা। জয়ানন্দের মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পায়।

'আখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পাড়েতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী।।'

অর্থাৎ ব্যর্থ প্রেমের কারণে চন্দ্রাবতী ভীষ্মের মতই কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসল। অনূঢ়া থাকার সংকল্প গ্রহণ করল। শিব পূজায় ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা বিস্মৃত হতে সচেষ্ট হল। বাস্তবিকই প্রেমের জন্য চন্দ্রাবতী যে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে তার তুলনা মেলা ভার। বিশেষতঃ জয়ানন্দ তাকে আঘাত দেওয়া সত্ত্বেও জয়ানন্দের প্রতি তার হৃদয়ের দৌর্বল্য শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'আহত প্রেম নীরব সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়া এক নিবন্ধ কঠোর অভিমানের রূপ লাভ করিয়া কিরূপে sublimity স্পর্শ করিতে পারে, চন্দ্রাবতী তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।...জীবন বিসর্জন না দিয়াও চন্দ্রাবতী তাহার প্রেমের নিষ্ঠার জন্য যে গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছে, হতভাগ্য চঞ্চলমতি জয়ানন্দ মৃত্যুর মধ্যেও তাহার একাংশেরও অধিকারী হইতে পারে নাই।'[১]

### জয়ানন্দ চরিত্র

জয়ানন্দ চন্দ্রাবতী পালার নায়ক। সে চন্দ্রাবতীকে ভালবাসে। বলা যায় তাদের বাল্যপ্রণয়। চন্দ্রাবতীকে প্রেমলিপি প্রেরণ করেছে জয়ানন্দ। তাতে সে জানিয়েছে তার গাঁথা মালা নিয়ে সে বিরলে বসে কাঁদে। পুষ্পবন থেকে কুসুমনিচয় সংগ্রহ করে চন্দ্রাবতী চলে গেলে তার কাছে মনে হয় পুষ্পবন বুঝিবা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে তার "প্রাণের দোসর" বলে অভিহিত করেছে। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর

সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য এবং সেই সঙ্গে চন্দ্রাবতীর প্রেমবারিতে তার বুভুক্ষু হৃদয়কে অভিষিক্ত করার তাগিদে জানিয়েছে সে মাতৃপিতৃহীন, মাতুলালয়ে পালিত। যদি তার প্রেমের আহ্বানে চন্দ্রাবতী সাড়া না দেয়, তবে সে দেশান্তরী হবার কথাও জানিয়েছে। তার পত্রের যদি উত্তর দেয় চন্দ্রাবতী এবং অবশ্যই জয়ানন্দের অভিপ্রেতমত, তবে তার পায়ে সে কিংকর হয়ে থাকবে এমন অঙ্গীকারও করেছে। চন্দ্রাবতীও জয়ানন্দকে তার মন সমর্পণ করে বসেছে। শেষপর্যন্ত ঘটকের মাধ্যমে পারিবারিকভাবে জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিবাহ স্থির হয়েছে।

জয়ানন্দ সুপুরুষ, সুপণ্ডিত। নানা শাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি। সুতরাং পাত্র হিসাবে সে মোটেই অকিঞ্চিৎকর ছিল না। কিন্তু এই জয়ানন্দই সুন্ধা নদীর কূলে এক মুসলমান কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করে বসে। এবং তাকে বিবাহ করে। বোঝা যায়, জয়ানন্দের প্রেম একনিষ্ঠ ছিল না। সে ছিল মোহে আচ্ছন্ন। নতুবা চন্দ্রাবতীকে নিজে পত্নীরূপে নির্বাচন করে সে অপর এক কন্যাকে প্রেম নিবেদন করত না। যাইহোক তার বিশ্বাসঘাতকতায় চন্দ্রাবতী আহত হয়েছে নিদারুণভাবে। সে আর বিবাহ করবে না বলে মনস্থির করেছে এবং শিবপূজায় নিজেকে যুক্ত রাখার কথা ঘোষণা করেছে।

জয়ানন্দ অস্থিরচিত্তের মানুষ। মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করেও তার মনে শান্তি নেই। সে পত্রের মাধ্যমে চন্দ্রাবতীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এই বলে যে, নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে পবিত্র তুলসী ত্যাগ করে শ্যাওলাকে সে বেছে নিয়েছে। অমৃত ভেবে সে নিজের অকালমৃত্যুকে ডেকে এনেছে। আত্মহননের জন্য সে মনস্থির করেছে। তৎপূর্বে চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেছে। সে নিজেকে পাপিষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তার আবেদন পূর্ণ করেনি চন্দ্রাবতী। জয়ানন্দ নদীর জলে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। অর্থাৎ একদিকে সে শোচনীয়ভাবে চন্দ্রাবতীর জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে। অন্যদিকে আত্মহনন করে সে মুসলমান কন্যাটির জীবনটিও নষ্ট করেছে। দু-দুটি নারীর ক্ষতি করার দায়ে জয়ানন্দ অভিযুক্ত।

বস্তুতপক্ষে চন্দ্রাবতীর তুলনায় জয়ানন্দ বড়ই নিষ্প্রভ এবং ম্রিয়মান হয়ে উঠেছে। চন্দ্রাবতীর ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সংযম অন্যদিকে চপলমতি অসংযমী, প্রেমের নামে মোহগ্রস্ত জয়ানন্দ। কর্তব্য-অকর্তব্যবোধ তার মধ্যে বেড়ে ওঠেনি। হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের অকালমৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছে।

### কমলা

'কমলা' পালাটির শুরু হয়েছে 'হুলিয়া' গ্রামের মানিক চাকলাদারের সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে পালাটির প্রথম পরিচ্ছেদে মানিক চাকলাদারের বৈভবের বিস্তারিত পরিচয় দানের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? কেননা মূল পালায় মানিক চাকলাদারের কোনও ভূমিকা নেই, ভূমিকা তার কন্যা কমলার, সেই এই পালাটির মুখ্য আকর্ষণ এবং নায়িকা। আমরা জানি মধুসূদন দত্ত তাঁর অদ্বিতীয় মেঘনাদবধ কাব্যটির ১ম সর্গে

লঙ্কাধিপতি দশাননের রাজসভার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আপাতভাবে সেই বিবরণকেও অপ্রাসঙ্গিকতা দোষে দুষ্ট বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যখন পাঠক অনুধাবন করে যে রাজসভার বৈভবের পরিচয় দিয়ে কবি প্রকারান্তরে লঙ্কাধিপতির বৈভব এবং ক্ষমতাকে প্রকটিত করেছেন, এহেন লঙ্কাধিপতি যে কি অদ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং যিনি বা যাঁর পুত্র ইন্দ্রজিৎ কাব্যের নায়ক পদে অধিষ্ঠিত, তার কাহিনী পাঠক মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে স্বভাবতঃই উদ্বুদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে 'কমলা' পালায় তার পিতৃ বৈভবের পরিচয় দানের উদ্দেশ্য—এত প্রাচুর্যের মধ্যে যে কমলা মানুষ হল, পরবর্তীকালে একজন কারকুনের চক্রান্তে তাকে কি অপরিসীম দুঃখ ভোগেরই না শিকার হতে হয়েছে। কমলার দুঃখ ভোগের গভীরতাকে ব্যঞ্জিত করতেই তার পিতার প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করা হয়েছে।

'কমলা' পালার প্রধান দুই চরিত্র হল কমলা আর তাদের কারকুন যার নাম নিদান। প্রথম পরিচ্ছেদে কবি কমলা ও নিদান এই দুটি চরিত্রকেই উপস্থাপিত করেছেন, সেই সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন কমলার ভাই সুধন চরিত্রটিকেও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে চিকন গয়লানী চরিত্রটি। পালায় তার ভূমিকা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াইয়ের অনুরূপ। সে কুটনি। তবে এই পরিচয়ের সীমাতেই তাকে বাঁধা যাবে না। চিকন গয়লানী বর্তমানে বয়স্কা রমণী। কবি তার যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দিব্বি তাকে প্রৌঢ়া বলা চলে—

কোন দন্ত পড়িয়াছে কোন দন্তে পোকা।
সোয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে শাখা।।
চলিতে ঢলিয়া পড়ে রসে থলথল।
শুখাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল।।

নবীন বয়সে সে ছিল রসের কারবারী। নাগরদের সঙ্গে তার তখন দিব্বি রঙ্গরস চলত। কিন্তু বর্তমানে তার সরকারী পরিচয় দধি-দুগ্ধ বিক্রেতা রূপে। এক্ষেত্রেও তার খ্যাতি কম নয়—

এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পানি।।

আর যে ব্যবসায় সে সাফল্য লাভ করেছে তার মূলে তার সেলসওম্যানশিপ—

দই-দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী।।

দধি দুগ্ধ বিক্রয় করা ব্যতীত তার আর একটি পেশা আছে—তা হল ঘর ভাঙ্গানোর মহৌষধ সরবরাহকারিণী সে। তার প্রদত্ত তেল পড়ার গুণে ঘরের কামিনী পতিকে অনায়াসে ত্যাগ করে, তার তৈরী পেঁচার মাংসের থেকে প্রস্তুত বড়ীতে 'সতী নারী পতি ছাড়ে'। এহেন চিকন গোয়ালিনীকে ধরে পড়ল কারকুন যে ভাবেই হোক মনিব কন্যা কমলার সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বেচারী চিকন গোয়ালিনী মানুষ চেনেনি, তাই কমলাকে প্রভাবিত করতে গিয়ে প্রহৃত হতে হয়েছে তাকে। এরপর শুরু হয়েছে কারকুনের ঘৃণ্য চক্রান্ত। মানিক চাকলাদারের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

শেষে কমলা এক মইষালের গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। এখানেই প্রদীপকুমারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। শেষপর্যন্ত প্রদীপকুমারের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। কারকুনের সমস্ত চক্রান্ত সে ফাঁস করে দিয়েছে, উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছে কমলা। মুক্তি পেয়েছে তার পিতা ও ভ্রাতা। 'কমলা' পালাটিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এটি মিলনান্তক, অধিকাংশ গীতিকার মত ট্রাজেডি নয়।

পালাটিতে কমলা আত্মপরিচয় দানে রহস্য করে বলেছে যে পূর্বজন্মে সে ছিল স্বর্গেতে রতিরূপে মদনের সঙ্গে, শাপভ্রষ্ট হয়ে তাকে মর্ত্যলোকবাসী হতে হয়েছে। কিন্তু পাছে কোনদিন তার কাছে মদনের উপস্থিতি ঘটে, তখন তাকে সে পাছে কোন উত্তর দিতে না পারে এই কারণেই দ্বিতীয় কোন পুরুষের পাণি গ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন চিকন গোয়ালিনীও অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই এই রহস্যের জবাব দিয়েছে—

স্বর্গপুরে গেছি আমি দধি-দুগ্ধ লইয়া।
উঠিতে যোজন সিড়ি কমর ভাঙ্গ্যা পড়ে।
আমি বইল্যা গেছি কন্যা অন্যে যাইতে মরে।।
আইন্যাছি মদনের পত্র দেও পুরস্কার।
এত কাম কর্ত্তে বল সাধ্য আছে কার।।

এই বলেই সে কমলাকে উদ্দেশ করে লিখিত কারকুনের প্রেমপত্রটি দিয়েছে। কারকুনের পত্র লিখন সার্থক না হলেও গোয়ালিনী যে নৈপুণ্যে পত্রটির প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে, তাতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে। গোয়ালিনীর কুপ্রস্তাবে কমলা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে নিদারুণভাবে প্রহার করেছে। তার দেহ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। কিন্তু তাই বলে সে সহজে ধরা দেবার পাত্রী নয়—

পন্থের লোক জিজ্ঞাসা করে রক্ত কেন দাতে
গোয়ালিনী কহে মোরে মারিল সান্নিকে।।

কারকুনের অভিযোগের যথাযথ তদন্ত না করেই জমিদার যেভাবে সম্পূর্ণ অকারণে মানিক চাকলাদার ও তার পুত্রকে শাস্তি দিয়েছে, তাতে জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিচারের নামে চরম অবিচার করার বিষয়টিই অভিব্যক্ত হয়েছে।

আলোচ্য পালাটিতেও রামায়ণের উল্লেখ লক্ষণীয়। কারকুন কৌশলে মানিক চাকলাদারের পুত্র সুধনকে অন্যত্র প্রেরণ করতে চায়। তাই বন্দী পিতার মুক্তির ব্যাপারে তাকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে প্ররোচিত করতে গিয়ে কারকুন শ্রীরাম লক্ষ্মণের পিতৃসত্য পালনের উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ চোদ্দ বৎসর বনবাস জীবনকে অঙ্গীকার করে নেওয়ার কথা বলেছে—

পিতার লাগিয়া দেখ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
চৌদ্দ বছর ভরা গোয়াইল বনে।।

বৃদ্ধ মহিষালের কমলাকে দেবী জ্ঞানে আশ্রয় দান এবং তার কাছে অন্তিমকালে

পদাশ্রয় প্রার্থনা বৃদ্ধ মহিষালের সরলতাকে যেমন সূচিত করেছে, তেমনিই মহিষালের গৃহে কমলার আপনার জনের মত আচরণ ও গৃহকর্মাদি সম্পাদনের বিবরণ পালাটিতে একটা স্নিগ্ধতার পরিমণ্ডল রচনা করেছে। সংক্ষিপ্ততা ধর্মও কবি ক্ষেত্র বিশেষে রক্ষা করেছেন। যেমন বলা হয়েছে—

এক দুই মাস করি তিন বছর গেল
গর্ভ সোদর ভাই জনম লইল।।

কিংবা কমলার উক্তিতে বলান হয়েছে—

এক দুই করি দেখ তের বছর যায়।
আমার বিয়ার কথা কয় বাপ-মায়।।

কারকুন যেমন একের পর এক চক্রান্তের জাল বিস্তার করে চাকলাদার পরিবারটিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, তেমনিই কমলা কর্তৃক এক নাটকীয় মুহূর্তে, যখন নাকি কালীর কাছে তার পিতা ও ভ্রাতা বলি প্রদত্ত হতে চলেছে, সেই সময় আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে একে একে চিকন গোয়ালিনী, আন্দি-সান্দি, মাতুল, মৈষাল বন্ধু, এমনকি রাজপুত্র প্রদীপকুমারকে সাক্ষী রেখে কারকুনের ষড়যন্ত্রের রহস্য ভেদ করে দোষী কারকুনকে দেবী পূজার বলি করিয়েছে, তাতে একদিকে যেমন poetic justice রক্ষিত হয়েছে, তেমনি কমলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও প্রশংসা না করে উপায় থাকে না। পালাটিতে প্রবাদের ব্যবহারে যথার্থই নৈপুণ্যের স্বাক্ষর মিলেছে—যেমন—'মাছি মারিয়া করি কেনে দুই হাত কালা', 'কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে' ইত্যাদি। অলংকার প্রয়োগেও কবি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—'জলেতে সুন্দরী কন্যা ফুটা পদ্মফুল', 'তোমার ত যৌবন ছিল জোয়ারের পানি' ইত্যাদি।

**কমলা চরিত্র**

দ্বিজ ঈশান প্রণীত 'কমলা' পালাটির নায়িকা হল কমলা। ফুলিয়া গ্রামের মানিক চাকলাদারের কন্যা সে। অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী সে। তার অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে লোককবি জানিয়েছেন—

'স্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে।'

একদিন স্নানরতা কন্যাকে দেখে কারকুন তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হল এবং চিকন গোয়ালিনীর সাহায্যে কমলার কাছে প্রেমপত্র প্রেরণ করল। কমলা কিন্তু অতিমাত্রায় আত্মসচেতন। তাই সে নিজের প্রসঙ্গে রহস্য করে বলেছে শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যলোকে এসেছে, আসলে সে রতি। তার বক্তব্য—

'শাপেতে পড়িয়া জন্ম মানুষের ঘরে।
মানুষের সাধ্য নাই মোরে বিয়া করে।।
দেখহ' আমার রূপ চান্দের কিরণ।
আমারে ভোগিতে নাই মানুষ এমন।।'

কমলার বক্তব্য হল মদন ঠাকুর যদি কোনোদিন তার কাছে এসে উপস্থিত হয় সেক্ষেত্রে মানুষকে বিবাহ করলে তার কাছে জবাব দেবার কিছু থাকবে না। মদনের কাছে সে বিশ্বাসঘাতিনী বলে প্রতিপন্ন হবে। তাই তার সংকল্প হল—

'বিয়া না করিব আমি রৈব আইবুড়।'

পরিহাসের মধ্য দিয়েও তার অহংবোধ ও সৌন্দর্য সচেতনতাই পরিস্ফুট এখানে। চিকন গোয়ালিনী প্রদত্ত প্রেমলিপি পাঠ করে কমলা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু সে অতিশয় সুচতুরা। তার মনের প্রকৃত ভাব গোপন রেখে গোয়ালিনীর কাছে প্রেমপত্র রচয়িতার রূপৈশ্বর্য সম্পর্কে জানতে চায়। গোয়ালিনীর ধারণা হয়েছিল বুঝিবা তার দৌত্য সফল হয়েছে। মনের সুখে সে কারকুনের রূপ এবং কমলার জন্য তার ব্যাকুলতার কথা সবিস্তারে জানালো। কমলা গোয়ালিনীকে পুরস্কার দেবার ছলনা করে প্রচণ্ড প্রহার করল। সে গোয়ালিনীকে ভর্ৎসনা করে বললে—

'শুন লো চিকন গোয়ালিনী।
তিনকাল গেছে তোর না গেল নষ্টামি।।
বয়সে মজেছ কত নাগরের সনে।
পরকে মজাও কত নানান ভানে।।
শূলেতে দিতাম তোরে বাপেরে কহিয়া।
ছাড়িয়া দিলাম তবে অনেক ভাবিয়া।।'

কারকুন কমলাদের বাড়ীর ভৃত্য। তার স্পর্ধার কথায় কমলা যে অতিশয় অসন্তুষ্ট তাও জানাতে ভুললো না। কারকুন ছাড়বার পাত্র নয়। সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হল এবং জমিদারের কাছে মানিক চাকলাদারের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে মানিককে কারারুদ্ধ করালো। এরপর কৌশলে সে কমলার ভাই সুধনকে জমিদারের দ্বারা দণ্ডাজ্ঞার ব্যবস্থা করল। সোজাসুজি সে কমলার কাছে প্রস্তাব দিল—

'তোমার সঙ্গে মোর যদি বিয়া হয়।
সুখেতে থাকিবা কন্যা কইলাম সমুদয়।।
মনের সুখেতে করবা মোর চাকলাদারী।
চিরদিন করবাম আমি তোমার চাকুরী।।
আমায় বিয়া করলে চিত্তে পাইবা বড় সুখ।
নৈলে গাছের পাতা ঝরব দেখ্যা তোমার দুঃখ।।'

কমলা তো তেমন পাত্রীই নয়, কোনো প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করবার মানসিকতা তার নেই। তার ওপর যে কারকুন তার পিতা এবং ভাইয়ের অপরিমেয় দুঃখভোগের কারণ, একদা যার অধীনে সে চাকরি করেছে তারই বিরুদ্ধে তার চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্র কারকুনের বিষয়ে কমলাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। পত্রপাঠ কমলা কারকুনকে বিদায় দিল এই বলে—

'পায়ের গোলাম তুই পায়ের নফর!

চরণে আছস বান্ধা হৈয়া চাকর।।
কি আর কহিব তরে পশুর অধম।
মাথায় তুল্যা কেবা লয় পায়ের খরম।।'

তার বাবা এবং ভাই যদি থাকতো দেশে তাহলে গর্হিত প্রস্তাব দানের কারণে কারকুনের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করত সে। কমলা বুঝতে পারল আর যাই হোক জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। তাই সে তার মাকে নিয়ে চলে গেল মামার বাড়ী। কারকুন কমলাকে উচিত শিক্ষা দিতে কমলার মামার কাছে কমলার চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করল আর জানালো কলঙ্কিনী কমলাকে যে স্থান দেবে সে সেই পরিবারের সকলেরই গর্দান নেবে। অগত্যা কমলার মাতুলের আশ্রয়টিও গেল। তার মামা কারকুনের অভিযোগকে সত্য জ্ঞান করে স্ত্রীকে পত্র লিখেছিল। কমলাকে যেন তাদের গৃহে এক মুহূর্তের জন্য স্থান দেওয়া না হয়। মাতুলের নির্দেশের কথা জানতে পেরে কমলা মাতুলালয় ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করল। মাতুলানীর কাছে সে অনুগ্রহ ভিক্ষা করল না। বিরল আত্মমর্যাদা বোধের প্রতীক কমলার সিদ্ধান্ত হল—

'বাপে জন্ম দিয়া থাকে যদি হই সতী.
বিপদে করিবে রক্ষা দুর্গা ভগবতী।।
জলে ডুবি বিষ খাই গলে দেই কাতি।
মামার বাড়ী না থাকিত দণ্ড দিবা রাতি।।'

অগত্যা অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ালো সে। এক বৃদ্ধ মইষাল কমলাকে দেখে ভাবলো ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মী উপনীত। পরম সমাদরে সে কমলাকে নিয়ে গেল নিজের কাছে। কমলা অকৃতজ্ঞ নয়, আশ্রয়দাতা মইষালের বাড়ীর সব কাজ সে করতে লাগল। সন্ধ্যাকালে সে আলো জ্বালে। গোয়ালে ধোঁয়া দেয়। মইষালের জন্য খড়ের বিছানা পাতে, তার রান্নাও করে দেয় সে। এদিকে এক শিকারী শিকার উপলক্ষ্যে উপস্থিত হল। তৃষ্ণার্ত হয়ে সে জল প্রার্থনা করল। কমলাকে মইষালের গৃহে দেখে শিকারী চমৎকৃত হল এবং অতি কষ্টে মইষালকে রাজি করিয়ে কমলাকে নিয়ে শিকারী নিজের দেশের উদ্দেশে যাত্রা করল। শিকারীর নাম প্রদীপকুমার। প্রদীপকুমার কমলার জন্য আকুল। সরাসরি সে কমলাকে জানিয়ে দিল--

'যেদিন হইতে দেখেছি তোমায় মইষালের ঘরে।
জীবন-যৌবন সইপ্যা দিছি কন্যা তোমার করে।।

... ... ...

তুমি আমার চন্দ্র সূর্য তুমি নয়ন তার।
তুমি আমার মণি মুক্তা তুমি গলার হার।।
তিলেক ছাড়িয়া তোমায় নাহি বাচে প্রাণ।
তোমায় না পাইলে কন্যা ত্যজিব পরাণ।।'

রাজপুত্র প্রদীপকুমারের শত অনুরোধ সত্ত্বেও কমলা আত্মপরিচয় দানে বিরত থাকে।

শুধু অপেক্ষা করে উপযুক্ত সুযোগের জন্য। শেষপর্যন্ত সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। কমলা জানতে পারে প্রদীপকুমারের পিতা রক্ষাকালী পূজার আয়োজন করেছে। আর সেই পূজায় এক পিতা ও তার পুত্রকে বলি দেবে। প্রদীপকুমারের বিবরণ থেকে কমলা জানতে পারে এই পিতা পুত্র অন্য কেউ নয়, তারই হতভাগ্য পিতা এবং ভ্রাতা। অতএব সে প্রদীপকুমারকে ধরে বসে নরবলি দেখবে বলে। তার পিতা এবং ভ্রাতার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে জানায় এতদিন ধরে তার পরিচয় জানার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রদীপকুমার প্রকাশ করে এসেছে সে সেই ব্যাকুলতার নিরসন ঘটাবে আত্মপরিচয় দানে। সেই সঙ্গে চতুরা কমলা জানিয়ে দিতে ভোলে না শর্তের কথা। তাদের পরিবারে নিযুক্ত থেকে যে কারকুন পরবর্তীকালে তাদের চরম শত্রুতা করেছে তাকে সভায় হাজির করানোর কথা সে বলে। পালকি বাহক আন্ধি সান্ধিকে আনার কথা সে বলে। আনতে বলে চিকন গোয়ালিনীকে, তার মাতুল এবং মাতুলানীকে। সর্বোপরি মইষাল বন্ধুকেও উপস্থিত করবার জন্য সে বলে। এরপর সভাকক্ষে উপস্থিত হয়ে কমলা চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী মেনে দেবগণ, তরুলতা, পশুগণ, বনের দুর্গা প্রভৃতিকে সাক্ষী রেখে শুরু করে তার মর্মন্তুদ কাহিনী, যা নাটকের থেকেও চমৎকার। সভায় সকলের সমক্ষে সে রাজকুমারকে প্রাণের পতি, প্রাণের দেবতা বলে অভিহিত করেছে। কমলা একটু একটু করে তার জন্ম বিবরণ থেকে শুরু করে তের বৎসরে পদার্পণ, পিতামাতা কর্তৃক তার বিবাহের জন্য তোড়জোড়, তার যৌবন সমাগমে কারকুন কর্তৃক তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, চিকন গোয়ালিনীর মাধ্যমে কারকুনের পত্র প্রেরণ, রাজার চর দ্বারা তার পিতাকে রাজগৃহে আহ্বান, রাজা কর্তৃক তার পিতার বন্দী হওয়া, কারকুনের চক্রান্তে তার ভ্রাতারও বন্দী জীবনে প্রবেশের কথা বলে। নিরাশ্রয় অবস্থায় তার মামার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ কিন্তু বিদেশ থেকে মামার লিখিত পত্রের কারণে তার মাতুলালয় ত্যাগ এবং মইষালের গৃহে আশ্রয় লাভ এবং সেখানে রাজার কুমারের সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা বলে। রাজকুমারকে পতিরূপে তার বরণ করা এবং তারই সঙ্গে তার রাজগৃহে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ও সে বলে। কমলা নিজেকে রাণীর দাসী বলে অভিহিত করে তার বিরল সম্ভ্রমবোধের পরিচয় দিয়েছে; গোয়ালা কর্তৃক আশ্রয়দানের কথা বলতে গিয়ে বলেছে—

> 'জন্মের সুহৃদ মোর বাপের সমান।
> তিন দিন দিল মোর গোয়ালেতে স্থান।।
> মায়া-মমতায় সে যেন বাপের চাইতে বাড়া।
> এইখানে পাইলাম সুখের আছরা।।'

কমলার বিরল কৃতজ্ঞতা বোধের পরিচয় মেলে। ইতিপূর্বেই মাতুলালয় ত্যাগ করার ব্যাপারে আমরা তার বিরল আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় পেয়েছি। কমলা রাজগৃহে স্থান পেলেও এবং রাজপুত্রের বধূ হলেও কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে বাস্তবিকই প্রশংসার পরিচয় দিয়েছে। সকাল সকাল সে জল সংগ্রহ করে বাড়ী এসেছে, শুধু তাই নয় রাণীকে সে স্নান করিয়েছে বলেও জানিয়েছে। কমলার অভিযোগ মতো উপস্থিত সাক্ষীদের জেরা

করে রাজা সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়েছেন এবং প্রমাণিত হয়েছে কমলার বক্তব্যই ঠিক। প্রকাশ পেয়েছে কারকুনের চক্রান্ত। দীর্ঘদিন ধরে কমলা যে সুযোগের সন্ধানে ছিল সেই সুযোগ লাভ করে তার সদ্ব্যবহার করেছে যথার্থভাবে। আন্ধি সান্ধি, মইষাল বন্ধু, মামা-মামী, গোয়ালা এমনকি রাজারকুমারের সাক্ষ্য দান বলাবাহুল্য সবই কমলার অনুকূলেই গেল। শেষপর্যন্ত চক্রান্তকারী কারকুনকে কালীপূজার দিন বলি হতে হয়েছে। যথাসময়ে রাজপুত্রের সঙ্গে কমলার সাড়ম্বরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'মহুয়া', 'মলুয়া' কিংবা 'চন্দ্রাবতী'র মতো কমলা হতভাগিনী নয়। তাকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে অনেকখানি, কিন্তু সে দুঃখভোগ ব্যর্থ হয়নি। শেষপর্যন্ত সে যে রাজপুত্রকে ভালবেসেছিল তাকেই লাভ করেছে পতিরূপে। তার দুঃখের অবসান ঘটেছে। মানুষ যখন শতদুঃখে জীর্ণ হয়ে যায় তখন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যেটুকু পায় তাকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। কমলা কিন্তু রাজকুমারকে লাভ করেও তার কর্তব্য বোধ থেকে বিচ্যুত হয়নি, বরং সে সুযোগের প্রতীক্ষায় থেকেছে, যাতে বন্দী পিতা এবং ভ্রাতার মুক্তির ব্যবস্থা সে করে দিতে পারে। তার দুঃখিনী মায়ের দুঃখের অবসান সে ঘটাবে। আর সর্বোপরি যে অকৃতজ্ঞ কারকুনের জন্য তাদের পারিবারিক জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে, প্রতিশোধ নেবে। এইজন্যই রাজকুমার বারংবার তার কক্ষে আসতে চাইলেও কিংবা তার পরিচয় জানতে চাইলেও কমলা পরিচয় দেয়নি কিংবা রাজকুমারের সঙ্গে অবাধ মিলনের খেলায়ও মেতে ওঠেনি। রাজকুমারকে নিরাশ করে তাকে কম মনোবেদনা সহ্য করতে হয় নি।। তার নিজেরই ভাষায়—

'বিফলে ফিরিয়া আরে বন্ধু যাও নিজের ঘরে।
একেলা শুইয়া বন্ধু আরে কান্দি আপন মন্দিরে।।
বাইরেতে শুনিলে বন্ধু আরে বন্ধু তোমার পায়ের ধ্বনি।
ঘুম হইতে জাইগা উঠি আমি অভাগিনী।
বুক ফাটিয়া যায়রে বন্ধু আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়া না পারি।
অন্তরের আগুনে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি।।'

শেষপর্যন্ত তার বুদ্ধিমত্তার কারণেই পারিবারিক শত্রুর দণ্ড বিধানে তার সমগ্র পরিবারের পূর্বের অবস্থায় আসীন হওয়ার সব কৃতিত্বই যেমন কমলার, তেমনি নিজের সঙ্কীর্ণ-ব্যক্তি-স্বার্থকে বড় করে না দেখে পারিবারিক স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য আমাদের কাছে বরণীয় রমণীতে রূপান্তরিত হয়েছে সে। পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কমলা ছিল রহস্য প্রিয়, তাই মানুষের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে প্রথমে অনীহা প্রকাশ করেছিল কেননা সেক্ষেত্রে মদনদেবের কাছে তাকে বিশ্বাসঘাতিনী হতে হবে। কিন্তু 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে', তাই শেষপর্যন্ত কমলার আর মদনদেবের প্রতি আনুগত্যের কথা মনে থাকেনি, সে প্রদীপকুমারের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য :

**'যে তেজস্বিতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ এই গীতিকাগুলির নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ইহার নায়িকা কমলার চরিত্রের মধ্য দিয়াও তাহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মহুয়া চরিত্রের দৃপ্ততা তীব্রতা একমাত্র কমলার মধ্যে পাওয়া যায়।...মহুয়ার মধ্যে প্রেমিকা নারীর চিত্র—কিন্তু কমলার ক্ষেত্রে নারীত্বই যেন অধিকতর প্রখর।'[২]**

## দেওয়ান ভাবনা

দশ বৎসরের সুনাই যখন পিতৃহীন হল, তখন তার জননী নিরুপায় হয়ে তাকে নিয়ে দীঘলহাটিতে ভায়ের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিল। সুনাইয়ের মামার যজমানির ব্যবসা। পুত্র কন্যা কেউ না থাকায় সুনাইয়ের মাতুল তাদের পেয়ে খুশীই হল। সুনাই পরমা সুন্দরী। যখন তার বারো বৎসর বয়স তখন তার বিবাহ নিয়ে ঘটকের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। কন্যার উপযুক্ত পাত্র আর পছন্দ হয় না সুনাইয়ের জননীর। যেমন সুনাই সুন্দর তার বরও তেমনি হবে, এই তার মায়ের আশা। এই রকম সময়ে অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান মাধবের সঙ্গে সুনাইয়ের পরিচয় হল এবং দ্রুত তা প্রেমে রূপান্তরিত হল।

এদিকে ঘটে গেল এক ঘটনা। বাঘরার মাধ্যমে দেওয়ান ভাবনা সুনাইয়ের রূপৈশ্বর্যের কথা জেনে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হল। বাঘরা সুনাইয়ের মাতুলকে জমি জায়গার লোভ দেখিয়ে হাত করল। মাতুল দেওয়ান ভাবনার সঙ্গে সুনাইয়ের বিবাহে সম্মতি দিল। সুনাই তা অবগত হয়ে মাধবকে অনুরোধ জানাল তাকে যেন মাতুলালয় থেকে সে নিয়ে যায়। জল আনতে গিয়ে সুনাই ধরা পড়ল দেওয়ান ভাবনার লোকজনদের হাতে। কিন্তু পথিমধ্যে মাধব তাদের পর্যুদস্ত করে সুনাইকে উদ্ধার করল। দেওয়ান ভাবনার প্রয়াসকে এইভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে মাধব সুনাইয়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হল। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত দেওয়ান ভাবনা মাধবের পিতাকে বন্দী করল। মাধব পিতাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজে বন্দী হল। মাধবের পিতা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সুনাইকে অনুরোধ জানাল সে যেন মাধবের প্রাণ রক্ষা করতে দেওয়ান ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। শ্বশুরের মিনতিতে সে দেওয়ান ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণে সম্মত হল, উদ্দেশ্য মাধবের জীবন রক্ষা। দেওয়ান ভাবনা মাধবকে মুক্তি দিল। কিন্তু দেওয়ান ভাবনার আশা পূর্ণ হল না, কেননা সুনাই বিষপানে আত্মঘাতিনী হয়ে তার সতীত্ব রক্ষা করল।

আলোচ্য পালাটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা এইবার আলোকপাত করতে পারি। আমাদের গীতিকাগুলিতে যে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন লক্ষিত হয়, এটিও তা থেকে মুক্ত থাকেনি। সেকালে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথার চল যে ছিল তার প্রমাণ মেলে নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে—

দশ বছর গিয়া সুনাইগো এগারতে পড়ে।
কন্যার যৈবন দেখ্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে।।

এতেক সুন্দর কন্যাগো তাহেত যুবতী।
কেবা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গতি।।

বার বৎসরে সুনাই পদার্পণ করার পরই তার বিবাহের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে দেখা যায়।

মানুষ ছিল সংস্কারাচ্ছন্ন। দেওয়ান ভাবনার লোকজন দ্বারা সুনাই ধৃত হবার পূর্বে অশুভ ইঙ্গিতসূচক বিবরণে বলা হয়েছে—

বাঁও আঁখি ঝরে মোর তরাসে কাঁপে বুক।
*                *                *
খালি কলসী কান্থে তুলিতে না পারি।
*                *                *
শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও।
জলের ঘাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ।
হাঁচি টিক্‌টিকি আর যত অলক্ষণ।।

জনপ্রিয় শাড়ীর মধ্যে ছিল অগ্নিপাটের শাড়ী, নীলাম্বরী শাড়ী ইত্যাদি। বিলাসিতার জন্য ছিল জলটুঙ্গীর ঘর। ছিল কামটুঙ্গী। জনপ্রিয় ছিল পাশা খেলা। মাধব তাই সুনাইকে প্রস্তাব দিয়েছিল তার প্রেরিত প্রেমপত্রে—

বাপের বাড়ীতে আছেগো জলটুঙ্গীর ঘর।
সেই ঘরে বসিয়া তুমি করিবা পশর।।
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামটুঙ্গীর বাসা।
রাইতের নিশি তথায় বসি খেলাইবাম পাশা।।

শয়নের উপকরণাদির মধ্যে ছিল শীতলপাটী। সুনাই মাধবকে দেখে প্রথম দর্শনেই তার প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং তার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করে বলেছে—

শুইতে দিতাম শীতলপাটী সঙ্গে যাইতাম উড়ি।।

অলঙ্কার প্রয়োগে কবি যথার্থই অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বার বৎসরের সুনাই অসাধারণ লাবণ্যের অধিকারিণী বোঝাতে কবি লাবণ্যকে তরল পদার্থের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—

অঙ্গের লাবণি সুনাইরগো বাইয়া পড়ে ভূমে।

অনুরূপভাবে সুনাইর সদ্য প্রস্ফুটিত উচ্ছল যৌবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

আষাঢ় মাসে দীঘলা পান্‌সীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে।।

প্রেমিকাকে মূল্যবান মণিমুক্তায় সজ্জিত করার কথা অনেক শোনা গেছে, কিন্তু যখন কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে উদ্দেশ করে বলে—

গলায় গাঁথিয়া দিবাম জোনাকীর মালা।

—তখন বুঝতে হয় সেই প্রেমিক যথার্থই রসিক, সৌন্দর্যবোধ তার অসীম। খুব

বেশি না হলেও এমনতর কবিত্বমণ্ডিত পংক্তির সন্ধান আলোচ্য পালাটিতে লভ্য। পালাটির পরিণতির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সুনাই তার সতীত্ব রক্ষার্থে আত্মবলি দিয়েছে। অসহায়া নিরপরাধা এক বালিকা কন্যা যে নাকি নবোঢ়া, তার অকাল পরিণতির বিবরণ দান করতে গিয়ে কবি উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছেন—

নিশি রাইত মেঘে আন্ধা আসমানে নাই তারা।
বারবাংলার ঘরে সুনাই চৌদিকে পাহারা।।

সুনাই মৃত্যুবরণের পূর্বে প্রথমে স্মরণ করেছে তার গর্ভধারিণীকে, পিতৃহীনা কন্যাকে যে পিতৃমাতৃস্নেহে লালন-পালন করেছে। এরপর সুনাই প্রণতি জানিয়েছে তার স্বামী মাধবের উদ্দেশে। সবশেষে সে স্মরণ করেছে দুর্গা ভগবতীকে। মানবিক দিক এতে বড় হয়ে উঠেছে। সুনাইয়ের কাছে দুর্গা ভগবতীর তুলনায় তার স্নেহময়ী জননী অনেক বেশি আপনার, পরিচিত। তারপরেই যে ব্যক্তিটি পরিচিত সে মাধব। তাই সর্বাগ্রে এদের কথাই তার মনে জেগেছে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে :

লক্ষণীয়, পালায় কর্মবাদ এবং দৈবের প্রতি বিশ্বাস দুই-ই স্থান পেয়েছে। পিতৃ ভ্রাতৃহীন সুনাই যে, 'জনম দুঃখিনী", সেজন্য দায়ী করা হয়েছে তার কর্মকে—

কর্মদোষে হইলা সুনাইগো জনম দুঃখিনী।

আবার সুনাইয়ের সঙ্গে মাধবের প্রথম দর্শন প্রসঙ্গে কবি মন্তব্য করেছেন—

চারিচক্ষু এক অইলরে পরাণ কাইড়া লইল।
কোন্ দৈবে মনের মানুষরে আন্যা দেখাইল।।

এইবার আমরা 'দেওয়ান ভাবনা' পালার কয়েকটি চরিত্রের আলোচনা করব।

### সুনাইয়ের চরিত্র

অন্যান্য গীতিকাগুলির মতই সুনাই এই পালার শুধু নায়িকা নয়, অপরূপা সে। হতভাগিনী পিতৃহারা। জননীই তাকে লালন-পালন করেছে। দশ বৎসর অতিক্রান্ত করে সুনাই যখন এগারোয় পদার্পণ করল, তখন মূলত: তার বিবাহের প্রয়োজনেই সুনাইয়ের মা তাকে নিয়ে দীঘলহাটিতে উপনীত হল। মাতুলালয়ে প্রথমে সে মাতুলের কিছু অনুকম্পা লাভ করেছিল, মামা তাকে কিনে দিয়েছিল নীলাম্বরী। তার বিবাহের ব্যাপারেও মাতুল কিছুটা সক্রিয়তা দেখিয়েছিল। কিন্তু যবে থেকে দেওয়ান ভাবনার দৃষ্টি সুনাইয়ের উপর পড়ে, তবে থেকে মাতুল হল তার বৈরী। দেওয়ান ভাবনার তরফে ভাটুক মাতুলকে জমি পুষ্করিণী ইত্যাদির প্রলোভন দেখান হয়েছিল। মাতুল সম্মত হয়েছিল ভাগ্নীকে দেওয়ান ভাবনার সঙ্গে বিবাহ দিতে।

এদিকে ধনীর দুলাল মাধবের প্রতি সুনাই ছিল আসক্ত। দেওয়ান ভাবনার চক্রান্তকে ব্যর্থ করে মাধবের সঙ্গে সুনাইয়ের বিবাহ হল ঠিকই, কিন্তু বেচারীর কপালে সুখের দাম্পত্য জীবন ভোগ আর ঘটল না। শ্বশুরের অনুরোধে সে বন্দী স্বামীকে উদ্ধারকল্পে আত্মঘাতিনী হল। অর্থবৈভব কিংবা প্রাণের আকর্ষণে এই বালিকা কন্যাটি তার সতীত্ব

নষ্ট করেনি। শত প্রলোভন অথবা বিপর্যয়ের মধ্যেও সে তার লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে।

মাধবের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় মিলেছে তাকে উদ্ধার করে তার জীবন দানের ঘটনায়। আরও পরিচয় মেলে সে যখন দেওয়ান ভাবনার লোকজন কর্তৃক অপহৃতা হয়েছে, তখনও নিজের বিপদকে গুরুত্ব না দিয়ে মাধবের বিপদাশঙ্কায় তার শঙ্কিত হওয়াতে—

না আইল না আইল বন্ধু ক্ষতি নাই সে তাতে।
না জানি বিপদে বন্ধু পড়িল কি পথে।।

সুনাইর বারমাসীও দয়িতের বিচ্ছেদ বেদনায় অশ্রুসিক্ত।

সুনাইয়ের পতিপ্রেম তাকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী করে তুলেছিল। ঘুণাক্ষরে সে কামুক দেওয়ান ভাবনাকে তার পরিকল্পনার কথা জানতে দেয়নি। বরং তাকে প্রলুব্ধ করেছে এই বলে যে সে স্বেচ্ছায় দেওয়ানের কাছে আত্মনিবেদনে উৎসুক। তবে সে শর্ত করিয়ে নিয়েছে যে সর্বাগ্রে মাধবকে মুক্তি দিতে হবে, তবেই সে দেওয়ানের বাসনা পূরণ করবে—

আমার বন্ধুরে আগে করিবা খালাস।
তবে সে মিটাইবাম আমি তোমার মনে: আশ।।

কবি যথার্থই বলেছেন—প্রাণ বন্ধুরে বাঁচাইতে সুনাই পরাণে মরিল।

সমালোচকের ভাষায়, 'প্রণয়াস্পদকে রক্ষা করিবার জন্য সুনাইর এই উদার আত্মত্যাগ, কেবলমাত্র গীতিকার নহে, যে কোন মহাকাব্যের বিষয় হইতে পারে।'[৩]

## সুনাইয়ের মাতুল

সুনাইয়ের মাতুল পেশায় ভাটুক ঠাকুর। তার সংসারে কেবল তার স্ত্রী, সন্তানাদি তার হয়নি। নিরাশ্রয় সুনাই এবং তার মা যখন দীঘলহাটিতে উপস্থিত হল, তখন সুনাইয়ের মামা সানন্দে তাদের আশ্রয় দিল। এমনকি সুনাইয়ের বিবাহাদির ব্যাপারেও সে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, কিন্তু তারপরই দেখা গেল আশ্রয়দাতা ষড়যন্ত্রকারীতে রূপান্তরিত। দেওয়ান ভাবনার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে সে ভাগ্নীকে দেওয়ানের হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেছিল—

সম্মতি জানাইল ভাটুক দুর্জন্যা বাঘরায়।
জাতি মাইরা বিয়া দিব মনেতে গুছায়।।

সুনাইয়ের মাতুলের এই বিশ্বাসঘাতকতা তার চরিত্রকে মসীলিপ্ত করেছে। তবে মাতুল চরিত্রটি যে বাস্তব হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই।

## মাধব

গীতিকাটির নায়ক হল মাধব। ধনী পিতার সন্তান সে। পক্ষী শিকারে পটু। তাই পোষা ঘুঘু নিয়ে তার যাতায়াত। মাধবকে দেখতে সুন্দর। যে মুহূর্তে সে সুনাইকে দেখেছে সেই মুহূর্তেই সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। সে পত্র প্রেরণ করেছে

সুনাইয়ের উদ্দেশে। নানা প্রলোভনের কথা তাতে রয়েছে। সব কিছুকে অতিক্রম করে গেছে মাধবের রসিক মন। তার সৌন্দর্যবোধ আমাদের মুগ্ধ করে। রসিক মনের বলেই সে সুনাইকে জোনাকির মালায় সজ্জিত করবে বলে জানিয়েছে।

মাধব সাহসী ও সেই সঙ্গে কর্তব্যপরায়ণ। দেওয়ান ভাবনার লোকজন অতর্কিতে সুনাইকে ধরে নিয়ে যাবার সময়ে তাকে ক্রন্দনরতা দেখা গেছে। মাধব তা শুনেই প্রশ্ন করেছে—

কেবা যাওরে নদী দিয়া বাইয়া পানসী নাও।
পর ঘরের যুবতী নারী ধইরা লইয়া যাও।।

তখনও সে কিন্তু জানে না যে তারই প্রেমিকাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাধবের কণ্ঠস্বর শুনে সুনাই ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করলে মাধব তাকে উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হয়েছে। তুমুল যুদ্ধে সে দেওয়ান ভাবনার লোকজনকে পর্যুদস্ত করেছে। শেষপর্যন্ত মাধবের সঙ্গেই সুনাইয়ের বিবাহ হয়েছে।

'মৈমনসিংহ-গীতিকার এই একটিমাত্র পুরুষ চরিত্রে যথার্থ পৌরুষের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।......মোহকে জয় করিয়া পৌরুষ এখানে যথার্থ প্রেমের পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল।'[৪]

প্রতিহিংসাপরায়ণ দেওয়ান ভাবনা মাধবের পিতাকে বন্দী করেছে। পিতার বন্দীদশা শুনেই মাধব ভাওয়ালিয়া সহ ভাবনার উদ্দেশে যাত্রা করেছে। এবং তার বিনিময়ে পিতা মুক্তিলাভ করেছে। অবশ্য সে নিজে মুক্তি লাভ করেছে স্ত্রীর জীবনের বিনিময়ে। অবশ্য বেচারী বন্দীদশা থেকে কিরূপে মুক্তিলাভ করতে চলেছে সে সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি।

**দেওয়ান ভাবনা**

পালায় ভিলেন চরিত্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে দেওয়ান ভাবনা। একাধিক বিবাহ তার। তথাপি বাঘরার মাধ্যমে সুনাইয়ের রূপৈশ্বর্যের কথা অবগত হয়ে সে সুনাইকে লাভ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রথমে হাত করেছে সুনাইয়ের মাতুলকে সম্পত্তির প্রলোভনে। এরপর অসহায়া সুনাইকে লোকজন দ্বারা অপহরণ করিয়েছে। এতেও যখন ব্যর্থ হয়েছে প্রয়াস, তখন মাধবের পিতাকে বন্দী করেছে সে। সে জানত তাহলেই মাধব তার কাছে উপস্থিত হবে পিতার মুক্তির জন্য, আর সেই সুযোগে মাধবকে বন্দী করবে সে। বাস্তবেও তাই ঘটেছে। তখন সুনাই গেছে তার বিনিময়ে মাধবকে মুক্ত করতে। এর অপেক্ষাতেই সে ছিল। কিন্তু এত সব করেও দেওয়ান ভাবনার কূট কৌশল বাস্তবায়িত হয়নি। নবোঢ়া বালিকা সুনাইয়ের সতীত্ব সে নষ্ট করতে পারেনি। কেননা তৎপূর্বেই সুনাই বিষপানে দেহত্যাগ করেছে। এইভাবে সদ্য বিবাহিত মাধবের দাম্পত্য জীবনকে সে নষ্ট করেছে, আর তারই কারণে কুসুম কোমল সুনাইকে ট্রাজিক পরিণতির শিকার হতে হয়েছে।

## দস্যু কেনারামের পালা

দ্বিজ বংশী সুতা প্রণীত 'দস্যু কেনারামের পালা'টির মুখ্য উপজীব্য বিষয় এক দুর্দান্ত প্রকৃতির নরঘাতক ডাকাতের হৃদয় পরিবর্তন। সচরাচর গীতিকাগুলি, বিশেষত মৈমনসিংহ থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলিতে নরনারীর প্রেম রূপায়িত হতে দেখা গেছে। কিন্তু আলোচ্য গীতিকাটিতে একটিমাত্র নারী চরিত্র উপস্থাপিত—সে হল কেনারামের জননী যশোধারা, খেলারামের পত্নী। পুত্রের যখন মাত্র সাত মাস বয়স, তখনই যশোধারার দেহান্ত হয়। পালায় তাকে বাদ দিলে দ্বিতীয় কোন রক্তমাংসের নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলেনা। অতএব নর-নারীর প্রেম কাহিনী হবার কোনো সম্ভাবনাই পালাটিতে ছিল না। বলা যায় সাধারণ মানব প্রেমকেই গীতিকাটির উপজীব্য করে তোলা হয়েছে।

অপুত্রক খেলারাম ও যশোধারা মনসার বরে পুত্র সন্তান লাভ করেছে। যশোধারার অকাল মৃত্যুর পর খেলারাম শিশু পুত্রকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে শ্বশুরালয়ে, দেবপুর গ্রামে। কেনারামের যখন মাত্র এক বৎসর বয়স, তখন খেলারাম শিশুপুত্রকে ফেলে চলে গেছে তীর্থ ভ্রমণে। মামীর কাছেই কেনারাম মানুষ হচ্ছিল, বাদ সাধল অনাবৃষ্টি ও আকাল। কেনারামের মাতুল মাত্র পাঁচ কাটা ধানের বিনিময়ে কেনাকে বিক্রয় করে দিল হালুয়ার কাছে। হালুয়ার সাত সাতটি পুত্রই দুর্ধর্ষ ডাকাত। ঘটনাচক্রে যোগাযোগ ঘটে গেল দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গে। বংশীদাসের কণ্ঠে মনোমুগ্ধকর মনসার ভাসান শুনে এবং সেই সঙ্গে পাপের পরিণতির কথা জেনে কেনারামের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। সে দীক্ষিত হল, পেশা হল তার মনসামঙ্গল গেয়ে ভিক্ষা করা। ডাকাতির দ্বারা উপার্জিত সমস্ত সম্পদ সে নদীর জলে বিসর্জন দিল।

পালাটির অভিনবত্ব নানা কারণেই। মনসার বরে যে কেনারামের জন্ম, সেই কেনারামকে কিন্তু বিন্দুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করে তোলা হয় নি। এমনকি পালায় উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করেছে মনসার মাহাত্ম্যসূচক বিবরণ, তথাপি অলৌকিকতা পালাটির স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেনি। বর্ণিত হয়েছে যদিও যে বংশীদাসের সুললিত কণ্ঠের গান শুনে 'পাগ্‌লা ভাটীয়াল নদী বহে যে উজানি', কিংবা 'পাষাণ গলিয়া মেঘ বর্ষে যার গানে', তথাপি কোনমতেই এসব বিবরণকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা সঞ্জাত এবং মানবিক কাহিনীর পরিপন্থী বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কবির তেমন যদি অভিপ্রায় থাকত, তবে মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে অনৈসর্গিক প্রক্রিয়ায় কেনারামকে পরিবর্তিত রূপে উপস্থাপিত করতে পারতেন। কবি কেনারামের চরিত্রের পরিবর্তনে সহজাত সংস্কারেরই জয় ঘোষণা করেছেন বলে স্বীকার করতে হয়।—'এক কথায় বলিতে গেলে, এই গীতিকায় আয়ত্ত (acquired) ও সহজাত (inherent) সংস্কারের মধ্যে দ্বন্দ্ব নির্দেশ করিয়া পরিণামে সহজাত সংস্কারেরই জয় ঘোষণা করা হইয়াছে।'[৫]

কেনারাম পুরুষানুক্রমে ডাকাত ব্যবসায়ী ছিল না, অবস্থার বৈগুণ্যে সঙ্গদোষে সে যেমন ডাকাত হয়ে উঠেছিল, তেমনিই সঙ্গগুণে, বংশীদাসের সাহচর্যে সে আবার

রূপান্তরিত হল।। প্রকারান্তরে পালাটিতে—

'কবির যে কি শক্তি, সমাজ জীবনে তাঁহার যে কি দান, তাহাদের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।'[৬]

বংশীদাস কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে অমানুষ কেনারামকে পরিবর্তিত করেন নি, তাকে রূপান্তরিত করেছিল তাঁর অনবদ্য কবিত্বশক্তি তথা গীতিশক্তির গুণ। প্রসঙ্গত অসুর তনয় তণ্ডুক ও শুক্রাচার্যের প্রসঙ্গ অবতারণা করে শুক্রাচার্যের অনুকম্পায় তণ্ডুকের মুক্তিলাভের কাহিনীটির সংযোজনের ফলপ্রসূতা স্বীকার্য। আলোচ্য পালায় কেনারামই তণ্ডুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, বংশীদাসকে দেখা গেছে শুক্রাচার্যের ভূমিকা পালনে।

পালাটির একাধিক স্থানে রামায়ণের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। কেনারামের সুস্বাস্থ্যের বর্ণনা দান প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'রাবণের মত হৈল অতি বলবান'।

দ্বিজ বংশীদাস যখন কেনারামকে প্রথম দিকে প্রভাবিত করতে অসমর্থ হচ্ছিলেন, তখন তিনি খেদোক্তি করেছেন এই বলে,—

লৌহের বাড়াই দেখ মানুষের প্রাণ।
শাপেতে হইয়াছে যেমন অহল্যা পাষাণ।।

আখ্যানের নানা অংশেই কবি প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করেছেন। যেমন.—

ক. চোরা নাহি শুনে দেখ ধর্মের কাহিনী।
খ. পিশাচে না শুনে রাম অন্তরেতে গ্লানি।।

দুর্ভিক্ষের যে চিত্র পালাটিতে উপস্থাপিত, তা বাস্তবানুগ—

এক মুষ্টি ধান্য নাহি গৃহস্থের ঘরে।
অনাহারে পথে ঘাটে যত লোক মরে।
আগে ত বৃক্ষের ফল করিল ভোজন।
তাহার পরে গাছের পাতা করিল ভক্ষণ।।
পরেত ঘাসেতে নাহি হইল কুলান।
ক্ষুধায় কাতর হৈল যত লোকজন।।
গরুবাছুর বেচিয়া খাইল খাইল হালিধান।
স্ত্রী পুত্র বেচে নাহি গো গণে কুলমান।।

এই প্রসঙ্গে কেনারামের একটি মন্তব্যও উল্লেখের দাবী রাখে। কেনারাম নরঘাতক, অর্থগৃধ্নু, অমানবিক কার্যে অদ্বিতীয়, তথাপি সে ধনী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমাজের যে কোন কল্যাণ সাধিত হয় না বলে মন্তব্য করেছে, তাকে আমরা কোনমতেই অগ্রাহ্য করতে পারি না। তার ভাষায়—

দেশে যত ধনী আছে তাহাদের ধনে।
ভিক্ষুক লোকের আসে কোন প্রয়োজনে।।
থাকিয়া ভাণ্ডারের ধন ভাণ্ডারেতে ক্ষয়।
এ ধনেতে সংসারের কোন কার্য হয়।।

এ তার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কিংবা কবির অভিজ্ঞতা কেনারামের বকলমে প্রকাশিত। অলংকার প্রয়োগে কবি সূক্ষ্ম কল্পনাশক্তির পরিচয় না দিলেও, প্রযুক্ত অলংকারগুলিতে তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে, বিশেষত: ব্যবহারিক জীবন সম্পৃক্ত হওয়ায় এগুলির পৃথক আবেদন অনস্বীকার্য। যেমন–

ক. আমিত যুবতী নারী তুমি বৃদ্ধ বুড়া।
দন্তহীন বাঘে যেন কামড়ায় মরা।।
খ. ডুমুনীর বোলে শিব পরম কৌতুক।
চোরে ধন পাইলে যেমন মনে হয় সুখ।।
গ. পাহাড়িয়া দেহ যেন কালমেঘের সাজ।
যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ।।
ঘ. হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া।
ঙ. কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্বত প্রমাণ।

পালায় কিছু কিছু সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতিফলন লক্ষণীয়, এর ফলে পালাটির মানবিক রস অনেক বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন দেবীর পূজায় ক্রীত বলে খেলারামের পুত্রের নামকরণ হল 'কেনারাম', জোড়া পাঁঠা সহ মনসার আষাঢ় সংক্রান্তিতে পূজার আয়োজনের প্রসঙ্গ, একই গোত্রের পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়, কাঁচা মৃত্তিকার সরায় নৃত্য কৌশল প্রদর্শনের রীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি গীতিকাটিতে উল্লিখিত হয়েছে। পালাটির সংহত রূপ ক্ষুণ্ণ হয়েছে 'মনসামঙ্গলে'র বিস্তারিত কাহিনীর সংযোজনে।

### দস্যু কেনারাম পালার অলৌকিকত্ব

দস্যু কেনারামের পালায় অলৌকিকত্বের প্রভাব আপাতভাবে দ্বিবিধ ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয় – ১) দস্যু কেনারামের জন্ম প্রসঙ্গে ২) কেনারাম চরিত্রের পরিবর্তনে।

প্রথমেই আমরা দস্যু কেনারামের জন্ম বৃত্তান্তের প্রসঙ্গ আলোচনা করব। বাকুলিয়া গ্রাম নিবাসী দ্বিজ খেলারাম এবং যশোধারা ছিলেন নিঃসন্তান। এই জন্য তাদের দুজনেরই দুঃখের কোনও সীমা পরিসীমা ছিল না। দুজনে মনোদুঃখে সিদ্ধান্ত নিল তারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করবে। সন্তানহীনতার বেদনা ও অপমান আর সহ্য করবে না। দুদিন অনাহারে কেটে গেল, তিন দিনের দিন যশোধারা নিদ্রিতা অবস্থায় এক স্বপ্ন দেখল– "দেখিল শিয়রে এক দেবী অধিষ্ঠান / চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী পদ্মা মূর্তিমান।। / দেবী আগমনে ঘর হইল উজালা। / সুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সবরিকলা।। / অষ্টনাগ অঙ্গে তার হেলায় দুলায়। / পদ্মের উপরে বৈসা ধীরে ধীরে কয়।।

যশোধারা পুত্রবতী হবে। তার মনের দুঃখ অপগত হবে। মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মনসার আবাধনা করতে হবে।

স্বপ্নাদেশে মনসা জানিয়ে দিলেন—"আষাঢ় সংক্রান্তি দিনে লো শুন দিয়া মন। / উপাস থাকিয়া করলো ঘট-সংস্থাপন।। / মণ্ডপেতে প্রতিদিন দিও ধূপ বাতি। স্মরণে রাখিও মোরে প্রতি দিবারাতি।। / এহি মনেত একমাস করিয়া পালন। / শ্রাবণ সংক্রান্তি দিনে করহ পূজন।। / এই নির্দেশানুযায়ী খেলারাম ও যশোধারা আষাঢ় সংক্রান্তির দিনে ঘটস্থাপন করে মনসা পূজার আয়োজন করে। এবং একমাসের মধ্যে যশোধারা গর্ভবতী হয়। কবি চন্দ্রাবতী এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"চন্দ্রাবতী কয় শুন গো অপুত্রার ঘরে / সুন্দর ছাওয়াল হৈল মনসার বরে।।" প্রশ্ন হল সত্য সত্যই মনসার বরেই কেনারামের জন্ম হয়েছে? একি দৈবী শক্তির প্রভাব? যারা ভক্ত তারা চন্দ্রাবতীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন। কেননা দৈবী শক্তিতে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু যুক্তিবাদীর পক্ষে এমনতর তথ্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, স্বপ্ন দেখার পিছনে কোনও অলৌকিকত্বের ব্যাপার নেই। মানুষ যা চিন্তা ভাবনা করে, বাস্তবে যা পেতে চায় অথচ পাওয়া হয়ে ওঠে না, স্বপ্নে সেই অপূর্ণ বাসনা পূর্ণতা পায়। সেদিক দিয়ে যশোধারার স্বপ্নদর্শন অথবা মনসার স্বপ্নাদেশ লাভ, আসলে যশোধারার সচেতন মনের চাহিদার এক ধরনের বাস্তবায়ন। ভক্তজন বলবেন স্বপ্নাদেশ মেনে একমাস ব্যাপী মনসার পূজা অর্চনা করার সুবাদে কেনারাম রূপী সন্তান লাভ সম্ভব হয়েছে খেলারাম ও যশোধারার। এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যশোধারার সন্তান হয়নি কিন্তু সে কোনওদিন সন্তান লাভ করতে পারবে না এমনতর তথ্যের কথা উল্লিখিত হয়নি। বিলম্বিতভাবে সন্তান লাভও ঘটে থাকে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সাধারণ মানুষের কাছে দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কেনারামের জন্মের সঙ্গে দেবী মনসার ভূমিকাকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ কেনারামের চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়—কেনারাম ছিল সাঙ্ঘাতিক দস্যু। তার কাজ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা ও নির্বিচারে লুণ্ঠন করা। তার ভালোমন্দ কোন জ্ঞান নেই। কাকে পাপ বলে তা সে জানে না। "বাঘ যেমন মারে জন্তু খেলিয়া খেলিয়া / এহি মতে মারে দুষ্ট মানুষ ধরিয়া।।" / এ হেন দস্যু কেনারাম দ্বিজ বংশীদাসের কণ্ঠে বেহুলা ভাসান শুনে হাতের খাঁড়া ফেলে দিয়ে ক্রন্দনরত হয়েছে। সে তার সমস্ত অর্জিত অর্থ সম্পদ বংশীদাসকে দিয়ে দিতে চেয়েছে। তার শুধু একটাই আবেদন—"অন্তকালে স্থান গুরু দিও রাঙ্গা পায়।" কেনারাম তিনঘড়া ধন নদীর জলে বিসর্জন দিয়েছে এবং নিজের দেহের মাংস নিজেই কামড়াতে শুরু করেছে। শেষপর্যন্ত দ্বিজ বংশীদাস কেনারামকে দীক্ষা দিতে সম্মত হয়েছেন। তাকে মনসার ভাসান শিক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন ও মায়ের নামগান করে সে পরিত্রাণ পাবে বলে আশ্বস্ত করেছে। দ্বিজ বংশীদাসের কাছে দীক্ষিত কেনারামের জন্মান্তর ঘটেছে। কেনারাম এর পর ঘরে ঘরে মনসার ভাসান গেয়ে মুষ্টি ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেছে। আপাতভাবে মনে হবে অধ্যাত্ম মার্গের পথিক দ্বিজ বংশীদাস নিছক তাঁর সুমধুর কণ্ঠ নিঃসৃত মনসার ভাসানে দস্যু কেনারামের হৃদয় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। দ্বিজ

বংশীদাসের অলৌকিক শক্তি এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু তা সত্যি নয়। আসলে নরঘাতক কেনারামকে দ্বিজ বংশীদাসের মত কেউ নির্ভীক ভাবে মোকাবিলা করেনি। তাকে তার নৃশংস পাপের পরিণতি সম্পর্কে কেউ অবহিত করেনি। যতখানি নির্ভীকতার সঙ্গে দ্বিজ বংশীদাস নিশ্চিত মৃত্যুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়েছেন, স্বাভাবিক ভাবেই কেনারামের মধ্যে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকবে। তার অভ্যস্ত যান্ত্রিক জীবনে এত বড় এক বৈপরীত্যের সম্মুখীন হল সে। তদুপরি বেহুলার করুণ পরিণাম তার চিত্তকে কিছু পরিমাণে হলেও কোমল করে তুলে থাকবে। চন্দ্রাবতী বর্ণনা করেছেন—"যখন গাহিল পিতা বেহুলা হইল রাড়ী / কেনারামের চক্ষে জল বহে দড়দড়ি।। / সর্বোপরি দীর্ঘ সময় ধরে দ্বিজ বংশী দাসের মধুক্ষরা কণ্ঠে উপস্থাপিত মনসার ভাসানের প্রভাব তো কার্যকরী হয়েইছিল। এই সব মিলিয়ে তার মধ্যে অনুতাপের অনল প্রজ্বলিত হয়েছিল। তাতেই তার চিত্তশুদ্ধি ঘটে। পূত চরিত্র দ্বিজ বংশীদাসের সান্নিধ্য যে কেনারামের হৃদয় পরিবর্তনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।।

**দস্যু কেনারামের পালাকে মনসার পাঁচালী বলে অভিহিত করা যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা**

'দস্যু কেনারামের পালা'র মুখ্য বিষয়বস্তু হল কেনারামের মনসার বরে জন্মগ্রহণ, ঘটনাচক্রে তার ডাকাতদলের সংসর্গে পড়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতে পরিণত হওয়া এবং শেষপর্যন্ত দস্যু কেনারামের কিরূপে জন্মান্তর ঘটল, দস্যুতাবৃত্তি ত্যাগ করে দ্বিজ বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক মনসার মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হওয়ার আকর্ষণীয় বিবরণ। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল মূল কাহিনী বহির্ভূত মনসার পাঁচালীকে বিস্তৃত পরিসরে স্থাপন পূর্বক মনসার মাহাত্ম্য প্রচার। আমরা জানি নাটকে, উপন্যাসে মূল আখ্যানের সহায়ক রূপে গৌণ আখ্যানের সংযোজন ঘটানো হয়ে থাকে। কিন্তু কখনই গৌণ বা অপ্রধান আখ্যানকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় না যা মুখ্য আখ্যানের গুরুত্ব ও গৌরবকে অতিক্রম করে যেতে পারে। দস্যু কেনারামের পালার ক্ষেত্রে এই ত্রুটিটি ঘটেছে বলেই সমালোচকদের দৃঢ় প্রত্যয়। অতএব আমাদের বিচার করে দেখতে হবে দস্যু কেনারামের পালায় মূল আখ্যানটি কি—সেকি মনসার পাঁচালী, মনসার মাহাত্ম্য প্রচার, নাকি দস্যু কেনারামের হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনী।

পালায় বাকুলিয়া গ্রাম নিবাসী দ্বিজ খেলারাম এবং তস্য পত্নী যশোধারার মন্দভাগ্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লিখিত হয়েছে তারা ছিল অপুত্রক। এই দুঃখে হতভাগ্য দম্পতি অনাহারে দেহত্যাগের সংকল্প করে। দুটি দিন অতিবাহিত হল। তৃতীয় দিনের দিন :

"যশোধারা দেখিল এক অপূর্ব স্বপন।।<br>
দেখিল শিয়রে এক দেবী অধিষ্ঠান।<br>
চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী পদ্মা মূর্ত্তিমান।।

দেবী আগমনে ঘর হইল উজালা।
সুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সবরিকলা।।"

দেবী মনসা স্বপ্নে আশ্বস্ত করলেন যশোধারাকে আষাঢ় সংক্রান্তির দিনে ভক্তিপূত চিত্তে উপবাসী থেকে ঘটস্থাপন পূর্বক একমাসব্যাপী মনসার আরাধনা যেন করে। সেক্ষেত্রে সে অবশ্যই পুত্রসন্তান লাভ করবে। খেলারাম এবং যশোধারা এই স্বপ্নাদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল এবং যথাসময়ে তাদের পুত্রসন্তান হল। এই পুত্রের নাম দিল কেনারাম। কিন্তু বিধাতার পরিহাস, ঘটনাচক্রে পিতৃমাতৃহীন কেনারাম একজন দুর্ধর্ষ ডাকাতে পরিণত হল। এক্ষেত্রে মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে কবি মনসার প্রচারেই উদ্‌গ্রীব বেশী, তাই মনসার বরে কেনারামের জন্ম বৃত্তান্তকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখি যশোধারার মৃত্যু হয়েছে। শিশু সন্তানকে নিয়ে বিপদাপন্ন হয়েছে খেলারাম। অগত্যা শ্বশুরালয়ের শরণাপন্ন হতে হয়েছে তাকে। দেবপুর গ্রামে কেনারামকে তার মাতুলালয়ে রেখে খেলারাম তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছে। কেনারামের বয়স তখন মাত্র এক বছর। তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু খেলারাম আর ফিরল না। এদিকে দেশে অকল্পনীয় অবস্থার সূচনা হল। দেখা দিল আকাল, সাধারণ মানুষ অন্নসংস্থানে অপারগ হয়ে গোরুবাছুর থেকে স্ত্রী-পুত্র সবই বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হল। এইরূপ দৈব-দুর্বিপাকের শিকার হয়ে কেনারামের মাতুল কেনারামকে পাঁচকাঠা ধানের বিনিময়ে এক হালুয়ার কাছে বিক্রি করে দিল। হালুয়ার সাতটি পুত্রই ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। এদের সংসর্গে পড়ে কেনারাম দুর্ধর্ষ ডাকাতে পরিণত হল। পালার চতুর্থ সর্গে আমরা দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গে দস্যু কেনারামের সাক্ষাতের বিবরণ পাই। দুজনের দুই ভিন্ন মেরুতে অবস্থান। একজন সাধক আর একজন নির্মম প্রকৃতির নরহত্যাকারী ডাকাত। দ্বিজ বংশীদাসের সন্ন্যাসীর বেশ, তাঁর ললাটে তিলকের ছটা, মাথায় দীর্ঘ জটা, ভাবে বিভোর, মুখে তাঁর মনসার মাহাত্ম্য সূচক গান। অন্যদিকে দস্যু কেনারামের প্রসঙ্গে কবি জানিয়েছেন সে মানুষ হত্যায় অনাবিল আনন্দ ভোগ করে—

"মানুষ মারিয়া মোর মনে নাহি দুখ।
যত মারি তত যেন পাই মনে সুখ।।
পাপ পুণ্য নাহি জানি মানুষ মারিব।
তোমার কাছেতে ঠাকুর ধর্ম না শিখিব।।"

দস্যু কেনারাম যখন দ্বিজ বংশীদাসকে হত্যা করতে কৃতসংকল্প, কোনও মতেই দ্বিজ বংশীদাস পাপপুণ্যের কথা বলে কেনারামকে টলাতে পারলেন না, তখন অনন্যোপায় হয়ে তিনি নরঘাতক দস্যু কেনারামের কাছে আবেদন জানালেন--

"জীবনের শেষ গান লইব গাহিয়া।।
তাইতে একটু সময় দেও মোরে ধার।
গান শেষে কর তুমি কার্য্য আপনার।।"

কেনারাম সম্মতি দিল এবং এরপর শুরু হল দ্বিজ বংশীদাসের ভাসান সঙ্গীত।

পংক্তির হিসাবে দ্বিজ বংশীদাস মনসামঙ্গল গেয়েছেন বিস্তৃত পরিসরে। দ্বিজ বংশীদাস কোনও একজনের রচনা পরিবেশন করেননি। নারায়ণদেব, বংশীদাস, কোটীশ্বরদাস, রাবণ পণ্ডিত প্রমুখ কবিদের রচিত মনসামঙ্গল তিনি গেয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করি মূল পালার দ্বিগুণেরও অধিক পরিমাণে মনসার ভাসান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এবং দ্বিজ বংশীদাসের সঙ্গীত পরিবেশন সমাপ্ত হলে দস্যু কেনারামের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাকে দেখা গেছে ক্রন্দনরত অবস্থায়। সারা জীবন ব্যাপী যত সম্পদ সে অর্জন করেছে তা সমস্ত দ্বিজ বংশীদাসকে দিয়ে দিতে চেয়েছে। শুধু প্রার্থনা জানিয়েছে তিনি যেন তাকে তাঁর চরণে ঠাঁই দেন। কেনারাম অকপটে স্বীকার করেছে সে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় কুসঙ্গে পড়ায় উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেনি। নিরন্তর সে তার পাপের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। সে স্বীকার করেছে—

"কত পাপ করিয়াছি লেখাজুখা নাই।
আমার মতন পাপী ত্রিভুবনে নাই।।
কত লোক মারিয়াছি এই খাড়া দিয়া।
আপনি মরিব আজি দেখ দাঁড়াইয়া।।

শেষপর্যন্ত নাছোড়াবান্দা কেনারামকে দ্বিজ বংশীদাস দীক্ষা দান করেছেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে মনসা ভাসান শিক্ষা করে, মনসা মাহাত্ম্য প্রচার করে সে মুক্তি লাভ করবে। পালার সমাপ্তি ঘটেছে এই বলে—

"শিউরি উঠিত লোক যে কেনার নামে।
পাগল হইয়া যায় সেই কেনার গানে।।"

এখন সমস্যা দুটি। একটি হল আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ১) বিস্তৃত পরিসরে মনসার ভাসানকে সন্নিবিষ্ট করার যৌক্তিকতা, ২) কঠিন হৃদয় দস্যু কেনারামের আমূল পরিবর্তনের মূলে অলৌকিক কোনও প্রভাব কার্যকরী হয়েছে কিনা। আর একটু বিস্তৃত করে বললে বলতে হয় প্রকারান্তরে মনসার প্রসাদেই তার রূপান্তর ঘটেছে কিনা। আপাতভাবে দুটি প্রশ্ন পৃথক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি অপরটির পরিপূরক। যদি কবির এইরূপ পরিকল্পনা থেকে থাকত মনসার মাহাত্ম্য প্রচারের মূল উদ্দেশ্যেই তিনি দস্যু কেনারামের পালার উল্লেখ করেছেন, তবে সেই দিক থেকে বিস্তৃত পরিসরে মনসার ভাসান রচনার উদ্দেশ্য স্বতঃই প্রমাণিত হয়। মনসার বরেই যার জন্ম, মনসার প্রসাদেই তার মনসার সেবকে রূপান্তরিত হওয়া। সেক্ষেত্রে সমস্যা হল পালাটির নামকরণ নিয়ে। দস্যু কেনারামের পালায় কেনারামই কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে গৃহীত হবে এটাই স্বাভাবিক। তার প্রসঙ্গই সবিস্তারে বর্ণিত হবে। সেখানে মনসার প্রসঙ্গ এলেও কখনই তা মূল প্রসঙ্গকে অতিক্রম করবে না। বাস্তবে তা ঘটেনি। আমরা প্রথমে দ্বিতীয় প্রশ্নটির মীমাংসা করব। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এই পালায় একটা অলৌকিকত্ব আছে। বিশেষ করে দস্যু কেনারামের জন্মপ্রসঙ্গে।

কিন্তু এর কোনও পাথুরে প্রমাণ মিলবে না। স্বপ্নাদেশ পালনের মাধ্যমে সন্তান

লাভের সৌভাগ্য অর্জন যুক্তি-তর্ক দিয়ে একে প্রতিপন্ন করা যাবে না। এমনও হতে পারে যে স্বপ্নাদেশ লাভ না করেও যশোধারা পুত্রবতী হতে পারতেন। এইবার কেনারামের হৃদয় পরিবর্তন ঘটিত ঘটনার প্রসঙ্গ। আধুনিক বিজ্ঞান শুধু মানুষ নয় পশুপক্ষী, গাছপালার উপরও সঙ্গীতের প্রভাবকে স্বীকার করে নিচ্ছে, দ্বিজ বংশীদাস তাঁর সুললিত কণ্ঠে, ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন তাই বিশেষ ভাবে কেনারামের চিত্তলোককে প্রভাবিত করেছে। এই প্রসঙ্গে বংশীদাসের নির্বাচিত হতভাগিনী বেহুলার ভাগ্যাহত অবস্থার করুণ বিবরণদানের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হবার দাবী রাখে। সদ্য বিবাহিতা বেহুলা দেবপুরে তার মৃত পতিকে নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন তা দেখে রাজ্যের লোক হাহাকার করছে পশুপক্ষীও বেহুলার ভাগ্যবিড়ম্বনার শরিক

"গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দে পশুপাখী।
ছয় ভাইয়ের বউয়ে কান্দে "কেমনে ঘরে থাকি।।'

কেনারামও এই সঙ্গীতের কথাই বলেছে :—

'গুরুগো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি।
শুনিয়া পাগল হইল পাষণ্ডের প্রাণী।"

এইবার দীর্ঘ পরিসরে মনসার ভাসানকে সন্নিবিষ্ট করার প্রসঙ্গ। দ্বিজ বংশীদাসকে আমরা সাধক বলে জানি। তাঁর সৎ পরামর্শদানে, উপদেশে যখন কেনারাম পরিবর্তিত হল না এবং দ্বিজ বংশীদাসকে হত্যা করার জন্য কেনারাম জেদ ধরল, তখন দ্বিজ বংশীদাস মৃত্যুর পূর্বে শেষবারের মত মনসার ভাসান গাইবার অনুমতি চাইলেন। জীবনে শেষবারের মত ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার ছিল বলেই দ্বিজ বংশীদাস দীর্ঘ সময় ধরে মনসার ভাসান গাইলেন। দ্বিতীয়ত যে কেনারামের হৃদয় পাষাণের মত কঠিন, মায়া মমতাহীন, তার হৃদয় পরিবর্তনের জন্য কিছুটা কালক্ষেপ করার আবশ্যক ছিল। খুব দ্রুত যদি গান শেষ হত তাহলে কেনারামের মত পাষণ্ডের কখনও হৃদয় পরিবর্তন ঘটত না। তার মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বংশীদাস দীর্ঘক্ষণ পাঁচালী গেয়েছেন। পাঠক কিন্তু দস্যু কেনারামের পালা পাঠ করেন কেনারামের আমূল পরিবর্তনজনিত ঘটনা আস্বাদনের জন্য। মনসার মাহাত্ম্য আস্বাদনের জন্য নয়। যতই তাই আলোচ্য পালাটিকে মনসার পাঁচালী ভারাক্রান্ত মনে হোক দস্যু কেনারামের আকর্ষণীয় বর্ণময় চরিত্র এবং তার নাটকীয় পরিবর্তন এই আখ্যানের মুখ্য আকর্ষণ। তবে এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হয় কেনারামের আখ্যায়িকায় দীর্ঘ মনসামঙ্গলের বর্ণনা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে এবং পালার শিল্পগুণ এতে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহে।

**দস্যু কেনারামের চরিত্র**

'দস্যু কেনারামের পালা'র মুখ্য চরিত্র কেনারাম দস্যুবৃত্তি করে। কোন পাপকর্মেই

যার আপত্তি ছিল না, সেই হেন কেনারাম দ্বিজ বংশীদাসের কণ্ঠে মনসামঙ্গল শুনে আশ্চর্যজনকভাবে পরিবর্তিত হল, তারই বিবরণ বর্ণিত হয়েছে 'কেনারামের পালা'য়।

বাকুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিল দ্বিজ খেলারাম এবং যশোধারা। নিঃসন্তান তারা। উভয়েরই সেই কারণে অন্তহীন মনঃকষ্ট। শেষে মনসার বরে জন্ম হল কেনারামের। খেলারাম এবং যশোধারার মনঃকষ্টের অবসান হল। কিন্তু বিধি বাম। কেনারামের যখন মাত্র সাত মাস বয়স, তখন তার মাতার মৃত্যু হল। নিরুপায় খেলারাম মাতৃহীন কেনারামকে নিয়ে উপস্থিত হল দেবপুর গ্রামে। এখানে মাতুলালয়ে লালিত পালিত হতে লাগল কেনারাম।

কেনারামের যখন এক বৎসর বয়স, তখন খেলারাম তীর্থ পর্যটনে নিষ্ক্রান্ত হল। কিন্তু তিন তিনটি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সে আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করল না। এদিকে প্রবল অনাবৃষ্টির কারণে কেনারামের মাতুল পাঁচ কাঠা ধানের বিনিময়ে তাকে হালুয়ার কাছে বিক্রয় করে দিল। শুরু হল কেনারামের পরিবর্তিত জীবন।

হালুয়ার সাতটি পুত্র দুর্ধর্ষ ডাকাত। এদের সংসর্গে কেনারামও দুর্ধর্ষ ডাকাতে পরিণত হল। শিশুকাল থেকেই সে দেবতা মানে না। ভাল-মন্দের কোন ভেদাভেদ জ্ঞান তার নেই। পাপ কাকে বলে তাও সে জানে না। স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণের কোন বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও সে অকারণেই পথিক হত্যা করে তার যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করে। আহৃত সম্পদ তার কাজে লাগে না, সব ভূমিতে প্রোথিত করে। তার অবস্থান গভীর বনে। ক্ষুধায় বিচরণরত মহিষ অথবা গাভীর দুগ্ধ পান করে সে। কেনার ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত। তার ভয়ে কেউ দূরবর্তী স্থানে সহজে যাত্রা করে না। এমনকি সন্ধ্যাবেলা কেউ গৃহের বাইরে পর্যন্ত যায় না।

এ হেন কেনারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল একদিন দ্বিজ বংশীদাসের। কেনারাম দ্বিজ বংশীদাসের কাছে প্রথমে জানতে চাইল তাকে তিনি চেনেন কিনা। বংশীদাস নির্ভয়ে জানালেন—

পাপেরে দেখিয়া বল কেবা নাহি চিনে।।

যাইহোক, কেনারাম বংশীদাসকে তাঁর যথাসর্বস্ব তাকে দিয়ে দেবার জন্য বলল। বংশীদাস জানালেন তাঁর সম্বল বলতে কয়েকটি ছিন্ন বস্ত্র মাত্র। কেনারাম জানতে চাইল, বংশীদাস বাড়ী বাড়ী যে গান গেয়ে বেড়ান, বিনিময়ে তাহলে কি পান? বংশীদাস জানালেন, তিনি গান গেয়ে পাপীর মনকে দ্রবীভূত করেন। কেনারাম ছাড়বার পাত্র নয়। তাই সে জানাল—

পাই বা না পাই কিছু ইতে নাহি দুখ।
মানুষ মারিয়া আম্মি পাই বড় সুখ।।

এই বলেই সে বংশীদাসকে হত্যা করার জন্য তার হাতের খাঁড়াটি তুলে ধরল। বংশীদাস তাকে নানা উপদেশ দিয়ে বোঝাতে চাইলেন নরহত্যা গর্হিত অপরাধ। এই অপরাধে নরক যন্ত্রণা ভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কেনারামের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল—

মানুষ মারিয়া মোর মনে নাহি দুখ।
যত মারি তত যেন পাই মনে সুখ।।

বংশীদাসের প্রশ্নের উত্তরে কেনারাম দ্বিধাহীন ভাবে জানাল যে তার দারাপুত্র কেউ নেই এবং অর্থেও তার কোনো প্রয়োজন নেই, তথাপি নর হত্যাতেই তার আনন্দ।

বংশীদাস তাকে পরামর্শ দিলেন—সে যেন দরিদ্রকে তার আহৃত সম্পদ দান করে, নতুবা সে নিজে যেন তা ভোগ করে। নতুবা সম্পদ আহরণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু কেনারামের যুক্তি অদ্ভুত। সে দরিদ্রকে ধন দানের আদর্শে বিশ্বাসী নয়। কেননা দরিদ্র একবার যদি ধনের স্বাদ পায়, তবে সে হয়ে উঠবে লোভী।

ধনলোভে মত্ত হইয়া করিবে কুকাজ।
হাজার কলঙ্কে তার নাহি হবে লাজ।।
পড়িলে একটিবার লোভের বিপাকে।
মানুষ ডাকাইত হয় জ্ঞান নাহি থাকে।।

কেনারাম সমস্ত সম্পদ ভূগর্ভে রেখে দেয়। কারণ তার বিশ্বাস—

এ ধন সকলি মাটীর।
মাটীতে লুকাইয়া রাখি যুক্তি করি স্থির।।
মাটীতে মিশিয়া ধন যাউক মাটী হইয়া।
মানুষ যে নাহি পায় সে ধন খুঁজিয়া।।

কেনারাম দস্যু ও নরহত্যাকারী হলেও তার বাস্তবজ্ঞান যে কত প্রখর, তার পরিচয় মেলে যখন সে বংশীদাসকে উদ্দেশ করে বলে—

ভাবিয়া দেখহ ঠাকুর যত টাকাকড়ি।
কেবলি লোভের চিহ্ন জগতের বৈরী।।

তার অভিজ্ঞতার নির্যাস বর্ণিত হয়েছে দুটি পংক্তিতে—

দেশে যত ধনী আছে তাহাদের ধনে।
ভিক্ষুক লোকের আসে কোন প্রয়োজনে।।

এরপর কেনারাম বংশীদাসকে আঘাত করতে উদ্যত হলে বংশীদাস কিছু সময় চেয়ে নেন শেষবারের মতন 'বেহুলার ভাসান' গাইবার জন্য। কেনারাম অপেক্ষা করতে থাকে। বেহুলার ভাসান শেষ হলে দেখা গেল কেনারামের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে তার দীর্ঘকালের অর্জিত সম্পদ বংশীদাসকে দিতে উদ্যত, শুধু তাই নয়, বংশীদাসকে সে গুরু বলে সম্বোধন করেছে। সে অকপটে স্বীকার করেছে—

শৈশবে না পাইলাম শিক্ষা না চিনিলাম পথ।
এতদিনে পাইয়া তোমায় সিদ্ধ মনোরথ।।

বংশীদাস কেনারামের কাছ থেকে কোনো সম্পদ গ্রহণে অস্বীকার করেছেন। কেনারাম তখন সমস্ত সম্পদ একে একে নদীর জলে বিসর্জন দিয়েছে। এরপর সে আত্মঘাতী হতে চেয়েছে। বংশীদাসের তখন কেনারামের প্রতি করুণা হয়েছে। তিনি

তাকে মুক্তিমন্ত্র দানে স্বীকৃত হয়েছেন। কেনারাম শিষ্য হয়েছে দ্বিজ বংশীদাসের। গুরুর কাছে শেখা বেহুলার ভাসান গেয়ে কেনারাম বাড়ী বাড়ী মুষ্টি ভিক্ষা করে।

যারে দেখ্যা দেশের লোক আগে পাইত ভয়।
তাহারে ডাকিয়া লোকে গীত গাইতে কয়।।
যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ।
শুনিলে তাহার গান গলয়ে পাষাণ।

দস্যু রত্নাকর ভাবরত্নাকর বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, দস্যু কেনারামের ভক্ত কেনারামে রূপান্তরিত হওয়ার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে আলোচ্য পালায়। তবে পালাটিতে গুরুত্ব প্রদত্ত হয়েছে বংশীদাসের অলৌকিক প্রভাবের উপর। কেননা নরহত্যায় পটু কেনারামকে তিনি সঙ্গীত সুধা বর্ষণে বিগলিত করেছিলেন, তার জন্মান্তর ঘটিয়েছিলেন। বংশীদাসের অতুলনীয় গায়ন রীতির সহায়ক হয়েছিল মনসার ভাসান। তবু স্বীকার করতে হবে কেনারামের পরিবর্তন মোটেই অস্বাভাবিক কিংবা অযৌক্তিক হয়নি। অত্যন্ত বাস্তবসম্মত হয়েছে তার রূপান্তর, আর এইখানেই কবির বিরল নৈপুণ্যের পরিচয় প্রকাশিত।

## রূপবতী

প্রকৃতিতে 'রূপবতী' পালাটি কিছুটা স্বতন্ত্র, কেননা এই পালা অন্যান্য গীতিকার মত নায়ক-নায়িকার প্রাক-বিবাহ প্রেমের বিবরণে সমৃদ্ধ নয়, বিবাহোত্তর প্রেমের পরিচয়েই পালাটি সমুজ্জ্বল।

রামপুরের রাজা রাজচন্দ্র মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কিন্তু তার দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করার কথা মনে রইল না। এদিকে রাজকন্যা রূপবতী চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করেছে, তাই তার বিবাহের জন্য রাণী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি রাজাকে কন্যার প্রসঙ্গ জানিয়ে পত্র দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পত্রের বিষয় অবহিত হয়ে নবাব প্রস্তাব করে বসলেন তিনিই রূপবতীর পাণিপ্রার্থী হবেন। রাজা দেশে ফিরলেন, কিন্তু নবাবের ইচ্ছার কারণে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে জানালেন পরদিন সকালেই তিনি যাকে প্রথমে দেখবেন, তারই সঙ্গে কন্যার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবেন। রাণী কৌশলে মদন নামে এক ভৃত্যকে পরদিন প্রত্যুষেই রাজার শয়নমন্দির দ্বারে তামাক নিয়ে উপস্থিত করালেন। তারই হস্তে রাণী কন্যাকে সমর্পণ করলেন।

মদন ও রূপবতী বনে নির্বাসিত হল। সৌভাগ্যক্রমে তারা আশ্রয় পেল কাঙ্গালীয়া জাঙ্গালীয়াদের গৃহের জ্যেষ্ঠ বধূ পুনাইয়ের কাছে। এদিকে মদন তার পিতামাতার সন্ধান নেবার জন্য যাত্রা করলে রাজার লোকদের হাতে ধৃত হল রাজকন্যার অপহরণকারী রূপে। তাকে বলি দেওয়া হবে বলে স্থির হল। পুনাই রূপবতীর কারণে হাজির হল রাজদরবারে। রাজাকে জানাল—

নিশি রাইতে রাণী যারে কন্যা দিল দান।
সেইত জামাই তোমার পুত্রের সমান।।

মদন নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় সে মুক্তি পেল। রাজা মহাসমারোহে মদনের সঙ্গে রূপবতীর বিবাহ দিলেন। এইভাবে কাহিনীটিকে মিলনাত্মক করা হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন,–

'ইহার মধ্যে রূপকথার রূপ ও গীতিকথার রস দুইই আছে।'[৭]

প্রকৃতিতে রূপবতী যে রূপকথাধর্মী তাতে সন্দেহ নেই। রাজা রাজচন্দ্র যখন বলেন প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে সর্বাগ্রে তিনি যাকে দেখবেন, তার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দেবেন–

মালী ডোম আইজঙ্গ না করব বিচার।
কন্যা বিলাইয়া দিবাম নাহিক আচার।।

তখনই রূপকথার সঙ্গে এর সাযুজ্য ধরা পড়ে। তাই বলে রূপকথার মত আলোচ্য পালাটি একান্তভাবে কল্পনাশ্রয়ী হয়নি। রূপকধর্মী হয়েও শেষপর্যন্ত পালাটি বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক সমাজজীবনের নানা পরিচয় পালাটিতে উপস্থাপিত। অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দানের রীতি, সমাজে গণকের ভূমিকা, জলপথে যাত্রার রেওয়াজ, বাংলার হাতীর দাঁতের পাটি, গজমতির মালা, শীতল পাটি, অভ্র নির্মিত চিরুণী ইত্যাদির খ্যাতি, নবাবের অযৌক্তিক আচরণের বিবরণ ইত্যাদি পালাটির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বর্দ্ধিত করেছে। সংক্ষিপ্ততা ধর্মও ক্ষেত্রবিশেষে রক্ষিত হতে দেখা গেছে। রাজা রাজচন্দ্রের তিন বৎসরকালের জন্য অনুপস্থিতি বর্ণিত হয়েছে অনাড়ম্বরভাবে–

তিন বছর গেল যদি রাজা না আইল।

রাজার নবাবের কাছে যাত্রার বিবরণ সংক্ষেপে হলেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালের কোন অভিজ্ঞতাই উল্লিখিত হয় নি। একেবারে রাজার গৃহে উপস্থিতির কথা ঘোষিত হয়েছে। অনুরূপভাবে রাজ-জামাতা মদন কিভাবে কোথায় বন্দী হল, তার মাতা পিতার সঙ্গে আদৌ সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে পাঠক অন্ধকারে থাকতে বাধ্য হয়।

রাণী বিবাহযোগ্যা কন্যা রূপবতীর বিবাহের ব্যাপারে গণকদের শরণাপন্ন হলে এক এক গণক এক এক রকম গণনা করেছে। তাদের বক্তব্যের কেবল এক জায়গাতেই সাদৃশ্য–তা হল রাজকন্যার বিবাহ হবে রাজপরিবারে, রূপবতী হবে রাজরাণী। গণকদের গণনা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, রূপবতীর বিবাহ হয়েছে বাড়ীর বক্সী মদনের সঙ্গে। বোঝা যায় রাণীর মন রাখতেই গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত। পালাটির ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চ কবিকল্পনার স্বাক্ষর বিদ্যমান। যেমন–

আন্ধাইবা নিঝুম রাতি আশমানে জ্বলে তারা।
মদন আসিয়া দুয়ারে হইল খাড়া।।
লাজেতে গলিয়া পড়ে কন্যার মাথার কেশ।

আস্তেব্যস্তে টানিয়া কন্যা পরে নিজ বেশ।।
না আসিল পুরোহিত কুল আচরণ।
নিঝুম রাতে করে মায় কন্যা সমর্পণ।।
লইয়া কন্যার হাত মদনেরে দিল।
কেহ না জানিল মায় কন্যা সমর্পিল।।

একমাত্র রাজকন্যার বিবাহ, কত সমারোহ সহকারে হবার কথা, তা নয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর রাতে একান্ত অনাড়ম্বরভাবে সাধিত হল রাজকন্যা রূপবতীর বিবাহ পর্ব। এই বেদনাদায়ক, করুণ ঘটনাটি বর্ণনায় কবি যথার্থই শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। হতভাগিনী কন্যার বিবাহে যে শুধু পুরোহিত জোটেনি তাই নয়, এমনকি তার সাজসজ্জাও তাকে নিজেকেই করে নিতে হয়েছে। এরপরই শুরু হয়েছে নব পরিণীত দম্পতির অনিশ্চিত পথে যাত্রা।

বাগ্‌ধারা প্রয়োগে কিংবা অলঙ্কারের ব্যবহারেও কবির নৈপুণ্য স্বীকার করতে হয়। অখণ্ডনীয় ভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে মদন রূপবতীকে বলেছে—'শিরে কইলে সর্পাঘাত ওঝায় কিবা করে।'

সামান্য একজন বক্‌সী হয়ে যে মদন রাজকন্যাকে স্ত্রী রূপে লাভ করবে, এ ছিল আশাতীত ঘটনা। মদন এজন্য সঙ্কুচিত হয়েছে এবং তার মত অযোগ্য পাত্রে রাজকন্যাকে সমর্পণ করার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছে—'দৈবের নৈবেদ্য করে কুক্‌কুরে ভোজন।'

অন্যান্য গীতিকার মত আলোচ্য গীতিকাতেও গতানুগতিক প্রকাশভঙ্গীর সাক্ষাৎ মেলে। যেমন—

বাপের বাড়ীর পাল্কীরে কোথায় চল্যা যাও।
মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও।।

## রূপবতী পালায় মাতৃচরিত্র

রামপুর শহরে রাজত্ব করেন রামচন্দ্র। তিনি নবাবের দরবারে সেই যে যাত্রা করলেন আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। দীর্ঘ তিন বৎসর অপেক্ষা করার পরও যখন রাজা ফিরলেন না তখন রাণী অগত্যা নিরুপায় হয়ে পত্র প্রেরণ করলেন। একে তো রাজার অনুপস্থিতির জন্য রাণীর চিন্তার অবধি ছিল না, তার উপরে যুক্ত হয়েছিল তার অনূঢ়া কন্যার চিন্তা। রূপবতী চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করা সত্ত্বেও তার বিবাহের কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। তৎকালীন সামাজিক প্রথানুযায়ী এটা ছিল দৃষ্টিকটু অপরাধ। পাড়া প্রতিবেশীরা অনূঢ়া রূপবতীকে নিয়ে কানাকানি করল। জননী হৃদয়কে তা পীড়িত করতে থাকল। রাণী রাজাকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন—

পরথম যৌবন কন্যার লোকে কানাকানি।
তা শুন্যা কেমনে সহে মায়ের পরাণি।
বিবাহের কাল গেল উচিৎ না হয়।
এমন কন্যা ঘরে রাখলে ধর্ম্মনাশ হয়।।

হতভাগিনী রাণী সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় যেটুকু করা সম্ভব তাই করলেন। বিভিন্ন গণকের শরণাপন্ন হলেন, কন্যার বিবাহের ব্যাপারে তত্ত্বতল্লাশ চালাতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত রাজা রামচন্দ্র রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু তিনি বহন করে আনলেন এক অতিশয় দুঃসংবাদ। নবাব রূপবতীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। মুসলমান নবাবের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলে রাজার জাতি ধর্ম দুই-ই নাশ হবে। তাই রাজা প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখবেন তার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দেবেন।

রাণী রাজার প্রতিজ্ঞা শুনে চিন্তিত হলেন বটে কিন্তু তিনি তার কর্তব্য বিস্মৃত হলেন না। তিনি এক চালাকি করলেন। পাছে সত্যসত্যই রাজা যার তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন এই ভয়ে বাড়ীর বক্‌সী মদনকে ডেকে পাঠিয়ে রাজার প্রতিজ্ঞার কথা আনুপূর্বিক বললেন। পাছে রাজা রাণীর চালাকি ধরতে পারেন, সেইজন্য মদনকে শিখিয়ে দিলেন—

শুন শুন মদন আরে কহি যে তোমারে।
নিশি ভোর কালে তুমি যাইও শয়ন মন্দির-দ্বারে।।
হুক্কাতে তামুক লইয়া ছল কইরা যাইও।
মন্দির-দুয়ারে তুমি গিয়া খাড়া হইও।

মদনও সেইমত সকালবেলা রাজার সম্মুখে উপস্থিত হলে রাজা মদনের হাতেই তার কন্যাকে সমর্পণ করলেন। স্বভাবতই আমরা রাণীর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারি না। চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রাণী মদনের হাতে তার কন্যাকে সমর্পণ করলেন (পাঠান্তর অনুযায়ী)। রাণী জানেন তার কন্যা-জামাতার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চয়তায় ভরা। তাই কন্যা সমর্পণ করে মদনকে উদ্দেশ করে বললেন—

ছিঁড়িয়া বুকের নলী দিলাম তোমারে।
পোষা পাখী দিলাম আমার ভাঙ্গিয়া পিঞ্জরে।।
বনে থাক জলে থাক রাইখো মায়ের কথা।
এই কন্যার মনে তুমি নাহি দিও ব্যথা।।
সুখে রাখ দুঃখে রাখ তুমি প্রাণপতি।
তুমি বিনে অভাগীর নাহি অন্য গতি।।

রাণী পরবর্তী কর্তব্যও যথাযথ সম্পাদন করতে ভুললেন না। গভীর রাতে মাঝি মাল্লাদের ডেকে এনে সকলের অগোচরে কন্যা জামাতাকে নৌকায় চড়িয়ে যাত্রা করিয়ে দিলেন। পালায় রাণীর প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ জননীরূপে রাণীকে আমরা কেবল অন্ধ অপত্যস্নেহের আধার রূপেই পাইনি। তাঁর কতর্ব্যপরায়ণতার পরিচয়ও পেয়েছি।

**রূপবতী চরিত্র**

হতভাগিনী রূপবতী তার মাতার অবলম্বিত কৌশলে এবং পিতৃইচ্ছায় মদনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হল। নবাবের ক্রোধবহ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য দুজনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বনান্তরে উপস্থিত হল। মদন ছিল রূপবতীদের বাড়ীর অতি সাধারণ কর্মচারী। তার পক্ষে রাজকন্যার স্বামী হওয়া ছিল স্বপ্নেও অতীত ব্যাপার, সে তাই রূপবতীকে উদ্দেশ করে বলেছে—

আমি তো চণ্ডাল কন্যা তুমি গঙ্গার পানি।
না ধরিব না ধুইব তোমার চরণ খানি।।

কিন্তু রূপবতী মদনকে তার পতির মর্যাদা দিয়ে বলেছে,—

শুন শুন প্রাণপতি কই যে তোমায়।
তোমার হস্তে সমর্পণ কইরা দিল মায়।।
বনে জংলায় থাকি তুমি মোর স্বামী।
তুমি বিনা অন্য কারে নাহি জানি আমি।।

রূপবতীর মধ্যে আমরা কোনো উন্নাসিকতা দেখি না। সে পরিস্থিতি ও পরিবেশকে স্বীকার করে নিয়েছে ও মানিয়ে নিয়েছে। ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর মদন রূপবতীর কাছে পক্ষকালের জন্য বিদায় চেয়ে নিল তার মা বাবার সংবাদ নিয়ে আসবে বলে। একপক্ষ অতিক্রান্ত হবার পরও মদন যখন প্রত্যাবর্তন করল না, দেখা গেল রূপবতী বড়ই চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে। সে মদনের জন্য পথের দিকে চেয়ে থাকে, চোখ দিয়ে অবিরত অশ্রু নির্গত হয়, রূপবতীর খেদোক্তি থেকেই জানা যায় মদনের প্রতি তার আন্তরিক আকর্ষণের কথা—

তুলিয়া গাঁথিলাম মালা মালা হইল বাসি।
এমন যৈবন কালে বন্ধু হইল বৈদেশী।।
রাইত যায় আমার আশে দিনে আইব বলি।
পন্থের পানে চাইয়া থাকতে চক্ষে পড়ে বালি।।

শেষে রূপবতী খবর পেয়েছে রাজা মদনকে ধরে নিয়ে গেছেন, নরবলি দেবার উদ্দেশ্যে। এই সংবাদে রূপবতী একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার শিরেতে বাজ পড়েছে। সে তার আশ্রয়দাত্রী পুনাইকে নিবেদন করে বলেছে—

যেখানেতে গেছে পতি
অইবাম মরণের সাথী
জীবনে আমার কার্য নাই।।

রূপবতীর আগ্রহাতিশয্যে পুনাই শেষপর্যন্ত স্বয়ং রাজচন্দ্র সমীপে উপনীত হয়েছে। তার যুক্তির কাছে রাজা হার স্বীকার করে মদনকে মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, উপযুক্ত মর্যাদায় রূপবতীর সঙ্গে মদনের বিবাহও দিয়েছেন।

প্রেমের লক্ষণ হল নিজের শত দুঃখ কষ্টকে অবজ্ঞা করে ভালবাসার জনের জন্য চিন্তিত

হওয়া এবং ভালবাসার জনের শত দুঃখ যন্ত্রণার জন্য নিজেকে দায়ী করার মানসিকতা। রূপবতীকেও দেখা গেছে মদনের বনবাসী হবার জন্য সে নিজেকে দায়ী করেছে,—

এতেক করিল বিধি কপালেরে দোষি।
আমার লাগিয়া বন্ধু তুমি বনবাসী।।

পিতার হাতে তার স্বামীর বন্দী হবার কথা শুনে বিলাপ করে রূপবতী বলেছে,—

গাঁথিয়া পুষ্পের হার একদিন নাহি দিলাম বন্ধুর গলে গো।
রাঁধিয়া চিকনের ভাত তুইল্যা না দিলাম বন্ধুর মুখে গো।।

অর্থাৎ রূপবতী নিজের কর্তব্যচ্যুতির দিকগুলিকেই বড়ো করে দেখতে চেয়েছে। তার সব থেকে বড় প্রশংসনীয় দিক শত প্রতিকূলতা ও দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করেনি, দোষী করেছে নিজের কপালকেই,

আর কারে বা দিব দোষ কপালেরে দোষিব।

রূপবতী পালায় রূপবতীকে কিছুদিনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে হলেও সে তার স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। তার সুখী দাম্পত্য জীবনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে পালার সমাপ্তি হয়েছে।

**রাজচন্দ্রের চরিত্র**

রাজা রাজচন্দ্রের রাজত্ব রামপুর শহরে। নবাবের দরবারে তাঁর উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন বোধ করে তিনি গণককে ডাকিয়ে দিন স্থির করলেন। অর্থাৎ তিনি যে দিন ক্ষণ স্থির করার ব্যাপারে গণকের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তার প্রমাণ মেলে এর থেকেই। তিনি নবাবকে উপঢৌকন দেবার জন্য সঙ্গে নিলেন অভ্রের চিরুণী, ডালা, পাখা, হাতীর দাঁতের পাটি, গজমতির মালা, তাছাড়া নবাবের রাজস্ব বাবদ দশ সহস্র টাকাও সঙ্গে নিলেন। সংগৃহীত উপঢৌকন থেকে রাজার রুচিবোধের পরিচয় মেলে। রাজার দায়িত্ববোধের বড়ই অভাব ছিল। তাই নবাবের কাছে পৌঁছে তাঁর আর গৃহের কথা মনে রইল না। দীর্ঘ তিনটি বৎসর তাঁর নবাবের কাছেই অতিবাহিত হয়ে গেল। এদিকে প্রাসাদে রাণী একাকিনী কন্যা রূপবতীকে নিয়ে অপেক্ষমান।

শেষে নিরুপায় হয়ে রাণী রাজাকে পত্র প্রেরণ করলেন কন্যা রূপবতীর বিবাহ-প্রসঙ্গ জানিয়ে। রাজা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু বড়ই চিন্তিত দেখা গেল তাঁকে। চিন্তার কারণ, স্বয়ং নবাব রূপবতীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। নবাব জাতিতে মুসলমান। অতএব তার সঙ্গে একমাত্র কন্যার বিবাহ দেওয়ার অর্থ জাতিনাশ এবং ধর্মনাশ। রাজা কিভাবে সমস্যার মোকাবিলা করবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একবার ভাবলেন রাজত্ব ত্যাগ করে বনে চলে যাবেন। প্রতিজ্ঞা করলেন পরদিন প্রভাতে যার মুখ দেখবেন প্রথমে, তার হাতেই রূপবতীকে সমর্পণ করবেন। রাণী কৌশলে মদনকে পরদিন রাজার সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত করালেন। রাজা রাণীর কৌশল ধরতে পারলেন না। তিনি মদনের উপস্থিতি স্বাভাবিক মনে করলেন। তার পরিচয় জেনে তিনি খুশী হলেন এবং

কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের আয়োজন করলেন।—

শুভদিন শুভক্ষণ স্থির যে করিল।
শুভ লগ্ন পাইয়া রাজা কন্যাদান দিল।।

পাঠান্তরে রাজাকে অনেক বেশি ব্যক্তিত্বহীন রূপে উপস্থাপিত দেখা গেছে। তিনি স্থির করলেন নবাবকে কন্যা সমর্পণ না করলে তাঁর জমিদারী থাকবে না, তাছাড়া তাঁর গর্দান যাবারও সমূহ সম্ভাবনা। তিনি রাণীকে বলেছেন—

আয়োজন কর রাণী পাঠাও কন্যারে।
গলায় কলসী বান্ধ্যা আমি ডুবিব সায়রে।।

রাণী সঙ্গোপনে কন্যার বিবাহের আয়োজন করেছেন মদনের সঙ্গে এবং দুজনকে দূরে প্রেরণ করেছেন।

রাজা যে বিবাহের সংবাদ অবগত ছিলেন না, তার পরিচয় মেলে তাঁর পরবর্তী আচরণে—

রাজা যে মারিল ডঙ্কা সহরে বাজারে।
যেজন ধরিয়া দিবে তার দুষমনেরে।।
জাতি নাশ কৈল দুষমন কুলে দিল কালি।
দুষমনে ধরিয়া রাজা দিবে নরবলি।।

যে রাজা প্রতিজ্ঞা করেন প্রভাতে যার মুখ প্রথমে দেখবেন, তারই হাতে কন্যাকে সমর্পণ করবেন, তাঁকেই দেখা গেছে জাতপাত রক্ষায় অশেষ আগ্রহীরূপে। সত্য সত্যই মদন বন্দী হয়েছে এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে কারাগারে। শেষে পুনাইয়ের সকরুণ আবেদন এবং রাণী কর্তৃক মদনের হাতে রূপবতীকে সমর্পণ করার কথা জানালে মদনের মুক্তি সম্ভবপর হয়েছে। কন্যার স্মৃতি মনে পড়ায় রাজাকে অশ্রুসজল দেখা গেছে। শুধু মদনকে তিনি মুক্তিই দেন নি, কন্যার সঙ্গে তার বিবাহও দিয়েছেন। রাণীর তুলনায় রাজাকে বড় বেশি ব্যক্তিত্বহীন দেখা গেছে।

## কঙ্ক ও লীলা

কঙ্ক ও লীলা পালাটির বিষয় চৈতন্য সমসাময়িক বলে অনুমিত হয়। বস্তুতপক্ষে আলোচ্য পালাটিতে যে পরিমাণ চৈতন্য প্রভাব লক্ষিত হয়, অন্য কোন গীতিকায় তা অনুপস্থিত। কঙ্ক পীরের কাছে দীক্ষা নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে যে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেই আশ্রয় নিয়েছিল, তার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে আখ্যানে লভ্য। নিমগাছের তলায় শায়িত কঙ্ক নিদ্রামগ্ন অবস্থায় এক স্বপ্ন দেখে—দেখে যে সে শ্মশানে জ্বলন্ত অগ্নিতে পড়েছে, তার চতুর্দিকে পিশাচেরা তাণ্ডবে রত। কঙ্ক তখন তার জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল—

রক্ত গৌর তনু তার কাঞ্চনের কায়া।
আগুন হইতে কঙ্কে দিল বাচাইয়া।।

স্বপনে আদেশ তার পাইয়া কঙ্কবর।
প্রভাতে 'গৌরাঙ্গ' বলি তেজিলেন ঘর।।

কাঞ্চন কায়া বিশিষ্ট ব্যক্তিটি যে গৌরাঙ্গ তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। আমরা আরও জানতে পারি যে স্বপ্নে গৌরাঙ্গ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কঙ্ক গৃহত্যাগী হল। কঙ্ক যে চৈতন্যদেবেরই সমসাময়িক, তার প্রমাণ মেলে গর্গের বক্তব্য থেকেও। মাধব সুন্দরকে তিনি কঙ্কের অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করেছেন, সেই সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন কোথায় তাকে পাওয়া যেতে পারে সেই প্রসঙ্গে—

কিন্তু এক কথা মোর শুন দিয়া মন।
গৌরাঙ্গের পূর্ণ ভক্ত হয় সেই জন।।
যে দেশে বাজিতে গৌর চরণ-নূপুর।
সেই পথ ধরি তোমরা যাও ততদূর।।
যে দেশেতে বাজে প্রভুর খোল করতাল।
হরি নামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল।।
সেই দেশে কঙ্কর করিও অন্বেষণ।
অবশ্য গৌরাঙ্গ ভক্তে পাবে দরশন।।
যে দেশে গাছের পাখী গায় হরিনাম।
নাম-সংকীর্তনে নদী বহে সে উজান।
শিষ্য-পদধূলি মেখে ছাইয়াছে গগন।
সে দেশে অবশ্য প্রভুর পাবে দরশন।।

যে দেশে গৌর চরণ নূপুর ঝংকৃত, সেখানেই কঙ্ককে পাওয়া যাবে একথা বলতে স্পষ্টই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে স্বয়ং গৌরাঙ্গ যে অঞ্চলে পর্যটনরত, কঙ্কও সেখানেই অবস্থান করছে।

গীতিকাটির একটি ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে। নির্দোষ কঙ্ক কপালের ফেরে গর্গ প্রদত্ত আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হল বোঝাতে কবি বলেছেন—

কপালের দোষে যেমন রামের বনবাস।

আখ্যানেতে একাধিক স্থলে অলৌকিকতার উল্লেখ লক্ষণীয়। অলৌকিকতা পীরের ক্ষমতা বর্ণনা প্রসঙ্গে লক্ষিত হয়—

ধূলা দিয়া ভাল করে আইসে রোগী যত।

কিংবা—

মাটী দিয়া বানায় মেওয়া কিবা মন্ত্রবলে।

পীর সকলের সব মনোবাসনাই পূরণ করেছে। এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি কঙ্ককে পীরের প্রতি আকৃষ্ট করানোর জন্যই পীরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'গীতিকায় অলৌকিকতার কোনও স্থান নাই'—একথা 'কঙ্ক ও লীলা'র ক্ষেত্রে যে অন্তত: প্রযোজ্য

নয়, তা অনস্বীকার্য। অবশ্য একথাও সত্য যে সাধারণত গীতিকাগুলি অলৌকিকতা বিবর্জিত'। আলোচ্য পালায় গর্গের শ্রুত দৈববাণীকে অবশ্য গর্গেরই 'বিবেকের বাণী' বলে যে ড. ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করেছেন আমরা তার সঙ্গে একমত।

বিশেষভাবে গীতিকাটিতে কঙ্কের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের ঐক্যবদ্ধ চক্রান্ত, সেকালের হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার প্রাবল্যকেই সূচিত করে। কবির লোক চরিত্র সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান ছিল তার চমৎকার পরিচয় মেলে সামনাসামনি গর্গকে সায় দিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে সমালোচকদের তাঁর বিরুদ্ধে ফন্দী আঁটার বিবরণে। নদীর জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দর্শনে লীলার প্রতিক্রিয়া বর্ণনায়, যৌবন-সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তাৎক্ষণিক চাঞ্চল্যের প্রকাশে কবির সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচয় মেলে—

হেরি সে সুন্দর রূপ চমকে সুন্দরী।
শীঘ্র গতি ঘরে ফিরে লইয়া গাগরী।।

**কঙ্কের চরিত্র**

হতভাগ্য কঙ্ক। স্রোতের শ্যাওলা হয়ে সারাজীবন তাকে ভেসে বেড়াতেই দেখা গেল। বিপ্রপুরের ব্রাহ্মণ গুণরাজ খানের পুত্র সে। মাত্র ছয় মাস বয়স যখন তার, তখনই সে মাতৃহারা হয়। পত্নীশোকে গুণরাজ প্রথমে পাগল হয়ে যায়, তারপর তারও মৃত্যু ঘটে। মুরারি নামে এক চণ্ডাল তখন কৃপা পরবশ হয়ে কঙ্ককে নিজ গৃহে আনে পালনের জন্য। কঙ্ক মুরারিকে পিতা ও মুরারির স্ত্রী কৌশল্যাকে জননী সম্বোধন করে। কঙ্কের যখন মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স, তখন মুরারিব মৃত্যু হল। পতির দুঃখে কৌশল্যাও অকাল মৃত্যুর শিকার হল। শেষপর্যন্ত কঙ্ক স্থান পেল গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণের কাছে। ব্রাহ্মণী গায়ত্রী পুত্রজ্ঞানে গ্রহণ করল কঙ্ককে। গায়ত্রীও মারা গেল অকালে। যাইহোক, তবু কঙ্ক গর্গের আশ্রয়েতেই রইল। কিন্তু দেখা দিল অন্য বিপত্তি।

গর্গের একমাত্র কন্যা লীলা। সে প্রেমে পড়ল কঙ্কের। কঙ্কের গুণ অনেক। গর্গের কাছে সে শাস্ত্র পড়ে। নানাবিধ শাস্ত্র অলংকারে তার ব্যুৎপত্তি। তাছাড়া বারমাসী ফরমাসী গান গাইতেও সে ছিল পারদর্শী। কঙ্কের বাঁশী বাজানোও ছিল অনবদ্য। আকর্ষণীয় রূপ তো তার ছিলই।

কঙ্কের দেনন্দিন কাজের মধ্যে ছিল গর্গের গরু চরানো। গোচারণ মাঠেই কঙ্কের সঙ্গে পরিচয় হল এক পীরের। কঙ্কের ভক্তিভাব, কবিত্বশক্তি, গানের গলা ইত্যাদির কারণে সর্বোপরি তার অনিন্দ্যকান্তিতে পীর তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কঙ্ক পীরের কাছে দীক্ষা নিল। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও সে পীরের কাছে কালাম শিক্ষা করল। গুরুর প্রতি কঙ্কের অবিচল নিষ্ঠা। পীরের আদেশে কঙ্ক রচনা করল সত্যপীরের পাঁচালী।

গর্গের ছিল কঙ্কের প্রতি অপরিসীম দুর্বলতা। তিনি তাকে সমাজে তুলে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা তাতে বাধ সাধল। শুধু তাই নয়, তারা কঙ্কের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। প্রচার করা হল কঙ্ক শুধু চণ্ডালের পুত্রই নয়, সে মুসলমান পীরের কাছেও দীক্ষিত। সেই সঙ্গে রটনা করা হল—

কঙ্কেরে সঁপেছে লীলা জীবন-যৌবন।

বেচারী গর্গ সত্যাসত্য বিচার না করেই, কঙ্কের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তাতেই ধরা দিলেন। তিনি কঙ্কের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হল, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। তিনি কঙ্ক ও লীলাকে হত্যা করবেন বলে স্থির করলেন। গর্গ কঙ্ককে হত্যার জন্য তার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করলেন। লীলা তা গোপনে দেখে কঙ্ককে জানিয়ে দিয়ে তাকে অন্যত্র চলে যাবার পরামর্শ দিল।

কঙ্ক গৃহত্যাগী হবার পূর্বে লীলাকে বারংবার বলে গেল সে যেন গর্গের উপযুক্ত পরিচর্যা করে—

তোমার আমার গুরুরে লীলা রইলেন পিতা।
জীবন মরণে যিনি সাক্ষাৎ দেবতা।।
এমন দেবের পূজা রে লীলা না করিও হেলন।

গর্গ কঙ্কের জীবন নাশে উদ্যোগী, তথাপি তাঁর সম্পর্কে কঙ্কের যে সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশিত, তাতেই তার মানসিক ঔদার্যের পরিচয় মেলে। গৃহত্যাগী হবার পূর্বে কঙ্ক লীলাকে অনুরোধ জানিয়ে গেছে সে যেন তাকে স্মরণে রাখে। দেবতার প্রতি কঙ্কের বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় পাই যখন সে লীলাকে বলে—

গৃহের দেবতা রইল রে লীলা শালগ্রাম শিলা।
শুদ্ধ মনে পূজা তারে করিও তিন বেলা।।
দেবের পূজা রে লীলা হেলা না করিও।

কিংবা, নারায়ণে স্মরিও সদা অগতির গতি।।

কঙ্ক তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে গেছে। ক্রমে গর্গ বুঝেছেন তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন, উপলব্ধি করেছেন যে তিনি কঙ্কের প্রতি অবিচার করেছেন। কঙ্কের সন্ধানে তিনি শিষ্য প্রেরণ করেছেন। কঙ্কের বিচ্ছেদে লীলা অকাল মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে। গর্গের কারণেই লীলার সঙ্গে কঙ্কেব মিলন ঘটল না। বেচারী কঙ্ক যখন ফিরে এলো, তার পূর্বেই লীলা দেহত্যাগ করেছে। কঙ্ক অতিশয় সংযমী। মানসিক দৃঢ়তা তার অসাধারণ। লীলার অকাল মৃত্যুতে তাই তাকে তেমন বিচলিত দেখা গেল না। শুধু লীলার প্রজ্বলিত চিতা সে প্রদক্ষিণ করে লীলার প্রতি শেষ সম্মান নিবেদন করেছে এবং গর্গকে নিয়ে নীলাচলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। কঙ্ক তার ব্যর্থতাময় জীবনের জন্য কাউকে দোষারোপ করেনি। সকল পরিস্থিতিকেই সে মানিয়ে নিয়েছে।

## গর্গের চরিত্র

গর্গ ছিলেন সুপণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ। ধর্মজ্ঞান ছিল তাঁর প্রবল। শ্মশানে অনাথ কঙ্ককে দেখে তিনি তাকে যত্নপূর্বক ওঠালেন, তারপর নিজের গায়ের নামাবলী দিয়ে কঙ্কের মুখ

মুছিয়ে দিলেন। সঙ্গে করে এরপর তাকে নিজগৃহে নিয়ে এসে আশ্রয় দিলেন। গর্গের এই আচরণে বোঝা যায় তিনি শুধু পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না, তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ ছিল জাগ্রত। বিরল মানবপ্রেম এবং কর্তব্যবোধ তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বলতা দান করেছে। তবে—"একদিক দিয়া ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠা, অপর দিক দিয়া বিপন্ন মানবতার প্রতি সহানুভূতিবোধ এই উভয়ের দ্বন্দ্বেই তাঁহার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য দূর হইল ;"[৮]

কঙ্কের যখন দশ বৎসর বয়স তখন গর্গ তার হাতেখড়ি দিলেন। কঙ্ক ফকিরের নির্দেশে সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করে 'কবিকঙ্ক' রূপে পরিচিতি লাভ করলে গর্গ খুব প্রীত হলেন। তিনি অনুধাবন করলেন কঙ্ক সামান্য একজন মানুষ নয়। তিনি স্থির করলেন কঙ্ককে সমাজে স্থান দেবেন। গর্গ অতি বিচক্ষণ তাই সচেষ্ট হলেন এ ব্যাপারে পণ্ডিত সমাজের সমর্থন আদায়ে। তিনি যুক্তি দেখালেন এই কঙ্ক ব্রাহ্মণ তনয়।

জ্ঞান মানে নাহি রয়, চণ্ডালের অন্ন খায়,
ঘরে নিতে নাহিক সংশয়।।

কিন্তু গর্গের সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হল। প্রতিপক্ষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে তাঁর শুভ প্রয়াস পর্যুদস্ত হল বরং তাদের দুষ্ট চক্রান্তের জালে পড়লেন গর্গ। রটনা করে দেওয়া হল কঙ্ক শুধু চণ্ডালের পুত্র নয়, কিংবা সে শুধু মুসলমান পীরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেনি, সে বেদাচারহীন, সন্ধ্যা-মন্ত্র তার অজানা, সর্বোপরি লীলা তার জীবন-যৌবন কঙ্কের হাতে সমর্পণ করেছে। গর্গ বিভ্রান্তির শিকার হলেন। তিনি কঙ্কের বিরুদ্ধে রটনাকে সত্য বলে মানলেন আর সঙ্গে সঙ্গে লীলা ও কঙ্কের বিনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। যে কঙ্কের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস, সেই কঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারই জন্য লীলা বিপথগামী হয়েছে। লজ্জা এবং ক্রোধের বশবর্তী হওয়ার ফলে গর্গের বিচার বুদ্ধি লোপ পেল।

কিভাবে তিনি তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করবেন যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কন্যা লীলাকে একবার নির্দেশ দিলেন।—

শীঘ্রগতি আন জল কলসী ভরিয়া।
দেবের মন্দির গেল অপবিত্র হইয়া।।
কুস্বপন দেখিয়াছি কাল নিশাভাগে।
দেবতা চলিয়া যান তেই সে বিরাগে।।
জল লইয়া তুমি আইস তাড়াতাড়ি।
স্বহস্তে মন্দির আমি পরিষ্কার করি।।

পরক্ষণেই তাঁর আদেশ পরিবর্তিত হয়। গর্গ বলেন—

শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
আমিই আনিব জল দেবের কারণ।।

গর্গের অস্থিরচিত্ততার প্রতিফলন ঘটেছে এইভাবে। কিন্তু গর্গের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভূমিকা দেখা গেল এর পরবর্তী পর্যায়ে। যে গর্গ কঙ্কের আশ্রয়দাতা ছিলেন,

অপত্যস্নেহে যাকে মানুষ করেছিলেন, সেই তিনিই কঙ্কের প্রাণহরণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। গোপনে কঙ্কের আহার্যে তিনি মিশ্রিত করলেন কালকূট বিষ। লীলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে কঙ্কের জীবন রক্ষা পেলেও মৃত্যুমুখে পতিত হল সুরভি। গর্গের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তাঁর পাষাণবৎ হৃদয় বিগলিত হল। এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য তিনি মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন না। অভুক্ত গর্গ দেবের চরণে হত্যা দিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন। শেষপর্যন্ত ঘটনা পরম্পরায় তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না যে শত্রুপক্ষ কৌশলে তাঁর প্রিয় কঙ্ককে বিতাড়িত করেছে। তিনি শিষ্য বিচিত্র মাধবকে কঙ্কের সন্ধানে প্রেরণ করেছেন। বলে দিয়েছেন তাকে—

যদি নাহি পাও তোমরা কঙ্কেব দরশন।
তবে জাইন এহিভাবে আমার মরণ।।

গুরু হয়েও গর্গ কঙ্কের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে তাঁর আচরণের উপযুক্ত খেসারত দেন নি শুধু, তাঁর উদার মানসিকতা তথা কঙ্কের প্রতি তাঁর অকপট স্নেহকেই মূর্ত করে তুলেছেন—

আর যদি দেখা পাও কইও করে ধরি।
অপরাধ কবিয়াছি ক্ষমা ভিক্ষা করি।।

কঙ্কের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে বিচিত্র মাধব। কিন্তু গর্গের অশান্ত চিত্ত প্রবোধ মানেনি, তিনি পুনরায় শিষ্যকে কঙ্কেব সন্ধানে প্রেরণ করেছেন—

গুরু দক্ষিণা দেও কঙ্কেরে আনিয়া।
পরাণে মরিব নৈলে তাহারে ছাড়িয়া।।

গর্গ তাঁর প্রিয়তম শিষ্যটিকে ভালভাবেই জানতেন, তাই বিচিত্র মাধবকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন—

কিন্তু এক কথা মোর শুন দিয়া মন।
গৌরাঙ্গের পূর্ণ ভক্ত হয় সেই জন।।
যে দেশে বাজিছে গৌর চরণ-নূপুর।
সেই পথ ধরি তোমরা যাও ততদূর।।
যে দেশেতে বাজে প্রভুর খোল করতাল।
হরি নামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল।।
সেই দেশে কঙ্কের করিও অন্বেষণ।
অবশ্য গৌরাঙ্গ ভক্তে পাবে দরশন।।

'শেষদৃশ্যে' লীলার মৃত্যুতে গর্গ ব্যাকুলিত হয়েছেন, কন্যাহারা পিতার আর্তি সহজেই আমাদেব স্পর্শ করে। তিনি বলেছেন—

'আজি হইতে সাঙ্গ মোর সংসারের খেলা।'

বাস্তবিকই কন্যার দাহকার্য শেষ করে প্রিয় শিষ্য কঙ্ক সমভিব্যাহারে গর্গ নীলাচলের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন, সংসারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে।

**লীলার চরিত্র**

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের লীলা চরিত্রটি সম্পর্কে কৃত মন্তব্যটি উদ্ধার করে আমরা চরিত্রটির পর্যালোচনায় ব্রতী হব—

'লীলার চরিত্রটি ভূলুণ্ঠিতা একটি লতার মত—বাল্যে জননীর এবং যৌবনে প্রণয়াস্পদের আশ্রয়চ্যুতা ;'[৯]

গর্গ এবং গায়ত্রীর একমাত্র কন্যা সন্তান লীলা। যখন তার মাত্র আট বৎসর বয়স, তখন তার মাতৃ বিয়োগ হয়। ছেলেবেলা থেকে কঙ্ক ও লীলা ভাইবোনের মত একত্রই প্রতিপালিত হয়েছে। কঙ্কের জন্য লীলার ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। কঙ্ককে ভাত না দিয়ে লীলা নিজে অন্নগ্রহণ করে না। কঙ্ক যেন রৌদ্রে গরু চরাতে না যায়, সে ব্যাপারে লীলা তাকে নিষেধ করে। গোচারণের মাঠ থেকে কঙ্ক যখন ফেরে, লীলা তার প্রতীক্ষায় থাকে, কঙ্কের পাশে বসে তাকে পাখার বাতাস করে শ্রম অপনোদন করে। যে পর্যন্ত কঙ্ক গৃহে না থাকে, সে পর্যন্ত তার বিরহে লীলাকে ক্রন্দনরতা দেখা যায়।

ক্রমে এ হেন লীলা যৌবনে পদার্পণ করে, সে বার বৎসর অতিক্রম করে তের বৎসরে পদার্পণ করে। অপরূপ সৌন্দর্য তার। যৌবনবতী হবার সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কের প্রতি তার আকর্ষণও বৃদ্ধি পায়। কঙ্কের প্রতি মুগ্ধতা রূপান্তরিত হয় প্রেমে। এক মুহূর্তের বিরহও তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে—

নয়নের কাজলরে বন্ধু আরে বন্ধু তুমি গলার মালা।
একাকিনী ঘরে কান্দি অভাগিনী লীলা।।

কঙ্ক সম্পর্কে লীলার হৃদয় দৌর্বল্যের পরিচয় মেলে তারই জবানীতে—

তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা।
বেইরা রাখব যুগল চরণ ছাইড়া যাইব কোথা।।

* * *

তুমিরে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়বাম জাতি-কূল।।
ধেনু বৎস লইয়া তুমি যাওরে বাথানে।
বন্দের লাইগা থাকি চাইয়া পথ পানে।।
পথ নাহি দেখিরে বন্ধু ঝুরে আখি-জলে।
পাগলিনী হইয়া ফিরি তিলেক না দেখিলে।।

কঙ্কগত প্রাণ যে লীলার তারই দুর্ভাগ্য সূচিত হল। কিছু দুরভিসন্ধিপরায়ণ হিন্দু কঙ্কের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে রটিয়ে দিল বেদাচারহীন অধর্মাচারী কঙ্কে লীলা তার জীবন-যৌবন সব কিছু সমর্পণ করে বসেছে। লীলার সম্পর্কে গর্গ এই রটনায় বিভ্রান্ত হয়ে লীলা ও কঙ্ক উভয়কে হত্যা করতে মনস্থ করলেন।

লীলা কঙ্কের জন্য যে ভাত রেখেছিল, সঙ্গোপনে তাতে গর্গ কালকূট বিষ মিশ্রিত করলেন যাতে কঙ্কের তাতে মৃত্যু হয়। লীলা সৌভাগ্যবশত: পিতার কুকর্ম দেখে

ফেলেছিল। গোচারণের মাঠ থেকে কঙ্ক ফিরলে লীলা তাকে গর্গের সব চক্রান্তের কথা জানিয়েছে আর বলেছে—

কেমন করিয়া কিবা পরাণে ধরাই।
নিজ হস্তে বিষ দিয়া তোমাকে খাওয়াই।।
আজ তুমি ভিন্ন দেশে যাওরে পলাইয়া।
মরিবে অভাগী লীলা এ বিষ খাইয়া।।

কিন্তু বিষ মিশ্রিত ভাত খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে সুরভি। কঙ্ক এরপর বিদায় নিয়েছে আশ্রম থেকে। কঙ্ককে হারিয়ে লীলার উন্মাদিনীর প্রায় অবস্থা হয়েছে। সে কঙ্কের সন্ধান করে ফিরেছে কঙ্কের শয়ন গৃহে, এরপর সে গোয়াল গৃহে উপস্থিত হয়েছে।

নয়নেতে নিদ্রা নাই পেটে নাই অন্ন।
সর্বস্থান খুঁজে লীলা করি তন্ন তন্ন।।
*     *     *
বস্ত্র না সম্বরে লীলা নাহি বান্ধে চুল।
আজি হইতে আশভরসা সকলি নির্মূল।।

গর্গ শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল উপলব্ধি করেছেন এবং কঙ্কের সন্ধানে প্রেরণ করেছেন শিষ্যকে। কিন্তু সাথীহীনা হতভাগিনী লীলা যে বিরহ যন্ত্রণায় কতখানি কাতর, কেউ সে সন্ধান রাখেনি।

অন্ন নাহি খায় লীলা নাহি ছুয়ে পানি।
ভূতলে পাতিল শয্যা লীলা বিরহিনী।।

ভানুকে উদ্দেশ করে সে নিবেদন করেছে—

লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও।
আলোকে চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিও।।

নদীকে উদ্দেশ করে লীলা তার মনোবাসনা প্রকাশ করে বলেছে—

তুমিত দরিয়ারে নদী আরে নদীকূলে তোমার বাসা।
তুমি জান কঙ্ক-লীলার মনের যত আশা।।
তুমি জান কঙ্ক-লীলার ভালবাসাবাসি।
জাগিয়া তোমার তীরে কাটাইয়াছি নিশি।।
*     *     *     *
লাগাল পাইলে রে তারে কইও লীলার কথা।
মিনতি জানাইয়া কইও দুঃখের বারতা।।

শত দুঃখেও লীলার আশা ছিল বিচিত্র মাধব কঙ্কের সন্ধান পেয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে আশা তার ব্যর্থতায় পর্যবসিত। দু'দুবার সে কঙ্কের সন্ধানে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। এর ওপর লীলার কানে গেল কঙ্কের মৃত্যু সংবাদ। মাধবকে লীলা এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে জানায়—

জনরব এইমাত্র লোকমুখে শুনি।
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক ত্যজিয়াছে প্রাণী।।

লীলা কঙ্কের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলে আর তার জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ রইল না। আশাহত হয়ে তিলে তিলে সে মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হল—

বাচিয়া নাহিক কঙ্ক রইব কোন আশে।
যে দেশ গিয়াছ বন্ধু যাইব সেই দেশে।।

লীলা মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে বিচ্ছেদ বেদনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। এইভাবে হতভাগিনী অতৃপ্ত প্রেম নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। কঙ্কের সঙ্গে মিলনসুখ ভোগের সুযোগ লাভে চিরতরে বঞ্চিত হয়েছে।

মৃত্যু শয্যায় লীলা কঙ্ক সম্বন্ধে বলেছে :

সোদর সাক্ষাৎ বেশি তাহার অধিক বাসি
হেন ভাই জলেতে ডুবিল।
কিসের কর্মের লেখা আর না হইল দেখা
বিধি মোরে নিদারুণ হইল।।
প্রাণের দোসর ভাই তা' হতে সুহৃদ নাই
হেন ভাই জলে ডুইবা মরে।
মরিবার কাল হায় চখে না দেখিনু তায়
এ কি শেল রহিল অন্তরে।।

আপাতভাবে মনে হতে পরে লীলা বুঝিবা কঙ্ককে ভ্রাতা জ্ঞান করত, কিন্তু ইতিপূর্বে কঙ্কের প্রতি লীলার যে হৃদয় দৌর্বল্যের পরিচয় আমরা লাভ করেছি, তা থেকেই প্রমাণিত হয় উভয়ের মধ্যে ছিল প্রেমের সম্পর্ক, যা গর্গ জানতেন না।

## কাজলরেখা

'কাজলরেখা' সম্পর্কে সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন, 'এই গাথাটি অতিরিক্ত ঘটনাপ্রধান এবং গাথাকাব্য অপেক্ষা রূপকথার লক্ষণই ইহাতে অধিক'[১০]—তা খুবই যথার্থ। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ত এটিকে রূপকথা শ্রেণীর রচনা বলে গাথা সাহিত্য থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু 'কাজলরেখা', 'মদনকুমার' ও 'মধুমালা'র মত আনুপূর্বিক গদ্যে রচিত নয়, তাই আমরা 'কাজলরেখা'কে গীতিকা সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেবার পক্ষপাতী নই। 'কাজলরেখা' গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে রচিত এবং তুলনামূলকভাবে গদ্যের তুলনায় পদ্যের পরিমাণই এতে অধিক। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শুকপক্ষী, সন্ন্যাসীপ্রদত্ত আম্রভক্ষণে হীরাধরের পত্নীর গর্ভধারণ প্রভৃতি রূপকথার অভিপ্রায়গুলির সাক্ষাৎ আলোচ্য গীতিকায় লভ্য। রূপকথার চরিত্র সম্বলিত বলে আলোচ্য গীতিকাটি অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ। সূচ রাজকুমারের মৃত্যু হয়েছিল জননীর গর্ভেতেই, কিন্তু সেই মৃত সন্তানই—

গর্ভেতে মরিয়া শিশু দেবতার বরে।
চন্দ্রসম সেই শিশু দিনে দিনে বাড়ে।।
বাড়িতে বাড়িতে তার যৌবনকাল আইল।
দৈবের নির্বন্ধে কন্যা সেইখানে গেল।।

পুনরায়, কাজলরেখাকে সোনাধর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে চাইলে কাজলরেখা আত্মরক্ষার্থে বলেছে—

মরার উপরে দুষ্টু এবে তুল্ছে খাড়া।
সতী নারী হই যদি সমুদ্রে দেউক চড়া।।

সত্য সত্যই সমুদ্রে চড়া পড়েছে। সোনাধরের ডিঙ্গা চড়ায় আটকে গেছে। পুনরাবৃত্তি লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, গীতিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। আলোচ্য গীতিকাতেও দেখা গেছে—

হাতের কঙ্কণ দিয়া কিনিলাম দাসী।
সে হইল রাণী আর আমি বনবাসী।।
সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্যবাণী।
কোন্ দিন পোয়াইব মোর দুঃখের রজনী।।

অংশটি একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে, পুনরাবৃত্তির ঘটনা আরও ঘটেছে। কাজলরেখা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন যে আলপনা অঙ্কিত করেছে, তাতে আমরা আমাদের লোকাচার তথা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত আলপনার অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা যেমন জানতে পারি, তেমনিই আলপনা অঙ্কনের উপকরণ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কেও বর্ণনা মেলে—

উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া।
ধুইয়া মুছিয়া কন্যা লইল বাটিয়া।।
পিটালি করিয়া কন্যা পর্থমে আঁকিল।
বাপ আর মায়ের চবণ মনে গাঁথা ছিল।
জোরা টাইল আঁকে কন্যা আর ধানছড়া।
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরলক্ষ্মীর পারা।।
শিব-দুর্গা আঁকে কন্যা কৈলাস ভবন।
পদ্মপত্রে আঁকে কন্যা লক্ষ্মী-নারায়ণ।। ইত্যাদি

নকল রাণীর সঙ্গে প্রকৃত রাণীর পার্থক্য বোঝাতে কাহিনীতে উভয়ের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, রুচি, রন্ধন অভিজ্ঞতা কিংবা আলপনা অঙ্কনের ব্যাপারে যে পরীক্ষার বিষয় সংযোজিত হয়েছে, তাতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

হীরা-মতি জ্বলে কন্যা যখন নাকি হাসে।
সুজাতি বর্ষার জলেরে যেমন পদ্মফুল ভাসে।।

কিংবা আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে সূচরাজার কাছে কাজলরেখা উক্তিতে তার

অনিশ্চয়তাময় জীবনের মর্মান্তিক বেদনা পরিস্ফুট হয়েছে এইভাবে—

মাও নাই বাপও নাই গর্ভসোদর ভাই।
আসমানের মেঘ যেমন ভাসিয়া বেড়াই।।

**কাজলরেখার চরিত্র**

সাধু ধনেশ্বরের কন্যা কাজলরেখা। অপূর্ব তার সৌন্দর্য। এক সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রদত্ত শুকপক্ষী ধনেশ্বরকে জানায় মরা স্বামীর সঙ্গে কাজলরেখার বিবাহ হবে। শুকপক্ষীটি ধনেশ্বরকে পরামর্শ দেয় সওদাগর যেন কাজলরেখাকে তার পুরীতে না রেখে বনের মধ্যে দিয়ে আসে। তদনুযায়ী সওদাগর মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেও বাণিজ্য করার ছলনায় বনে রেখে এলেন কাজলরেখাকে। বনমধ্যে ছিল একটি মন্দির। মন্দিরের মধ্যে কাজলরেখা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সে আর নিষ্ক্রান্ত হতে পারল না। মন্দির মধ্যে কাজলরেখা দেখতে পেল একটি মৃত কুমার শায়িত আছে আর তার সর্বাঙ্গ সূচবিদ্ধ। সওদাগর কাজলরেখাকে বনে রেখে চলে আসার আগে বলে এসেছিল—

বাপ হইয়া মরার কাছে কন্যা দিলাম বিয়া।
গিরেতে ফিরিবাম আমি কিবা ধন লইয়া।।
শুনলো পরাণের ঝি কইয়া যাই আমি।
সাম্‌নে আছে মরা কুমার সেই তোমার স্বামী।।

কাজলরেখাও তার ভবিতব্যকে মেনে নিল। সে তার মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করে বলে—

যে হও সে হও প্রভু তুমি তো সোয়ামী।
যতকাল দেহ তোমার ততকাল আমি।।

মন্দিরের কপাট কিছুক্ষণ পরে খুলে গেল। এক সন্ন্যাসী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করল। কাজলরেখা সন্ন্যাসীর সাহায্যে তার স্বামীর জীবন রক্ষায় সক্ষম হবে ভেবে সন্ন্যাসীর পায়ে আছড়ে পড়ল। সন্ন্যাসী কাজলরেখাকে জানিয়ে দিল মৃত ব্যক্তিটি রাজার পুত্র। কাজলরেখা তার গা থেকে একটি একটি করে সূঁচ যেন তুলে নেয়, শুধু সে যেন তার চোখের দুটি সূঁচ না তোলে। সন্ন্যাসী গাছের পাতা দিয়ে গেল, আর বলে গেল রাজপুত্রের গা থেকে সমস্ত সূঁচ তুলে ফেলার পর তার চোখের সূঁচ দুটি তুলে ফেলে পাতার রস চোখে দিয়ে দিলেই সে বেঁচে উঠবে। সন্ন্যাসী সাবধান করে দিয়ে গেল কাজলরেখা যেন নিজের থেকে রাজকুমারের কাছে তার পরিচয় না দেয়। দিলে সে বিধবা হবে। ধর্মমতি শুক রাজপুত্রের কাছে কাজলরেখার প্রকৃত পরিচয় দেবে।

কাজলরেখার ছিল অসীম ধৈর্য্যশক্তি। সন্ন্যাসীর নির্দেশ তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে দেখা গেছে। সে দীর্ঘ সাতদিন ধরে মৃত স্বামীর দেহ থেকে একটি একটি করে সূঁচ তুলেছে। এই ক'দিন সে খায়নি, মন্দিরের বাইরে বের হয় নি। অষ্টম দিবসে যখন

রাজপুত্রের কেবল চোখের দুটি সূঁচ তোলা বাকি, সেই সময় কাজলরেখা স্নানের জন্য বের হল। একটি লোককে পেটের দায়ে তার কন্যাকে বিক্রয় করতে হাজির হতে দেখা গেল। কাজলরেখা ছিল সমব্যথী। তার পিতা তাকে বনবাসে নির্বাসন দিয়ে গেছে। আর এক পিতাকে দেখা গেল পেটের দায়ে কন্যা বিক্রয়ে রত। মেয়েটিকে কাজলরেখা তারই মত জনম দুঃখিনী বিবেচনা করে তার হাতের কঙ্কণের সাহায্যে কিনে নিল। তারপর তাকে পাঠিয়ে দিল ভাঙা মন্দিরে যেখানে তার মৃত স্বামী শায়িত অবস্থায় ছিল।

কাজলরেখা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল স্বভাবের। তার মনে কোন জটিলতা ছিল না। তাই সে অকপটে সদ্য ক্রীত দাসীকে বলেছে সে যেন মন্দিরে উপস্থিত হয়ে গাছের পাতার রস করে রাখে, সে স্নান করে গিয়ে রাজপুত্রের চোখের দুটি সূঁচ তুলে নিয়ে ঐ রস লাগিয়ে দেবে। তাহলেই সে বেঁচে উঠবে। দাসীটি মন্দিরে ঢুকে মৃত রাজকুমারের চোখ থেকে সূঁচ দুটি তুলে নিয়ে তার চোখের পাতায় রস লাগিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার বেঁচে উঠল। দাসীটি নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে রাজকুমারের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হল। হতভাগিনী কাজলরেখার শুরু হল জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিড়ম্বনা। সে স্নান করে মন্দিরে এসে দেখে তার পরিশ্রম লব্ধ ফল দাসী হস্তগত করে ফেলেছে। দাসী কাজলরেখাকে কঙ্কণ দাসী বলে পরিচয় দিল। সন্ন্যাসীর পবামর্শ মত কাজলরেখা দাসীর চরম বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও প্রতিবাদে সোচ্চার হল না, নীরবতা অবলম্বন করল।

রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী।
কর্মদোষে কাজলরেখা জন্ম-অভাগিনী।।

শুরু হল কাজলরেখার দাসীর বিড়ম্বনাময় জীবন। রাজকুমার তার রাজ্যে ফিরে এল। রাজবাড়ীতে কাজলরেখাকে দাসীগিরি করতে হল, আর নকল রাণী রইল দিব্বি ভোগসুখে। রাজকুমার কিন্তু কাজলরেখার প্রতি আকৃষ্ট হল। সে কাজলরেখার প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু কাজলরেখা সন্ন্যাসীর পরামর্শে অটল। কোনমতেই সে নিজের মুখে নিজের পরিচয় দেবে না। তাই সে জানাল,—

আমি যে কঙ্কণ দাসীরে রাজা শুন দিয়া মন।
তোমার নারী কিন্‌ল দিয়া হাতের কঙ্কণ।।

রাজকুমার দেশভ্রমণে যাবে। নকল রাণীর কাছ থেকে পছন্দমত জিনিস আনার ফরমাস পেল সে, কিন্তু কাজলরেখা চেয়ে বসল কেবল একটি ধর্ম্মতি শুকপক্ষী। কাজলরেখার পিত্রালয় থেকে ধর্ম্মতি শুকপক্ষী কিনে রাজকুমার কাজলরেখাকে দিল।

কাজলরেখা শুধু ধনী পরিবারের কন্যা ছিল না, ঘর-গৃহস্থালীর কার্য্যও যে তার জানা ছিল, অবস্থা বিপাকে তার দাসীবৃত্তি থেকেই তা জানা গেছে। রাজকুমারের বন্ধুকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করা হলে তার জন্য কাজলরেখা যে সব উপাদেয় ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত করেছে তা থেকেই আমবা তার রন্ধনে পারদর্শিতার পরিচয় যেমন পাই, তেমনই জানতে পারি আতিথেয়তায় তার অতুলনীয় ভূমিকার কথা। আলপনা দেয়াতেও তার

নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন সে যে আলপনা দিয়েছে তা দেখে রাজকুমার, তার পাত্রমিত্র বন্ধুরা সকলেই চমৎকৃত হয়েছে। কাজলরেখার দীর্ঘ বারোটি বছর চরম দুঃখ ভোগ এবং কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কাজলরেখার বিড়ম্বনাভোগের তখনও বাকি ছিল। তাই তার স্বামীর বন্ধু তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। নকল রাণী এবং রাজকুমারের বন্ধু কাজলরেখা সম্পর্কে রাজকুমারকে সন্দিগ্ধ করে তুলতে চক্রান্তের জাল বিস্তার করে। কাজলরেখার ঘরের দরজার মধ্যে সিঁদুর লেপে দিয়ে এল। রাজকুমারের বন্ধু সেই সিঁদুরের উপরে চারটি পায়ের দাগ অঙ্কিত করে দিল। রাজপুত্র নকল রাণীর প্ররোচনায় কাজলরেখার কাছে সিঁদুরের ব্যাপারে জানতে চাইলে কাজলরেখা সাক্ষী মেনে বসল শুকপক্ষীকে। শুকপক্ষী রাজপুত্রকে পরামর্শ দিল কাজলরেখাকে বনবাসে দেবার জন্য, বিদায়কালে সে রাজকুমারের কাছে আবেদন জানাল—

রাখ কিনা রাখ মনে তাতে ক্ষতি নাই।
মরণকালে একবার যেন তোমায় দেখতে পাই।।

রাজকুমার-বন্ধুর উপব দায়িত্ব ন্যস্ত হল কাজলরেখা:ক দ্বীপে নির্বাসিত করার। সেইমত রাজকুমারের বন্ধু কাজলরেখাকে নিয়ে চলল। সোজাসুজি সে কাজলরেখাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসল। কিন্তু কাজলরেখা অদ্বিতীয় সতীত্বের কারণে কোনোমতেই সে স্বামীবন্ধুর কুপ্রস্তাবে সম্মত হল না।

মাথার উপরে দুষ্টু এবে তুল্‌ছে খাড়া।
সতী নারী হই যদি সমুদ্রে দেউক চড়া।।

সত্যসত্যই সমুদ্রে চড়া পড়ল এবং কাজলরেখাকে সেই চড়ায় ফেলে রেখে রাজকুমারের বন্ধু বিদায় নিল। কিছুকাল পরে কাজলরেখার ভাই রত্নেশ্বর ব্যবসা করতে গিয়ে সমুদ্র মধ্যে কাজলরেখার সন্ধান পেল। নিজের বোন বলে সে চিনতে পারল না। কাজলরেখাকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে ফিরে এল। সে নিজের ভগ্নীকেই বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বসল—

না কর্‌ছি না কর্‌ছ বিয়া যৌবনকাল যায়।
অনুমতি পাইলে বিয়া করিবাম তোমায়।।

কি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন কাজলরেখা। এ যে সীতার অগ্নিপরীক্ষার তুলনায়ও বেশী। কাজলরেখা তখন তার পরিচয় দানের ব্যাপারে শুকপক্ষীর কথা বলল। শুকপক্ষীকে জানানো হল। শুকপক্ষী কাজলরেখার জীবনের আনুপূর্বিক পরিচয় ব্যক্ত করল। শেষপর্যন্ত রত্নেশ্বর কাজলরেখার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করল। তার কঙ্কণদাসীর উপযুক্ত শাস্তি হল। বস্তুতঃ দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী কাজলরেখা যে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে, নানা কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, শেষপর্যন্ত সে তার অসাধারণ চরিত্র বলে সসম্মানে সব কঠিন পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার প্রকৃত সম্পদ ছিল নিষ্কলুষ পতিপ্রেম। এই শক্তিই তাকে প্রেরণা জুগিয়েছে মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করতে।

পাতিব্রত্যের কঠিন বর্মে আবৃত ছিল বলেই সে নীরবে কত লাঞ্ছনা, কত দুঃখ বরণই না করে এসেছে। আর স্বামীর বন্ধুর প্রলোভনের শিকার হওয়া থেকেও সে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে। কাজলরেখা পালায় poetic justice রক্ষিত হয়েছে লক্ষিত হয়। দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ দুঃখভোগের পরে কাজলরেখা তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

**কঙ্কণদাসী**

'কাজলরেখা' পালাটিতে কঙ্কণদাসীর ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার বাবা পেটের দায়ে তাকে বিক্রয় করেছিল কাজলরেখার কাছে। নিজের হাতের কঙ্কণের বিনিময়ে তাকে সে নিজের কাছে রাখল। কাজলরেখা সহানুভূতিশীল হয়ে যাকে গ্রহণ করল, দেখা গেল সেই কঙ্কণদাসীই উপস্থিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। আর যে কাজলরেখা তার পরম উপকারী, তার প্রতি সে অবলীলাক্রমে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কাজলরেখা স্নান করতে গিয়েছিল, তার পরিকল্পনা ছিল স্নান করে ফিরে এসে রাজকুমারের দু'চোখ থেকে সূঁচ খুলে সন্ন্যাসী প্রদত্ত পাতার রস চোখে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলবে। কিন্তু কঙ্কণদাসী মন্দিরে গিয়ে কাজলরেখা আসার পূর্বেই রাজকুমারকে বাঁচিয়ে তুলল এবং তাকে বিবাহ করবার জন্য কুমারকে বলল। ধর্মসাক্ষী করে রাজকুমার কঙ্কণদাসীকে বিবাহ করল। রাজকুমার আসল সত্য কিছুই জানল না। শুধু এটুকুই জানল কঙ্কণদাসীর করুণাতেই সে জীবন ফিরে পেয়েছে।

কির্‌পাতে তোমার কন্যা পরাণ যে পাই।
তোমা বিনা এ সংসারে মোর অন্য নাই।।

কিন্তু সত্য ত গোপন থাকে না। তাই যতই কঙ্কণদাসী রাণীর মর্যাদা পাক, ক্রমেই তার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। রাজকার্যে তার নির্দেশ রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে। সে তার স্বামীর বন্ধুর জন্য যা রেঁধেছিল তাও কহতব্য নয়। সে রেঁধেছিল চালতার অম্বল, কচুশাকের তরকারী। বুদ্ধিমত্তায় রাণীর পদ অলংকৃত করলে কী হবে, রুচির ক্ষেত্রে তার তো কোন পরিবর্তনই হয় নি। কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন সে যা আলপনা দিয়েছিল, তা দেখাচ্ছিল কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং-এর মতো। রাজকুমার পর্যটনে যাবার আগে কঙ্কণদাসীর পছন্দসই জিনিস আনবার কথা বললে, সে আনতে বলেছিল বেতের ঝাইল, বেতের কুলো, তেঁতুল কাঠের ঢেঁকী, পেতলের নথ, কাঁসার বেঁক্‌খাড়ুয়া। শেষপর্যন্ত যখন তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেল শুকপক্ষীর মাধ্যমে, তখন রাজকুমার তাকে ভয় দেখাতে বললে, রত্নেশ্বর সাধু তাদের বাড়ী লুঠ করতে আসবে। আগেই সে একটি গর্ত খুঁড়িয়ে রেখেছিল। কঙ্কণদাসী তার নিজস্ব গহনাপত্তর নিয়ে সর্বাগ্রে সেখানে প্রবেশ করল। সেই গর্তেই তাকে পুঁতে দেওয়া হল। এইভাবেই যে কাজলরেখার প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছিল, তার উপযুক্ত শাস্তি পেল। তার অকাল পরিণতির জন্য কারো কষ্ট হয় নি। বরং তার এই পরিণতি না হলে যেন পাঠক দুঃখ পেত।

## দেওয়ানা মদিনা

'দেওয়ানা মদিনা' গীতিকাটির সূচনা হয়েছে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। মৃত্যুপথ যাত্রী এক রমণী তার স্বামীকে আকুলভাবে আবেদনে জানাচ্ছে যে তার মৃত্যুর পর তার স্বামী যেন পুনর্বিবাহ না করে। আপাতভাবে মনে হবে বুঝিবা ঐ রমণী মৃত্যুর পরেও এইভাবে তার প্রিয়তম স্বামীর ওপর নিজের অধিকার কায়েম রাখতে চায়। দ্বিতীয় কোন নারীর সঙ্গে তার স্বামীর সংসর্গ সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না, এমনকি তার মৃত্যুর পরেও নয়। কিন্তু ক্রমশ: প্রকাশ পেয়েছে যে রমণীটির অনুরোধের কারণ অন্যবিধ। দু-দুটি শিশু সন্তান সে রেখে যাচ্ছে, পাছে বিমাতার দ্বারা তারা নির্যাতিত হয় এই তার ভয়--

সতীন বালাই কিরা কই তোমার কাছে।
এ তিন ধনেরা মোর দুঃখু পাইব পাছে।।
সতীনের ছাওয়াল কাঁটা সতাই মায়ে লাগে।
সেই না কাঁটা তুলে সতাই সগলের আগে।।

আলাল-দুলালের জননী যে অনুমানের কথা বলেছে--সতীন পুত্রের প্রতি বিমাতার বিমাতৃসুলভ আচরণের কথা, নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সে যে কবুতর-কবুতরীর কাহিনীর উল্লেখ করেছে, আলোচ্য গীতিকায় তাকেই সত্যে প্রমাণিত হতে দেখা গেছে। দেওয়ান সোনাফর অবস্থা বিপাকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে তার দুটি নাবালক সন্তানের জীবনকে চরম বিড়ম্বনাময় করে তুলেছে, আর বিড়ম্বনার মূলে দেখা গেছে তার দ্বিতীয়া পত্নীকে। আলাল-দুলালের জননী কথিত কবুতর কাহিনীর দ্বিতীয় কবুতরীর বিশ্বাসঘাতকতা সোনাফরের দ্বিতীয় স্ত্রীর ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে দেওয়ান সোনাফরের খেদোক্তি—

মর‍্যাত না গেছ আওরাত গিয়াছ মারিয়া।
তিনলা পরানি মার‍্যা গেছ পলাইয়া।।

—পাঠকের হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে। মাতৃহীন দুটি নাবালক সন্তানকে নিয়ে বান্যাচঙ্গের দেওয়ানের যে বিপত্তি ঘটেছে, তা বাস্তবকিই অতিশয় মর্মান্তিক। অর্থের অভাব নেই তার, কিন্তু সংসারের সুখ ত কেবল অর্থনির্ভর নয়। যোগ্য কর্ত্রী না থাকলে সংসার মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই সোনাফর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছে। কবি নিপুণভাবে সোনাফরের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পটভূমিটি অঙ্কিত করেছেন। বান্যাচঙ্গের দেওয়ানের দ্বিতীয়া স্ত্রী সতীন পুত্রদ্বয়ের প্রতি যে অমানবিক আচরণ করেছে তা যেমন ঘৃণ্য তেমনি অতিশয় হৃদয়হীন, কিন্তু এক্ষেত্রেও আলাল-দুলালের প্রতি দেওয়ানের অতিরিক্ত মনোযোগ দান এবং দ্বিতীয়া পত্নীকে অবহেলার কারণে দ্বিতীয়া পত্নীর সতীন পুত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মানসিকতা গড়ে ওঠার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দিকটি অনবদ্যভাবে রূপায়িত করেছেন কবি—

সতী পুতেরারে করে কত না আদর।
ফিরিয়া না চায় মোর পানে এক নজর।।

সতীন পুত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে সোনাফরের দ্বিতীয়া স্ত্রী অত্যন্ত কৌশলে গোপনে যে ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছে, আখ্যানটিতে তা এক অতিরিক্ত মাত্রা সংযোজন করেছে। প্রকাশ্যে সতীন পুত্রদের প্রতি সোহাগ প্রদর্শন, গোপনে তাদেরই চিরতরে বিনাশের জন্য সুনিপুণভাবে পরিকল্পনা রচনা, এ ব্যাপারে জহ্লাদের সাহায্য গ্রহণ- আখ্যানের এই অংশে রোমাঞ্চ সংযোজিত হয়েছে।

আলাল সেকেন্দার দেওয়ানের কাছে কাজ করেছে, অথচ বেতন গ্রহণে তার অস্বীকৃতি বিশেষত এই প্রসঙ্গে তার উক্তি—

'নিবাম মায়না আমি একেবারে।।
একদিন চাইবাম মায়না রাখবাইন মনেতে।
সেই দিন পাই যেন আমার যে হাতে।।'

পাঠকের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে, পরে দেখা গেল বান্যাচঙ্গে গৃহনির্মাণে সহায়তা লাভের জন্যই আলাল এইরূপ ব্যবস্থা নিয়েছিল। যেভাবে বান্যাচঙ্গে আলাল তার অধিকার কায়েম করেছে, বান্যাচঙ্গের দেওয়ান, তার সতাতো ভাইকে উচ্ছেদ করে, তাতে আলালের কিছুটা শৌর্য-বীর্যের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। গীতিকাটির সর্বোত্তম অংশ দুলালের জন্য মদিনার সাগ্রহ প্রতীক্ষা, বিশেষত: দুলালের সঙ্গে যুক্ত তার জীবনের সেইসব মধুর স্মৃতি যেগুলির স্মৃতিচারণায় সে মত্ত থেকে প্রকারান্তরে মদিনা নিজের মনকেই আশ্বস্ত করতে চেয়েছে যে দুলাল কখনই সত্য সত্যই তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। সোনাফরের দ্বিতীয়া পত্নীর সতীন পুত্রদের প্রতি আপাতভাবে প্রকাশিত অপত্য স্নেহের অন্তরালে তাদের সর্বনাশ সাধনের যে চক্রান্ত, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কবি যে অলংকারটি ব্যবহার করেছেন তা অনবদ্য হয়েছে কবির বাস্তবজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে—

বগা যেমন চউখ বুজ্এয়া পাগারের ধারে।
সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে।।

**বিমাতা**

সোনাফর মিঞার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তার স্বামীর কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলে গিয়েছিল তার মৃত্যুর পর সোনাফর যেন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ না করে। কারণ তার মৃত্যুকালে সে যে দুটি শিশুপুত্র আলাল এবং দুলালকে রেখে যাচ্ছে তারা যদি সৎ মায়ের পাল্লায় পড়ে, তবে নিঃসন্দেহে অত্যাচারিত হবে। মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে তার অনুরোধ রক্ষা করবার কথা দিয়েও সোনাফর মিঞা শেষপর্যন্ত কিন্তু দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে, অবশ্য এক্ষেত্রে সোনাফরের উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না। মাতৃহারা শিশুসন্তানদ্বয়কে রক্ষাকল্পে সে বিবাহ করেছিল একপ্রকার বাধ্য হয়েই। কিন্তু

তার দ্বিতীয়া পত্নী সোনাফরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত তো করেই নি, বরং আলাল দুলালের মা যে আশঙ্কায় সোনাফরকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের ব্যাপারে নিষেধ করে গিয়েছিল, তাই সত্যে পরিণত হল।

দ্বিতীয়া পত্নী আশা করেছিল স্বামীর কাছ থেকে সে উপযুক্ত স্বীকৃতি ও সোহাগ লাভ করবে। কিন্তু তার পরিবর্তে সে যখন দেখল তার স্বামী সতীন পুত্রদের সোহাগেই মত্ত তখন স্বভাবতই তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল।

"সতীপুতেরারে করে কত না আদর।
ফিরিয়া না চায় মোর পানে এক নজর।।
আমার যদি ছাওয়াল হয় থাকব অনাদরে।
বুকের লউ দেখ্‌ব কেবল সতীপুতরারে।।"

সে মনে মনে চিন্তা করল যেভাবেই হোক গলার কাঁটা স্বরূপ সতীন পুত্রদের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি পেতে হবে। চতুরা দ্বিতীয়া পত্নী এটুকু জানত যে সে সোনাফরকে তার প্রকৃত মনোভাব যদি জানায় তবে তাকেই বিতাড়িত হতে হবে। অতএব কৌশলে কাজ হাসিল করতে হবে।

অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সে সোনাফরকে তার প্রতি বিশ্বাসী করে তুলল। সে জানাল তার কাছ থেকে তার সতীন পুত্রদের দূরে সরিয়ে রেখে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কেননা সকল সতীন তো এক নয়। পাড়া প্রতিবেশীরাও অকারণে সোনাফরের আচরণের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। সে জানাল যে সে নিঃসন্তান, অতএব আলাল এবং দুলালকে অবলম্বন করেই সে সন্তানপ্রাপ্তির আনন্দ পেতে চায়। আলাল-দুলালের প্রতি তার অকৃত্রিম অপত্য স্নেহ প্রদর্শন করে সে বলল,

কলিজার লৌ মোর আলাল দুলাল।
কি খায় না খায় কিবা করয়ে কুয়াল।।
কত বস্তু আন আরে আন্দর মহালে।
মনের দুঃখেতে সেই সব পেটে নাহি চলে।।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে নানা কাকুতি মিনতি করে আলাল-দুলালকে তার নাগালে পেল। প্রথম যেদিন আলাল-দুলাল তাদের সৎ মায়ের অন্দর মহলে উপস্থিত হবে সেদিন সোনাফরের দ্বিতীয়া স্ত্রী নানাভাবে তার অন্দরমহলকে সজ্জিত করল। নানাবিধ আকর্ষণীয় ভোজ্য সামগ্রীও প্রস্তুত করল। সতীনের কাঁটা ভাঙবার জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিন্তু বাইরে থেকে তার আচরণের কোনো হদিস সে কাউকে দিতে রাজি নয়। নিজের চাতুর্যের কথা সে নিজেই জানিয়েছে এইভাবে—

এমন করিবাম যাইতে সর্ব লোকে বলে।
জান্ দিয়া ভালবাসি সতীপুত সগলে।
নিজের হাতে ছিঁড়ি মুণ্ডু যুদি অগোচরে।
তেও যেন মোর কথা কেউ বিশ্বাস না করে।।

বাস্তবিক সে সৎমা হয়েও সতীন পুত্রদের প্রতি এমন তার অপত্য স্নেহ প্রকাশ করত যার ফলে আলাল-দুলাল যেমন খুশী, তেমনি সোনাফর মিঞাও মোহিত হয়েছিল। দুই সতীন পুত্রকে বুকে ধরে সে চুম্বন করত, নিজের হাতে খাবার সাজিয়ে দিত, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাওয়াত। তার অভিনয় নৈপুণ্য যে কতখানি নিখুঁত ছিল তার পরিচয় আমরা পাই আলাল দুলালের আচরণে।

সতাইর আদরে তারা আন্দর না ছাড়ে।
বাপের আঙুল ধইরা আর নাই সে ফিরে।।
সতাইর যতনে ভুলে মায়ের সে দুখ।
আন্দরে থাকিয়া পায় যত রকম সুখ।।

শুধু আলাল-দুলালই যে বিমাতার অভিনয় নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েছিল তাই না, প্রতিবেশীরাও তার আচরণে মুগ্ধ।

সতাইয়ে পার্‌লে দেখি গলা টিপ্যা মারে।
সতী পুতের লাগ্যা কেবা অত যতন করে।।
মুখের গরাস দেয় যতনে তুলিয়া।
আলুফা জিনিস খাওয়ায় নিজে না খাইয়া।।

শ্রাবণ মাসে নতুন বর্ষায় যখন মাঠঘাট খালবিল জলে ভরে যায়, তখন বাইচ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই বাইচ খেলা উপলক্ষ সতীন পুত্রদের প্রেরণ করে জহ্লাদের সাহায্যে তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে সে।

'বিশপুড়া জমিবাড়ী' দেবার অঙ্গীকার করে সে জহ্লাদকে নিযুক্ত করে চিরতরে পৃথিবী থেকে আলাল-দুলালকে সরিয়ে দিতে। সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খীতে যাত্রা করল আলাল-দুলাল। এবং দরিয়ায় পৌঁছে জহ্লাদ যখন তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে বসল তখনই তারা বুঝতে পারল যে তারা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে।

সচরাচর গীতিকায় আমরা যেসব নারী চরিত্র লাভ করি তাদের প্রেমের পরাকাষ্ঠায় আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু সোনাফর মিঞার দ্বিতীয়া স্ত্রীর দুটি নাবালক সন্তানকে হত্যার চক্রান্তে সৎমা সম্পর্কিত যে প্রতিকূল ধারণা প্রচলিত আছে তারই পরিচয় লভ্য। সতীন পুত্রদ্বয়ের প্রতি আক্রোশে সে যে আচরণ করেছে তা নারীত্বের পক্ষে কলঙ্কজনক ও মানবিকতাবোধের পরিপন্থী। বার্দ্ধক্যে সোনাফর মিঞার প্রতি তার দ্বিতীয়া স্ত্রী অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল। অর্থাৎ পতির প্রতিও তার কর্তব্যপরায়ণতাব পরিচয় রাখতে সে সক্ষম হয়নি, প্রেমের কথা তো বাদই দিতে হয়।

**মদিনা**

দেওয়ানা মদিনা পালায় উপস্থাপিত মদিনা চরিত্রটি পতিপ্রেমের অপূর্ব পরাকাষ্ঠারূপে গৃহীত হবার যোগ্য। ধনুয়া নদীর পাড়ে কাজলকান্দা বাড়ীতে হীরাধর ব্যাপারী নামে যে গৃহস্থ বাস করত তার কন্যাকে বিয়ে করেছিল সোনাফর মিঞার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর

কনিষ্ঠ সন্তান দুলাল। কন্যার নাম মদিনা। হীরাধর দুলালকে কিছু জায়গা জমিও দিয়ে গিয়েছিল। তাদের একটি সন্তান হয়েছিল সুরুজ জামাল নামে। পরবর্তীকালে বড় ভাই আলাল দেওয়ান সেকেন্দারের একটি কন্যাকে নিজে বিবাহ করবে বলে স্থির করে, আর একটি কন্যার সঙ্গে ছোট ভাই দুলালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে। মদিনা নিরপরাধা হলেও দুলাল দিব্বি পতিগতপ্রাণা মদিনাকে তালাকনামা লিখে দিয়ে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে বসে। বেচারী মদিনা শুধু সুন্দরীই ছিল না, পতির প্রতি তার বিশ্বাস ছিল অটুট, প্রেম ছিল অন্তহীন। ভাইয়ের মারফত সে দুলালের তালাকনামা পেলেও প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারল না যে সত্য সত্যই চিরকালের জন্য দুলাল তাকে ত্যাগ করেছে। দুলাল এবং মদিনা একসঙ্গে ঘর গৃহস্থালী ও চাষবাসের কত কাজই না দিনের পর দিন করেছে। দুলাল ধান এনেছে আর সে কুলো দিয়ে তা ঝেড়েছে। পৌষ মাসে সাইল ক্ষেত ধান গাছে পূর্ণ হয়ে গেলে মদিনা শস্যক্ষেত্র পাহারা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, দুলালের জন্য সে তখন হুঁকো সাজিয়ে অপেক্ষা করেছে। কর্দমাক্ত জমিতে দুলাল যখন চারা ধানগাছ পোঁতার কাজে ব্যস্ত থাকত, তখন মদিনা তার জন্য ভাত রেঁধে অপেক্ষা করত। সে দুলালকে কাজেও সহায়তা করত, তাকে ধানের চারাগাছ এগিয়ে দিত। শীতকালে মাঘ মাসের প্রত্যুষে দুলাল যখন সাইল ক্ষেতে জল দিতে যেত তখন দুলালকে শৈত্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আগুন নিয়ে সে ক্ষেতে হাজির হত। শীতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য উভয়ে একসঙ্গে আগুন পোয়াত। উভয়ে যত্ন করে সাইলের ধান ঘরে তুলত। দুলাল যখন খড় কাটার কাজে ব্যস্ত থাকত মদিনা তখন জল সংগ্রহ করে আনত। এহেন মদিনার পক্ষে তো কোনমতেই দুলালের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করা সম্ভব নয়। একান্তভাবে সে ছিল দুলালগতপ্রাণা। দুলাল আবার তার কাছে ফিরে আসবে, আবার আগের মতই তারা সুখী দাম্পত্যজীবন ভোগ করবে এই আশায় বেচারী মদিনা কত বিনিদ্র রজনী যাপন করল। দুলালের প্রিয় খাদ্যসামগ্রী সে প্রস্তুত করে, কখনও তালের পিঠা তৈরী করে, কখনও খই বানায়, গামছায় দই বেঁধে শিকেতে তুলে রাখে, সাইল ধানের চিঁড়া প্রস্তুত করে, ভাল ভাল মাছ ও মোরগের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। দীর্ঘ ছয় মাস সে প্রতীক্ষায় থাকার পরও যখন দুলালের দেখা পেল না তখন শিশুপুত্র সুরুজজামালকে পাঠাল দুলালের কাছে, তার ভাইয়ের সঙ্গে। বান্যাচঙ্গে ভাগ্নেকে নিয়ে উপস্থিত হল মদিনার ভাই। কিন্তু দুলাল সরাসরি জানিয়ে দিল তার কাছে সুরুজ অথবা মদিনার প্রয়োজন নেই। তারা বরং কাজলকান্দাতেই জায়গা জমি নিয়ে সুখে দিন কাটাক। নতুবা দুলালের প্রথম বিবাহের কথা জানাজানি হয়ে গেলে তার সামাজিক সম্মানহানির আশঙ্কা। নিজের পুত্রের মুখে মদিনা যখন দুলালের বক্তব্য জানতে পারল তখন স্বভাবতই মদিনা অতিশয় দুঃখিত হল। কেঁদে কেঁদে তার দিন কাটতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল সে। কখনও হাসে, কখনও গান গায়, কখনও বা তালি দেয়। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল মদিনা। পতি বিরহে কাতরা মদিনা শেষপর্যন্ত একপ্রকার স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করল। লক্ষণীয়, বিনা দোষে তার স্বামী তাকে

ত্যাগ করা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার পরেও সে স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো কটূক্তি করেনি, কোনো অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ করেনি তার প্রতি। শুধু দুঃখ করেছে তার নিজের স্বপ্নের সংসাব ভেঙ্গে যাবার কারণে। ইচ্ছা করলেই সে দুলালের নিষেধ সত্ত্বেও বান্যাচঙ্গে উপস্থিত হয়ে দুলালের ভালমানুষীর মুখোশ খুলে দিতে পারত। কিন্তু পাছে তার প্রিয়তমের সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট হয় তাই কোনো প্রকার প্রতিহিংসাপরায়ণতার পরিচয় সে দেয়নি। নিজের দুঃখ নিজেই ভোগ করে, কাউকে তার জন্য দোষী সাব্যস্ত না করে অকালে বিদায় নিয়েছে ধরাধাম থেকে। আর এইভাবেই সে তার জ্বলন্ত পতিপ্রেমের স্বাক্ষর রেখেছে। সমালোচকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি উদ্ধার করে বলা যেতে পারে,

'কেবলমাত্র অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সম্মুখ সংগ্রাম কিংবা আত্মত্যাগের ভিতর দিয়াই যে নারীর শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা নহে—নীরব সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়াও যে তাহার এক অপূর্ব মহিমা প্রকাশ পাইতে প্যারে, মদিনাব জীবনে তাহাই দেখা যায়।'[১১]

## আলাল ও দুলাল

দেওয়ান সোনাফরেব প্রথমা স্ত্রীর দুই পুত্র আলাল ও দুলাল। দ্বিতীয়া পত্নীর চক্রান্তে তারা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল, ঘটনাচক্রে দুই ভাই রক্ষা পায়। প্রথমে তারা কাজলকান্দায় বসবাসকারী হীরাধব ব্যাপারীর গৃহে বিক্রীত হয়। এখান থেকে আলাল পলায়ন করে দেওযান সেকেন্দারের সান্নিধ্যে আসে। কিন্তু দুলাল থেকে যায়। আলাল তার কর্মপটুতা এবং কর্তব্যপরায়ণতার গুণে সেকেন্দারের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়। দেওযান সেকেন্দার দুটি কন্যা ছিল। সেকেন্দার স্থির করল এক কন্যার সঙ্গে আলালেব বিবাহ দেবে। এদিকে বুদ্ধিমান আলাল তার পিতৃভিটাব অধিকারী হবার মানসে সেকেন্দারের কাছে পাঁচ শত শ্রমিক এবং দুই শত সৈন্য যাচ্ঞা করল। এদের সহায়তায় আলাল বান্যাচঙ্গে বাড়ী নির্মাণ কবল। ক্রমে সে বান্যাচঙ্গ অধিকার করে নিয়ে পিতৃপদের অধিকারী হল। সে কিন্তু নিছক নিজেব সৌভাগ্যসুখ নিয়েই তৃপ্ত ছিল না। দুলালের কথা তার মনে ছিল। তাই স্পষ্টাস্পষ্টি সে সেকেন্দারকে জানিয়ে দিয়েছে—

> আমার আর এক ভাই দুনিয়াতে আছে।
> তার লাগ্যা দিলে আমি বড় দুঃখু পাই।।
> বিয়া করিবাম পরে তারে যদি পাই।।

ভাইযেব সন্ধানে আলাল দরিদ্রের বেশ ধারণ করে নানা স্থানে তার সন্ধান করে শেষপর্যন্ত বিবাহিত দুলালের সন্ধান পেল। আলাল দুলালকে পরামর্শ দিল তালাকনামা দিয়ে মদিনাকে ত্যাগ করতে। সেকেন্দার-কন্যাকে বিবাহ করার পরামর্শ দিল সে। আলাল যতই ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় দিক, কিন্তু মদিনাকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে সে যে একটি রমণীর সুখী দাম্পত্য জীবন বিনষ্টের কারণ হয়েছিল, সেজন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত না করে পারা যায় না।

তবে তুলনামূলকভাবে অধিকতর দোষী হল দুলাল। তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে হয়। দুলাল মদিনাকে বিবাহ করেছিল, লাভ করেছিল বিনিময়ে জায়গা জমি। এমন কি তাব সুরুজজামাল নামে একটি পুত্র সন্তানও হয়েছিল। যে দুলাল মদিনার সঙ্গে একত্রে ধান ঝেড়েছে, যে মদিনা পৌষ মাসে সাইল ক্ষেত পাহারা দিয়েছে, দুলালকে তামাক সেজে দিয়েছে, তার জন্য ভাত রেঁধে অপেক্ষা করেছে দিনের পর দিন, এমনকি দুলালের হাতের কাছে রোপনের জন্য ধানের চারা এগিয়ে দিয়েছে, মাঘ মাসের শীতে দুলাল জমিতে জল সেচনে গেলে মদিনা তার জন্য আগুন প্রস্তুত করে ক্ষেতে নিয়ে গেছে, একসঙ্গে শীতের দিনে আগুনের তাপ পুইয়েছে, এহেন সুখী দাম্পত্য জীবন নিছক ভাইয়ের পরামর্শে একতরফাভাবে ভেঙে দিয়েছে দুলাল। স্ত্রী এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা পর্যন্ত সে করেনি। দীর্ঘদিন স্বামীর পথ চেয়ে শেষপর্যন্ত হতভাগিনী মদিনা পাগল হয়ে অকালমৃত্যু বরণ করেছে। দুলালের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে পারেনি মদিনা। মদিনার অকালমৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ রূপে দায়ী দুলাল। কতখানি স্বার্থপর এবং হীনচেতা ছিল দুলাল যে তার শ্যালকের সঙ্গে পুত্র সুরুজ বান্যাচঙ্গে মদিনাব কথামত উপস্থিত হলে সে বলে.—

অসর্ম্মানি অইবাম আমি তোমরারে লইয়া।।

সে পরামর্শ দিয়েছে :

ক্ষেতখলা আছে তোমরা সেই সগল কর।
আর না আসিও ফিরা৷ বান্যাচঙ্গের সর।।

হতভাগিনী মদিনা তার এককালের পরম আশ্রয় এবং জীবন সঙ্গী দুলালের এই আচরণের সংবাদেই একেবারে ভেঙে পড়েছিল। যেটুকু তার প্রত্যয় ছিল যে শেষপর্যন্ত—

দুলালে তালাক দিব নাই সে লয় মনে।
মদিনারে ভালবাসে যেবা জান পরাণে।।
তারে ছাড়ি দুলাল রইতে না পারিব।
কতদিন পরে খসম নির্চয় আসিব।।

—তা অন্তর্হিত হয় এবং অকাল মৃত্যুর শিকার হয়।

এদিকে দুলালকে দেখা গেছে বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে। সে শ্যালক এবং পুত্রকে বিদায় দিয়ে ভাবলে একদা যে মদিনা তার প্রাণের বিনিময়ে তাকে অধিকার করে নিয়েছিল, একদিন তার সর্বহাবা অবস্থায় যে মদিনার পিতা তাকে আশ্রয় দিয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছিল, সে সেই আশ্রয়দাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যে মদিনার পিতা আশা করে তার সঙ্গে স্নেহের পুত্তলির বিবাহ দিয়েছিল, যৌতুক দিয়েছিল জায়গাজমি, সে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেনি, মদিনার স্বর্গীয় প্রেমের অমর্যাদা করে সে পাপী হয়েছে। শেষপর্যন্ত সে তার ভ্রাতা আলাল অথবা নবোঢ়া পত্নীকে কিছু না জানিয়ে কাজলকান্দার উদ্দেশে যাত্রা করেছে। কিন্তু যখন সে কাজলকান্দায় পৌঁচেছে তার আগেই তার চরম শঠতায় এবং অবিমৃষ্যকারিতায় মদিনার মৃত্যু হয়েছে। দুলাল

অনেক কান্নাকাটি করেছে এবং বান্যাচঙ্গের লোভনীয় দেওয়ান গিরি ত্যাগ করে ফকির সেজে মদিনার কবরের কাছে ডেরা বেঁধেছে। নিজের মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করেছে সে। অর্থাৎ কৃতকর্মের জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দেখা গেছে। কিন্তু তাতেও সে সেকেন্দার দেওয়ানের কন্যা, তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতিও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়ে প্রকারান্তরে নিজের দোষের পরিমাণকেই বৃদ্ধি করেছে।

## মানিকতারা ডাকাইত

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ৮৩২ পংক্তি বিশিষ্ট মানিকতারা ডাকাইতের পালাটি সংকলিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র পালাটির রচয়িতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন আমির ও জামাইৎউল্লা নামক দুই ব্যক্তিকে। দীনেশচন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী,

'...আমির রচনাভঙ্গীতে জামাইৎউল্লার এমন সুন্দর অনুকরণ করিয়াছেন যে, উভয়ের রচনা পৃথক করা কষ্টকর। গায়েনেরা অনেক সময়ে কবিত্বের দাবী ফাঁদিয়া ভণিতায় নিজেদের নাম ঢুকাইয়া দিতেন, এইভাবে আমিরের নাম ভণিতায় প্রবেশলাভ করিয়া থাকিতে পারে।'

অর্থাৎ সেন মহাশয়ের মতে মূল পালাটির গায়ক ও রচয়িতার সংখ্যা এক এবং তিনি জামাইৎউল্লা। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় কিন্তু দীনেশচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তাঁর অভিমত, 'মানিকতারা পালা রচনা করিয়াছিলেন মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার ইসলামপুর গ্রামনিবাসী কবি সেখ আমিরুদ্দিন।'

আর একটি বিষয়ে সেন মহাশয়ের সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্রের মত পার্থক্য লক্ষিত হয়। দীনেশচন্দ্রের মতে, 'এই পালা ইংরেজাধিকারের কিছু পূর্বে অর্থাৎ মুসলমানাধিকারের অবনতির দিনে রচিত হইয়াছিল। গানটির রচনাকাল সম্ভবত: অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।' কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমার মনে হয় এই পালার ঘটনা ১৬৫০ হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল এবং ঘটনার অব্যবহিত কাল পরেই শেখ আমির পালা রচনা করিয়াছিলেন।'

রচয়িতা এবং রচনাকাল সম্পর্কে উভয়ের বক্তব্যেই যুক্তি আছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তাই কোন পক্ষের সমর্থনেই কিছু বলা অনুচিত। পালাটির রসাস্বাদনে অবশ্য এইসব বিতর্ক কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। যাইহোক, দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালাটি যেখানে অসম্পূর্ণ, ক্ষিতীশচন্দ্র সেখানে সম্পূর্ণ পালাটির হদিস দিয়েছেন 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে।

বিশু নাপিতের পাঁচ পাঁচটি সন্তান। কিন্তু চারটিই মারা গেল বেঘোরে। কুশাই মারা গেল নদীর জলে নিমজ্জিত হয়ে, দাশু মারা গেল কুমীরের হাতে, আর একটি সন্তান গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ায় তাতে মারা গেল। ছোট্কা মারা গেল রোগে। জীবিত রইল কেবল জ্যেষ্ঠ সন্তান বাসু। দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তদুপরি পুত্রশোকে কাতর বিশুও নদীর

স্রোতের টানে ডুবে গেল। বিশুর পত্নী কেবল বেঁচে রইল একমাত্র পুত্রের আকর্ষণে। অসহায় এই পরিবারটির সাহায্যার্থে এগিয়ে এল কোচার পাড়ার কানাইয়ের মা। সে বাসুর মায়ের সঙ্গে সই পাতাল। কানু বয়সে ছিল বাসুর তুলনায় মাত্র তিন বৎসরের বড়।

কানু ও বাসুতে বড় ভাব। বাসুর মার কিন্তু মোটেই পছন্দ নয় দুজনের মেলামেশা। সে নিষেধ করে বাসুকে কানুর সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে, কিন্তু বাসু শোনে না। বিশ বৎসর বয়স্ক বাসু কানুর চেলা হয়ে পড়ল।

একদিন এ হেন বাসু কানুর পরামর্শে ডাকাতি করতে বের হল। সোনা মাঝি অসুস্থ হয়ে পড়লে কানু তার নৌকায় এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে পার করার দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু সে মতলব করেছিল অন্যবিধ। গঞ্জের ঘাটের জলের ঘূর্ণাবর্তে উভয়কে মেরে তাদের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করবে। বাসুর সহায়তায় কানু বাস্তবিক সেই দুষ্কার্যই সম্পন্ন করল। বাসু তার প্রাপ্য ব্রাহ্মণ পরিবারের সোনাদানা অলঙ্কারাদি নিয়ে গৃহে এল। বাসুর মা ছেলের কুকীর্তির কথা জানতে পেরে শোকে দুঃখে প্রাণত্যাগ করল।

মাতৃশোক বাসুকে কিছুটা আঘাত হানল। কিন্তু সেটা নিতান্তই সাময়িক। পুনরায় সে কানুর চেলা হয়ে ডাকাতি করতে শুরু করল। কানুর মা কানুর বিবাহ দিয়ে বাসুকে বিবাহ করার পরামর্শ দিল। বাসু বের হল কন্যার সন্ধানে। শেষে সে বিবাহ করল সাধু শীলের কন্যা পরমা সুন্দরী মাণিকতারাকে।

বিবাহ ত হল, কিন্তু বাসুর মনে শান্তি নেই। সে তার জীবিকার কথা মাণিকতারাকে খুলে বলতে পারে না, পাছে মাণিকতারার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শেষে একদিন সে সব কথা তাকে বলেই ফেলল—

চুরি কইরা খাইছি কত কইরাছি কত খেলা।।
বয়েস বাইড়্ল ডাঙ্গর হইলাম শিখলাম ডাকাতি।।
পরের ধন লুইটা আইনা কইরাছি বেসাতি।।

মাণিকতারা সব শুনে প্রসন্ন মনে জানাল যে সে পতির সকল কর্মের সহায়ক হবে। তখন বাসু মাণিককে জানাল তার পরম শত্রু কালুচোরার কথা। সে জানাল সে যাচ্ছে নবাব সরকারের খাজনার টাকা ডাকাতি করতে রাখাল রাজার দীঘির পাড়ে। তার অবর্তমানে পাছে কালুচোরার কারণে মাণিকের কোন বিপদ হয়, এই আশঙ্কা তার। কিন্তু মাণিকতারা বিপদাশঙ্কা উড়িয়ে দিল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

বাসু ও কানু সর্দার কুড়িজন জোয়ান সহ ডাকাতি করতে গেল। বাসু টাকার থলি নিয়ে পালালেও কানু ধরা পড়ে গেল কালুর দলের হাতে। বাসু গেল কানুকে উদ্ধার করতে। এদিকে মাণিকতারাও চিন্তিত হয়ে পড়ল কানুর উদ্ধারের ব্যাপারে—

আমার পতি খাইছে বহুত কানুর মায়ের নুন।
কি কইরা সুজ্বাম আমি সেইনা নুনের ঋণ।।
কালুচোরার হাত থিকে যুদি কানুরে আনবার পারি।

তা হইলে এইনা ঋণ কতক হইব জারি।।

কানুকে বাঁচাবার জন্য সে বিধবা বোন্‌ঝি পঞ্চুকে নর্তকী সাজিয়ে আর নিজে গায়িকা হয়ে যাত্রা করল। কালুর পুত্র দুলুকে আকৃষ্ট করে নৌকায় তুলে নিল। তারপর তাকে মদ্যপান করিয়ে বেহুঁস করে বেঁধে ফেলল। এইভাবে মাণিকতারা শর্ত আরোপ করল যে কালু যদি কানুকে মারে, তবে তার দুলুরও মৃত্যু ঘটবে। কালু এই শর্তের কথা অবগত হয়ে বাসুর বাড়ী আক্রমণ করল। সকলে পলায়ন করলেও মাণিকতারা পলায়ন করল না। সে সমানে প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। কালু মারা পড়ল কিন্তু তার হাতে বাসুর পা ভাঙ্গল। মাণিকতারা স্বামীকে যত্ন করে খুব। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাকেই ডাকাত দলের নেতৃত্ব দিতে হল। শেষে এক দুর্যোগে ডাকাতি করতে গিয়ে শিমুলতলাতে জলের ঘাটে মৃত্যুমুখে পতিত হল। বেচারী বাসু ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল।

'মাণিকতারা ডাকাইতের পালা'র আখ্যানটি অভিনব, বিশেষতঃ মাণিকতারার বীরাঙ্গনার ভূমিকা আখ্যানের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। 'আসরবন্দনা' দিয়ে পালার সূচনা। বন্দনাংশে হিন্দু দেবতা এবং মুসলমানের আল্লা উভয়কেই স্মরণ করা হয়েছে।

দেব্‌তা নিরঞ্জনের পায় আমি পরথমে বন্দম্।
মেহেববানী কর আল্লা মুই বড়ো অধম।।

ব্রহ্মপুত্র নদীর বর্ণনা দিয়ে মূল পালার শুরু। সচরাচর মূল আখ্যান দিয়েই গীতিকার শুরু হতে দেখা যায়। এখানে তাব ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং তার ফলে কিছুটা নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণনাগুণে ব্রহ্মপুত্র জীবন্ত এক চরিত্রে রূপান্তবিত—

এই ত দেখি তেলেছমাত্ নদী
যহন পায়না বাতাস বাও।
মাটির মতন পইড়া থাকে
মুখে নাই তার বাও।।

তবে ব্রহ্মপুত্রেব বিবরণ কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়েছে যা সংক্ষিপ্ত হতে পারত। সংক্ষিপ্ত হতে পারত বিশু নাপিতের বংশ প্রায় নির্বংশ হওয়ার বিববণ। চার চারটি পুত্রের অকাল মৃত্যুজনিত শোকে বিশুর প্রায় আত্মহননেব প্রসঙ্গটি অবশ্য বাস্তবতার সীমাকে লঙ্ঘন করেনি। বিশুর মৃত্যুতে বিকলচিত্তে তার পত্নীর আত্মহননের ইচ্ছা এবং একমাত্র সন্তান বাসুর ডাকে পুনরায় তার বাঁচার প্রেরণা লাভের প্রসঙ্গটি যেমন মনস্তত্ত্বসম্মত হয়েছে, তেমনিই তা মানবিক গুণে সমৃদ্ধ।

অভাবে জর্জরিত বাসুর মাকে কানুর মা যে নিত্য গামছায় বেঁধে চাল, ডাল, গোটা বেল, বেগুন, মরিচ, নানাবিধ ফল, মহিষেব দুগ্ধ ইত্যাদির যোগান দিত তাতে কানুর মার উদারতা, সইয়ের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশিত। সর্বোপরি তার আচরণ মানবিক গুণ সমৃদ্ধ হয়েছে স্বীকার করতে হয়। বাসুর মা যেভাবে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে, জেলেদেব জালের সুতো কেটে, ঢেঁকি ভেঙ্গে ক্ষুদ কুড়ার সংস্থান করেছে, তাতে দারিদ্র্য পীড়িত

পরিবারের চিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাসুর মার জীবনাসক্তির পরিচয় মেলে শত অভাবেও ভাবী কালের সুখের কথা চিন্তা করার মধ্য দিয়ে—

জাইত-ব্যবসা কইর্‌ব বাসু যাইব সগল দুখ্।
পেটের জ্বালা যাইব দূরে দেখ্‌ব সুখের মুখ।।

কথায় বলে মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। বাসু মানুষ হল না, পরিণত হল সে ডাকাতে। বাসুর মা শত দারিদ্র্যের শিকার হয়েও পুত্রের অসৎ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ গ্রহণ করেনি, শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণ হত্যার পাপে পুত্র লিপ্ত--এই নির্মম সত্য জেনে সে গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শেষপর্যন্ত তার মৃত্যুও ঘটেছে। কবি এক্ষেত্রে বাসুর মার চরিত্রচিত্রণে বাস্তবতাকে অনুসরণ করেছেন। জননীর চরিত্র শাশ্বত, তার সীমাহীন অপত্য স্নেহ, পুত্রের সামান্যতম অশুভ কিছু ঘটার সম্ভাবনায় ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া যেমন শ্রীকৃষ্ণ-জননীর মধ্যে লক্ষিত হয়েছে, তেমনি লক্ষিত হয়েছে বাসুর মা'র মধ্যেও। বাসুর মঙ্গল কামনায় তাকে মানসিক করতে দেখা গেছে—

'দোহাই দেই বুড়ো ঠাক্‌রাইন্,
আমার বাসুরে ভালা রাখ্‌বাইন্,
ভাইজা দিমু ছাঘু গুড় আর চাইল।
দোয়াই মাও গো সুবচুনী,
আমার বাসুরে ভালো রাইখ্যো জানি,
আমি গুয়া পান দিমু তরে কাইল।।

কিন্তু সন্তানের জন্য এহেন ব্যাকুল হৃদয় জননী যখন জেনেছে বাসু ব্রাহ্মণ বধ করে প্রভূত বিত্ত হস্তগত করেছে, তখন ক্ষোভে দুঃখে জননীর মুখ থেকে একেবারে আগ্নেয়গিরির লাভা উৎসারিত হয়েছে—

হইয়া কেনে মরলি নারে হইত না এত জ্বালা।
এমুন দুশমনের হায় রে ডুইব্যা মরণ ভালা।।

সে সময়ে গ্রামের মানুষ চিকিৎসার জন্য নির্ভর করত কবিরাজের ওপর। অনেক কবিরাজই চিকিৎসার নামে ভাওতা দিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। আলোচ্য পালায় তেমনিই এক তিনকড়ি কবিরাজের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের গীতিকাগুলির অধিকাংশই ট্রাজেডিতে শেষ হয়েছে, তাই হাস্যরস সৃষ্টির অবকাশ তেমন সেখানে দেখা যায়নি। তিনকড়ি কবিরাজের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তাতে যেমন সে জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, তেমনিই নির্মল হাস্যরসের আধার হয়ে উঠেছে সে—

তিনকড়ি কবিরাজ শুইনা ধুতি-চাদ্দর পইর্‌যা।
চাদ্দরের খুইটার মধ্যে দাওয়াই বাইন্ধ্যা লয়্যা।।
হাতে লইল বাগা-লাঠি কান্ধে লইল ছাতি।
তুলসী তলায় যায়্যা কবিরাজ ঠেকাইল মাথি।।

কিষ্ট বরণ শরীলখানি ত্যালতালা তার গাও।
খাটাখুটা নাফাগোফা ফাটাফাটা পাও।।
কুত্‌কুতাইয়্যা চায় কবিরাজ গুর্‌গুরায়্যা যায়। ইত্যাদি

কবিরাজের চিকিৎসার বিধানটিও তারই মতন। অসুস্থ বাসুর মায়ের জন্য তার প্রদত্ত ভেষজের তালিকা হল এইরকম—

আইজকা দিবা ব্যালের ছাল আর নিমের পাতার ঝোল।
কাইল্‌কা দিবা গরম কইরা সজ ভিজাইনা জল।।
পশ্যু দিবা নীল বড়িডা কাঞ্জি দিয়া গুইল্যা।
তশ্যু দিবা নাল বড়িডা কুয়ার পানি তুইল্যা।।
শেষামেশি দিবা বাসু এই না ধলা বড়ি।
আরাম হইব তোমার মাও থাইকব না জ্বর জারি।।
চাকুল্যা চাউলের ভাত খিল্যাইও শরীলে ঢাইল জল।
ধলা বড়ি খাওয়াইলে দিও তেতুলেব অম্বল।

যথারীতি কবিরাজ এক কুল্যা চাল, এক ডালা ডাল, হলুদ, লবণ, তৈল, গাছের বেগুন, মরিচ, কলা ইত্যাদি পারিশ্রমিক স্বরূপ নিয়ে হাসতে হাসতে বিদায় নিল। তার দেওয়া আশ্বাস—

তোমাব মাও যে বালো হইব খাইলে চাইরডা বড়ি

—কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বাসুর মা সন্ধ্যাবেলাতেই দেহ রাখল।

মৃত জননীর মুখে আগুন দিয়ে বাসু সেই দেহ জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সমাজের দরিদ্র তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সৎকারের বাস্তব ছবিটিই এখানে ধরা পড়েছে।

ব্রাহ্মণ হত্যা করে বাসু যে মূল্যবান সামগ্রী আত্মসাৎ করেছিল, সেই সব অলঙ্কারাদির তালিকা থেকে সমসাময়িক কালের প্রচলিত অলঙ্কারাদি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। এ সবের মধ্যে ছিল—

সোনার বেসর, ঝুমকা দুল, আর আছে কন্নফুল।
গলায় চিক, মাথায় সিতি, আর নাইরকল ফুল।।
সোনার মালা, বাজু, আর আছে বুকের পাটা।
সোনার হাসুলি আর কান-খোঁচানী কাঁটা।

*        *        *

চন্দ্রহার, সুরুজহার, আর আছে বেকী খাড়ু।
চরণপদ্মে বান্ধা রইছে গুঞ্জরী দুই গাছ সরু।।

বাসু তার সহধর্মিনীর সন্ধানে সাধুর গৃহে উপস্থিত হলে বাসুর আপ্যায়ণের জন্য যে আয়োজন হয়েছে, মূল আখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে তার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল না। কবি বিশেষত: রন্ধনের প্রসঙ্গটি সংক্ষিপ্ত করতে পারতেন। তা সত্ত্বেও সেজ বৌয়ের ডাল

রান্নার বিষয়টি কিছুটা হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। ডাল গলতে দেরী হওয়ার কারণে সে ডালকে উদ্দেশ করে বলেছে—

অ: ডাইল গলবি কিনারে
ডাইল গল না সকালে।
খিদায় আকুল হয়্যা রইছে
বইয়া সগলে।।
ভাসুর করে কিচির মিচির
দেওরে করে রাগ।
ফোটা তিল কাইট্যা হউর
সাইজ্যা বইছে বাঘ।।

ভাসুর-শ্বশুর সম্পর্কে সেজ বৌয়ের মন্তব্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার।

কিছু কিছু সংস্কার ও সামাজিক প্রথা ইত্যাদির বর্ণনায় পালাটির বাস্তবরস সমৃদ্ধ হয়েছে স্বীকার করতে হয়। বাসুকে ভাজা পোড়া খেতে দেওয়ায় তার ভাবী শ্বশুর বাড়ীর লোকের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়েছে সে। কেননা প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী জামাই প্রথম শ্বশুরালয়ে এলে তাকে কোনো ভাজা পোড়া দিতে নেই, দিলে কন্যা শ্বশুরবাড়ীতে স্বামী, শাশুড়ী, ভাজ, ননদ, এমনকি আত্মীয় স্বজনের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। সাধু তাই বলেছে :

পয়লা ভোগে জামাইর পাতে দিলা ভাজা—পোড়া।
হউর বাড়ী যাইয়া পুরী হইব আধা মরা।।
জামাই ভাজে, শাশুড়ী ভাজে, ভাজে ননদগণ।
ইষ্টি কুটুম পাড়া পশ্যি তারে ভাজে অইষ্টক্ষণ।।

শেষপর্যন্ত বাসুর পাত থেকে সমস্ত ভাজা পোড়া নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সাধুশীল মাণিকতারার সঙ্গে বাসুর বিবাহের জন্য বাসুর কাছ থেকে একশ টাকা পণ আদায় করেছে বলে বর্ণিত হয়েছে।

বাসুর কাছে সাধু লইল একশ ট্যাকা পণ।

অর্থাৎ বর পণের মত যে কন্যা পণেরও রেওয়াজ ছিল, তা বোঝা যায়।

বিবাহের পর মাণিকতারা শ্বশুরালয়ের উদ্দেশে যাত্রার পূর্বে মাতৃঋণ শোধ করেছে ইঁদুরের মাটি দিয়ে—

তারার পাছে খাড়াইল মাও টোনা যে পাতিল।
দুই হস্তে এন্দুরের মাটি মাণিকতারা দিল।।

এও এক প্রচলিত সামাজিক রীতি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে। আরও দু' একটি দৃষ্টান্তের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধু যখন তার কাছে উপস্থিত হবার কারণ বাসুর কাছে জানতে চেয়েছে, তখন লজ্জাবশত: বাসু সাধুর দিকে না তাকিয়ে

মাটির দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছে—

মাটির দিরি চাইয়া বাসু মিহিসুরে কয়।
একলা ঘরে থাকি আমি জানুইন্ সমুদায়।।
কুটুম নাই বয়েস হইল ঘরের মানুষ চাই।
জানের দোসর বিচ্‌ড়াইবার লাইগ্যা বাইর হইছি তাই।।

নিজের বিবাহেব প্রসঙ্গ পাত্রের পক্ষে বলা, বিশেষত: ভাবী শ্বশুরের কাছে, যে কতখানি বিড়ম্বনাদায়ক, কবি বাসুর আচরণের মাধ্যমে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনাটি উপভোগ্য ও বাস্তবসম্মত হয়েছে। নির্মল হাস্যরস এই বর্ণনা থেকেও লভ্য। জামাই শ্বশুরবাড়ীতে প্রথমবারে এলে তার পাতে ভাজা পোড়া দিতে নেই এই যুক্তিতে যখন বাসুর পাত থেকে বড় কইমাছ ভাজা, বেগুন পোড়া, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, তিলের বড়া ভাজা, বেসন দেওয়া উস্কি ভাজা ইত্যাদি তুলে নেওয়া হয়েছে, তখন বেচারী ভোজন রসিক বাসুর প্রতিক্রিয়া এবং তার সান্ত্বনালাভের প্রয়াস হাস্যরসের উদ্রেক করে—

বাসু ভাবে, হায় কি হইল এই না কম্মে ছিল।
মস্ত বড়ো কই মাছ ভাজা আর বাগুন পোড়া গেল।।
* * *
মনের মতন জিনিস পায়্যা খাবার না পারিল।
বিয়া হইব ভাব বুইঝ্যা মনে খুশী হইল।।

দীনেশচন্দ্র সেনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—

'আখ্যায়িকার কোন কোন অংশ সুদীর্ঘ হইলেও আগাগোড়া এমন একটা কৌতুকের ধার প্রবাহিত হইযাছে যে ভাষার দুরূহতা সত্ত্বেও পাঠকের মনে শ্রান্তি বা বিরক্তির সঞ্চাব হয় না। ব্যঙ্গ রসের অবতারণায় কবির হাত যশ বেশ পটু ;'[১২]

ডাকাতির বিবরণের কারণে পালায় কিছুটা বীররসের স্বাদ মেলে। তবে ক্ষেত্র বিশেযে কবির ব্যক্তিগত মন্তব্য অনাবশ্যকভাবে সংযোজিত হয়ে পালাটির ভারকেই বৃদ্ধি করেছে। যেমন—

(ক) অনাথ হইলে জগদিষ্ট ইষ্ট করে তার।
(খ) সেক বয়াতী জামাত উল্লা হাইস্যা হাইস্যা কয়।
কথা শুইন্যা দুঃখে মরি এইবা কি আর হয়।।
মায়ের বুকের এককোটা দুধ হয় রে মহা ঋণ।।
দুনিয়ার কেউ পারেনা শুইজ্‌বার মায়ের দুধের ঋণ।।
(গ) পতির ভালবাসা পাইলে জুড়ায় নারীর বুক।
পতির কাছে আদর পাইলে নারীর হয় রে সুখ।।

এইবাব কবির চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ। প্রথমেই যার নামে পালাটির নামকরণ, সেই মাণিকতারার বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

**মাণিকতারা**

মাইন্দা গ্রামের সাধু শীলের পরমা সুন্দরী কন্যা মাণিকতারা। তার পিতা সাধু শীল কন্যার গুণপনার কথা বলতে গিয়ে যে বলেছে--

ঘরে বাইরে কায্য করে পুরুষোর লাগে তাক।
তার উপরে হাত ঘুরাইলে কাইট্যা রাখে নাক।।

—তা মোটেই অত্যুক্তি নয়। বাসু নবোঢ়া মাণিকতারাকে গৃহে একাকিনী রেখে তার জীবিকায় ব্যস্ত থাকার প্রসঙ্গে শঙ্কা প্রকাশ করলে মাণিকতারা জানিয়েছে সে মোটেই অবলা নারী নয়, কেননা—

বিশ যোয়ানের মাথা আমি একলা খাইতে পারি।

এ যে তার মুখের কথা মাত্র ছিল না, পববর্তীকালে সে তার আচরণেই তা প্রমাণ করেছে। বাসু হুইর্‌কাল পাখীর মাংস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মাণিকতারা বলেছে--

আমার বাপের বাড়ীত্‌ গিয়া কওগে বাপের ঠাই।
তারামণির ধুনকী বাটোইল সাইনঝার আগে চাই।।

সেইমত শিকারের সাজসরঞ্জাম সব আনীত হল। মা্‌ .কতারা নিজ হস্তে তীর তৈরী করেছে, মাটি দিয়ে গোলা পাকিয়েছে গণ্ডা পাঁচেক। তার লক্ষ্য কি অভ্রান্ত—

...মাণিক ধুনকীত্‌ দুই গুল্লি বসাইল।
দুই হুইরকাল মাটিত্‌ পইড়্যা আছাড়-পিছাড় লইল।।

মাণিকতারা এক বাটুলে পাঁচটি শিকারেও সক্ষম ছিল। সে প্রসঙ্গত জানিয়েছে দারু ও সুমারু কোচের সাকরেদি করেছে-

শতেক দুশ্‌মন যদি সামনে হয়রে খাড়া।
তীর ধুনকী হাতে থাইক্‌লে একলা একশ মাণিকতারা।।

কালুর আক্রমণের সম্ভাবনায় বাসু মাণিকতারাকে পরামর্শ দিয়েছে পলায়নের জন্য। কিন্তু স্বামীর পরামর্শ মানতে সে সম্মত হয়নি। উল্টে সে স্বামীকে ব্যঙ্গ করে বলেছে--

পলাইয়া যাওবে তুমি যুদি পায়্যা থাকো ভয়।।
তা না হইলে দুলুচোরার কথা মাথা কাইট্যা লয়্যা।
গোঞ্জের ঘাটে রাইখ্যা আইস বাঁশেতে ঝুলায়্যা।।

বাস্তবে ভীষণ প্রকৃতির কালু যখন বাসুর গৃহ আক্রমণ করেছে, তখন বীরাঙ্গনার ভঙ্গিতে মাণিককে তার মোকাবিলা করতে দেখা গেছে—

বাড়ীর সামনে মাণিকতারা একলা মাইয়া খাড়া।
পঞ্চ আছে পিছনে তার তীরের বোঝা ধইবা।।

লোককবি তার বীর্যবত্তা সম্পর্কে আরও জানিয়েছেন—

একলা মাইয়া মওরা নিল দুই কুড়ি ডাকাতে।।

কালুর মৃত্যু হয়েছে শেষপর্যন্ত। কালু, দুলুর মৃত্যুতে এবং বাসুর খঞ্জ হওয়ার পর ডাকাতেরা যখন একজন যোগ্য সর্দারের সন্ধানে রত, তখন মাণিকতারা স্বেচ্ছায় এই

দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছার কথা জানিয়েছে। প্রেমের শক্তিতে গীতিকার নারী চরিত্রগুলি অতুলনীয়, কিন্তু শৌর্যে বীর্যে মাণিকতারার অনুরূপ নায়িকা চরিত্রের সন্ধান শুধু গীতিকাতেই নয়, সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যেও বড় বেশি মেলে না। মাণিকতারার প্রভাব প্রতিপত্তির পরিচয় দান প্রসঙ্গে লোককবি জানিয়েছেন—

দেশের দেওয়ান কাজী ডরায় মাণিকতারার নামে।
সাধুর ডিঙ্গা সেলামী দেয় ভাটি আর উজানে।।

* * *

দেশ বিদেশের জমিন্দার মাণিকতারার খাজনা দেয়।
জান বাঁচাবার লাইগা তাগোব হইল বিষুম দায়।।

মাণিকতারার দুর্জয় সাহস এবং শৌর্যবীর্যই ছিল না, ছিল তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও। যে কৌশলে সে কালুর পুত্র দুলুকে বন্দী করেছে, তাতেই সে প্রমাণ মেলে।

মাণিকতারার চরিত্রের শৌর্য বীর্য ব্যতীত অপর যে বৈশিষ্ট্য আমাদের নজর কাড়ে, তা হল অসাধারণ পতিপ্রেম তথা পাতিব্রত্য। বাসুকেই সে তার ধর্ম কর্ম ও গতি বলে জেনেছে এবং সেই রকম আচরণই করেছে। তার মতে—

সোয়ামী থাইক্‌লে গাছের তলে আর ভাঙ্গা ঘরে।
স্তিরী যাইব পাছে পাছে সুখে দুখে নাই সে ছাড়ে।।

কাজেও মাণিকতারা তা দেখিয়েছে। কালুর হাতে বাসুর একটি পা ভাঙ্গলে এবং কর্ম ক্ষমতা হারালেও মাণিকতারা স্বামীকে অবজ্ঞা করেনি কখনও। একদিকে ডাকাতি করে সংসার প্রতিপালন করেছে যেমন, তেমনি অন্যদিকে স্বামীকে খাইয়েছে, তাকে যত্ন করেছে—

ঘরে আইসা মাণিকতারা কোন কাম করে।
পরাণ ঢাইলা সেবা যতন করে সোয়ামীরে।।
ভালা খাওন ভালা পিঁধন ভালা বিছান ঘরে।
সব্ব সুখে রাইখ্যাছে মাণিক আপন সোয়ামীরে।।

মাণিকতারার পাতিব্রত্যের পরিচয় অন্যভাবেও প্রকাশিত হয়েছে। কানুর মায়ের দ্বারা বাসু নানাভাবে উপকৃত ছিল, তাই মাণিক কালুচোরার হাতে বন্দী কানুকে মুক্ত করে আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছে, উদ্দেশ্য এইভাবে কিছুটা অন্তত: কানুর মায়ের ঋণ পরিশোধ—

কালুচোরার হাত থিকে যুদি কানুরে আনবার পারি।
তা হইলে এইনা ঋণ কতক হইব জারি।।

কানুর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী অন্য পুরুষের আশ্রয়ে গেলে অসহায়া কানু-জননীকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে মাণিকতারা তার অসাধারণ কর্তব্যপরায়ণতার প্রমাণ রেখেছে—

ঘরে বুড়ীর নাই কেউ নাই উপার্জনীয়া।

মাণিকতারা দেয় দব্ব যত লাগে আনিয়া।।
এইনা মতে বিশ বচ্ছর পার হইয়া গেল।

**বাসু**

'মাণিকতারা ডাকাইতের পালা'র মুখ্য আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ডাকাতনেত্রী মাণিকতারা, তবে তারপরই যে চরিত্রটির উল্লেখ করতে হয় সে হল বাসু। সে হল বিশুর 'এক পেটি তেল'। চারটি সন্তান বেঘোরে প্রাণ দেবার পর বিশুর এই সন্তানটিই বেঁচে ছিল। পুত্র শোকে ও দারিদ্র্যে বিশুরও মৃত্যু হল। তখন বাসু আর তার মা রইল বেঁচে। বাসুর মা অনেক ক্লেশে তার একমাত্র সন্তানটিকে মানুষ করেছিল। তার স্বপ্ন ছিল ছেলে তার জাত ব্যবসা করে অর্থাৎ নাপিত হয়ে সংসারের সব দুঃখ কষ্ট দূর করবে। কিন্তু তা আর হল না। বাসু অসৎ সংসর্গে পড়ে গেল। সে তার থেকে বছর তিনেকের বড় কানুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ডাকাতি শুরু করে। প্রথমেই সে আর কানু মিলে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে হত্যা করে তাদের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করে। বাসুর মা তা জেনে শোকে দুঃখে অভিমানে প্রাণত্যাগ করে। মাতৃবিয়োগ সাময়িকভাবে বাসুকে কাতর করলেও কয়েকদিন পরেই সে পুনরায় তার ডাকাতি ব্যবসা শুরু করে দিল। কানুর বিবাহ হলে, বাসু তার জীবন সঙ্গিনীর সন্ধানে ব্রতী হল। নির্বাচিত করল মাণিকতারাকে। দেখা গেল সকল বিষয়েই তার স্ত্রী তার শুধু উপযুক্ত নয়, অনেক ক্ষেত্রে সে বাসুকে অতিক্রম করে গেছে। বস্তুত: মাণিকতারার চরিত্রের দীপ্তির কাছে বাসু নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

বাসু ছিল ভোজন রসিক। সে খেতে পারত ভাল মত। তার শ্বশুর সেইজন্য তাকে পছন্দ করেছিল জামাই হিসাবে।

এহি ছেইল্যা পরাণে বাঁইচ্যা থাইক্‌ব অধিক দিনে।।
ইহারে দিব রে কইন্যা মনের অভিলাষ।

তার শূন্য ঘরে পাছে মাণিকতারার কোনো অসুবিধা হয়, তাই সে মাণিকতারার দিদির বিধবা কন্যা পঞ্চিকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছিল—

জনম ভইরা আমি তারে ভাত-কাপড় দিব।।

বাসুর আর যে দোষই থাক, সে যে মাণিকতারাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে মাণিকতারাকে উদ্দেশ করে যথার্থই বলেছিল—

তুমি আমার কইল্‌জার লৌ দুই চৌক্ষের কাজল।।

স্ত্রীর কাছে সে প্রথমে তার ডাকাতির কথা গোপন রেখেছিল, ভয় ছিল তার, যদি মাণিকতারার মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাতে। শেষে মাণিকতারারই আগ্রহাতিশয্যে সে সব কথা প্রকাশ করে দিয়েছে, তবে তার পূর্বে সে মাণিকতারাকে তার অর্জিত জহর পাতি সোনার মৌহর সব দেখিয়ে মানসিক দিক দিয়ে খানিকটা প্রস্তুত করে নিয়েছে। মাণিকতারা যখন বাসুকে তার সকল কর্মে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে, তখন বাসু নিশ্চিন্ত হয়ে পুনরায় শুরু করেছে ডাকাতি ব্যবসা। বাসুর প্রতিদ্বন্দ্বী

হল কালুচোরা। কালুকেই তার যত ভয়। কেননা ইতিপূর্বে সে কালুর কাছে বার কয়েক অপমানিত হয়েছে, এমনকি কালুর হাতে তার জীবনও বিপন্ন হয়েছিল। নেহাৎ অনুগ্রহ করেই কালু তাকে প্রাণে মারেনি। বিবাহের পর তার ভয় হল তার অবর্তমানে যদি কালুর কারণে মাণিকতারার কোন ক্ষতি হয়। বাসুর এই ভীতি থেকে মাণিকতারার প্রতি তার ভালবাসার প্রমাণ যেমন মেলে, তেমনি তার কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কেও জানা যায়। কেননা স্বামী হিসাবে স্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব তো তারই। ডাকাতিতে বাসু যে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মেলে 'লাটের খুতি' ডাকাতি করার মাধ্যমে।

তবে কালুর কাছে সে নিতান্তই শিশু। তাই কালু তার বাড়ী আক্রমণে উদ্যত হলে বাসুকে দেখা গেছে সন্ত্রস্ত হতে। মাণিকতারাকে সে পলায়নের পরামর্শ পর্যন্ত দিয়েছে। শেষপর্যন্ত কালুর হাতে তার একটি পা খোঁড়া হয়েছে। ডাকাতির ব্যবসা তার এই ভাবেই শেষ হয়েছে। জীবিত অবস্থাতেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। হারিয়েছে মাণিকতারাকে। ভিক্ষাবৃত্তি করে তাকে জীবন ধারণ করতে দেখা গেছে। ডাকাতির মাধ্যমে উপার্জিত যে সম্পদ সে ভূগর্ভে প্রোথিত করেছিল, তার সন্ধানে ব্রতী হয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কেননা ইঁদুরে হাঁড়ির তলদেশ ছেঁদা করায় হাঁড়িতে রক্ষিত সম্পদ সব পাতালে প্রবেশ করেছিল।

## ফিরোজ খাঁ দেওয়ান—সাখিনা বিবির পালা

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালাটি সংকলন করেছেন। ঐ একই পালা সংকলিত হয়েছে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডে। দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, 'পালাটি কবিত্বপূর্ণ না হলেও আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক।'[১৩]

কালিদাস গজদানী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হলেন। গৌড়ের সুবাদার এই সংবাদে প্রীত হয়ে তাঁর কন্যার সঙ্গে গজদানীর বিবাহ দিলেন। দুটি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করল। ঈশা খাঁ ত স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি জয়ন্তী পাহাড়ে পলায়ন করেন। জঙ্গলবাড়ীতে রাজত্ব করছিল রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুটি ভাই। কিন্তু দেওয়ান তাদের বিতাড়িত করে জঙ্গলবাড়ী অধিকার করে নিলেন। জঙ্গলবাড়ীকে তিনি মনের মতন করে সাজালেন। এই বংশেরই সন্তান ফিরোজ দেওয়ান। ইনি ঈশা খাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থির করলেন দিল্লীর বাদশাহকে আর খাজনা দেবেন না। ফিরোজ ছিলেন কুমার। তাঁর জননী তাঁকে বিবাহের কথা বললে তিনি এই যুক্তিতে গররাজি হন যে যেহেতু তিনি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধে লিপ্ত হতে চলেছেন, তাই পরাজিত হলে তাঁর বিবিকে দিল্লীশ্বর করায়ত্ত করবেন, বন্দী করবেন। এদিকে এক ছবিওয়ালী প্রাসাদে এসে উপস্থিত। তার কাছে উমর খাঁর কন্যার ছবি দেখে ফিরোজ মুগ্ধ হলেন। ছবিটি তিনি ক্রয় করলেন। এখন থেকে তাঁর মনে এক ভাবনা—তাজপুরের দেওয়ানের কন্যাকে কিরূপে লাভ করা যায়।

তাঁর বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হল। শিকার করার ছলনায় ফিরোজ জঙ্গলবাড়ী ত্যাগ করে চললেন। ফকিরের ছদ্মবেশে তিনি উমর খাঁ দেওয়ানের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে সাখিনা সুন্দরীকে চাক্ষুষ করলেন। সাখিনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেল। নিজের স্থানে ফিরে এসে দরিয়া বান্দীকে নিজের মনের বাসনার কথা জানিয়ে প্রেরণ করলেন তাজপুরে সাখিনা সুন্দরীর কাছে। দরিয়া ছবিওয়ালীর ছদ্মবেশে ফিরোজের ছবি নিয়ে যাত্রা করল। ফিরোজের ছবি দেখে সাখিনা ত অভিভূত। গলার হারের বিনিময়ে ফিরোজের ছবি ক্রয় করল সাখিনা। সাখিনা ফিরোজের প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হল। দরিয়ার অভিযান সফল হওয়ায় ফিরোজ এইবার তার জননীর কাছে সব খুলে বললেন। প্রথমে তিনি গররাজি হলেও পরে বিবাহে সম্মতি দিলেন এবং উমর দেওয়ানের কাছে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরিত হল। কিন্তু উমর বিবাহে সম্মত হলেন না। তাঁর মতে ফিরোজ নীচু বংশের সন্তান। তার সঙ্গে সাখিনার বিবাহ দিলে উমরের জাত্যভিমানে লাগবে, কেননা তিনি উচ্চ বংশীয়। অপমানিত উজিরের মুখে সব অবগত হয়ে ফিরোজ মাতৃ আদেশে উমর খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। উমর পরাজিত হলেন। সাখিনাকে জঙ্গলবাড়ীতে বন্দী করে এনে ফিরোজ তাকে বিবাহ করলেন। পরাজিত উমর উপস্থিত হলেন দিল্লীর বাদশাহের কাছে। জানালেন তাঁর দুঃখের কাহিনী। বাদশাহ সব শুনে ক্ষুব্ধ হলেন। যুদ্ধ ঘোষিত হল ফিরোজের বিরুদ্ধে। ফিরোজ বাদশাহের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়ে বন্দী হলেন। সাখিনা এই সংবাদ অবগত হয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে বাদশাহের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল। সাখিনার কাছে বাদশাহের সৈন্যরা পরাজিত হল। উমরের কেল্লা তাজপুর--ভস্মীভূত হল। কিন্তু এত কাণ্ডের পর সাখিনা জানতে পারল তার স্বামী ফিরোজ তাকে তালাক দিয়েছেন। এই সংবাদেই সাখিনা মৃত্যু বরণ করল। উমর খাঁ শোকে ভেঙ্গে পড়লেন কন্যার জন্য, ওদিকে ফিরোজও নিজের ভুল বুঝতে পারল। সাখিনাকে কবর দেওয়া হল। মনঃকষ্টে ফিরোজ দেওয়ানী ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করলেন। জানালেন তিনি আর জঙ্গলবাড়ী ফিরবেন না। সাখিনার কবরের কাছেই তিনি থেকে গেলেন। পালাটির কবি ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—

কুবুদ্ধি আছিল দেওয়ানের সুবুদ্ধি হইল।
কাফের আছিল দেওয়ান মোচ্ছলমান হইল।।

—জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান কালিদাস গজদানী যতদিন হিন্দু ছিলেন ততদিন তিনি ছিলেন কুবুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু সুবুদ্ধি হওয়াতেই তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেন!

পালাটিতে ঐতিহাসিক একাধিক চরিত্র উপস্থাপিত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালিদাস গজদানী। ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী হিন্দু জমিদার রূপে পরিচিতি অর্জন করেন। যে কারণেই হোক, ইনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন এবং হুসেন শাহের কন্যাকে বিবাহ করেন। ঈশা খাঁও বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র এবং দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে এঁর বিরোধের যে বিষয় উল্লিখিত হয়েছে তাও

সত্য। পালায় মূল চরিত্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছেন ফিরোজ খাঁ। ফিরোজ খাঁ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করে' ন, 'ফিরোজ খাঁ বোধহয় দেওয়ান ঈশা খাঁর বহুদূরবর্তী বংশধর নহেন। তিনি ঈশা খাঁর পৌত্রদের একজন হইবেন।' অপরপক্ষে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মন্তব্য করেছেন,

'স্বামী উদ্ধারের জন্য সখিনার যুদ্ধ সত্য ঘটনা। কেল্লা তাজপুরের নিকটে যে মাঠে সখিনার সঙ্গে উমর খাঁর পরিচালনাধীন বাদশাহী ফৌজের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও দেখিয়াছি।'

মূল আখ্যান ফিরোজ খাঁকে নিয়ে। তথাপি কবি কালিদাস গজদানী এবং ঈশা খাঁর প্রসঙ্গ ফিরোজের পূর্বপুরুষরূপে ঈষৎ বিস্তারিত পরিসরে উল্লেখ করেছেন, যেহেতু কালিদাসের ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে উমর খাঁ তার কন্যার সঙ্গে কালিদাসের উত্তর পুরুষ ফিরোজের বিবাহ দিতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। আর ঈশা খাঁকেই ফিরোজ তার জীবনের আদর্শ করে নিয়েছিলেন।

আখ্যানটিতে সমসাময়িক জীবনযাত্রার বেশ কিছু মূল্যবান তথ্যাদি প্রাপ্ত হই। সে সময়ে মানুষের আর্থিক সাচ্ছল্য ছিল, 'এক তঙ্কায় দেশে মিলে বিশ মন ধান'। জঙ্গলবাড়ী অধিকার করে ঈশা খাঁ সেখানে বার বাংলার ঘর নির্মাণ করেছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে—'বার বাংলার ঘরে লাগায় সোনার কবাট'। বার বাংলার ঘর ছিল সে যুগে বাঁশ, খড় ও বেতে নির্মিত বিখ্যাত বিলাস ভবন। অভিজাত বংশে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কুল মর্যাদা বিশেষভাবে বিবেচিত হত। উমর খাঁ তাঁর বংশের তুলনায় ফিরোজ খাঁয়ের বংশকে হীন বলে গণ্য করতেন বলেই ফিরোজের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেননি। বর্ণিত হয়েছে সাখিনা, 'পায়ে মেন্দী মাইঞ্জা তুলে জলের যে ঘাটে'। প্রাচীনকালে বাঙ্গালী মেয়েরা মেদি নামক একপ্রকার গাছের পাতার লাল রস দিয়ে পায়ে আলতা পরত। সাখিনার দরিয়ার মাধ্যমে ফিরোজের চিত্র পেয়ে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'স্বপনে সোনার ধুন্দুল পাইল রে হাতে।' পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে এরূপ সংস্কার প্রচলিত আছে যে স্বপ্নে সোনার ধুঁধুল দেখলে রাজা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

সংস্কারমুক্ত মানুষ আজও নেই, পূর্বেও ছিল না। সাখিনার যে কপাল পুড়বে তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে ফিরোজের যুদ্ধ যাত্রার পরেই বর্ণিত হয়েছে—

দূরে ত শিরগাল ডাকিল,
গোয়ালে ডাকে গাই।
ঘরের ছাদে ডাকিল কাউয়া।
কইন্যা কিছু শুনে নাই।

অলঙ্কার প্রয়োগে কবি মোটের উপর নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত সাখিনার পরিবর্তিত রূপের বর্ণনাদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

আগুন জ্বইলতাছে কইন্যার

দুই আঙ্খির তারা।
বাঘিনী গর্জাইতাছে যেমুন
হইয়া শাবক হারা।।

ফিরোজ কর্তৃক তালাক দানের দুঃসংবাদে সাখিনার ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়ার বর্ণনাদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

আসমান হইতে খইস্যা তারা
যেমুন জমিনে পড়িল।
সোনার পরতিমা হায়রে,
ধূলায় ভাইঙ্গ্যা পড়িল।।

মৃত কন্যার দেহ নিয়ে ক্রন্দনরত উমর খাঁ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ভাঙ্গা পুত্‌লা কোলে কইরা ছাওয়াল যেমুন কান্দে
সখিনাকে কোলে লইয়া তেমুন উমর খাঁ কান্দে।।

আখ্যানটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে সুতীব্র ট্রাজিক রসে। পাতিব্রত্যের পরিচয় দিয়েও সাখিনা তার জীবিতাবস্থায় উপযুক্ত স্বীকৃতি না পেয়ে কঠিন আঘাত পেয়ে অকাল মৃত্যুর শিকাব হয়েছে। যে বন্দী স্বামীকে উদ্ধার করতে এবং স্বামীর মর্যাদা রক্ষাকল্পে সে পুরুষের ছদ্মবেশে বাদশাহের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, পিতৃরাজ্য ধ্বংস করেছে, সেই স্বামীই ফিরোজ তাকে তালাক দিয়েছেন। কবি অত্যন্ত শিল্পকুশলতাব সঙ্গে সাখিনা বিবির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাকে ক্রন্দনরতা করেন নি, এমনকি স্বামীর আচরণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। মুখ দিয়ে তার কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় নি। মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনের স্পর্শে সে তার নারীত্বের তথা পতিপ্রেমের চরম অবমাননার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। ট্রাজিক রসকে ঘনীভূত করেছে উমর খাঁয়ের বিলাপোক্তি। কুলমর্যাদার অহংকারে যে উমর খাঁ কন্যার অন্তরের অন্দরমহলের সংবাদ নেন নি, তিনিই সাখিনার মৃত্যু বরণের মধ্য দিয়ে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আর্তি করেছেন—

না বুঝিলাম না শুনিলাম
আমি তোমার দিলের আশ।
আপন খেয়ালে করলাম আমি
হায়রে এমন সর্বনাশ।

সতী সাধ্বী স্ত্রীর মৃত্যুর পর ফিরোজের চেতনা ফিরেছে। তখন তিনি বুঝেছেন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তিনি কতখানি অমানবিক আচরণ করেছেন, মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করেছেন। আর সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাকে বলতে হয়েছে—

যার লাইগ্যা ফকির হয়্যা ঘুরলাম বনে বনে
তালাকনামা দিয়া তারে বধিলাম পরাণে।

*  *  *

আর না যাইবাম আমি জঙ্গলবাড়ী সরে।।
দেওয়ানীতে কাজ নাই আমি ফকির হইব।
তোমার গান গাইয়া আমি ভিক্ষা মাইগ্যা খাব।।

## সাখিনা বিবি

পালায় উপস্থাপিত চরিত্রগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সাখিনা বিবির। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী সে। সৌন্দর্যের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে সাখিনা অদ্বিতীয়া হয়ে উঠেছিল। ফকিরের ছদ্মবেশে অসুস্থ উমর খাঁর রোগ নিরাময়ের জন্য তাদের প্রাসাদে গেলে সাখিনা ঠিকই ধরতে পেরেছিল যে ফিরোজ বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছে—

দাওয়াই তাবিজ না জান তুমি না জান উতার।
আমার চৌক্ষে ধুলা দিবা ক্ষেমতা নাই তোমার।।

দরিয়ার কাছে ফিরোজের তসবির দেখেই সাখিনা যে অভিভূত হয়ে পড়েছিল কবি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন এইভাবে—

দেইখ্যাত সুন্দর কইন্যা হইয়া গেল থির।

ক্রমেই তার দুর্বলতা প্রকটিত হয়েছে। গলার হারের বিনিময়ে সাখিনা ফিরোজের তসবির ক্রয় করেছে আর সেই সঙ্গে তার নবীন বয়সে ফকিরী নেওয়ার কারণও জেনে নিয়েছে সবিস্তারে। ফকিরের জন্য তাকে চোখের জল ফেলতে দেখা গেছে। তসবির ওয়ালী রূপিনী দরিয়াকে সে হাজার টাকা মূল্যের গলার হাঁসুলি উপহার দিয়েছে। তারপর শুরু হয়েছে ফকিরের জন্য তার প্রতীক্ষা—

তসবির লইয়া কইন্যা ক্ষেণে বইক্ষে ধরে।
ক্ষেণে দেখে তসবির রাইখ্যা কুলের উপরে।।
গোছল, খানা, পইরন, হাসি সগল ছাড়িল।
পুন্নু মাসীর রাইত যেমুন আন্ধাইরে ঘিরিল।।

তার প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে, পিতা উমর খাঁকে পরাজিত করে ফিরোজ তাকে বিবাহ করেছেন।

এরপরে যখন বাদশাহের সৈন্যের বিরুদ্ধে ফিরোজ যুদ্ধ করার প্রাক্কালে সাখিনার কাছে বিদায় প্রার্থনা করেছেন, কি সংযত ও আভিজাত্য ভাবে সে বিদায় দিয়েছে। যোদ্ধা স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রীর আচরণ করেছে সে। পঞ্চপীরের মাটি তার শিরে তুলে দিয়ে শীঘ্র যুদ্ধ সমাপ্ত করে ফিরে আসার আর্জি জানিয়েছে সে। সে কিন্তু চোখের জলে বিদায় জানায়নি। কবি বলেছেন, 'পাষাণে বান্ধিল মন খসমে বিদায় করি।' সে মনের যন্ত্রণা গোপনে রেখেছে। এরপর যখন শুনেছে ফিরোজ আহত ও বন্দী হয়েছে, তখন তার ভিন্ন মূর্তি দেখা গেছে। ইন্দ্রজিতের সন্ধান লাভের জন্য প্রমীলাকে যেমন বীরাঙ্গনা

রূপে মধুসূদন চিত্রিত করেছেন, তেমনি বীরাঙ্গনা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে সাখিনা। মুসলমান সমাজে যেহেতু পর্দানসীন প্রথা চালু আছে, তাই সে ফিরোজের মামাত ভাইয়ের ছদ্মবেশে রীতিমত ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে গেছে। কবি তার বর্ণনায় বলেছেন—

রক্ত বরণ আঙ্খি দুইডা
কইন্যার শরীল হইল কালা।
আঙ্খির দিষ্টিতে কইন্যার
বন আগুনের জ্বালা।।

* * *

আগুন জ্বইলতাছে কইন্যার
দুই আঙ্খির তারা
বাঘিনী গর্জাইতেছে যেমুন
হইয়া শাবক হারা।।

সে জানে যে ঈশা খাঁর বংশের কুলবধূ সে। তাই সে বলেছে—

দুশমনের হস্তে আমি
ধরা নাই ত দিব।

* * *

সোয়ামীর লাইগ্যা রণে মইরতে
আমি দুঃখু নাই ত করি।

পতিপ্রেমই তাকে বীরাঙ্গনায় পর্যবসিত করেছিল। যুদ্ধে বিজয়ীও হয়েছিল সাখিনা। স্বামীর শত্রুতা করায় সে তার পিতার রাজ্য ধ্বংস করতেও কুণ্ঠিতা হয় নি। কিন্তু সেই স্বামীর কাছ থেকেই যখন সে চরম আঘাত লাভ করল, তখন তা সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না, মৃত্যু বরণ করল সে।

### জননী চরিত্র

সাখিনা বিবির পরই উল্লেখ করতে হয় ফিরোজের জননী চরিত্রটির। অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মহিলা ইনি। তদুপরি এঁর গভীর আভিজাত্যবোধ ও বংশমর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা চরিত্রটিতে এক ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। ফিরোজ যখন তাঁকে জানিয়েছেন যে তিনি উমর খাঁয়ের কন্যার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক, তখন প্রথমে তিনি পুত্রের এই প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন নি। কারণ তিনি জানতেন পাঠান উমর ছোট জাতি বলে ফিরোজের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হবে না। বিবাহের প্রস্তাবকারীকে উমর অপমান করবেনই আর সেক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়ে উঠবে অনিবার্য। যুদ্ধে দিল্লীর ফৌজ উমরের পক্ষাবলম্বন করবে। যুদ্ধে কেল্লা তাজপুর এবং জঙ্গলবাড়ী দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বলেছিলেন—

জঙ্গলবাড়ীর অপমান আমি হইতে নাই সে দিব।

এই বিয়া করাইতে গেলে লড়াই বাজিব।।

অপত্যস্নেহবশতঃ তিনি শেষপর্যন্ত পুত্রের ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীই সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। উমর খাঁ বিবাহের প্রস্তাবই শুধু নাকচ করেন নি, বিবাহের প্রস্তাবকারী উজিরকে চরম অপমান করেছেন। আর এই সত্য জেনে ফিরোজা বিবি নির্দেশ দিয়েছেন পুত্রকে—

উমর খাঁর গর্দান চাই হপ্তাহ ভিতরে।।
তার কইন্যা সখিনারে ধরিয়া আনিয়া।
দশ দিনের মধ্যে তুমি করবা তারে বিয়া।।
তবে ত বুঝবাম্ পুত্র, দেওয়ান ঈশা খাঁর ধারা।
জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানীতে হয় নাই আইজও হারা।।

## দরিয়া

আর একটি স্ত্রী চরিত্রের উল্লেখ প্রয়োজন, সে দরিয়া। সে দেওয়ান পরিবারের একজন সামান্য পরিচারিকা। কিন্তু মনে মনে সে সুদর্শন যুবক ফিরোজ খাঁকে ভালবাসত। তাই তাকে তসবিরওয়ালীর ছদ্মবেশে সাখিনা বিবির কাছে ফিরোজ নিজের চিত্রসহ প্রেরণ করলে দরিয়া সে আদেশ শিরোধার্য করেছে, কিন্তু তাকে অন্তর্দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার প্রেম কোনদিনও সোচ্চার হতে পারল না। কবি অসাধারণ নৈপুণ্যে তার সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন—

পন্থে যাইতে বান্দীর দুই আঙ্খি ঝরে।
কেউ না জানিল তার কি আছে অন্তরে।।
মন পরাণে কবে দরিয়া ফিরোজের কাম।
কিবান্ ছিল অন্তরে বান্দীর কে কইরব সন্ধান।।

সে যে বুদ্ধিমতী তার পরিচয় দিয়েছে সে তসবীরওয়ালীর ভূমিকাটি সার্থকভাবে পালন করে।

## ফিরোজ খাঁ

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রধান ফিরোজ খাঁ। তাঁর মধ্যে বংশ মর্যাদা বোধ প্রবল। ঈশা খাঁর বংশধর, এই মর্যাদাবোধ তাঁকে দান করেছিল বিরল সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা। তিনি তাই দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জেহাদ ঘোষণা করার সাহস দেখিয়েছিলেন—

আর না পাটাইবাম খিরাজ দিল্লীর সওরে।
আর না যাইবাম্ আমি বাদ্‌শার দরবারে।।
একপাল হরি আর মওর তোড়া তোড়া।
বিশ গোটা হাতি আর একশত ঘোড়া।।

হুজুরে হাজির কইরা বান্দার মতন।
দরবারে দাণ্ডাইয়া না থাকবাম্ কন দিন।।
যা করে বাদশার ফৌজ করুক আমারে।

প্রথমে তিনি বিবাহে অসম্মত ছিলেন, কেননা তিনিও ছিলেন তাঁর জননীর মতই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। বাদশাহকে তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব না দিলে যুদ্ধ হয়ে উঠবে অনিবার্য আর যুদ্ধে যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবে সেক্ষেত্রে—

সাদী কইরলে জেনানা যাইব চালান বাদশার ঘরে।
এহি সে কারণে মাও গো, সাদী না করাইবা মোরে।।

কিন্তু নিজের এই দৃঢ়তা শেষ পর্যন্ত ফিরোজ আর রক্ষা করতে পারেন নি। উমর খাঁয়ের কন্যার জন্য তিনি উন্মত্ত হয়েছেন। তার জন্য তিনি ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন, দরিয়াকে তসবিরওয়ালী করে পাঠিয়েছেন সাখিনার কাছে তার মন বোঝার অভিপ্রায়ে। যখন বুঝেছেন সাখিনাও তাঁর প্রতি আসক্ত, তখনই সরকারী ভাবে উমর খাঁয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। উমর খাঁ সেই প্রস্তাব নাকচ করলে তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে উমরকে পরাজিত করে সাখিনা বিবিকে বিবাহ করে তাঁর বাসনাকে বাস্তবায়িত করেছেন। ফিরোজের শৌর্য বীর্যের পরিচয় বাদশাহের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও প্রমাণিত। তবে সাখিনা বিবিকে তালাক দিয়ে তিনি ধর্মীয় সংস্কারকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে মানবিক মূল্যবোধকে অপমানিত করেছেন। যে স্ত্রী তাঁর বন্দীদশা ঘোচাল, শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে শ্বশুরকুলের মর্যাদা রক্ষা করল, তাকেই তিনি ত্যাগ করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে তাঁর অন্তরের ছিল না, তা সাখিনা বিবির মৃত্যুর পর তার মধ্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল বৈরাগ্যের, তা থেকেই প্রমাণিত।

**উমর খাঁ**

উমর খাঁর ছিল কেবল আভিজাত্যবোধ। দু'বারই যুদ্ধে তিনি পর্যুদস্ত হয়েছেন। একবার পর্যুদস্ত হয়েছেন জামাতার কাছে, আর একবার নিজের কন্যার কাছে। সুতরাং তাঁর বীর্যবত্তার পরিচয় মেলে না। তবে কন্যার মৃত্যুতে তাঁর যে আর্তি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তার অপত্যস্নেহ যে অকৃত্রিম ছিল তা প্রমাণিত। সাখিনা বিবির মৃত্যুতে উমর খাঁ উপলব্ধি করেছেন যে অর্থহীন কুলগৌরবে তিনি কন্যার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে অস্বীকার করে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। অকপটে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে—

না বুঝিলাম না শুনিলাম
আমি তোমার দিলের আশ
আপন খেয়ালে করলাম আমি
হায়রে এমন সর্বনাশ।।

## ছুরত জামাল–অধুয়া সুন্দরী পালা

ছুরত জামাল–অধুয়া সুন্দরী পালাটি সংকলিত হয়েছে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতরভাবে ঐ ঐকই পালা সংকলিত হয়েছে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডে। মৌলিক মহাশয়ের অনুমান অনুযায়ী পালায় বর্ণিত 'ঘটনাটি ঘটিয়াছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে, এবং ফৈজু ফকির পালাটি রচনা করিয়াছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে।' পালাটিতে উপকথা ও ইতিহাসের সংমিশ্রণ ঘটেছে।[১৪] পালাটির রচয়িতা এবং গায়ক ছিলেন একই ব্যক্তি–ফৈজু ফকির। বন্দনাংশে কবি বলেছেন, 'ফৈজু ফকিরে কয়, আল্লা আমি দীনহীন।' পালাটির প্রথম খণ্ডের শেষাংশে উল্লিখিত হয়েছে :

ফৈজু ফকিরে কয় 'ভাইরে, আল্লার কেরামৎ।
দুনিয়ার কে জানে কও আল্লার কুদরৎ।।

পালাটির দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ 'অধুয়া সুন্দরী'তেও উল্লিখিত হতে দেখা গেছে ফৈজু ফকিরের নাম–

ফৈজু ফকিরে কহে দোষ তোমার নাই।
পীরিতে পড়িয়াছে কন্যা পীরিত বালাই।।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে :

ফৈজু ফকির কহে না কর ক্রন্দন।
আল্লার নামেতে সবে শান্ত কর মন।।

কাব্যের সমাপ্তিতেও ফৈজু ফকিরের নাম সংযোজিত হতে দেখা গেছে। ভাগ্যের লিখন মুছবার নয়–একথা জানিয়ে বলা হয়েছে–

ফৈজু ফকিরে কহে কান্দিলে হবে কি।
যায় তার নছিবের লেখা লেখছুইন আল্লাজী।।

অন্য পালাগুলির ক্ষেত্রে যেহেতু রচয়িতা ও গায়ককে সচরাচর পৃথক হতে দেখা গেছে, তাই এই পালার মত রচয়িতা কিংবা গায়কের নাম এতবার উল্লিখিত হয়নি। অবশ্য সমগ্র পালাটি একজনেরই রচনা কিনা সে বিষয়ে কেউ কেউ সংশয়প্রকাশ করেছেন–

–'এই পালার সবটাই ফৈজু ফকিরের রচনা কিনা,...সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।' (ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪)। দীনেশচন্দ্র সেন পালাটির প্রেক্ষাপটস্বরূপ উল্লেখ করেছেন,–

'জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের ন্যায় বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরাও পূর্বে হিন্দু ছিলেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে বানিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণরাজা গোবিন্দ খাঁ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া হবিব খাঁ নাম ধারণ করেন।..হবিব খাঁ শুধু বানিয়াচঙ্গের অধিপতি ছিলেন না, পার্শ্ববর্তী লাউড় পরগণাও তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি শ্রীহট্টের ২৪টি পরগণার মালিক

ছিলেন।...লাউড়ের জঙ্গলে এখনও বানিয়াচঙ্গ হাব্‌লি নামক দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানদিগের লাউড়ের উপর আধিপত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।...এই দেওয়ানদিগের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে পালাটি রচিত হইয়াছে।'

বানিয়াচঙ্গে আলাল খাঁ এবং দুলাল খাঁ নামে দুইভাই ছিলেন। বড়জন ছিলেন দেওয়ান। গণক আলালকে জানাল তিনি সুদর্শন এক পুত্রের অধিকারী হবেন কিন্তু সন্তানের জন্মের বিশ বৎসরের মধ্যে যদি পিতা তার মুখদর্শন করেন, তবে তাঁকে অপরিসীম দুঃখ পেতে হবে। রাজ্যবাসী যদি পুত্রকে দেখতে পায়, তবে পুত্রেরই মৃত্যু হবে। এই কথা শুনে নাজির-উজিরের সঙ্গে পরামর্শ করে আলাল খাঁ তেড়ালেংড়ার সাহায্যে হাইলাবনে ফতেমাবিবির জন্য এক প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। সেখানে বিবিকে অন্তরীণ করে রাখা হল। স্থির হল ফতেমা সন্তান প্রসব করা থেকে হাইলাবনে কুড়ি বৎসরকাল অবস্থান করবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় মনের দিক থেকে আলাল আঘাত পেলেন। দেওয়ানির দায়িত্ব দুলালকে দিয়ে তিনি ফকির হয়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

যথাসময়ে ফতেমা জামালকে প্রসব করল। তার সঙ্গী বলতে এক দাসী। এদিকে একদিন শিকারে গিয়ে দুলাল কাঠুরিয়া বালকদের সঙ্গে ছুরত জামালকে দেখতে পেল। অনুমান করল এ ফতেমা বিবিরই সন্তান। মনে পড়ে গেল তার গণকের কথা। সাত বৎসরের মাথায় সাক্ষাৎ ঘটে গেল অভিশপ্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে, না জানি তার বরাতে কি আছে! দুলালকে তার লোকজন পরামর্শ দিল ছুরত জামালকে হত্যা করার জন্য। সেইমত তেড়ালেংড়া নিযুক্ত হল। ঠিক হল সে ফতেমাবিবির ঘর মাটি চাপা দিয়ে দেবে, তাহলেই মাতা পুত্র উভয়েরই মৃত্যু হবে। আলালের আমলের বৃদ্ধ উজিরের এই পরামর্শ মোটেই পছন্দ হল না। সে গোপনে গিয়ে ফতেমাকে এই চক্রান্তের কথা জানিয়ে এল, সেই সঙ্গে পরামর্শ দিল সে যেন পুত্রসহ আলালের বন্ধু দক্ষিণের হিন্দু রাজা দুবরাজের আশ্রয় নেয়. স্বয়ং উজির তার মনিব পত্নী ও মনিব পুত্রকে নিয়ে গিয়ে দুবরাজের কাছে এল। তেড়ালেংড়া ফতেমা বিবির বাড়ী মাটি চাপা দিল দুলালের নির্দেশমত।

উনিশ বছব বয়সে জামাল ফকিরের ছদ্মবেশে প্রথমে হাইলার বনেতে গেল। দেখলে তাদের বাসস্থানের অবস্থা, মাটি চাপা অবস্থায় রয়েছে। হাইলার বনে দিব্বি বসতি জমিয়ে বসেছে তেড়ালেংড়া আর তার আত্মীয়স্বজন। এরপর জামাল গেল বাইন্যাচঙ্গ। গিয়ে দেখলে তার খুল্লতাতের অত্যাচারের রূপ। জামাল অঙ্গীকার করল বিশ্বাসঘাতক খুল্লতাতকে উপযুক্ত শাস্তি দেবে। সে ফৌজে নাম লিখিয়ে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করল। তারপর কুড়ি বৎসর বয়সে লোকলস্কর নিয়ে হাইলার বনে তেড়ালেংড়াকে বন্দী করে বাইন্যাচঙ্গে হাজির হল প্রজারা জামালের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল। দুলাল দেওয়ান ভয়ে পলায়ন করল। পিতার দেওয়ানী লাভ করল জামাল। সে তার মা ফতেমাকে নিজের কাছে নিয়ে এল।

দুবরাজ রাজার কন্যা অধুরা সুন্দরী তাদের আশ্রিত জামালের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ল। জামাল যখন বাইন্যাচঙ্গের দেওয়ান, তখন তাকে সে লিখল প্রেমপত্র। জামাল নদীর ঘাটে অধুয়াকে দেখে গেল। অধুয়ার রূপে সেও মুগ্ধ। সে এরপর উজিরকে দিয়ে দুবরাজের কাছে তার সঙ্গে অধুয়ার বিবাহের প্রস্তাব দিল। দুবরাজ বিবাহে অসম্মতি জানালেন এবং উজিরকে শাস্তি দিলেন নিদারুণভাবে। জামাল সব অবগত হয়ে দুবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল।

দেওয়ানগিরি হারিয়ে দুলাল মক্কায় উপস্থিত হয়ে জামালের সম্পর্কে নানা কথা বানিয়ে অভিযোগ করে তার বিরুদ্ধে আলালকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। আলাল পুত্রকে শাস্তি দিতে দেশে ফিরে এলেন। পথিমধ্যে বন্ধু দুবরাজের কন্যাকে জামাল অপহরণ করবে শুনে আলাল দুবরাজকে পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মদত দিলেন। জামাল পরাজিত ও কারারুদ্ধ হল।

দিল্লীশ্বর আলাল খাঁর কাছে দশ সহস্র সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। দুবরাজের পরামর্শে বন্দী পুত্র জামালকে আলাল দিল্লীতে বাদশাহের হয়ে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে জামাল অধুয়াকে একটি অঙ্গুরীয় এবং একটি পত্র প্রেরণ করল। জামাল যুদ্ধে যাচ্ছে, যদি ফেরে তবে অধুয়াকে বিবাহ করবে। যুদ্ধে জামালের মৃত্যু হল। আলাল খাঁ পুত্রশোকে কাতর হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ উজির তখন তাঁকে সব খুলে বলল। জানাল দুলালের বিশ্বাসঘাতকতার কথা, তেড়ালেংড়ার ভূমিকাব কথা, অধুয়া সুন্দরীর প্রেমপত্র প্রেরণ, দুবরাজের প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য কৌশলে জামালকে যুদ্ধে প্রেরণের জন্য তার পরামর্শদান। আলাল খাঁ তার ভুল বুঝতে পারলেন। আলালের নির্দেশে দক্ষিণবাগের সহরে অগ্নি সংযোগ করা হল, অধুয়াকে ধরে আনা হল। আলাল খাঁ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁর ঘোড়ার সহিসের সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু অধুয়া তার পূর্বেই আত্মঘাতিনী হল। তার কাছ থেকে পাওয়া গেল জামালের অঙ্গুরীয় ও পত্র। কন্যার শোকে দুবরাজ পাগল, পুত্রশোকে পাগল আলাল খাঁ। পুনরায় দুলালকে বাইন্যাচঙ্গের দেওয়ানগিরি দিয়ে আলাল মক্কায় ফিরে গেলেন। দুবরাজও মুসলমান হয়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

দীনেশচন্দ্র সেন পালাটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন :

'মৈমনসিংহের অন্যান্য পালাগানের মত এই রচনায় তেমন কবিত্ব সম্পদ নাই। তবে ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে এই পালাটির কতকটা মূল্য আছে। মুসলমান আমলের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথার সন্ধান আমরা এই পালার ভিতর দিয়া পাইতেছি।'

অর্থাৎ দীনেশচন্দ্র পালাটির কবিত্ব সম্পদের পরিচয় না পেলেও এটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, সমসাময়িক সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রতিফলিত হওয়ার কারণে। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক পালার কয়েকটি অসঙ্গতি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অসূর্যম্পশ্যা হিন্দু পরিবারের মেয়ে ষোড়শী অধুয়ার কুসুমচয়নে

যাবার পথে জামালকে দেখে তার প্রতি তার আসক্ত হওয়া, কিংবা অধুয়াদের স্নানের ঘাটে জামাল খাঁর উপস্থিতি, জালাল খাঁর আক্রোশে যখন সমগ্র দক্ষিণবাগের অগ্নিগর্ভ অবস্থা, 'এরূপ অবস্থায় জামালের পত্র পাইয়া পরমানন্দে চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া পূজাকালে রাজকুমারী অধুয়ার বন্দী হওয়ার বর্ণনা অবাস্তব।'

বাস্তবিক অন্যান্য গীতিকার তুলনায় আলোচ্য গীতিকায় কাব্যসম্পদের অভাব লক্ষিত হয়। তবে আখ্যানের জটিলতা এবং বৈচিত্র্য সেই অভাবকে অনেকাংশে পূরণ করে দিয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্রের উত্থাপিত অভিযোগ কিন্তু একবাক্যে মেনে নেওয়া যায় না। জামালের যখন সাত বৎসর বয়স, তখনই ফতেমাবিবি সহ সে আশ্রয় নিয়েছিল দুবরাজের কাছে। তখন থেকে দীর্ঘ ১১/১২ বৎসরকাল দক্ষিণবাগেই তার অতিবাহিত হয়েছে। অধুয়া সুন্দরীর দাসী স্বপনের ভাষায়, 'আঠার বছর রইলা তুমি দক্ষিণবাগ সওরে'। অতএব পিতার আশ্রিত এই যুবকটিকে অধুয়া অনেকদিন থেকেই দেখে এসেছে। বিশেষত: অধুয়ার সঙ্গে জামালের বয়সের পার্থক্য ছিল সামান্যই। তাই কুসুম চয়নের সময় পথিমধ্যে অধুয়ার সঙ্গে জামালের সাক্ষাতের কথা যদি কবি বলে থাকেন তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। স্নানের ঘাটে জামালের উপস্থিতি বিষয়ে বক্তব্য হল এই উপস্থিতি অধুয়া সুন্দরীর দাসী স্বপন এবং স্বয়ং অধুয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। বর্ণিত হয়েছে জামাল তার ভাওয়াল্যা থেকেই অধুয়াকে দেখেছে, যে ভাওয়াল্যা অবস্থান করছিল নদীর ঘাটে, অপরপক্ষে অধুয়া ও অন্যান্যরা উপস্থিত হয়েছিল জলের ঘাটে। দুই ঘাটের মধ্যেকার ব্যবধান বোঝাতেই কবি পৃথক পৃথকভাবে ঘাট দুটির উল্লেখ করেছেন—

জলের ঘাটেতে অধুয়া দেখে দাঁড়াইয়া।
নদীর ঘাটে আছে বান্ধা রঙ্গের ভাওয়ালিয়া।।

তদুপরি দক্ষিণবাগে অবস্থান কালেও জামাল সরোবরে স্নানরতা মহিলাদের দেখেছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে কাব্যে, এক্ষেত্রে নিছক অপরিচিত বলে নয়, পরিচিত হিসাবেই জামালের উপস্থিতি সম্ভব হয়েছিল বলে স্বীকার করতে হয়—

একদিন গেল জামাল দক্ষিণদিগ্ দেখিতে।।
দক্ষিণদিগে বড়ো দীঘি পানি টলমল করে।
চাইর পাউড়িতে মেওয়ার গাছ কত মেওয়া ধরে।।
শানেতে বান্ধিয়া দিছে ঘাট চারি খান।
ঘাটে ঘাটে উড়িতেছে সোনার নিশান।।
কত কইন্যা সিনান করে আউলা মাথার কেশ।
জামালরে দেইখ্যা কয়, 'ছাইল্যাডা বেশ বেশ।।'

অধুয়ার চণ্ডীপূজা প্রসঙ্গে বক্তব্য হল যে ক্ষিতীশচন্দ্র ধরে নিয়েছেন একদিকে যখন দক্ষিণবাগের অগ্নি প্রজ্বলিত অবস্থা, তখন সব জেনেশুনে যেন অধুয়া চণ্ডীর পূজায় ব্যস্ত ছিল। কাব্যের বর্ণনায় কিন্তু দেখা যায়—আলাল খাঁ দক্ষিণবাগকে অগ্নিতে ভস্মীভূত

করার কিংবা দুবরাজকে বন্দী করার আদেশ একই সঙ্গে দিয়েছেন। অতএব সেক্ষেত্রে সহরে অগ্নি সংযোগ করার পূর্বেই প্রেমিকের পত্রলাভ করে—অধুয়া যদি চণ্ডী পূজায় রত থাকে তাতে আশ্চর্যের কিছুই থাকে না। দক্ষিণবাগের উপর আক্রমণ সহসাই হয়েছিল এবং অধুয়া ও তার পিতা দুবরাজ একই সঙ্গে বন্দী হয়েছিলেন বলে বলা হয়েছে—'অধুয়ারে বান্ধিয়া লয় বাপের সহিতে।'

আখ্যানে একটি অসঙ্গতি অবশ্য চোখে পড়ার মত। জামাল পিতার দেওয়ানী হস্তগত করে বৃদ্ধ উজিরের বাড়ী সংবাদ প্রেরণ করে। কিন্তু বর্ণিত হয়েছে—

অতি বিদ্ধ উজির সেই না মইরা ত গেছে।

আর তাই 'নয়া উজির'কে দিয়ে জামাল দুবরাজের কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেছিল। কিন্তু জামালের মৃত্যুর পর যখন আলাল শোকাভিভূত হয়েছেন, তখন জামালের মৃত্যুর পশ্চাতে যে চক্রান্ত কার্যকরী হয়েছে, বিশ্বাসঘাতক দুলাল খাঁর ভূমিকা, দুবরাজের ভূমিকা সব ব্যাখ্যাত হয়েছে বৃদ্ধ উজিরের দ্বারাই—

হেনকালে বৃদ্ধ উজির আসিয়া কহিল।
তোমার দোষেতে তুমি সকল খুয়াইলে।।

ফৈজু ফকির উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন, তাই মানুষের পরিণতি সম্পর্কে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন, কবি বলেছেন :

হিন্দু ভাই মইরা গেলে নিব গাঙ্গের ভাটি।
মোছলমান মইরা গেলে পাড়িয়া দিব মাটি।।

অন্যত্রও কবির স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে :

হিন্দু মোছলমান দেখ আছে দুনিয়ায়।
এক আল্লার সর্‌জন জানাইও সভায়।।

অলংকার প্রয়োগে ক্ষেত্র বিশেষে কবি বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তেড়ালেংড়ার পায়ের গোদের তুলনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

দুই পায়ে গোদ তার যেমুন কলা গাছের গুড়ি।।

কিংবা, দুবরাজ যখন জামালের তরফে তার সঙ্গে অধুয়ার বিবাহের প্রস্তাব শুনলেন তখন তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন, কিরকম?

জ্বলন্ত আগুনি যেন উঠিল ফুল্‌কিয়া।।

দুবরাজ কর্তৃক অপমানিত উজিরের কাছে সব অবগত হয়ে জামাল ক্ষুব্ধ হয়েছে। কি রকম?

বাতাস পাইয়া যেমন আগুন জ্বলিল।

অলংকারে আগুনের ব্যবহার একাধিক ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়—

ক. সর্বাঙ্গে আগুন যেন জ্বলিয়া উঠিল।
খ. পুত্র শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।
গ. শুকনা ডালেতে যেমন আগুন ধরিল।

জামালের মৃত্যুর কথা শুনে আলাল খাঁ বিপর্যস্ত হয়েছেন, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের বন্যায় যেমন কলাগাছের অবস্থা হয় সেইরকম—

কাত্যানির বানে যেমন কলাগাছ পড়ে।
বিছাইয়া পড়িল দেওয়ান জমিনের উপরে।।

কবি মাঝে মাঝেই ব্যক্তিগত মন্তব্য যুক্ত করেছেন। এই সব মন্তব্যে সংসারের অনিত্যতা, সংসারের একমাত্র অবলম্বন ঈশ্বর, অভিব্যক্ত হয়েছে।

সমসাময়িক সমাজজীবনের কিছু চিত্র প্রকাশিত হওয়ায় পালাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। যেমন সমাজে গণকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, অন্ততঃপক্ষে অভিজাত সমাজে। শ্রমিক শ্রেণীর নেশার দ্রব্য ছিল গাঁজা। ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা নানাভাবেই অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালাত। শাস্তিদানের নানা প্রক্রিয়া ছিল। শিংমাছপূর্ণ চৌবাচ্চায় দাঁড় করিয়ে রাখা হত, পোড়া লঙ্কার পাত্র দাড়িতে বেঁধে উৎকট শাস্তি দেওয়া হত। অভিযুক্তের নাক কান কাটা ছিল সাধারণ ব্যাপার। অভিজাত বংশীয় মহিলারা দোলায় চড়ে যাতায়াত করত। মেয়েরা 'গঙ্গাজলী শাড়ী' পরিধান করত, 'লোটন' খোঁপা বাঁধত। সংস্কার দৃঢ়মূল হয়েছিল মানুষের জীবনে। জামালের যুদ্ধ যাত্রার সময় যাত্রাকালে হাঁচি, চোখের উপর মাছি পড়েছিল, ঘোড়া হোঁচট খেয়েছিল, কাঠুরিয়াদের কাঠ নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল, দেখা গিয়েছিল মৃতদেহ। বেচারী জামালকে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এইবার চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গ।

### আলাল খাঁ দুলাল খাঁ

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলাল খাঁ এবং দুলাল খাঁ। আলাল খাঁ যেমন ভাল, তার ভাই দুলাল খাঁ তেমনই মন্দ। আলাল গণকের কথামত সন্তান সম্ভবা ফতেমাবিবিকে হাইলাবনে নির্বাসিত করেছিলেন। পরে সেই দুঃখে ভাই দুলালকে দেওয়ানগিরি দিয়ে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন ফকিরী নিয়ে। তিনি বিষয়াসক্ত ছিলেন না। তাই বলে অন্যায় সহ্য করার মানুষও ছিলেন না তিনি। যখন দুলাল আলালকে লাগিয়েছিল যে জামাল তাকে বিতাড়িত করেছে, শুধু তাই নয় স্ত্রীলোকদের উপরও সে অত্যাচার করে, তখন পুত্রকে শাস্তি দিতে আলাল খাঁ মক্কা ছেড়ে দেশে ফিরেছেন। দুবরাজের কন্যাকে তার পুত্র অপহরণ করতে আসছে শুনে তিনি দুবরাজের সঙ্গে যোগ দিয়ে পুত্রকে পর্যুদস্ত করেছেন। তাকে কারারুদ্ধ করেছেন। তাই বলে তিনি অপত্য স্নেহহীন ছিলেন না। যুদ্ধে পুত্রের মৃত্যুর সংবাদে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তারপর যখন জেনেছেন দুবরাজের চালাকি, তখন রাজ্য জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তার কন্যা অধুয়াকে বন্দী করে আনিয়েছেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সহিসের সঙ্গে অধুয়ার বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। পুনরায় ভাইকে দেওয়ানগিরি ন্যস্ত করে মক্কায় ফিরে গিয়েছেন তিনি। কিছুটা কানপাতলা স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি।

দুলাল খাঁ ছিল আলালের বিপরীত মেরুর। তার আমলে প্রজারা নিদারুণ দুঃখভোগ করেছে। এমনকি নারীদের ওপর অত্যাচার করতেও তার বাধত না। সে ছিল বাইন্যাচঙ্গের প্রজাদের শত্রু। যখনি সন্দেহ করেছে বনমধ্যে দৃষ্ট সুন্দর বালকটি ফতেমাবিবির সন্তান, তেড়ালেংড়ার সাহায্যে ফতেমাবিবি সহ জামালকে মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। দেওয়ানগিরি অক্ষুণ্ণ রাখতে তার কতই না প্রয়াস। অথচ অত্যন্ত ভীরুস্বভাবের মানুষ ছিল সে। তাই আক্রমণকারী জামালকে প্রতিরোধ করার পরিবর্তে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অত্যন্ত মিথ্যাচারী ছিল দুলাল। নিজের দোষ গোপন রেখে সে আলালকে দিয়ে জামালের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল।

### জামাল

জামাল আলালের সন্তান। বেচারী কোন অপরাধ না করেও আজন্ম শুধু অবিচারের শিকার হয়েছে। গণক বলেছে তার বিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাকে যদি আলাল দেখে, আলালের পক্ষে শুভ হবে না। তাই মাতার সঙ্গে তাকেও বনবাসী হতে হয়েছে জন্ম থেকেই। জন্ম থেকে পিতৃদর্শন সুখলাভে বঞ্চিত সে। এর মধ্যে খুল্লতাত তাকে ও ফতেমাকে হত্যা করার চক্রান্ত করলে বৃদ্ধ উজিরের পরামর্শে সে দুবরাজের আশ্রিত হয়েছে। উনিশ বৎসর বয়সে সে ছদ্মবেশে পিতৃরাজ্য ঘুরে এসে খুল্লতাতের অত্যাচারের পরিচয় পেয়ে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আক্রমণ করেছে। মনে রাখতে হবে প্রজাদের দুঃখই তাকে বিচলিত করেছিল বেশি। রাজ্য সুখ ভোগের আকর্ষণ ছিল গৌণ। বিশ্বাসঘাতক খুল্লতাতকে বিতাড়িত করেছে সে। দুবরাজের কন্যা অধুয়া সুন্দরী তাকে প্রেমপত্র প্রেরণ করেছিল। কিন্তু রটনা হল যে সে মুসলমান হয়ে হিন্দু রমণী অপহরণের পরিকল্পনা করেছে। চক্রান্তকারীদের জন্য বেচারীকে পিতার বিষ নজরে পড়ে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে। দিল্লীতে যুদ্ধে গিয়ে অকালমৃত্যুর শিকার হয়েছে সে। নির্ভীক, মাতৃবৎসল, কর্তব্যপরায়ণ ও বুদ্ধিমান জামাল আলোচ্য পালাটির এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

### দুবরাজ

দুবরাজ হিন্দু হয়েও অসহায় ফতেমা ও জামালকে আশ্রয় দিয়ে যেমন উদারতা দেখিয়েছেন, তেমনি দুবরাজ তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে চাওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তারই প্ররোচনায় আলাল জামালকে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন। বেচারী দুবরাজ একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়ে মক্কাবাসী হয়েছেন।

পালার নায়িকা অধুয়াসুন্দরী। প্রেম জাতপাত মানে না। মুসলমান জামালের প্রতি সে আসক্ত হয়েছিল। আত্মঘাতিনী হয়ে সে আলালের তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধগ্রহণ স্পৃহাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

## নেজাম ডাকাইতের পালা
## বা
## পীরের কেরামতি

নেজাম ডাকাইতের পালাটি সংকলিত হয়েছে পূর্ববঙ্গ গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে। এই একই পালা ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। পালাটির শুরুতেই সংযোজিত হয়েছে 'বন্দনা'। বন্দনাটি বেশ দীর্ঘ। তাছাড়া বন্দনাটিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্ম সম্প্রদায়ের সম্পর্কেই সম্ভ্রমসূচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত। পালাটির রচয়িতার কোনো নাম জানা যায়নি, তবে বোঝা যায় এটি কোন মুসলমান কবির রচনা। কিন্তু তথাপি তিনি শুধু বলেন নি—

পচ্চিমেতে যাব আমি মক্কা এন স্তান।
উর্‌দিশেতে মানি আমি মোমিন মোসলমান।।

সেই সঙ্গে বলেছেন—

পুবদিগে মানি আমি পুবের যাত্রা ভানু।
বিন্দাবন মানম আমি রাধার শোভা কানু।।
দকিনেতে মানি আমি ক্ষীরনদী সাইগর।

দীনেশচন্দ্র সেন পালাটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—

'মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন ও অতিমানুষিক ঘটনার সমাবেশ এই সমস্ত গানের বিশেষত্ব।'

বস্তুতপক্ষে আলোচ্য পালাটিতে এত বেশি অলৌকিক ঘটনারাজি এবং অতিলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে যে গীতিকাগুলিতে সচরাচর তেমন লক্ষিত হয় না। 'ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনও উপাখ্যান পালাগানের বর্ণনীয় বিষয় হইলে তাহাতে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের আতিশয্য দৃষ্ট হয়।'[১৫]

সেখ ফরিদ নামীয় ফকির নেজাম ডাকাতকে তার চাহিদামত কখনও একশ, কখনও দুইশত আবার কখনও পাঁচশত টাকা দিয়েছে, তথাপি নেজাম ডাকাত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে সেখ ফরিদের টাকার ঝোলা পূর্ণ হয়েই রয়েছে। এমনকি ফরিদ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে টাকার পাহাড় পর্যন্ত তৈরী করেছেন। ফরিদের অনুগামী নেজামকে পরীক্ষা করার জন্য পাহাড়ের পাথরকে সোনায় রূপান্তরিত করেছেন। লোভের বশবর্তী হয়ে নেজাম কতক সোনা তার ঝোলায় সংগ্রহ করে নিয়েছে।

সেখ ফরিজ কয়,—নেজাম, কি দেখি ঝোলাত্।
খুইলা দেখাও ঝোলা আমার সাক্ষাৎ।।
কথা শুনি নেজাম ডাকাইত ঝোলা ত খুলিল।
পাহাড়ের পাথ্থর সগ্‌গল ঝোলাতে দেখিল।।

শুধু তাই নয়, সেখ ফরিদ নেজামকে যে লৌহদণ্ড দিয়েছেন, ছয়বৎসর অন্তে তা বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে অপরূপ এক লতা নির্গত হয়েছে। অলৌকিকত্বের বাড়াবাড়ির ফলে পালাটির বাস্তব রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য গীতিকাগুলি মূলতঃ যেখানে

প্রেম বিষয়ক, আলোচ্য পালাটি সেখানে দুষ্কৃতকারী নেজামের সৎসঙ্গে পরিবর্তিত হবার কাহিনী। স্বভাবত:ই তাই কাহিনীর আকর্ষণ অন্যান্য গীতিকাগুলির মত নয়।

অন্যান্য গীতিকাগুলিতে যেমন শালীনতাবোধ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত, আলোচ্য গীতিকায় সে তুলনায় তবু কিছুটা স্থূলতা প্রকাশ পেয়েছে স্বীকার করতে হয়। আর এই স্থূলতা প্রকাশ পেয়েছে জঙ্গলের রাজার কন্যার রূপযৌবন বর্ণনা প্রসঙ্গে। লালবাই-এর বক্ষসৌন্দর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—সিনায় কদলী পুষ্প যেন কল্পতরু।। আরও বর্ণিত হয়েছে—

বারোবছর পার হইয়া মাইয়ার তের বছর পুরে।
আঞ্চুলি আটিয়া ধরে কাল যইবনের ভরে।।

পালাটিতে বিকৃত যৌনাসক্তি প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। লম্পট জব্বর লালবাইকে তার জীবিতাবস্থায় কুক্ষিগত করতে পারেনি। তাই তারই কারণে তার অকালমৃত্যুর পর তাকে কবর দেওয়া হলে সে এক বন্ধুর সাহায্যে লালবাইয়ের মৃতদেহ তুলিয়েছে, উদ্দেশ্য মৃতদেহ অবলম্বনে তার কামাসক্তি চরিতার্থ করা—

মনে মনে আশা করে আসকদার তুষিব।
মরা মাইয়া লই মনের আরজ মিটাইব।

অবশ্য শেষপর্যন্ত জব্বরের অভিপ্রায় চরিতার্থতালাভ করেনি। কেননা তৎপূর্বেই নেজামের হাতে তার মৃত্যু ঘটেছে।

অলংকার প্রয়োগে কবি কিছু অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রযুক্ত অলংকারগুলি নেজাম ডাকাতের বিবরণ সম্পর্কিত—

ক. জোবা ফুলর মতন চৌউখ সদাই থাকে লাল।
খ. খাজুইর‍্যা মাথার চুল দাড়ি মুচ লাম্বা।
গ. হাত পাও যেমুন তার জারৈল গাছের থাম্বা।
ঘ. বাঘের মতন থাবা তার সিঙ্গের মতন গলা।
ঙ. মৈঘের মতন দিষ্টি বেটার হাত্তির মতন চলা।।
চ. ফকিরের কথা শুনি নেজাম কাঁইপ্যা উডিল।
দিগাড জঙ্গলে যেন ভুইচাল লাগিল।।

জঙ্গলরাজ্যের কন্যার সৌন্দর্য ও রূপবর্ণনায় অবশ্য কবি মোটামুটিভাবে গতানুগতিকতার দ্বারাই চালিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল কন্যার সুমধুর কণ্ঠস্বরের তুলনা দিতে গিয়ে মুসলমান কবি কানুর হাতের বাঁশির প্রসঙ্গ এনেছেন—

বচন কোকিলাব বোল কানুর হাতের বাঁশি।।

**নেজাম ডাকাত**

আলোচ্য পালাটির মুখ্য আকর্ষণ নেজাম ডাকাতের চরিত্র। নেজামের জীবিকা ডাকাতি। অর্থের জন্য মানুষের জীবন হরণ করতেও তার বাধে না। কিন্তু অপহৃত

সম্পদ সে মৃত্তিকার মধ্যে গর্তে প্রোথিত করে রাখে। হাটে বাজারে সে যায় না। ভাল খাওয়া দাওয়া তার জোটে না। পরণে তার ছিন্নবস্ত্র। সুতরাং অর্থোপার্জন তার অর্থহীন। নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছে সে। সেখ ফরিদ ধ্যানে নেজামের বিষয় অবহিত হয়ে তাকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে প্রভূত টাকা পয়সায় পূর্ণ একটি ঝুলি নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হন। বৃদ্ধ বলে সেখ ফরিদকে কোন দয়ামায়া কিন্তু নেজাম দেখাল না। সে খোলা তলোয়ার নিয়ে উপস্থিত হল এবং স্পষ্টাস্পষ্ট জানাল তাকে টাকা না দিলে সে তাঁর গর্দান নেবে। প্রথমে একশত টাকা, তারপরে দুইশত টাকা এবং তারপরে নেজাম দাবী করে বসল পাঁচশত টাকা। তার দাবী প্রতিবারেই সেখ ফরিদ মেটালেন। কিন্তু নেজাম যখন লক্ষ্য করল বৃদ্ধের টাকার থলি টাকা দেওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ থাকে, তখন সে ভাবল বৃদ্ধ কোনো দরবেশ বা ফকির হবেন। অতএব তার কাছে বহু গুপ্ত ধন আছে। নেজাম ঠিক করল বৃদ্ধকে পরীক্ষা করবে। কিন্তু সেখ ফরিদ যখন টাকার পাহাড় নির্মাণ করলেন এবং তাকে ডাকাতি ব্যবসা ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন, জানালেন অসৎ পথে থাকার জন্য তার জন্য কি পরিণতি অপেক্ষা করে আছে, তখন সন্ত্রস্ত হল নেজাম। সে উপলব্ধি করল টাকা পয়সায় প্রকৃত সুখ নেই। সে সেখ ফরিদের শরণ নিলে। কিন্তু তথাপি সে সম্পূর্ণভাবে তার লোভকে সংবরণ করতে পারেনি। তাই ফরিদের সৃষ্ট সোনা সংগ্রহ করলে ফরিদ সেই সোনাকে পাথরে রূপান্তরিত করে তাকে পুনরায় শিক্ষা দিলেন তার অর্থহীন লোভ বিষয়ে। নেজাম সেখ ফরিদের সম্মুখেই মৃত্যুবরণ করতে প্রয়াসী হল। শুধু মুখেই বলা নয়, সে পাথরের উপরে বুক ঠুকতে লাগল। সে অকপটে স্বীকার করল—

কুসঙ্গে মইজা আমি পাই কত তাপ।
আখেরে ফকিরী দেও তুমি আমার বাপ।।

ফরিদ নেজামকে দিয়ে গেলেন একটি লোহার লাঠি। আর বলে গেলেন বারো বৎসর পরে লাঠিটির মাথা বিদীর্ণ হয়ে একটি অপরূপ লতা বের হবে। যেদিন লতা বের হবে সেইদিনই তাঁর সঙ্গে পুনরায় তার সাক্ষাৎ ঘটবে।

নেজাম বনের মধ্যে রয়ে গেল। সে এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ। দিনরাত ইষ্টনাম জপ করে। এদিকে এক ঘটনা ঘটল। জব্বর নামে এক বিকৃত রুচির লম্পট মৃত এক রমণীকে কবর থেকে বের করে যখন তার কামাসক্তিকে চরিতার্থ করতে উদ্যত, তখন নেজাম আর স্থির থাকতে পারেনি। সে তার সাধনা বন্ধ করে জব্বর ও তার সহযোগীকে হত্যা করেছে।

সেখ ফরিদ সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন নেজামের কাছে। নেজাম ভেবেছিল সে পুনরায় নরহত্যা করে পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে, কিন্তু ফরিদ তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন। সেখ ফরিদ এরপর নেজামকে এক হালুইকরের স্ত্রীর কাছে রেখে গেছেন। এখানে সে হালুয়ানীর বাড়ীর গরু চরিয়েছে, বিনিময়ে দু'বেলা খাবার পেয়েছে। রাত্রে সে ইষ্ট জপেছে। সর্বদাই তাকে দেখা গেছে অন্যমনস্ক। তাকে মারলেও তার

কোন হুঁশ ছিল না। সে হালুয়ানীকে ধর্মমায়ের সম্মান দিয়েছে। হালুয়ানী ও তার পুত্রের সহায়তায় নেজাম আশ্রয় পেয়েছে হজরত বড়ো পীর শাহসায়েবের। তিনি তাকে আউলিয়া করে দিয়েছেন।

দস্যু রত্নাকরের ভাব রত্নাকর বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে নেজাম ডাকাতের নেজাম আউলিয়া হওয়ার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে পালায় সেখ ফরিদ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নেজামের নির্মমতার তেমন কোনো পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নি, আমরা মূলতঃ তাকে রূপান্তরিত অবস্থায় পেয়েছি, সেই সঙ্গে কোন ঘটনা তার মধ্যে ভাবান্তর ঘটিয়েছিল তাও জেনেছি।

## কাঞ্চনমালা

দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য দিয়েই কাঞ্চনমালার প্রসঙ্গ শুরু করা যেতে পারে। 'কাঞ্চনমালার পালাটা রূপকথা।...রূপকথা সাহিত্যে মালঞ্চমালা কাহিনী কবিত্বে, পবিত্রতার মাহাত্ম্যে ঘটনা সন্নিবেশ নৈপুণ্যে এবং আধ্যাত্মিকতায় এক অপূর্ব সামগ্রী, কাঞ্চনমালা গল্পটিও সেই সকল গুণে ঐশ্বর্যশালী এবং তাহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য।'[১৬]

কাঞ্চনমালা পরীর রাজসভায় নৃত্যকালে সরা ভাঙ্গে, তার তাল ভঙ্গ হয়। পরীর রাজা তাকে অভিশাপ দিল কাঞ্চনমালা মানুষের গৃহে জন্ম নেবে। হলও তাই। কাঞ্চনমালা জন্মগ্রহণ করল ভরাইনগরে সাধু সদাগরের কন্যারূপে। সদাগরের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। এক সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খেয়ে সদাগর পত্নী হল গর্ভবতী। সন্ন্যাসী বলে গেলেন :

> নবম বছরে কন্যা দিবে গৌরীদান।।
> নয় বছর পরে যদি দণ্ডেক ভারাও।
> সাগরে ডুবিবে তোমার চৌদ্দখানা নাও।।
> পুরীতে লাগিবে তোমার বেহুতি আগুনি।
> ক্রুদ্ধ হইয়া ধনস্থলে বসিবেন শনি।।

কাঞ্চনমালা দেখতে দেখতে নয় বছরে পদার্পণ করল। সদাগর শত চেষ্টা করেও তাকে পাত্রস্থ করতে পারল না। নয় বছর পূর্ণ হতে তখন মাত্র অর্ধদণ্ড বাকি, সাধু প্রতিজ্ঞা করল—

> এর মধ্যে যার মুখ দেখিবাম কাছে।
> তার কাছে দিবাম কন্যা কপালে যা আছে।।

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ছয়মাসের এক অন্ধ শিশুকে নিয়ে সদাগরের সম্মুখে উপস্থিত হল। সে সদাগরকে বললে—

> ঠাকুর কহে সাধু তুমি এরে দেও ঠাঁই।
> এরে রাখ্যা আমি তবে গয়া কাশী যাই।।

ইহকাল গেল মোর ভিক্ষা যে করিয়া।
পরকালের কাম করি গয়া কাশী গিয়া।।
দুঃখের উপরে দুঃখ অন্ধ পুত্র মোর।
তোমার কাছে সইপ্যা কাটি সংসারের ডোর।।

অগত্যা এই অন্ধ শিশুর সঙ্গেই কাঞ্চনমালার বিবাহ হল। তার পূর্বে সদাগর কন্যাকে জানাল তার জন্ম ইতিহাস, সন্ন্যাসীর সতর্ক বাণী। পিতা হয়ে কন্যাকে নির্মমভাবে দায়িত্ব ভার দিয়ে সদাগর বললে—

আজি হৈতে এই পুত্র লালন কর তুমি।
কপালে আছিল তোমার অন্ধ ছাওয়াল স্বামী।।

অন্ধ শিশু স্বামীকে নিয়ে কাঞ্চনমালা গৃহত্যাগিনী হল। পথিমধ্যে তাকে কম ক্লেশ স্বীকার করতে হল না—

'চৈত্রমাসের বালু যেন খুলায় ভাজিয়া।
সেই পথে বালু যেন রাখিছে ঢালিয়া।।
সেই পথের উপর দিয়া কন্যা হাঁটিয়া যে যায়।।
আগুনের তাপে তার ঘা হইল পায়।।

বনমধ্যে কাঞ্চনমালা বৃক্ষের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল—

তুমি না বনের রাজা তুমি বাপ মাও।
ছাওয়ালেরে বাঁচাও প্রাণে মোর মাথা খাও।।
ইহা বইলা গাছের মধ্যে তিন টুকী মাইল।
সত্যযুগের সত্যগাছ দুই চির হইল।।

দাড়াক বৃক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কাঞ্চনমালাকে একটি ফল দিয়ে বললেন—

এই ফল লইয়া তুমি ছাওয়ালে খাওয়াও।
চক্ষুদান পাইবে ছাওয়াল কহিলাম তোমায়।।

সত্য সত্যই সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খাইয়ে শিশুকে চক্ষুষ্মান করে তোলা গেল। এরপর কাঞ্চনমালা ঘুরতে ঘুরতে এক কাঠুরিয়ার গৃহে আশ্রয় পেল। এখানেই তার ছয় বৎসর অতিবাহিত হল। এক রাজা বনে শিকার করতে এসে কুমারকে দেখলেন, তার কপালে রাজটীকা দেখে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সে সময় কাঞ্চনমালা গৃহে ছিল না, সে গিয়েছিল কাষ্ঠাহরণে। গৃহে ফিরে কুমারকে না দেখে সে আকুল হয়ে পড়ল। কাঞ্চনমালা স্বামীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। দীর্ঘ ছয় বৎসর পর্যটনের পর সে এসে পৌঁছাল সুমাই নগরের রাজা বিদ্যাধরের রাজ্যে। রাজকন্যা কুঞ্জমালার একজন দাসীর প্রয়োজন। কুঞ্জমালার স্বামীই কাঞ্চনমালার অভিলষিত কুমার। কাঞ্চনমালার স্বামী কাঞ্চনমালার প্রকৃত পরিচয় জানত না। তথাপি কুঞ্জমালার কাছে তার বনবাস জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সে জানিয়েছিল—

এক কন্যা কাঠুরিয়ার ছিল সে সুন্দরী।
তার রূপের কথা কইতে নাই পারি।।
কিছু কিছু মনে পরে সেই কন্যার কথা।
তাহার হারাইয়া মনে পাইয়াছি বড় ব্যথা।।
সাই সাথিনী আমার সেই কন্যা ছিল।
* * *
আমারে লালিয়া পালিয়া সেই বড় করিয়া তুলে।।

কুঞ্জমালা কুমারকে দিয়ে কাঞ্চনমালার ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিল। ফলে কাঞ্চনমালাকে দাসীরূপে পেয়ে কুঞ্জমালা তাকে ঠিকই চিনে নিল। কুঞ্জমালার প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল—

দুরন্ত ভাবনায় মন উঠা পড়া করে।
খাল কাটিয়া কেন্ন আনিলাম কুম্ভীরে।।

কাঞ্চনমালাকে কাছে পেয়ে রাজপুত্র কুঞ্জমালাকে অবহেলা করতে শুরু করে দিল। সব সময়েই তার কাঞ্চনমালাকে চাই। কুঞ্জমালা বুঝতে পারল তার কপাল পুড়েছে—

সতীন আইল ঘরে হইল সর্বনাশ।
সাপের সঙ্গতি যেন হইল গিরবাস।।
যে নারীর সতীন ঘরে তার নাই সুখ।
বিধাতা লেইখ্যাছে তারে জন্মভরা দুখ।।
পালঙ্কে শুইলে যেন কাটা ফুটে গায়।
হাজার সুখে থাকলে তবু সুখ নাহি পায়।।
ঘরেতে আগুন লাগলে পুইরা করে ছাই।
সতীন থাকিলে ঘরে জন্মে সুখ নাই।

কুঞ্জমালা মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করল। কাঞ্চনমালাকে বনবাসে পাঠাতে হবে। সুযোগও মিলে গেল। একের পর এক অঘটন ঘটে গেল। রাজার মৃত্যু হল, পাটহাতীও মারা গেল। রাজ্যে দেখা দিল অমঙ্গল। কুঞ্জমালার প্ররোচনায় রাজকুমার বিশ্বাস করল যে কাঞ্চনমালা ডাকিনী। নিরুপায় হয়ে কুমার কাঞ্চনমালাকে বনবাসে দিল।

বনবাসে কেঁদে কেটে কাঞ্চনমালার দিন যায়। এইভাবে ছয়মাস অতিবাহিত হল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সন্ন্যাসীর কথা। দড়াক গাছের নীচে গিয়ে—

একটুকি দুই টুকি তিন টুকি মাইল।
বিরিক্ষ হইতে সন্ন্যাসী বাহির হইল।।

সন্ন্যাসী কাঞ্চনমালাকে বৃক্ষমধ্যে আশ্রয় দিলেন। মাত্র নয়দিনের মধ্যেই সন্ন্যাসী বনমধ্যে গড়ে তুললেন সমৃদ্ধ নগরী। ঘোষণা করলেন তিনি—

নয়া নগরে কন্যা সুবর্ণ পরতিমা।
যোগ্য দিনে এই কন্যা হবে স্বয়ম্বরা।।

কেবল শর্ত হল কন্যা অর্ধেক গান গাইবে, যে বাকি অর্ধাংশ পূরণ করতে পারবে,

কন্যা তারই পাণিগ্রহণ করবে। সাতরাজ্যের রাজপুত্রেরা ফিরে গেল। শেষে—

অন্ধ এক ভিক্ষুক আইয়া দাঁড়াইল দ্বারে।
লড়িত ভর দিয়া যায় চলিতে না পারে।।

এই অন্ধ ভিক্ষুকই কাঞ্চনমালার গানের অর্ধাংশ পূরণ করল। দুজনেই তখন দুজনকে চিনতে পারল। কাঞ্চনমালা অন্ধ স্বামীর পদসেবা করতে লাগল। কাঞ্চনমালা সন্ন্যাসীর কাছে কেঁদে পড়ল। সন্ন্যাসী জানালেন কাঞ্চনমালা যদি চিরকালের মত তার স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারে, তবেই তার স্বামী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কাঞ্চন ফিরে যেতে রাজি হল-

স্বামীর সুখের লাইগ্যা আমি যাইবাম ছাড়িয়া।
সোয়ামীকে কর সুখী নয়ন দান দিয়া।

সন্ন্যাসীর পরামর্শে কাঞ্চনমালা মায়াকাঠি নিয়ে পিতৃরাজ্যে ফিরে গেল। সন্ন্যাসী জানালেন তার বিমাতা রাক্ষসী। মায়াকাঠির ভয়ে কাঞ্চনমালার বিমাতা পালাবে আর তার বাবাও মুক্তি পাবে। কাঞ্চনমালা সন্ন্যাসীর নির্দেশমত কার্য করল। সবই মিটল, কিন্তু গোল দেখা দিল কাঞ্চনমালার সতীত্ব নিয়ে, কেননা সে দীর্ঘদিন দেশত্যাগিনী ছিল, অতএব তাকে চরিত্র পরীক্ষা দিতে হবে। স্থির হল একটি মাকড়সার সূতা ধরে কাঞ্চনমালাকে শূন্যে ঝুলতে হবে। সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কাঞ্চনমালার পরিণতি হল অভাবনীয়—

সাতরাজ্যের রাজার কাছে মেলানি মাগিয়া।
ধীরে ধীরে উঠে কন্যা মাকড়সা ধরিয়া।।
কাঞ্চনমালা কন্যায় কেও না দেখিল আর।
বাতি নিবাইলে যেমন ঘর অন্ধকার।।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'তে সংকলিত মালঞ্চমালার কাহিনীর সঙ্গে কাঞ্চনমালার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। তবে দীনেশচন্দ্রের সংকলনে আলোচ্য পালাটি গীতিকার আকারে উপস্থাপিত গদ্য পদ্যময় রচনা। রূপকথার একাধিক অভিপ্রায় পালাটিতে বিদ্যমান। বৃক্ষের বিদীর্ণ হওয়া ও আশ্রয়দান, সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফলভক্ষণে বন্ধ্যা রমণীর গর্ভবতী হওয়া ইত্যাদি তারই প্রমাণ। কাঞ্চনমালার পরিণতি রামায়ণের সীতার অনুরূপ—একজন চরিত্র পরীক্ষা দিয়ে পাতালে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন, অপরজন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল কেউ বুঝতে পারল না। তবে তুলনামূলকভাবে বোধকরি কাঞ্চনমালার দুঃখভোগ ছিল কঠিনতর সীতার দুঃখভোগের তুলনায়। স্বামীকে চক্ষুষ্মান করার জন্য সন্ন্যাসী তাকে যে ফল দিয়েছিলেন তা তাকে প্রদান করতে হল সতীন কুঞ্জমালাকে এবং মনে এতটুকু দুঃখ না রেখে। নিজের সুখ-দুঃখের কথা বিস্মৃত হয়ে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফলের সঙ্গে রাজাসহ স্বামীকে কুঞ্জমালার হাতে সমর্পণ করল সে—

চক্ষে নাই যে জল কন্যার বুকে নাই দুখ।
স্বামী এড়ি যায় কন্যা মনে নাই শোক।।

কি জানি কান্দিলে পাছে স্বামী না হয় ভাল।
মনের যত শোক দুঃখ মুছিয়া ফেলিল।।

পালায় যতই রূপকথার পরিবেশ রচনা করা হোক, মানবিক প্রসঙ্গ বারংবার আত্মপ্রকাশ করে পালাটিকে বাস্তব করে তুলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপুত্রক জীবনের খেদোক্তিটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

যে নদীতে জল নাই নাম কিবা তার
ভাইরে কাম কিবা তার।
যে ঘরে চেরাগ নাই শুধা অন্ধকার
ভাইরে শুধা অন্ধকার।
নিষ্ফলা গাছেতে কভু বান্দর নাহি চড়ে।
ফুলে মধু না থাকিলে না জিগায় ভ্রমরে।।

অনুরূপভাবে উল্লেখ্য পতিহীন নারীর জীবন—

কাণ্ডারী না থাকলে যেমন নাও পাকে পড়ে।
সেই নারীর দুঃখু না যায় স্বামী যারে ছাড়ে।।
যে নারীর পতি নাই কিবা আছে তার।
চেড়াগ নিবাইলে যেমন দুনিয়াই অন্ধকার।।

পালায় সুখের অনিত্যতা নিয়ে যে দার্শনিক প্রত্যয় অভিব্যক্ত তা বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত বলেই পাঠকচিত্তে বিশেষ আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম—

এই ছিল আসমানে চান্নি এই যে মেঘে ঢাকা।
মানুষের ভাগ্যে সুখ যেমন পদ্মপাতার জল।।
আজ যে রাজা দেখ সুখের সীমা নাই।
কাইল সে দারুণ পথেঘাটে ভিক্ষা মাইগ্যা খাই।।
আইজ দেখ যার আছে লক্ষ টাকা কড়ি।
কাইল দেখ সেইজন পথের ভিখারী।।
আইজ যে ছিল ধনপতি শিরে ছাতি।
কাইল সে দেখ গাছতলাতে দুখে পোহায় রাতি।।

## কমলারাণীর পালা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'কমলারাণী' পালাটি সংকলিত হয়েছে। তবে দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালাটি অসম্পূর্ণ। দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত পালাটির ছত্রসংখ্যা ৩৪৫। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ একই পালা সংকলিত হয়েছে ৬৬০টি পংক্তিতে আবদ্ধ হয়ে। অর্থাৎ নূতন ৩১৯টি ছত্র মৌলিক মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থে ধৃত পালাটিতে লভ্য।

দীনেশচন্দ্র আলোচ্য পালাটির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

'পালাগানের চরিত্রগুলিও যেমন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, সেইরূপ মূল আখ্যায়িকার বিষয়ভাগও ঐতিহাসিক ঘটনামূলক।...আখ্যায়িকায় বর্ণিত সুষং দুর্গাপুরের জমিদার জানকীনাথ মল্লিক, তদীয় পত্নী কমলাদেবী এবং পুত্র রঘুনাথ সিং ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি।' পালাটি অধরচাঁদ বিরচিত। পালাটির শেষে কবি তাঁর নিজের নামের উল্লেখ করেছেন—'অধরচান্দে কাইন্দ্যা কয় রাজা, কি করিলে কাম।'

পালাটির আখ্যান তেমন আকর্ষণীয় নয়, অলৌকিকতার প্রভাব জাত পালাটি। পালার প্রারম্ভে কোনো বন্দনা অংশ সংযোজিত হয় নি। সুষঙ্গ রাজ্যের ভৌগোলিক ও কৃষিজপণ্যের বর্ণনা দিয়েই পালার সূচনা। আসামের কালাজ্বরে জানকীনাথের পিতার মৃত্যুর বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক। ষোড়শ বর্ষীয় রাজকুমারের রাজমাতাকে নিয়ে কামাখ্যা দর্শনের বিবরণ মোটামুটি ভাবে প্রদত্ত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যুগীঘুপা, তিরকুটেশ্বরী দেবী, ধুবাবুড়ির পাট, মহামায়া দেবীর মন্দির ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তীর্থক্ষেত্রেই রাজকুমার জানকীনাথের সঙ্গে বামুনডাঙ্গা গ্রামের জমিদার কন্যা কমলার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। কৌশলে কবি কমলার পিতার ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন, উত্তর মুল্লুকের বামুনডাঙ্গা গ্রাম থেকে কমলার কোচারের রাজ্যে উপস্থিতির কারণও উল্লিখিত হয়েছে। কমলা একটি সন্তান প্রসবের পর জানকীনাথের কাছে তার একটি প্রার্থনা জানাল—

একদিনে কাটবাম্ আমি এক টাকু সূতা।
সেই না সূতা ঘির দিয়া যত জমিন হয়।
সেই জমিনে পুষ্কুন্নি এক কাড়বাইন নির্চয়।।
সেই না পুষ্কুন্নির নাম হইব কমলাসাগর।

এইভাবেই কমলা মৃত্যুর পরও স্মরণীয় হয়ে থাকতে চেয়েছে—'আমি মইরা গেলে নাম গাইব সগগলেতে।' জানকীনাথ সম্মত হন। রাণীর কাটা সুতার মাপে বিশাল পুষ্করিণী খনন করা হল, কিন্তু শত চেষ্টাতেও তাতে জল হল না। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী খনন করা পুষ্করিণীতে জল না উঠলে অশুভের লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়, বলা হয় খননকারী চৌদ্দপুরুষ তাতে নরকগামী হয়। রাজার চোখে ঘুম নেই। শেষে রাজা স্বপ্নে দেখলেন রাণীর আত্ম বলিদানের ফলে পুষ্করিণী জলপূর্ণ হয়েছে। রাজার দেখা স্বপ্নের কথা শুনে রাণী কমলা সত্যসত্যই আত্মবলিদান করে পুষ্করিণীকে জলপূর্ণ করে তুলল। এক্ষেত্রে কবি কমলার সতীত্বকে বড় করে তুলেছেন। কেননা কমলা প্রার্থনা জানিয়েছে :

যদি আমি সতী হই ধর্মে থাকে মন।
দীঘি ভইরা উঠুক পানি দেখুক সর্বজন।।
যদি আমি সতী হই আমার প্রভুর বাঞ্ছা পুরে।
আমারে ডুবায়্যা দেবতা লও পাতাল পুরে।।

সকলের চোখের সামনে কমলার সলিল সমাধি ঘটেছে। কিন্তু এরপর কমলা রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছে শিশু সন্তানের জন্য তার ব্যাকুলতার কথা। দীঘির

পাড়ে একটি ঘর তৈরী করে দিতে অনুরোধ করেছে কমলা, আর বলেছে সুয়াদাসী যেন শিশুকে নিয়ে ঐ ঘরে রাত্রি অতিবাহিত করে, কমলা এসে তার সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দান করে যাবে। এইরকম একবছর ধরে যখন চলছে, এক বৎসরের মাত্র একটি দিন বাকি,, এমন সময়ে রাজা রাত্রে বন্ধ ঘর খুলে হাজির হন। রাজা কমলাকে জাপটে ধরলেন। ক্রন্দনরত রাজাকে কমলা জানাল তার শাপমুক্তি ঘটেছে, সে দেবপুরে যাচ্ছে। এই বলে কমলা শূন্যে উড়ে গেল। রূপকথার অভিপ্রায় আখ্যানটিতে লভ্য। কমলার পুষ্করিণীতে সলিল সমাধি লাভ, পুনরায় শিশুসন্তানকে স্তন দুগ্ধদানের জন্য নিয়মিত উপস্থিত হওয়া, তার শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া এ সবই অলৌকিকতার পরিচয়বাহী। কমলার বাৎসল্য তার চরিত্রকে কিছুটা বাস্তবতা দান করেছে। কমলার জন্য রাজার ক্রন্দন ও ব্যাকুলতা তার চরিত্র উপযোগী হয় নি. কবি এইভাবে রাজাব পত্নীপ্রেম দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজার আচরণ সহানুভূতির উদ্রেক করে না, বরং বিরক্তিই উৎপাদন করে। কমলার পুষ্করিণীতে জল আনয়নের প্রয়াস প্রত্যক্ষ করতে উপস্থিত কৌতূহলী জনতার বিবরণ, তাদের প্রতিক্রিয়া ও কৌতূহল ইত্যাদির বর্ণনা বাস্তবানুগ হয়েছে। দীনেশচন্দ্র যথার্থই মন্তব্য করেছেন :

'মাঝে মাঝে কবি দার্শনিক গবেষণা দ্বারা গ্রাম্য গীতির সরলতা নষ্ট করিয়াছেন।"[১৭]

## নীলা

'নীলা' প্রকৃতিতে গীতিকা নয়। আখ্যান এতে অনুপস্থিত। শিশুকালে 'নীলা'র বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। তারপর যে কোন কারণেই হোক, স্বামীর সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ফলে সে তার পতি দেবতাটিকে চেনে না। দীর্ঘকাল পরে সেই পতিদেবতাব আবির্ভাব ঘটল নীলার সমীপে। স্বভাবতঃই নীলার কাছে সে একজন অপরিচিত পুরুষ বলেই বিবেচিত হয়েছে। সাধু নীলাকে মাঘেব অন্ধকার রাত্রে নীলার যৌবন চুরি যাবে বলায় তখন নীলা তাব প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে :

আজকে নিশীথেরে যদি চুবার নাগাল পাই।
খড়্গোতে কাটিয়া তারে চণ্ডীতি পাঠাই।।

বোঝা যায় নীলা ছিল সাহসী, ভীত নয়। এরপর সাধু নীলাকে অলংকারের প্রলোভন দেখিয়েছে, কিন্তু নীলা প্রলুব্ধ হয়নি। অত্যন্ত তেজস্বিতার সঙ্গে জবাব দিয়েছে--

পাক দিয়া ফেলবরে সাধু তোমার অষ্ট অলংকার।

সাধু নীলাকে আত্ম পরিচয় দান প্রসঙ্গে যখন বলেছে :

বাড়ী আমার মরিচপুরে বাপ গদাধর।

মায়ের নামডী কওনারে সতী যেমন মোর নামডী সুন্দর।--তখনই নীলা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে। সে ছুটে গেছে মাতা পিতার কাছে। বলেছে--

ওগো মাতা ওগো পিতা তোমরা কি কর বসিয়া।
শিশুকালে দিছাও বিয়া জামাই চেন গিয়া।।

দু'একটি ক্ষেত্রে কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে। যেমন—

'তোমার যৌবন বাসরে নীল্যা না পুরিল আশ'।

একটি ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে নীতিবাক্য প্রকাশিত—

'বিটা যার ভাজন হায়রে তার বাপে না খায় গাইল।'

অর্থাৎ যার ছেলে সচ্চরিত্রের, তার পিতাকে গালাগাল খেতে হয় না।

একটি অলংকারে রামায়ণের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গীতিকায় রামায়ণ কিংবা মহাভারতের প্রভাব সীমিত ক্ষেত্রেই উপস্থিত বলা চলে, তাই সে দিক দিয়ে অলংকারটির উল্লেখ প্রয়োজন—

'যেমন লঙ্কা ধাওয়ায়্যা আসে বীর হনুমান।।

## শান্তি কন্যার হাঁহলা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয়খণ্ডে 'শান্তি কন্যার হাঁহলা' সংকলিত হয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক এই একই পালাকে স্থান দিয়েছেন তাঁর সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় ৪র্থ খণ্ডে। তুলনামূলকভাবে দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালাটির তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলিত পালাটি দীর্ঘতর। গীতিকার আখ্যানের মত আলোচ্য পালায় কোন ধারাবাহিক আখ্যান বর্ণিত হয় নি, তৎপরিবর্তে অপরিচিত তরুণ নায়কের সঙ্গে বিবাহিতা ষোড়শী নায়িকার কথোপকথনের ঢঙে রচিত পালাটিতে তরুণ নায়কের তার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা ও সেই পরীক্ষায় ষোড়শী নায়িকার সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি উপস্থাপিত। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর উভয়ের মিলনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে পালাটি শেষ হয়েছে।

আলোচ্য পালাটির নায়িকা শান্তি। সে হল গুণধর বণিকের কন্যা। নায়কের নাম সুন্দর, সেও বণিকের পুত্র। শান্তির সঙ্গে সুন্দরের বাল্যকালে বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের পরই সুন্দর তার পিতা সমভিব্যাহারে গিয়েছিল বাণিজ্যে। দীর্ঘ ব্যবধানের পর সুন্দর ফিরে এল। তখন সেও যেমন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত, তার নাবালিকা স্ত্রীও তখন ষোড়শী যুবতী। সুন্দর আত্মগোপন করে দীর্ঘ একটি বৎসর ব্যাপী শান্তিকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করল। কিন্তু শান্তি তার সতীত্ব অটুট রেখে অপরিচিত সুন্দরের কোনো প্রস্তাবেই সম্মতি দিল না। অবশ্যই প্রস্তাব ছিল মিলনের। শেষপর্যন্ত শান্তি তার কঠিন চরিত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সুন্দর তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করল। উভয়ের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা দেখা দিল।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক জানিয়েছেন, 'পূর্ববঙ্গের নিজস্ব পল্লীগীতের সুর 'ভাটিয়ালী', 'মুড়াই', 'সাইগরী' প্রভৃতি প্রায়ই নারীকণ্ঠে সম্ভব হয় না, সেইজন্য পূর্ববঙ্গে মহিলারা 'ভাওয়াইয়া' ও 'হাঁহলা' বা হাঁওলা' সুরের গান গাহিয়া থাকেন।'

মৌলিক মহাশয় আরও জানিয়েছেন, 'বিবাহাদি উৎসবে 'হাঁওলা গান' গাহিবার প্রথা সুপ্রাচীন কাল হইতে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত।' আনন্দোৎসবে গীত হবার কারণে হাঁহলার

বিষয়বস্তু কখনই করুণ রসাত্মক হতে পারে না। আমাদের আলোচ্য পালাটিতেও করুণ রস পরিবেশিত হয় নি, বরং মিলনের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই হাঁহলাটির পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্র পৌরাণিক বিষয় রাধা-কৃষ্ণের মিলন লীলা, রুক্মিণী হরণ, রাম সীতার বিবাহ, কিংবা হর-পার্বতীর বিবাহ অবলম্বনে রচিত হাঁহলার বহুল পরিচিতি বিষয়ে জানিয়েছেন, কিন্তু আমাদের আলোচ্য পালাটি সেদিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। কেননা এতে কোনো পৌরাণিক বিষয় স্থান পায়নি। তৎপরিবর্তে রক্ত মাংসের দুটি চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

আমাদের পরিচিত গীতিকাগুলিতে নায়ক নায়িকার মিলন কেন্দ্র রূপে পুষ্করিণীর ঘাট উপস্থাপিত। আলোচ্য পালাটিতেও শান্তি ও সুন্দরের সাক্ষাৎ তথা কথোপকথন পুষ্করিণীর পাড়েই ঘটেছে। গীতিকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কথোপকথনের ঢঙে রচিত হতে দেখা যায়। আলোচ্য পালাটি প্রায় আনুপূর্বিক কথোপকথনের ঢঙে রচিত। কথোপকথনের বাইরে রয়ে গেছে—

ভালো শাড়ী পইরা মাও
কাঙ্কে পিতলা কলসী।
ডাইকা লইল সঙ্গে যত
পাড়ার পড়শী।।
হাতে লইল খৈল খরসী মাথায় তৈল বাটি।
হেলিতে দুলিতে চলে সবাই জামাই চিনতি।।

এই অংশটি, আর শান্তির সজ্জার বিবরণটুকু।

শান্তির চরিত্রের যে দিকটি বিশেষভাবে আমাদের নজর কাড়ে, তা হল তার চরিত্রের দৃঢ়তা। বাল্যে বিবাহ হয়েছিল তাব, স্বামীকে তার স্পষ্ট মনেও নেই। তবু সাধ্বী স্ত্রীর সংস্কার তার মধ্যে জাজ্বল্যমান। দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন :

'ছলনাশীল তরুণ যুবক ও রঙ্গপ্রিয় মাধবীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শান্তির অটল চরিত্রমহিমা ও দৃপ্ততেজ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে তেমনি তাহার নারীজনোচিত কমনীয় চরিত্র মাধুর্য এবং রহস্যপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে।'

অপরিচিত যুবক শান্তির কাছে প্রেম নিবেদন করতে গেলে সে শুনিয়ে দিয়েছে—

শাশুড়ীর সুহাইগ্যা শান্তি আমি
হারে আমি সোয়ামীর পরাণ।
বৈদেশীরে দেখি আমি
বাপ ভাইয়ের সমান।।

প্রয়োজনে শান্তি রূঢ় হতেও জানে। চৈত্রমাসে একদিন প্রকৃতিতে খরার কারণে তাপ, অপরদিকে সুন্দর-শান্তির যৌবনের কারণে দগ্ধ হচ্ছে জানালে শান্তি বলেছে—

মাও তোমার দোচারিণী
বাপ তোমার হিজা

পরের নারীর পিছুন লাইগ্যা
তোমার কপালে ঘটব সাজা।।

ফাল্গুনমাসে সুন্দর শান্তির কাছে যখন জানতে চেয়েছে যে গৃহে অতিথি গেলে সে কি করবে, শান্তি যে উত্তর দিয়েছে তাতে একদিকে যেমন তার কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় মেলে, তেমনি সে যে বিশেষ বুদ্ধিমতী, তার উত্তরে তার সেই বুদ্ধিদৃপ্ত পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে। শান্তি বলেছে অতিথিকে সে শয়নের জন্য খাট,, পালঙ্ক, বালিশ, মশারি, রন্ধনের জন্য চাল, ডাব, সবকিছু দেবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিয়েছে—

এই কয়েক্ চিজ্ পাইলে পরবাসী
খুশী হওন উচিত।
এয়ার বেশি যার লাইগব্ সেইত
না হইব অতিথ্।।

সুন্দর যখন শান্তিকে বলেছে যে বৈশাখেও সে তার নবযৌবন কাউকে দান করল না, তখন শান্তি অত্যন্ত বাস্তববাদীর মত যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে—

ক্ষেতের তরমুজ নয় রে সাধু—
আমি কাইট্যা বিলাইব।
কোলের পোলা নয় রে আমি
এই না দুগ্ধ পিয়াইব।

শান্তির নিজের সতীত্বের ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। স্বামীর মৃত্যু ঘটলে সে তা ঠিকই জানতে পারত বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই যখন সুন্দর মিথ্যা করে বলেছে যে কাঞ্চনপুরের ভাটিতে শান্তির স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, তখন শান্তি অগাধ বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছে—

রাম লক্ষ্মণ দুইডা শঙ্খ
আমার ভাইঙ্গা হইত চুর।
আস্তে আস্তে মৈলান হইত
আমার সিন্থাব সিন্দুর।।

শেষপর্যন্ত যখন সুন্দর তার পরিচয় দিয়েছে, তখনও শান্তি তা বিশ্বাস করেনি, সে গৃহে ফিরে এসে মা-বাবাকে সব জানিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চেয়েছে সত্যিই অপরিচিত যুবকটি তার স্বামী কিনা, সেই বিষয়ে।

সুন্দরের ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়। দীর্ঘ একটি বৎসর ধরে যে ভাবে সে তার স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষা করেছে, তাতেই বোঝা যায় তার অপরিসীম ধৈর্য। স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে শান্তিকে সে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

আলোচ্য পালায় সীমিত পরিসরে হলেও সমসাময়িক জীবনের কিছু প্রতিফলন ঘটেছে। পূর্বে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। নারীদের ব্যবহার্য অলঙ্কারের মধ্যে ছিল মোতির

মালা, হাসুলী, বাজুবন্ধ, পায়ের পাশুলী, কোমরের ঘাগর, গলায় পরা হত গজমোতির হার। স্নানের সময় মানুষ খৈল খরসী ব্যবহার করত। ঠেঙ্গাড়ে ডাকাতেরা বাঁশের যে মুগুর ব্যবহার করত তার নাম ছিল 'শরবানি'। সধবারা পূর্ববঙ্গে হাতের শাঁখাকে রাম-লক্ষ্মণ নামে অভিহিত করত। আলোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলতে হয়,—

'ষড়ঋতু বাংলাদেশের প্রকৃতির উপর যে বিচিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে, সেই বিচিত্র দৃশ্যাবলী রহস্য ও স্নিগ্ধ স্নেহের দ্বারা মধুর হইয়া এই পালাটির মধ্যে আলোক-আঁধারের সৃষ্টি করিয়াছে।'[১৮]

## ধোপার পাট

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'ধোপার পাট' পালাটি সর্বমোট ৪৬৬টি ছত্রে সংকলিত হয়েছে। অপরপক্ষে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে এটি 'কাঞ্চনকন্যা' নামে ৭৫০ ছত্রে ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে ২৮৪টি ছত্র অধিক সংকলিত হয়েছে।

'ধোপার পাট' বা 'কাঞ্চন কন্যা' পালাটির রচয়িতার নাম জানা যায় না। ক্ষিতীশচন্দ্র মনে করতেন, 'এই পালার ঘটনা, 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী'র বহু পূর্ববর্তী এমনকি পঞ্চদশ শতাব্দীরও হইতে পারে।' ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক পালাটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন,—

'আজ হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে বাংলা মায়ের এক কবি সন্তানের হৃদয়ে প্রেমের যে আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং কাঞ্চনকন্যা অবলম্বনে সেই আদর্শ তিনি যেভাবে কাব্যে রূপ দিয়াছেন, তাহা বিশ্বসাহিত্যে বিরল।'

এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে আমরা পালাটির মূল্যায়নে প্রয়াস পেতে পারি। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে যে বড় ব্যক্তির প্রেমপ্রীতি বালির বাঁধের মতই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। এই প্রবাদ বাক্যটির যথার্থ্যই যেন প্রতিপন্ন হতে দেখা গেছে 'ধোপার পাট' পালাটিতে।

গোধা নাম্নীয় ধোপার কন্যা কাঞ্চনমালা চতুর্দশী, অপরূপ সুন্দরী সে। তার রূপে মুগ্ধ হল রাজকুমার। খুবই তাৎপর্যের—কবি বিশ্বাসঘাতক নায়কের নাম করেন নি। রাজকুমার ধোপার কন্যাকে প্রেম নিবেদন করলে সে প্রথমে তাতে সাড়া দেয়নি। চতুর্দশী হলে কি হয়, সে অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ। তাই সে বলেছে :

সোনার ভমরা রে বন্ধু
আরে বন্ধু, তুমি পাইবা পউদ্মের মধু।

সে প্রলুব্ধ হয়েও নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করেছে এই যুক্তি দেখিয়ে—

ছোটোর সঙ্গে বড়োর পীরিত
দশের মধ্যে খোটা।।
বাউন হইয়া আমি
কেনে চান্দে বাড়াই হাত।

তবু রাজকুমারের সঙ্গেই হতভাগিনী তার জীবনকে যুক্ত করে নিয়েছে। পিতামাতা পরিচিত পরিবেশ সব ত্যাগ করে গৃহত্যাগিনী হয়েছে রাজকুমারের সঙ্গে। পরবর্তীকালে অন্য রাজ্যে উপস্থিত হয়ে সেই রাজ্যের রাজার ধোপার মাধ্যমে ঐ রাজ্যের রাজকন্যা রুক্মিণীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে গোধার কন্যা কাঞ্চনকন্যা এবং তার রাজকুমার স্বামী। রুক্মিণী কৌশলে কাঞ্চনকন্যার কাছ থেকে রাজকুমারকে নিজের প্রভাবে এনে তাকে বিবাহ করেছে। বেচারী কাঞ্চনকন্যা রাজকুমারের আশায় পথ চেয়ে শেষে নিরাশ হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে এসেছে। জেনেছে তার প্রেমিক রাজকুমারের বিবাহিত জীবনের কথা। একদিন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে দেখেছে রাজকুমার ও রুক্মিণীকে। দুটি বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা আর সে সহ্য করতে পারেনি। মৃত্যুবরণ করেছে স্বেচ্ছায়। যে রাজকুমার কথা দিয়েছিল তার যথাসর্বস্ব দিয়ে ধোপার কন্যার পাণিগ্রহণ করবে—

রাজত্বি ধন যা আছে লো কন্যা,
আমি বাপেরে কইয়া।
সর্ব্বাস্থি তোমারে দিয়া
আমি করবাম্ তরে বিয়া।।

—সেই তাকেই দেখা গেল দিব্বি রুক্মিণীকে পেয়ে অবলীলাক্রমে ধোপার কন্যাকে বিস্মৃত হতে, তার জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে। একথা ঠিকই যে রাজকুমার ধোপার কন্যার জন্য কুলমান রাজত্ব ত্যাগ করেছিল, কিন্তু এসবই ছিল সাময়িক ব্যাপার। যেই রুক্মিণী তাকে লিখিতভাবে জানিয়েছে যে তার নির্বাচন যথাযথ হয়নি,—

ভমবা আছিলা তুমি হইলা গোবরিয়া।
ধুবানী আইনাছে তোমারে পিরীতে মজাইয়া।।
কিংবা, এয়ার থাইকা দুক্ষের কথা কি কইবাম্ আর।
ধুবার বুঝা বইয়া বেড়ায় রাজার কুমার।।

দেখা গেল এরপরই রাজকুমার ধোপার কন্যাকে তিন মাসের জন্য বিদেশভ্রমণে যাচ্ছে বলে রুক্মিণীকে বিবাহ করে, নিজের দেশে সুখে দাম্পত্য জীবন যাপনে রত হয়েছে।

আমরা দুটি বিশ্বাসঘাতকতার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রথমটি প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা। এতক্ষণ সেই প্রসঙ্গ উল্লিখিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতা সখীর। রুক্মিণী নিজে যেচে আলাপ ও সখ্য স্থাপন করেছিল কাঞ্চনমালার সঙ্গে। কাঞ্চনমালাও বিশ্বাস করে অকপটে তার ও রাজকুমারের অসম প্রেম ও তার কারণে তাদের ঘর ছাড়ার কথা বলেছিল। রুক্মিণী সেই সুযোগ নিয়ে সখীর প্রেমিককে হস্তগত করে কাঞ্চনমালার জীবনকে মরুভূমিতে পরিণত করল।

এ পর্যন্ত গেল মূল আখ্যানটির প্রসঙ্গ এবং বিশেষত: কাঞ্চনমালার বিড়ম্বিত জীবনের করুণ পরিণতির প্রসঙ্গ। এইবার আমরা পালাটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে আসতে পারি।

**পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাঞ্চনমালার রাজকুমারের বাঁশীর শব্দ শুনে গভীর রাতে অভিসারে বেরোবার কথা। কিন্তু তার সত্যভঙ্গ হল, মা-বাবা দুজনেই জাগ্রতাবস্থায়, ফলে প্রেমিকের বাঁশীর শব্দ শুনেও তার আর অভিসারে বেরুনো হল না। এই যে দ্বন্দ্ব কবি তা চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন--**

বাপ মাও জাইগা রইছে
আমি যাইবাম্ রে কেমনে।
আমি ঘর করলাম বাইর রে বন্ধু
পর করলাম আপনে।

একটি ক্ষেত্রে কবি প্রচলিত ছড়ার একটি পংক্তিকে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছেন। বৃষ্টিস্নাত রাত্রে রাজকুমার অভিসারে বেরিয়েছে, তার উদ্দেশে কাঞ্চনমালার উক্তি :

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বাইরে কেনে ভিজ।
ঘরের পাছে মানের পাতা
কাইটা মাথায় ধর।।

কাঞ্চনমালা ধোপার মেয়ে। অঝোর ধারার হাত থেকে রক্ষা পেতে মানকচুর পাতা ছাড়া আর কোনও আশ্রয়ের কথা তার মনে আসা সম্ভব নয়, তাই আসেওনি, এলেই বরং তা কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট হত।

গোধাকে ডেকে পাঠিয়েছে রাজা, উদ্দেশ্য তার কন্যার সঙ্গে রাজকুমারের মেলামেশা বন্ধ করা। কিন্তু বেচারী গোধা ধোপা তার কন্যার সঙ্গে রাজকুমারের প্রেমের সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাই সে ভেবেছে নিশ্চয়ই তার কাপড় ধুয়ে রাজবাড়ীতে দিতে দেরী হয়েছে, তাতেই তার ডাক পড়েছে প্রাসাদে। তাই কোনরকম ভণিতা না করেই সে আত্মপক্ষ সমর্থনে নেমে পড়েছে :

দুইদিন গেল বিষ্টি বাদল ঝড়ে আর তুফানে।
কাপড় না বাতায় এই দারুণ দুর্দিনে।
তে কারণে মহারাজ আমার অবগতি।।
বস্তর না শুকাইতে আইল দুর্গতি।।

ধোপার বক্তব্য কিছুটা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। পাঠক নির্মল স্নিগ্ধ হাস্যরসের স্বাদ পায় তার জবানীতে।

রাজকুমার ও কাঞ্চনকন্যার পলায়ন অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত। রাজা ধোপাকে ডেকে নির্দেশ দিয়েছেন পরদিন সকালেই সে যেন তার কন্যার সঙ্গে রাজার বাগুয়া নামক মালীর বিবাহ দেয়। তারপরই বর্ণিত হল--

কই বা গেল রাজপুত্র কই বা কাঞ্চনমালা।
দেশেতে পড়িল ঢোল গানের পরথম্ পালা।।

পরিশীলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেমিক ও প্রেমিকা পলায়নের পূর্বে নিঃসন্দেহে কিছু সলা পরামর্শ করে নিত, অন্তত: গৃহত্যাগী হয়ে রাজার চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেবার প্রসঙ্গে। এখানে কিন্তু তা হয়নি। এই সংক্ষিপ্ততা তথা আকস্মিক পট পরিবর্তনে নাটকীয় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে স্বীকার করতে হয়।

মধুসূদন বিদেশে গিয়েও তাঁর বাল্যের স্মৃতি বিজড়িত কপোতাক্ষকে বিস্মৃত হতে পারেন নি, অপপক্ষে দীর্ঘ চৌদ্দটি বৎসর ধরে যে খুরাই নদীর সঙ্গে কাঞ্চনমালার সম্পর্ক, যে নদীর ঘাটে সে স্নান করেছে, জন্ম থেকে যে নদীকে সে দেখে এসেছে, যে নদীর পাড়ে বাঁশপাতার বিছানায় রাত্রে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেই নদীর স্মৃতি কাঞ্চনমালার সত্তার সঙ্গে মিশে গেছে। তাই গৃহত্যাগ করে চলে যাবার পর সে দুঃখ করে বলেছে—

রাইত না পোয়াইলে দেখবাম্
আমার খুরাই নদীর ঘাট।

পালাটিতে 'খুরাই' একটি চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছে। এই নদীতে আত্ম বিসর্জনের পূর্বে কাঞ্চন দীর্ঘ স্মৃতিচারণায় বলেছে :

ছুট্‌কালে খেইলাছি খেলা তোমার কূলে কূলে।
বয়েস হইলে ধোইয়াছি কাপড় তোমার ঘাটের জলে।।
তোমার ঘাটে পরথম্ দেখলাম বন্দের চান্দমুখ।
জীবন যইবন সোইপ্যা দিলাম পাইলাম কত সুখ।।
আইজ এই না শেষের দিনে মোরে কূলে তুইল্যা লও।
তোমার শীতল বইক্ষে মোরে একটু স্থান দেও।।

শিক্ষিত মানুষের মত কাঞ্চনমালা আত্মকেন্দ্রিক নয়, তাই জন্মের মতন মা-বাবাকে ত্যাগ করে চলে আসার দুঃখ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাইলা ধানের মাঠ, পাড়ার নরনারী, পরিচিত পরিবেশের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

কাঞ্চনমালার কথার খেই ধরে রাজকুমার তাদের উভয়ের অভিন্নতার প্রসঙ্গ টেনেছে যেভাবে তাতে কবি সঙ্গতি রক্ষার ক্ষেত্রেও অভাবনীয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। রাজকুমার কাঞ্চনমালার প্রিয় খুরাই নদীর প্রসঙ্গ টেনে বলেছে—

আরে কন্যা, খুরাই নদীর জলে সুত
দেখো সাওর পানে ধায়।
সাওরে মিশিলে সুত
আর চিনা নাইত যায়।।
তর পরাণে মোর পরাণে
কন্যা, সুখে দুখে মিশা।।
আর ত না চাইবাম্ কন্যা,
আর নাই লো কোনো আশা।।

দীর্ঘকাল পরে পতিহারা হয়ে কাঞ্চনমালা তার পিত্রালয়ে ফিরে এলে ধোপা তাকে বুঝিয়েছে সমাজের তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে অসম প্রেমের পরিণতি কখনই সুখের হয় না। বেশ বোঝা যায় গোধার বক্তব্য শুধু কন্যার পরিণতির প্রতিক্রিয়া নয়, তা তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি—

বড়োর সাথে ছোটোর পিরীত হয় রে অগঠন।
উচাগাছে উঠ্‌লে যেমন পড়িলে মরণ।।
জমিন ছাইড়া পাও বাড়ালে শূন্যে না লয় ভর।
হিয়ার মাংস কাইটা দিলেও আপন না হয় পর।।

দুটি চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা লক্ষণীয় পালাটিতে। গৃহে ফিরে কাঞ্চনমালা তার পিতাকে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, কেননা নিজের কপাল পুড়িয়ে সে ফিরে এসেছে গৃহে। কিন্তু যেই শুনেছে—

বিয়া কইরা রাজার পুত্তর সুখে বইসা খায়।
স্বপনেও একদিন কাঞ্চনের কথা না জিগায়।।
শুকাইল চউক্ষের জল কন্যার মুখে শব্দ নাই।

চরম আঘাত তথা বিশ্বাসঘাতকতা তাকে শুষ্ক করে দিয়েছে। নীরব করে দিয়েছে।

পুনরায়, অন্দরে প্রবেশ করে রুক্মিণীসহ রাজকুমারকে প্রত্যক্ষ করার পর যখন পাগলী রূপে কাঞ্চনমালা রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তখন কাঞ্চনমালা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েনি, 'হাইসা গইলা পড়ে কাঞ্চন সুখে যায় রে চলে।' মনে হবে এ তার উন্মত্ততা, আসলে তার মনে পড়ে থাকবে রাজকুমারের পূর্বে প্রদত্ত আশ্বাসবাণী, তার সঙ্গে প্রেমের কপট অভিনয়ের কথা।

দীনেশচন্দ্র 'মহুয়া'র মতই এই পালায় অবলম্বিত নাট্য কৌশলের প্রশংসা করেছেন।[১৯]

## মইষাল বন্ধু—সাঁজুতী কন্যার পালা

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে দুই পর্যায়ে 'মইষাল বন্ধু' পালাটি প্রকাশ করেছেন। প্রথম পর্যায়ের প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র নিজেই তা অসমাপ্ত বলে স্বীকার করেছেন। এই পর্যায়ে দেখা যায় মহুয়া কর্তৃক সাঁজুতী সুন্দরীকে অপহরণের বিবরণ দানেই বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। কাঙ্গু রাজার প্রসঙ্গটি এখানে অনুপস্থিত। অপরপক্ষে দীনেশচন্দ্র দ্বিতীয় পর্যায়েয় যে 'মইষাল বন্ধু' পালাটি সংকলন করেছেন, সেখানে দেখা যায় কাঙ্গু রাজার বিচারে ময়নার সঙ্গে সাঁজুতী কন্যাকে ধরে আনা হয়েছে। কাঙ্গু রাজা মইষালকে শূলে চড়াবার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ কার্যকরী হয়েছে কিনা, তা বর্ণিত হয়নি। সাঁজুতীরই বা কি প্রতিক্রিয়া বা তার কি পরিণতি হয়েছিল, তাও অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। পালাটি সমাপ্ত হয়েছে ময়নার ক্রন্দনের প্রসঙ্গ উল্লেখের মধ্য দিয়ে। সে তুলনায় ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক কর্তৃক তাঁর 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে সংকলিত 'মইষাল বন্ধু-সাঁজুতী কন্যার পালা'টি অনেক বেশী

সম্পূর্ণ। স্বামী ও সন্তানকে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করে সাঁজুতী আত্মহননের পথ অবলম্বন করেছে, এই বিবরণেই মৌলিক মহাশয় সংকলিত পালাটির পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। পালাটির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

আলোচ্য পালাটিতে কোনো 'আসর বন্দনা' যুক্ত হয়নি। সরাসরি কাহিনী দিয়েই পালার সূচনা। ভাগ্য বিড়ম্বনায় ডিঙ্গাধরের পিতা সচ্ছল অবস্থার অধিকারী হয়েও সর্বস্ব হারিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে যখন সিঙ্গাপুরের ধনী মহাজন বলরামের কাছ থেকে একশত টাকা কর্জ করে নূতন করে বাঁচার প্রয়াসে নিযুক্ত, তখনই আকস্মিকভাবে ডিঙ্গাধরের পিতার মৃত্যু হল। বেচারী ডিঙ্গাধর পড়ল অথৈ জলে। সে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য বলরামের গৃহে ছয় বৎসরের মেয়াদে রাখালীতে নিযুক্ত হল। এখানে অবস্থান কালে তার বংশী বাজানোয় মুগ্ধ হয়ে বলরামের একমাত্র কন্যা সাঁজুতী তার প্রেমাসক্ত হয়। এদিকে ডিঙ্গাধরের অন্যমনস্কতার কারণে মহিষ জমিদারের বাঁকের ধান খেয়ে নিলে জমিদারের পাইক বলরামকে ধরে নিয়ে যায়। পাঁচ হাজার টাকা তার জরিমানা হয়। একমাসের মধ্যে জরিমানার টাকা দিতে অসমর্থ হলে বলরামের মৃত্যু হবে শূলে চড়িয়ে বলে স্থির হয়। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্থির হয় যদি বলরাম তার সুন্দরী কন্যা সাঁজুতীকে এনে দেয়, তবে জরিমানা তার মুকুব করা হবে। জমিদারের কাছে বাথানের মহিষ, মইষাল চাকর জামিন রেখে বলরাম মুক্তি পেল। নিরুপায় বলরাম আষাঢ় মণ্ডলের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ করে জমিদারের জরিমানা মেটায়। মুক্তি পায় ডিঙ্গাধব। কিন্তু সে আর বলরামের গৃহে ফেরে না। বলরামের কন্যা সাঁজুতীর ডিঙ্গাধরের বিরহে উন্মাদিনীর অবস্থা। ডিঙ্গাধর সাঁজুতীর বিবাহের ব্যাপারে এক ঘটক প্রেরণ করল। সাঁজুতীর মা জানাল আষাঢ়ের পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ না করতে পারার জন্য তার পুত্রের সঙ্গে সাঁজুতীর বিবাহ দিতে হবে তাকে। টাকা পরিশোধের আর মাত্র তিনটি দিন বাকি। আষাঢ়িয়ার সমস্ত ঋণ ডিঙ্গাধর শোধ করে দেয়। তার সঙ্গে সাঁজুতীর বিবাহ হয়। একদিন মঘুয়া সাঁজুতীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়। সে সাঁজুতীকে করায়ত্ত করবে বলে চক্রান্ত করে। পূর্ব পরিচিতির সুযোগে মঘুয়া ডিঙ্গাধরকে তার স্ত্রীকে চট্টাগ্রামে মঘুয়ার ভগিনী ময়নার কাছে রেখে বাণিজ্য যাত্রায় প্রলুব্ধ করে। উভয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে। কিন্তু দীর্ঘ ছয় বৎসরেও মঘুয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন না করায় মইষাল মঘুয়ার ভগিনী ময়নাকে বিবাহ করে। দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে মঘুয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সব দেখে শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে চট্টগ্রামের কাঙ্গুরাজার কাছে ডিঙ্গাধরের বিরুদ্ধে নালিশ করে। কাঙ্গুরাজাকে সে সাঁজুতীর অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পর্কেও জানিয়ে দিতে ভোলে না। কাঙ্গুরাজা তখন মইষালকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দেয়। ময়না কাঙ্গুরাজার পাইকদের হাতে ধরা দিল। সাঁজুতী তার একমাত্র সন্তানকে ডিঙ্গাধরের হাতে তুলে দিয়ে ভৃত্যের বেশে ঘাটে রাখা নৌকার সাহায্যে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার পরামর্শ দিয়ে নিজের গৃহে অগ্নি সংযোগ করে আত্ম হননের পথ প্রশস্ত করল।

আমাদের গীতিকাগুলিতে প্রকৃতি-বর্ণনা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য

গীতিকাটিতে প্রকৃতি শুধু আখ্যানের পটভূমিরূপেই ব্যবহৃত হয়নি, সমগ্র আখ্যানটি প্রকৃতি নির্ভব হয়ে উঠেছে। শিঙ্গাখালি নদী ডিঙ্গাধরদের সচ্ছল পরিবারের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ রূপে দেখা দিয়েছে। ডিঙ্গাধরের পিতা বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়ে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করেছে, তার বিবরণ কবি দিয়েছেন। পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য ডিঙ্গাধর বলরাম মহাজনের গৃহে মহিষের রাখালী করেছে, এই প্রসঙ্গেও প্রকৃতি এসেছে, বলরামের কন্যা সাঁজুতী জল নিতে নদীর ঘাটে গেছে, এই প্রসঙ্গেও প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে--

আগল পাগল কালা মেঘ
আশমানে যায় উইড়ে।
গাছেব তলায় বাঁশি বাজায়
সেইনা নদীর পাড়ে।।
নদীর জলে পাগ্‌লা ঢেউ
পাড়ে মারে হানা।

এমনকি প্রেমিকা সাঁজুতীর ডিঙ্গাধরের ক্লেশের কথা ভেবে যে ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে—

রোইদে কেন পুড়চ রে বন্ধু
তুমি মেঘে কেনে ভিজ।
বিলে আছে পদ্মের পাতা।।
আইনা মাথায় ধর।।
মাঠে আছে হিজল গাছ
জানি শীতল তার তলা।
সেইনা গাছেব তলায় বইবা
তুমি বোইদের দুপুরবেলা।।

অলঙ্কার প্রয়োগেও প্রকৃতি তার স্থান করে নিয়েছে। সাঁজুতী বলেছে—

কূল ভাইঙ্গা নদীর যেমন
মধ্যে পড়ে চড়া।
আমি বে অবুলা বন্ধু,
হইছি অন্তর পুড়া

প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাঁজুতীর রূপ কল্পনায় বিভোর দেখা গেছে ডিঙ্গাধবকেও—

আরে আশমানেতে ফুটে তারা
মেঘেব ফাঁকে দেখি।
মৈযাল ভাবে এমনতর
সেইনা কন্যার দুইডা আঁখি।

আশমানেতে কালা মেঘ
উইড়া উইড়া যায়।
নীলাম্বরী পইরা কন্যা
যেমন জলের ঘাটে যায়

পালাটিতে নানা বৃত্তির মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। এদের মধ্যে আছে ঘটক, মহাজন, জমিদার, বণিক, মইষাল ইত্যাদি।

**ঘটক**

ডিঙ্গাধর নিযুক্ত ঘটকটি ছিল রসিক। সে সাঁজুতীর মার কাছে গিয়ে বলেছে সে যেন তার মনের সব কথা অকপটে তাকে বলে। কেননা--

দশ বিশ পাত্র মোর সন্ধানেতে আছে।।
বিয়ার ঘটক আমি খবর লইয়া ফিরি।
আমারে কহিলে আমি ঘটাইতে পারি।।

সাঁজুতীর মা যখন তার দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়েছে, বলেছে স্বামীর ঋণ পরিশোধের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাঁজুতীর সঙ্গে আষাইঢ়ার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে, তখন ঘটক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—

না ভাবিবা তুমি মাও নাই তোমার ভয়।
উরুম্বা না লইব কন্যা যাইব ভালো ঘরে।
ধনীর ঘরে বিয়া হইব কার্ত্তিক কুমার বরে।।
বাড়ী ঘর বাইন্ধ্যা দিব শুইধা দিব ধার।
সাতদিন মধ্যে আইনা দিবাম্ সমাচার।।

ঘটক কোনক্রমেই ডিঙ্গাধর যে পাত্র, তা ফাঁস করেনি। অথচ ঘটকালির জন্য যা কর্তব্য করণীয় তা করেছে।

**মহাজন**

পালাটিতে দুটি মহাজনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এদের একজন হল শিঙ্গাপুরের বলরাম অপরজন আষাইঢ়া মণ্ডল। বলরাম ধনী মহাজন। অর্থের তার অপ্রতুলতা নেই। সুদের বিনিময়ে সে লোককে টাকা কর্জ দেয়। তার সংসার প্রতিপালিত হয় সুদের টাকায়। বারোমাসে তার গৃহে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। আশ্বিন মাসে সে আয়োজন করে দুর্গাপূজার, কার্তিকে সাড়ম্বরে কার্তিক পূজা করে। অগ্রহায়ণে অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীপূজা। অবস্থার বিপাকে পড়ে ডিঙ্গাধরের পিতা তার কাছে একশত টাকা কর্জ করেছিল। পিতার মৃত্যুর পর বলরাম ডিঙ্গাধরের ঐ ঋণ শোধের ব্যাপারে তাগাদা দিয়েছে। তবে একটুখানি মহত্ত্ব সে দেখিয়েছে। পিতৃহীন ডিঙ্গাধরকে বলেছে—

তোমার কাছেতে বাপু নাই সে চাই সুদ।
আসলে উসুল হইলে তোমার দেনা শোধ।।

কিন্তু যেহেতু ডিঙ্গাধরের মূল শোধের ক্ষমতা ছিল না, তাই সে দীর্ঘ ছয় বৎসরের মেয়াদে বলরামের গৃহে রাখালী করতে নিযুক্ত হয়েছে। ডিঙ্গাধরের অন্যমনস্কতায় বলরামের মহিষ জমিদারের ক্ষেতের ধান খাওয়ায় পাইক বলরামকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। বলরাম কিন্তু ডিঙ্গাধরের ওপর কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চেষ্টা করেনি। বলরামের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে। নিরুপায় বলরাম আষাইঢ়া মণ্ডলের কাছে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ করে জরিমানা মিটিয়েছে, আর সেই সঙ্গে নিজে মুক্তি পেয়েছে এবং ডিঙ্গাধরকেও খালাস করেছে। ডিঙ্গাধর মুক্তি পেয়ে আর বলরামের গৃহে পদার্পণ করেনি, বলরামও তার কোন সন্ধান করেনি। ডিঙ্গাধর সাত ডিঙ্গা ধনের মালিক হয়েছে জেনে সে সাঁজুতীর সঙ্গে তার বিবাহের ব্যাপারে ঘটক প্রেরণ করেছে। বিবাহের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে অগ্রহায়ণ মাস। কিন্তু ডিঙ্গাধর ব্যবসার সূত্রে বাইরে চলে যাওয়ায় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়নি। বলরামের মৃত্যু ঘটেছে। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিবারটি একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আষাইঢ়া মণ্ডল প্রভূত বিত্তের অধিকারী, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ সে। সে বিড়াল বেঁধে ভাত খায়। তার স্ত্রীর পরণে আস্ত কাপড় জোটে না। তার না আছে ব্যক্তিত্ব, না আছে আত্ম সম্মানবোধ। আর তাই—

ভাইয়ে মারে চড়-চাপড়,
পুতে ডাকে লাউড়ের পাগল।।

আষাইঢ়া নিজে পরে থাকে লেংটি। ঘরে তার শয়নের জন্য পাটিটিও নেই। রাতদিন তার সুদের চিন্তা। টাকার কুমীর সে। সুদের ব্যাপারে সে খুবই সচেতন। কড়া ক্রান্তি সে হিসেব করে নেয়। প্রাপ্য কিছুই ছাড়ে না। এক সন্ধ্যা আহার করলে সে পরের সন্ধ্যা ব্যয়ের ভয়ে অনাহারে থাকে। রাত্রে আলো জ্বালে না তেল পোড়াবার ভয়ে। পাতার মশাল জ্বালে সে। বলরাম এ হেন আষাঢ়িয়ার কাছে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ করেছিল। তার মৃত্যু হলেও আষাঢ়িয়া তার প্রাপ্য ছাড়তে সম্মত হয়নি। বলরামের স্ত্রী কন্যাকে তাদের বাথানের সমস্ত মহিষ এবং জমি বিক্রয় করে আষাঢ়িয়ার অর্ধেক ঋণ শোধ করতে হয়েছে। পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ শোধ করতে অসম্মত হলে আষাঢ়িয়া বলরামের গৃহাদিসহ বাড়ীর জমি বাজেয়াপ্ত করে নেবে বলে জানিয়ে দেয়। আষাঢ়িয়া এমনতর লোক যে তার পুত্রের সঙ্গে কেউ কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিল না। শেষে আষাঢ়িয়া সাব্যস্ত করে ঋণশোধে যদি বলরামের স্ত্রী অপারগ হয়, তবে পরিবর্তে সাঁজুতীর সঙ্গে তার পুত্রের বিবাহ হবে। ডিঙ্গাধর আষাঢ়িয়ার সব ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ায় সাঁজুতীর সঙ্গে আর তার পুত্রের বিবাহ হতে পারেনি।

**জমিদার**

জমিদার চরিত্রটি সীমিত পরিসরে হলেও নিজের শ্রেণী চরিত্রকে বজায় রেখেছে। নদীর চরের ধান বলরামের বাথানের মহিষ খেয়েছে, এই ওজুহাতে পাইক বলরামকে

ধরে এনেছে। বিচারে বলরামের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে। নির্দেশ জারি করেছে যে জমির টাকা একমাসের মধ্যে পরিশোধ করতে না পারলে বলরামকে শূলে চড়ান হবে। গুপ্তচরের মাধ্যমে জমিদার যখন জেনেছে যে বলরামের এক রূপসী কন্যা আছে, তখন জমিদার শর্ত আরোপ করেছে এই বলে—

তবে যদি তোমার কন্যা আইনা দেও মোরে।
মাফ করবাম্ জরিমানা আর ছাড়বাম্ তরে।।

জমিদারের মানসিকতা ও তার চরিত্র এতেই পরিস্ফুট।

**রাজা চরিত্র**

পালায় একটি রাজাও আছে কাঙ্গু তার নাম। রাজত্ব তার চট্টগ্রামে। বড়ই অধার্মিক রাজা। রাজ্যের পক্ষে সে ছিল শত্রু। নারী বিলাসী রাজার সাতশত সুন্দরী নারী ছিল। তাছাড়াও সুন্দরী নারী পেলে তার বিবাহ করায় কোনো আপত্তি ছিল না। মঘুয়া এসে এ হেন কাঙ্গুরাজার কাছে ডিঙ্গাধরের বিরুদ্ধে নালিশ করল যে তার অনুপস্থিতির সুযোগে ডিঙ্গাধর তার ঘরের নারীকে বিবাহ করেছে, বিবাহ করেছে তার ভগিনী মইনাকে, অর্থাৎ ডিঙ্গাধর দুই নারী নিয়ে সংসার করছে। আর সেই সঙ্গে সে জানিয়েছে যে ডিঙ্গাধরের একটি পত্নী অপরূপা সুন্দরী, সঙ্গে সঙ্গে রাজা ডিঙ্গাধরকে শূলে চড়াবার নির্দেশ দিয়েছে। মঘুয়ার অভিযোগ সত্য কিনা তার বিচার পর্যন্ত করেনি।

**মঘুয়া**

মঘুয়া চট্টগ্রামের লোক। পেশায় সে বণিক। তার ষোলটি দাঁড় বিশিষ্ট ডিঙ্গা। ডিঙ্গাধরের সঙ্গে তার বেশ সৌহার্দ্য হল। ডিঙ্গাধরের কাছে সে দিন তিনেকের আতিথ্য গ্রহণ করে ডিঙ্গাধরকে তার দেশে যাবার জন্য প্রলোভন দেখাল—

আমার দেশে চল রে বন্ধু পাইত্যা হইবা সোনা।।
খাইতে পাইবা চিক্কনীর ভাত মধু দোনা দোনা।।

সে আরও বলেছে—

দুইজনায় বাইরিবাম মোরা বাণিজ্যি কারণে।
এক না বচ্ছরে তুমি বড়ো হইবা ধনে।।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে ডিঙ্গাধর যখন তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন সত্য সত্যই সে প্রভূত বিত্তের অধিকারী। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মঘুয়াকে বন্ধুবৎসল বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তীকালে। সাঁজুতীকে ডিঙ্গাধরের ঘাটে আর্দ্র বস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় দেখে সে তার রূপে মুগ্ধ হয় এবং অনুসন্ধানে যখন জানল তারই বন্ধু ডিঙ্গাধরের সঙ্গে সাঁজুতীর বিবাহ হয়েছে, তখন সে এক ফন্দী করল। ডিঙ্গাধবের গৃহে উপস্থিত হয়ে পুনরায় তাকে বাণিজ্যের লোভ দেখাল। তার প্রস্তাব মত ডিঙ্গাধর সাঁজুতী সহ মঘুয়ার চট্টগ্রামের গৃহে উপনীত হল।

স্থির হল দুই বন্ধুতে সেখানে থেকে বাণিজ্য যাত্রা করবে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে ভগিনী ময়না দেখাশোনা করবে। আসলে মঘুয়া কৌশলে ডিঙ্গাধরকে সরিয়ে দিয়ে সাঁজুতীকে পেতে চেয়েছিল। এই কারণেই সে তার অনূঢ়া ভগিনী ময়নাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল—

দেশেতে ফিরবাম্ আমি ছয়মাস পরে।
দেশে আইসা বিয়া তবে দিবাম্ ভালা বরে।।
সোনায় গড়ায়্যা দিবাম্ গলাত্ হাছুলি।
উত্তম দেইখা কিইন্যা দিবাম শাড়ী গঙ্গাজলি।।
নাকের নথ দিবাম্ তরে পায় গোল—খাড়ুয়া।
হাতেতে দিবাম্ তরে সোনার বাজুয়া।।

এর বিনিময়ে ময়নাকে শুধু ছয়মাসের জন্য গৃহে লুকিয়ে রাখতে হবে সাঁজুতীকে। মঘুয়া ডিঙ্গাধরকে লোভ দেখাল এই বলে যে তাকে যেতে হবে কামিনীর দেশে—সেখানে ধনরত্নের সীমা পরিসীমা নেই। সেখানে নারীরা বেতের ঝুড়ি ভরে সোনা নিয়ে আসে বেচাকেনা করতে। তারা পরীর মত সুন্দরী। আসলে মঘুয়া এইভাবে ডিঙ্গাধরকে উত্তর মহলে গারো কুকীর দেশে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল, কেননা—

মানুষ ধইরা খায় তারা রাইক্ষসের বেশ।।
সেইনা দেশে যে জন যায় না আইসে ফিরিয়া।।

কিন্তু শেষপর্যন্ত মঘুয়ার কৌশল আর কার্যকরী হল না। দুই বন্ধুতে দুইপথে যাত্রা করেছিল। পথে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হল ডিঙ্গাধর। দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে মঘুয়া না ফেরায় ডিঙ্গাধর ময়নাকে বিবাহ করে বসল। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরে মঘুয়া চট্টগ্রামে ফিরে যখন দেখল তার সব কৌশল ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে শেষ চেষ্টা হিসাবে কাঙ্গুরাজার কাছে ডিঙ্গাধরের বিরুদ্ধে নালিশ করলে যে দুই নারী নিয়ে সংসার করছে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে ডিঙ্গাধর মঘুয়ার ভগিনীকে বিবাহ করে বসেছে। বারবার সে কাঙ্গুরাজাকে সাঁজুতীর রূপৈশ্বর্যের কথা জানাল—

সোনার মত বরণ কন্যার চান্দের মত মুখ।
সেই না কন্যা দেখলে রাজা পাইবা বড়ো সুখ।।

মঘুয়ার প্ররোচনাতেই কাঙ্গু ডিঙ্গাধরকে শূলে চড়াবার নির্দেশ দিল। ময়না এবং সাঁজুতী দুটি কন্যার ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠল সে। বিপদের সম্ভাবনা দেখে সাঁজুতী আত্ম হননের পথ অবলম্বন করল। স্বামী ও একমাত্র সন্তানকে নিরাপদে পাঠিয়ে দিল সে। প্রতিহিংসা ও আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার কারণে মঘুয়া নিজের ভগিনীর স্বার্থকে পর্যন্ত দেখেনি। বন্ধুর প্রতিও সে চরম শঠতা করে নিজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছে। সর্বোপরি পরস্ত্রীকে অপহরণ করার চক্রান্ত করে সে নিজেকে কামুক ও লম্পট রূপেও পরিচিত করেছে। সমালোচক সঙ্গতভাবেই আলোচ্য গীতিকাটিতে ঘটনা সমৃদ্ধি প্রসূত নাট্যগুণ লক্ষ্য করেছেন।[২০] পরিশেষে নায়ক-নায়িকার প্রসঙ্গ।

**ডিঙ্গাধর**

আলোচ্য পালাটির নায়ক ডিঙ্গাধর এবং নায়িকা সাঁজুতী।

ডিঙ্গাধর ভাগ্যাহত পুত্র। দশ বৎসব বয়সে তার মাতৃবিয়োগ হয়। তাদের সচ্ছল পরিবার একের পর এক বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত হলে তার পিতা শিঙ্গাপুরের বলরাম মহাজনের কাছে একশত টাকা ঋণ নেয় অবস্থার সামাল দেওয়ার জন্য। কিন্তু অবস্থা সামাল দেওয়ার পূর্বেই তার পিতা আকস্মিকভাবে মারা গেল। অকূল পাথারে পড়ল ডিঙ্গাধর। হালের মহিষ বিক্রয় করে সে পিতৃকৃত্য করল। বলরাম যখন তাকে এসে তার পিতৃঋণের কথা জানাল, তখন সে আকাশ থেকে পড়ল। ঋণশোধের কোনো সঙ্গতি তার ছিল না। এদিকে তার মনে বদ্ধমূল সংস্কার ছিল ঋণের পাপে তার পিতার সদ্‌গতি হবে না। ঋণপাপে জন্ম-জন্মান্তরেও কাবো মুক্তি নেই। শেষে সে বলরামের গৃহে মইষালের কাজ নিল পিতৃঋণশোধের জন্য সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের মেয়াদে। মনিব কন্যা সাঁজুতীর প্রেমে আসক্ত হয় সে। তার অন্যমনস্কতার সুযোগে বাথানেব মহিষ বাঁকের ধান খেলে জমিদার বলরামকে বন্দী করে এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে শূলে চড়িয়ে তাকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করে। ডিঙ্গাধর এমনই মহৎ যে সে স্বেচ্ছায় জমিদার গৃহে উপস্থিত হয়ে তার নিজের দোষ অকপটে স্বীকার করেছে এবং প্রভুর মুক্তি প্রার্থনা করে তার প্রভু ভক্তির পরিচয় দিয়েছে—

> প্রভু বধ করে যদি ধর্মের দোয়াই লাগে।।
> প্রভুরে ছাড়িয়া দেও মোরে আটক কর।
> যত দোষ সব আমার প্রভুরে মোর ছাড়ো।।

বাস্তবেও ডিঙ্গাধর জমিদারের কাছে জামিন থেকেছে যে পর্যন্ত না বলরাম জরিমানার অর্থের সংস্থান করতে পেরেছে। খালাস পেয়ে ডিঙ্গাধর কিন্তু বলরামের গৃহে আর যায়নি, সম্ভবত সে মনিব কন্যার আকর্ষণ মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। নদীপথে যাত্রাকালে ডিঙ্গাধরেব যখন নিমজ্জমান অবস্থা, তখন এক বণিক তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। ভাগ্যাহত ডিঙ্গাধরের শুধু জীবনই রক্ষিত হয় না, তার কপালও ফেবে। বৃদ্ধ বণিকেব আপনজন বলতে কেউ ছিল না, সে ডিঙ্গাধরকেই পুত্রের মর্যাদা দেয়। বণিকের মৃত্যুর পর সে সাতডিঙ্গা সম্পদের অধিকারী হয় এবং নিজের দেশে গিয়ে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করে শিঙ্গাখালীর পাড়ে। মন থেকে সে কিন্তু সাঁজুতীকে বিস্মৃত হতে পারেনি। বলরাম যখন জেনেছে ডিঙ্গাধর প্রভূত ধনের মালিক, তখন সে সাঁজুতীর সঙ্গে তার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু মঘুয়ার প্রেরণায় ডিঙ্গাধর বহির্দেশে বাণিজ্য যাত্রায় বেরিয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে ডিঙ্গাধরের ধনে আসক্তি ছিল খুব। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে দেশে ফিরে ছদ্মবেশে সে সাঁজুতীদের বাড়ী গেছে তার সন্ধানে। জেনেছে বলরামের মৃত্যুর সংবাদ, আর প্রত্যক্ষ করেছে সাঁজুতী ও তার জননীর সীমাহীন দারিদ্র্য। দুঃখে তার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যেতে বসেছে। ঘটকের মাধ্যমে সে সাঁজুতীর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। শ্বশুরের সমস্ত ঋণ সে

পরিশোধ করে দিয়েছে। সাঁজুতীর সঙ্গে ডিঙ্গাধরের বিবাহ হয়েছে। কিন্তু শান্তিতে বেশিদিন গার্হস্থ্য ধর্মপালন করা তার আর হয়ে ওঠেনি। মঘুয়া ঘটনাচক্রে সাঁজুতীকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সাঁজুতীকে লাভ করতে চক্রান্ত করেছে, অর্থবিলাসী ডিঙ্গাধর মঘুয়ার পরামর্শে পুনরায় বাণিজ্যযাত্রা করেছে, সাঁজুতীকে রেখে গেছে মঘুয়ার ভগিনী ময়নার হেফাজতে। দীর্ঘদিন মঘুয়া না ফেরায় ডিঙ্গাধর বিবাহিত হয়েও ময়নাকে বিবাহ করেছে। ভ্রাতৃহীনা জ্ঞানে ময়নাকে ডিঙ্গাধর তার ভগিনীজ্ঞানে কোনো সুপাত্রে পাত্রস্থ করতে পারত কিন্তু তা সে করেনি। পরে মঘুয়া ফিরে এসে রাজার কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করলে রাজা ডিঙ্গাধরকে প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। সাঁজুতী তাকে এবং তাদের একমাত্র সন্তানকে নিরাপদে প্রেরণের ব্যবস্থা করে দিয়ে আত্মঘাতিনী হয়েছে। প্রেমের ব্যাপারে আমরা শেষপর্যন্ত ডিঙ্গাধরের নিষ্ঠার পরিচয় পাই না। যদি সে সাঁজুতীকে বিবাহ করার পর ময়নাকে বিবাহ না করত, তবেই তার সেই নিষ্ঠা প্রমাণিত হত। তার তুলনায় সাঁজুতী প্রেমের ব্যাপারে যথেষ্ট নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে স্বীকার করতে হয়।

**সাঁজুতী**

বলরাম মহাজনের দুহিতা সাঁজুতী। একদিন জলের ঘাটে স্নান করতে গিয়ে সাঁজুতী তাদের বাড়ীর মইষাল ডিঙ্গাধরের বংশীর সুর শুনে ডিঙ্গাধরের প্রতি আসক্ত হয়। মুখে কিন্তু কাউকে কিছু সে বলে না। তবে ডিঙ্গাধরের জন্য সে তার বংশ গৌরববোধ অথবা জাতিকুল পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছে—

মন যদি পাগল হইল
আমার কি করিবে কুলে—
রে বন্ধু, কাম নাই জাতি কুলে।

ঘটনাচক্রে বলরাম জমিদারের লোকেদের হাতে বন্দী হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা গুণগার দিতে হয়েছে তাকে। বলরাম সেই টাকা কর্জ করেছিল আষাইড়া মণ্ডলের কাছে। কিন্তু ঋণশোধের পূর্বেই বলরামের মৃত্যু হয়। তখন আষাঢ়িয়া ধরে বসে তার পুত্রের সঙ্গে সাঁজুতীর বিবাহ দিতে হবে। দীর্ঘ ব্যবধানের পর ডিঙ্গাধর ছদ্মবেশে সাঁজুতীর সংবাদ নিতে গিয়ে যখন তাকে অনূঢ়া দেখে এবং তাদের আর্থিক দুরবস্থা বিষয়ে অবগত হয় তখন ঘটক পাঠিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। সাঁজুতীর মা আষাঢ়িয়ার প্রসঙ্গ জানায়। যখন আষাঢ়িয়ার সমস্ত ঋণ ডিঙ্গাধর পরিশোধ করে দিয়েছে, তখন সাঁজুতী কৌশল অবলম্বন করে ডিঙ্গাধরের সঙ্গে তার বিবাহকে আটকাতে চেয়েছে, কেননা তখনও সে ডিঙ্গাধরের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেনি—

বাপের মৈষাল ছিল থাকিত বাথানে।
কোন দেশে আছে তার না জানি সন্ধানে।।
ছয় না বচ্ছরের লাইগা লইছিল চাকুরি।

ছয়মাস খাইট্যা দিয়া হইল দেশান্তরী।।
কোন দেশে বাড়ী ঘর না জানি সন্ধান।
তাহারে আনিয়া দিবা মইষের কারণ।।
আমি ত এক কন্যা মায়ের নাই সুদর ভাই।
একলা ঘরে ফেইলা মাও কেম্‌নে আমি যাই।।

শত দারিদ্র্যের শিকার হয়েও এবং একজন সম্পন্ন পাত্রের হাতে পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সাঁজুতী যাকে মন দিয়েছে, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করতে রাজি না হয়ে তার প্রেমের ব্যাপারে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। ছদ্মবেশ পরিহার করে ডিঙ্গাধর নিজের পরিচয় দিয়েছে এবং সাঁজুতীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে।

চট্টগ্রামে মঘুয়ার ভগিনী ময়নাকে বিবাহ করেছে ডিঙ্গাধর সাঁজুতীর উপস্থিতিতেই, কিন্তু সাঁজুতী এ ব্যাপারে কোনো বাধা দেয়নি। অন্ততঃ পালায় সে প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। কিন্তু তার আত্ম মর্যাদাবোধ, সতীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। কাঙ্গু রাজা যখন ময়না, সাঁজুতী এবং ডিঙ্গাধরকে ধরে আনতে নির্দেশ দিয়েছে সেই সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছে ডিঙ্গাধরকে শূলে চড়ানোর, সাঁজুতী অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে ডিঙ্গাধর ও তাদের একমাত্র সন্তানের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করেছে—

ঘাটে রইছে ডিঙ্গি নাও তুমি যাইবা একা।।
চাকরের বেশ ধইরা বন্ধু, পুত্র লয়্যা যাও।
না ভাবিবা আমার কথা পুত্ররে বাঁচাও।।
তুমি যদি বাঁচো রে বন্ধু, আমার পুত্র যদি বাঁচে।।
বংশের বাতি থাইকা যাইব সব থাইকব পাছে।।

সতী ও সার্থক প্রেমিকা সাঁজুতী আত্মহননের পথ অবলম্বন করেছে।

## ভেলুয়া সুন্দরী—মদনসাধুর পালা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে 'ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা'টি। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক এই পালাটিকে স্থান দিয়েছেন 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৬ষ্ঠ খণ্ডে। ক্ষিতীশচন্দ্র অনুমান করেছেন পালাটিতে বর্ণিত ঘটনার কাল 'খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী...।' সমালোচকের মন্তব্য আলোচ্য পালাটি সম্পর্কে যে ঘটনার বাহুল্যের দ্বারা কবিত্বের দৈন্যকে পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।[২১]

শঙ্খপুরের মুরারি সাধু ছিল বিশাল বিত্তশালী ব্যক্তি। মুরারির একটিমাত্র পুত্র, নাম তার মদন। মদনের বয়স তখন একুশ্‌ বৎসর, তার মা-বাবা তার বিবাহের জন্য চিন্তা ভাবনা শুরু করল।

কাঞ্চননগরের মানিক সওদাগরের পাঁচটি পুত্র, আর একটি কন্যা, নাম তার ভেলুয়া সুন্দরী। অপরূপা সুন্দরী সে। ভেলুয়ার যখন সতের বৎসর বয়স, তখন তার বিবাহের জন্য মানিক সওদাগরের প্রয়াস শুরু হল।

মদনকে মুরারি সাধু জানাল তার বয়েস হয়েছে অতএব মদন যেন বিদেশে বাণিজ্য যাত্রা করে। বাণিজ্য নিজে না করলে লাভ হয় না, তাছাড়া এই উপলক্ষ্যে মদনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও পুষ্ট হবে। মদন পিতৃ ইচ্ছা পূরণের জন্য বাণিজ্য যাত্রা করল। মদনের চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর যখন কাঞ্চননগরের ঘাটে উপনীত হল, তখন সেখানে ভেলুয়া তার সহচরীদের সঙ্গে স্নানের জন্য উপস্থিত। দুজনে দুজনকে দেখল এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হল। মদন তার পরিচয় সহ ভেলুয়ার প্রতি তার আসক্ত হওয়ার ঘটনা শিখিয়ে তার পোষা শুক পাখীকে উড়িয়ে দিল। ভেলুয়ার ছিল সারী। মদনের শুকের মুখে সব অবগত হয়ে ভেলুয়ার মদনের জন্য আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেল। মদন বাণিজ্য সেরে প্রত্যাবর্তনকালে উপস্থিত হল মানিক সওদাগরের দরবারে। সে জানাল যে তার শুকপাখীটি উড়ে গেছে। কিন্তু শুনেছে মানিক সওদাগরের কন্যা ভেলুয়া একটি শুক পালন করছে, যদি তাকে একবার শুকটি দেখান হয়। শুককে আনা হল, সে মদনের পরিচয় দান করে সকলকে বিস্মিত করল। শুকটি তুলে দেওয়া হল মদনের হাতে। মদন এরপর শুকটিকে শিখিয়ে দিল যাতে ভেলুয়া তার পুষ্প বনে চলে যায়, কেননা তার পুষ্প চুরি যাচ্ছে। ভেলুয়া চোর ধরতে কাননে গেল। সেখানেই মিলন হল মদনের সঙ্গে। মদন মাণিক্যের আংটি ভেলুয়াকে পরিয়ে দিল। ভেলুয়াও নিজ হস্তে মালতীর মালা গেঁথে মদনকে পরাল। মদন বাণিজ্য শেষে বাড়ী ফিরল। সঙ্গে তার ভেলুয়ার সারী, আর তার শুক রেখে গেল ভেলুয়ার কাছে। মুরারি যখন ছেলের মনের খবর পেল, তখন ঘটক পাঠাল কাঞ্চননগরে। কিন্তু মানিক সওদাগর বংশ মর্যাদার ওজুহাতে ভেলুয়ার সঙ্গে মদনের বিবাহ দিতে সম্মত হল না। মদন তখন পুনরায় বাণিজ্য যাত্রা করল, সঙ্গে নিল সলুকা দাসীকে। সলুকাকে সব শিখিয়ে সারীটিকে সঙ্গে দিয়ে পাঠাল ভেলুয়ার কাছে। সলুকা জানিয়ে গেল ভেলুয়াকে মদনের সঙ্গে গোপন মিলনের স্থান। উভয়ের মিলন ঘটলে মদন প্রস্তাব দিল ভেলুয়া যেন তার সঙ্গে সাগর যাত্রা করে, আরও জানাল ভেলুয়াকে না পেলে সে আত্ম বিসর্জন করবে। ভেলুয়া মদনের প্রস্তাবে সম্মত হল। ভেলুয়াকে নিয়ে মদন নিজের গৃহে উপনীত হল। কিন্তু তার পিতা মদনকে বিতাড়িত করল। মদন তখন ভেলুয়াকে নিয়ে হাজির হল রাংচাপুরে আবুরাজার কাছে।

মদনের কাছ থেকে হীরা, মণি, মাণিক্য পেয়ে আবু রাজা ত খুব খুশী। আবু রাজা যখন ভেলুয়ার রূপৈশ্বর্যের কথা শুনল, তখন সে ভেলুয়াকে পেতে আগ্রহী হল। রাজার নির্দেশ মত মদন গেল বিদেশে। আর পরামর্শ দিয়ে গেল ভেলুয়াকে বিপদে সে যেন বিষ পানে আত্মহত্যা করে। মদনের অনুপস্থিতিতে আবু রাজা ভেলুয়ার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে বিবাহ করার অভিলাষ জানাল। ভেলুয়া জানাল মদন তাকে চুরি করে এনেছে। সে তার পিতামাতা ও ভ্রাতাদের সংবাদ প্রেরণের জন্য বলল, কেননা এদের উপস্থিতি ব্যতীত বিবাহ সম্ভব হবে না তার পক্ষে। ভেলুয়া সলুকাকে নিয়ে উপস্থিত হল জৈতাশ্বরে ধনঞ্জয় সাধুর বাড়ী। এখানে যখন মদন উপস্থিত হল তখন তার প্রেমে

পড়ল ধনঞ্জয়ের কন্যা মেনকা। ওদিকে ধনঞ্জয় পুত্র হিরণসাধু ভেলুয়াকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হল। ধনঞ্জয় ভেলুয়ার সঙ্গে হিরণের বিবাহের ব্যবস্থা করল। মেনকার পরামর্শে ভেলুয়া তিনটি মাস সময় চেয়ে নিল। হিরণ বাণিজ্যের অছিলায় গিয়ে মদনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। হিরণের অভিপ্রায়ের কথা সারীকে শিখিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দিল ভেলুয়া। সারীর কাছ থেকে মদন হিরণের বিষয়ে সব অবগত হল। হিরণ মিলিত হয়েছিল মদনের সঙ্গে কিন্তু মদন হিরণকে ফাঁকি দিয়ে পালাল। এরপর সে হাজির হল ধনঞ্জয় সাধুর বাড়ী। এখান থেকে ভেলুয়াকে নিয়ে মদন যাত্রা করল। পথিমধ্যে দেখা একে একে মানিক সওদাগর ও তার পুত্রদের সঙ্গে, দেখা আবু রাজা, ধনঞ্জয় সাধু, হিরণসাধুর সঙ্গে। মদন ভেলুয়াকে নিয়ে আত্মরক্ষা করে চলল। শেষে ঝড় তুফানে হিরণ সাধু ডুবল। মেনকা ও ভেলুয়া জলে ডুবে এক বালুর চরে গিয়ে পৌঁছাল। তাদের রক্ষা করল এক ধার্মিক সাধু। কাঞ্চননগরে এবং জৈতাশ্বরে দুজনকে পৌঁছে দিতে গিয়ে সাধু আক্রান্ত হল আবু রাজার দ্বারা। মদন তখন ভেলুয়ার সন্ধানে রত, তার সঙ্গে ধার্মিক সাধুর সাক্ষাৎ হল, সে সব জানল। এদিকে মেনকা জানাল যে সে আবু রাজাকে বিবাহ করে তাকে হত্যা করে ভেলুয়াকে বাঁচাবে। ডোমনীর ছদ্মবে. . সলুকা আবুরাজার গৃহে গিয়ে ভেলুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ছক বুঝিয়ে দিল। সেইমত সাগরবক্ষে বিবাহ হবে বলে মেনকা আবুকে জানাল। আবু রাজা সেইমত সাগরবক্ষে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হল। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী মদনের গৃহের লোকজন, ভেলুয়ার বাড়ীর লোকজন সব হাজির হল। ভেলুয়ার পাঁচভাই আবু রাজার ডিঙ্গায় চড়ে বসল। মদনের নির্দেশে রাজা ও লোকজনকে বেঁধে নিয়ে—অলঙ্ঘ্যার চরে নিয়ে যাওয়া হল। রাজাকেও বাঁধা হল। মেনকা ও ভেলুয়ার সঙ্গে বিবাহ হল মদনের।

পালাটি সুদীর্ঘ। নানা ঘটনা ও চরিত্রে আখ্যানটি পূর্ণ। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে পালাটি করুণ রসাত্মক নয়. এটি মিলনাত্মক। তাছাড়া নায়ক একই সঙ্গে দুজনের পাণি গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ পালাটি দ্বৈত নায়িকা সম্বলিত। তুলনামূলকভাবে অবশ্য মেনকা অপেক্ষা ভেলুয়া সুন্দরী পালায় অধিকতর স্থান অধিকার করে আছে। আর যে বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ প্রয়োজন তা হল পালাটির রূপকথার পরিমণ্ডল। শুক ও সারী পাখী দুটিকে উপযুক্তভাবে আখ্যানে ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে কাহিনী মিলনাত্মক হওয়ার পেছনে পাখী দুটির ভূমিকা অনেকখানি। লোকসাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পুনরাবৃত্তিমূলক অংশের সংযোজন অন্যতম। আলোচ্য পালায় এই বৈশিষ্ট্যটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশেষত শুকের গানে এই বৈশিষ্ট্য অধিক পরিমাণে বিধৃত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে সংক্ষিপ্ততা ধর্ম রক্ষিত হয়েছে। যেমন—

একদিন দুইদিন কইরা
কইন্যার তিন মাস যায়।

সচরাচর গীতিকায় নায়ক-নায়িকার মিলনস্থল হিসাবে নদীর ঘাট বা পুকুর ঘাটকেই নির্বাচন করতে দেখা যায়। আলোচ্য পালায় নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন ঘটেছে কাঞ্চন

নগরের স্নানের ঘাটে। তবে প্রথম মিলন ঘটেছে কাননে। প্রথম মিলনের বর্ণনায় কবির সংযম গুণ আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। গভীর রাতে যখন সকলে নিদ্রাভিভূত, তখন কুসুম উদ্যানে মিলন হল দুজনের—'নিশি রাইতে ফুল তুলিতে দুইজনে মিলন হইল।' মালতীর মালা মদনের গলায় পরিয়ে দিয়েছে ভেলুয়া, আর মদন মাণিক্যের অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিয়েছে ভেলুয়াকে। উভয়ে উভয়ের কাছে নিজেদের আকর্ষণ অকপটে ব্যক্ত করেছে, কিন্তু কোথাও দৈহিক বিষয় বড় হয়ে ওঠে নি। দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, এই পালার গানটিতে বিশেষ কোনও কবিত্ব সম্পদ আছে বলিয়া মনে হয় না...ইহাতে কবিত্বেরও তেমনি কোনো নিদর্শন নাই।' কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে আমরা এর অন্যথাই লক্ষ্য করি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

ক. এইক্ষণে ত যইবন নদী বইছে উজানা।।

খ. তারা ভাইস্যা রইছে দেখে আশমান সাওরে।।

গ. আন্ধিতে বাইন্ধ্যা রাইখাছে পরভাতিয়া তারা।।

—সপ্তদশী মেনকা সুন্দরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। নায়িকাকে দেখে নায়কের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় বলা হয়েছে—

ঘ. গাঙ্গের জলে চাঁদ ভাসে দেখিতে পাইল।।
জলেতে ভাসিয়া রইছে পুন্নুমাসীর চান।

অপরপক্ষে নায়ক সম্পর্কে নায়িকার প্রতিক্রিয়া এইরূপ—

ঙ. আইজ কি রে পরভাতের ভানু ডিঙ্গা বাইয়া যায়।।

ভেলুয়ার সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে—

চ. আশ্‌মানেতে কালা মেঘ বে
যেমুন চান্দরে ঢাইক্যা রাখে।
ভাঙ্গা কেশ পড়ে যখন রে
সেইনা সৌন্দর্য কইন্যার মুখে।।

মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় কাব্যের নানাস্থানেই লভ্য। মদনকে দর্শনের পর ভেলুয়ার প্রথম প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় কবি বলেছেন—

মাতার নাই সে দিল কইন্যা হাসি নাইত মুখে।
মনের যত কথা কইন্যা মনে লুকায়্যা রাখে।।

মদন বিদেশে বাণিজ্যে গেছে, কবে ফিরবে, তা ভেলুয়া জানে না, এদিকে সে মদনের জন্য উন্মাদিনী প্রায়।—

জ্বালায়ে ঘিরের বাত্তি ফুঁ দিয়া নিবায়।
অইন্ধকারে থাকে কইন্যা আলোরে ডরায়।।

যে মদনের জন্য ভেলুয়া উদ্বিগ্ন, সেই বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে শুনে ভেলুয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, জলের ঘাটে একাকিনী যেতে পারছে না সে, কিন্তু অন্য কেই বা তার সঙ্গে যাবে, কি অজুহাতেই বা সে অসময়ে জলের ঘাটে উপস্থিত হবে—

এই মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে—

কেমনে যাই জলের ঘাটে কেবান যাইব সাথে।
কোন বা ছলে যাইব আমি ঐনা ঘাটের পথে।।

সমাজজীবনের কিছু কিছু প্রতিফলন পালাটিতে পড়েছে। সেকালে নৌ-বাণিজ্য যে খুবই প্রসার লাভ করেছিল তার প্রমাণ আমরা পাই। 'চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর', 'পবন ডিঙ্গা', 'মালদহের বৈঠালী' ইত্যাদির উল্লেখে যেমন নৌযানের বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে, তেমনি মালদহের বৈঠালীর সাহায্যে ডিঙ্গার গতি বৃদ্ধি করা হত তাও জানা যায়।

বিদেশ থেকে বাণিজ্য শেষে বণিকেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে নৌকাবরণ করার রীতি ছিল, রীতি ছিল 'ভরা' তোলার। ধার্মিক সওদাগর বাণিজ্যের শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে—

ধান্য দূর্বা লইয়া সাধুর যত পুরনারী।
ডিঙ্গা অর্ঘিবারে আইল কইরা ত্বরাতরি।।
পুষ্প চন্দন দিয়া ডিঙ্গার গলইয়ের উপর।
দুর্গা পদ্ম নাম কইর্য়া নোয়াইল শির।।
ভরায় তুলিয়া লইল রত্নাদি কাঞ্চন।

ডোমনীরা খারি অর্থাৎ ফুলের সাজি, পাখা ইত্যাদি বিক্রয় করে বেড়াত। সলুকা ডোমনীর ছদ্মবেশে আবু রাজার গৃহে উপস্থিত হয়ে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছিল—

খারি বিউনি বিকাইয়া দেশে দেশে ফিরি।।

অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ চৌদোলার ব্যবহার করতেন খুব। আবুরাজা যখন জেনেছে তার লোকজন এমন ডিঙ্গা আটক করেছে যেখানে দুটি সুন্দরী রমণী হয়েছে—

এই কথা শুইন্যা রাজা চৌদোলা লইয়া।
ঘাটেতে আইল রাজা ঝট্‌তি করিয়া।।

অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথার চল ছিল। তার প্রমাণ মেলে মদনের মেনকা ও ভেলুয়াকে বিবাহ করার ঘটনায়, প্রমাণ মেলে আবুরাজের পঞ্চশত স্ত্রী থাকার ঘটনায়—

শুন শুন মদন সাধু কই যে তোমারে।
পঞ্চশত সোন্দর নারী আছে আমার ঘরে।।

অভিজাত শ্রেণীর মানুষ 'পাঁচখণ্ড বাড়ীর' অধিকারী হতেন। এদের থাকত সদর বাড়ী, পূজা বাড়ী, অন্দর মহল, রান্নাবাড়ী ও গোহাল বাড়ী। কাঞ্চন নগরের মানিক সওদাগরের গৃহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

পাঁচখণ্ড বাড়ী তোর সোনাতে বান্ধিয়া।
বড়ো বডো ঘর সাধু রাইখ্যাছে ছান্দিয়া।।

কৌলীন্যপ্রথা সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছিল। মানিক সওদাগর কুলীন বলে অত্যন্ত

শ্লাঘাবোধ করত--

চান্দসদাইগরের বংশ সাধু জাতিতে কুলীন।
বংশের গৌরবে সাধু অন্যরে ভাবে হীন।।

মদনের সঙ্গে ভেলুয়ার বিবাহের প্রস্তাব মানিক সওদাগর খারিজ করেছিল, শুধু মদনের বংশ হীন এই যুক্তিতে--

বণিক বংশেতে আমি সবার কুলীন।
অকুলীনে কইন্যা দিলে জাতি হইব হীন।।
কত পরস্তাব আইল যেন মন নাই সে উঠে।
এই বংশে কইন্যা দিলে মোর বংশ টুটে।।

সমাজে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকত ঘটক, পুরোহিত, নাপিত। জমির মাপ ছিল 'পুরা'র হিসাবে, ১৬ বিঘায় ১ 'পুরা' হত। আব্র রাজা মদনকে বলেছে তার মনের মতন কন্যা এনে দিতে পারলে সে মদনকে দেবে সোনা দিয়ে বাঁধান ঘর, সুন্দরী রমণীর সঙ্গে তার হবে বিবাহ, আর--

বাইশ পুরা জমিন দিবাম তোমারে লিখিয়া।

জলাশয়ের মধ্যে গ্রীষ্মাবাসের নাম ছিল 'জলটুঙ্গি'। কোনো বিষয়ে জনগণকে জানাতে ঢেঁড়া পেটানোর রীতি ছিল। কড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম ছিল। পান খাওয়ার রীতি ছিল খুব। অভিজাত পরিবারে ব্যবহৃত হত সোনার বাটা, রুপার বাটা। সোনার বাটায় 'গাইষ্ট্য খিলা' রক্ষিত হবার কথা বর্ণিত হয়েছে--

সোনার বাটার গাইষ্ট্য খিলা রূপার বাটায় পান।

ধান মাপার এক ধরনের বেতের পাত্র ছিল, তার নাম 'কাঠা'--

কাঠায় মাইপ্যা তুলে ধান রে আচরিত কথা।

এইবার চরিত্র চিত্রণের প্রসঙ্গ। নারী চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ভেলুয়া ও মেনকার কথা।

**ভেলুয়া**

কাঞ্চননগরের বিত্তবান বণিক মানিক সওদাগরের কন্যা ভেলুয়া। অপরূপ লাবণ্যময়ী সে। কবি তার রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'নদীর ঘাটে চলে কন্যা অগ্নির সোমান।'-- সেই সতের বৎসরের কন্যা ভেলুয়া প্রেমে পড়ল মদনের। মদনের চিন্তাতেই সে বিভোর। এদিকে মানিক কুলের গৌরবের দোহাই দিয়ে মদনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত। প্রেমের টানে গভীর রাতে একাকিনী ভেলুয়া কুসুম কাননে উপস্থিত হয়েছে, মিলিত হয়েছে মদনের সঙ্গে। মালতীর মালা দিয়ে তাকে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছে। অকপটে সে মদনকে জানিয়েছে--

বিয়া তুমি কর না কর সেই যে তোমার দায়।
আমার মন বান্ধা পইড়াছে তোমার রাঙ্গা পায়।।

মদনের প্রস্তাবে ভেলুয়া এককথায় পিতা মাতা, সখী, সম্পদ সর্বস্ব ত্যাগ করে মদনের সঙ্গে অনিশ্চয়তার পথের পথিক হয়েছে। সে তার আচরণ সমর্থন করে বলেছে—

কুলীন বাপে না দিল বিয়া তার কুলের মুখ চাইয়া।
পরাণ পতির সঙ্গে যাই আইজ আমি ধর্মেরে রাখিয়া।।

সে যে কুলত্যাগিনী হচ্ছে, এতে বংশ মর্যাদাব হানি ঘটবে, এ সম্পর্কেও সে ছিল সচেতন—

বাপ ভাইরে নাই সে কইলাম কুলে দিলাম কালি।

পতির জন্য কুলত্যাগিনী হলেও ভেলুয়া অকৃতজ্ঞ ছিল না, গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করে যাবার প্রাক্কালে সে কাঞ্চননগরের সব বন্ধুদের কাছে মনে মনে বিদায় প্রার্থনা করেছে—

সবার কাছে বিদায় মাগি আইজ নিশীথে গোপন।।

সে অঙ্গীকার করেছে, 'আমি না হইব অসতী'। পরবর্তীকালে সে একের পর এক প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছে। রাংচাপুরের আবুরাজা তাকে তার পাটরাণী করতে চেয়েছে। কিন্তু ভেলুয়া বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আবুরাজাকে প্রতিহত করেছে। বাপ-ভায়েদের আগে আনবার ব্যবস্থা করতে বলেছে সে, তবে সে বিবাহে সম্মত হতে পারে। এইভাবে সময় নিয়ে সে আবুরাজার বাড়ী থেকে পালিয়ে উপস্থিত হয়েছে ধনঞ্জয় সাধুর গৃহে। কিন্তু এখানেও হিরণ সাধু তাকে পেতে চেয়েছে। সে যে দুঃখ করে বলেছে 'রূপ হইল বৈরীরে আমার যইবন হইল কাল'—তা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। শত্রুপক্ষ যখন তাকে ও মদনকে ঘিরে ফেলেছে, নিরুপায় হয়ে ভেলুয়া সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়েছে আত্মঘাতিনী হবার অভিপ্রায়ে। তার সখী-প্রীতিও অকৃত্রিম। তাই যখন মেনকা ভেলুয়াকে উদ্ধার লাভে সহায়তা করার জন্য আবুরাজাকে বিবাহ করার পরিকল্পনা করেছে, তখন সে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছে—

তরে না করিতে দিবাম্ দুশমনেরে বিযা।।

ভেলুয়া তার অকৃত্রিম সখীপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে মেনকাকে সতীনরূপে মেনে নিয়ে।

**মেনকা**

মেনকা ধনঞ্জয় সাধুর কন্যা এবং হিরণ সাধুর ভগিনী। সেও ভেলুয়ারই সমবয়সী। তারও অপূর্ব যৌবনশ্রী। তাদের গৃহে ভেলুয়া আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে দুজনের খুব ভাব। কবি যথার্থই বলেছেন—

দুইজনে মনে প্রাণে এক হইয়া গেল।।

একত্র আহার, শয়ন, ভোজন সবকিছুই তাদের। 'এক অঙ্গ হইল যেমুন তারা দুজনায়।' ভেলুয়ার প্রতি আসক্ত হয়েছে হিরণ, মেনকা কিন্তু তার সখীর স্বার্থই দেখেছে, সে ভেলুয়াকে সতর্ক করে দিয়েছে : 'দুরন্ত দুশমন্ ভাই তোমার রূপেতে

মজিলা'। ধনঞ্জয় তার পুত্রের সঙ্গে ভেলুয়ার বিবাহের প্রস্তুতি নিলে মেনকা পিতাকেও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই দেয়নি—

বুড়াকালে বাপ আমার হইল বাহাত্তরা।
পুত্রের মন রাইখ্‌তে বাপ হইল জ্ঞানহারা।।

সেই ভেলুয়াকে হিরণের হাত থেকে বাঁচাতে বিবাহের জন্য তিনমাস সময়ের প্রার্থনা করিয়েছে, হিরণ যে বাণিজ্যের ছুতায় গিয়ে মদনকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছে, তাও সে জানিয়ে দিয়েছে। ভেলুয়া আত্মঘাতিনী হবার জন্য সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করতে মেনকাও জলে ঝাঁপ দিয়েছে। রাংচাপুরের আবুরাজার হাত থেকে ভেলুয়াকে রক্ষা করতে সে আবুকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়েছে। বন্ধুর জন্যে এত বড় ত্যাগ স্বীকার সচরাচর দেখা যায় না। সে সর্বদা ভেলুয়াকে রক্ষা করে এসেছে। এজন্য নিজেকে বিপন্ন করতেও তার বাধেনি। শেষপর্যন্ত সে তার ভালবাসার মানুষ মদনকেই পতিরূপে পেয়েছে, ভেলুয়াকে পেয়েছে সতীনরূপে। এইভাবে দুই সখীর বন্ধুত্ব অটুট রাখার ব্যবস্থা করেছেন কবি। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক যথার্থই মন্তব্য করেছেন,—

'এই পালার আর একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য, একই নায়কের দুই নায়িকা ভেলুয়া ও মেনকার পরস্পরের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য।...নারী চরিত্রে সপত্নীর মধ্যে এই ভাব সুদুর্লভ।'

**মদন সাধু**

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় পালাটির নায়ক মদন সাধুর। সে মুরারি সাধুর পুত্র। বয়স মাত্র একুশ। অপূর্ব দর্শন সে। ভেলুয়াকে দেখা পর্যন্ত সে ভেলুয়াগত প্রাণ হয়ে পড়ে। ভেলুয়ার পিতা তার সঙ্গে বিবাহদানে অসম্মত হলে সে ভেলুয়াকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। পিত্রালয়ে স্থান হয়নি তার। ভেলুয়াকে নিয়ে সে যাযাবরের মত স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করেছে। ভেলুয়ার রূপৈশ্বর্যের কারণে সে বারংবার বিপদে পড়েছে। বন্ধু, আশ্রয়দাতা সকলেই তার শত্রু হয়েছে। সলুকা দাসী আর একটি শুক পাখীকে অবলম্বন করে সে একটির পর একটি বাধা অতিক্রম করেছে। শেষপর্যন্ত সে তার প্রেয়সী ভেলুয়াকে লাভ করেছে, অন্য পালাগুলির নায়কের মত তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়নি। সে তার প্রতি আসক্তা মেনকাকেও বিবাহ করেছে।

**মদন**

মদন যে অতিশয় বুদ্ধিমান তার পরিচয় মেলে আবু রাজার কবল থেকে মেনকা ও ভেলুয়াকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা রচনার মাধ্যমে। তাছাড়া সে অকৃতজ্ঞ নয়, যে ধার্মিক সাধু মেনকা ও ভেলুয়াকে বাঁচিয়েছিল এবং তাদেরই কারণে তার যথাসর্বস্ব আবু রাজার কাছে হারিয়েছিল, মদন তাকে তার চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন সহ শুধু প্রত্যর্পণ করেনি, প্রণামও করেছে।

**মুরারি সাধু**

মদন সাধুর পিতা মুরারি সাধু। খুবই আদর্শবান ও নীতিনিষ্ঠ মানুষ। তাই পুত্র মদন সাধু ভেলুয়াকে নিয়ে পালিয়ে এলে সে তাদের গ্রহণ করেনি। মুরারি ভেলুয়ার পিতার কাছে পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। সেই অপমানবোধ তার মনে ছিল। তাই সে অপমানকারীর কন্যাকে পুত্রবধূ বলে মেনে নিতে পারেনি। তাছাড়াও মদন ভেলুয়াকে চুরি করেছিল, তাই মুরারি বলেছে :

হেন পুত্তুর না চাই আমি অপুত্রক ভালা।
তোমার জন্মেতে আমার বংশ হইল কালা।।

সে আরও নির্দেশ দিয়েছে—যার কইন্যা তারে দেও শীঘ্র যাও লইয়া।

মানিক সাধুর ছিল কুল মর্যাদা বোধ প্রবল। তাই মদনের সঙ্গে তার কন্যা ভেলুয়ার বিবাহের প্রস্তাবে সে সম্মত হতে পারেনি। চাঁদ সওদাগরের বংশধর সে, মনসার সেবক। বণিক সমাজে সেই কুলীন, তার ভাষায়—

বণিক বংশেতে আমি সবার কুলীন।
অকুলীনে কইন্যা দিলে জাতি হইব হীন।।

**আবু**

রাংচাপুরের রাজা আবু। অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ সে। তার ভয়ে বাঘ ও মহিষ এক কূয়ার জল খায়। সে নাস্তিক। ধন দৌলত এবং পরস্ত্রী হরণ করাই তার কাজ। বিশেষ করে সে নারীদেহ ভোগী—

পঞ্চশত সোন্দর নারী আছে তার ঘরে।
পরের ঘরের সোন্দর নারী তেও চুরি করে।।
যেইখানে শুনে রাজা আছে সোন্দর নারী।।
চরলোক পাঠাইয়া আনে তারে ধরি।।

সে বিপদাপন্ন মদন ও তার ভাবী স্ত্রী ভেলুয়াকে আশ্রয় দিয়েছে, আবার ভেলুয়াকে বিবাহ করার জন্য অনায়াসে প্রয়াসী হয়েছে। কর্তব্যচুতি ঘটাতে তার বাধেনি।

**হিরণ সাধু**

ধনঞ্জয় সাধুর পুত্র হিরণ সাধু সে মদনের বন্ধু। বিপদাপন্ন বন্ধুর ভাবী পত্নী ভেলুয়া তাদের আশ্রিতা। সেই আশ্রিতাকে পাবার আশায় হিরণ বন্ধুকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছে এমনই অমানুষ সে।

## দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি' পালাটি সংকলিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র পালাটির সুদীর্ঘ ভূমিকায় বিশেষভাবে এটির ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি জঙ্গলবাড়ীর মুসলমান

দেওয়ান বংশের আদিপুরুষ রাজা ধনপৎ সিং থেকে শুরু করে এই বংশের রহিম নেওয়াজ খাঁ ও এলাহা নেওয়াজ খাঁ অর্থাৎ শেষতম বংশধরের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। দীনেশচন্দ্র 'ঈশা খাঁ মসনদালি' সম্পর্কিত তথ্যাদির জন্য নির্ভর করেছেন আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরী, ঢাকার ভূতপূর্ব সিভিল সার্জন ডাক্তার ওয়াইজ লিখিত ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ঈশা খাঁ সম্পর্কিত প্রবন্ধ, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত স্টেপলটন সাহেব লিখিত 'সপ্তদশ শতাব্দীর সাতটি কামান সম্বন্ধে সমালোচনা' শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধ, 'মসনদালি ইতিহাস' ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থ ইত্যাদির ওপর। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদিতে এবং ঐতিহাসিকদের বক্তব্যে কিন্তু ঐকমত্য লক্ষিত হয় না। নানা বিরোধ এবং স্ববিরোধিতা এসবে সুস্পষ্ট। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পালাটির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সুবিস্তৃত জ্ঞানলাভের তেমন বাধ্য বাধকতা নেই, কেননা সেই জ্ঞান পালাটির রসাস্বাদনের জন্য অপরিহার্য নয়। যাঁরা রচয়িতা এবং যাঁরা শ্রোতা—উভয়পক্ষই সাহিত্য রস পরিবেশন ও সাহিত্যের রসাস্বাদনকেই মুখ্য কর্তব্য অথবা উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। তথাপি আমরা এটুকু মনে রাখলেই পালাটি আস্বাদনের পক্ষে যথেষ্ট হবে যে ঈশা খাঁর পিতা হলেন কালিদাস গজদানী। কালিদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সুলেমান খাঁ নামে পরিচিতি অর্জন করেন। তিনি এক মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঈশা খাঁর হিন্দু পত্নীর গর্ভে দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এরা হল যথক্রমে আদম ও বিরাম।

অপরাপর গীতিকার মতই আলোচ্য গীতিকাতেও প্রেমকেই মুখ্য উপজীব্য করা হয়েছে। তবে অন্যান্য গীতিকাব সঙ্গে আলোচ্য পালার এই ব্যাপারে মূল পার্থক্য হল পালাটিতে উপস্থাপিত নারী চরিত্রগুলি তাদের মনোমত পাত্রদের বিবাহ করার জন্য যে আচরণ করেছে, তাতে যেন অনেক পরিমাণে তাদের নির্লজ্জতাই সূচিত হয়েছে। এই ব্যাপারে তাদের শালীনতা বোধের অভাব সুপ্রকট।

পালাটি ঈশা খাঁকে নিয়ে অথচ তার এক পূর্বপুরুষ ধনপত্ সিং, পিতামহ ভগীরথ এবং পিতা কালিদাস প্রসঙ্গে সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষত: ঈশা খাঁর পিতা কালিদাসকে কৌশলে ধর্মান্তরিত করা এবং মমিনা খাতুনের সঙ্গে তার বিবাহের প্রসঙ্গটি দীর্ঘায়িত হওয়ায় কাহিনীর আকর্ষণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে।

ক্ষেত্রবিশেষে কবি আতিশয্য দোষ ঘটিয়েছেন লক্ষিত হয়। যেমন করিমুল্লার বীরত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

কান্ধেতে আছয়ে মিয়াঁর গদা বিশমণি।।

করিমুল্লার ভোজন বর্ণনায় মঙ্গলকাব্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। এই বর্ণনাও আতিশয্য দোষে দুষ্ট :

একমন চিড়া দিল পনর সের চিনি।
আর দিল দুই মণ দই কিইন্যা আনি।।
লবণ সম্মুখে দিল একসের আনিয়া।

এরে দিয়া খাইল বীর পেট ত ভরিয়া।।

কেদার রায়ের দুই কন্যা যেভাবে আদম এবং বিরামকে বলি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে তাও এক কথায় অভাবনীয়—

এমন সময় কইন্যারা কোন কাম করিল।
খাণ্ডার বাড়ি দিয়া তাবে ভূমিত ফালাইল।।
বালিকারে মাইরল পরে মারে আর জনে।
এরে দেইখ্যা পলায় লোক জঙ্গলায় আর বনে।।
এইমতে দুই বইনে কুমার রারে বাঁচাইয়া।
খাণ্ডা হাতে দরজার মধ্যে থাকে খাড়াইয়া।।
যেই যায় কুমারগণের বধের কারণ।
খাণ্ডা বাড়ি দিয়া তার মারয়ে পরাণ।।

কেদার রায়ের কন্যাদ্বয় তাদের পিতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে এবং পিতার বিরুদ্ধাচবণ করেছে তা অভাবনীয়, পিতাকে তারা শত্রু বলেছে যেহেতু কেদার তাদের মনের মানুষদের বন্দী করেছিলেন, শাস্তি দিয়েছিলেন। এমনকি আত্মগোপনকারী পিতার গোপনস্থানের হদিস তারা দিয়েছে এবং পিতাকে হত্যা করার জন্য করিমুল্লাকে প্ররোচিত করেছে।

শুন করিম বীর।
এমন শত্রু না রাখিবা যদি সে হয় পীর।।
এই শত্রু থাকে যদি দুনিয়ার মাঝারে।
কোনদিন সর্বনাশ করে আর কারে।।
আমরা জানি কোথায় দুষ্টু আছে পলাইয়া।
নিজহাতে গিয়া তুমি আসহ মারিয়া।।
শত্রু আইলে সেই দুষ্টু না থাকে জমিনে।
পাতালে এক বাড়ী আছে খসুয়ার বনে।।
উপরে জঙ্গল নীচে সুন্দর দালান।
তার মধ্যে থাইক্যা দুষ্টু বাঁচায় পরাণ।।

আতিশয্যের প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে হয়। ঈশা খাঁ বনে আত্মগোপন করে থাকার সময়ে তার সঙ্গের বিড়ালটিকে খ্যদ্যান্বেষণে ছেড়ে দিলে দেখা গেছে ইঁদুর বেড়ালকে মারতে উদ্যত হয়েছে—

বিলাইতে ধইরতে যায় যখন উন্দুরে
উন্দুরে ধরিয়া তুথায় বিলাইরে মারে।।

কালিদাস মন্তব্য করেছেন :

যেই ঈশ্বর সেই আল্লা এক কইর‍্যা মানি।
কথায় আর কাজে কেনে করি দুইখানি।।

একথা ঠিকই যে কালিদাস এই মন্তব্য করেছেন ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর, তথাপি তার এই মন্তব্যের গুরুত্বকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। ধর্ম সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনে কালিদাসের বক্তব্য বিশেষভাবে তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিফলনও পালাটিতে লক্ষণীয়। আমরা ষোড়শ শতাব্দীর মৈমনসিংহ জেলায় প্রচলিত আচার-আচরণ, গৃহসজ্জা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। জঙ্গলবাড়ীতে ঈশা খাঁর 'বাঙ্গলা ঘর' নির্মাণের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তা থেকে মৈমনসিংহতে বাঙ্গলা ঘর নির্মাণের রীতি সম্পর্কে জানা যায়। বাঙ্গলা ঘরগুলির ছাদ ময়ূর, সারস ও মাছরাঙা পাখীর পালকে সজ্জিত করা হত—তাছাড়া গৃহ সজ্জায় আয়নার ব্যবহারও ছিল—

ভিতর আঙ্গিনায় মিয়াঁ যত ঘর বান্ধিল।
মাছরাঙ্গার পাখ দিয়া ঘরের ছানি দিল।।
আয়না দিয়া সাজাইল যত ঘরখানি।
ঝিলমিল ঝিলমিল করে যত শাল কাঠের ঠুনি।।
দুধবগার পাখে ছাইল বাইর আঙ্গিনা।
বাড়ীর চাইর দিগে পরে কাটিল গাঙ্গিনা
বার বাঙ্গলা ঘর ছাইল ময়ূরের পাখে।
দরবারের বেলা মিয়া সেই ঘরে থাকে।।

সেকালে বড় বড় নৌকাকে 'কোশা' বলা হত। পালায় উল্লিখিত হয়েছে ঈশা খাঁর কোশা প্রসঙ্গে—

পবনের মতন কোশা চলে দাঁড়ের টানে।

কোশার বর্ণনায় আতিশয্য ঘটলেও, সে যুগে মৈমনসিংহ নৌ-শিল্পে যে বিশেষ অগ্রসর হয়েছিল সে পরিচয় মেলে—

সাড়ে সাত হাজার হাত দীর্ঘ তার ছিল।
ফাড়ে হাজার হাত উচা পঞ্চাশ দিল।।
দুই হাজার দাঁড়ি আছিল সেই নায়ের।

অভিজাত মুসলমান মহিলা এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবকদের পরিধেয় বস্ত্রাদি সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে—

কইন্যারে পরাইল ইরাণের শাড়ী।
সাজিল দুই বইন আর কত জোর পরি।।
*   *   *
আদম বিরাম সাজে কিবা মরি হায়।।
*   *   *
মিশরের কুর্তা গায় দিল ত তাদের।
টুপি পরাইল আনি আরব দেশের।।

পারসীর জুতি পরে দিল তারা পায়।
কস্তুরী কুঙ্কুম আতর কত যে ছিটায়।।

সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল প্রকট। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বৈবাহিক সম্বন্ধ রচনা সহজ ছিল না। তাই কালিদাসকে মমিনা খাতুন বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি পত্রপাঠ তা নাকচ করে দিয়েছেন প্রচলিত সামাজিক রীতির প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে—

আমি হই হিন্দু আর তুমি মুসলমান।
সাদী কেমনে হইব নইলে সমানে সমান।।

কালীমূর্তির সম্মুখে নরবলি দানের রেওয়াজ সম্ভবত প্রচলিত ছিল। সেইজন্যই কেদার রায় ঈশা খাঁর পুত্রদ্বয়কে কালী বাড়ী নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল—

কালী বাড়ীত্ নিয়া পরে দিত তারার বলি

অলঙ্কারের মধ্যে ব্যতিরেক ও উৎপ্রেক্ষার প্রাধান্য চোখে পড়ার মতন—

ক. ঝিলিমিলি করে রূপ জিনিয়া তপন
খ. রূপে ত জিইন্যাছে দেওয়ান রতির মদন
গ. পরিগণ হাইর মানে কইন্যার রূপের কাছ
ঘ. হাত-পায়ের গোছা যেমন গজারির ঠুনি
ঙ. পাও দুইখান গোলগাল যেমুন কলাগাছ
চ. চৌখ্ জিনিয়া যেন মিরিগের নয়ান.
ছ. মুখখানি যেমুন কইন্যার পুন্নুমাসীর চান্।

প্রবাদের ব্যবহারে আমরা বাস্তবতাবোধ ও দার্শনিক প্রতীতীর পরিচয় পাই—

ক. দুনিয়ার যত চিজ সব মিছা হয়।
জন্মিলে মরণ সেই হইব নির্চয়।
খ. বড়োর মান বড়োয় জানে অন্যে জাইনব কি।
কুত্তায় না জানে ভাইরে, কিবান চিজ্ ঘি।।

কিংবা

গ. স্তিরী বল পুত্র বল গর্ভসোদর ভাই।
আইন্যা দিলে খাউয়া আছে সঙ্গে যাউয়া নাই।।

মৈমনসিংহ অঞ্চলের সর্বপ্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র ঈশা খাঁকে নিয়ে গীতিকাখানি রচিত হলেও কবিত্বশক্তি বিরহিত ঘটনার তালিকায় পর্যবসিত হয়েছে গীতিকাটি।[২২]

এইবার পালাটিতে উপস্থাপিত কয়েকটি চরিত্রের আলোচনায় ব্রতী হতে পারি।

## কালিদাস

ভগীরথের পুত্র কালিদাস। ইনি ছিলেন দেওয়ান। অতিশয় সুপুরুষ এবং ধার্মিক। দানশীলতাব জন্য কালিদাসের খ্যাতি ছিল খুব। আর এ ব্যাপারে তার কোন বাছবিচার

ছিল না। সোনার হাতী দান করার সুবাদে তার নাম হয় 'কালিদাস গজদানী'। গৃহে তার দোল-দুর্গোৎসব লেগেই থাকত। কেউ কখনও তার কাছে প্রার্থী হয়ে গিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসত না। নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েও হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদজ্ঞান তার ছিল না।—

হিঁদু-মুসলমানে তানার ভেদ কিছু নাই।
সগ্‌গলরে সোমান দেখে হিংসা তার নাই।।

কালিদাস ছিলেন অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। প্রবাসী সম্ভ্রান্ত অতিথি তাঁর গৃহে উপস্থিত হলে তিনি তার প্রতি উপযুক্তভাবে আতিথ্য করতেন।

জেলালউদ্দিনের কন্যা মমিনা খাতুন কালিদাসের প্রতি অনুরক্ত হল। সে কালিদাসকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিল। কিন্তু কালিদাস এই প্রস্তাবে তার সম্মতি দিলেন না। কোনমতেই ধর্ম পরিত্যাগে রাজি নন। রূপৈশ্বর্যের কারণে তিনি জাত খোয়াতে সম্মত হলেন না।—'রূপের লাগিয়া আমি জাতি নাই সে দিব।'

কালিদাসের ছিল ধর্মভয়। তাই তার বিশ্বাস ছিল মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করলে ধর্মচ্যুত হবেন। ধর্মভ্রষ্ট হলে—'সাত জন্ম যাইব আমার দুজক ভুগিয়া।" মমিনা খাতুন তখন কৌশলে কালিদাসকে গোমাংস ভক্ষণ করাল। বেচারী কালিদাস যখন তার নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণের কথা জানতে পারলেন, তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তার মধ্যে। জেলালউদ্দিন তখন কালিদাসকে তার কন্যার পাণি গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন এবং জানালেন তাঁর সমস্ত ধনদৌলতের অধিকারী হবেন কালিদাস। কালিদাস এবারে তার বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। তিনি অনুধাবন করলেন হিন্দুত্ব নষ্ট হয়েছে বলে মূল্যবান জীবন নষ্ট করতে পারেন না, বিশেষত ঈশ্বর ও আল্লার মধ্যেকার অভিন্নতা স্মরণ করে তিনি মুসলমান হলেন এবং মমিনা খাতুনকে বিবাহ করে নবাবগিরি করায়ত্ত করলেন। তার নাম হল দেওয়ান ছোলেমান। পনের বছর নবাবী করে ছোলেমান মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

### ঈশা খাঁ

কালিদাস গজদানী ওরফে সুলেমান খাঁর দ্বিতীয় পুত্র ঈশা খাঁ। দাউদ খাঁর মৃত্যুর পর ঈশা খাঁ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রজাবৎসল ছিলেন তিনি, 'জান দিয়া পালে পরজা পুত্রের সমান'। দিল্লীর বাদশার প্রাপ্য নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত অনির্দিষ্ট অর্থের দাবী ঈশা খাঁ মানতে অসম্মত হলে শুরু হল বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ। বাদশাহ ফৌজদার শাহাবাজ খাঁকে পাঁচ কাহন সৈন্য সহ গৌড়ে প্রেরণ করলেন। ঈশা খাঁ পর্যুদস্ত হয়ে প্রথমে চট্টগ্রামে এবং এখান থেকে ঢাকায় পলায়ন করলেন। আশ্রয় নিলেন জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলের কোচজাতীয় রাজা রাম-লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করে ঈশা খাঁ নিজের অধিকার কায়েম করেন। জঙ্গলবাড়ীতে তিনি অধিষ্ঠিত হন এবং ক্রমেই ফৌজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকেন, বৃদ্ধি করতে থাকেন নিজের রাজত্বের সীমানা। দিল্লীর বাদশাহের তরফে স্বয়ং মানসিংহ উপস্থিত হলেন ঈশা খাঁকে জব্দ করতে। ঈশা খাঁ চতুর, তিনি

বুঝেছিলেন মানসিংহের সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না, তাই ক্রমান্বয়ে বুকাই নগর, সেরপুর, দেওয়ান বাগ প্রভৃতি স্থানে আত্মগোপন করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য মানসিংহের হাতে বন্দী হলেন তিনি। প্রেরিত হলেন দিল্লীতে। মানসিংহ সম্রাট আকবরের কাছে ঈশা খাঁর বীরত্ব সম্পর্কে অকপটে বলেছেন :

কত জঙ্গে লইড়্যাছি আমি কত পালোয়ানের সনে।
ইশা খাঁর মতন বীর না পাইলাম রণে।।

মানসিংহের পরামর্শে আকবর বন্দী ঈশা খাঁকে মুক্তি দিলেন। মুক্তিলাভ করে ঈশা খাঁ কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে সম্রাটের চরণস্পর্শ করে ক্ষমাভিক্ষা চাইলেন।

মুক্তি পায়্যা ঈশা খাঁ বাদশাহ চরণ ধরিল।
ভূমিত পইড়্যা পরে ক্ষেমা ভিক্ষা যে চাইল।।

ঈশা খাঁর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট আকবর তাঁকে বাইশ পরগণার 'মসনদালী' খেতাব দিলেন। দিল্লী থেকে কোশা করে প্রত্যাবর্তনের সময় শ্রীপুরের কেদার রায়ের ভগ্নী সুভদ্রার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। সুভদ্রা আসক্ত হল ঈশা খাঁর প্রতি। সুভদ্রারই পরামর্শ মত নির্দিষ্ট দিনে স্নানরতা সুভদ্রাকে অপহরণ করে নিয়ে গেলেন ঈশা খাঁ। সুভদ্রার সঙ্গে ঈশা খাঁর বিবাহ হল। সুভদ্রার নাম হল নিয়ামত জান। নিয়ামত জানের গর্ভে ঈশা খাঁর দুটি সন্তানের জন্ম হল। আদমের বয়ঃক্রম যখন পনের, তখন ঈশা খাঁর মৃত্যু হল।

### কেদার রায়

কেদার রায়ের ভগিনী সুভদ্রাকে অপহরণ করে ঈশা খাঁ তাকে বিবাহ করায় কেদার রায় ঈশা খাঁর ওপর যার পর নাই অসন্তুষ্ট হন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন—

থাকহ আশমানে কিবা যদি পানির তলাতে।
ধইরবাম তোমারে আমি পাই যেখানেতে।।
তরে যদি না পাই বংশ পাইবাম তর।
লইবাম মনের দাদ সেইসময় মোর।।

সত্যসত্যই সেই প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ কেদার রায় পেলেন যখন শুনলেন ঈশা খাঁর মৃত্যু হয়েছে। চোদ্দখানি তরণী নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন জঙ্গলবাড়ীতে ভগ্নীর কাছে। মিথ্যা করে তিনি ঈশা খাঁর মৃত্যু সংবাদে তাঁর দুঃখিত হবার কথা জানালেন। বললেন তাঁর দুটি ভাগিনেয় হওয়ার সুসংবাদেও তিনি প্রীত। স্বীকার করলেন ঈশা খাঁ তাঁর তুলনায় অধিকতর ধনী ছিলেন। এরপর তিনি জানালেন তাঁর দুটি কন্যার সঙ্গে দুটি ভাগিনেয়র বিবাহ দিতে তিনি উৎসুক। নিয়ামত জান জানাল কেদার রায় কিরূপে তার ভাগিনেয়দের সঙ্গে নিজের কন্যাদের বিবাহ দেবেন। কেদার রায় তাঁর প্রকৃত মনোভাব গোপন রেখে জানালেন—'মুছুলমানে মামার কইন্যা বিয়া কইরতে পারে'। কিন্তু নিয়ামত জান ভাইয়ের প্রকৃত অভিসন্ধি অনুমান করে কেদার রায়ের ইচ্ছামত আদম ও বিরামকে

তাঁর গৃহে প্রেরণ করতে অনীহা প্রকাশ করলে কেদার রায় অন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিলেন। জঙ্গলবাড়ীর সকলকে তিনি ভোজে আমন্ত্রণ করলেন আমন্ত্রিত হল আদম ও বিরামও। এদের তিনি কৌশলে নিয়ে গেলেন শ্রীপুরে এবং দু'ভাইকে বন্দী করে পাথর চাপা দিয়ে রাখলেন। করিমুল্লা আদম ও বিরামকে উদ্ধারের জন্য শ্রীপুরে সসৈন্যে উপস্থিত হলে কেদার রায় দুই ভাগিনেয়কে কালীর সামনে বলি দেবার আদেশ দিলেন। জঙ্গলবাড়ীর ফৌজদারেরা শ্রীপুর অবরোধ করলে কেদার রায় পলায়ন করে খসুয়ার বনে আত্মগোপন করলেন। কিন্তু তাতেও তিনি রেহাই পেলেন না। করিমুল্লার হাতে মৃত্যু বরণ করলেন।

### মমিনা খাতুন

জেলালউদ্দিনের কন্যা মমিনা খাতুন। অপরূপ সুন্দরী সে। একদিন সে কালিদাসকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেল। এই একবার দর্শনেই সে কালিদাসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। কালিদাসের জন্য সে খাওয়াদাওয়া ত্যাগ করল। রাতের ঘুমও তার চলে গেল। সরাসরি সে কালিদাসের কাছে তার মনোভিলাষ জানিয়ে পত্রপ্রেরণ করল। লিখল—

তোমার যে বান্দী হইয়া কাটাই জীবন।
তুমি যে হইলা আমার অন্ধের নয়ান।।

কিন্তু কালিদাস মমিনা খাতুনকে বিবাহ করতে সম্মত হল না যেহেতু সে হিন্দু সেই অজুহাতে। কিন্তু মমিনা খাতুন নাছোড়বান্দা। সে যা পণ করে, তার জন্য কোন কিছু করতেই তার বাধে না। সে কালিদাসের জাত নষ্ট করার চক্রান্ত করল। কালিদাসের রাঁধুনির সঙ্গে যোগাযোগ করল। তাকে সুন্দরী স্ত্রী এবং ১৬ বিঘা জমি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে কালিদাসের জাত নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করল। ভেড়ার মাংস দিয়ে কাবাব প্রস্তুত করে, গরুর মাংস দ্বারা ব্যঞ্জন রেঁধে সে পাঠাল। কালিদাসের পাচক তা পরিবেশন করল। কালিদাস কিছু না জেনেই নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করল। পরে সব কিছু জেনে সে উন্মত্ততা করলেও শেষপর্যন্ত জেলালউদ্দিনের যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে মমিনা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। মমিনা খাতুনের আশা বাস্তবায়িত হল। মমিনা খাঁর গর্ভে দুটি সন্তানের জন্ম হল।

### নিয়ামত জান

নিয়ামত জান শ্রীপুর অধিপতি কেদার রায়ের ভগিনী। তার প্রকৃত নাম সুভদ্রা। ঈশা খাঁকে একবার দেখেই সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ঈশা খাঁকে বিবাহ করতে মনস্থির করে। মমিনা খাতুনের সঙ্গে তার একদিকে মিল, আবার অন্যদিকে গরমিল। মমিনা খাতুন যেমন কালিদাসকে বিবাহ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে নিজেই তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল, সুভদ্রা ওরফে নিয়ামত জানও একইভাবে ঈশা খাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করার ইচ্ছার কথা গোপন করেছিল। বিবাহ করার ব্যাপারে দুজনকেই

দেখা গেছে বেপরোয়া। দুজনেই নিজেদের পছন্দ মত পতি নির্বাচন করেছে। অপরদিকে গরমিল হল মমিনা নিজে মুসলমান হলেও বিবাহ করেছিল হিন্দুকে, অপরদিকে সুভদ্রা হিন্দু হয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমানকে বিবাহ করেছিল। মমিনা খাতুন তার নির্বাচিত পতিকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। এ ব্যাপারে সে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল। কিন্তু সুভদ্রা নিজে মুসলমান হয়ে পরিচিতা হয় নিয়ামত জান নামে। এরপর সে ঈশা খাঁকে বিবাহ করে। মমিনা খাতুনের অভিভাবক তার বিবাহে কোন অন্তরায় রূপে আত্মপ্রকাশ করেননি, কিন্তু নিয়ামত জানের বিবাহে তার ভ্রাতা কেদার রায় ছিলেন পরম বিরোধী। বিবাহের ব্যাপারে প্রেমের জন্য মমিনা খাতুনের তুলনায় নিয়ামত জানকে অধিক ত্যাগ ও দুর্ভোগ স্বীকার করতে হয়েছে। তবে নিয়ামত জানকে বিবাহের ব্যাপারে ঈশা খাঁর কোন অনীহা ছিল না প্রথমাবধিই। সেদিক থেকে সে সৌভাগ্যবতী ছিল বলা চলে।

সুভদ্রা ছিল অতিশয় বুদ্ধিমতী। সে স্নানের অছিলায় জলের ঘাটে গেছে এবং সুযোগমত তার লিখিত বক্তব্য তথা পরিকল্পনা সোনার সাহায্যে ঈশা খাঁর কাছে প্রেরণ করেছে। সে নিজেই পরিকল্পনা রচনা করে জানিয়েছিল—

চৈত না মাসে রে কুমার অষ্টমী তিথিতে।
ছিনান কইরেতে যাইবাম্ আমি পদ্মার ঘাটেতে।।
ফৌজ লয়্যা আইও তুমি কোশা সাজাইয়া
জলের ঘাট হইতে মোরে লইও তুলিয়া।।

ঈশা খাঁও সুভদ্রার পরামর্শমত নির্দিষ্টদিনে পদ্মার ঘাট থেকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেছেন।

ভ্রাতাকে ফাঁকি দিয়ে, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঈশা খাঁকে বিবাহ করায় কেদার রায় খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে জঙ্গলবাড়ী উপস্থিত হয়ে ভগ্নীর কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁর দুই কন্যার সঙ্গে দুই ভাগ্নের বিবাহ দিতে তিনি ইচ্ছুক। চতুরা নিয়ামত জানের বুঝতে বাকি থাকেনি প্রতিহিংসাপরায়ণ কেদার রায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। তার দুটি পুত্রের প্রাণ সংহারের জন্যই যে কেদার রায়ের সব ষড়যন্ত্র, তা নিয়ামত জান উপলব্ধি করেছে। তাই সেও চাতুরীর সঙ্গে জানিয়েছে :

তোমার কইন্যা কইরব বিয়া ইথে নাই মানা।
কেমনে বিয়া দিবা তারা তোমার ভাগিনা।।

কেদার রায় তখন জানিয়েছেন মুসলমানের পক্ষে মামাতো বোনের পাণিগ্রহণ রীতি বহির্ভূত কোন আচরণ নয়। অসহায়া নিয়ামত জান কেদার রায়ের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হয়েও সরাসরি না করতে পারেনি। তবে সেও অন্য চাতুরির আশ্রয় নিয়ে জানিয়েছে :

বাড়ী ছাইড়্যা সাদী নাই পদ্দিতে আমার।

সে পুত্রদ্বয়কে কোনমতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তথাপি বেচারী কেদার

রায়ের চাতুরির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। দুজন পুত্রই কেদারের হাতে বন্দী হয়েছে। তাদের শ্রীপুরে নিয়ে গেছেন কেদার রায়। পুত্রশোকে নিয়ামত জান যে ব্যাকুলতা দেখিয়েছে, তা স্বাভাবিক মায়েরই আচরণ।

শেষপর্যন্ত অবশ্য পুত্রদ্বয় মুক্তিলাভ করেছে বলে গীতিকায় বর্ণিত হয়েছে। পুত্রদের বিবাহের বিষয় উল্লিখিত হলেও পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে নিয়ামত জানের সুখের ঘর-সংসার করার বিষয়টি অনুল্লিখিতই রয়ে গেছে।

## মাঞ্জুর মা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডে 'মাঞ্জুর মা' পালাটি সন্নিবিষ্ট। সেখানে প্রকৃত ছত্রসংখ্যা ২৩৬। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই পালাটি ২৪০ ছত্রে 'মণির ওঝা-মাঞ্জুর মাও' পালা নামে সংকলিত হয়েছে।

পালাটির কবির নাম অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। দীনেশচন্দ্র এবং ক্ষিতীশচন্দ্র উভয়েই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে কবি মুসলমান ছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের মতে, 'এই পালার কবির নাম জানা যায় না, তবে তিনি মুসলমান তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'[২৩]

দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, 'যদিও ইহাতে কোনো ভণিতা পাইলাম না এবং কবি সম্বন্ধে কোথাও কোনো ইঙ্গিত নাই, তথাপি তিনি যে একজন মুসলমান কৃষক ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।'

কবি পালায় 'মাঞ্জুব মাও'কে 'বেহেস্তের নিশান' বলে অভিহিত করেছেন, বলেছেন, 'আরে ওঝা বেহেস্তে চইল্যা গেল।' বিপরীতক্রমে ওঝা মাঞ্জুর মাওকে যে সব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন সেগুলি হল 'গঙ্গানদীর জল', 'সাক্ষাৎ দশভুজা', 'তীর্থ বারানসী', 'দেবের তুলসী'—অর্থাৎ কবির সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয়ই প্রতিফলিত হয়েছে পালাটিতে। ক্ষিতীশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, 'ঘটনা ও পালা রচনার কাল সম্পর্কেও সুনিশ্চিত কিছু বলার উপায় নাই।'

পালাটিতে কোন 'বন্দনা' সংযোজিত হয় নি। পালারম্ভ হয়েছে সরাসরি কানির বাড়ির মণির ওঝার কৃতিত্ব বর্ণনার মাধ্যমে। বলা হয়েছে ওঝা তার বিদ্যায় এমনই পারদর্শী ছিল যে মরা মানুষ পর্যন্ত তার চিকিৎসায় পুনর্জীবন লাভ করত। অথচ ওঝা ছিল নির্লোভ। অর্থ, ভাত, এমনকি রুগীর বাড়ীর জল পর্যন্ত সে খেত না। বিনা পারিশ্রমিকে সে মানুষের উপকার করত. কিন্তু তার চরিত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল সে ছিল ভয়ঙ্কর নারী বিদ্বেষী। তার কাছে স্ত্রীরা হল নষ্টজাতি। সে ছিল নারী অবিশ্বাসী। তার বিশ্বাস ছিল—

এর ফান্দে যে জন মজে রে
আরে সেই জনা যায় মারা।।

অতএব ওঝার আর বিয়ে করা হয় নি। এ হেন ওঝা এক রুগীর চিকিৎসা করতে

গিয়ে তাকে নিরাময় করতে ব্যর্থ হল। তার ঘাড়ে চাপল মাঞ্জুর মাওয়ের দায়িত্ব। অনাথ মাঞ্জুর মাওকে আশ্রয় দিয়ে মণির ওঝা তার মানবিকতা বোধের পরিচয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে। কবি এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছেন। একদিকে প্রকৃতির প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন, অপর দিকে মণির ওঝার বিশ্বাসের মূলে একটা বাস্তব ঘটনার অবতারণা ঘটিয়েছেন।

অপত্যস্নেহে যে মাঞ্জুর মাওকে প্রতিপালন করেছে মণির ওঝা, শেষে মায়া থেকে মোহ তথা প্রেমে পড়েছে সেই মাঞ্জুর মাওয়েরই। ঘোরতর নারী বিদ্বেষী মণির ওঝাকে দিয়ে দার পরিগ্রহ করিয়ে কবি প্রকৃতির প্রতিশোধ গ্রহণ দেখিয়েছেন। মণির ওঝা নিজেও বুঝেছে তার বিশ্বাস এবং কর্মে মিল হচ্ছে না, তাই যুক্তি দেখিয়ে নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিয়েছে—

নিজহস্তে গইড়া কাঠাম রে,
হায়দুন, কেমনে দিয়ম্ ফালাইযা।।
নষ্ট নষ্ট সবই নষ্ট রে
কেবল নষ্ট নয়, মাঞ্জুর মা।
যতন করলাম ফলন্ত গাছ রে
হায়দুন, কেবল পরের লাইগ্যা।

মণির ওঝা মাঞ্জুর মাওয়ের প্রেমাসক্ত হলেও মাঞ্জুর মাও কিন্তু কোনমতেই মণির ওঝাকে তার স্বামী বলে মেনে নিতে পারেনি। বয়স এবং সংস্কার দুইই ছিল এজন্য দায়ী। তার ওপর মাঞ্জুর ছিল হাছেনের প্রেমাসক্ত। অতএব মণির ওঝার অনুপস্থিতিতে মাঞ্জুর মাও হাছেনের সঙ্গে গৃহত্যাগী হয়েছে। মজার ব্যাপার হল—মণির ওঝা মাঞ্জুর মাওকে গৃহে না পেয়েও তার চরিত্র সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি, সন্দেহ করেছে তার অনুপস্থিতিতে বলপূর্বক কেউ মাঞ্জুর মাওকে অপহরণ করে থাকবে। 'সতী কুলের বউ', 'কলিজার বউ', 'নারী শিরোমণি', 'নয়ানের মণি' মাঞ্জুর মাওয়ের বিরহে শেষপর্যন্ত মণির ওঝা আত্ম বিসর্জন দিয়েছে। প্রেম বয়সের, আভিজাত্যের কিংবা অন্য কিছুর ব্যবধান যে মানে না, মণির ওঝা তারই প্রমাণ। আত্ম বিসর্জন দিয়ে সে মাঞ্জুর মাওয়ের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার স্বাক্ষর রেখেছে। তাই বলে মাঞ্জুর মাওয়ের আচরণকেও আমরা মণির ওঝার প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতা বলে বলতে পারি না। যুবতী কন্যার পক্ষে পিতৃতুল্য ব্যক্তিকে স্বামী বলে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি, তাই সে হাছেনের সঙ্গে গৃহত্যাগী হয়ে স্বাভাবিক আচরণই করেছে। পালার পরিণতি অবশ্য মণির ওঝার নারী সম্পর্কিত বিশ্বাসের আনুকূল্য করেছে।[২৪]

## কাফেন চোরা

কাফেন চোরা বা আয়রা বিবির পালা অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত। দীনেশচন্দ্রের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডে এবং ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র

৩য় খণ্ডে পালাটি সংকলিত হয়েছে। পালার প্রথমেই সংযোজিত হয়েছে গায়েনের বন্দনা। অনুমিত হয় গায়েন আর কবি ভিন্ন ব্যক্তি। লুধাগাজী নামে এক ওঝা 'গুরাধন বেপারী'র নাতনী পরীকে ঠেগার খাল থেকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেল। বেচারী পরীর স্থান হল গজালি গ্রামে। কিছুকাল পরে পরী একটি সন্তান প্রসব করে মারা গেল। সন্তানের নাম মনসুর। সে তার বিমাতার কাছে মানুষ হতে লাগল। লুধাগাজী মারা গেল বাঘের হাতে। কুসঙ্গে পড়ে মনসুর রূপান্তরিত হল ডাকাতে। তার কাজ মৃত ব্যক্তির কফিন চুরি করে তা বাজারে বিক্রয় করা। কাজ তার স্বভাবতই গভীর রাতে। একদিন নবোঢ়া এক রমণীর গলায় হাসুলি, কানের করম ফুল, নাকের নথ, রমণীটি পাল্কী করে শ্বশুরালয়ে যাবার সময়ে সে ডাকাতি করল।

নবোঢ়াটি ছিল আজিম বেপারীর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী, নাম আয়রা বিবি। আজিম তার ব্যবসার প্রয়োজনে বাড়ী ছেড়ে যাত্রা করল। তার গৃহে একাকিনী আয়রা রইল, রইল তার শাশুড়ী। এদিকে আয়রাকে বিস্মৃত হতে পারেনি মনসুর, যার আর এক নাম 'কাফেন চোবা'। গোপনে সে চলে এল চিন্তাপুর গ্রামে। এখানে আয়রাকে সে দেখতে পেল স্নানরতা অবস্থায় নদীতে। মনসুর অনুশোচনা করতে লাগল এমন সুন্দরী কন্যাকে সে বাগে পেয়েও আত্মসাৎ করেনি বলে। গভীর রাতে যখন সকলে নিদ্রামগ্ন, তখন আয়রার গৃহে সিঁধ কেটে সে আয়রার গৃহে প্রবেশ করল। আয়রা জেগে উঠে চেঁচামেচি করলে পাড়ার লোকজন এসে বেধড়ক মার দিলে মনসুরকে।

মানসিক ক্লেশে অসুস্থ হয়ে পড়ল আয়রা। সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আয়রাকে কবর দেওয়া হল। মনসুর আয়রার কফিন চুরি করতে গেল। আচমকা সে গণ্ডদেশে চপেটাঘাত খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। আয়রা তাকে পরামর্শ দিল পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ার। মনসুর তা করতে স্বীকৃত হল।

এক দৌলতদারের বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়ে ভোর হয়ে গেলে মনসুর ফজরের নমাজ পড়া শুরু করে দেয়। তার নমাজ পড়া শেষ হলে বাড়ীর সকলে তার পায়ে এসে পড়ল। বাড়ীর লোকজন কিছুতেই বিশ্বাস করল না যে সে কাফেন চোরা। দৌলতদার মনসুরকে অপরিমিত দৌলত দিল। সে সব নিজের দলের লোকেদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে নিজে জঙ্গলে চলে গেল। কখনও কখনও আয়রার কবরের জঙ্গল থেকে আসা এক ফকিরকে আল্লার জিকির জপতে দেখা যেত, এ সেই মনসুর।

পালাটিতে অলৌকিকত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মৃত আয়রা কর্তৃক মনসুরকে উপদেশ দান এবং নমাজ পড়ায় উদ্বুদ্ধ করা তারই প্রমাণ। আয়রা 'মনের আগুনে' অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত তার মৃত্যুও হয়েছে। কিন্তু পালায় বর্ণিত হয়নি যে মনসুর কর্তৃক সে লাঞ্ছিতা হয়েছিল। মনসুর তার কক্ষে প্রবেশ করেছিল ঠিকই এবং তার যৌবনও প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু তার সতীত্ব নষ্ট করেছিল বলে বর্ণিত হয়নি। বরং আয়রার চীৎকারে মনসুর লোকজনের হাতে ধরা পড়ে গেছে! তাহলে আয়রা কি নিছক মনসুরের ভয়েই এমন পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল? অথচ পালায়

বর্ণিত হয়েছে লোকজন তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জঙ্গলে টাঙ্গিয়ে রেখে গেছিল মৃত জ্ঞানে। তবে কি পতি বিরহে কাতরা হয়ে পড়েছিল আয়রা? কবি তার পরিণতির কোনো সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করেন নি।

তবে মনসুরের পরিবর্তন পালায় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। সে ডাকাত হয়েও যে দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ত, তা কি শুধু পরকালের ভয়ে না আয়রার প্রতি হৃদয় দৌর্বল্যবশতঃ? তবে দৌলতদারের বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়ে তার ফজরের নমাজ পড়া কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়েছে। তার চরিত্রে স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। একই সঙ্গে ডাকাতি এবং পাঁচবার নমাজ পাঠ তারই প্রমাণ। তবে তার পরিণতি স্বাভাবিক হয়েছে। ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েও যখন সে দৌলতদারের বাড়ীতে সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ পেয়েছে, তখনই তার যথার্থ পরিবর্তন ঘটেছে। সে সমস্ত ধন-দৌলত দলের সদস্যদের বিতরণ করে দিয়ে ফকিরী নিয়েছে। কিন্তু তার আয়রার কবরে মাঝেমধ্যে উপস্থিত হওয়া যত না আয়রার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে, তদপেক্ষা তার প্রতি তার হৃদয় দৌর্বল্যকেই দায়ী করতে হয়।

আজিম বেপারী যে বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলে্ছ তার আভাস কবি আগেই দিয়েছেন। বাণিজ্যযাত্রা করার সময় সে নানা অশুভ লক্ষণ লক্ষ্য করেছে—

> উড়িয়া যাইতে আজিমের চউক্ষে পইড়ল মাছি।
> ঘবের থুন বাইর হইতে মুখে পইড়ল হাঁচি।।
> ডাইনর থুন আসি সর্প বামে গেল ধাই।
> পন্থের মাঝে দেখে আজিম ডুমা এক গাই।।

মনসুর ডাকাত কর্তৃক আয়রার স্বর্ণালঙ্কার লুণ্ঠনের বিবরণ বাস্তবানুগ এবং তৎকালীন সমাজে ডাকাতদের উপদ্রব যে সমাজজীবনে কি ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল তারই ইঙ্গিতবহ।

## সুজা তনয়ার বিলাপ

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে 'সুজা তনয়ার বিলাপ'। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক এই পালাটির সন্ধান পাননি বলে জানিয়েছেন। তাই তাঁর প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকায় এটি সংকলিত হয় নি। মাত্র ত্রিশ পংক্তি সম্বলিত এই গীতিকাটি সম্পর্কে রাজমালার গ্রন্থকার কৈলাসচন্দ্র সিংহের অনুমান এটি একটি বৃহৎ পালা গানের ভগ্নাংশ। দীনেশচন্দ্র সেন এই বিলাপটির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন,

'রাজা সুধর্ম সাহ সুজাকে তাঁহার পত্নী পরিভানু ও একটি কন্যা সহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করেন।..তাঁহাদের জীবন নাশ করিয়া মগরাজা সুজার অপ্রমেয় ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এক কন্যাকে বলপূর্বক তাঁহার অন্তঃপুরে বন্দী করিয়াছিলেন।'

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, 'সুজা তনয়ার বিলাপ' রচয়িতা কবি কন্যাটির বিবাহ সম্পর্কে যে বলপ্রয়োগ বা অন্যায় সুযোগ গ্রহণের ইঙ্গিত করিয়াছেন

এবং আরাকান-রাজ-অন্তঃপুরের বর্বর পরিবেশে কন্যাটির দুর্দশার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, উহা তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বলিয়াই মনে হয়।' বিলাপটিতে যে ধুয়া প্রযুক্ত হয়েছে তা হ'ল, 'হায় নছিবে একি ছিল রে।' সুজা তনয়ার বিলাপ বক্তব্যের কারণেই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

সে আর্তি প্রকাশ করে বলেছে :

তুইযর আইল্যা হইয়রে বুগ উড়ের জ্বলি জ্বলি।।

* * *

জীয়ত রাখি মোরে কেনে মাড়ি দিলি গোরে--
হায়রে, মাড়ি দিলি গোরে।।

সুজা তনয়া মঘেদের খাদ্য পানীয় এবং পরিচ্ছদের ব্যাপারে তার তীব্র অনীহা জানিয়েছে। যেমন--

মইঘ্যা বাজার খানা খাইতে মনত্ আইয়ে ঘিন্।।
এক সোনাই রাঁধে বে ভাত বাড়ী হুন্দা খায়।
বাছুন ভরা নাপ্ ফির্পোচা গিলা ত ন যায়--

কিংবা,

পিন্‌বার লাগি মইঘ্যা রাজা দিয়ের কালা খামি।।
দশ মঘিনী আইসা আমার বইয়ে গায়ের কাছে।
কানত্ দিতাম্ কহি আমার সোনার নাধং যাচে।।

বিলাপটিতে আরাকান অঞ্চলের পচামাছ যুক্ত ব্যঞ্জন 'নাঁপফি পোঁচা' কিংবা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পরিধেয় বস্ত্র 'খামি' ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছে।

## বারো তীর্থের গান

'বারো তীর্থের গানে' আনুপূর্বিক কাহিনীর রূপায়ণ নয়, মাতৃভক্ত রাজা ভগদত্ত তাঁর বৃদ্ধা জননীর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে বারো তীর্থের জলসংগ্রহ করে যে এক পুষ্করিণীকে তীর্থে পরিণত করেছিলেন তারই বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

ভগদত্তের বৃদ্ধা জননীর ইচ্ছা হয়েছিল তিনি দ্বাদশ মহাতীর্থে স্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করে সমস্ত অপরাধ মুক্ত হবেন। কিন্তু ভগদত্ত বুঝলেন যে তাঁর বৃদ্ধা জননীর পক্ষে বারো তীর্থে স্বয়ং উপস্থিত হওয়া সম্ভব হবে না। তাই তিনি জননীকে বোঝালেন যে মাতৃইচ্ছা পূরণের জন্য দ্বাদশ তীর্থের জল সংগ্রহ করে এনে একটি নব নির্মিত পুষ্করিণীতে তা ঢেলে দেবেন, সেই পুষ্করিণীতে জননী স্নান করে অভিলষিত পুণ্য সঞ্চয় করবেন। ভগদত্ত স্বয়ং তীর্থ থেকে জল সংগ্রহ করে আনলেন, অপরপক্ষে তাঁর ভাই রামচন্দ্র পুষ্করিণী খনন করিয়ে রাখলেন. পুষ্করিণীতে স্নান করে ভগদত্তের জননী ঘাটে বসে সোনা, রুপা, গরু ইত্যাদি দান করলেন। ব্রাহ্মণভোজন করান হল, বস্ত্র কড়ি দান এসবও হল। এইভাবেই বারো তীর্থ রচিত হল।

ভগদত্তের জননীর আর একটি সাধ পূরণ করলেন ভগদত্ত। রাজমাতা একগোছা সুতা কেটেছিলেন। তা চরকাতে ছিল। তা থেকে তুলে তিনি কাঠিতে ভরে রেখেছিলেন। সেই সুতার মাপে একটি দীঘি কাটিয়ে দেবার কথা তিনি বললেন। নিজের হাতে মার প্রস্তুত সুতা নিয়ে সেই মাপের দীঘি কাটিয়ে দিলেন ভগদত্ত। এই দীঘির নাম হল সুতা নাড়ার দীঘি।

ভগদত্তের মাতৃভক্তি আলোচ্য গানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। তিনি মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। মাতৃ ইচ্ছা পূরণ করতে বারো তীর্থের জল সম্বলিত পুষ্করিণী কাটিয়ে দিয়েছেন, রচনা করেছেন সুতা নাড়ার দীঘি। ভগদত্তের মাতৃভক্তির পরিচয় মেলে যখন তিনি বলেন—

এই না দেহ পয়দা কইরাছে।
আমাগর সোনার মা।।
সেই ত মায়ের মোন-বাসনা
যদি মিটাইবার নাইসে পারি।
ধন-দৌলত বেবাক মিথ্যা
মিথ্যা দালান-কোটা-বাড়ী।।

এরপরই উল্লেখ করতে হয় ভগদত্তের অনুজ রামচন্দ্রের। রামায়ণের লক্ষ্মণের মতনই তার ভ্রাতৃভক্তি। ভগদত্ত মাতৃইচ্ছা পূরণের জন্য বারো তীর্থের জল সংগ্রহে যাবেন জেনে রামচন্দ্র কুণ্ঠিত হয়েছেন দাদার রাজত্ব পরিচালনা করতে। কেননা ভগদত্ত প্রবাসে কত কষ্টের সম্মুখীন হবেন, সেক্ষেত্রে তিনি থাকবেন সুখভোগে—

দ্যাশ-বিদ্যাশে ঘুইরবা তুমি
কষ্টে যাইব তোমার দিন।
ঘরে বইয়া সুখে থাকমু
সেই ভাবনায় আমার পরাণ ক্ষীণ।

রামচন্দ্র দাদার নির্দেশে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করেছেন, সহানুভূতির সঙ্গে প্রজাদের সঙ্গে আচরণ করেছেন। তথাপি কুপ্রজার দ্বারা তিনি অকারণে নিন্দিত হয়েছেন। কুপিত হয়ে তিনিও প্রজাদের অভিশাপ দিয়েছেন। বারোতীর্থের গানের রচনাকাল বলা হয়েছে 'বারো শো আশি সন'। এর গায়ক ছিলেন বামুইরগার সজুবয়াতী, ইনি সম্ভবত রচয়িতা ছিলেন না, কেননা ইনি নিজের প্রসঙ্গে এটুকুই জানিয়েছেন,

'বামুইরগার সজুবয়াতী ধুয়া বাইন্ধ্যা গান করে।'

## ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা

ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালাটি ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন কাহিনীটির ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'ভেলুয়ার কথা গল্প বা উপকথা নয়, ইহা

ভিত্তির উপর স্থাপিত। হামিদুল্লা নামক কোনো লেখক 'তারিখ্-ই-হামিদি' নামক ফার্সি ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই গীতি-বর্ণিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।'

কাব্যোক্ত ঘটনাটি 'ষোড়শ শতাব্দীতে হুসেন শাহের পুত্র নসরত্ শাহের সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।'

পালাটিতে কোনো বন্দনা অংশ সংযোজিত হয়নি। সরাসরি একেবারে পালাটি আরম্ভ হয়েছে।

মানিক সওদাগরের পুত্র আমির সাধু পালাটির নায়ক। মনুহর-কন্যা ভেলুয়ার পোষা একটি কবুতরকে হত্যা করার অপরাধে আমির ভেলুয়ার ভায়েদের হাতে বন্দী হয় এবং চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য ভেলুয়ার সঙ্গে আমিরের বিবাহ হয়। গৃহে ভেলুয়াকে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর আমিরের ভগ্নী বিভলার প্ররোচনায় আমিরকে বাণিজ্য যাত্রা করতে হয়। আমিরের অনুপস্থিতিতে ভেলুয়াব চরিত্রে দোষারোপ করে বিভলা তাকে চরম নির্যাতনের সম্মুখীন করে। এতেও তার দুর্ভাগ্যের অবসান হয় না। ভোলা সওদাগর তাকে ঘরে নিয়ে যায় বিবাহ করবে বলে। কৌশলে ভেলুয়া এক বৎসরের জন্য ভোলাকে বিবাহ করার ব্যাপারটি স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করে। বহু অর্থ উপার্জন করে আমিব দেশে প্রত্যাবর্তন করে শোনে তার স্ত্রী মারা গেছে। অনুসন্ধানে সে জানতে পারে ভেলুয়ার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। ফকির হয়ে গৃহত্যাগ করে সে। উপস্থিত হয় সে ভোলার গৃহে। ভেলুয়ার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। সব বৃত্তান্ত সে অবগত হয়। দেশের কাজীর সহায়তায় সে ভেলুয়াকে লাভ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পিতার সাহায্যে কাজীকে ও ভোলাকে পর্যুদস্ত করে। ভোলা নিহত হয়। কিন্তু এত সব করা যার জন্য, সেই ভেলুয়া সুন্দরীর সঙ্গে আমিরের মিলন সাধিত হয় না। ক্ষোভে, দুঃখে, কষ্টে ও হতাশায় ভেলুয়ার মৃত্যু হল। তার মৃতদেহকে কবর দেওয়া হল। পাগলের ন্যায় ভেলুয়ার কবরের কাছে পড়ে সারিন্দা বাজাতে থাকে আমির। একদিন পরীদের সঙ্গে ভেলুয়াকে সে আকাশে যেতে দেখে তার কবর থেকে।

পালাটির একাধিক স্থলে কিঞ্চিৎ অলৌকিকত্বের বর্ণনা আছে। ভেলুয়ার পোষা কবুতব কোরাণের বাণী উচ্চারণ করেছে বলে বর্ণিত হয়েছে—

কলেমা-তৈবব কৈতর মুখে মুখে পড়ে।।

ভেলুয়াকে কবর দিয়ে আমির দিনরাত সারিন্দা বাজায় কবরেব কাছে। একদিন রাত্রে আমির দেখলে—

সাতপরী আসিয়া রে
ভেলুয়ারে ডাকে।।
উঠিল উঠিল কইন্যা
ছাড়িয়া কয়ব্বর।
পরীর সঙ্গে উর্কা দিল
আশমানের উপব।।

পরীদের উপস্থিতি এবং তাদের সঙ্গে ভেলুয়ার যাত্রা অলৌকিক হলেও, উল্লেখ করা যেতে পারে অলৌকিকত্ব পালার মূল কাহিনী নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। পরীদের প্রসঙ্গটিকে ভেলুয়ার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর আমিরের স্বপ্ন বা বিশ্বাস বলেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

শালীনতা বোধ রক্ষায় কবির প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখ করতে হয়। ভেলুয়ার সৌন্দর্য বর্ণনাতে কবি সংযম রক্ষা করেছেন,—তার নয়ন, তার হাসি, চিকন কেশ, হস্ত, পদ, গাত্রবর্ণ, মুখশ্রী, রক্তিম ওষ্ঠদ্বয় ইত্যাদির উল্লেখেই কবির সৌন্দর্য বর্ণনা নিঃশেষিত। ভেলুয়াকে গৃহে রেখে আমির বাণিজ্যযাত্রা করেছে, কিন্তু যাত্রা ভুল হওয়ায় আমির চারদিন পরে শাফলা বন্দরেই ফিরে এসেছে। গোপনে সে নিজগৃহে গেছে বিরহা কাতরা ভেলুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এক্ষেত্রে যে বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে, তাতেও কবির সংযম গুণ লক্ষণীয়--

ভেলুয়ারে দেখি আমির হইল পাগল।
কুলর মাছ পাইল যেন পানির লাগল।।
দোনো জনে কোলাকুলি গলাগলি করে।
চারি চোখের জল তারার অজ্মারেতে ঝরে।।

দুটি পিপাসার্ত ও বিরহ কাতর সত্তার মিলন বর্ণনা মাত্র এই চারটি পংক্তিতেই সমাপ্ত।

অনেক অনুসন্ধানের পর ফকির বেশী আমির গভীররাত্রে ভোলা সওদাগরের গৃহে উপস্থিত হয়েছে, মিলিত হয়েছে অন্তরীণা ভেলুয়ার সঙ্গে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাদের মিলন বর্ণনায় কবির সংযম গুণ লঙ্ঘিত হয়নি লক্ষিত হয়—

'সাধু সাধু'—বলি ভেলুয়া বুগে লইল টানি।
অঝ্ঝোরে ঝরিতে লাগিল দুই নয়ানের পানি।।
লোটন কৈতরের মতন ধরিল বেড়াই।
চাই চোগে পানির হোত্ মুখে কথা নাই।।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণে সমৃদ্ধ আলোচ্য পালাটি। নৌ শিল্পের বিস্তাবের পরিচয় মেলে নানাবিধ নৌকার উল্লেখে। আমির অন্তরীণা ভেলুয়াকে উদ্ধারের জন্য দশহাজার সৈন্যসহ যাত্রা করেছে, সঙ্গে নিয়েছে নানা কাজের উপযোগী নৌবাহিনী, যেমন 'ফোরকান', 'কালাধর', 'কৈলাণ', 'কাঞ্চনমালা', 'গুণধর', 'হংসমালা', 'শ্যামল সোন্দর', 'খৈয়াপটি', 'রঙ্গশালা', 'হকচুর', 'আউল-কাউল', 'হুড়মুড়', 'লক্ষ্মীধর'। সমুদ্রযাত্রার উপযোগী জাহাজ বর্ণিত হয়েছে 'হাঙ্কারি জাহাজ' নামে, যেহেতু তা সমুদ্রের বৃহদাকৃতির ঢেউ ভেঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে চলতে পারে। মানিক সওদাগর শাফলা বন্দরের মালিক ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে বিদেশী বন্দর থেকে এখানে দ্রব্যাদি আমদানী-রপ্তানী করার কথা। শাফলা বন্দরে কতরকমের ডিঙ্গাই না বাঁধা থাকে আব মাঝি মাল্লারা গভীর রাতে শিঙ্গা বাজায় কোনো কিছুর ইঙ্গিত দানের জন্য।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার গৌরবও ছিল। তারই ইঙ্গিত মেলে আমিরের বক্তব্যে, সে জানিয়েছে যে সে সামান্য কৃষিজীবী বা মৎস্যজীবী নয়, সে সওদাগরের সন্তান। অনিশ্চয়তায় ভরা তার জীবন, নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা তার জন্য নির্দিষ্ট নয়—

মুল্লুকে মুল্লুকে যাইব কইত্তে সদাইগরী।।

আমির শিকারে গেছে নৌকায়, সঙ্গে নিয়েছে মাঝিমাল্লা সব—

খালাসি টেণ্ডল সবে লইল রে সাজি।
দড় দেখি ছুয়ান লইল গৌরলধর মাঝি।।

মাঝি মাল্লাদের সর্দার পরিচিত ছিল। 'খালাসি টেণ্ডল' নামে. জাহাজ বা নৌকার হাল বাঁধার দড়ি হল 'ছুয়ান'। মাঝিরা 'বদর বদর' উচ্চারণ করে সমুদ্র যাত্রা করত। সমুদ্রযাত্রার বিবরণে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন মেলে—

হু হু করি ছুটে ডিঙ্গা পালত্ পইড়্ল টান।
পরিচয় ন রইল যাইছে ভাণ্ডি কি উজান।।
এক ঢেউয়ে উড়ে রে ডিঙ্গা আকাশ বরাবর।
আর ঢেউয়ে যায় রে ডিঙ্গা পাতালর ভিতর।।
উতর দহিন পুগ পচিম হইল ভিলাভিন্
কন্দিকর থুন কন্দিকে যায় কিছু ন রইল চিন্।।

কবি সমুদ্রমধ্যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন জলযাত্রীদের দুরবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাস্তবানুগ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন—

কেহ্ পড়ি রইল আর কেহ্ বমি করে।
উইঠ্তে চাহি কেহ্ আবার কাইত্ হই চিত্ হই পড়ে।।

*        *        *

খালাসি ধৈঞ্জল ডাকে—বদর বদর।
দড়-মতে ছুয়ান ধরিল মাঝি গৌরলধর।।

ভোলাও 'মাছিলি' বন্দরে উপার্জনের জন্য যাত্রা করেছিল উল্লিখিত হয়েছে। এখান থেকেই সে এসে উপস্থিত হয়েছিল শাফলা বন্দরে। সমুদ্রযাত্রা, সামুদ্রিক বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি ছাড়াও সমসাময়িককালের ব্যবহার্য অলংকারাদি. পরিচ্ছদ ইত্যাদির কিছু উল্লেখ মেলে পালাটিতে। ভোলা সওদাগর প্রলোভন দেখাতে গিয়ে ভেলুয়াকে যে সব সামগ্রী দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল চন্দ্রহার, নীলাম্বরী শাড়ী, নাকের নথ, কানের 'বালি'। উৎকৃষ্ট চালের নাম চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিল 'তুলসীমালা'। পতির অনুপস্থিতিতে ভেলুয়ার দুর্দশার বর্ণনাতেও সমসাময়িককালের ব্যবহার্য অলঙ্কারাদির পরিচয় লভ্য। ননদ বিভলা ভেলুয়ার কাছ থেকে যে সব জিনিস নিয়ে নিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে ছিল—হাতে পরার বাজু, অগ্নি পাটের শাড়ী, গলার হাঁসুলি, হাতের কঙ্কণ, কানের 'শিকল' ইত্যাদি। নবোঢ়া ভেলুয়াব সজ্জার বর্ণনাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

দাঁতে মিশি নাকে নথ পরাইল তারে।।

*     *     *

হার পরাইল গলায় আর দিল হাসুলি।
নাকে দিল করম ফুল কানে দিল বালি।।
তোড়ল্ তাড়ন্ দিল দেসরা বাজুবন।
দোনো হাতে পরাই দিল সোনার কঙ্কণ।।
চুলেতে মাখাই দিল আতরের পানি।
মাথার উপরে দিল সিঁথির ঢাকনি।।
ঘুঙ্গুরু পরাইয়া দিল দোনো পায়ের মাঝে।
সোন্দরী ভেলুয়া সাজিল অপরূপ সাজে।।

বিবৃতিমূলক পালাটিতে মাঝে মাঝে অনবদ্য কবিত্বশক্তির পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না। যেমন--

সাঁজের কালে রাঙ্গা সূরুজ ডুপিল সাই''রে।
সোনালী ছড়ক্ পইল ঢেউয়ের উপরে।।

প্রবাদবাক্যের ব্যবহারেও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন কবি। ফকির বেশী আমির ভেলুয়াকে স্ত্রী বলে দাবী জানালে কাজী তাকে বলেছে :

তোমার যোগ্য নয় এ বিবি তোমার যোগ্য নয়।
কুত্তার পেডে ঘিয়ের ভাত বদ হজম হয়।।

আমাদের পালাগুলিতে প্রায়ই বারমাসী সংযোজিত হয়েছে। মূলতঃ এগুলি দুঃখের বারমাসী। আলোচ্য পালাতেও ভেলুয়ার বারমাসী স্থান পেয়েছে। পতিবিরহে কাতরা এবং ননদের চক্রান্তে চরম দুঃখজনক অবস্থায় পতিত, বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনেব প্রেক্ষাপটে ভেলুয়ার মনোবেদনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

কবি সংসার বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে নানা মন্তব্যে। যেমন—আমির অর্থোপার্জন ব্যতিরেকে পুরুষ মানুষের সংসারে কি অবস্থা হয় তার বিবরণে বলেছে--

মাতা বল পিতা বল হাউসের স্তিরী
গিয়েত্ পইসা ন থাকিলে কেহ ন চায় ফিরি।

অর্জিত সম্পদ যতই অধিক হোক, ক্রমাগত তা ব্যয় করলে দ্রুত যে তা নিঃশেষিত হয়, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে—বাদশার ধনফুরাই যায় বসি বসি খাইলে।

স্ত্রৈণ হলে সংসার বিনষ্ট হয় বলেও মন্তব্য করা হয়েছে—

সংসার নষ্ট হয় রেঁ জাইন্য বউয়ের বশ্য হইলে।।

অত্যন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে যখন কবি বলেন—

সংসারের রীতর্ কথা শুন সভাজন।
মাও-বাপের শত্তুর হয় বউয়র বশ যে জন।।

ননদের কারণে ভ্রাতৃবধূর জীবন যে বিষময় হয় সে কথাও বলা হয়েছে, বিশেষত ননদ যদি হয় অনূঢা—

আবিয়াত ননদিনী আছে যার ঘরে।
সে বধূর সুখ কখখনো না হয় সংসারে।।

অলংকার প্রয়োগে কবি তেমন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারেন নি। সাধারণভাবে অন্যান্য পালাগুলিতে যেমনভাবে অলঙ্কার প্রযুক্ত হয়েছে, সেই ধারাই অনুসৃত হয়েছে। যেমন—

পূব আকাশে লাল হইছে পাইখ্-পহলে গায়।
তেল ফুরাইন্যা বাত্তির মতন আশমানে তারা নিবি যায়।।

কিংবা,

ছাই ধরিলে সোনা হয় রে এমন ভাগ্য তাব।
রুজির গাঙ্গে আইল যেন পুন্নিমার জোযার।।

এইবার চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গ। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ভেলুয়া সুন্দরীর কথা।

**ভেলুয়া সুন্দরী**

শত্রুতার মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় হয় আমিরের। আমির ভেলুয়ার পোষা প্রিয় পাখীটিকে হত্যা করায় ভেলুয়ার রোষেব সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই হল আমিরের বধূ। নবোঢ়া ভেলুয়াকে ছেড়ে আমির সমুদ্র-বাণিজ্যে যেতে মনস্থ করলে সে আমিরকে বাণিজ্য যাত্রা থেকে নিরস্ত করতে নানাভাবে প্রয়াস পেয়েছে। কখনও সে আমিরের সঙ্গী হতে চেয়েছে, কখনও বা নিজের অলংকার বিক্রয় করে আমিরকে খাওয়াবার কথা বলেছে। আবার কখনও বা অল্পবয়সে আমিরের পক্ষে বিদেশযাত্রা অনুচিত বলে জানিয়েছে। কিন্তু তার প্রয়াস ফলবতী হয় নি। আমির বাণিজ্য যাত্রা করেছে। এরপর শুরু হয়েছে তার জীবনেব চরম দুঃখজনক অধ্যায়। অন্যায়ভাবে তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে ননদ বিভলা। তাকে দাসীব কর্মে বৃত হতে হয়েছে। চরম দুঃখ ভোগেব মধ্যে আবার নতুন উপসর্গ উপস্থিত হয়েছে ভোলা সওদাগরের কারণে। সে তাকে অপহরণ করেছে এবং বিবাহে উৎসুক হয়েছে। পতিপ্রেম ভেলুয়ার অন্তরে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাব মত যেহেতু বিদ্যমান, তাই সে ভোলাব শত প্রলোভনেও তার কাছে আত্ম সমর্পণ করেনি। ভোলা মিথ্যা করে তাকে যখন বলেছে যে মাছিলি বন্দরে আমিরের মৃত্যু হয়েছে এবং তাকে সকলে মিলে কবর দিয়েছে, তখন সে কথা ভেলুয়া বিশ্বাস করেনি। নিজের সতীত্বে তার অবিচল বিশ্বাস ছিল। তার দৃঢ় প্রত্যয় আমিরের কিছু হলে সে নিশ্চয়ই তার ইঙ্গিত পেত--

মলিন হইত রে আমার মাথার সিঁদুর।।
বুগের মধ্যে দুব্ দুব্ কৈরত্ রে পরাণ।
অমঙ্গল হইলে রে আমার কাঁপিত নয়ান।।

ইদ্দত পালনের নামে সে ভোলার কাছে এক বছরের সময় চেয়ে নিয়েছিল। আমিরের সঙ্গে এরপর ভোলার গৃহেতে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে। সে আমিরকে পরামর্শ দিয়েছিল রাত্রেই দেশ ছেড়ে চলে যাবার। কিন্তু তার পরামর্শ কানে না করায় অহেতুক ভেলুয়ার বিড়ম্বনা ভোগ দীর্ঘায়িত হয়েছে। বুড়া মুনাপ কাজী আমিরের নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের ছলনায় ভেলুয়াকে পেতে চেয়েছে। কাজীর গৃহে থাকা কালীন কাজী তার কাছেও ঘেঁষতে পারেনি অবশ্য—

বাঘ যেমন শিকার দেখি এক দিষ্টে চায়।
আগুনর ফুল্কা ঝরে চৌক্ষর কিনারায়।।
কইন্যার দুই চোগ তেমনি দেখে কাজী বুড়া।
ভয় পাই পলায় কাজী দাড়িত্ দিয়া লাড়া।।

অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, মনোবেদনায় ভেলুয়া কাজীর গৃহে শেষপর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অসুস্থ ভেলুয়াকে সৈন্যের সাহায্যে আমির উদ্ধার করে এনেছে বটে, কিন্তু নিজের গৃহে তাকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি, কেননা পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছে। অতৃপ্ত পতিপ্রেম অন্তরে নিয়ে, সতীত্বকে অটুট রেখে হতভাগিনী বিনাদোষে ঘটনাচক্রে চরম দুঃখ ও বেদনাভোগের মধ্য দিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। মৃত্যুর পর তাকে পরীদেব সঙ্গে স্বর্গে উপনীত করিয়ে কবি তার ওপর যে অবিচার হয়েছে তার জীবদ্দশায়, তারই যেন প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

### বিভলা

মহিলা চরিত্রের মধ্যে এরপর উল্লেখ করতে হয় আমির সাধুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিভলার কথা। তাকে উপলক্ষ করেই কবি মন্তব্য করেছেন :

আবিয়াত ননদিনী আছে যার ঘরে।
সে বধূর সুখ কখখনো না হয় সংসারে।।

ভেলুয়ার জীবনকে ব্যর্থ করার মূলে যদি কোনো একজনকে দায়ী করতে হয়, তবে তা বিভলাকে। তার চরিত্র তার চেহারাতেই প্রতিফলিত—

মাংস নাই সারা অঙ্গে অস্থি বেড়াই চাম্..
পাণ্ডুবর্ণ দেহখানি রক্ত নাহি তায়।।
পুরুষের মত কেশ হাত আর পায়।।
কুড়ি বছর বয়েস হইল বইলতে লজ্জা পাই।
যইবন-জোয়ার তবু গাঙ্গে আসে নাই।।
ডালম্বের গাছে হায় রে ধরে নাই ফল।
ডাঙ্গর ডাঙ্গর চৌখ করে ঝলমল।।
নারীর ছুবত্ নাই বিভলার অঙ্গে।

বিভলা কুৎসিত দর্শনেব অধিকারিণী, তার মুখের কথা 'চিরতার পানি'র মত। এক

কথাকে সে দশ কথায় পরিণত করে। সকলেই তার ভয়ে তটস্থ। ঈর্ষায় বিষতিক্ত তার চিত্ত। আমির ভেলুয়াকে বিবাহ করায় সর্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট হয়েছে বিভলা। সেই তার ভায়ের বিরুদ্ধে মাকে প্ররোচিত করেছে, পরিণামে আমিরকে বাণিজ্য যাত্রায় যেতে হয়েছে। এরই সুযোগের প্রতীক্ষায় সে ছিল। আমিরের অনুপস্থিতিতে সে ভেলুয়ার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করেছে, তাকে দাসীর কার্যে রত হতে বাধ্য করেছে। তার সমস্ত অলঙ্কারাদি সে খুলে নিয়েছে। শয়তানি করার জন্য ভেলুয়াকে দিয়ে সাড়ে তিন সের পরিমাণের মরিচ বাটিয়ে নিয়েছে। ভোলা সওদাগর কর্তৃক ভেলুয়া অপহৃতা হলেও তার কেউ যে সন্ধান করেনি, তার মূলে বিভলা ছিল বলে অনুমান করা যায়। এক বৎসর পরে আমির গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে সে ভাইকে পরামর্শ দিয়েছে—

হারামী ভেলুয়া এখন নাহি আর ঘরে।।
ভালা কইন্যা বিয়া কইরা সুখে কর বাস।

বিভলা আমিরকে মিথ্যা করে জানিয়েছে ভেলুয়ার মৃত্যুর কথা। এমনকি তাকে সাগরের তীরে কবর দেওয়া হয়েছে বলেও সে জানিয়েছে। ভাইকে প্রতারণা করতে সে কৃষ্ণবর্ণের একটি কুকুরকে কবর দেওয়াবার ব্যবস্থা করেছে। নারী সুলভ কমনীয়তা বা স্নিগ্ধতার কোন পরিচয়ই তাতে মেলেনা। সে নারী জাতির কলঙ্ক রূপে উপস্থাপিত।

**ভেলুয়ার জননী**

নারী চরিত্রের মধ্যে এরপরই উল্লেখ করতে হয় ভেলুয়া-জননীর। ভেলুয়া-জননীর কারণেই আমির বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়েছে। সে ছোটবেলাতেই বোনের সঙ্গে সত্যে আবদ্ধ চিল যে তার যদি পুত্র হয় তবে তার সঙ্গে সে তার কন্যার বিবাহ দেবে। অতএব এখন সেই সত্য রক্ষার জন্য ভেলুয়ার সঙ্গে আমিরের বিবাহ দেওয়া চাই। ভেলুয়ার শ্বশুরালয়ে যাত্রার প্রাক্কালে সোনাই আমিরকে যে সব অনুরোধ করেছে, তাতে শাশ্বত জননীসত্তার পরিচয়ই প্রকাশিত হয়েছে—

আমার ভেলুয়ারে তুমি যওনে রাখিবা।
কনো অপরাধ হইলে তাহারে ক্ষেমিবা।।

অনুরোধ করেছে যেন ভেলুয়াকে দিয়ে গোবর ফেলানো না হয়, উঠান কুড়াতে না হয়, মরিচ বাটতে না হয় এবং জল তুলতে না হয়। সে বলেছে—

পরাণের পরাণ আমার দিলাম তোমার হাতে।
দুঃখু যেন না পায় কইন্যা ভাত আর পানিতে।।

চণ্ডীমঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনীর কণ্ঠে অনুরণিত প্রার্থনার সঙ্গে এই আবেদন তুলনীয়—

আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।

**আমির সাধু**

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখনীয় আমির সাধুর চরিত্র। চতুর্দশ বিদ্যায় সে

পারদর্শী। কোরাণ কেতাব সবই তার পড়া। তার আত্ম মর্যাদা বোধ প্রবল। সওদাগরের পুত্র বলে তার অহংকার বেশ। তাই তাকে বলতে দেখা গেছে–

হাইল্যার পোলা নহি যে মাও চাষ করি খাব।
জাইল্যার পোলা নহি যে খালত্ জাল বসাইব।।

সে কিছুটা নির্ভীক এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। তাই শিকারে যাত্রা করতে দেখা গেছে তাকে। তাদের নৌকা কূল ধরে যেতে থাকলে সে গৌরলধর মাঝিকে মাঝ দরিয়া দিয়ে নৌকা নিয়ে যাবার কথা বলেছে। মাঝি তার কথায় সম্মত না হলে নিজেই নৌকা মাঝ দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। তারপর যখন ডিঙ্গা পথহারা হয়েছে, বিপদেব সম্মুখীন হয়ে আমির হাজার টাকা সিন্নি দেবার মানসিক করেছে গাজী কালুর নামে। ভেলুয়ার কথা বলা পাখী হত্যার দায়ে সে ভেলুয়ার ভায়েদের হাতে বন্দী হয়েছে। শেষপর্যন্ত ভেলুয়ার সঙ্গে সে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। লক্ষণীয়, অন্যান্য পালায় প্রাক্ বিবাহ প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য পালাটিতে বিবাহ-উত্তর প্রেমেব বিবরণ উল্লিখিত। মাতার ভর্ৎসনায় সে বাণিজ্যযাত্রা করেছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বয়স তার অল্প, কিন্তু অল্পবয়সেই সে সংসারের নির্মম সত্যটি দিব্বি উপলব্ধি করেছিল–

মাতা বল পিতা বল হাউসের স্তিরী।
গিরেত্ পইসা ন থাকিলে কেহ ন চায় ফিরি।।

আমির সাধু সফল বণিক, তার প্রমাণ উজানী নগরে, মাছিলি বন্দরে তার বহুল পরিমাণে অর্থোপার্জন। আমিরের পত্নীপ্রেম অতুলনীয়। ভেলুয়ার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ অবগত হয়ে সে ধন দৌলত সব পরিত্যাগ করে ফকির হয়েছে। সে টোনা বারুইয়ের শিষ্য হয়েছে। ভেলুয়া আমিরের বাণিজ্যযাত্রার পর লব্ধ তার অন্তহীন দুঃখভোগের কথা জানিয়েছে। ভেলুয়া তাকে বলেছে দেশত্যাগ করে চলে যাবার কথা, কিন্তু আমির এ প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। তার স্পষ্ট জবাব–

আমি চোরার পোলা নই।
যাইতাম্ নয় ভোলার মতন চুরি করি লই।।

সে সুবিচার লাভের আশায় মুনীপ কাজীর শরণাপন্ন হয়েছে এবং যথারীতি সে প্রতারিত হয়েছে। তখন সে সৈন্য বলের সাহায্যে ভোলা ও কাজীকে পর্যুদস্ত করে ভেলুয়াকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু ভেলুয়া আমিরের গৃহে পৌঁছবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ভেলুয়ার জন্য আমিরেব আন্তরিক প্রয়াস, স্বেচ্ছা দুঃখবরণ, সারিঙ্গাসহ ভেলুয়ার কবরের কাছে পড়ে থাকা প্রমাণ করে তার অদ্বিতীয় পত্নীপ্রেম। একজন অকাল মৃত্যুর শিকার হয়ে জীবনকে ব্যর্থ করেছে, অপরজন মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিভার বহন করে জীবিত থেকেও জীবন্মৃত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে সম্ভাবনাময় জীবনকে অর্থহীন করে তুলেছে।

**ভোলা সওদাগর**

ভোলা সওদাগর মাছিলি বন্দর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে শাফলা বন্দরের ঘাটে

ভেলুয়াকে দেখে তার রূপশ্রীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে অপহরণ করে এবং বিবাহের প্রস্তাব করে বসে। নানাভাবে ভোলা ভেলুয়াকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। সে মিথ্যা '' র জানায় আমিরের মৃত্যুর কথা। ভেলুয়া তখন ইদ্দত পালনের জন্য একটি বৎসর সময় চেয়ে নেয়, কোনোভাবে সে ভোলার কামনাগ্নি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। কাজীর বিচারের সম্মুখীন হতে ভোলা ভেলুয়াকে মিথ্যা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তার শেষ চেষ্টা আর সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত আমিরের সৈন্য সামন্তদের হাতে তার পরাজয় ঘটেছে, অনিবার্য মৃত্যু লাভ হয়েছে তার।

**মুনাপ কাজী**

মুনাপ কাজী অতিশয় ধূর্ত, সে চোরের উপর বাটপাড়ি করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার চেষ্টাও ফলবতী হয়নি। বিচারের নামে চরম প্রহসনের ঘটনা ঘটিয়েছে সে। আমির তার কাছে ভোলার বিরুদ্ধে স্ত্রী অপহরণের নালিশ করেছে। কাজী এই সুযোগে ভেলুয়াকে আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করেছে। অথচ বয়স তাব নব্বই। তবু আসক্তির শেষ নেই তার। কবি তার স্বরূপ উদঘাটনের জন্য কিছু পূর্ব পরিচয় দিয়েছেন--

বয়েসকালে আছিল বেটা পাক্কা বদমাস।
শত শত কুলনারীর কইরাছে সর্বনাশ।।

সে একদিকে ভোলাকে ভাগিয়েছে, অপরদিকে ভেলুয়া আমিরের যোগ্য নয় বলে আমিরকেও ভেলুয়া লাভের ব্যাপারে নিরাশ করেছে। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। তাই সে আমিরকে বলেছে—

তোমার যোগ্য নয় এ বিবি কহিলাম সার।
আর একজন লুভি নিলে আসিবা আবার।।

ভেলুয়াকে গ্রাস করতে চেয়েও কাজী সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত সে ভোলার সাহায্য নিয়েও আক্রমণোদ্যত আমিরের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

**শ্যামরায়ের পালা**

শ্যামরায়ের পালাটি খুব ক্ষুদ্রাকৃতির। দীনেশচন্দ্র সেন এই পালাটিকে পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন, অপর পক্ষে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম খণ্ডে এই পালাটি সংকলিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালার ছত্রসংখ্যা যেখানে ৩৯৬, সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংকলিত পালার ছত্রসংখ্যা ৪১২, অর্থাৎ ১৬টি নূতন ছত্র সংযোজিত হয়েছে। পালাটির রচয়িতা জনৈক নিতাইচাঁদ। পালার একাধিক ক্ষেত্রে নিতাইয়ের নামটি উল্লিখিত হতে দেখা গেছে। যেমন,—

'নিতাই চান্দে ডাক দিয়া কয় ভুবন নিছিয়া'

'রঙ্গমালা সুন্দরী—চৌধুরীর লড়াই' পালায় বিবাহিতা রঙ্গমালার সঙ্গে জমিদার

রাজচন্দ্রের প্রেম বর্ণিত হয়েছে, রঙ্গমালা কুঞ্জের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় স্বেচ্ছায় স্বামী গৃহ করেনি। কিন্তু আলোচ্য পালায় বর্ণিত হয়েছে রাজপুত্র শ্যামরায় এক বিবাহিতা ডোমনীর প্রতি আসক্ত হয়ে পিতা চাঁদরায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে। লক্ষ্য করার যে ডোমনী কিন্তু অনেক পরে শ্যামরায়কে বুঝিয়েছে যে তার প্রতি আসক্ত হওয়া কিংবা তার জন্য রাজ্য ত্যাগ করা উচিত হবে না, কিন্তু অন্ধপ্রেম ত কোনো যুক্তি মানে না। শ্যামবায় জানিয়েছে :

তোমারে লইয়া লো কন্যাস হইব দেশান্তরী।
রাজ্য ছাইড়া যাইব আমি হইব দণ্ডধারী।।
গির করব বিরিক্ষের তল বসতি জঙ্গলা।।
গজমতি থুয়্যা গলায় পরব হাড়ের মালা।।

বাস্তবিক প্রেমের কারণে শ্যামরায় স্বদেশ, স্বজন ছেড়েছে, অঙ্গীকার করেছে কৃচ্ছ্রসাধনকে, ডোমের জীবিকা পর্যন্ত নিয়েছে, 'খাড়ি, বিউনি বানাইয়া বাজারে বিকায়।'

শ্যামরায়ের কৃচ্ছ্রসাধনে সঙ্কুচিত হয়েছে ডোমনী। সে শ্যামরায়ের দুঃখ ভোগের জন্য নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু তথাপি এদের কপালে সুখভোগ হল না। গাবুর রাজার চক্রান্তে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। গাবুর রাজা নিজেই ডোমনীকে পেতে চেয়েছে। কৌশলে সে পালিয়েছে। শেষে পিতৃ সাহায্যে শ্যামরায় গাবুর রাজার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শরাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ডোমনীও স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করে তার শ্যামরায়ের প্রতি অকপট ভালবাসার প্রমাণ রেখেছে।

পালাটিতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলতে রয়েছে 'দ্বৈতউক্তি', যেখানে নায়ক ও নায়িকার কথোপকথন স্থান পেয়েছে। নায়ক নায়িকাকে নানাভাবে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু নানা যুক্তিতে বিশেষত পাছে নায়ক কলঙ্কিত হয়, তাই তার সাহায্য নিতে ডোমনী অস্বীকার করেছে। কবি মাঝেমাঝেই প্রেমের স্বপক্ষে প্রচার চালিয়েছেন। যেমন—

ধুলা মাটি বাইছা লওরে পিরীত বড় ধন।
সুস্থান কুস্থান নাইরে সুজন কুজন।।

ক্ষেত্রবিশেষে কবি-কল্পনার পরিচয় মেলে। যেমন ডোমনী মৃত শ্যামরায়ের উদ্দেশে বলেছে :

দেহের মধ্যে পরাণ রে বন্ধু, পরাণের মধ্যে হিয়া।
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু, তবে রাখতাম লুকাইযা।।

কিংবা ডোমনীর অন্যত্র উক্তি :

'সুখেরে কইরাছি বৈরী দুঃখেরে দোসর।'

## হাতি খেদার গান

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডে 'হাতি খেদার গান' পালাটি সংকলিত হয়েছে। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক এই পালাটিকে স্থান দিয়েছেন তাঁর

সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৬ষ্ঠ খণ্ডে। পালাটির রচয়িতার নাম অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। তবে অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে কবি ছিলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। বন্দনার প্রথমেই কবি স্মরণ করেছেন আল্লাকে—'পরথমে আল্লার নাম করিয়া স্মরণ'। অন্যত্রও কবি বলেছেন, 'জন্মাবধি গুণা আল্লা তুমি কর মাফ।' 'বোমাবাজি', 'ফায়ার'-এর মত শব্দ ব্যবহারের কারণে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক আলোচ্য পালাটির রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন, 'সম্ভবত বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ।'

পালাটির বিষয় ফাঁদে ফেলে হাতী ধরার বিষয়। বিষয়ের দিক থেকে অভিনবত্ব স্বীকার করেও বলতে হয় কবি কাহিনীকে তেমন আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন নি, কেননা এতে গল্পরসের অনুপস্থিতি ঘটেছে। কোনো উল্লেখযোগ্য চরিত্র এতে সংযোজিত হয় নি। কবিত্ব শক্তিরও তেমন কোনো পরিচয় মেলে না। হাতী ধরা সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্যাদিই পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে। কিছু কিছু সমাজ জীবন সংক্রান্ত তথ্যাদিও উল্লিখিত হতে দেখা গেছে পালাটিতে। যেমন নৃত্যগীত ব্যবসায় রত সুন্দরী মহিলাদের চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার মুসলমানরা 'পোহনা পুরী' বলে (পোহনা পরীর মুল্লুক রে ভাই উত্তরদেশে জানি), ২৪ বিঘায় এক দ্রোণ জমি হত (পৈমাল করি গেল হাতি দোনাদোনি জাগা।), পাহাড়ে যে চাষ হয় তার নাম 'জুম' (জুম্মার জোম অইল নাশ বাঙ্গাল্যার গেল ক্ষেতি), ১$\frac{১}{৪}$ বিঘা জমি এককানি বলে বিবেচিত হত (খালি জাগা অইব রে ভাই, দশবারো কানী।।), একপ্রকার বড় কাঁসর বাজানোর রেওয়াজ ছিল যার নাম 'ভং' (বাজায় ভং কাঁসরত্, মারে বাড়ি।) ; এইবার হাতীধরা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা কার্যাবলীর কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে—যে ব্যক্তি হাতির জন্য কেল্লা প্রস্তুত করে তার নাম ডুলা হাজরা (কেহ হাতির কেল্লা মারে ডুলা হাজরায়।), বন্য জন্তুদের গতিবিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হলেন 'চৈকক্যাল' (সঙ্গেতে চৈকক্যাল্ চলে অতি হুসিয়ার।) হাতী ধরার পর তাকে শণ নির্মিত যে দড়িতে প্রথমে বাঁধা হয় তার নাম 'আলাত্' (ভালা ভালা আলাত্ লইল মোটা মোটা বাছি।), যারা বনে বনে ঘুরে পশুর সন্ধান করে তা শিকারীকে জানায় আরাকানী ভাষায় তারা গুঁইয়া নামে পরিচিত (এম্‌নি কালে আইল এক জোঙ্গলার গুঁইয়া।।), খেদা প্রস্তুতে দক্ষ কারিগরকে বলা হত সিকদার (কুলি আইল চৈকক্যাল আইল আইলরে হিকদার।), জংলা হাতীকে যেখানে রেখে পোষ মানানো হয়, তাকে বলে খেদার কেল্লা (এইনা মতে হস্বল হাতি কেল্লাত্ আনে টানি।) ইত্যাদি।

কবি একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন পালায়, হাতী খেদায় অংশ গ্রহণকারীরা বিলাপ করে বলেছে, 'গাছত্ কাঁট্টল দেহি আরে ঠোডত্ দিলম ত্যাল'। কয়েকটি মাত্র অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে যেমন : জোঙ্গলত খেদা যেমুন কারবালার ময়দান, হাতি ন চিনে রে খেদা যেমন জাল ন চিনে মাছ, শীত কাইল্যা বেল চলতি নুকা দেহিতে দেহিতে যায়, হাতির ঠ্যাং দেইখতে যেন গুদাম ঘরর থম্ ইত্যাদি। হাতির অত্যাচারে পীড়িত সাধারণ মানুষের আর্তি অত্যন্ত বাস্তব হয়েছে—

ধন নাই দৌলত নাই রে, আছে গায়ে ছিড়া তেনা।
বউয়র জেয়র বান্ধ্যা দিয়া করিলম যে দেনা।।
কেম্‌নে সুজিব দেন্‌ খাইল্যা রইল গোলা।
কি খাইব সোনার মানিক এক বছইরগ্যা পোলা।
নছিবের দোষে এইবার ভাসি গেল সব।
বললা হাতি অইল হায়রে, খোদার গজব।।

খেদায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের বিলাপ ও তাদের দুর্দশা বর্ণনা কিছুটা নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে—

কেওর পেড ফুলি উডে নুনা ইলসা খাই।

## কমল সদাইগরের পালা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৩য় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে কমল সদাইগরের পালাটি। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক এই পালাটির স্থান দিয়েছেন তাঁর সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডে। পালাটির রচয়িতার নাম অনুল্লিখিত থেকে গেছে। পালাটির আখ্যানটি চিত্তাকর্ষক, নানা ঘটনা ও চরিত্রে সমাকীর্ণ। পালাটি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,

'যদিও এই পালার সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী মনে করেন যে, ইহার কোনও না কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তদ্রূপ অনুমান সর্বৈব অমূলক।'

তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, 'বিমাতার চক্রান্তে শিশুদের দুর্দশার কাহিনী রূপকথা সাহিত্যের এতটা জায়গা জুড়িয়া আছে যে ইহা সহজেই মনে হয় যে এই পালাটি সেইসব পালার অন্যতম।...কমল সদাগর সেই বসন্তেরই রূপান্তর।'

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক পালাটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'চান্দমণি—সূর্যমণি' নাম না দিয়া 'কমল সদাইগর' নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে এই কমল সদাইগর পালাটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং এই পালার জনপ্রিয়তা দেখিয়া পরবর্তীকালে অপরগুলি রূপকথা আকারে রচিত ও প্রচলিত হইয়াছে। আখ্যান এবং পালায় বর্ণিত চরিত্রগুলি আলোচনার পূর্বে আমরা সংক্ষেপে আখ্যানটির পরিচয় গ্রহণ করতে পারি।

কাঁইচ্যা নদীর পাড়ে অবস্থিত বাসন্তী নগরে বসতি ছিল কমল সওদাগরের। অবস্থাপন্ন সওদাগর সে। বাণিজ্য করে তার প্রভূত সম্পদ। তার স্ত্রী রূপবতী, ভক্তিমতী ও কর্তব্য পরায়ণা সুরঙ্গিণী। তাদের দুটি সন্তান—চান্দমণি ও সূর্যমণি। বাড়ীর এক বিশ্বস্ত পরিচারিকা মইফুলা, অল্পবয়সের বিধবা এবং যৌবনবতী। আকস্মিকভাবে মৃত্যু হল সুরঙ্গিণীর। সুরঙ্গিণী মৃত্যুকালে দুই পুত্রের দায়িত্ব দিয়ে গেল মইফুল্লাকে। মুহুরী গোবর্ধনের পরামর্শে কমল সওদাগর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করল। দ্বিতীয় পত্নী

সোনাই, সে ধর্মমণির কন্যা, নিবাস ধরমপুর গ্রাম। কমল সওদাগর তার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুশোক বিস্মৃত হতে পারেনি, তাছাড়া তার ব্যবসাতেও খুব ক্ষতি হয়। বয়সের ভার ত ছিলই। ফলে সোনাইকে সে খুশী করতে পারেনি। সোনাই আকৃষ্ট হল গোবর্ধনের প্রতি। কৌশলে সোনাই কমলকে বিদেশে পাঠাল বাণিজ্য করতে। কমলের অনুপস্থিতিতে একদিকে সোনাই গোবর্ধনের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হল, অপরদিকে সতীন পুত্রদ্বয়কে হত্যা করার চক্রান্ত করল। এ ব্যাপারে সে সহায়তা নিল দুশ্চরিত্র মানিকের। কিন্তু মইফুলের সহায়তায় দুজনের জীবন রক্ষা পায়। ঘটনাচক্রে চান্দমণি দক্ষিণদেশের রাজসিংহাসন লাভ করে। সূর্যমণি আশ্রয়লাভ করে এক মেছুনির কাছে। শেষপর্যন্ত দুই পুত্র ও পিতার মিলন ঘটে। কমল সওদাগর সোনাইকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করে নিজেও আত্মঘাতী হতে গিয়ে পুত্রদের দ্বারা প্রতিহত হল। মইফুলের সন্তানও মিলল অবশেষে।

আখ্যানটির সঙ্গে মনসুর বয়াতী রচিত 'দেওয়ানা মদিনা'র অনেকখানি সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 'দেওয়ানা মদিনা'তেও বর্ণিত হয়েছে দেওয়ান সোনাফরের প্রথমা স্ত্রী আলাল ও দুলাল নাম্নীয় দুই পুত্র সন্তান রেখে মৃত্যুলোকে পাড়ি জমায়। দেওয়ান কমল সদাগরের মত প্রথমে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহে গরবাজি ছিল। শেষে উজির নাজিরের অনুরোধে দেওয়ান দ্বিতীয়বার বিবাহ করল। কমল সদাগরও গোবর্ধনের ও পাড়া প্রতিবেশীদের নির্বন্ধাতিশয্যে দ্বিতীযবার বিবাহ করেছে। দেওয়ানা মদিনাতে সোনাফরের প্রথমা পত্নী অনুরোধ করেছিল দেওয়ানকে সে যেন দ্বিতীয়বার বিবাহ না করে, সুরঙ্গিণী সেরকম কোনো অনুরোধ করেনি অবশ্য। তবে সে যেখানে মৃত্যুর পূর্বে পরিচারিকা মইফুলার হাতে তার দুটি সন্তানকে সমর্পণ করে গিয়েছে, সেখানে দেওয়ানা মদিনায় প্রথমা স্ত্রী স্বামীর হাতেই আলাল-দুলালের দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে গেছে। দেওয়ানা মদিনায় দ্বিতীয়া পত্নী সতীন পুত্রদের হত্যার জন্য জহ্লাদ নিযুক্ত করেছে, কমল সওদাগর পালায় সোনাই চান্দমণি-সূর্যমণিকে হত্যার জন্য নিযুক্ত করেছে মানিককে। দেওয়ানা মদিনায় জহ্লাদ করুণা পরবশ হয়ে আলাল দুলালকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছে এবং এক সওদাগরের নৌকায় তুলে দিয়েছে। মানিকও মইফুল্লার সঙ্গে পরামর্শ করে চান্দমণি-সূর্যমণিকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছে। দেওয়ানা মদিনায় বিমাতার ভূমিকা যেখানে সীমিত পরিসরে উপস্থাপিত, সেখানে কমল সওদাগরের পালায় বিমাতা সোনাই প্রায় আখ্যানের শেষপর্যন্ত যুক্ত থেকেছে। 'দেওয়ানা-মদিনা'য় সৎমা তার কৃতকর্মের ফলভোগ তেমন করে করেনি। কিন্তু কমল সওদাগবে সোনাইকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হয়েছে তার কৃতকর্মের জন্য।

পালা শুরু হয়েছে সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। অবিমিশ্র সরস্বতীর বন্দনা যুক্ত পালা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মোট ২১টি পরিচ্ছেদে পালাটি সমাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ পালা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবরণ অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ করা হয়েছে যেমন, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটনাকে অতিশয় সংক্ষিপ্ত করে কাহিনীতে গতি সঞ্চার করা হয়েছে।

যেমন পালারম্ভেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে কমল সওদাগরের চকমিলান বাড়ীর বিবরণ এবং তাঁর সুবিপুল ঐশ্বর্যের বিবরণ, বারোমাসে তাদের গৃহে অনুষ্ঠিত হয় যে সব ব্রতপার্বণ সে সবের কথা, এমনকি বিভিন্ন কর্মচারীর প্রসঙ্গ। অথচ সুবঙ্গিণীর অসুস্থ হওয়া, তার মৃত্যু বরণ এবং শ্রাদ্ধাদিব বিববণ সীমিত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গ ক্রমে কবি তাঁর মন্তব্য বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সংযুক্ত করেছেন। যেমন—

ক. কপাল যহন ভাঙ্গে তহন
ডাঙ্গায় কুইমরে খায়।

খ. ট্যাকা পইসা জাইন্য রে ভাই
শীতের জুয়াইরা জল
খেনে আইসে খেনে যায়
মানুষের ভাইগা একটা ছল।।

গ. সুখ না থাকিলে মনে রাইজ্য কিবা ছার।
পরমান্ন কি ভালা লাগে পেডর অসুখ যার।।

পালার নানা স্থানেই কবি কর্তৃক বেশ কয়েকটি প্রবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন—

ক রাজার দোষে রাইজ্য নষ্ট পরজা কষ্ট পায়।

খ. সোনা রূপা নষ্ট জাইন্য তামা আর পিতলে।
রাজা নষ্ট অবিচারে মধু নষ্ট জলে।।

গ. মাছে চিনে গভীর পানি, নাইয়া চিনে ধার।
মায়ে জানে পুতের বেদন জন্ম গর্ভে যার..

অলঙ্কার প্রয়োগে কবি বাস্তবতাবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হল—মানুষের মনের চাঞ্চল্য বোঝাতে কবি কচুপাতায় সঞ্চিত জলের তুলনা দিয়েছেন—

মানুষের মনরে জাইন্য কচুপাতায় জল।
লড়াচড়া খাইলে ভাইরে, করে টলমল।।

যৌবনবতী সোনাই রসবোধহীন ও ছলাকলায় অভিজ্ঞতাশূন্য কমল সওদাগরের প্রতি বিরূপ। সে সেই বিরূপতা প্রকাশ করেছে কমল সওদাগবকে শুষ্ক মাদার কাঠের সঙ্গে তুলনা করে—

সদাইগর শুকা-কাঠ মাদারের লাকড়ি।।
রসের অভাবে আমি শুকাইয়া মরি..

বিপরীতক্রমে কমল সওদাগরের মুহুরী গোবর্ধনের প্রতি আকৃষ্ট সোনাই। তাকে নবীন মেঘের সঙ্গে এবং নিজেকে চাতক পাখীর সঙ্গে তুলনা কবে বলেছে—

চাতক ফুকারে যেমুন নবীন মেঘ বিনে।
তোমার লাগি তেমুন কান্দি আমি রাইত দিনে।।

গোবর্ধনের সান্নিধ্য লাভ ব্যতীত সোনাইয়ের অবস্থা কি করুণ হয়ে ওঠে, তার বিবরণে বলা হয়েছে—

জল বিনে মচ্ছ যেমুন ছট্‌পট্‌ করে।
তেমুন করিয়ে আমি ঘরে তোমার তরে।।

সোনাই গোবর্ধনকে অবৈধ মিলনে প্ররোচিত করলে গোবর্ধনের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার বর্ণনাটিও উপভোগ্য—

তেতুল লাড়িলে কেহ মুখর কাচে আনি।
কেম্‌নে সম্বরি হায় রে রাখি জিব্বার পানি।।

চান্দমণি ও সূর্যমণিকে হত্যার জন্য সোনাইয়ের ব্যগ্রতার মূলে তার দৃষ্ট একটি স্বপ্নকে কারণ রূপে যুক্ত করে কবি অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। এরই মাধ্যমে কবি সোনাইয়ের পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন—

গোবর্ধনের গলাত্‌ দেখে লাগি গেল ফাঁসি।
ছাড়াই দিল গলার দড়ি সুরঙ্গিণী আসি।।
সাইগরে পড়ি সোনাই হাপুড়ুপু খায়।
নুনা জলে পেড ফুলি দম ন বাইরায়।।

ক্ষেত্র বিশেষে অপূর্ব কবিকল্পনার স্বাক্ষর মেলে—বৃক্ষতলে নিদ্রামগ্ন চান্দমণি ও সূর্যমণি প্রভাতকালীন সূর্যালোকে রঞ্জিত হলে তার বিবরণ দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

রাঙ্গা সুরুজ ঢালি দিল গায়ত্‌ সোনার কিরণ।

স্বপ্নদর্শনে ভীতা সোনাই সতীন পুত্রদ্বয়কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে গোবর্ধনকে ছুরি দিয়ে তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে বলেছে। কিন্তু শত প্ররোচনা সত্ত্বেও এই অমানবিক কাজ গোবর্ধন করতে পারেনি। কবি এই ব্যাপারে তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—

মনত্‌ পড়িল হায় রে সদাইগরের কথা।
আর ত মনত্‌ পড়িল সুরঙ্গিণী মাতা।।

সোনাই মইফুল্লাকে বিবাহ দেবার, বিষয় সম্পত্তির প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে তার মাধ্যমে সতীন পুত্রদ্বয়, যাদের সে পথের কাঁটা বিবেচনা করেছিল, সরাতে চেয়েছিল, কিন্তু যখন বুঝল যে তা হবার নয়, মইফুল্লা মনিব পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে স্নেহের সূত্রে আবদ্ধ, তখন অতি দ্রুত তার বক্তব্য পরিবর্তিত করে মইফুল্লার কাছে ভালোমানুষ সাজার যে চেষ্টা করেছে, তা কিছুটা কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে—

শুন শুন মইফুল্লা, বলি যে তোমারে।
বড়ো ভালবাসি আমি দুইডা কুমারে।।
সদাইগর দিয়া গেল তোমার উপর ভার।
পরখ করি দেখিলাম যোগ্যতা তোমার।।

দক্ষিণদেশের রাজার মৃত্যু হলে তাঁর শূন্যস্থানে শ্বেতহস্তী কর্তৃক চান্দমণিকে

অধিষ্ঠিত করার বিবরণটি পালাটিতে রূপকথার আমেজকে যুক্ত করেছে। অবৈধ প্রেমে লিপ্ত বিশ্বাসঘাতিকা সোনাইয়ের করুণ পরিণতি কাহিনীতে Poetic Justice কেই বড় করে তুলেছে। সূর্যমণির পেটের জল নিষ্কাশনে মেছুনি কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই প্রতিফলিত করেছে—

মাডির কলস একটা তানি উপুর করি.
তার উপরে যাদুধনরে শোয়াইল চিত করি।।
হাত পাও লাড়িয়া তার চিকিৎসা করিল।
পেডের জল ধীরে ধীরে বাইর হইল।।

এইবার চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গ।

## সুরঙ্গিণী

কমল সওদাগরের প্রথমা স্ত্রী সুরঙ্গিণী। নানাগুণের আধার সে। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে সে জননী স্বরূপিণী। গৃহে অতিথি ব্রাহ্মণের নিত্য সৎকার তার দ্বারা হয়। অপরদিকে ভক্তিমতী সে বৈশাখে তুলসী গাছে ঝারা বাঁধা থেকে শ্রাবণে মনসা পূজা, ভাদ্রে ভদ্রকালীর আরাধনা সবই করে। সতীসাধ্বী রমণী সে। দুটি সন্তানকে রেখে সে মৃত্যু মুখে পতিত হল। তার জনপ্রিয়তার পরিচয় মেলে তার মৃত্যুতে বিশেষত গরীব দুঃখীদের প্রতিক্রিয়ায়। পাড়া প্রতিবেশীরা যেমন তার মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, তেমনি গরীব দুঃখীরাও কেঁদেছে।

## সোনাই

কমল সওদাগরের দ্বিতীয়া স্ত্রী সোনাই, সে ছিল সুরঙ্গিণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মমণির কন্যা সে। রঙ্গরসে মন তার। তার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তিতে কমল সওদাগর ব্যর্থ হওয়ায় সে আসক্ত হয়েছে কমল সওদাগরের মুহুরী গোবর্ধনের প্রতি। সুদর্শন গোবর্ধনকে নষ্ট করেছে সে। নির্লজ্জ কামাসক্ত সোনাই স্বামীর কর্মচারীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়েছে। তাদের অবৈধ প্রেমের পথে অন্তরায় হওয়ায় কৌশলে সোনাই কমল সওদাগরকে বিদেশে বাণিজ্য যাত্রায় প্রেরণ করেছে। এরপর পাছে সতীন পুত্রদ্বয় কর্তৃক তার স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, সেই ভয়ে তাদের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। দুশ্চরিত্র মানিকের সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং তাকে দারোয়ানের চাকরী দিয়ে পরিচারিকা বিধবা যুবতী মইফুল্লার গৃহের পাশে থাকতে দিয়েছে যাতে তার হাতে পড়ে মইফুল্লা নষ্ট হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত নিজের সতীত্ব রক্ষার্থে মইফুল্লা তার পুরানো মনিবগৃহ তাগ করে গেছে। এইবার যখন চান্দমণি ও সূর্যমণির স্বার্থরক্ষার কেউ রইল না, তখন তাদের হত্যার জন্য তলোয়ার দিয়ে বলেছে—

ন থিয়াইও ভাই আমার, ন কইও কথা।
চট্‌করি কাডি আনে দেনো যাদুর মাথা।।

একজন নারী হয়েও সে যে কতখানি হৃদয়হীনা, স্বার্থপর নীচাসক্ত, তার পরিচয় মেলে এই ঘটনাতেই। মইফুল্লার কারণে মানিক শেষপর্যন্ত কমল সওদাগরের পুত্রদ্বয়কে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছে, আর সেই কারণে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে মানিকের ওপর। যে মানিকের সঙ্গে সে ভাইয়ের সম্পর্ক পাতিয়েছিল, তাকে সম্বোধন করেছে 'লুচ্চা' বলে, এবং তাকে চরম পরিণতির ভয় দেখিয়েছে। সোনাইয়ের কারণেই চান্দমণি ও সূর্যমণিকে গৃহহারা হতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত অবশ্য তাকে তার পাপের ফলভোগ করতে হয়েছে। কমল সওদাগর কর্তৃক সে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এইভাবেই Poetic Justice রক্ষিত হয়েছে।

**মইফুল্লা**

স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে এরপর উল্লেখযোগ্য হল মইফুল্লা। সে অল্পবয়সের বিধবা। কমল সওদাগরের বাড়ীর দাসদাসীর মধ্যে সেই ছিল প্রধানা। কর্ত্রী সুরঙ্গিণী মৃত্যুর আগে তারই হাতে তার দুই পুত্রের ভার ন্যস্ত করে গেছিল। সে সেই অনুরোধ শত প্রতিকূলতার মধ্যেও রক্ষা করেছে। বিমাতা কর্তৃক নির্যাতিত চান্দমণি ও সূর্যমণির জন্য সে নীরবে চক্ষের জল ফেলেছে। ক্ষুধায় দুই ভাইকে খাইয়েছে, তৃষ্ণায় পানীয় দিয়েছে। চান্দমণি-সূর্যমণিকে সে গর্ভে ধারণ না করলেও তাদের প্রতি সে গর্ভধারিণীর মতই অকৃত্রিম অপত্য স্নেহের পরিচয় দিয়েছে। দ্বিতীয়ত সে প্রমাণ করেছে যে সে সতীসাধ্বী রমণী। মইফুল্লাকে হাত করার জন্য সোনাই তার গলার হার তুলে দিয়েছে, অগ্নিপাটের শাড়ী উপহার দিয়েছে। তার সঙ্গে সখীত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এমনকি ভরা যুবতী মইফুল্লাকে পুনরায় বিবাহ দেবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিনিময়ে চেয়েছে সে যেন কমল সওদাগরের পুত্রদ্বয়ের হাত থেকে তাকে রক্ষা করে। কিন্তু সে এসব প্রলোভনের শিকার হয়নি। বরং প্রস্তাব শুনেই চোখের জল ফেলেছে। এরপর মইফুল্লার সতীত্ব নষ্টের জন্য সোনাই দুশ্চরিত্র মানিককে নিযুক্ত করেছে। গভীররাতে মানিক মইফুল্লার সতীত্ব বিনাশে উদ্যত হলে সে গর্জে উঠেছে—

ঝাঁড়ার বাড়ি মারি তর আতর মাখা মুখে।
তুই মোর হাত ধরলি মরি যাই দুখে।।
একাদশী পালি আমি একা সিদ্ধা খাই।
মাথার চুল ফালাইছি আমি গঙ্গার সিনানে যাই।।
শোর করি আমি এখন ভাঙ্গি আনিব পাড়া।
মা ভৈন কি নাই তর অরে লক্ষ্মীছাড়া।।

মানিকের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি। নিজের সতীত্ব রক্ষার্থে মইফুল্লা সওদাগর গৃহ পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু সওদাগরের দুটি ছেলের জন্য সে কেঁদেছে। এরপর মানিক সওদাগরের দুটি ছেলেকে হত্যা করতে উদ্যত হলে মইফুল্লা যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে তাদের বাঁচিয়েছে। ছেলে দুটির কারণেই সে উন্মাদিনী পর্যন্ত হয়েছে।

**কমল সওদাগর**

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রধান কমল সওদাগর। সে সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রথমা স্ত্রী সুরঙ্গিণীকে সে প্রাণ ভরে ভালবাসত। তার মৃত্যুর পর গোবর্ধন ও অন্যান্যদের পরামর্শে সে সোনাইকে বিবাহ করে বটে, কিন্তু বেচারী সোনাইয়ের মন সে পায়নি। স্ত্রী অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়েছে। সহজ সরল কমল সওদাগর কিছুই বুঝতে পারেনি। সোনাইয়ের পরামর্শে সে বাণিজ্যযাত্রা করেছে। আর এইভাবেই সে তার পারিবারিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে মূলতঃ তারই কর্মচারী গোবর্ধনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সোনাইয়ের অবৈধ ক্রিয়াকলাপ এবং সতীন পুত্রদের হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে গোবর্ধনকে বন্ধন করার নির্দেশ দিয়েছে আর সোনাইকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে নিজে আত্মঘাতী হতে উদ্যত হয়েছে। পুত্ররা তাকে তা থেকে বিরত করেছে।

**মানিক**

মানিক দুশ্চরিত্র। লম্পট। সে মইফুল্লার সতীত্ব নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল। তথাপি তারও প্রাণে কিছু মায়া মমতা ছিল। তাই সওদাগর পুত্রদ্বয়কে হত্যার জন্য নিযুক্ত হয়েও সে তাদের হত্যা করেনি।

গোবর্ধন মানিকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।

## আয়না বিবির পালা

দীনেশচন্দ্র সেন 'আয়না বিবি'র পালাকে স্থান দিয়েছেন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডে। অপরপক্ষে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খণ্ডে পালাটি সংকলিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালাটির ছত্রসংখ্যা যেখানে ৫১৯, সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত পালাটির ছত্রসংখ্যা ৭৫২, অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ২৩৩টি ছত্র নূতন। ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত পালায় সংযোজিত দশম ও একাদশ অধ্যায় দুটি নূতন, দীনেশচন্দ্রের সংকলনে এই দুটি অধ্যায় অনুপস্থিত। পালাটির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। তবে পালার বর্ণনা থেকে মনে হয় কবি ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

উজ্জ্যাল মামুদ ব্যবসার সূত্রে বেরিয়ে ঘটনাচক্রে আয়নার সঙ্গে পরিচিত হল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল পরস্পরের মন দেওয়া নেওয়া। বাণিজ্য শেষে, পুনরায় উজ্জ্যাল উপস্থিত হল আয়নাদের বাসস্থানে, কিন্তু সেখানে আয়নার সাক্ষাৎ মিলল না। পিতার মৃত্যুর পর আয়না আশ্রয় নিয়েছিল মামার কাছে। মামা যখন তার ছেলের সঙ্গে আয়নার বিবাহ দিতে উদ্যোগী, এমন সময়ে পুনরায় আয়নার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল উজ্জ্যালের। রাত্রে উজ্জ্যাল আয়নাকে নিয়ে যাত্রা করল নিজের দেশের উদ্দেশে। বিবাহ হল মুসলমান শাস্ত্রমতে উভয়ের।

বিবাহের পর মাস ছয়েক অতিবাহিত হবার পর আয়নাকে গৃহে রেখে পুনরায় উজ্জ্যাল বাণিজ্য যাত্রা করল। কিন্তু বাণিজ্যযাত্রা শেষে, ভাগীদার ফিরলেও উজ্জ্যাল

ফিরল না। আয়না স্বামীর সন্ধানলাভের জন্য গৃহত্যাগিনী হল। সুজন সওদাগর ও তার পুত্রের সহায়তায়, অনেক ক্লেশ স্বীকার করে আয়না গারুয়ার গৃহে সন্ধান পেল স্বামীর, তাকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এল। মোল্লা—মৌলানারা ফতোয়া দিলেন অসতী আয়নাকে নিয়ে সংসার করা চলবে না, তাকে দেশান্তরে দূর করে দিতে হবে। নতুবা উজ্জ্যালকে সমাজচ্যুত হতে হবে। উজ্জ্যাল সমাজের রক্তচক্ষুর কাছেই আত্মসমর্পণ করল। কৌশলে বনে পরিত্যাগ করে এল আয়নাকে। শেষে কুরুঞ্জিয়া দলের সঙ্গে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে ঘুরতে আয়না উপস্থিত হল একদিন তার স্বামীর গৃহে। দেখলে তার স্বামীর নূতন ঘর-সংসার। আয়নাকে চিনতে না পারলেও উজ্জ্যালের ভগিনী ও জননী কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল। আয়না এরপর দরিয়ায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। উজ্জ্যাল তার সন্ধানে গৃহত্যাগী হয়েছে।

আয়না বিবির চরিত্রটি ত্যাগ ও তিতিক্ষায় সমুজ্জ্বল। যে স্বামীর জন্য সে অনিশ্চিত পথের পথিক হয়েছে, যে পতিপ্রেমকে সম্বল করে স্বামীকে গৃহে ফিরিয়ে এনেছে, সমাজের বিধান মেনে উজ্জ্যাল তাকেই পরিত্যাগ করেছে। যদিও পালাটির শেষে বর্ণিত হয়েছে আয়নার সন্ধানে উজ্জ্যাল বিদেশযাত্রা করেছে, ফকির হয়েছে, তথাপি সমাজের রক্তচক্ষুর কাছে আত্মসমর্পণ করে, নির্দোষ আয়নাকে ত্যাগ করার কারণে তার যে সামীহীন দোষ, তাতে তা লাঘব হয় না। যে আয়নায় জন্য একদা উজ্জ্যাল গৃহত্যাগী হতে চেয়েছিল, তারই কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল, সমাজের দুঃশাসনকে নতমস্তকে মেনে নিয়ে দিব্বি সংসারী হয়েছে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। এমনকি কুরুঞ্জিয়ার ছদ্মবেশে আয়নাবিবি তার গৃহে উপস্থিত হলে উজ্জ্যালের জননী এবং ভগ্নী তাকে চিনতে পারলেও এবং আয়নাকে গৃহে আসার নিমন্ত্রণ জানালেও উজ্জ্যাল তাকে ঘুণাক্ষরে চিনতে পারেনি। পাঠকের সহানুভূতি স্বভাবতঃই আয়নাবিবির প্রতিই ধাবিত হয়।

পালাটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ হল দীর্ঘকাল পরে আয়নার ছদ্মবেশে উজ্জ্যালের গৃহে উপস্থিত হওয়া, আর সেই উপলক্ষ্যে তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় কবির অসাধারণ সাফল্য।

আস্তে বেস্তে যায় কন্যা
আরে আপনার বাড়ী রে।।
পাও নাই সে চলে কন্যার
আরে হিয়া কাঁপে থর থরিয়ে।।

একদা যে গৃহ ছিল তারই, এখন সেখানেই সে অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত। যে গৃহের সঙ্গে তার কতদিনের সুখকর স্মৃতি বিজড়িত, আজ সেখানেই সে উপস্থিত হয়েছে নিতান্ত অপরিচিতের মত. কবি তার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন।

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে উপস্থিত হয়ে আয়না উঠানের কিনারায় মেন্দিগাছ দেখতে পায়, যেটিতে সে কত না জল দেলেছে, যেটি সে তার নিজের হাতে বপন করেছিল, কত স্মৃতি বিজড়িত এই গাছটি, কিন্তু আজ আর তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই--

উঠানের কানছায় দেখে
আরে, সেই না মেন্দি গাছের চারা।
রুইয়াছিল অভাগিনী আয়না
ঢাইল্যাছে কত না জলের ধারা।।

সব থেকে বড় প্রতিক্রিয়া তখনও অপেক্ষা করছিল। তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল উজ্জ্যাল তাকে ত্যাগ করলেও বিস্মৃত হতে পারবে না, তাকে পরিত্যাগ করে নূতন করে সংসার ফাঁদতে পারবে না, কিন্তু সেই আশাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল যখন দেখেছে উজ্জ্যাল দিব্বি বিবাহ করে দ্বিতীয়া পত্নী ও সন্তানসহ ঘর সংসারে মত্ত রয়েছে।

সোয়ামী তার পর হয়্যাছে
আর ত আশা নাই রে।।
বিয়া কইর‍্যা মামুদ উজ্জ্যাল
আইজ সুখে বইসা খায়।

আশা ভঙ্গের শিকার হয়েছে আয়না নিদারুণভাবে। কবি অনবদ্য তুলনা দিলেন এই প্রসঙ্গে—

বাউয়ের বাসা যেমন হায় রে
কামে নাই সে লাগে।
ঘর থাকিতে যেমন তারা
বাইরে বইসা ভিজে রে।।

কুরুঞ্জিয়া বেশী আয়নার জন্য তার ননদ ও শাশুড়ীর ব্যাকুলতা আমাদের দীর্ঘদিনের শাশুড়ি-বধু, ভ্রাতৃবধূ-ননদের তিক্ত সম্পর্কের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নবতর ছায়াপাত ঘটিয়েছে। যে কথা বলা উচিত ছিল উজ্জ্যালের, তাই বলেছে তার মা—

আয়না যদি হইয়া থাক্‌ছ লো কন্যা
আলো কন্যা, ঘরে ফিইরা আয়।
পান্‌-পঞ্চাইত্‌ ছাড়বাম্‌ লো কন্যা
আমি না ছাড়ুবাম্‌ তোমায়।।

গৃহহীন, স্বামীহীনের বেদনা অনন্ত, কিন্তু যে হতভাগিনী স্বামী, শ্বশুরালয় সব থাকা সত্ত্বেও কোন কিছুরই অধিকার পেল না, তার দুঃখের তো কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা হতে পারে না, এমনটিই ঘটেছে আয়নার ক্ষেত্রে। যে কোন আত্ম মর্যাদা বোধসম্পন্ন নারী এক্ষেত্রে যা করে আয়নাও তাই করেছে। কামনা করেছে—

সুখেতে থাকরে বন্ধু
তুমি পুত্তুর কোলে লইয়া।
সুখে কর গির-বাস
বন্ধু, সতীন রে লইয়া।।

এরপব সে দ্রুত গৃহত্যাগ করে দরিয়ায় জীবন বিসর্জন দিয়েছে। কুরুঞ্জিয়া জাতির

সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করে। ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণিত কবিকল্পনার সৌন্দর্য লক্ষণীয়। বাণিজ্যযাত্রায় উদ্যত উজ্জ্যালকে গৃহত্যাগে বাধা দিতে আয়নার যুক্তি—

খরতর ঢেউয়ের নদী রে
তাতে চলে যইবন তরী।
এমনকালে পতি ছাড়লে
না রইব কাণ্ডারী।।

ভরা যৌবনে স্ত্রীকে একলা রেখে যাওয়া স্বামীর অনুচিত—এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে খরস্রোতা নদীতে চলমান তরীর চিত্রকল্পের উপস্থাপনা আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। আর একটি চিত্রকল্পের উল্লেখ করতে হয়,—আষাঢ় মাসে বর্ষণরত আকাশকে মেঘের রাণী কর্তৃক জমিতে কলসী থেকে জল নিক্ষেপের চিত্রকল্পে ধরেছেন কবি—

কাঙ্কে কলসী মেঘের রাণী ফিরেন পাড়া পাড়া।
আশমানে খাড়ায়্যা জমিনে ঢালেন জলের ধারা।।

উজ্জ্যালের সন্ধানে আয়নার জল সংগ্রহের ছুতায় জলের ঘাটে উপস্থিত হওয়ার বিবরণটি উপভোগ্য—উজ্জ্যালের কারণে তার অমোঘ আকর্ষণের পরিচয়বাহী হয়েও স্নিগ্ধ হাস্যরসের আধার হয়ে উঠেছে বর্ণনাটি—

ভরা কলসী ঘরে লো কন্যা
আলো কন্যা তোর, পানির ঠেকা নাই।
ভরা কলসী ঢাইলা লো কন্যা
আলো কন্যা, কেনে জলের ঘাটে যাই।।

সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে আমরা বলতে পারি :

'বারমাসীর বর্ণনা, পৌষের আঁধা এবং শরতের শালিধানা হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়িয়া নদীর বন্যা এবং ভাদ্রমাসের চাঁদনি পর্যন্ত এই দেশের ঋতুভেদে যে বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বাংলার পল্লীচিত্র যেন আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।'[২৫]

প্রবাদের মত একটি বাক্যের ব্যবহার করেছেন কবি উজ্জ্যালের জন্য প্রতীক্ষারত আয়নার বকলমে—

'রাইত আমার কাইন্দ্যা কাটে
দিনের আশায় বইয়া।'

পালার আর একটি ক্ষেত্রের বর্ণনা খুবই দ্যোতনা মণ্ডিত। অপরিচিত আয়নাদের গৃহে উপস্থিত হয়ে উজ্জ্যাল আগুন যাচ্ঞা করেছে। সেইমত আয়না উজ্জ্যালকে আগুন এনে দিয়েছে—

এই কথা শুনিয়া উজ্জ্যাল আগুন মাগিল।
ডেউয়ায় করিয়া কন্যা আগুন আইনা দিল।।

এ কি শুধু আক্ষরিক অর্থের আগুন, না প্রেমাগ্নি? অর্থ করা যেতে পারে উজ্জ্যাল

প্রেমাগ্নি যাজ্ঞা করলে আয়না বিবি সেই যাজ্ঞায় সাড়া দিয়েছে। অন্ততঃপক্ষে একটি অলঙ্কারে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। উজ্জ্যাল বাণিজ্যযাত্রা করেছে, অনিশ্চিত সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত সন্তানের জন্য সদা চিন্তিত জননীর প্রতিক্রিয়া কিরূপ, না—

অভাগিনী ঘুইবা বেড়ায় কুম্ভকারের চাক।

আয়না বিবি পালায় মুখ্য আকর্ষণই হল আযনার অতুলনীয় পতিপ্রেম এবং বিনিময়ে স্বামীর চরম বিশ্বাসঘাতকতায় তার করুণ পরিণতিলাভ। আয়না বিবি পাঠকচিত্তে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, পালাগুলির অসংখ্য নারী চরিত্রের মধ্যেও সে পূর্ণ দীপ্তিতে বিরাজ করবে।

## আয়না বিবির পালা : ব্যর্থ প্রেমের কাব্য

"Our sweetst songs are those
That tell of saddest thought.".

বিচ্ছেদ-বেদনা, বিরহ-যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস আমাদের যত সহজে টানে, ততটা কিন্তু মিলনাত্মক কাহিনী টানে না। শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিং লীয়র তাই 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' ইত্যাদির তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে আদৃত। আয়নাবিবি পালায় মুখ্য চরিত্ররূপে আমরা পাই আয়নাবিবিকে। তার জীবনের বিয়োগান্তক পরিণতি এই আখ্যানের মুখ্য উপজীব্য।

ব্যবসায় বেবিয়ে উজ্জ্যাল সাধু উপস্থিত হয়েছিল আয়নাদের গৃহে। আয়নার অশক্ত বৃদ্ধ পিতার উপার্জন ক্ষমতা নেই। স্বভাবতই দারিদ্র্য পীড়িত তাদের সংসার। বৃদ্ধ পিতা চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত একমাত্র কন্যার বিবাহের ব্যাপারে। ঘটনাচক্রে জানা গেল বৃদ্ধ উজ্জ্যালের পিতৃবন্ধু। আয়না ও উজ্জ্যাল সাধু—প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলল— 'love at first sight'।

ব্যবসা শেষে ছ'মাস পরে দেশে ফেরার পথে উজ্জ্যাল আয়নাদের সন্ধানে গেল। কিন্তু খোঁজ পেল না—শুধু জানল আয়নার পিতার মৃত্যু হয়েছে।

"পাড়াপড়শী জনে উজ্জ্যাল আয়নার কথা পুছে।
কেউ জানে কেউ না জানে কেউ কয় মন্দ।।"
আর একদিন গেল সাধুর না ঘুচিল মন্দ।।
সন্ধান না পাইল আয়নার গেরামে গেরামে ঘুরি।
তিনদিন পরে আইল আপন নায়ে ফিরি।।

শেষপর্যন্ত আয়নাকে আবিষ্কার করে সে আয়নার মাতুলালয়ে—

"মামুর বাড়ী আছি আমি বাপ গেছে মারা।
ছয়মাস ধইরা আমার কাঁদন কাটি সারা।।
মামুর পোলার সঙ্গে আমার দিতে চায় বিয়া।
পন্থের পানে চাইয়া আচি তোমার লাগিয়া।।

পরের মাও বাপেরে আমি ডাকি বাপ মাও।
যে দেশে যাইবা বন্ধু, আমারে সঙ্গে লয়্যা যাও।।"

উজ্জ্যাল সাধু তো একপায়ে খাড়া। সেই রাত্রেই সে আয়নাকে নিয়ে নিজের দেশের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। শুরু হয় তাদের সুখী দাম্পত্যজীবন।

"মামুদ উজ্জ্যাল হাটে যায় রে কিন্যা আনব কি।
আয়না বিবির লাইগা আন্‌ব আবের চিরুণী।।
উজ্জ্যাল মামুদ হাটে যায় রে কোনাকুনি পথ।
আয়নার লাইগা কিন্যা আনব নাকের বলাক নথ।।

বন্দরে যায় উজ্জ্যাল মামুদ বেচিতে ফসল।
আয়নার লাইগ্যা আনব কিন্যা সাঁচ্চা গন্ধ তেল।।
সাঁচ্চা গন্ধ তেল আর গুলাবী আতর।
উজ্জ্যালেরে করে আয়না কত না আদর।।"

কিন্তু এই সুখী দাম্পত্যজীবন দীর্ঘায়িত হয় না। উজ্জ্যাল পুনরায় বাণিজ্য যাত্রার প্রস্তুতি নেয় এবং আয়নাকে জানায়—

"মাও আছে বইন আছে থাইক তাদের নিয়া।
ছয়মাস পরে লো আমি আইবাম ফিরিয়া।।
ছয়মাস রইবা লো আয়না তুমি হইয়া অবর নারী।
আমার না মাও লো আয়না তোমার শাশুড়ী।।"

কিন্তু, উজ্জ্যাল সেই যে বাণিজ্যযাত্রা করল, আর তার নাগাল নেই। নানা দুশ্চিন্তায় কাল কাটে আয়নার। যথাসময়ে ভাগীদার ফিরে এনে জানাল, উজ্জ্যালের নৌকাডুবি হয়েছে। স্বামীর শোকে কাতরা হল আয়না। তার কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় হল স্বামী জীবিত আছে—উজ্জ্যাল মরে নি।

নিজের এই বিশ্বাসের ওপর ভর করে আয়না স্বামীর সন্ধানে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। পেটে তার দানা নেই, মুখে নেই জল। চোখের জল আর বুকের আশাই তার একমাত্র সম্বল। শেষপর্যন্ত গারুয়ার ঘরে অসুস্থ উজ্জ্যালের সন্ধান মিললে আয়না তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। তিনমাসের সেবার পর উজ্জ্যাল সুস্থ হল। কিন্তু মোল্লা মৌলানারা উজ্জ্যালকে জানাল, আয়না অসতী। কেননা সে রাতে একাকিনী ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। তাই আয়নাকে পত্রপাঠ বিদায় করতে হবে। নতুবা উজ্জ্যাল সমাজচ্যুত হবে।

এক বন্ধুগৃহে যাওয়ার নাম করে উজ্জ্যাল আয়নাকে বনের মধ্যে ছেড়ে এল। বনের মধ্যে আয়নার সঙ্গে কুরুঙ্গিয়াদের সাক্ষাৎ হল। তাদের কাছে আয়না আশ্রয় পেল। তাদের সঙ্গে সে নানা দেশে ঘোরে আর স্বামীর সন্ধান করে। কুরুঙ্গিয়া নারীর বেশে একদা সে উপস্থিত হল উজ্জ্যালের গৃহে। ইতিমধ্যে কয়েকবছর অতিক্রান্ত। উঠোনে সে মেহেন্দি গাছটি দেখতে পেল। যে গাছের চারাতে একসময় সে জল ঢেলেছিল। কিন্তু

নিজগৃহে আজ সে পরবাসী—

"সোয়ামী তার পর হয়্যাছে
আর তো নাইরে আশা।
বিয়া কইরা মামুদ উজ্জ্যাল
আইজ সুখে বইসা খায়।।
অভাগী দুঃখিনী আয়না
আইজ পন্থে কান্দিয়া বেড়ায়।।
কোলেতে সুন্দর ছাওয়াল
আরে ভালা কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
পুত্তুর কোলে লইয়া সতীন
আরে কত আলাঝালা করে রে।।

এ পর্যন্ত সে বিশ্বাস করতে পারে নি যে তার স্বামীই তাকে স্বেচ্ছায় বনবাসে দিয়ে এসেছে। এখন তার কাছে সবই স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার শাশুড়ী 'আয়না' বলে সন্দেহ প্রকাশ করলে এবং তার পরিচয় জানতে চাইলে সে জানায়

"মাও আমার নাই দুনিয়ায়
বাপ আমার সে নাই
দারুণ কপালের দোষে
আমি সগলই হারাই।।"

উজ্জ্যালের সঙ্গে আর ঘর বাঁধার কোনোই সুযোগ নেই। আশাহত আয়না আত্মঘাতিনী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দরিয়ায় তার সলিল সমাধি ঘটল। মৃত্যুর আগে সে স্বামীর সুখীজীবন কামনা করল। উজ্জ্যাল যখন আয়নাকে আবিষ্কার করল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ফকির হয়ে দেশে দেশে সে আয়নার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু আর কোনোদিনও যে তাদের মিলন হবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হতভাগিনী আয়নার সুখী দাম্পত্যজীবন যাপনের সুখস্বপ্ন অকালে বিনষ্ট হল।

আয়নার ব্যর্থজীবন বাস্তবিকই করুণ ও মর্মস্পর্শী। সহজেই তা পাঠকচিত্তকে আর্দ্র করে তোলে।

## রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই পালা

বাংলা গীতিকাগুলির মধ্যে বৃহত্তম হল রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই পালাটি। দীনেশচন্দ্র সেন এই পালাটিকে স্থান দিয়েছেন পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খণ্ডে এবং ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক এই একই পালাকে স্থান দিয়েছেন প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ খণ্ডে। দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালাটির সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত পালার বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালাটির পদ্য ছত্রসংখ্যা যেখানে ২৭৫৭, সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্র সংকলিত পদ্য ছত্রসংখ্যা ৩০০২। দীনেশচন্দ্রের সংকলনে

যেখানে এগারোটি স্থানে গদ্যে বর্ণিত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্রের সংকলনে তেমন গদ্যবর্ণনা অনুপস্থিত, যাতে মূল ঘটনাটি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য হ'ল মূল ঘটনা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় নি, কাহিনীর পরিণতিও উভয় ক্ষেত্রেই একই থেকেছে।

আলোচ্য পালাটির যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে দীনেশচন্দ্রই সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নোয়াখালি গেজেটিয়ারের বিবরণ উদ্ধার করে তিনি লিখেছেন,—

'এই পরগণার সত্ত্বাধিকারীদের মধ্যে রাজচন্দ্র নামক একব্যক্তি রঙ্গমালা নামক কোন নর্তকীর প্রেমে পড়িয়া ভয়ানক জ্ঞাতি বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ঘটনা চৌধুরীর লড়াই নামে পালাগানে বিবৃত হইয়াছে।'

পালাটির মুখ্য বিষয় এইরূপ। শিশুকালে পালাটির নায়ক রাজচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। তাকে প্রতিপালন করেছিলেন খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌদুরী। রাজচন্দ্র অত্যন্ত লম্পট প্রকৃতির ছিলেন। আর তাকে অন্যায় কর্মে সহায়তা করার জন্য ছিল রামভাড়ালী। একদা রাজচন্দ্র রঙ্গমালা নাম্নী এক রমণীর প্রেমে পড়ে। রঙ্গমালার পিতার ইচ্ছায় বিশাল জলাশয় খনন করিযে দেবার ব্যবস্থা করে রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের সঙ্গে রঙ্গ-মালার সম্পর্কের কথা জেনে দুঃখিত হন রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। শেষপর্যন্ত রামভাড়ালীর কারণে সৃষ্টি হল রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে রাজচন্দ্রের মনোমালিন্য। রঙ্গ-মালার শোচনীয় মৃত্যু হল। রাজচন্দ্র রঙ্গমালার ইচ্ছানুযায়ী তার শেষকৃত্য সম্পাদন করল। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে আলোচ্য পালাটি সুবিশাল। সংক্ষিপ্ততা ধর্ম রক্ষিত হয়নি বললেই চলে, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে আখ্যানকে সংক্ষিপ্ত করার অভিপ্রায়ে বর্ণিত হতে দেখা গেছে—'একদিন দুইদিন করি মাস চলি গেল'। অনাবশ্যকভাবে আখ্যানটিকে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। বহু চরিত্রের সমাবেশে, নানা ঘটনারাজির উপস্থাপনায় আখ্যানটি জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে। নানা কারণেই আমাদের অন্যান্য গীতিকাগুলির তুলনায় বর্তমান গীতিকাটির স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করার মত। এতে কোনো বন্দনা অংশ সংযোজিত হয়নি। নায়িকা রঙ্গময়ী যে সুন্দরী ছিল তা আমরা অনুমান করতে পারি তার কাটামুণ্ডু দেখে রাজেন্দ্রনারায়ণের উক্তিতে, কিন্তু অন্যান্য গীতিকায় যেখানে নায়িকার রূপবর্ণনা বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপিত, সেখানে আলোচ্য পালায় কবি নায়িকার রূপের বিস্তারিত কোন বিবরণ দিলেন না। শুধু বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'দীঘির ঘাটে হইল যেমন উদয়।'

কিংবা,

'কইন্যার রূপ দেখি পড়ুদ্দের ফুল মুখ লুকায় সায়রে।'

তাছাড়া আলোচ্য পালায় নায়িকার বারমাসীও সংযোজিত হয়নি। অন্যান্য গীতিকায় যেখানে নায়ক-নায়িকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের বিবরণ উল্লিখিত, সেক্ষেত্রে আলোচ্য পালায় চক্রান্ত করে নায়ক-নায়িকার প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ততা অনুপস্থিত। রাজচন্দ্র বিবাহিত, তাসত্ত্বেও রমণীর প্রতি তার ছিল এক বিশেষ আসক্তি। আলোচ্য পালায় স্বামীত্যাগী রঙ্গমালার প্রতি তার আসক্তি যেন মোহের পর্যায়ে

পৌঁছেছিল, আন্তরিক প্রেম যেন তা ছিল না। রঙ্গমালার ট্রাজিক পরিণতিও যেন তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। রঙ্গময়ী বারংবার রাজচন্দ্রকে জলাশয় খনন ইত্যাদি বিষয়ে সাবধান করেছে এবং অশুভ পরিণতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। তাতেই পাঠকচিত্তও পূর্ব থেকেই যেন করুণ পরিণতি সম্পর্কে প্রস্তুত হবার সুযোগ পেয়েছে। শৌর্য, বীর্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কিছু কিছু পরিচয় পালাটিতে উপস্থাপিত, আবার অলৌকিকতার প্রভাবও উল্লেখযোগ্য পরিসরে পরিদৃশ্যমান। শ্যামপ্রিয়া কর্তৃক মন্ত্রপূত জল দীঘিতে নিক্ষেপ করায়, রঙ্গমালা সেইজলে স্নান করে প্রভাবিত হয়েছে—

বোষ্টমীর পড়াজল রঙ্গমালারে ঘিরিল।।
ঘটি ভরি পড়া জল রঙ্গ মাথাত্ তুলি দিল।
নয় গুণ মনর আগুন হায় রে, জ্বলি যে উড়িল।।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদেও বর্ণিত হয়েছে :

রাজার দীঘিত্ ছেয়ান করি রঙ্গ ঘরত্ ফিরিল।
মনর আগুন তার দ্বিগুণ বাড়ি গেল।।
কি করিব কোথায় যাইব ভাবি নাইত ॱায়।
কার লাগি পরাণ কান্দে বুঝান না যায়।।

রাজচন্দ্রের মন্ত্রপূত পান শ্যামপ্রিয়ার মাধ্যমে রঙ্গমালার কাছে পৌঁচেছে এবং তা খেয়ে রঙ্গমালার প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে—

রাজচন্দর পান পড়া হেকমত চালাইল।
রঙ্গমালার মনর আগুন জ্বলিয়া উডিল।।

দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন পালাটি 'বাংলাদেশের কোন এক বিশেষ যুগের নিখুঁত একখানি চিত্র হিসাবে মূল্যবান।' বস্তুত সমসাময়িক সমাজজীবনেব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে পালাটি সমৃদ্ধ, আর সেই কারণে এতে এক বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব যুক্ত হয়েছে। বশীকরণ, মারণ, উচাটন ইত্যাদির চল ছিল সমাজে, মানুষ পানপড়া, জলপড়া ইত্যাদিতে বিশ্বাস করত। পাল্কীর প্রচলন ছিল। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে 'নর' জাতি অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হত, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা এদের ছোঁয়া জল কিংবা খাদ্যগ্রহণ করতেন না, এদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করাও হত না। রাজচন্দ্র নরজাতির গৃহে ভাত খেয়েছিল বলে তার জাত গিয়েছিল, আবার খুল্লতাতকে তালেবপুরে উপস্থিত হয়ে ফলার ভক্ষণের আহ্বান জানালে তাঁর প্রতিক্রিয়ারূপে বর্ণিত হয়েছে—

জাইত গেল মান গেল কলঙ্কের সীমা নাই।
ভোজ খাইতে নিমন্তন দিল নরবাড়ীত্ যাই।

চন্দ্রনাথ নরের গৃহে পূজা করতে অসম্মতি জানিয়েছিল—

আপতা নরর নামে দীঘি পূজা নাই সে হয়।
যদি আমি চন্দ্রনাথ পূজা সে করিব।
সমাজরতুন সগলে আমারে বাহির করি দিব।।

অর্থাৎ জাতিভেদপ্রথা সমাজে তীব্রভাবে বিদ্যমান ছিল। ১৬ বিঘায় একদ্রোণ জমি হত—'সাড়ে বাইশ দ্রোণ জমি হইল রসির ভিতরি।' কুলবিচারে পাত্র ও কন্যা দক্ষ সমান না হলে অসম কুলে বিবাহ হত মালা বদলের মাধ্যমে। তাই রঙ্গমালা তার পিতাকে সরাসরি বলেছে যে সে রাজচন্দ্রকে বিবাহ করবে মালা বদল করে।—

বামন ডাকি না হইব বিয়া সমাজর বেবস্থা নাই।
মালা বদল বিয়া হইব আপনাগর অনুমতি চাই।।

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সমাজে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পড়েছিল, তাছাড়া বৈষ্ণবধর্মের ভেক নিয়ে অনেকেই বিপথগামী হতেন। তারই প্রমাণ শ্যামপ্রিয়া। সাধারণভাবে সমাজে বৈষ্ণবদের সে সম্মানের স্থান ছিল তার পরিচয় মেলে রঙ্গমালার কথায়—

বোষ্টম বোষ্টমী হইল কিষ্টর দাস দাসী.
অপরাধ হইল মোর মনত্ এন বাসি।।

কেননা, শ্যামপ্রিয়াকে ইতিপূর্বে রঙ্গমালা প্রহার করে বিতাড়িত করেছিল। বিপরীতক্রমে বৈষ্ণবদের সম্পর্কে বিপরীত মানসিকতার পরিচয়ও একস্থানে লাভ করা গেছে—

রামায় বলে, মহারাজ, বোষ্টমরা নানান কথা কয়।
ট্যাকা কড়ির লাগি তারা মানুষরে ঠগায়।।

বরপক্ষকেই সম্ভবত কন্যাপণ দিতে হয়, বিশেষতঃ তথাকথিত নিম্নসমাজে। তারই ইঙ্গিত মেলে রঙ্গমালার খেদোক্তিতে।

ট্যাকার লোভত্ পড়ি বাপ বিচার না করিয়া।
রামগইত্যা গুঁজার কাছে আমারে দিল বিয়া।।

অভিজাত সমাজের মানুষের মধ্যে চারিত্রিক শৈথিল্য যে ছিল তারই প্রমাণ রাজচন্দ্র। অলংকার প্রয়োগে কবি তেমন ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি। কাব্যিক সৌন্দর্যের সন্ধানও পালাটি থেকে তেমন মেলে না। বেশ কয়েকটি সঙ্গীতের সংযোজনায় পালাটির আকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাতে পালায় কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। শ্যামপ্রিয়া যে প্রকৃতির মেয়েমানুষ, তাতে তার প্রতি করুণার উদ্রেক হওয়ার পরিবর্তে কৌতুকহাস্যের সৃষ্টি হয়েছে—

এক কিল কিলাইল মোরে রঙ্গ সোন্দরী।
গুল পিড়্নি পিডন দিল বাঁশর জিঙ্গল ধরি।।
গাও গতরে ব্যথা হই রাইতে হইল জ্বর।

**রঙ্গমালা**

চরিত্র চিত্রণের প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রঙ্গমালার কথা। আপ্তারাম নরের কন্যা সে। সুন্দরী। কিন্তু তার পিতা ও ভ্রাতা মিলে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে এক কুব্জের সঙ্গে। তাই রঙ্গমালা স্বামীর ঘর করেনি। তাই বলে সে বিপথ গামিনীও হয়নি। শ্যামপ্রিয়া তাকে যখন বলেছে যে সে তার সোনার যৌবনকে হেলায় নষ্ট করেছে,

চাইলে সে তাকে তার নাগর জোগাড় করে দেবে, রঙ্গমালা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছে--'এমন অযুগ্যি কথা কইলা কিয়ের লাই'।। তারই নির্দেশে রঙ্গমালা প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু তারপর রাজচন্দ্র ও শ্যামপ্রিয়ার জলপড়া, পানপড়ার গুণে সেই রঙ্গমালাই আসক্ত হয়েছে রাজচন্দ্রের প্রতি। রাজচন্দ্রের প্রতি তার যে নিছক দৈহিক আকর্ষণ ছিল না তার প্রমাণ মেলে তার শর্ত আরোপে--

যদি তানার সাহস থাকে মালা বদল করি।
আমারে লইতে পারে ধর্মসাক্ষী করি।।

শ্যামপ্রিয়ার কাছে সে যখন শুনেছে রাজচন্দ্রের খুল্লতাত যদি জানতে পারেন, রাজচন্দ্র নীচবংশীয়া রঙ্গমালাকে বিবাহ করেছে, তবে তার কয়েদ হবে, একথা শুনেই চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে রঙ্গমালা। তার জন্য রাজচন্দ্রের দুঃখভোগ ঘটবে কিছুতেই সে তা সহ্য করতে পারবে না বলে জানিয়েছে--

আমার লাগি দুষ্কু হয় পরাণ বন্ধের যদি।
এমন কাম ন করিব আমি পরাণ থাকিতে।
বন্ধুরে কইর মানা এই পথে আসিতে।।

রঙ্গমালার বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়। সে বারংবার অনুরোধ করেছে রাজচন্দ্রকে যেন সে আপতারামের কথায় দীঘি খনন না করে কিংবা দীঘি খনন উপলক্ষ্যে খুল্লতাতকে নিমন্ত্রণ পত্র না প্রেরণ করে, কিন্তু অবিমৃষ্যকারী রাজচন্দ্র সে অনুরোধে কর্ণপাত করেনি, ফলে কোনো দোষ না করেও রঙ্গমালাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তাদের গৃহ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে চাঁদ ভাঁড়ালীর কারণে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকা চরিত্রের সঙ্গে রঙ্গমালার গভীর সাদৃশ্য।

**রাজচন্দ্র**

রাজচন্দ্র মাতৃপিতৃহীন হয়ে খুল্লতাত জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর হাতে মানুষ হয়। যদিও রাজচন্দ্র বিবাহিত, তথাপি নারী সঙ্গলাভে তার তীব্র ব্যাকুলতা। তার সকল অসৎকর্মের সঙ্গী রামভাঁড়ালী। চন্দ্রকলাকে অপমান করতে তার বাধে নি। নারী সংসর্গ লাভের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে তার বাধে না। সে কালা ধুগীর স্ত্রী সৈরপমালার প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছে। এরপর সে আকৃষ্ট হয়েছে রঙ্গমালার প্রতি। অন্ত্যজ শ্রেণীর রঙ্গমালার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে তার জাতিচ্যুত হবার সম্ভাবনা, তথাপি রাজচন্দ্র ঘোষণা করেছে--

কি করিব ধনে আমার কি করিব জাতি।
আমি ন মানিব সোমাজ বামণ পণ্ডিতর পাঁতি।।

রঙ্গমালার পিতা আপ্‌তারামের ইচ্ছাপূরণের জন্য রাজচন্দ্র বিশাল দীঘি খননের আয়োজন করেছে, পাছে এই সংবাদে তার খুল্লতাত ক্ষুব্ধ হন, তার বিরোধিতা করেন, তাই সে তার বিষয় সম্পত্তি নিজের অধীনে নিয়ে নিতে চেয়েছে। পিতৃপ্রতিম খুল্লতাতের প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধ নেই তার। চাঁদভাড়ালী রাজচন্দ্র সম্পর্কে যে

ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, তা মোটেই আতিশয্য দুষ্ট নয়—

আইজ দিবা জমিদারী লিখিয়া পড়িয়া
কাইল খোয়াইব সব পীরিতের লাগিয়া।।

রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছ থেকে নিজের অংশের জমিদারী পেতে রাজচন্দ্র ইঙ্গা চৌধুরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং রাজচন্দ্রকে জমিদারী পাইয়ে দেবার সুবাদে চার আনা অংশ ইঙ্গা চৌধুরীকে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। চাঁদ ভাঁড়ালীর কারণে রাজচন্দ্রের বাসনা আর বাস্তবায়িত হতে পারেনি। রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজচন্দ্রকে পত্র দিয়েছেন সত্বর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। বুদ্ধিমতী রঙ্গমালা নিষেধ করেছে রাজচন্দ্রকে খুল্লতাতের সমীপে যেতে, কিন্তু রঙ্গমালার কোনো অনুরোধই সে রক্ষা করেনি। 'লাথিমারি রঙ্গর হাত সরাইয়া দিল।।' তবে রঙ্গমালার শোচনীয় মৃত্যুর পর সে তার শেষকৃত্য করেছে। রাজচন্দ্র বলেছে—

আমার আগেতে যদি রঙ্গমালা মরে।
করালে আবদ্ধ আছি কাষ্ঠ কইরতাম তারে।।

সেই অঙ্গীকার রক্ষা করে রাজচন্দ্র বুঝি বা জীবনে একটি বারের জন্য আদর্শপরায়ণতার স্বাক্ষর রেখেছে।

**রাজেন্দ্রনারায়ণ**

রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী পিতৃহীন রাজচন্দ্রকে মানুষ করেছিলেন। নাবালক রাজচন্দ্রের জমিদারী তিনিই দেখাশুনা করতেন। রাজচন্দ্রকে তিনি অতিমাত্রায় স্নেহ করতেন। তার গুণগুলিই কেবল তাঁর চোখে পড়ে, দোষগুলি তিনি দেখতে পেতেন না। স্নেহের বশবর্তী হয়ে সেরকম শাসন তিনি তাকে করেন নি। কালীযুগীর স্ত্রীর প্রতি রাজচন্দ্র অত্যাচার করেছে, এই অভিয়োগ পেয়ে একবার মাত্র তিনি আদেশ করেছিলেন তাকে বেঁধে আনার জন্য—'যুগী বাড়ীরতুন রাজচন্দরকে ধরি আইনতে হুকুম দিল।' রঙ্গমালার সঙ্গে রাজচন্দ্রের সম্পর্কের কথা জেনে রাজেন্দ্রনারায়ণ একবার চেষ্টা করেছিলেন দুশ্চরিত্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে কাজের ছুতায় আটকাতে—

কাইল দিনরথুন আমার সাথে দরবারে বইবা।
রাইতে আমার কাছত্ বসি কাগজ বুঝি লইবা।।

রাজেন্দ্রনারায়ণের পরামর্শদাতা চাঁদ ভাঁড়ালী। তার কথামতই তিনি চালিত হয়েছেন। রাজচন্দ্র কর্তৃক নরগৃহে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি অপমানিতবোধ করেছেন, এতে বোঝা যায় তাঁর কুলমর্যাদা ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল—

জাইত গেল মান গেল কলঙ্কর সীমা নাই।
ভোজ খাইতে নিমন্তন দিল নরবাড়ীত যাই।।

ইঙ্গা চৌধুরীর বংশ চাঁদ ভাঁড়ালী কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষার আদর্শে অবিচল ছিলেন—

আমি আইলাম দোস্তী করি তুই বংশ করলি সাফ্।
এই বেইমানীর ফলে আমায় হইল মহাপাপ।।

**শ্যামপ্রিয়া**

শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী, অন্ততঃ সাজে ও মুখে অবিবত নামোচ্চারণে। কিন্তু সে দুশ্চরিত্রা এবং অর্থের জন্য পারেনা এমন কোনো কাজ তার ছিল না। সেই ছিল রাজচন্দ্রের কুটনি। তারই মধ্যস্থতায় রঙ্গমালার সঙ্গে রাজচন্দ্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সে যেভাবে বোনের সম্পর্ক ফেঁদেছে রঙ্গমালার সঙ্গে, তাতে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাক্ষাৎ মেলে। একবারই মাত্র তার অকপট রূপপ্রকাশ পেয়েছে। যখন রঙ্গমালা জেনেছে তার সঙ্গে রাজচন্দ্রেব বিবাহের সংবাদ রাজেন্দ্রনারায়ণ অবগত হলে রাজচন্দ্র কারারুদ্ধ হবে, তখন রঙ্গমালা আর রাজচন্দ্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চায়নি, চোখের জল ফেলে শ্যামপ্রিয়াকে তার ভূমিকার জন্য গলার মালা দিতে গেলে সে বলেছে—

বহুত পাপ কইরাছি আমি ট্যাকার লাগিয়া।
আর ন করিব আকাম কই তোমারে ছুইয়া

সে নিজেই নিজের তুলনা।

## পীর বাতাসীর পালা

কবি রজনীগোপাল রচিত 'পীর বাতাসীর পালা' দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত। দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালার ছত্রসংখ্যা ৬১৯। অপরপক্ষে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই পালাটি সংকলিত হয়েছে। পালাটির বন্দনা অংশ সম্ভবত দ্বিতীয় কারোর রচনা। বন্দনা অংশের রচয়িতা সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, বলেছেন -

সভাজনে বন্দুম রে ভাই হেন্দু মোছলমান।
বন্দুম পীর ছায়েব গাজী রে।
মক্কা মদিনা বন্দুলাম মুঁই কাশী গয়াথান।।

পালাটির রচয়িতা কবি রজনীগোপাল পালা মধ্যে একাধিক স্থানে নিজের নামের উল্লেখ করেছেন। যেমন 'যমেরে না ডরায় পিরীত রজনীগোপাল কয়', কিংবা 'রজনীগোপাল কয়, কন্যা পীরিত নয়ত সাজা'। পালা সমাপ্ত হবার পর কবি তাঁর আত্ম পরিচয় দান করেছেন। এর থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ, মাতার নাম সোনামণি। কবির নিবাস ছিল 'ভাটীলা ময়ালে'। কবির গোত্র মধুকুল্য। গীতিকা রচয়িতারা অনেক ক্ষেত্রেই ভণিতা পর্যন্ত করেন নি, যাঁরা নিজেদের নামের উল্লেখ করেছেন, তাঁরাও তেমনভাবে আত্ম পরিচয় দান করেন নি। সেদিক থেকে রজনীগোপালের আত্মপরিচয়দান উল্লেখযোগ্য।

পালাটির নায়ক বিনাথ। মাত্র সাতমাস বয়সে সে পিতৃহীন হয়, অপরপক্ষে সাত

বৎসর বয়সে সে হয় মাতৃহীন। গ্রামের মোড়ল চান্দের বাড়ীতে সে আশ্রয় নেয়। তার কাজ হয় রাখালি করা। কুড়ি বৎসর বয়সে বিনাথ চান্দের সঙ্গে গেল বাণিজ্যযাত্রায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিনাথ জলে ভাসতে ভাসতে যেতে থাকে। এই অবস্থায় সে নজরে পড়ে সুমাই ওঝার পালিতা কন্যা বাতাসীর। বাতাসীর আগ্রহাতিশয্যে সুমাই ওঝা ঔষধ দিয়ে বিনাথের প্রাণরক্ষা করে। বিনাথ সুমাই ওঝার শিষ্যত্ব নিয়ে নানা মন্ত্র তন্ত্র আয়ত্ত করে। সেও ওঝারূপে পরিচিতি লাভ করে।

বিনাথের যশে সুমাই ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে বিনাথ পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল চান্দমোড়লের গ্রামে। চান্দের পুত্র কুশাই সর্পাঘাতে মৃত্যুর সম্মুখীন হলে তাকে বিনাথ বাঁচিয়ে দিল। চান্দ মোড়ল তার কন্যা সুজন্তীর সঙ্গে বিবাহ দিল বিনাথের। সুজন্তী ছিল ভ্রষ্টা চরিত্রের। সুমাই ওঝার সঙ্গে চক্রান্ত করে সুজন্তী বিনাথের কাছ থেকে 'জীয়ন মন্তর' জেনে নিলে বিনাথ সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সে বাতাসী কন্যার উদ্দেশে পাড়ি জমাল। বাতাসী বিনাথের বিরহে ইতিমধ্যেই কাতর হয়ে পড়েছিল। বিনাথকে পেয়ে তাই সে খুবই আনন্দিত। উভয়ে গৃহত্যাগী হল। আশ্রয় নিল জঙ্গল মধ্যে। এদিকে সুমাই ওঝা বাতাসীর সন্ধানে বেরিয়ে বিনাথকে দেখতে পেল। সে বুঝল কি ঘটেছে। সে মন্ত্র পড়ে সর্প চালনা করল। বিনাথ সর্প দংশনে মারা গেল। বাতাসীর অনুরোধে সুমাই ওঝা চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারল না। বাতাসী বিনাথকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেও আত্মঘাতিনী হল।

পালাটিতে নারীর দ্বিবিধ পরিচয় ধৃত হয়েছে। সুজন্তী শিথিল চরিত্রের অধিকারিণী। নিজের বিবাহিত স্বামীকে জ্ঞান হারা করেছে সে সুমাই ওঝার পরামর্শে। অপরপক্ষে বাতাসী তাকে প্রথমবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে ওঝার সাহায্যে। দ্বিতীয়বারও সে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। শেষে বিনাথের জন্য সে নিজে আত্মঘাতিনী হয়ে বিনাথের প্রতি তার অকপট প্রেমের পরিচয় দিয়েছে।

**বিনাথ**

পালাটির নায়ক বিনাথ। সে হতভাগ্য। বিনাদোষে সে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছে। অকালে পিতৃমাতৃহীন হয়েছে। সুমাই ওঝার শিষ্যত্ব নিয়েও শেষে গুরুর ক্রোধের সম্মুখীন হয়েছে। যে গুরুর ক্রোধবহ্নি থেকে আত্মরক্ষার্থে সে বাতাসীর কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, শেষে ভবিতব্যের কারণে বিবাহিত স্ত্রী সুজন্তীর বিশ্বাসঘাতকতায় পুনরায় বাতাসীর আশ্রয় নিতে গিয়ে সেই সুমাই ওঝার রোষে পড়ে অকালমৃত্যুর শিকার হয়েছে। বাতাসীর তুলনায় বিনাথের চারিত্রিক সততা অধিকতর নয়। সুজন্তীর বিশ্বাসঘাতকতার পর বিনাথ বাতাসীর সান্নিধ্য লাভে উপস্থিত হয়েছে। একবারের জন্যও কিন্তু সে সুজন্তীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে বলে বাতাসীকে জানায়নি। প্রকৃত সত্য গোপন রেখে সে বাতাসীকে জানিয়েছে—

আমার যত মন্তর গুণ ওঝা হরণ করিল।

দেশের যত লোক সব মোর বৈরী হইল।।
ভাইবা চিন্ত্যা দেখলাম কন্যা দেশে নাই মোর ঠাঁই।
তুমি বিনা এই অভাগ্যার অন্য গতি নাই।।

**সুমাই ওঝা**

সুমাই ওঝা তার বৃত্তিতে পারদর্শী, কিন্তু মন তার নীচ, তাই যে বিনাথ তার শিষ্যত্ব নিয়ে তার কাছ থেকে ওঝাগিরি শিখেছে, নিছক তার কৃতিত্বে সে তার প্রতি রুষ্ট হয়ে তাকে জ্ঞানহীন করার জন্য হীন চক্রান্ত করেছে। তাকে হত্যা করারও চক্রান্ত করেছে সে। শেষপর্যন্ত ওঝার চক্রান্তেই বিনাথ অকালমৃত্যুর শিকার হয়েছে। তবে সুমাইয়ের দুর্বলতা ছিল তার পালিতা কন্যা বাতাসীর প্রতি। বাতাসীর অনুরোধেই প্রথমবার বিনাথকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। পরেও তাকে সর্প দংশন করার পর বাতাসীর ক্রন্দনে বিচলিত ওঝা মৃত বিনাথকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পারেনি। বিনাথের সঙ্গে বাতাসী পলায়ন করলে তার শোকে 'তিনদিন গেল ওঝার খাওন দাওন নাই'। বাতাসীর সন্ধানে সে প্রয়াসী হয়েছে।

পালাটিতে ওঝাদের নানা শিক্ষা-দীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে যেমন ফুলকড়ি, ব্রহ্মজাল, কালবিষ, উতর-পাতর, ধূলাপড়া ইত্যাদি। পালাটির নানাস্থলেই পিরীতের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। কবি অন্যান্য গীতিকার মত বস্তুধর্মিতা রক্ষায় মাঝে মাঝেই ব্যর্থ হয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে মন্তব্য করতে দেখা গেছে :

মিলন হইতে বিচ্ছেদ ভালা মহাজনে বলে।
বাদ হইতে ভুখা ভালা জানতে পারবা কালে।।
কাছে হইতে দূরে ভালা যদি থাকে পরাণের টান।
বিরহ মিলন দুই পিরীতের পরাণ।।
বহুত পিঁয়াসে যেমুন পান করিলে পানি।
বিরহ বিচ্ছেদের পরে মিলে দুই পরাণী।।

পালাটিতে সংক্ষিপ্ততা ধর্ম রক্ষিত হতে দেখা গেছে। বিনাথের সাতবৎসর বয়সে মাতৃহীন হবার ঘটনা উল্লেখের মাত্র নয়টি পংক্তির পরেই কবি বলেছেন, 'দেখিতে শুনিতে তার কুড়ি বচ্ছর হইল'। অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা এড়িয়ে গিয়েছেন কবি।

**বাতাসী**

না পাওয়ার বেদনা অপেক্ষা লাভ করার পর তা হারানোর বেদনা যে তীব্রতর বাতাসীর ক্ষেত্রে তা দেখা গেছে। সুমাই ওঝার কারণে বিনাথ বাতাসীর সান্নিধ্য ত্যাগ করলে বাতাসীর বিচ্ছেদ বেদনা, তার মানসিক যন্ত্রণা, পিরীতের পরিণামের বর্ণনায় কবির সাফল্য প্রশ্নাতীত. বাতাসী বিনাথের মৃত্যুর পর বিধাতার উদ্দেশে বলেছে :

শুনরে দারুণ বিধি আমার মাথা খাও।
অভাগীর পরমাই দিয়া বন্দেরে বাঁচাও।।

সেই অকৃত্রিম প্রেমের আধার রূপিনী নারী যে তার দয়িতের বিচ্ছেদ বেদনায় কতখানি কাতর হয়েছিল তা এর থেকেই সহজেই অনুমেয়। কবিও সাফল্যের সঙ্গে তাকে রূপ দিয়েছেন।

অলংকারের ব্যবহারে কবির বাস্তবানুগত্যের পরিচয় মেলে। যেমন চান্দ সওদাগরের দ্রুত গমনের বর্ণনায় বলা হয়েছে 'চিলা যেমুন আশমানেতে উইড়্যা পলায়', কিংবা বিনাথের স্রোতে ভেসে যাওয়া উপলক্ষ্যে বর্ণিত হয়েছে, 'সুতের মুখেতে যেমুন জলুয়ের কুটা ভাসে'। বাতাসীর চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব জনিত প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় কবির সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় মেলে।

পুনর্জীবনলাভের পর বিনাথ যখন বাতাসীর পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়েছে, তখন বাতাসীর লজ্জায়, রক্তিম বর্ণের বিবরণ দিয়ে কবি বলেছেন -

লাজে রাঙ্গা রক্ত জবা কন্যা নোয়াইল মাথা।
এমন মরম কন্যার আগে ছিল কোথা।।

যে বিনাথকে বাতাসী যত্ন করে খাইয়েছে, তাকে শক্ত-সামর্থ করে তুলেছে, সেই বিনাথ যখন বাতাসীকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছে, তখন বাতাসী কিন্তু কোন উত্তর দেয়নি ;

বিনাথ জিগাইলে কন্যা কথা নাই সে কয়।

তার নীরবতাই সূচিত করেছে তার প্রেমের গভীরতাকে, বিনাথের প্রতি তার অকৃত্রিম ও আত্যন্তিক দুর্বলতাকে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'বেহুলা যে হিসাবে সতী, সে হিসাবে হয়ত বাতাসী অসতী, কিন্তু তথাপি ইহাদের উভয়ই এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য...।'[২৬]

## সদাগর কন্যা বগুলা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডে এই পালাটি সংকলিত হয়েছে। অপরপক্ষে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই পালাটি স্থান পেয়েছে। দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত গ্রন্থে যেখানে এই পালাটির ছত্রসংখ্যা ৪২৫, সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্রের সম্পাদিত গ্রন্থে ধৃত পালাটির ছত্রসংখ্যা ৬২৭, অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের তুলনায় ২০২ টি ছত্র অধিক।

পালাটির কবির নাম জানা যায়নি। সওদাগর কন্যা বগুলা আর এক সওদাগর পুত্রের সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়াশুনা করত। কালে বগুলা অপূর্ব শ্রীময়ী হয়ে উঠল। এক রাজপুত্র তাকে বিবাহ করতে চাইল, কিন্তু বগুলা সম্মত হল না, সে ভালবাসত সহপাঠী সওদাগর পুত্রকে, তাকেই সে বিবাহ করল। এরপর সওদাগর পুত্র বাণিজ্যে গেলে নিরাশ রাজকুমার বগুলাকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে লাগল। পাছে রাজপুত্র সওদাগরের পুত্রের কোনো ক্ষতি করে, সেই ভয়ে বগুলা সোজাসুজি রাজপুত্রকে ভর্ৎসনা করতে পারত না। ব্রতানুষ্ঠানের ছুতা দেখিয়ে সে রাজকুমারের মিলনের প্রস্তাবকে এড়িয়ে যেত। শেষে রাজকুমার জানাল সে সওদাগর পুত্রকে বন্দী করেছে এবং তাকে সে বলি দেবে। বগুলা তার স্বামীর কারণে রাজপুত্রের কাছে যাবে বলে জানাল, তাকে চৌদোলা

পাঠাতে লিখে দিল। ঘটনাচক্রে সেই চিঠি পড়ল বগুলার ননদের হাতে। ননদ ও শাশুড়ী বগুলার চরিত্রে কলংক লেপন করে গৃহমধ্যে বন্দী করল। সওদাগর পুত্র বাণিজ্য যাত্রা শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে বগুলার স্বহস্তে লিখিত পত্র সে দেখল এবং সেও বগুলার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হল। বগুলাকে নির্বাসন দেওয়া হল এক শূন্য নদীর চরে। এখান থেকে তাকে এক রাজকুমার নিয়ে গেল বিবাহ করার অভিপ্রায়ে। বগুলা কৌশল অবলম্বন করল। সে রাজকুমারকে জানাল তাকে ব্রত উদযাপন করতে হবে এবং সেজন্য একজন সুলক্ষণ সাধুর পুত্রের প্রয়োজন। বন্দী হল একদিন সওদাগর পুত্র। বগুলা গভীর রাত্রে স্বামীকে নিয়ে গৃহত্যাগ করল।

পালাটিতে নৌযাত্রা সম্পর্কিত আচারের উল্লেখ রয়েছে। নৌযাত্রার পূর্বে নৌকার গলুইয়ে ধান্যদূর্বা স্থাপন রীতি ছিল। ধুপ দীপের সাহায্যে ডিঙ্গী সজ্জিত করা হত। নৌকায় স্থাপন করা হত লক্ষ্মীর ঝাঁপি। ভরা পূজা ব্যতিরেকে নৌকা যাত্রা হত না। অগ্রহায়ণ মাসে কুলনারীরা গৃহে নূতন ধান্যের অর্ঘ্য নিবেদন করত জয়ধ্বনি সহকারে—

ঘরে আইসে নয়া ধান জয়াদি জোকারে।
অর্ঘ্য দেয় কুলের নারী ঘরের লক্ষ্মীরে।

সেকালে পায়রার সাহায্যে পত্রের আদান-প্রদান করা হত। পালায় রাজপুত্র বগুলার উদ্দেশে পায়রার মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করেছে বলে উল্লিখিত হয়েছে, বিপরীতক্রমে বগুলাও জবাব পাঠিয়েছে পায়রার সাহায্যে—

কইতরা উড়িয়া গেল লইয়া লিখনী।

শ্রাবণ মাসে নূতন পিটালির সাহায্যে আলপনা দিয়ে ঘটস্থাপন করে মনসা পূজা করার রীতি চালু ছিল। রীতি ছিল পঞ্চনাগ অঙ্কনের—

নূতন পিটালি দিয়া আলপনা দিল।।
মনসা দেবীরে আঁকে অতি ভক্তিভরে।
পঞ্চনাগ আঁকে কন্যা শিরের উপরে।।

চৌদোলার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, বিশেষত অভিজাত সমাজে। বাণিজ্যযাত্রা শেষে নৌকা ফিরে এলে তাকে বরণ করে নেওয়া হত। সওদাগর পুত্র বাণিজ্যযাত্রা শেষে ফিরলে—

মাও আইল বইন আইল ডিঙ্গা করিতে বরণ।

ব্রতানুষ্ঠান পালনের খুব রেওয়াজ ছিল। রাজপুত্র বগুলাকে জানিয়েছিল—

রূপের এ ভরা নদী আইজ বইছে উজানী।
দিনে দিনে ভাটি ধইরব নাই সে থাকব পানি।।

যৌবনকালের অনিত্যতা বোঝাতে গিয়ে নদীর চিত্রকল্পের উপস্থাপনা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়েছে স্বীকার করতে হয়। বগুলার বারমাসী বর্ণনাতেও কবির অনবদ্য কল্পনাশক্তি ও কাব্যিক সৌন্দর্য প্রকাশের নৈপুণ্য প্রমাণিত। ফাল্গুন মাসে পতিহারা বিরহী বগুলা সব সুন্দরের মধ্যেই তার আকাঙ্ক্ষিতের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছে—

ফুলে বন্ধু কলিতে বন্ধু ভমরার বোলে।

কিন্তু দুঃখের হল সে তা ধরতে বা স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি—

নাসিকায় পাই গন্ধ কানে আইসে কথা।

আর তাতেই তার বিরহবেদনা তীব্রতর হয়ে ওঠে। চৈত্রমাসে বগুলার দেখা স্বপ্নটিও মনোরম :

ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্ন দেখি বন্ধু আইল বাড়ী।
পালংকে বইসা রে বন্ধু কোলে নিল মোরে।।
মুখেতে রাখিয়া মুখ চুম্বিল আমারে।।
দ্বিতীয় পওরে বন্ধু দিল আলিঙ্গন।

ফ্রয়েড বলেছিলেন বাস্তবে আমরা যা না পাই, স্বপ্নের মাধ্যমে তাকেই পেতে চাই। বগুলাও বাস্তবে যে সওদাগর পুত্রকে লাভ করা থেকে বঞ্চিত ছিল, স্বপ্নের মাধ্যমে সেই অভিলষিত পুরুষকেই সে লাভ করেছে। লাভ করেছে তার সোহাগকে।

**বগুলা**

পালাটির আকর্ষণ বগুলা। নারী হয়েও সে কত স্মার্ট। তিন তিনবার ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দিয়ে সে সওদাগর পুত্রকে বলেছে তা কুড়িয়ে দেবার জন্য। এইভাবে সে তার প্রতি তার হৃদয় দৌর্বল্যকে প্রকাশ করেছে। সওদাগর পুত্র তার সহপাঠী তাকে সে ভালবেসে তার জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছে, সহজেই রাজপুত্রকে স্বামীরূপে পেতে পারত, কিন্তু সেই প্রলোভনের শিকার সে হয়নি।

শরৎচন্দ্র বলেছেন বড় প্রেম শুধু কাছে টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়। বগুলা সওদাগর পুত্রকে দূর দেশে বাণিজ্য করতে পাঠিয়েছে। নিজের গহনা দিয়েছে স্বামীকে ব্যবসার জন্য, তা বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহের জন্য। বারংবার করে স্বামীকে সে বলে দিয়েছে তার যাত্রা পথের বিষয়ে, বিপদে সে কখন কোন দেবীর শরণাপন্ন হয়ে বিপন্মুক্ত হবে।

বিপদে পড়িলে বন্ধু দুর্গা মায়ের নাম লইও।

*　　　*　　　*

তুফানে পড়িলে ডিঙ্গা কইর মা মনসা স্মরণ।

নিজেও যে বগুলা ভক্তিমতী ছিল তার পরিচয় আমরা পাই বিশেষত তার মনসা পূজার আয়োজনের মাধ্যমে। রাজপুত্র তাকে অন্যায় প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও যে বগুলা রূঢ় আচরণ করেনি, তা রাজপুত্রের প্রতি তার হৃদয় দৌর্বল্যের জন্য নয় :

মরণে না করি ভয় ভয় সে কুল মানে।
আর ভয় বাসি আমার পতির কারণে।।
নিরাশ হইয়া যদি পতি রে ঘাটায়।
কি করিতে কি হইব না দেখি উপায়।।

নিজের সতীত্বের প্রতি তার কি আস্থা। রাজপুত্র যখন জানাল সওদাগর পুত্রের মৃত্যু সংবাদ, তখন বগুলা তা বিশ্বাস করেনি :

দরপণ লইয়া দেখে সিঁথার সিন্দুর।
কামরাঙ্গা সিন্দূর সিঁথায় ডগমগ করে।
হস্তের শঙ্খেতে দেখে ফাটল নাইত ধরে।
ঘরেতে ঘিরতের পরদীম জ্বলিছে উজলা।
দেখিয়া বুঝিল কন্যা দুশমনের ছলাকলা।।

বগুলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাদের বিস্মিত করে। এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরেই সে দু'দুজন রাজপুত্রের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ঘটনাচক্রে সে গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরেই পুনরায় স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। প্রথমের মত দ্বিতীয় রাজপুত্রও তার কছে বেকুব বনেছে।

## রাজা রঘুর পালা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডে পালাটি সংকলিত হয়েছে। পালাটির ছত্র সংখ্যা সেখানে ২১৫। অপরপক্ষে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সপ্তম খণ্ডে এই পালাটি স্থান পেয়েছে।

'রাজা রঘুর পালা' খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির রচনা। মাত্র ৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে রাজা জানকীনাথের স্বপ্নে রাণী কমলাদেবীকে দর্শন, রাণীর নির্দেশানুযায়ী কমলাসাগরের তীরে কুটীর নির্মাণ, গোপনে রাণীর শিশুসন্তান রঘুনাথকে প্রতিপালন, রাণীকে চিরকালের মত আয়ত্ত করার প্রয়াসে রাজার ব্যর্থতা ও রাণীর শোকে তাঁর মৃত্যু বরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে মাতৃপিতৃহীন রঘুনাথের মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ, ঈশা খাঁ কর্তৃক রঘুনাথের রাজ্য অবরুদ্ধ হওয়া এবং শেষে রঘুনাথের অপহৃত হওয়ার বিবরণ। তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে রাজভক্ত গারোদের দ্বারা রঘুনাথের উদ্ধারলাভের বিবরণ।

পালাটিতে মৃত রাণী কমলাদেবীর জন্য রাজা রঘুর ব্যাকুলতা প্রমাণ করে রাণীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ। বিশেষতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশু রঘুর কারণে রাজার অসহায়ত্ব পরিস্ফুট। রাণীর কারণে রাজার মৃত্যু ঘটেছে, তবে রাণীকে চিরতরে লাভের আশায় রাজার ব্যর্থ প্রয়াস কিছুটা হাস্যরসের উদ্রেক করে, তাঁর আচরণ শিশু সুলভ হয়ে উঠেছে :

আইঞ্চল না ধইরা রাজা রে
আরে রাজা গড়াইয়্যা পড়িল।
জোরাযালি কইরতে রাজা রে
আরে রাজা দইড় ভাইঙ্গ্যা পড়িল।।

সচরাচর গীতিকায় অলৌকিকত্ব তেমন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আলোচ্য পালায় মৃত্যুর পরেও রাণী যেভাবে তাঁর দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করাতে কমলা সায়র থেকে প্রতিদিন উপস্থিত হতেন বলে বর্ণিত হয়েছে, তাতে রাণী কমলা দেবীর অপত্য স্নেহ প্রমাণিত হলেও ঘটনাটি বাস্তবানুগ হয়নি।

ঈশা খাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র। জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান ছিলেন তিনি। সুষং দুর্গাপুরের রাজা জানকীনাথের সঙ্গে ছিল তাঁর শত্রুতা। ঈশা খাঁর শারীরিক ক্ষমতার পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

তার সামান্যা জুড়ি নাই এই পিরথিমিতে।
চড়কির মত ঘুরায় হাত্তি ধইর‍্যা শুড়েতে।।
মিয়ার দাপটে ক্যাম্পে আশমান-জমিন।
পায়াড়ের মতন জোয়ান মিয়া জঙ্গে।।

এহেন ঈশা খাঁকে কিন্তু দীর্ঘ তিনটি মাস সুষং অবরোধ করতে হয়েছিল নাবালক রাজা রঘুনাথকে গ্রেপ্তার করার জন্য। এতে ঈশা খাঁর সুনাম বৃদ্ধি পায়নি। রঘুনাথের গ্রেপ্তারের সংবাদে প্রজাদের প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় তারা ছিল আন্তরিকভাবেই রাজভক্ত। বিশেষত গারো প্রজারা। একদিকে তাদের রাজভক্তির পরিচয় রেখেছে নাবালক রঘুনাথকে উদ্ধার করে, অপরদিকে তাদের বুদ্ধিমত্তা, শ্রমশীলতা এবং বীর্যবত্তারও স্বাক্ষর বিদ্যমান। গারো প্রজারা যখন বলে :

ইছাইর মুণ্ডু কাইট্যা ভেলা সায়রের মাঝে।
আ-নইলে পারাপার নাই গাড়োর এই লাজে।।

তখন বোঝা যায় শুধু রাজভক্তিই নয়, সেই সঙ্গে তাদের আত্মমর্যাদাবোধও ছিল প্রবল। সেই মর্যাদাবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়াতেই তারা ঈশা খাঁর উপযুক্ত শাস্তি বিধানে তৎপর হয়েছিল। গারোরা যখন সংকল্প করেছে :

তিন কোশ দুবাত্ আছে ধনাই নদীর ঢালা।
গাঙ্গনার মধ্যে তার কাইট্যা আনবাম্ নালা।।
গাঙ্গনার পানি চইলা যাইব ধনাই নদীর সুতে।
শুকনা খাল পাড়ি দিবাম মোরা আন্ধাইর রাইতে।।

তখন তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে আমরা চমৎকৃত না হয়ে পারি না। শুধু সংকল্পই নয়, সংকল্পকে তারা বাস্তবায়িত করেছে :

বাইশ কাহন গাড়ো মিল্যা কাড়ে সেই নালা।
গাঙ্গিনার পানি পাইল গিয়া ধনাই গাঙ্গের ঢালা।।

'গারো কাড়া নালা' এবং 'কোদাল ধোয়া দীঘি' এই দুটি মিথের সূত্রের উল্লেখ আলোচ্য গীতিকাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বলা হয়েছে :

কুদাল ধুইতে কাড়ে এক এক কুদাল মাডি।
তাহাতে সিরজন হইল কুদাল-ধোয়া-দীঘি।।

অধরচাঁদ বিরচিত 'কমলা রাণীর পালা'র সঙ্গে 'রাজা রঘুর পালা'র প্রথম অধ্যায়ের গভীর সাদৃশ্য। সামান্য কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয় মাত্র। যেমন 'রাজা রঘুর পালা'য় কমলা রাজাকে স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছেন তার শিশু সন্তানকে একাকী রাত্রে রেখে আসতে যাতে তাকে তিনি স্তনদুগ্ধ দান করতে পারেন। কিন্তু 'কমলা রাণীর পালা'য় কমলা রাজাকে নির্দেশ দিয়েছেন :

বাপের বাড়ীর সুয়া দাসী
ছাওয়াল কোলে লয়্যা।
ঐ ঘরে থাকিব রাইতে
আমার লাগিয়া।।

রাজা রঘুর পালায় কমলার নিত্য পুষ্করিণী থেকে আবির্ভূত হওয়া এবং পুনরায় তাতে অদৃশ্য হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কমলা রাণীর পালায় তা উল্লিখিত হয়নি। 'রাজা রঘুর পালা'য় বর্ণিত হয়েছে শিশু সন্তানের কমলার দুগ্ধপানে প্রতিদিন ছয়মাসের বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু এমনতর তথ্য কমলা রাণীর পালায় অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। 'রাজা রঘুর পালা'য় রাজা রাণীকে ধরে রাখার চেষ্টা করলে কমলা সরোবরের জলে চিরকালের মত অন্তর্হিত হয়েছেন। আর সেই শোকে রাজার মৃত্যু হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'কমলা রাণীর পালা'য় বর্ণিত হয়েছে কমলার শাপমুক্তি শেষে দেবলোকে যাবার কথা। রাণী মহাশূন্যে অন্তর্হিত হয়েছেন। এখানে রাণীর শোকে রাজাব মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়নি। দুটি পালাতেই অস্বাভাবিকতা বয়েছে। দুটি পালাই অলৌকিকতা যুক্ত। দুটিতেই বাৎসল্য রস পালা দুটিকে কিছুটা মানবিক গুণ সম্পন্ন করে তুলেছে।

## আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডে 'নছর মালুম' নামে যে পালাটি সংকলিত হয়েছে, সেটিই 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা' রূপে সংকলিত হয়েছে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে। দীনেশচন্দ্র সংকলিত পালাটির ছত্র সংখ্যা ৮৫৪, কিন্তু ক্ষিতীশবাবুর সংকলিত পালাটির ছত্রসংখ্যা ৯৩৮, অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রর তুলনায় ৮৪টি ছত্র অধিক।

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক অনুমান করেছেন, 'ঘটনার কাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।'[২৭] পালাটিতে কবির নাম উল্লিখিত হয় নি। বন্দনা দিয়ে পালা গানটির শুরু। মাত্র আটটি পংক্তিতেই বন্দনা সীমাবদ্ধ। এরপরই মূল পালার সূচনা। বেশ বোঝা যায় বন্দনার রচযিতা আর মূল পালার রচয়িতা অভিন্ন নন।

হায়দরের গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল তার ভাগ্নে নছর। সে ছিল মরণোত্তর জাতক। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সেই হারিয়েছিল মাতাকে। অগত্যা মাতুলালয়ে তার আশ্রয়লাভ। কম দিন নয়, দীর্ঘ ষোলটি বৎসর সে মাতুলালয়ে অতিবাহিত করে। হায়দর তার একমাত্র কন্যা আমিনা খাতুনের সঙ্গে নছরের বিবাহ দেয়। এক বৎসর বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করার পর নছর উপার্জনের জন্য বিদেশযাত্রা করে। দীর্ঘ ছয়

বৎসর অতিবাহিত হল কিন্তু নছরের সাক্ষাৎ নেই। নছর কর্মসূত্রে দক্ষিণ দেশে উপনীত হয়ে সাগরকূলে অবস্থিত অঙ্গী নামক শহরে ব্যবসা আরম্ভ করে। এখানেই নছর মাফোর ষোড়শী কন্যা এখিনের প্রেমে পড়ে।

এদিকে প্রোষিতভর্তৃকা আমিনার প্রতি দৃষ্টি পড়ল এছাকের। সে হায়দরকে প্রলোভন দেখাল :

সাদী যদি করে মোরে আমিনা সোন্দরী।
তোমরারে পালিব আমি সারা জীবন ভরি।।
আষ্ট কানি জমি দিব শংখ নদীর কূলে।
ভরি ভরি সোনা দিব হাত কান গলে।।

আমিনা কোনমতেই এছাকের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হতে রাজি নয়। এছাক সহায়তা নিল বুধা নামে গুণিনের। কিন্তু বুধাও পারল না আমিনাকে এছাকের প্রতি প্রসন্ন অথবা আসক্ত করে তুলতে। আমিনা যখন বুঝল এছাকের সঙ্গে তার পিতারও যোগ রয়েছে, তখন সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে ইলসা খালির গফুর মিঞার বাড়ী আশ্রয় নিল। আশ্রয় পেল বটে, তবু পিতামাতার কথা ভেবে সে চোখের জল না ফেলে পারে না।

এদিকে নছর 'লাউখ্যা' নামের শুটকি মাছ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ সাগরের চরে অবস্থিত পরীদিয়ায় উপস্থিত হল। এখান থেকে সে হাজির হল হায়দরের বাড়ী। ততদিনে হায়দরের মৃত্যু হয়েছে, আমিনার মা ভিক্ষা করে। আমিনার দেখা পেল না নছর। সকলের কাছে আমিনার দোষ শুনতে পেল। নছর পুনরায় মোকামে ফিরবে বলে মনস্থ করল। গোবধ্যার চরে হার্মাদদের হাতে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হল। হার্মাদরা এরপর নছরকে বেচে দিল। নছর তার মালিকের নৌকা নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বিপদে পড়লে জেলেরা উদ্ধার করল। এছাক যখন জানতে পারল আমিনা গফুর মিঞার কাছে আশ্রয় পেয়েছে, তখন সে এক নতুন চাল চালল। আমিনার মাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল ইলসাখালিতে। আমিনাকে তার মা মাসীর গ্রামে যাবার জন্য বলল। কিন্তু আমিনা রাজি হল না। মাকে আমিনা নিজের কাছে রাখল। আমিনার মার সঙ্গে চক্রান্ত করে এছাক আমিনাকে গভীররাতে নিদ্রাভিভূত অবস্থায় চুরি করলে।

অঙ্গী শহরে মাফো নছরের অনুপস্থিতিতে তার সব জিনিসপত্র বিক্রয় করে দিল। এখিনকেও অন্যত্র বিবাহ দিল। জেলেরা নছরকে উদ্ধার করে এক পূর্বদেশীয় ব্যক্তির কাছে জিম্মা করে দিল। তার কাছ থেকে নছর গিয়ে হাজির হল এখিনের কাছে। যখন দেখল এখিন আর তার নেই, তখন অঙ্গী শহর থেকে নছর আমিনার কাছে যেতে মনস্থ করল। এছাক যখন বলপূর্বক আমিনার সতীত্ব হরণে উদ্যত, ঠিক তখনই সেখানে উপস্থিত হল নছর। এছাককে আহত করে আমিনার সতীত্ব রক্ষা করল। দীর্ঘ দশ বৎসর পরে উভয়ের মিলন হল।

পালাটির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় এর মিলনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তির কথা। দীর্ঘ দশ বৎসর ব্যাপী যে আমিনা তার সতীত্ব ধর্মকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা

করে এসেছে, অপেক্ষা করে থেকেছে নছরের জন্য, তার সেই আশা পূরণ হয়েছে, দীর্ঘ বিচ্ছেদ বেদনার পর নছর আমিনার মিলন সাধিত হয়েছে।

পালাটির প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে প্রোষিতভর্তৃকা আমিনার নিঃসঙ্গতার আর্তি দিয়ে, যৌবনের আবেদন ব্যর্থ হওয়ার দুঃখ প্রকাশের মধ্য দিয়ে, সেই সঙ্গে সতীত্ব ধর্ম অটুট রাখার সংকল্প প্রকাশের মাধ্যমে। এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা আমিনার পরিচয় পাই, অবগত হই তার বিচ্ছেদ বেদনার কারণ সম্পর্কে। প্রথম পরিচ্ছেদ এমনভাবে সংযোজিত হয়েছে, যার রসাস্বাদনে পাঠককে কিঞ্চিৎ বিড়ম্বনাভোগ করতে হয়, ক্রমশঃ এই পরিচ্ছেদের তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়। অঙ্গী নামক শহরের রমণীদের প্রসঙ্গে কবি যে দৃষ্টান্ত উপহার দিয়েছেন, তা কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক।

মরদেরা রাঁধে ভাত নারীয়ে হাটে যায়।
ভালা মাছ ছাড়ি তারা নাপ্‌ফি পচা খায়।।

কিংবা,

মাইয়া মাইনসর জেয়র আছে বহুত বহুত দাসী।
একপেঁচে কাপড় পিঁধে আঢ়াই হাত খামি।।
মাথার চুল বাবরি ছাঁটা এঙ্গি থাকে বুকে।
বোচবার মধ্যে পানর খিলি ইসারাতে ডাকে।।

কবি কৌতুক রসসৃষ্টিতেও সাফল্য দেখিয়েছেন। বুধা গুণিনের পরামর্শমত অনিচ্ছুক আমিনাকে বশীভূত করতে এছাক মিঞা তার তেলপড়া মুখে মেখে সেজেগুজে আমিনাদের বাড়ি উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। আমিনা তার কাছে আসেনি। কবি বর্ণনা করেছেন -

ন আইল ন আইল কন্যা ন আইল ঘরে।
ত্যাল পড়া মুকত্‌ মাখি এছাক ভাবি মরে।।
চাড়র মাঝে ন আইল মাছ ন খাইল আধার।
বনর হাতি ন পড়িল খেদার মাঝে তার।।

* * *

সারারাইত মোশার কামর সইয়া সইয়া।
ফজরে আপনার বাড়ীত্‌ গেল এছাক্‌ মিঞা।।

প্রবাদের ব্যবহার করেছেন কবি অনবদ্যভাবে। দরিদ্র গফুরের আশাতীতভাবে দু'ঘড়া সোনার মোহর প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় বলা হয়েছে :

হাপুতায় পাইলে পুত বুগত বাজায়।
নিধনীত্‌ পাইলে ধন টিবি টিবি চায়।।

একটি প্রবাদে চর্যাপদের প্রভাব লক্ষণীয় :

খোদায় ছুরত দিছে ছুরত হইয়ে বৈরী।

গফুরের আশাতীত ভাবে দু'ঘড়া সোনার মোহর প্রাপ্তির বিবরণটিও খুবই উপভোগ্য। গফুর যখন আশংকা করেছে মঘ দস্যু দ্বারা সে আক্রান্ত, আমিনাকে পরামর্শ দিয়েছে হার্মাদদের হাত থেকে সতীত্ব রক্ষা করতে সে যেন মাচার উপরে উঠে আত্মগোপন করে থাকে এবং অশক্ত শরীরে সে যখন একটি লাঠিকে সম্বল করে মঘের কাছে হাজির হয়েছে, তখন মঘুয়া জানিয়েছে—সে গুপ্তধন সংগ্রহ করতে এসেছে, আক্রমণ করতে নয়। বারঘড়া সোনার মোহর সংগ্রহ করে যাবার সময় :

বুড়ারে কইল মঘুয়া, "তুমি লও দুই ঘড়া।
এতদিন এই ধন দিয়াছ পাহারা।।"

একেবারে যাকে বলে মেঘ না চাইতে জল। পালার একস্থানে ছড়ার প্রভাব লক্ষণীয় :

বাপর বাড়ীর কড়ই গাছড়া
পাতা ঝুম ঝুম করে।
মাও বাপরে কইও মাঝি
নাইয়রে নিতে মোরে।।

গুণিন বুধার কাজকর্ম থেকে বোঝা যায় সকল অপকর্মে সে ছিল বদ লোকের সহায়ক। প্রকৃতপক্ষে তার কোনই বিদ্যা জানা ছিল না, প্রতারণা করেই তার জীবিকা নির্বাহ হত। হার্মাদদের অত্যাচারের বিবরণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। সব কিছু অস্থায়ী বোঝাতে কবির বর্ণনা :

মুড়ার কুল্যা গরু আর গাঙর কুল্যা বাড়ী।
মোছলমানর বিবি আর হেঁদুর গালর দাড়ি।।

প্রবাদের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে!

**আমিনা খাতুন**

চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমিনা খাতুনের। বাল্য প্রণয়ের স্মৃতি অবলম্বন করে শত প্রতিকূলতা এমনকি মাতা পিতার প্ররোচনা সত্ত্বেও সে তার সতীত্ব ধর্ম রক্ষা করেছে। সে যে বলেছে :

হাঙ্গার বউ ন হইয়ম রে আমি
আমি ন পুইযাম রে হাঙ্গা।
হদ্ বাজাই চাইয়ম্ রে আমি
আমার কপাল কন্নত্ ভাঙ্গা রে।

বস্তুতপক্ষে সে তার আদর্শকে অবিচল রেখেছে। তার আত্মমর্যাদাবোধ কত প্রবল, তাই তাদের সমাজে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বামীর অনুপস্থিতির পর ইচ্ছা করলেই যেখানে সে নিকা করতে পারত, করতে পারত শাস্ত্রীয় সমর্থনেই, সেখানে সে শাস্ত্রীয় অনুমোদনের তুলনায় তার আদর্শবোধ তথা মানসিক ধর্মকেই গুরুত্ব দিয়েছে :

বেচনের মাল নয় রে যইবন
আমি বাজারে বেচিব।।
বাঁটি দিবার ধন নয় রে যইবন।
বাঁটি দিব ঘরে ঘরে।।

কবি তার আদর্শকে যেমন জয়যুক্ত করেছেন, তেমনি শেষপর্যন্ত নছুরের সঙ্গে তার মিলনের মধ্য দিয়ে তার দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করে থাকাকে সার্থক করেছেন।

সমালোচকের মন্তব্য তার সম্পর্কে—'আমিনা খাতুন রৌদ্র ও ছায়ার অন্তরালে বিচিত্র চালচিত্রের মধ্যে যেন ভগবতী প্রতিমার ন্যায় ঝলমল করিতেছেন।...আমিনা খাতুন পাতিব্রত্যে সীতা-সাবিত্রীর পাশে দাঁড়াইতে পারেন।'[২৮]

**নছুর**

নছুরের চারিত্রিক শৈথিল্য আমিনার প্রসঙ্গেই যেন বড় বেশি চোখে লাগে। যে হায়দরের গৃহে সে আশ্রয় পেয়েছে, যে আমিনার সঙ্গে তার বাল্যাবধি পরিচয় সেই আমিনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে তার বিদেশে এখিনের প্রেমাসক্ত হওয়া উচিত হয়নি। তারপর যখন সে উপলব্ধি করেছে :

পিরিতের মর্ম নাই সে জানে এই ডাকুর জাইত।
ট্যাকা-পইসা পাইলে পিরিত ন পাইলে ফইজত্।।

নানা দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে নছুর উপলব্ধি করেছে আমিনার শ্রেষ্ঠত্ব। শেষে সে আমিনার সতীত্ব ধর্ম রক্ষায় সাহায্য করেছে এবং আমিনার সঙ্গে তার পুনরায় মিলন হয়েছে। 'পালা গানের অধিকাংশ নায়কের মতই এই নায়কটিও মেরুদণ্ডহীন।'[২৯]

**এছাক**

এছাকের চরিত্রটি পালায় ভিলেন রূপে উপস্থাপিত। সে শঠ, নারী দেহভোগী, প্রতিহিংসাপরায়ণ। তার বড়ো বিবি 'সেমাজান' অপরূপ সুন্দরী, তাছাড়াও তার গৃহে 'পাঁচশত বান্দী' ছিল, তথাপি তার লোভ হল আমিনার ওপর। আমিনাকে করায়ত্ত করতে সে কি করেনি। আমিনার মা বাপকে হাত করেছে, বুধা গুণীনের সাহায্য নিয়েছে। শেষে বলপ্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আমিনাকে সে নষ্ট করতে পারেনি।

**এখিন**

আমিনা চরিত্রের বিপরীত নারী চরিত্র হল এখিন। যেখানে আমিনা দীর্ঘ দশ বৎসর কাল নছুরের জন্য অপেক্ষমান ছিল, সেখানে সামান্য সময়ের অনুপস্থিতিতেই এখিন পুনরায় বিবাহ করেছে। তার আকর্ষণ অর্থের প্রতি। যথার্থ প্রেমের মর্যাদা সে দেয়নি, প্রেম কি তা সে বোঝেও না।

আমিনার মা এবং বাবা দুজনেই এছাকের প্রলোভনের শিকার হয়ছে। আসলে

দারিদ্র্য তাদের কন্যার স্বার্থের পরিপন্থী কার্যে মদত দিতে প্ররোচনা জুগিয়েছে। সেদিক দিয়ে আমিনার পালক পিতা গফুরের চরিত্রটি মহান। কি তার কর্তব্যবোধ কি তার অপার স্নেহ। মৃত্যু পথযাত্রী গফুরের জন্য আমিনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে সে বলেছে, 'এমন সময় কান্দি তুমি কেনে আমারে কাঁদাও।' সে শুধু তার যথাসর্বস্বই আমিনাকে দিয়ে যায়নি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে, 'দুলা ত আইব ফিরি আইজ আমার মনত কয়।' বুধা গুণীনের চরিত্রটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে।

পালাটি রচনায় কবির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তা হল যে নারী তার সতীত্ব রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ, শত প্রতিকূলতাতেও তা বিনষ্ট হয় না। নিছক প্রচারধর্মিতাকে বড় না করে পালাটিকে শিল্পকুশলতার মাধ্যমে রচনা করে কবি তাঁর সেই বক্তব্যকেই আমিনা খাতুনের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন। তার মা-বাবা থেকে আরও অনেকেই যেমন তার বিরোধিতা করেছে, তেমনি গফুরের মত নিঃস্বার্থ বৃদ্ধকে সে তার অনুকূলে পেয়েছে। শেষে তার সতীত্ব ধর্ম রক্ষায় তার স্বামীর সহায়তাও লাভ করেছে এক নাটকীয় মুহূর্তে। কবির বক্তব্য দিয়েই আলোচনার পরিসমাপ্তি টানা যেতে পারে—

সাইগরে তা ধায় নদী কনে দিব বাঁধ।*
হাত বাড়ালে পাওন ন যায় আশ্‌মানের চাঁদ।।
নারীর দৌলত সন্তীপনা রাইখ্‌তে যদি চায়।
এমন পুরুষ কেও নাই কাড়ি লই যায়।।

## নুরন্নেহা কবরের কথা বা কবরের কান্না

'নুরন্নেহা কবরের কথা' পালাটি সংকলিত হয়েছে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৫ম খণ্ডে এই একই পালা কিঞ্চিৎ বর্ধিতাকারে সংকলিত হয়েছে 'কবরের কান্না' নামে। পালাটি চরিত্রে অন্যান্য গীতিকা থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে এর নানা ক্ষেত্রেই। আলোচ্য পালাটির আখ্যানটিতেই রয়েছে স্বাতন্ত্র্য।

নজুমিয়ার বাস ছিল দেওগাঁয়। সে ছিল পাড়ার মাতব্বর। ধর্মভীরু নজুমিয়ার আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল। তার ছিল মূলত- ধানের ব্যবসা। একবার ধান বোঝাই নৌকা নিয়ে ব্যবসা করতে যাবার সময় নৌকাডুবি হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। নজুমিয়ার একমাত্র পুত্র মালেক। ইতিপূর্বেই সে তার মাকে হারিয়েছে। অতএব পিতৃ বিয়োগের ফলে বেচারী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। আপনজন বলতে রইল তার পিতামহী। পুত্রশোকে পিতামহীরও মৃত্যু হল। মালেকের সংসারে আত্মীয় স্বজন কেউ রইল না।

নজুমিয়ার সঙ্গে বিরোধ ছিল দেওগাঁর আজগরের। নজুমিয়ার মৃত্যুর পর সেই বিরোধের রেশ আর রইল না। মালেকের জন্য আজগরের সহানুভূতি ছিল। ক্রমেই মালেক আজগরের অতি প্রিয় হয়ে উঠল। আজগরের কন্যার নাম নুরুন্নেসা। মালেকের সঙ্গে তার প্রণয় হল। নুরুন্নেসা মালেকের ঘর পরিষ্কার করে দিত। জল এনে দিত।

ভাতও রেঁধে দিত মাঝে মধ্যে। নুরুন্নেসার মাও মালেককে স্নেহ করত। আদর করে ঘরে ডেকে এনে তাকে তরমুজ-ফুটি খাওয়াত। একবার প্রচণ্ড সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে অন্যান্যদের সঙ্গে আজগর সর্বস্বান্ত হয়ে রং দিয়া চরেতে গিয়ে নূতন করে বসতি স্থাপন করল। মালেকও জলোচ্ছ্বাসে দেওগাঁ ছেড়েছিল। দীর্ঘ এক বৎসর নানাস্থান ঘুরে মালেক এসে উপস্থিত হল রংদিয়ায়। সাক্ষাৎ হল পূর্ব প্রণয়িনীর সঙ্গে। উভয়ে উভয়কে পেয়ে খুব খুশী। মালেক নুরুন্নেসাদের বাড়ীতেই রয়ে গেল। একদিন আজগরের গৃহ হার্মাদ কর্তৃক আক্রান্ত হল। টাকাকড়ি ছাড়াও ডাকাতরা মালেক এবং নুরুন্নেসাকে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলল তাদের নৌকায়। ঘটনাচক্রে নৌকা এসে ভিড়ল বালুর চরে। সেখানে জেলেরা খাবারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের সমবেত আক্রমণে হার্মাদরা পর্যুদস্ত হল, মুক্তি পেল মালেক এবং নুরুন্নেসা। দুজনে ফিরে এল রংদিয়ায়। আজগর এবং তার স্ত্রী দুজনেই মহাখুশী। এদিকে মালেকের সঙ্গে নুরুন্নেসার প্রণয়ের সম্পর্ক উপলব্ধি করে একদিন আজগব মালেককে একাকী ডেকে নিয়ে গিয়ে জানিয়ে দিল মালেকের পক্ষে নুরুন্নেসাকে বিবাহ করা উচিত হবে না। কেননা মালেকের পিতা নজুমিয়া মালেকের মাকে তালাক দিলে আজগর তাকেই নিকা করেছে। নুরুন্নেসা তাই মালেকের সম্পর্কে এক মায়ের পেটের বোন। এই কথা শুনেই মালেক মনের দুঃখে মাল্লাগিরির কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে মালেকের অদর্শনে মনের দুঃখে নুরুন্নেসা গুমরে মরে। বসন্তরোগে একে একে আজগর, আজগরের স্ত্রী এবং নুরুন্নেসা মারা পড়ল। পাঁচ বৎসর পরে মালেক রংদিয়ায় ফিরে এসে সব শুনে শোকে ভেঙ্গে পড়ল। নুরুন্নেসার কবরের ওপর শুয়ে পড়লে মালেক শুনতে পেল কবরের ভেতর থেকে নুরুন্নেসার আত্মা কাঁদছে, সে মালেককে দুঃখ করতে নিষেধ করল, সে জানাল মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য নুরুন্নেসার প্রাণ কাঁদে। মালেক এরপর থেকে পাগল হয়ে গেল।

ভাই-বোনের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে কোনো গীতিকা রচিত হয়নি, সেদিক থেকে আলোচ্য পালাটির বিশেষ গুরুত্ব। পালাটির বন্দনাংশও খুবই উল্লেখযোগ্য। উদার, অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রতিফলনে তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে :

হেঁদু আর মোছলমান একই পিণ্ডর দড়ি।
কেও বলে আল্লারছুল কেউ বলে হরি।।
দোনোজনের জিকির রে ভাই একই জন শুনে।
ইমান ঠিগ্ রাইখ্‌লে ভাই বুঝবা আপন মনে।।
বিছমিল্লা আর ছিরিবিষ্টু একই গিয়ান।
দোফাক্ করি দিলা পরভু রাম রহিমান।।

গীতিকাটিতে বন্যাক্লিষ্ট মানুষজনের অত্যন্ত বাস্তব সম্মত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে :

শতে শতে মইরল মানুষ কারে কনে চায়।
ঘরর চালত্ ভাসি কেউ পইড়্ল দরিয়ায়।।
গরু মইরল মইষ মইরল তোফান হইল ভারি।।

ধানর দর চড়ি হইল ট্যাকায় পাঁচ আড়ি।।
কেউ বেচে স্তিরী পুত্র কেউ বেচে মাইয়া।
পেড ফুলি মরে কেউ পাতা সিদ্ধ খাইয়া।।
আজগরের দুঃখের কথা কি বলিব হায়।
ঘরত্ নাই রে ক্ষুদর কণা উবাসে দিন যায়।।

মালেক এবং নুরুন্নেসার অল্প বয়সের প্রণয়, তাদের উভয়েরই স্মৃতিতে যে চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল তার বর্ণনায় কবি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন -

ছোড কাইল্যা পিরীত রে
যেমুন কোইলার রাও।
উতলি উতলি উডি
কইলজাতে মারে ঘাও।।
ছোডো কাইল্যা পিরীত রে
যেমুন নাইরক্যালের তেল।
জমি আছিল শীতের রাইতে
রোইদে উনাই গেল।।

নজুমিয়ার মৃত্যুতে তার বৃদ্ধা জননীর শোকার্তি আমাদের অন্তরকে সহজেই স্পর্শ করে :

ঘর রে আঁধার বাইর রে আঁধার
আমার ফুরাই আইল দিন।
কন্ মায়রের বুকে রইলি
না পাইলাম চিন্ রে
আমার ফুরাই আইল দিন।।
ঘরে ফিরি আয় রে পুত
তরে আর ন দিব ছাড়ি।
বিষম বেবান দরিয়ায়
তুই কেন বা দিলি পাড়ি রে।
পুত, আয় রে ঘরে ফিরি।।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মালেকের সঙ্গে নুরুন্নেসার সাক্ষাৎকারে নুরুন্নেসার মানসিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় কবির গভীর মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় মেলে :

পটিমে সাইগরের মাঝে ঢেউয়ে খেলায় পানি।
ঘরে আর বাইরে নুর করে আনাগুনি।।
হাজার বাত্তি জ্বালাই দিল থির নয়রে মন।
মায়ে দিছে রাঁধিবারে নানান ছালোন।।

মালেকের সঙ্গে কথা বাপ মায় কয়;
বেড়ার ফাঁক্‌দি নুর ফুক্যামারি চায়।।

দীর্ঘকাল পরে নুরুন্নেসার পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাতের পরেও বহু প্রতীক্ষিত তাদের তরফে বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত না হওয়ায় মালেকের প্রতিক্রিয়া বর্ণনাতেও কবির নৈপুণ্য প্রকাশিত।

জিব্বার আগাত্‌ কথা আনি ন কহিল আর।
ভিতরর আগুনে হায় রে কইলজা পুড়ি জার।।
কইলজা পুড়ি জার রে তার কইল্‌জা যায় পুড়ি।
ভাবিতে ভাবিতে মালেক পড়ে ঝুরি ঝুরি।।

সমুদ্রের ভয়ংকরতার বর্ণনাতেও বাস্তবতা বোধের পরিচয় লভ্য :

বেবান সাইগরের মাঝে কালা পাইন্যায় পাড়ি।।
মুড়ার সমান ঢেউ বাতাসে খেলায়।
উপবে তুমি রে নুকা নীচুতে ফেলায়।।
দম্‌কা হাওয়া ছুটে যহন
আরে দম্‌কা হাওয়া ছুটে।
পাঁচ গৈড়ার বিষম ঢেউ
আশ্‌মান ধরি ছুটে রে ভাই,
আশ্‌মান ধরি ছুটে।।

সচরাচর গীতিকায় ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার লক্ষিত হয় না, কিন্তু আলোচ্য গীতিকার ক্ষেত্র বিশেষে ত্রিপদীর ব্যবহাব লক্ষণীয়। জেলেদের 'সারি গানে' পৌষমাসে তাদের জীবিকা সম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত।

গীতিকাগুলিতে নারীদেহ বর্ণনার কিংবা নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ চিত্র বর্ণনার অনুকূল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কবিরা এগুলি সযত্নে পরিহার করে গেছেন। আলোচ্য গীতিকার ক্ষেত্র বিশেষে তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। মালেকের প্রতি আসক্ত নুরুন্নেসা মালেককে আকৃষ্ট করার অভিপ্রায়ে তার দেহ সৌন্দর্য প্রদর্শন করেছে বলে বর্ণিত হয়েছে :

চলে কইন্যা সিনা খুলি বুগে চুলি
ও তার নয়ানে কাজল।

কিংবা,

যইবন উড়ে বসন ফাডি কলসী কাঁকে লই।

কবি মাঝে মাঝে গীতিকাটিতে তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্যকে সংযোজিত করেছেন।

যেমন—

(ক) আগুনে উনায় ঘিউ যদি কাছে থাকে।
ছাড়াই দিতে ন পারে রে যদি পিরীত পাকে।।
(খ) মাইনসের কি ক্ষেমতা যদি খোদা লাগে পিছে।।

(গ) পিরীত আসল চিজ্ এই দুনিয়ার মাঝার।।

অলংকার প্রয়োগে কবি যথার্থই বাস্তবতা বোধের পরিচয় রেখেছেন—

(ক) মালেকের প্রতি প্রেমাসক্ত নুরুন্নেসার মনে সর্বদা মালেকের কথা জাগে

হরা চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুডে।।

(খ) দীর্ঘ বিচ্ছেদ বেদনার পর নুরুন্নেসাকে ফিরে পেয়ে তাদের পিতামাতার অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে—আঁধার পাইল যেমুন হাতাইয়া লাডি।।

(গ) অপরিণত বয়সের প্রেমের বর্ণনা প্রসঙ্গে—

'ছোডো কাইল্যা পিরীত রে যেমুন নারিক্যালের তেল্।

জমি আছিল শীতর রাইতে

রোইদে উনাই গেল্।।

(ঘ) হার্মাদদের দ্বারা অপহৃত মালেক এবং নুরুন্নেসা শেষপর্যন্ত জেলেদের মাছ ধরার এক বালুর চরে একটি ঘরে আশ্রয় পেলে তাদের পরিবর্তিত অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'মাছ যেমুন পানি পায় পানিয়ে পাইল গাঙ্।

লাউ ঝিঙার লতা পাইল বাঁশের মাচাং।।

পরিশেষে মালেক ও নুরুন্নেসার প্রসঙ্গ। গীতিকাটির নায়ক মালেক। তার পিতার সঙ্গে নুরুন্নেসার পিতার ছিল শত্রুতা। কিন্তু নজুমিয়া ও তার বৃদ্ধা জননীর মৃত্যুর পর মালেক সংসারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে ক্রমে ক্রমে নুরুন্নেসার পরিবারের সঙ্গে মালেকের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নুরুন্নেসা মালেকের ঘর পরিষ্কার করে দিত, তাকে খাবার জল এনে দিত, মাঝে মাঝে রান্নাও করে দিত। এইভাবেই মালেকের সঙ্গে নুরুন্নেসার প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সম্পর্ক ক্রমেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ওঠে। নুরুন্নেসার পিতা আজগর তার কন্যার সঙ্গে মালেকের সম্পর্ক অনুধাবন করে একদিন তাকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানিয়ে দেয় যে নজুমিয়ার পরিত্যক্তা স্ত্রীকে আজগর বিবাহ করেছে এবং তারই গর্ভে যেহেতু নুরুন্নেসার জন্ম, সেই কারণে মালেক ও নুরুন্নেসার ভাই-বোনের সম্পর্ক। উভয়েরই একই মাতৃগর্ভে জন্ম। কেবল মালেকের জন্ম যেখানে নজুমিয়ার ঔরসে, সেখানে নুরুন্নেসার জন্ম আজগরের ঔরসে। মালেক স্বভাবতই এমনতর কঠিন সত্যের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। একদিকে সামাজিক তথা ধর্মীয় অনুশাসনের রক্তচক্ষু, অপরদিকে তার চিত্ত দৌর্বল্য, দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন নুরুন্নেসাকে কেন্দ্র করে--বেচারী শেষপর্যন্ত মাল্লাগিরি নিয়ে দূরে সরে গেছে। দীর্ঘ পাঁচবৎসর পরে সে ফিরে এসেছে রংদিয়ায়। দীর্ঘদিনের ব্যবধান সত্ত্বেও সে বিস্মৃত হতে পারেনি তার আবাল্য প্রণয়িনীকে। কিন্তু এসে যখন শুনল তার প্রেমের পাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বসন্তে, আর মানসিক মৃত্যু ঘটেছে তার বিচ্ছেদ বেদনায়, তখন সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। নুরুন্নেসার কবরে আছড়ে পড়েছে সে। কবর থেকে নুরুন্নেসার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় আপাতভাবে অলৌকিকত্বের

সন্ধান মিললেও আসলে কবি বলতে চেয়েছেন প্রেমের বন্ধন অবিনশ্বর একেবারে আত্মার মতনই। নুরুন্নেসার মাধ্যমে কবি তাই বলিয়েছেন :

খুলি ত নাই গিরা রে ভাই, রইছে মনর বান।
মউতেও হামিস্কন কাঁদে রে পরাণ।।

বেচারী নুরুন্নেসার প্রেম ব্যর্থ হয়েছে, জীবনে তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলন হয়নি, অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, অপরপক্ষে দয়িতার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে না পেরে মালেক পাগল হয়ে গেছে। জীবিত থেকেও সে মৃতের থেকেও করুণতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

## রতন ঠাকুরের পালা

রতন ঠাকুরের পালাটি ক্ষুদ্রাকৃতির। এই পালার নায়ক রতন ঠাকুর রাজকুমার, অপরপক্ষে নায়িকা এক মালিনী। মালিনীর গাঁথা ফুলের মালা দেখেই রতন ঠাকুর তার প্রেমাসক্ত হয়েছে। শেষপর্যন্ত দুজনে গৃহত্যাগী হয়েছে। উপস্থিত হয়েছে সজিন্তার দেশে। এখানে রতন ঠাকুর মালী বলে পরিচয় দিয়েছে নিজেকে, মালিনী তার পূর্ব পরিচয়েই পরিচিত হয়েছে। কিন্তু রতন ঠাকুরের পিতা রঙ্গিলা নাম্নী বারবিলাসিনীর সাহায্যে পুত্রকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন সজিন্তা থেকে। বেচারী মালিনী রতন ঠাকুরের বিরহে আত্মঘাতিনী হয়েছে। পরে রতন ঠাকুর ফিরে এসেছে সজিন্তায়, কিন্তু তখন তার প্রেমিকা আর বেঁচে নেই। শোকে, দুঃখে রতন ঠাকুর পাগল হয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। পালাটি বিয়োগান্ত. তবে তুলনামূলক ভাবে রতন ঠাকুরের ট্র্যাজেডিই অধিকতর। একথা ঠিকই যে প্রেমের জন্য মালিনী তার পিতাকে ত্যাগ করে গৃহত্যাগিনী হয়ে এক চরম অনিশ্চয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছিল, তার ভাষায় :

পর কইরাছি বাপরে বন্ধু,
আমি ছাইড়াছি বাপের ঘর।
দেশ ছাইড়া বৈদেশী হইলাম
আমার আপন হইল পর।।

কিন্তু শেষপর্যন্ত তার একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয় তাও তাকে হারাতে হয়েছে। আত্মঘাতিনী হয়েছে সে। প্রেমিক রাজকুমারের সঙ্গে তার মধুর মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে, দুঃখ ভোগের বিচারে রতন ঠাকুর মালিনীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। সে রাজপুত্র। বিলাসভরা জীবন তার। অতুল ঐশ্বর্যে সে লালিত। তা সত্ত্বেও প্রেমের কারণে প্রেমের মর্যাদা রক্ষাকল্পে সে স্বেচ্ছায় রাজ্য সুখভোগ ত্যাগ করে মালির জীবন অঙ্গীকার করে নিয়েছে। সজিন্তায় তারা যে কুটির নির্মাণ করেছিল তার বর্ণনায় বলা হয়েছে :

চিরল কুটি দিয়া তারা ঘর যে বান্ধিল।
উলুছন বাইছা তারা ঘরের ছানি দিল।।

ইকরের বান্ধন দিল খাগড়ের বেড়া।

এরূপ গৃহে থাকতে মালিনী অভ্যস্ত হতে পারে, কিন্তু রতন ঠাকুর যে অভ্যস্ত ছিল না তা বলাবাহুল্য। শুধু কি তাই, আত্মপরিচয় পর্যন্ত সে ত্যাগ করেছে মালিনীর স্বার্থে। রাজকুমার রূপান্তরিত হয়েছে সামান্য মালিতে, যার জীবিকা মালা বিক্রয় করা। বলা চলে প্রেমের যাদুকরী স্পর্শেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। রতন ঠাকুরের বিরহে মালিনীর অকাল মৃত্যু নিঃসন্দেহে শোকাবহ ঘটনা, কিন্তু রতন ঠাকুরের সারাটি জীবন পাগল হয়ে অতিবাহিত করা সে তুলনায় আরও অনেক বেশি দুঃখবহ ঘটনা সন্দেহ নেই। মানুষ মোহের বশবর্তী হয়ে একবার ভুল করতে পারে। কিন্তু বারে বারে ভুল করে না। সেদিক দিয়ে দেখলে রতন ঠাকুর রঙ্গিলার কৌশলে সজিস্তা থেকে নিজের প্রাসাদে ফিরে গিয়েছিল, যেতে বাধ্য হয়েছিল। নিছক দৈহিক আকর্ষণ অথবা মোহের ব্যাপার হলে. তার পুনরায় সজিস্তায় ফিরে আসার প্রশ্নই উঠত না। আসলে সে যে প্রাণাপেক্ষা ভালবেসেছিল মালিনীকে, সেইজন্যই তাকে সজিস্তা টেনেছিল। রাজপ্রাসাদের কোন কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

মালিনীও যে যথার্থ রতন ঠাকুরের প্রেমে পড়েছিল, তার ইঙ্গিত শুধু তার ঘর ছাড়াতেই মেলে না, রতন ঠাকুরের অদর্শনেও সে তাকে বারেকের জন্যও ভর্ৎসনা করেনি, বরং নিজের কর্মকেই দোষী করেছে :

বন্ধুরে না দিবাম রে দোষ
আমার নিজের কর্ম দোষী
আ—নইলে ভুলাইব কেমনে
বন্ধেরে তিরপুরাব রাইক্ষসী।।

নিজের প্রেমের প্রতি মালিনীর আস্থা ছিল প্রবল, তবেই না সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পরেছিল :

তুমি ত আইবা রে বন্ধু,
আমি জানি মন পরাণে।

শুধু তার ক্ষোভ এইখানে যে জীবদ্দশায় সে রতন ঠাকুরের আর দেখা পেল না শেষবারের মত।

পালাটির বিস্তৃত অংশ কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত। ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক স্থানে। যেমন, 'পরাণ পাগেলা বন্ধু রে', 'পিরীতি কাল কালিন্দী বিষ রে', 'লো কইন্যা না কান্দিও আর'। আলোচ্য পালাটির একটি বিশেষত্ব এই যে একাধিক স্থানেই ব্যঞ্জনা মণ্ডিত কাব্যাংশের সাক্ষাৎ মেলে। যেমন, রতন ঠাকুর মালির কাছে তার কন্যার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালে সে বলেছে :

পূবের বাতাস পাক মাইর্‌ল
বযারে নদীর বাড়ে ঢেউ।

অর্থাৎ রাজকুমার যদি মালীর বাড়ীর আশেপাশে আনাগোনা করে তবে যুবতী কন্যার মন চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং অনর্থও কিছু একটা ঘটে যাবে।

পুনরায়, মালীর কন্যা রতন ঠাকুরকে বলেছে :

'জল লড়ে স্থল লড়ে না কুমার,
আমি জলে না পাই ভর।'

অর্থাৎ জলের মধ্যেকার মাটিতে কোনক্রমে একবার দাঁড়াবার সুযোগ পেলে যেমন ঢেউ সহজে টলাতে পারবে না, তেমনি যৌবনে স্বামী আশ্রয় হলে যৌবনের চাঞ্চল্য মালিনীকে টলাতে পারবে না। প্রকারান্তরে সে রতন ঠাকুরকে পতিরূপে গ্রহণের ইচ্ছাকেই প্রকাশ করেছে এইভাবে।

আদর্শ গীতিকার ধর্ম হল সংক্ষিপ্ততা। আলোচ্য পালাটিতেও সেই ধর্ম রক্ষিত হতে দেখা গেছে। যে মালী তার কন্যা প্রসঙ্গে রতন ঠাকুরকে জানিয়েছিল :

এহি কইন্যা ছাড়া আমার রে
এই দুইন্যায় নাই রে কেউ।।

সেই মালীর কন্যার গৃহত্যাগিনী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেও কোনো প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়নি অনাবশ্যক বিবেচনায়। রঙ্গিলা নাম্নী বারবিলাসিনী রতন ঠাকুরের পিতা কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে কিরূপে রতন ঠাকুরকে বশীভূত করে রাজার কাছে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল, সে বিবরণও পালাটিতে অলভ্য। রতন ঠাকুরকে ফিরে পেয়ে তার পিতার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, কিংবা রতন ঠাকুর গৃহত্যাগী হলে রাজা কিংবা রাজপরিবারের অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়াও বর্ণিত হতে দেখা যায়নি। সংক্ষিপ্ততার কারণেই কাহিনী গতিশীল হয়ে উঠেছে, তীব্র গতিতে পরিণামের দিকে আখ্যানটি অগ্রসর হতে পেরেছে।

আলোচ্য পালায় আমরা কবির সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞানেরও পরিচয় পাই। রতন ঠাকুরের প্রতি আসক্ত মালিনীর কোন কিছুতেই মন ছিল না, মন ছিল না হাট করায়, নিদ্রায়, রন্ধনকার্যেও মন ছিল না। কেননা তার পিতা তখন জেনে ফেলেছে তাদের সম্পর্কের কথা, তাই ঘর থেকে তার বের হওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। এমতাবস্থায় প্রিয়জনের দর্শনে বঞ্চিতা প্রেমিকার যা হওয়া উচিত, তাই বর্ণিত হয়েছে। মালিনীর খেদোক্তি ঝরে পড়েছে তার গীত বিরহ সঙ্গীতে :

বাপ বাদী হইল রে আমার
সোংসার বাদী হইল।
জলের ঘাটে যাইতে মোরে
হায় রে, মানা যে করিল।

অতএব প্রেমের জ্বালা যে কি তা এখন সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, তবেই না তাকে বলতে শোনা গেছে 'পিরীত কাল-কালিন্দী বিষ রে।' রতন ঠাকুরের সঙ্গে তার প্রথম মিলনের অভিজ্ঞতা ও তার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ততা ধর্ম রক্ষিত হয়েছে, তেমনিই কবি শালীনতা ধর্মকেও রক্ষা করেছেন, কোনওপ্রকার স্থূলত্বকে প্রশ্রয়

দেন নি, সর্বোপরি এক্ষেত্রে কবিকে অত্যন্ত বাস্তবানুগ হতেও দেখা গেছে। রতন ঠাকুর মালিনীর প্রথম অঙ্গ স্পর্শ করলে তার প্রতিক্রিয়া :

থরথরায় কাঁপে রে অঙ্গ
মোর মুখে ছিল সে ঘাম্।

রতন ঠাকুর চুম্বন করলে মালিনীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এইরকম :

চৌক্ষে নাই সে দেখি রে আমি
আমার শুকাই যায় রে বুক—

কাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতেও কবির অসাধারণত্বের সাক্ষাৎ মেলে। রতন ঠাকুরের বাগানে কুসুম চয়ন করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে মালিনী। কৃত্রিম ক্ষোভপ্রকাশ করে রাজকুমার বলেছে, প্রতিদিন তার উদ্যানের কুসুম চুরি যায়, তাই প্রত্যুষে উঠে সে বাগানে আর প্রস্ফুটিত কুসুম রাজির সাক্ষাৎ পায় না, কিন্তু সেদিন সকালে তার ভিন্নতর অভিজ্ঞতা হয়েছে :

আইজ বিয়ানে উইঠ্যা দেখি
বাগে ফুইট্যাছে মুকুল--

এই মুকুলটি কে তার স্পষ্ট পরিচয় পরেই প্রদত্ত হয়েছে :

লো কইন্যা, ফুল গাছে নাই সে ধরে।।

রাজকুমার এরপর তার মনোভিলাষ ব্যক্ত করেছে। এতে একদিকে প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমিকার ঐশ্বর্যের পরিচয় যেমন মিলেছে, তেমনি কবিকল্পনার স্বাক্ষরও মিলবে :

যইবন পুষ্প তুইলা লো কইন্যা
কেশে মালা যে গান্থিস—
* * *
আরে, দুই আংখি অপরাজিতা
কইন্যা তর বদন চম্পার ফুল।
ডালুম রাঙা ঠোঁট দুইখানি
গালে ঢাইল্যাছে সিঁদুর।।
এই না ফুলে গাইস্থ্যা মালা
আইজ পরিবাম গলায়।।

একাধিক প্রবাদও পালাটিতে লভ্য--

ক) চোরের ধন কাইড়া লইলে
নাই সে বড়ো দায়—
খ) যার লাইগ্যা কইরলাম রে চুরি সেই সে বলে চোরা।।

সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে পরিশেষে বলতে পারি, 'পালাটিতে গীতিরসের প্রাচুর্য আছে।..নাট্যরস হইতে গীতিরসই ইহাতে সমধিক।'[৩৫]

## হরিণকুমার-জিরালনী কন্যার পালা

'হরিণকুমার-জিরালনী কন্যার পালা আসলে রূপকথা।'[৩১] এই রূপকথার নায়ক হরিণকুমার এবং নায়িকা জিরালনী। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে দুজনের মিলন কিভাবে শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হল সেই নিয়েই এই পালাটি রচিত।

কুশাই নদীর উত্তরাঞ্চলে যে নয়াগঞ্জ, তারই রাজা চক্রধর। রাজার দুই রাণী। কিন্তু ছোটরাণীর চক্রান্তে বড় রাণী বনবাসিনী। বড় রাণীর একমাত্র কন্যার নাম জিরালনী। জিরালনী অবশ্য ছোট রাণী ও তার বাবার সঙ্গে রাজপ্রাসাদেই থাকে।

একদিন চক্রধর গেলেন শিকারে। একটি হরিণ দেখতে পেয়ে তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে ধরে নিয়ে প্রাসাদে এলেন। জিরালনীকে তিনি হরিণটি উপহার দিলেন। আসলে হরিণটি ছিল দণ্ডপুরের রাজা দণ্ডপতির পুত্র। বিমাতা তাকে বন্য ঔষধের সাহায্যে হরিণে রূপান্তরিত করে। দীর্ঘ বারোটি বৎসর তার বনে অতিবাহিত হয়। হরিণের মাথায় একটি কবচ বাঁধা ছিল। জিরালনী কোনক্রমে সেটি খুলে ফেললে অনিন্দ্যসুন্দর কান্তির অধিকারী রাজকুমারকে হরিণের পরিবর্তে জিরালনী দেখতে পায়। পরস্পব পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়! উভয়ে উভয়েব দুঃখের শরিক হয়। হরিণকুমার দিবাভাগে হরিণরূপে রাজকন্যার কাছে থাকলেও রাত্রে সে রাজকুমারের স্বাভাবিক আকৃতিতে জিরালনীর সঙ্গে অতিবাহিত করে। ঘটনাচক্রে হরিণকুমারের মাথার কবচটি হারিয়ে যায়। আর তাকে হরিণে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় না। রাজবাড়ীর লোকের কাছে হরিণকুমারের উপস্থিতি ধরা পড়ার সম্ভাবনায় সে চক্রধরের প্রাসাদ থেকে পলায়ন করে। তবে তার পূর্বে উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়।

এদিকে চক্রধরের ছোট রাণীর সন্তান দুলাই জিরালনীর প্রতি আসক্ত, সে তাকে বিবাহ করার জন্য ব্যাকুল। সে প্রতিজ্ঞা করল জিরালনীর সঙ্গে তার বিবাহ না হলে প্রাণত্যাগ করবে। অগত্যা রাজা রাণী বিবাহে সম্মত হয় কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই জিরালনী দুলাইয়ের সঙ্গে তার বিবাহের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারে না। সে স্নান করার অছিলায় নদীর ঘাটে গিয়ে একটি দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ করে বসল। রাজা, সৎমা এমনকি দুলাইয়ের শত অনুরোধেও জিরালনী ফিরল না। সে এক জেলে ও জেলেনীর আশ্রয়লাভ করল। এখান থেকে সে মুক্তা ব্যবসায়ী এক সওদাগরের পুত্রের আশ্রয়ে গেল। বিনিময়ে সওদাগর পুত্র জেলে-জেলেনীকে ঘর নির্মাণ করে দিল আর দিল ধনসম্পদ। সওদাগর পুত্রকে জিরালনী তার দুঃখময় জীবনের কথা সবিস্তারে জানাল। সে তাকে অনুরোধ করল তার নির্বাসিতা জননী এবং স্বামী হরিণকুমারের সন্ধান এনে দেবার জন্য। বাণিজ্যরত সওদাগর পুত্রের সঙ্গী হল জিরালনী। কিন্তু জলপথে একদিন সওদাগর পুত্রের ডিঙ্গা ডুবল। কাঠুরিয়াদের দ্বারা সে রক্ষা পেল তাদেরই নৌকায়। এই নৌকাতেই অবস্থান করছিল হরিণকুমার। তার পিতার মৃত্যুর পর, সতাই পুত্র সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। ফলে হরিণকুমারকে কাঠুরিয়ার বৃত্তি অবলম্বন করে জীবন রক্ষায় ব্রতী হতে হয়েছে। সওদাগর পুত্রের কাছ থেকে

হরিণকুমার জিরালনী সম্পর্কে জানল। সওদাগর পুত্র কথা দিল তাকে সাহায্য করার। অর্থের লোভে কাঠুরিয়ারা সব সওদাগর পুত্রের সঙ্গে তাদের বাড়ী উপস্থিত হল।

জিরালনী গৃহত্যাগিনী হবার পর চক্রধর প্রজাদের সমালোচনার ফলে বড়রাণীর সন্ধানে লোক প্রেরণ করলেন। বড় রাণীর সন্ধানও মিলল। কিন্তু প্রাসাদে ফিরে রাণী যখন জিরালনীর অন্তর্হিত হবার কথা শুনলেন, তিনিও প্রাসাদ ত্যাগ করে গেলেন।

সওদাগর পুত্রেব সঙ্গে হরিণকুমার জিরালনীর সন্ধানে বেরিয়ে ভোলা ডাকাতের লোকজনদের দ্বারা ধৃত হয়। জিরালনী ভোলা ডাকাতের আশ্রিতা ছিল। ডাকাত হরিণকুমারকে তার পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাল। বিবাহ হল হরিণকুমারের সঙ্গে জিরালনীর। ভোলা ডাকাত তার যথাসর্বস্ব হরিণকুমারের রাজ ভাণ্ডারে গচ্ছিত করে দিল। ডাকাতি ত্যাগ করে সে দণ্ডপুরে এসে রইল। সওদাগর পুত্র নব পরিণীতা হরিণকুমার ও জিরালনীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল বারাণসী ধাম।

আলোচ্য পালাটিতে বেশ কয়েকটি অভিপ্রায় স্থান পেয়েছে। এইসব অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ঐন্দ্রজালিক উপায়ে হরিণকুমারের রূপান্তর ঘটার বিষয়টি (Transformation by magic; D200), তাছাড়া জিরালনীর বিমাতা এবং হরিণকুমারের বিমাতার দুষ্কার্যের জন্য শাস্তিলাভ (Q 200-Q399), অদৃষ্টও আর একটি অভিপ্রায়, যা গল্পটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে (N. Chance and Fate)। নায়ক হরিণকুমার নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত রাজকন্যা জিরালনীকে লাভ করেছে, লাভ করেছে তার পিতৃ সিংহাসনের অধিকার অর্থাৎ Marchen-এর বৈশিষ্ট্য 'heroes kill adversaries, succeed to kingdoms, and marry princesses' এখানেও প্রযোজ্য। বলা হয়েছে রূপকথা হবে অনেকগুলি অভিপ্রায় ও ঘটনার সমষ্টি—'fable of some length involving a succession of motifs or episodes'. আমরা অভিপ্রায়ের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ঘটনা সমাবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিণকুমারের কাহিনী, জিরালনী কন্যাকে বিবাহ করার ব্যাপারে তার সৎভ্রাতার কৌশল, জিরালনীর নৌকায় নিরুদ্দেশ যাত্রা এবং জেলে জেলেনীর আশ্রয় লাভ, সওদাগর পুত্রের সহায়তায় জিরালনীর জননী ও স্বামীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া, ভোলা ডাকাতের কাছে জিরালনীর আশ্রয় লাভ, ভোলার সাহায্যে হরিণকুমারের পৈতৃক সিংহাসন লাভের ঘটনা।

আলোচ্য পালাটি গদ্য পদ্য মিশ্র রচনা। উল্লেখযোগ্য অংশ কথোপকথনের সূত্রে গ্রথিত। রচয়িতা কখনই কাহিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করেন নি। 'ওরে মন পবনের নাও, মনের বৈঠা বাইয়া এইবার পাতাল পুরে যাও' ইত্যাদি ধুয়া স্থান পেয়েছে পালাটিতে। আদ্যন্ত কাহিনীটিতে suspense জাগরূক থেকেছে। প্রকৃতিতে প্রেমের কাহিনী আলোচ্য পালাটি, তবে অধিকাংশ গীতিকার মত বিয়োগান্ত নয়, মিলনাত্মক। উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর এই পালাটিতে লভ্য। ভ্রাতা এবং ভগিনীর বিবাহ উন্নত সমাজে

স্বীকৃত নয়, এখানেও সেই সামাজিক রীতিকেই সমর্থন জানান হয়েছে। চক্রধরের প্রজারা চক্রধরের দ্বিতীয়া রাণীর পুত্রের সঙ্গে জিরালনীর বিবাহের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে সংক্ষিপ্ততা গুণ রক্ষিত হয়েছে। শৈশবাবস্থায় জিরালনীর অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে—'সে সগল বহুত কথা এইখানে থাকিল।' ক্ষেত্রবিশেষে কবিত্বশক্তির পরিচয় মেলে। যেমন—'পূব আকাশে রাঙ্গা মেঘ রক্তে খেলা করে' কিংবা 'রাইতের তারা বিদায় মাগে যাইব বহুত দূর'। অলংকার প্রয়োগে গতানুগতিকতাকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

এইবার পালাটির কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধে আলোকপাত করা যেতে পারে।

**রাজা চক্রধর**

রাজা চক্রধর ছিলেন ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, নতুবা ছোটরাণীর প্ররোচনায় তিনি বড়ো রাণীকে বনবাসে দিতে পারতেন না। রাজা ছিলেন শিকার প্রিয়। হরিণ শিকারে যাওয়া তারই প্রমাণ। অবশ্য বড়োবাণীর কন্যা জিরালনীর প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অকৃত্রিম। ছোট রাণীর প্ররোচনায় রাজা জিরালনীর সঙ্গে ছোট র'ীর পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য ভাই-বোনের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রজারা রাজার আচরণের তীব্র সমালোচনা করলে চক্রধর বড় রাণীর সন্ধানে লোক প্রেরণ করেছেন। রাণীব সন্ধান পেয়ে স্বয়ং চৌদলা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন রাণীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

**ছোট রাণী**

ছোট রাণী অতিশয় চতুরা। সেই রাজা চক্রধরকে বড় রাণীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে বনবাসে প্রেরণের জন্য। পুত্রস্নেহে সে অন্ধ, এমনকি পুত্রের অন্যায় অনুরোধ রক্ষাতেও তাকে বিন্দুমাত্র ইতস্তত: করতে দেখা যায়নি। পুত্র জিরালনীকে বিবাহের জন্য পণ করে বসলে জননী হয়ে ছোট রাণী পুত্রকে এ ব্যাপারে শাসন করা দূরের কথা, বরং রাজাকে জানিয়েছে :

> যে হউক সে হউক আমার পুত্রের পরাণ চাই।
> জিরালনী কইন্যা বিনা পুত্রের বাঁচন নাই।।

অর্থাৎ প্রকারান্তরে সে ভাই-বোনের বিবাহকে মেনে নিয়ে তাকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এমনিই নির্লজ্জ সে যে, জিরালনীকে প্রলুব্ধ করতেও তার বাধে নি :

> গুরুজনের কথা মাও গো, না কর হেলন।
> সুখে ত থাকিবা দোয়ে না ভাইব দুশ্‌মন।।
> তোমারে করবাম্ মাও গো. রাইজ্য পাটেশ্বরী।
> এত বলি কান্দে রাণী জিরার হস্ত ধরি।।

মূলত: তারই কারণে জিরালনীকে অনিশ্চিত পথের পথিক হতে হয়েছে, গৃহত্যাগিনী হয়েছে সে। পুত্র শিকারে গিয়েছে শুনে সে সন্ত্রস্ত হয়ে কান্নাকাটি করেছে,

আর্ত স্বরে বলেছে :

এতদিনে বিধাতা আমার কপালে পুড়াইল।।
হাউলিয়ার জঙ্গলা সেই না রাইক্ষসের বাসা।
আর না ফিরিব পুত্র আমার গেল সগ্‌গল আশা।।

কিন্তু তার জন্য কারো কোনো সহানুভূতি জাগে না, সহানুভূতি জাগার প্রশ্নও ওঠে না।

**ছোট রাণীর পুত্র**

দুলাই ছোট রাণীর পুত্র। সে জিরালনীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তথাপি জিরালনীর প্রতি সে আকৃষ্ট। সামাজিক প্রথা অনযুায়ী দু'জনের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ সম্ভব ছিল না। তাই তাকে নির্লজ্জের মত অনুশোচনা করে বলতে শোনা গেছে :

হায় বিধাতা দুশ্‌মন হইল প্রতিবাদী।
জিরালনী কইন্যা বইন না হইত যদি।।
পরাণের পরাণ জিরা নয়ানের কাজলী।
হেন জিরাবে বহিন কইরা বিধাতা দিল গালি।।

দুলাই একটি রমণীয় উদ্যান রচনা করেছে। এ তার প্রকৃতি প্রেম সঞ্জাত ছিল না। উদ্যান বিলাসিতাও এর জন্য দায়ী ছিল না। জিরালনীকে আকৃষ্ট করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়েই যে তার উদ্যানরচনা, সে পরিচয় মেলে এই বর্ণনা থেকেই :

ভাইব্যা চিন্ত্যা রাজার পুত্তুর কোন কাম করে।
বাগান করিল এক গড়ের ভিতরে।।

এই উদ্যানে জিরালনী বেড়াতে এলে তার মাথার একটি কেশ গাছের ডালে থেকে যায়। সে সেটিকে নিয়ে জোড় মন্দির ঘরে খিল দিয়েছে, স্পষ্টই জানিয়েছে :

এই কেশ যার মাও গো তারে করবাম্‌ বিয়া।
তা নইলে তেজিবাম্‌ পরাণ গলায় কাতি দিয়া।।

ছোট রাণী ছেলের ইচ্ছাপূরণে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এবং জিরালনীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহের ব্যাপারে রাজা চক্রধরকে সম্মত করেছে। জিরালনী যখন নৌকায় যাত্রী হয়ে অনিশ্চিত পথের পথিক হয়েছে, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে দুলাই এসে তাকে ভগ্নী বলে সম্বোধন করে ফিরে আসতে বলেছে, নির্লজ্জতার সীমাকে অতিক্রম করে :

থালে ভাত ডিঙ্গাবে পানি ঘাটে আইস জিরালনী
শুন ভাইন মোরে না ভাড়াও।

জিরালনীও তাকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে :

ভাই হইয়া সোয়ামী হইবা
কোন লাজে নিতে আইলা রে
...কোন জনে দেখাইবা মুখ মুখে মাখাইলা কালি,

দুলাইয়ের গুণ বলতে ছিল তার সাহসিকতা। তাই কোন সঙ্গী সাথী না নিয়েই একাকী হাউলিয়ার জঙ্গলে তাকে শিকার করতে যেতে দেখা গেছে, বিশেষত যে হাউলিয়ার জঙ্গল রাক্ষস অধ্যুষিত ছিল বলে বিশ্বাস।

**সওদাগর পুত্র**

সওদাগর পুত্র মুক্তা ব্যবসায়ী। তার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিও ছিল। জেলে ও জেলেনীর কাছ থেকে মুক্তা সংগ্রহ করতে এসে লতাপাতার ছাউনি দেওয়া তাদের ঘরে জিরালনীকে সে ঠিক নজর করেছে :

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘরখানা পাতা লতার ছানি।
তাব মধ্যে বইসা আছে সপ্পের মাথার মণি।।

প্রথম দর্শনেই সে আকৃষ্ট কিন্তু সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। দুর্বলতার কোন পরিচয় রাখতে চায়নি সে, এদিকে ভাল করে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখা চাই, তার পরিচয পাওয়া চাই। তাই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে সে। বলেছে :

'জাইলা, তোমার সংসারে কে আছে।
পুত্র কইন্যা থাকে যদি আন আমার কাছে।।
কিছু কিছু মেওয়া মিঠাই দিতাম চাই তারারে'।

জেলে সবল বিশ্বাসে জানিয়েছে তার সন্তানাদি কেউ নেই। কিন্তু সওদাগর পুত্র তার কথা মানতে নারাজ :

পত্যয় না করি তোমার কথা।
ভাঙ্গা ঘরে চান্দের আলো আচানক বারতা।।

স্পষ্টতঃই সে জিবালনীর ইঙ্গিত দিয়েছে। অগত্যা জেলেনী সব কিছু অকপটে বলেছে তাকে। জানিয়েছে তাদের মত দরিদ্রেব ঘরে এসে তারও কি দুরবস্থা। সওদাগর পুত্র সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছে :

...জাইলা, না কান্দিও আর।
কইন্যা দিযা ধন লও যা মনে তোমার।।

কিন্তু এই প্রস্তাবে জেলেনী নারাজ হলে জিরালনী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সওদাগর পুত্রকে তার বিনিময়ে জেলে জেলেনীকে বাড়ী ঘর তৈরী করে দিতে বলেছে, বলেছে ধনসম্পদ দান করতে। সওদাগর পুত্র জিরালনীর কথামত কাজ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছে। কিন্তু ডিঙ্গায় উঠেই জিরালনী সোজাসুজি সওদাগর পুত্রকে জানিয়ে দিয়েছে, তার জন্য সে যেন আশায় না থাকে, সে যেন অন্যত্র বিবাহ করে। সওদাগর পুত্রও জিরালনীর ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছে। জিরালনীর ইচ্ছানুযায়ী সে তার নির্বাসিতা জননী এবং হরিণকুমারের সংবাদ সংগ্রহ করে দিতে সম্মত হয়েছে।

বাণিজ্যযাত্রা করে সওদাগব পুত্রের নৌকাডুবি হয়েছে। কোনমতে রক্ষা পেয়েছে সে কাঠুরিয়াদের দ্বারা। কাঠুরিয়াদের নৌকাতেই তার সঙ্গে হরিণকুমারের পরিচয় হয়েছে।

উভয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে জিরালনীর সন্ধান লাভে। সওদাগর পুত্রের একটিই বাসনা—'বন্ধুরে বিয়া দিয়া কেম্‌নে বাইন্ধ্যা দিব ঘর।' ঘটনাচক্রে তারা বন্দী হল ডাকাত দলের হাতে। ভোলা ডাকাত ইচ্ছা করেছিল তার আশ্রিতা জিরালনীর সঙ্গে সওদাগর পুত্রের বিবাহ দেয়। কিন্তু সে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। হরিণকুমারের আনুপূর্বিক পরিচয় দিয়ে তাকেই যোগ্য পাত্র বলে ঘোষণা করেছে এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ করেছে :

'ভাটি মুল্লুকের রাজা তুমি আছে ক্ষেমতা তোমার।
বন্ধুর রাজত্বি তুমি করিবা উদ্ধার।
বন্ধুর সঙ্গে দেও তোমার সুন্দর কইন্যার বিয়া।
পাটরানী হইব কইন্যা দণ্ডপুরে গিয়া।।'

সেইমত ভোলা ডাকাত হরিণকুমারকে তার পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করেছে। জিরালনীর সঙ্গে তার বিবাহও হয়েছে। সওদাগর পুত্র বিবাহে মানিকের মালা দিয়ে সম্মানিত করেছে হরিণকুমার ও জিরালনীকে। তারপর ব্যবসা বাণিজ্যের দায়িত্ব তার সব ভাইকে বুঝিয়ে দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে বারানসী যাত্রা করেছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় সে ছিল আন্তরিক ভাবে জিরালনীর প্রেমিক। কিন্তু তার প্রেম ছিল অব্যক্ত। ভালবাসার জনের প্রতি নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য করে সে সংসার জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে। সে দেখিয়েছে যথার্থ প্রেম নিজের স্বার্থের জন্য দাবী করে না, মহৎ ত্যাগের পথও অবলম্বন করে ভালবাসার জনের কল্যাণের জন্য।

### জিরালনী

নযাগঞ্জের রাজা চক্রধরের প্রথমা পত্নীর কন্যা জিরালনী। হতভাগিনী শৈশবেই জননী হারা, কেননা তার সৎমার চক্রান্তে বড় রাণী নির্বাসিতা। অবশ্য পিতৃস্নেহলাভে বঞ্চিতা নয় সে। তাই শিকার থেকে পাওয়া সুন্দর হরিণ চক্রধর কন্যাকেই উপহার দেন পালনের জন্য। জিরালনী যেভাবে হরিণটিকে পালন করেছে তাতে তার পশুপ্রীতি প্রমাণিত হয়েছে :

খাওয়ায় নাওয়ায় হরিণ কইন্যা মনের মতন।
বনেলা হরিণরে কইন্যা করয়ে যতন।।

জিরালনী বুদ্ধিমতী, তাই যদিও তার বিমাতার মুখে হাসি লেগে থাকে, তথাপি সে জানে তার প্রকৃত প্রকৃতি কি :

আমার সতাইর দেখো মুখে মধুর হাসি।
কুচক্র করিয়া মাওরে কইরাছে বনবাসী।।

তার ক্ষোভ পিতার উপরে। কেননা :

কঠিন নিঠুর বাপ পাষাণ হইল।
সতাইর কথায় মাওরে বনবাসে দিল।।

জিরালনীর আর এক সমস্যা তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে নিয়ে। সে তার প্রতি অনুরক্ত।

ভাই হয়ে সে বোনের পাণিগ্রহণে উৎসুক। হরিণকুমারকে নিজের দুঃখের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে সে জানিয়েছে :

সতাইয়ের পুত্র ভাই আছে একজন।।
দুরন্ত দুশ্‌মন ভাই মোরে কইরব বিয়া।

জিরালনীর কাছে স্বভাবতই রাজপ্রাসাদ ছিল অসহ্য। তার প্রয়োজন ছিল একজন উপযুক্ত সঙ্গীর, যার সঙ্গে সে রাজ্যত্যাগ করে যেতে ইচ্ছুক। নতুবা তাকে আত্মহননের পথ নিতে হয়। তথাপি ভ্রাতাকে পতিপদে বরণ করতে সে অনিচ্ছুক। সৌভাগ্যবশত: হরিণকুমারকে সে পায় এবং তাকেই পতিরূপে বরণ করে নেয় সে। পাছে হরিণকুমারের বিষয়টি রাজপ্রাসাদে জানাজানি হয়ে যায়, তাই সে প্রাসাদ ত্যাগ করে পালিয়েছে। আর তার বিরহে কাতরা হয়েছে জিরালনী। যদিও সে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার তার প্রতি অনুরক্তিতে বিরূপ, তথাপি তার দ্বারা প্রস্তুত অপূর্ব বাগানের কারণে ভ্রাতার প্রশংসা করে প্রকারান্তরে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে :

দেইখ্যা সে বাগান কইন্যার নয়ান জুড়ায়।
সার্থক কইরা ভাই বাগান বানায়।।

পিতা চক্রধর জিরালনীর বৈমাত্রেয় জননীর প্ররোচনায় কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহে সম্মত হলে জিরালনী কিছুটা সময় লাভের আশায় কৌশল অবলম্বন করে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। বলেছে :

এহি ত শাওন মাস বিয়ার দিন নাই।
বেউলা হইল রাঁড়ী কথা শুন্‌তে পাই।।
ভাদ্দর মাসে ভরা গাঙ্গ গাঙ্গে অথৈ পানি।
আইলে আশ্বিনের মাস আশ্‌মান হইবে সাফ।
আশ্বিন মাসে বিয়া হইলে নাই কনো তাপ।।

ভাদ্রমাস শেষ হবার মুখে, অথচ হরিণকুমারের কোন সন্ধান নেই। তাই নিরুপায় হয়ে স্নানের অজুহাতে জিরালনী নদীর ঘাটে গিয়ে আকস্মিকভাবে একটি ডিঙ্গির সওয়ারী হয়ে বসেছে। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তার পিতা, বৈমাত্রেয় জননী, ভ্রাতা এলে সে অপ্রিয় সত্যকথা তাদের মুখের ওপর জানিয়ে দিয়েছে। পিতাকে বলেছে :

বাপ হইয়্যা শ্বশুর হইবা
কোন বা লাজে নিতে আইলা,

কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে উদ্দেশ করে বলেছে :

ভাই হইয়া সুয়ামী হইবা
কোন লাজে নিতে আইলা রে

শেষপর্যন্ত সে আশ্রয় পেয়েছে এক জেলে-জেলেনীর সংসারে। এখানে তাকে চরম কৃচ্ছ্রসাধন করতে দেখা গেছে। রাজকন্যা হয়েও যেভাবে দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েছে তাতে তার সহনশীলতা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়ার দুর্লভ গুণই

প্রকাশিত। জেলেনী জিরালনীর কষ্ট ভোগের পরিচয় দান প্রসঙ্গে সওদাগর পুত্রকে জানিয়েছে :

অঙ্গে কন্যার ছিঁড়া বস্তর শীতের বাতাসে।।
উবাসে ঝুইরা পড়ে তবু মুখে হাসি।।
চিত্তি সুখে থাকে মাও দুক্কু নাই সে বাসি।।

সওদাগর পুত্র জিরালনীকে দেখে জেলে জেলেনীকে প্রস্তাব দিয়েছে সম্পদের বিনিময়ে তাকে তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। জেলে জেলেনী এই প্রস্তাব খারিজ করে দিলেও জিরালনী তার আশ্রয়দাতা পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা পরবশ হয়ে সওদাগর পুত্রের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। সে বলেছে :

'আমার না বাপ মাও বড়ো দুক্ষু পায়।
উবাসে কাবাসে তারার কত দিন চইলা যায়।।
ভাঙ্গা ঘর বাইন্ধ্যা দিবা দিয়া উলু ছনের ছানি।
পূব পাহাড়ের শালঠা কাঠে দিবা তার ধুনি।।
নাও একখান বাইন্ধ্যা দিবা পত্তন কাঠ দিয়া।
তবে ত আমারে তুমি যাইবা লইয়া।।'

বস্তুত তার এই কৃতজ্ঞতাবোধ তার চরিত্রে ভিন্নতর এক মাত্রাকে যুক্ত করেছে। মনে রাখতে হবে যে জিরালনী অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী, আর সে সওদাগর পুত্রকে চেনে না। তথাপি সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কত বড় ঝুঁকিই না নিয়েছিল। আসলে প্রেমের শক্তিই তাকে সাহস জুগিয়েছিল, নিশ্চিন্ত করেছিল যে সে শত প্রতিকূলতাতেও তার সতীত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে।

সওদাগর পুত্রের নৌকায় উঠেই সে জানিয়ে দিয়েছে যে সে ব্রহ্মচর্য পালন করবে। মাথায় তেল মাখবে না, মাটিতে সে শয্যা নেবে, ভক্ষণ করবে আতপ চাল। সওদাগর পুত্র তার অমতে যেন তাকে বিবাহ করতে না চায়। সে তাকে পরামর্শ দিয়েছে :

'ভালা কইন্যা দেইখ্যা তুমি আর বিয়া কর।
আমার আশায় থাইক্যা তোমার দুক্কু হইব বড়।।

সওদাগর পুত্রকে সে অনুরোধ করেছে তার নির্বাসিতা জননী এবং হরিণকুমারের সন্ধান এনে দেওয়ার জন্য। সে বলেছে সওদাগর পুত্রের গৃহে সে একাকিনী অবস্থান করবে না, তারই সঙ্গে ডিঙ্গায় ঘুরে বেড়াবে। কেননা তার যুক্তি হল—

বিদেশ বিচ্‌ড়ায়া যদি মায়ের দেখা পাই।
আমি ত চিনিবাম্ মাওরে তোমার চিনা নাই।।

এছাড়াও তার নিরাপত্তার জন্যও যে সে একাকিনী সওদাগর পুত্রের গৃহে অবস্থান করতে সম্মত হয়নি তা সহজেই অনুমেয়।

সওদাগর পুত্রের সঙ্গে নৌকায় যাত্রাকালে নৌকাডুবি হলে জিরালনী আশ্রয় পেল ভোলা ডাকাতের কাছে। সে আশ্রয় দাতা ভোলা ডাকাতকে পিতৃ সম্বোধন করে তার

হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছে—অকূলে কূল দিলা তুমি হইলা মোর বাপ।।

শেষপর্যন্ত হরিণকুমারের সঙ্গে জিরালনীর মিলন সম্ভব হয়েছে আর এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ভোলা ডাকাত আর সওদাগর পুত্র। হরিণকুমারের সঙ্গে জিরালনীর বিবাহের পর সওদাগর পুত্র সন্ন্যাস নিয়ে বারানসী যাত্রা করেছে। আর এই সংবাদে জিরালনীর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে এইভাবে :

এই না কথা জিরালনী যখনে শুনিল।
সোনার পালংকে বইসা কান্দিতে লাগিল।

জিরালনী ত তার দয়িতকে পেয়েছিল। তবু সওদাগর পুত্রের সন্ন্যাসী হওয়ার সংবাদে তার চোখে জল এসেছে কেন? এ কি শুধুই একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আশ্রয়দাতার স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ চিরতরে অবরুদ্ধ হওয়ার পবিপ্রেক্ষিতে জিরালনীর সহানুভূতি প্রকাশ, দুঃখের অভিব্যক্তি মাত্র? আমাদের মনে হয় নিঃস্বার্থভাবে সওদাগর পুত্র তাদের মিলনের জন্য যা করেছে, সেজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ত জিরালনীর ছিলই, সেই সঙ্গে তার সম্পর্কেও জিবালনীর হৃদয় দৌর্বল্য গড়ে উঠেছিল। সতীত্ব রক্ষার তাগিদে যে দুর্বলতাকে সে এ পর্যন্ত প্রশ্রয় দেয়নি সেই হৃদয় দৌর্বল্যেরই প্রকাশ ঘটেছে জিরালনীর চোখের জলের মাধ্যমে, সওদাগর পুত্রের সন্ন্যাসী হবার সংবাদে, একটি সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের অকাল পরিসমাপ্তির জন্য জিরালনী নিজেকে দায়ী না করে পারেনি।

## সন্নমালার পালা

'সন্নমালা' পালাটির চরিত্রের সঙ্গে রূপকথার গভীব সাযুজ্য। এটি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত রচনা। পালাটিতে মনসামঙ্গলের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সন্নমালা চরিত্রে বেহুলার প্রভাব প্রকট। তবে বেহুলা যেখানে নানা প্রতিকূলতার পর স্বর্গে উপনীত হয়ে নৃত্যগীতাদিতে দেবতাদেব সন্তুষ্ট করে তাঁর মৃত স্বামীর পুনর্জীবনের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেক্ষেত্রে সন্নমালা বৃদ্ধ একচক্ষু বিশিষ্ট রাখাল কানাইয়ের দ্বারা বনজ ভেষজ উদ্ভিদের সাহায্যে সর্পাঘাতে মৃত সওদাগব পুত্রকে বাঁচিয়েছে। পালায় সর্পদেবী মনসার প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। স্বয়ং রাজার বিশ্বাস হয়েছিল বিষহরিই মৃত সওদাগর পুত্রকে পুনর্জীবিত করেছেন। আর তাই, 'বিষহরি মনসার ভয়ে রাজা কাঁপিতে লাগিল।।' এবং নগরের লোকেরাও বলাবলি করেছে :

সদাইগরের বংশ হয় ভক্ত মনসার।
মরা ডৌকা বাইচ্যা আইল কিরপায় তানার।
মনসার কোপে পইড়্যা আর রইক্ষা নাই।
রাজা পরজা সবারে খাইব কেমনে পরাণ বাঁচাই।।

রাজকন্যা মনসার কোপ থেকে রেহাই পেতে পিতার কাছে প্রস্তাব করে বসেছে :

আমারে ত বিয়া দেও সদাইগরেব ঘরে।।

মা-মনসার কোপে পইড়্যা পরাণ না বাঁচিব।
সদাইগর খুশী হইলে মনসার কোপ যাইব।।

পালাটিতে মনসার জয়গান গীত হয়নি, এমনকি সওদাগর পুত্রের পুনর্জীবনে মনসার কোনো ভূমিকা লক্ষিত হয়নি, তথাপি সাধারণ মানুষ সহ রাজার মনসা ভীতির পরিচয়, সমসাময়িক কালের মানুষের মনসা ভীতিকেই প্রতিফলিত করেছে। দীনেশচন্দ্র সেনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য, 'বেহুলার উপাখ্যান একটি বিশেষ ধর্মের অন্তর্বর্তী হওয়াতে সাধারণ্যে তাহার প্রচার খুব বেশী হইয়াছে। কিন্তু দেশময় বেহুলা জাতীয় স্ত্রী চবিত্রের উদাহরণ ছিল। পরবর্তী বেহুলা উপাখ্যানগুলি সেইমত দৃষ্টান্ত দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় পালাটি সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, 'পালাটি অলৌকিকতাবর্জিত...', কিন্তু আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব সওদাগর পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে যাত্রাকালে সন্নমালার অশরীরী শক্তির সম্মুখীন হওয়ার বিবরণ :

থাইকা থাইকা বিজ্‌লীর চমক রে
আকাশ ভাইঙ্গ্যা ঠাডার পড়ে।
দৈত্য দানা ভূত পিশাচরে
ডৌকার ভেরা ঘিবে।।
কেউ কয়, 'ডৌকারে খাইম্ রে
কইন্যা, ছাইড়া দে না মড়া।'
কেউ কয়, 'কইন্যা, তরে খাম্ রে
ডাঙ্গায় তুইলা ভেরা।।'

সন্নমালা রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করে আত্মরক্ষা কবেছে। কিংবা নির্বাসিতা রাজকন্যাকে সওদাগর ডিঙ্গায় উঠিয়ে নিলে যে সাত সাতটি ডিঙ্গা এ পর্যন্ত অচল অবস্থায় ছিল সেগুলি গতিশক্তি ফিরে পেয়েছে :

বাও নাই বাতাস নাই ডিঙ্গায় পাল উড়ে।
ঢেউ নাই ঢুলুনী নাই ডিঙ্গা উইড্যা চলে।

--এসবই অলৌকিকতারই পরিচয়বাহী। অলৌকিকতার পরিচয় মেলে একচক্ষু বিশিষ্ট কানাইয়ের, সর্পাঘাতে মৃত সওদাগর পুত্রকে পুনর্জীবিত করাতেও। পালাটিতে আমরা যে অভিপ্রায়টির সন্ধান পাই তা হল নিষেধাজ্ঞা বা taboo সংক্রান্ত। গণক ঠাকুর গণনা করে বলেছে রাজকন্যা সন্নমালার দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হবার পরেই যেহেতু তার অলক্ষ্মীর অংশে জন্ম, সেইহেতু তার কারণে রাজার বিপুল ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। তাই রাজাকে সে পরামর্শ দিয়েছে :

'সিতাবী কইন্যারে রাজা
ভাসাও নিয়া জলে।।'

অর্থাৎ বার বৎসরের পর সন্নমালাকে রাজগৃহে রাখার ব্যাপারে গণক নিষেধাজ্ঞা

জারি করেছে। কিন্তু অপত্যস্নেহবশত: রাজা সেই নিষেধাজ্ঞা পালন না করায় তাঁর সমূহ ক্ষতি হয়েছে :

হাত্তিশালে হাত্তি মরে ঘোড়া শালে ঘোড়া।
রাইজ্যের না পরজা সব হইল বেয়াড়া।।
বার বাংলা ঘরে রাজার লাগিল আগুণি।
চৌদিগেতে অমঙ্গল রাইজ্যের যত গুনি।।

নিরুপায় হয়ে রাজা শেষপর্যন্ত সন্নমালাকে নির্বাসিত করেছেন। সওদাগর পুত্রকে পুনর্জীবিত করা প্রসঙ্গে রাখাল কানাই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সন্নমালার কাছে এই বলে :

ডৌকা বাঁচাইবাম আমি কইলাম নিচ্চয়।।
এক না বিপদ রইছে তোমার গেরোর দশা।
বারো বচ্ছরের লাইগ্যা কইন্যা ছাড়ো পতির আশা।।
বারো বচ্ছর রইখা লো কইন্যা,
পতির অদেখা হইয়া,
তবে তো গেরোর দোষ যাইব কাটিয়া।।

সন্নমালাও অক্ষরে অক্ষরে এই নিষেধাজ্ঞা পালন করেছে এবং পালার পরিণতিতে সে তার বহু অভিলষিত সওদাগর পুত্রের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে, এমন ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়েছে। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা পালনে তার কল্যাণই হয়েছে।

পালাটিতে সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমাজে বিষহরি সম্পর্কিত ভীতির ভাব, সর্পাঘাতে আহত ব্যক্তির গুণিনের সাহায্যে চিকিৎসা, নৌ বাণিজ্যের প্রসার, জল দস্যুদের উৎপাত, গণকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, নৌবাণিজ্য শেষে প্রত্যাবর্তনকারী ডিঙ্গাগুলিকে বরণ করার রীতি :

ডিঙ্গার গলুয়ে ধান,
দূর্বা, সিন্দূর, ঘিয়ের বাত্তি, সাতবরণ ডালা, সাত বউ
সাত ডিঙ্গা অর্ঘ্য পুচ্ছ্যা ঘরে ধন দৌলত তুল্যা নিল।।

কিংবা সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত দেশাচারের উল্লেখ :
'সাপের ডৌকা পুড়াইতে দেশাচারে মানা।'—এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পালায় কিছু কিছু অংশ ছড়ার ছাঁদে রচিত হতে দেখা গেছে :

ভাইট্যাল বাঁকে কে আইল?
সন্নমালার বাপ রাজা আইল।
উজান বাঁকে কে আইল?
সওদাগরের পুত্র আইল।

প্রবাদের ব্যবহারও লক্ষ্য করার মত :

গাঙ্গের জল লড়ে বাও বাতাসে।

আর মাইয়া লোকের কথা মুখে মুখে ভাসে।।

পালার শেষাংশটি খুবই নাটকীয়তা পূর্ণ হয়েছে। রাজার পুত্র সন্নমালাকে লাভ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত দুর্দান্ত মঘুয়া ডাকাতের দলে যোগ দিল এবং 'সন্নগ্রাম' লুণ্ঠনে ডাকাতদলকে প্ররোচিত করল। সন্নমালা এই সংবাদ অবগত হয়ে আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে পিতাকে সংবাদ পাঠাল। তিনি যথাসময়ে হাজার বাইচের নৌকায় দশ সহস্র লাঠিয়ালসহ উপস্থিত হলেন। নিতান্ত আকস্মিকভাবে অকুস্থলে উপনীত হল সন্নমালার দয়িত সওদাগরপুত্র, সঙ্গে তার চৌদ্দটি ডিঙ্গা এবং একশত চল্লিশজন তীরন্দাজ। সন্নমালার নিজস্ব বাহিনী ত ছিলই। এই তিন বাহিনীর প্রতিরোধে ডাকাতদল পালিয়ে বাঁচল। শেষ চেষ্টা হিসাবে রাজপুত্র বিষযুক্ত তীর নিক্ষেপ করল, সন্নমালাকে লক্ষ্য করে। মারা গেল রাজপুত্রেরই ভগিনী। সেও সওদাগর পুত্রের প্রেমে আসক্ত ছিল। এইভাবে একজন প্রেমিকার সংখ্যা হ্রাস পেলে সন্নমালার আর সওদাগর পুত্রকে পতিরূপে লাভ করার কোনো বাধা রইল না। জয় হল তার একনিষ্ঠ প্রেমের। উল্লেখ্য, একচক্ষু কানাইয়ের নির্দেশমত ঠিক বারো বছর পরে সওদাগর পুত্রের সঙ্গে সন্নমালার বিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মানুষ যখন অসহায়ত্ববোধ করে, মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই ধর্মের শরণাপন্ন হয়। আরও সত্য হল অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে মানুষ বিশেষ ধর্মের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শনের পরিবর্তে যে কোনও ধর্মের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। পুত্র সন্তান লাভের কামনায় রাজা দেব দেউল মানত, 'মানে দরগায় পীরের ছিন্নী'।

**সন্নমালা**

পালাটির মুখ্য চরিত্র সন্নমালা। তারই নামে পালাটি নামাঙ্কিত। সে পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। অপরূপ রূপের অধিকারী সে, তাই তার নাম রাখা হয়েছে সন্নমালা, স্বর্ণের বর্ণ তার। কন্যার ভাগ্য গণনার উদ্দেশ্যে রাজা গণকের সহায়তা নিলেন। জানতে পারলেন কন্যার জন্ম হয়েছে অলক্ষ্মীর অংশে। তাই সন্নমালার দ্বাদশ বৎসর বয়স হবার পর রাজার দুর্ভাগ্যের সূচনা হবে, তিনি হবেন লক্ষ্মীছাড়া। তবু অপত্য স্নেহের কারণে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে ত্যাগ করতে পারেন না। সত্য সত্যই সন্নমালার দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হবার পর শুরু হল রাজার ক্ষয়-ক্ষতি। শেষে নিরুপায় হয়ে রাজা কন্যাকে নির্বাসিত করলেন। শুরু হল সন্নমালার অনিশ্চিত জীবন তার দুর্ভাগ্যকে নিয়ে। অবশ্য তাকে বিদায় করার পূর্বেই মাতাপিতার আচার আচরণে সে কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। আর তাই সে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল :

'হিয়ার মাংস কাইট্যা দিলে
মাও গো, যুদি তোমার দুক্কু যায়।
সেই ত মাংস কাইট্যা মাও গো,
আমি দিবাম্ তোমার পায়।।'

দুর্ভাগ্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেবার শক্তি দেখিয়েছে সন্নমালা। রাজকন্যা সে, কত ভোগ-বিলাসে প্রতিপালিত হয়েছে, আর তাকেই কিনা বনবাসে যেতে হবে, এজন্য সে ভেঙ্গে পড়েনি, বরং দুঃখিত মা-বাবাকে বুঝিয়েছে :

জনম দিয়াছ বাপ মাও গো,
আমার কপাল দিবা কি?
তোমার কপালে লেখ্যাছে বিধাতা
দুষ্কিনী বনবাসী ঝি।।

নিজের ওপর তার কতখানি আস্থা। তার অসহায় অবস্থাতেও সে কখনই যে বিপথগামী হবে না, সে ব্যাপারে সে ছিল নিশ্চিত। তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তার পিতাকে সান্ত্বনা দানের বাণীতে :

রাজার কুলে জনম রে আমার
রাজা সে মাও বাপ।।
বনে থাকি আর ছনে থাকিরে
মোরে না ছুইব কোনো পাপ।।

বাস্তবেও দেখা গেছে তার বক্তব্যই যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বনবাস জীবনে সে যেভাবে বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তাতেই প্রমাণিত হয় তার বন্য জীবজন্তুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা। সওদাগরের সঙ্গে আসা মাঝি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে সওদাগরকে জানিয়েছে :

'বনের না বাঘ ভাল্লুক মানুষ ধইরা খায়।
সেই না বাঘ ভাল্লুক কইন্যার সঙ্গেতে বেড়ায়।।'

সওদাগর বাণিজ্য করে ফেরার পথে সঙ্গে নিয়ে এল সন্নমালাকে, তার উদ্দেশ্য পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দান। সওদাগর পুত্রও সন্নমালার প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং তার কাছে পাণিপ্রার্থনা করেছে। কিন্তু সওদাগর পুত্রের কাছে সে তার দুর্ভাগ্যের কথা অকপটে জানিয়েছে, কোনোকিছুই গোপন করেনি :

'যদি যাই রে গাছের তলায় আভাগীর কর্মদোষে।
সেও গাছ জ্বইলা যায় আমার গায়ের বাতাসে।।
জলে গেলে শুকায় জল কেউ না দেয় থান।
সুন্দর পুরীতে না দেও অলক্ষ্মীরে থান।'

*　　*　　*

আমারে করিলে বিয়া পড়িবা বিপাকে
গাইষ্টে বাইন্ধ্যা নিজের মন্দ কুমার, পরে কেবা দেখে।।

শেষপর্যন্ত সওদাগর পুত্রের পীড়াপীড়িতে সে তাকে বিবাহ করতে অঙ্গীকার করেছে। পরবর্তীকালে অপর এক রাজপুত্র তার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হলেও, সন্নমালা

কিন্তু তার কথার খেলাপ করেনি। রাজপুত্র প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত সওদাগর পুত্রকে কৌশলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। রাজকুমারের পরামর্শে সওদাগর পুত্রকে বিষাক্ত সর্পের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সওদাগর পুত্র সর্পাঘাতে মৃত্যু বরণ করলে সন্নমালা তার পুনর্জীবনের জন্য কতই না প্রয়াস করেছে। মৃত স্বামীকে সে একচক্ষু বিশিষ্ট কানাইয়ের সহায়তায় বাঁচিয়ে তুলেছে। কিন্তু কানাইয়ের পরামর্শমত সে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সওদাগর পুত্রকে আব দর্শন করেনি। তার অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমই তাকে এই বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করার শক্তি যুগিয়েছে।

সন্নমালার সংগঠনী শক্তিও প্রশংসার যোগ্য। তারই নির্দেশে এবং তৎপরতায় 'সন্ন গেরাম' স্থাপিত হয়েছে বনমধ্যে। সে শুরু করেছে এখানকার রাজত্ব। সন্নমালার শাসন ব্যবস্থাও ছিল আদর্শ—'রাইজ্যে নজর সেলামী নাই, দশ বচ্ছর খাই খাজনা নাই, বনের কাঠ-বাঁশ-ছনের দাম লাইগ্‌ত না।' সন্নমালার রাজত্বের যে আনন্দময় চিত্র বর্ণিত হয়েছে, তাতেই তার সুশাসনের পরিচয় বিধৃত :

'মাঠে বারোমাসে তের ফসল হয়, পথে বাগ বাগিচায় পোলাপান খেলা করে, সাঁঝ বিয়ানে নগরের বউ-ঝি পিত্‌লা কলসী কাংকে গাঙ্গের ঘাটে নিভ্‌ভয়ে জল আইন্‌তে যায়। লোকে কওয়াকই করে, 'এমুন সুখের রাইজ্য আব দুনিয়ায় নাই।'

মঘুয়া ডাকাতের দল কর্তৃক আক্রান্ত হলে সন্নমালা স্বয়ং রণসাজে সজ্জিত হয়ে ডাকাত দলের মোকাবিলা করতে উপস্থিত হয়ে একই সঙ্গে তার সাহসিকতা ও বীর্যবত্তার পরিচয় রেখেছে। সন্নমালার প্রেম জয়ী হয়েছে, সে তার দয়িতকে পতিরূপে লাভ করতে চলেছে এই ইঙ্গিত দিয়ে পালা শেষ হয়েছে। সন্নমালা জানত তার সখী রাজকন্যাও সওদাগর পুত্রের প্রেমে আসক্ত। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সে সখীকে হিংসা করেনি, উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে সখীকে গ্রহণ করেছে। সন্নমালা এইভাবে তার ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছে।

## কুমার বীরনারায়ণের পালা

অজ্ঞাত পরিচয় কবির রচিত 'কুমার বীরনারায়ণেব পালা'টি একটি অনবদ্য গীতিকা। নানা বিরল বৈশিষ্ট্যেই গীতিকাটি সমুজ্জ্বল।

গীতিকা মূলত: প্রেমকাহিনীকে উপজীব্য করে যেমন রচিত হয়, তেমনি অধিকাংশ গীতিকাই বিয়োগান্ত, করুণরসাত্মক। কিন্তু গীতিকার সূচনাতে অধিকাংশ গীতিকার ক্ষেত্রে আমরা তার পরিণতির আভাস লাভ করি না। মহামতি শেক্ষপীয়রেব নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যকে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ রূপে আমরা লাভ করি। তা পরিণতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী। তাই তাকে keynote বলা হয়েছে সমগ্র নাটকেব। আমাদের আলোচ্য গীতিকাটিব প্রথম পরিচ্ছেদটিকে তেমনি সমগ্র পালার পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদানকারী রূপে লক্ষ্য করি। আলোচ্য পালাটির পরিণতি যে করুণ রসাত্মক হবে এবং কুমার বীরনারায়ণের ট্র্যাজেডিই যে পালার মুখ্য প্রতিপাদ্য, তার ইঙ্গিত পালার একেবারে প্রথমেই প্রদত্ত হয়েছে। নিদ্রাবসানে কুমার বীরনারায়ণকে একের

পর এক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে দেখা গেছে। টিকটিকির ডাক শোনা গেছে, হাঁচি পড়েছে, এমনকি টাল খেয়ে বীরনারায়ণ ভূমিতে পতিত হয়েছে। আখ্যানাংশেও শেষপর্যন্ত বীরনারায়ণের চরম দুঃখদায়ক পরিণতি লক্ষিত হয়েছে। সূচনাতেই লোককবি আখ্যানটির পরিণতি সম্পর্কে পাঠককে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

মনস্তত্ত্বিক দ্বন্দ্ব রূপায়ণেও আলোচ্য পালার রচয়িতা বিশেষ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। নিদ্রাবসানে কুমার বীরনারায়ণ একের পর এক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে প্রচলিত সংস্কারের প্রতি দুর্বলতা, অপরদিকে যৌবনাবেগের কারণে সেই সংস্কারকে অগ্রাহ্য করার মানসিকতা—এই দুইয়ের টানাপোড়েনের দ্বন্দ্বটি বড় চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে বীরনারায়ণের আচরণে :

উসারা থিক্যা লাইম্যা কুমার রে
আরে কুমার গইণ্যা ফালায় পাও।
আবার ফিইর‍্যা যায় রে কুমার
আরে ভালা, মুখে না করে রাও।।

পালার নায়িকা সোনা গাঙ্গের ঘাটে জল সংগ্রহ করতে গিয়ে বৃক্ষতলে নিদ্রিত কুমার বীরনারায়ণকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কুমারের প্রতি সোনার দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছেন কবি এই বলে :

মনেতে গুনজিয়া মন গো
কইন্যা আড় নয়ানে চায়।
কি জানি কি ভাইব্যা আস্থি
কইন্যার জলে ভাইস্যা যায়।।

সাধারণ স্বর্ণকার দুহিতা সোনা যে জমিদার পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং সেই আসক্ত হওয়া যে তার পক্ষে কতখানি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়েছে, সেই সম্পর্কেও কবি তাঁর সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন. সোনা নিজেই আত্মসমালোচনায় ব্রতী হয়েছে :

বামুন হয়্যা চাইছি রে আমি
ঐ না আশমান ছুইতে।

কিন্তু যত অসম্ভবই হোক, তবু সে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি :

মন রে বুঝাইলে মন আইজ
হায় রে, ধৈরজ ত না মানে।।

কবি নিদ্রামগ্ন কুমারের প্রতি ষোড়শী যুবতী উদ্ভিন্ন যৌবনা সোনাকে আকৃষ্ট করার জন্য যে রোমান্টিক পরিবেশ রচনা করেছেন, তা যেন পার্বতীর প্রতি শিবকে আকৃষ্ট করতে কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' যে পরিবেশ রচনা করেছিলেন, তার কথা মনে করিয়ে দেয়। সোনা গেছে গাঙ্গের ঘাটে, সব গীতিকাতেই নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনক্ষেত্র অথবা পরিচয়ের ক্ষেত্ররূপে যা গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সোনা উপস্থিত হয়েছে সন্ধ্যাকালে। লোককবি এরপর বর্ণনা করেছেন :

পাটের সুরুজ সোনা ঢালে গো
আরে ভালা, দহিণালী বায়।
বিরিক্ষের ডালে কোহিলা কুয়ে গো
আরে ভালা, কইন্যা এক দিষ্টে চায়।।

এ হেন অনুকূল পরিবেশে কুমারের প্রতি মন সমর্পণ না করে বেচারী ষোড়শীর অন্য কোনও উপায় ছিল কি?

কাব্যিক প্রকাশেও আলোচ্য পালাটির অংশ বিশেষ অতীব উপাদেয় ও আস্বাদযোগ্য হয়ে উঠেছে। নায়িকা সোনার রূপৈশ্বর্য বর্ণনাতেই এই কাব্যিক প্রকাশ বিশেষভাবে ঘটেছে :

পরভাত বেইলের সোনা সূরজ্ তেজ
কইন্যার ঢাইল্যা দিছে মুখে।
সোনার অঙ্গে সোনার ঢেউ গো
আরে ভালা, খেলায় ঝলকে ঝলকে।।

অর্থাৎ শুধু নামেই সোনা নয়, অফুরন্ত সৌন্দর্যের আধার নায়িকা যেমন স্বর্ণবর্ণা, তেমনিই 'ঢল ঢল তার অঙ্গের লাবণি'।

কুমার বীরনারায়ণের মুগ্ধ দৃষ্টিতে ষোড়শী কন্যা সোনার রূপৈশ্বর্য কেমনভাবে ধরা পড়েছিল কবি তার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বর্ণনা দিলেও বর্ণনার গুণে তা উদ্ধারযোগ্য হয়ে উঠেছে :

তোমার না চান্দমুখ লো কইন্যা,
যেমুন পরভাতে পউদ্দ ফুল।
আশমানের কালা মেঘ লো কইন্যা,
দেখি তোমার মাথার চুল।।
কাউয়া কালা কোইলা কালা
চৌখের কাজল কালা বেশ।
তারথিক্যা অধিক কালা
কইন্যা, তোমার চাঁচর কেশ।।
কুইজ্ রাঙা সিন্দুর লো রাঙা
রাঙা তেলাকুচ্যার ফল।
তারথিক্যা অধিক রাঙা
কইন্যা, তোমার ঠোঁট যোগল।
পরভাইত্যা আশমানের তারা
কইন্যা, তোমার দুইডা আঁখি।
আষাঢ় মাইস্যা পউদ্মের নাল
কইন্যা, তোমার হস্ত দেখি।।

মাঘ মাইস্যা শোনের ফুল লো
সোনার বরণ চুরি করে।
তোমার অঙ্গে কাঞ্চা সোনা
কইন্যা, লুকায় চোরের ডরে।।

পালাটিতে আমরা যে শালীনতা তথা সংযম গুণের পরিচয় পেয়েছি, তাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেখানে কবি মিলন দৃশ্যের বিস্তারিত ও স্থূল বর্ণনায় এক শ্রেণীর পাঠককে সহজেই তুষ্ট করতে পারতেন, সেখানে মাত্র চারটি পংক্তিতে কবি তাঁর কর্তব্য সমাধা করেছেন। সচেতন পাঠকের কাছে এর অতিরিক্ত বিবরণ দান অপ্রাসঙ্গিক ও আতিশয্য দোষে দুষ্ট বলেই প্রতিভাত হত। কবি নায়ক-নায়িকার বিবাহের পর প্রথম মিলনের বর্ণনায় বলেছেন :

ভাবনা চিন্তা তখন নাই তারার মনে।
দোহে দোহা এক কায়া হইল মিলনে।।
বর্মাগুের কথা তারা পাশরিয়া গেল।
হাউস মিটায়্যা তারা দোহে দোহারে পাইল।।

অলংকার প্রয়োগে কবি অভিনবত্বের স্বাক্ষর না রাখলেও, প্রযুক্ত অলংকারগুলি সার্থক ও উপভোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই। প্রযুক্ত কয়েকটি অলংকার :

(ক) সমুদ্দুরের মধ্যে রে কইন্যা
মন-মাণিক ডুবাইল। (রূপক)

(খ) শাউন মাইস্যা ধারা যেমন চৌক্ষে অবিরত। (বাচ্যোৎপ্রেক্ষা)

(গ) আন্ধাইর ঘরের মানিক কইন্যারে চোরে লয়্যা গেছে। (প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)

(ঘ) কুইজ রাঙা সিন্দুর লো রাঙা
রাঙা তেলাকুচ্যার ফল।
তার থিক্যা অধিক রাঙা
কইন্যা, তোমার ঠোট যোগল৷ (ব্যতিরেক)

(ঙ) কাউয়া কালা কোইলা কালা
চৌখের কাজল কালা বেশ।
তারথিক্যা অধিক কালা
কইন্যা তোমার চাঁচর কেশ।। (ব্যতিরেক)

(চ) হস্তের আঙ্গুলি লো তোমার
যেমুন আশ্বিন্যা চম্পার কলি। (বাচ্যোৎপ্রেক্ষা)

(ছ) মোর লগে আপনের পিরীত পউদ্মের পাতায় পানি। (প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা)

পালাটিতে বেশ কয়েকটি প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বক্তব্যকে শাণিত করেছে ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রয়োগ :

(ক) বামুন হয়্যা চাইছি রে আমি

ঐ না আশ্‌মান ছুইতে।

(খ) মাচ্ছি হয়্যা চাইলাম রে আমি

ঐ না উড়িতে আশ্‌মানে।

উদ্ধৃত দুটি প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে নায়িকার দ্বারা, জমিদার-তনয়ের প্রেমে পড়েছে সে, সামান্য এক স্বর্ণকার দুহিতা। তাই তার আশা যে কোনদিনও চরিতার্থ হবে না সে তা জানে। তথাপি প্রেমের এমনি বিচিত্র গতি যে ষোড়শী কন্যা সোনা তথাপি কুমার বীরনারায়ণের প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছে। নায়কের তুলনায় নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান করে নায়িকা প্রকারান্তরে তার অকৃত্রিম প্রেমেরই পরিচয় দিয়েছে সর্বোপরি।

(গ) পুরুষের কলঙ্ক যেমুন চৈত্তরের মেঘলা রাতি।

নারীর কলঙ্ক কুমার, হয় জীবনের সাথী।।

(ঘ) রাজার দোষে রাইজ্য নষ্ট নারীর দোষে ঘর।

বিচার দোষে পরজা নষ্ট বিচারে কইবলে আপন পর।।

সবশেষে আমরা চরিত্র চিত্রণে কবির দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

**সোনামণি**

আলোচ্য গীতিকাটির নায়িকা সোনামণি। রাধারমণ নামক এক স্বর্ণকারের দুহিতা সে। ষোড়শী ও রূপবতী সে। ঘর-গৃহস্থালির কাজে সে তার মাকে সাহায্য করে। কাজের অঙ্গ স্বরূপই তাকে আমরা জলের ঘাট থেকে জল সংগ্রহ করতে যেতে দেখেছি। নিদ্রিত জমিদার-তনয় কুমার বীরনারায়ণকে দেখে তার প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়েছে। সে জানে যে কুল-মর্যাদা ও অন্যান্য ব্যাপারে সে মোটেই জমিদার তনয়ের উপযুক্ত নয়। তথাপি সোনা তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও সে তার মন প্রাণ সবই জমিদার-তনয়কে সমর্পণ করে বসেছে।

সোনার প্রেমের পরীক্ষা শুরু হয়েছে সাধু কর্তৃক অপহৃতা হবার পর। অসহায় অবস্থায় সাধু তাকে অপহরণ করেছে এবং নানা প্রলোভনে তাকে প্রলুব্ধ করেছে :

হীরা-মোতিত্ জড়ায়্যা দিবাম্ শরীলের গয়না।

সোনার পালংকে দিবাম্ তোমার বিছান্।

মাটিতে না পইড়ব রাঙা চরণ দুইখান।।

হুকুম তামিল হইব সগলের আগে।

দেবতা এন তোমারে আমি রাখবাম্ কইরা মাথে।।

কিন্তু সাধুর প্রস্তাবে সম্মত হওয়া দূরে থাক সে তার দিকে ফিরেও তাকায়নি, মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। কুমারীত্বকে সহজলভ্য পণ্যে রূপান্তরিত করেনি। প্রতিকূল অবস্থা থেকে বীরনারায়ণের প্রত্যক্ষ সহায়তায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে প্রতিবেশীরা সোনাকে গৃহে স্থান গ্রহণ করতে দেয়নি। অগত্যা তাকে বীর-নারায়ণের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

সোনা কইন্যা কাইন্দ্যা পড়ে বীরনারায়ণের পায়।

বীরনারায়ণ উপলব্ধি করেছে যে সোনা অন্যায়ভাবে পরিত্যক্তা হয়েছে, তাই তার পিতার কাছে সুবিচারের জন্য তারা উপস্থিত হবে। কিন্তু বীরনারায়ণের তুলনায় সোনার বাস্তব বুদ্ধি ছিল অধিকতর। তাই সে কুমারের প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেনি। বলেছে :

রাজার দরবারে যাইয়া কোনো ইত্ নাই।।
গেরামের লোক পাড়াপশ্যি বৈরী হইল।
আমার পক্ষ লয়্যা কেবান্ সাক্ষি দিব বল।।
ইতে বিপরীত হইব রাজসভায় যাইয়া।

সোনা ষোড়শী, কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা অতিশয় প্রখর। সে জানে এই সমাজে পুরুষ শত অপরাধ করলেও, সহজেই রেহাই পেয়ে যায়, কিন্তু নারীর যদি একবার কলঙ্ক রটে, তবে সারাজীবন সেই কলঙ্ক তাকে বহন করতে হয়। সম্পূর্ণ অকারণে বীরনারায়ণকে নিয়ে তার চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপিত হয়েছে, তা তার মৃত্যু ব্যতীত যাবে না। তাই সে আত্মঘাতিনী হবার সংকল্প করেছে। তার সংকল্পে বাধা দিয়েছে বীরনারায়ণ। সে জানিয়েছে শুধুমাত্র সোনাকে সে জীবন বিপন্ন করে উদ্ধারই করেনি, তার প্রতি আসক্তির কথাও অকপটে জানিয়েছে। কিন্তু সোনা সহজ পাত্রী নয়, সে জানে 'বড়োর পিরীতি বালির বাঁধ', তাই সহজে বীরনারায়ণের প্রস্তাবে সম্মতি দেয় নি, বলেছে :

আপনে হইছুইন জমিদার, মুই গিরস্থের নারী।
মোর লগে আপনের পিরীত পউদ্মের পাতায় পানি।।
আপনে করিবেন জমিদারী রাজপাটে বইয়া।
মুই সোনা কলংকিনী কইন্যারে না চাইবাইন ফিরিয়া।।

উত্তরে বীরনারায়ণ যখন জানিয়েছে সোনাকে না পেলে সে চিরকুমার থেকে যাবে, গ্রহণ করবে সন্ন্যাস, তখন সোনা তাকে সাবধান করে দিয়েছে তাদের প্রণয়ের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে :

আমার সঙ্গে তোমার পিরীত
বাপ মায়ে না মানিব।
অপযশ দিয়া তোমারে সগলে খেদাইব।।

স্বার্থপরের মত কুমারের প্রস্তাবে যে সোনা সম্মত হয়নি তার কারণ সে চায়নি, তার জন্য তার ভালবাসার মানুষটির কোনো ক্ষতি হয়। সে নিজের শত দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু তার জন্য তার মনের মানুষের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সহ্য করতে সে অক্ষম :

আমার লাইগ্যা তোমার যুদি হয় কোনো ক্ষেতি।
আমার চৌখের আলো নিইভ্যা যাইব
দিনে আইব রাতি।।

সোনা জানিয়েছে তার জীবন সার্থক, কেননা সে তার মনের মানুষের ভালবাসার স্বীকৃতি পেয়েছে। মনের মানুষকে না পাক এতেই সে তৃপ্ত :

তুমি ভালবাইসাছ মোরে
এই না আমার সুখ।
এই না সুখ বইক্ষে লইলাম
আমার নাই আর কোনো দুখ।।

সোনার লোভ ছিল শুধু বীরনারায়ণের ভালবাসার প্রতি, তার বিষয় সম্পত্তিতে নয়। সে তার স্বাভাবিক বুদ্ধির বশেই জানত, তার সঙ্গে বিবাহ হলে, কখনই জমিদার তা মেনে নেবেন না। কুমার যখন জানিয়েছে সোনাকে লাভ করতে পারলে সে রাজ্যও চায় না, অনায়াসে বনবাসী হতে প্রস্তুত, তখনই সোনা বীরনারায়ণের কাছে ধরা দিয়েছে, চন্দ্র, তারকা, বৃক্ষাদিকে সাক্ষী করে সে কুমারকে পতিত্বে বরণ করেছে। দুজনে বহুদূরে চলে গেল, তবু দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করা সম্ভব হল না। জমিদারের লোকজন বন্দী করে নিয়ে এল কুমারকে। বিচারে তার দুটি চক্ষু উৎপাটিত করে অন্ধ করে দেওয়া হল। বেচারী সোনামণি এসবের কিছুই জানল না। কুমারের বিচ্ছেদ বেদনায় তাকে কাতর দেখা গেছে, কিন্তু বারেকের তরেও সে তার অসহায়ত্বের জন্য বীরনারায়ণকে দোষী করে নি। বরং সে শুভকামনা জানিয়ে বলেছে :

যেইখানে গেলারে বন্ধু, সুখে থাইক্য তুমি।
তোমার দুঙ্কের কথা যেন কানে নাই সে শুনি।।

কিছুতেই সোনা বিস্মৃত হতে পারেনি তার জন্য বীরনারায়ণের চরম কৃচ্ছ্রসাধনের কথা। সে বলেছে :

বাপ ছাইড়লা মাও ছাইড়লা
বন্ধু, তুমি আমার লাগিযা।
শুধু তাই নয়, আমার লাইগ্যা রাজার কুমার
কইরাছে বন-গফরে বাসা।
এই অভাগীর লাইগ্যা হায় রে
ছাইড়্যাছে রাজ রাজত্বির আশা।।

কুমারের শোকে হতভাগিনী শেষপর্যন্ত উন্মাদিনী হয়েছে। তবু তারই মধ্যে বীরনারায়ণের বাঁশীর সুর দীর্ঘকাল পরে শুনেও সে ঠিক ধরতে পেরেছে যে এ তার বহুল পরিচিত সুর। এ সুরের স্রষ্টা আর কেউ নয়, বীরনারায়ণ। উন্মত্তের মত দয়িতের উদ্দেশে রওনা হয়ে ভরা গাঙ্গের মধ্যে পড়ে তার অকালে সলিল সমাধি ঘটেছে।

**কুমার বীরনারায়ণ**

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মশাই বীরনারায়ণের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 'অধিকাংশ গাথার নায়ক অপেক্ষা নায়িকা চরিত্র নানাদিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একনিষ্ঠ প্রেম সমুজ্জ্বল।

সে তুলনায় এই একটিমাত্র গাথার নায়ক বীরনারায়ণের চরিত্র নানাদিক হইতে বিচারে অনবদ্য বলা যাইতে পারে।'[৩৫] আমরা মৌলিক মশাইয়ের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বীর-নারায়ণ চরিত্রটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

জমিদার-তনয় বীরনারায়ণের শিক্ষা দীক্ষার কোনো পরিচয় প্রদত্ত হয়নি, তবে এটুকু বোঝা যায় যে সে কিছুটা সংস্কারাচ্ছন্ন। নিদ্রাবসানে টিকটিকির ডাক, ঘর থেকে বের হবার সময় হাঁচির শব্দ, কিংবা তার টাল খেয়ে পড়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তার প্রমাণ মেলে :

আরে কুমার ঘরে থাইক্যা উঠ্-বইস করে রে
আর না যায় ঘর ছাইড়ে।
বাধা লয়্যা উইঠ্যাছে কুমার রে
আইজ পইড়বান্ কোন ফেবে।।

বীরনারায়ণ বাঁশী বাজানোয় দড় ছিল। বনমধ্যে সোনাকে নিয়ে অতিবাহিত করার সময়ে তাকে বাঁশী বাজাতে দেখা গেছে। অন্ধ হয়ে সে বাঁশীর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে :

বাঁশি বাজায়্যা বিচ্‌ড়াইবাম
আমি রে অন্ধ জনা।।
পুনরায়— দূর বনে বাইজত্যাছে বাঁশি
হায় রে কইন্যারে ডাকিয়া।

বীরনারায়ণ ছিল কর্তব্যপরায়ণ, কর্তব্য সম্পাদনে তাকে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে দেখা গেছে। সন্ধ্যাকালে সোনাকে বিদেশী সাধু বলপূর্বক অপহরণ করলে কন্যার আর্তস্বরে তার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

সেদাবতি কইরা সাধু রে
আরে সাধু কইন্যারে যায় লইযা।
বিরথা আমরার জমিন্দারী রে
আরে কি কাম জমিদার হইয়া।।

অর্থাৎ অন্যায় প্রতিরোধে দুর্বলকে রক্ষা করতেই যদি ব্যর্থ হয় তবে জমিদার হয়ে লাভ কি—এই বক্তব্য ছিল বীরনারায়ণের। তাই আর কাউকে না পেলেও এবং সাধু ও তার সঙ্গের লোকজন অনেক হলেও বীরনারায়ণ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেনি, সে বিপন্ন ষোড়শীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেছে। বিস্মৃত হলে চলবে না, তখনও কিন্তু সোনার সঙ্গে তাব প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অতএব প্রেমিকাকে রক্ষা করার টানেই বীরনারায়ণ অগ্রসর হয়েছিল, একথা বলা চলবে না। তাতে তার বৃহত্তর কর্তব্যবোধকেই অস্বীকার করা হবে।

বীরনারায়ণের উপস্থিত বুদ্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে, শত্রুর মোকাবিলাতে :

চুপচাপ্ যায়্যা না কুমার হাইত্যারপাতি যত।
একে একে ফালাইল গাঙ্গের মধ্যত।।
বাইছ্যা গুইছ্যা রাইখল কুমার ভাল রাম-দাও খানি।
চোরের মতন আইল কুমার ডিঙ্গার পিছনি।।
পিছনে আইয়া রে কুমার কাটে কাড়ালীরে।
কাড়ালী সাইজা রে কুমার ডিঙ্গার কাড়াল ধরে।।
কাড়াল ধইরা ভাইট্যাল ডিঙ্গা তুইলা দিল চরে।
আচম্বিতে কি হইল ডিঙ্গা না-লড়ে না-চড়ে।।

এরপর বীরনারায়ণ সোনাকে ডোংনাও খুলে তাতে উঠিয়ে নিয়েছে এবং যাত্রা করেছে। ক্ষিপ্তপ্রায় সাধু ও তার লোকজন সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, তারা বীরনারায়ণের পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে অগ্রসব হয়েছে। কিন্তু বীরনারায়ণ একে একে তাদের সকলকেই সংহার করেছে, ভয়ে সাধু আর অগ্রসর হয়নি :

এক এক কইবা কুমার করিল সংহার।
এরে দেইখ্যা সাধু আব না হইল আগুসার।।

শারীরিক শক্তিতেও বীরনারায়ণ যে অদ্বিতীয় ছিল, এতগুলি মানুষের সংহারে সেই সত্য প্রমাণিত। সোনার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে তাকে উপযুক্ত শাস্তিদানে তার গ্রামের লোকজন অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেও বীরনারায়ণ তাদের প্রতিহত করেছে, রক্ষা করেছে সোনাকে জনতার রোষের হাত থেকে।

বীরনারায়ণ ছিল অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ। সে নিজে ছিল যেহেতু ন্যায় পথের পথিক, তাই কোনো প্রকার অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার করা তার ধাতে ছিল না। সোনার প্রতিবেশীরা অন্যায়ভাবে সোনাকে 'অসতী' আখ্যা দিয়ে তাকে শাস্তি দিতে প্রয়াস করলে সে এব বিরুদ্ধে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য পিতা জমিদারের সভায় উপস্থিত হতে চেয়েছিল :

আমাব বাপের সভায় চল বিচারের লাগিয়া।।
পিতা আমার সভায় বইসা উচিত বিচার করে।
সগল কথা কইবাম গিয়া তানার গোচরে।।

প্রতিবেশীরা সকলে যেখানে শত্রু, যেখানে সোনাদের পক্ষে সাক্ষ্য দানের কেউ নেই, সেখানে সোনা কিংবা বীরনারায়ণের বক্তব্য যে জমিদার কর্তৃক গ্রাহ্য হবে না, এই বাস্তববোধ বীরনারায়ণের ছিল না। পববর্তীকালে সোনাব এই অনুমানই সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

সোনা বীরনাবায়ণকে জানিয়েছে সে আত্মঘাতিনী হবে। কোনমতেই সে কুমারকে তার জন্য কলংকিত হতে দেবেনা। কিন্তু বীরনারায়ণ সোনাকে আত্মঘাতিনী হতে দেয়নি, সোনার জীবনই সে শুধু রক্ষা করেনি, তাকে নিরাপত্তা, স্বীকৃতি ও সামাজিক মর্যাদা দিতে এগিয়ে এসেছে, চরম ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে। বাস্তবিক প্রেমিকের জন্য

তার মত কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগ স্বীকার সচরাচর দেখা যায় না। সে জানিয়েছে :

তোমারে ছাইড়্যা কইন্যা, আমি না যাইব।
তুমি যদি মর কইন্যা, আমিও মরিব।।
তোমারে পাইলে আমি রাইজ্য নাই সে চাই।
গেরাম সোমাজ ছাইড়্যা চল গহন বনে যাই।।
তোমারে লইয়া আমার বনে রাজভোগ।
তোমারে ছাইড়্যা হইব আমার সগ্‌গে নরক ভোগ।।

শুধু মুখেই নয়, বাস্তবেও সে তার এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। পিরীতের দায়ে সে কাঙ্গাল হয়েছে। বীরনারায়ণ কর্তৃক সোনার দীর্ঘ রূপ বর্ণনায় তার কবিত্ব শক্তির প্রকাশ মেলে।

প্রেমের কারণে বেচারী বীরনারায়ণকে যে চরম শাস্তি পেতে হয়েছে, বোধকরি তা তুলনা রহিত। তার পিতা বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে অন্ধ করে দেবার ফরমান জারি করেছেন। সত্যই বীরনারায়ণের দুটি চক্ষুই উৎপাটিত হয়েছে, চির অন্ধত্বের শিকার হয়েছে সে। এরপরেও হতভাগ্য তার প্রেমিকা বধূর সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়নি, কেননা নদীর জলে তার সলিল সমাধি ঘটে গেছিল, তারই বাঁশির শব্দ শুনে উতলা সোনা তার সঙ্গে যখন মিলিত হতে চলেছিল তখন। তুলনামূলকভাবে সোনার তুলনায় বীরনারায়ণের ট্রাজেডিই অধিকতর। কেননা সোনার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার বঞ্চিত জীবনের অবসান ঘটেছিল, অপরপক্ষে বীরনারায়ণ বিনা দোষে, বিনাপরাধে অন্ধ হয়ে, প্রেমিকা বধূকে চিরতরে হারিয়ে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করতে জীবিত রইল।

## জমিদার চরিত্র

সবশেষে আমরা জমিদারের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে পারি। প্রজারা তাঁর কাছে এসে বীরনারায়ণের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে, বীরনারায়ণের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ এক ষোড়শী কন্যা সোনাকে নষ্ট করার। প্রজারা বলেছে :

বিচার কর দেশের জমিদার গো,
আরে তুমি বিচারের মালিক।
আপন পুত্রু জাইন্যা নাই সে করবাইন বিপরীত।।

জমিদার সঙ্গে সঙ্গে কোটালকে নির্দেশ দিয়েছেন বীরনারায়ণকে ধরে আনার জন্য। অঙ্গীকার করেছেন :

হাচা যদি হয় কথা উচিত দণ্ড দিবাম্।
পুত্র বইলা নাই সে ঘুইরা ঘাইট্যা লইবাম্।।
কুপুত্র থাকনের থিক্যা না থাকন ভালা।
এমুন পুত্রু কেবল হয় রে কুলের সে কালা।।

জমিদার তাঁর কর্তব্যবোধ ও কুলমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। তিনি জানেন পুত্র যদি

মন্দ হয় তবে এমন পুত্র জীবিত থাকাকালীন সম্মান রক্ষিত হবে না। তাছাড়া পুত্রের কারণে তাঁর পক্ষে সমাজে মুখ দেখানোও ভার হয়ে উঠবে। সর্বোপরি মন্দ পুত্রের হাতে জমিদারীর ভার ন্যস্ত হলে তা রসাতলে যাবে। অতএব তাঁর অঙ্গীকার ধ্বনিত হয়েছে :

ধইরা আইনা বলি দিলে শীতল হইব প্রাণ।
পরজা গণের সামনে তবে রইব আমার মান।।

বিচারসভায় সোনার পিতা প্রকারান্তরে দায়ী করেছে বীরনাবায়ণকে তার কন্যাকে অপহরণের ব্যাপারে, স্মরণ করিয়ে দিয়েছে :

বিচার দোষে পরজা নষ্ট বিচারে কইরলে আপন পর।।

জমিদার বীরনারায়ণের বক্তব্য কি জানতে চেয়েছেন, বীরনারায়ণ আনুপূর্বিক সব বলেছে, কিন্তু সাক্ষী সাবুদের অভাবে তার বক্তব্য গ্রাহ্য হয়নি। বিশেষত গ্রামের লোকজন সকলেই তার উপর ছিল ক্ষুব্ধ, তাই তাদের চাপে জমিদার প্রজাদের অনুকূলেই রায় দিয়েছেন, দোষী সাব্যস্ত করেছেন বীরনারায়ণকে এবং তার দুটি চক্ষু উৎপাটিত করে তাকে দেশ থেকে বিতাড়নের নির্দেশ জারি করেছেন :

কুমারের দুই চৌখ্ ফালাও উপড়াইয়া।।
দেশের তনে দূর কইর‍্যা খেদাইয়া দেও।
এমুন কুপুত্রার মুখ আর দেখাইতে না চাও।।

অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য নির্দোষ সীতাকে ত্যাগ করে বনবাসে নির্বাসিতা করেছিলেন। এখানেও জমিদার প্রজাদের মন রাখতে নিজ পুত্রকে অন্ধ করে রাজ্য থেকে চিরতরে বিতাড়িত করেছেন। বিচারে নিরপেক্ষতা ধর্ম রক্ষা অপেক্ষা প্রজাদের মন রক্ষার দিকেই তাঁর অধিকতর দৃষ্টি ছিল :

বিচার করলাইন জমিদার পরজার মন চাইয়া।

সমষ্টির দাবী গণতন্ত্রে স্বীকৃত হলেও সমষ্টির বিশ্বাস যে সব সময় স্বীকৃত হতে পারে না তার প্রমাণ গ্যালিলিও, তারই প্রমাণ বীরনারায়ণ। সমষ্টির দাবী মেটাতে গিয়ে নিরপরাধ হয়েও চরম দণ্ডলাভ করতে হয়েছে তাকে। এক্ষেত্রে জমিদার যত বেশি প্রজাদের মন রক্ষার জন্য আগ্রহী, তত আগ্রহী প্রকৃত সত্য উদঘাটনে ছিলেন না স্বীকার করতে হয়।

## ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডে এবং ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৩য় খণ্ডে 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' পালাটি সংকলিত হয়েছে। কবির পরিচয় অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। দীনেশচন্দ্রের অনুমান, 'পালাটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দশ শতাব্দীর আদি ভাগে রচিত হইয়া থাকিবে।' কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্রের মতে, 'মনে হয় ঘটনাটি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘটিয়াছিল।' তবে সেই সঙ্গে মৌলিক মহাশয় যে মন্তব্যটি করেছেন তা শুধু আলোচ্য

পালাটির ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য তা নয়, মন্তব্যটি সাধারণভাবে অন্যান্য গীতিকাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—'পালার রচনাশৈলী দৃষ্টে ঘটনা ও পালা রচনার কাল নির্ণয় করার প্রয়াস বোধহয় সঙ্গত হইবে না।'

পালাটিতে বর্ণিত হয়েছে আসগোসাইলার কোচ রাজা ভারইয়ার সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহের বিরোধ, যার পরিণামে ভারইয়া রাজার পরিবারটি ধ্বংস প্রাপ্ত হল। ভারইয়া রাজার একমাত্র কন্যা চম্পাবতী উন্মাদিনী হয়েছে।

ভারইয়া তার বনজঙ্গলে ভরা রাজ্যকে পরিষ্কার করে কৃষির উপযোগী করে তুললে বীরসিংহ ভারইয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে এই অভিযোগে যে তার রাজ্য অধিকৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে ভারইয়ার দ্বারা। ভারইয়ার রাজা মন্ত্রতন্ত্র জানত। অতএব বীরসিংহ যুদ্ধে সুবিধা করতে পারল না। সে ভারইয়ার হাতে বন্দী হল। পিতার বন্দী হবার সংবাদে রাজপুত্র দুধরাজ প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রসর হল, কিন্তু ভারইয়ার মন্ত্রতন্ত্রের ক্ষমতার কাছে সেও পর্যুদস্ত হল। বন্দী হল দুধরাজ। এরপর ভারইয়া পরামর্শ করে স্থির করল তার কন্যার সঙ্গে দুধরাজের বিবাহ দেবে। তার প্রস্তাবে বীরসিংহ সম্মত হল। পিতা পুত্রের বন্দী দশা ঘুচল—উভয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। কিন্তু ভারইয়া কৃত অপমান বীরসিংহ বিস্মৃত হতে পারল না। পুনরায় ভারইয়ার রাজ্য আক্রমণ করবে বলে মনস্থ করল। দুধরাজ পিতার কাছে অনুমতি নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করল। সে যুদ্ধে বন্দী হল। কিন্তু চম্পাবতী, ভারইয়ার রাজকন্যা মনে মনে যেহেতু দুধরাজকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছিল, তাই সে তার যথাসর্বস্ব দিয়ে কারাগার থেকে দুধরাজকে মুক্ত করলে প্রহরীদের হাত করে। দুধরাজ এই প্রথম চাক্ষুষ করলে চম্পাবতীকে। সে চম্পাবতীকে বিবাহ করবে বলে কথা দিয়ে গেল। বীরসিংহ যখন বুঝতে পারলে যে স্বাভাবিক রণনৈপুণ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মোকাবিলা করা অসম্ভব তখন সেও কামরূপে গিয়ে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার গোপন রহস্য হস্তগত করে এল। এরপর সে ভারইয়াকে আক্রমণ করে ভারইয়াকে পাষাণে রূপান্তরিত করল। তার রাজ্য হস্তগত করে নিল। রাজরাণী ও রাজকন্যাকে বিতাড়িত করল। রাজরাণী আত্মঘাতিনী হল আর রাজকন্যা চম্পাবতী উন্মাদিনী হয়ে গেল।

পালাটিতে কবিকল্পনার স্বাক্ষর লভ্য একমাত্র নায়িকা চম্পাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনায়, তাছাড়া চরিত্র হিসাবেও একমাত্র চম্পাবতীই আমাদের নজর কাড়ে।[৩৩] সংস্কার মানুষের মনে কি বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় এবং তার পরিণতি কি সুদূরপ্রসারী হতে পারে চম্পাবতীর চরিত্র তারই প্রমাণ। দুধরাজের সঙ্গে তার বিবাহ হয়নি, কেবলমাত্র বিবাহের কথা হয়েছিল, তাতেই চম্পাবতী দুধরাজকে মনে মনে স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছিল। বন্দী রাজকুমারকে নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে মুক্ত করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুধরাজ তার কথা রাখেনি। পরাজিত রাজার কন্যা চম্পাবতীকে আর বিবাহ করেনি। উন্মাদিনী হয়ে চম্পাবতী পথে বের হয়েছে। তার করুণ পরিণতি পাঠক মনকে কিঞ্চিৎ আর্দ্র করে তোলে।

চম্পাবতীর জননী নানাভাবে অপমানিত হয়েও কন্যাব স্বার্থে যেভাবে বীরসিংহের কাছে কন্যার বিবাহের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তাতে শাশ্বত জননী স্নেহের মূর্ত প্রতীকে সে রূপান্তবিত হয়েছে। তাব আবেদন নাকচ হওয়ার মনোদুঃখে সে আত্মঘাতিনী হয়েছে।

সর্বাপেক্ষা দোষীরূপে বিবেচিত হয় দুধরাজ। যে রাজকন্যার সহৃদয়তায় সে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলে, যাকে সে বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছিল, শেষপর্যন্ত কিন্তু সে তার কথা রাখেনি। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এমনকি, প্রয়োজনে সে পিতার বিরোধিতা করেও নিষ্পাপ কোমলহৃদয়া চম্পাবতীর জীবনকে ব্যর্থ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারত। 'ধোপার পাটে'র কাঞ্চনমালার প্রণয়ী রাজপুত্রের মতই তাহার চরিত্র।'[৩৪]

পালাটিতে অলৌকিকতার প্রাচুর্য। আর এতেই পালাটির স্বাভাবিক মানবিক আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ভাবইয়া যেমন অলৌকিকত্বের আশ্রয় নিয়েছে, তেমনি বীরসিংহও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি, সেও অলৌকিকত্বের সাহায্যেই প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করেছে। দ্বাদশ পবিচ্ছেদে কামরূপে মাইয়ানা বুড়ী কর্তৃক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বড়ি প্রস্তুতির বিবরণ কিছুটা কৌতূহল সৃষ্টি করে :

কানা মশা, ভালা মাছি, বাঘ ভাল্লুকের আখি।
কাঁকডার ঠ্যাং, ইঁচার খড়গ আর কাউয়া পাখি।।
শনিবারের পেঁচার হাড্ডি, শেজা মেজার কাঁটা।
শিরগালের জিহ্বা, সাপের ফণা, সরা গাছের আঠা।।
শকুনার পিত্ত আর কালা বিলাইব হাড়।
মড়ার মাথাব খুলি আর শ্মশানের ভাঁড়।।
নানান জাতি চিজ বস্তু দলাত কবিল।
সেই দলা দিয়া বুডি বড়ি বানাইল।।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ভারইয়া রাজার সঙ্গে বীরসিংহের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতার বিবরণ কিছুটা নাটকীয় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে :

মাইয়ানার মন্তর পইড়া রাজা ধুলা উড়াইল।
মন্তর পইড়া ভারই বাজা খিরিক্ষ হইল।।
কুডাল হাতে সিঙ্গি বাজা করে মার মার।
ভারই রাজাব লোক লস্কব করে হাহাকার।।
সপ্প হয়্যা ভারই রাজা কায়া বদলাইল।
ময়ূর পঙ্খী হয়্যা সিঙ্গি শূন্যে ত উড়িল।।
তবে ত ভারইয়া রাজা বদল কবে কায়া।
কইতর হইল বাজা জানে নানান্ মায়া।।
বাজ হইযা সিঙ্গি রাজা থাপা দিয়া ধরে।

মচ্ছ হয়্যা ভারই রাজা পড়িল সায়রে।।
উদ্ হয়্যা সিঙ্গি রাজা পশ্চাতে ধাইল।
চিলা হয়্যা ভারইয়া রাজা শূন্যে ত উড়িল।।
মাইয়ানীর মন্তরে রাজা কোন কাম কবে।
মাচান্ হইয়া রাজা শূন্য পথে উড়ে।।
ধূলা হইয়া পন্থে পড়ে রাজা না দেখি উপায়।
বাকুণ্ডি হয়্যা সিঙ্গি রাজা তাহারে উড়ায়।। ইত্যাদি।

## পরীবানু বেগমের পালা

পরীবানু বেগমের পালাটিতে আনুপূর্বিক কোনো আখ্যান বর্ণিত হয়নি. বর্ণিত হয়েছে রাজ্যহাবা বিড়ম্বিত ভাগ্যের অধিকারী সুজা বাদশাহের জীবনের শেষ কয়েকটি দিন। লড়াইয়ে পর্যুদস্ত সুজা স্ত্রী কন্যাসহ চট্টগ্রামে উপস্থিত হলেন। তাঁরা আশ্রয় পেলেন রোসাঙ্গের রাজার কাছে। কিন্তু কাল হল সুজা পত্নী পরীবানু বেগমেব রূপৈশ্বর্য। একদিন রোসাঙ্গরাজ পরীবানু বেগমকে দেখে তাকে পেতে চাইলেন। সুজা পরীবানুকে নিয়ে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন। একটি ছোট নৌকায় উভয়ে সওয়ার হয়ে সমুদ্রযাত্রা করলেন। দুজনেরই সমুদ্রে সলিল সমাধি হল। দীনেশচন্দ্র সেন পরীবানু বেগমের পালাকে 'হাঁহলা' শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরূপ অন্তর্ভুক্তির কারণ আলোচ্য পালাটি আদ্যন্ত একই ছন্দে রচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁহলা বা হাঁওলার আর যে বৈশিষ্ট্যটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, সেটি বর্তমান পালাটিতে রক্ষিত হযনি, তা বিস্মৃত হলে চলবে না। হাঁহলা বা হাঁওলা কখনই করুণ রসাত্মক হয় না। আনন্দজনক সামাজিক অনুষ্ঠানে গীত হবার জন্যই হাঁওলা বা হাঁহলা রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পালাটি করুণ রসাত্মক। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মন্তব্য করেছেন, 'পালাটির ভাষা ও বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায়, কবি ধর্মে মুসলমান ছিলেন, এবং তিনি সুজা বাদশাহের সঙ্গে হাতির উপরে পরীবানু বেগমকে যাইতে দেখিয়াছিলেন।' পালাটিতে ব্যবহৃত শব্দ নিচয়ের নিরিখে এটির রচয়িতা মুসলমান ছিলেন বলে মেনে নেওয়া গেলেও রচয়িতা কবি সুজার হস্তী পৃষ্ঠে যাত্রার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, এ বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। কেননা পালাটিতে যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, সেজন্য কবির প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কল্পনাতেই সে বিবরণদান সম্ভব। আলোচ্য পালাটিতে যে ধুয়াটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হল 'সাইগবে ডুবাইলি পরীরে।' সচরাচর কবিদের গীতিকায় বস্তুগত ভাবনার দ্বারা চালিত হতে দেখা যায়। এখানে কিন্তু মাঝে মাঝেই কবিকে আত্মগত ভাবে মন্তব্য সংযোজন করতে দেখা গেছে। যেমন :

ভোজের বাজি দুনিয়া রে কেবল বেড়া জাল।
কাড়াকাড়ি মারামারি আর যত জঞ্জাল।।
মিছা রাজ্য মিছা ধন মিছা ট্যাকা কড়ি রে।

কিংবা গরীব-গুইন্যা বেশী ভালো যারা খায় মাগি।।

সুজা ও তার বেগম, কন্যাদ্বয়কে দেখে হতচকিত সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং তাদের তরফে আতিথ্য দানের প্রস্তাব অথবা বিপদসংকুল পথ সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ খুবই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে।

## শীলা দেবীর পালা

শীলা দেবীর পালাটির কাহিনীটি অভিনব।[৩৫] এক জংলা মুণ্ডা অসহায় অবস্থায় এক ব্রাহ্মণ রাজগৃহে কোটালের পদে নিযুক্ত হয় ব্রাহ্মণ রাজার ঔদার্যে। জংলা মুণ্ডা ক্রমে ব্রাহ্মণ রাজার অপরূপ সুন্দরী কন্যার প্রেমাসক্ত হয়। কিন্তু রাজা জংলার প্রার্থনা মত তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দানে অনীহা প্রকাশ করেন, শুধু তাই নয় জংলাকে বন্দী করেন। জংলা কারাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ডাকাত দল গঠন করে সুযোগ মত রাজবাড়ী আক্রমণ করে। কিন্তু তার ঈপ্সিত রাজকন্যার সন্ধান লাভ ঘটে না। কেননা পুত্রীসহ রাজা অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আশ্রয়দাতা পরগণা রাজের রাজপুত্র রাজকন্যা শীলা দেবীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার উদ্দেশে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু শীলাদেবী জানায় তার পিতার শর্তের কথা। জংলাকে যে ব্রাহ্মণ রাজার কাছে বেঁধে এনে দেবে, তার সঙ্গেই তিনি তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। রাজপুত্র শর্ত রক্ষার জন্য জংলার বিরুদ্ধে যাত্রা করে। যুদ্ধে জংলাকে কুমার পর্যুদস্ত করে। সে পালায়। কুমারের সঙ্গে যখন রাজকন্যা শীলা দেবীর বিবাহের আয়োজন চলছে, এমন সময়ে আকস্মিকভাবে জংলা ব্রাহ্মণ রাজার প্রাসাদ আক্রমণ করে বসে। নিহত হয় রাজকুমার। শীলাদেবীও আত্মঘাতিনী হয়। এরপর ত্রিপুরা রাজ জংলাকে বন্দী করে উপযুক্ত শাস্তিদান করেন। অর্থাৎ আলোচ্য পালায় বর্ণিত হয়েছে যে জংলা মুণ্ডার প্রতিশোধ স্পৃহার কারণে শীলাদেবীর আর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া হল না, যদিও পরগণা রাজের পুত্রের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে এটি ব্যর্থ প্রেমের কহিনী।

দীনেশচন্দ্র সেন শীলাদেবী পালা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'পালাটির ঘটনা সম্ভবত: ঐতিহাসিক। মৈমনসিংহের বহুস্থানে শীলাদেবী সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। উক্ত জেলার নব বৃন্দাবনের অরণ্য প্রদেশে শীলাদেবী সংশ্লিষ্ট অনেক কাহিনী এখনও শোনা যায়।'

সেন মশাই আরও মন্তব্য করেছেন, 'যে সময়ে কোন স্থানীয় কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিযা থাকে তাহার অব্যবহিত পরেই তথাকার সাধারণ লোকেরা তৎসম্বন্ধে পালা প্রস্তুত করে।' ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকও দীনেশচন্দ্রের অভিমতকে সমর্থন জানিয়েছেন।

জনৈক গোপালচন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত এবং 'আরতি' পত্রিকায় প্রকাশিত শীলাদেবী পালার সারাংশে বর্ণিত হয়েছে মুণ্ডা দস্যুর হাত থেকে রক্ষালাভের আশায় ব্রাহ্মণ রাজা সকন্যা আশ্রয় নিয়েছিলেন গাজী রাজার কাছে। গাজী রাজের পুত্র শীলাদেবীর রূপে

মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহে উদ্যোগী হলে ব্রাহ্মণরাজা ত্রিপুরার রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। ত্রিপুরার রাজকুমার শীলাদেবীর পাণিপ্রার্থী হলে তার সঙ্গেই বিবাহ দানে ব্রাহ্মণ রাজা সম্মত হন। কিন্তু ত্রিপুরার রাজকুমার মুণ্ডা দমনে ব্রাহ্মণ রাজার রাজ্যে গিয়ে মুণ্ডাদের কৌশলে সৃষ্ট বন্যায় প্রাণত্যাগ করে। এরপর ত্রিপুরা রাজ মুণ্ডাদের দমন করেন এবং উপযুক্ত শাস্তি দেন। অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য পালার সঙ্গে এর যে বিষয়ে গুরুতর অমিল তা হল ব্রাহ্মণ রাজার গাজীর আশ্রয়লাভ এবং তার পুত্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে ত্রিপুরা রাজের আশ্রয় গ্রহণ। দীনেশচন্দ্র সেন এই গুরুতর পার্থক্য বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, 'ব্রাহ্মণ প্রভাবের আতিশয্যে দ্বিতীয় পালা লেখক মুসলমান সংশ্লিষ্ট ঘটনাটা গোপন রাখিয়াছেন এবং তৎস্থলে একটি অজ্ঞাতকুলশীল অনামা হিন্দু রাজাকে আনিয়া সে স্থান পূরণ করিয়াছেন'। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক কিন্তু গাজী পুত্রের ভয়ে শীলাদেবী সহ ব্রাহ্মণ রাজার ত্রিপুরা রাজের আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা এবং মুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধে ত্রিপুরার রাজকুমারের মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনার সত্যতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। মৌলিক মশায়ের মন্তব্য, 'গাজীর কবল হইতে পালাইয়া পরগণার রাজার আশ্রয় গ্রহণ ও শীলাদেবীর আত্মহত্যার পর ত্রিপুরা রাজের আশ্রয়ে মুণ্ডা দমনের কাহিনীই সত্য। কেননা ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ রাজার গাজীপুত্রের ভয়ে সকন্যা ত্রিপুরার আশ্রয় গ্রহণ কিংবা মুণ্ডাদমন করার সময়ে ত্রিপুরার রাজপুত্রের মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায় না।

যাইহোক, শীলাদেবীর কাহিনীটি যে বহুল প্রচলিত, তার আর একটি প্রমাণ ক্ষিতীশচন্দ্র দিয়েছেন। তাহেরুদ্দিন বিশ্বাস রচিত 'হানিফ গাজী-শীলাদেবীর কেচ্ছা' গ্রন্থটির হদিস তিনি দিয়েছেন। এতে বর্ণিত হয়েছে, মুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ব্রাহ্মণ রাজা সকন্যা রহমৎ গাজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। রহমৎ গাজীর পুত্র হানিফের সঙ্গে শীলার প্রণয় হয়। হানিফের বিবিদের নিযুক্ত এক বৃদ্ধা বাঁদির প্রয়াসে ব্রাহ্মণ রাজা শীলা দেবী সহ এক হিন্দু জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার লম্পট পুত্রের সঙ্গে শীলার বিবাহে সম্মত হন। বিবাহ সভায় ছদ্মবেশে হানিফ উপস্থিত হয় এবং শীলা ও হানিফ পলায়ন করে। এদিকে জংলা মুণ্ডাও বাজনদারের ছদ্মবেশে বিবাহ সভায় হাজির ছিল। শীলা বাসর গৃহ থেকে পলায়ন করলে সেও তাদের অনুসরণ করে। জংলা মুণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধে হানিফ অপারগ হলে শীলা সহ হানিফ নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করে।

দীনেশচন্দ্র সেন পালাটির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে প্রথমে কিছুটা সংশয়ের মনোভাব প্রকাশ করলেও শেষপর্যন্ত অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন, 'মূল ঘটনা ঐতিহাসিক'। শুধু তাই নয়, তিনি পালাটির রচনাকাল সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন, বলেছেন, 'মূল পালাটি চতুর্দশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল, কারণ ঐ সময়েই গাজীরা অতি পরাক্রান্ত ছিল।' পালাটির রচনাকাল ব্যতীত পালাটির রচয়িতা ও বর্ণিত চরিত্রগুলির অবস্থান স্থল সম্পর্কেও সমালোচককে অনুমান করতে দেখা গেছে, 'গানগুলি যে ছন্দে রচিত ঐ ছন্দ

ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রচলিত পল্লীসুর 'মুড়াই' ও 'সাইগরী' ছাড়া কোনো ভাটিয়ালী ধাঁচ-এ গাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয়, এই পালার রচয়িতা কবি ঐ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং শীলাদেবীর পিত্রালয় ও পরগণার রাজার জমিদারী খুব সম্ভব ঢাকা জেলার দক্ষিণ, নোয়াখালী জেলার উত্তর-পূর্ব ও ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম-এই সীমানার মধ্যে কোথাও ছিল।' সবই আনুমানিক, কোন অনুমানের পেছনেই পাথুরে প্রমাণ নেই। পালাটি আস্বাদনেব ক্ষেত্রে এটির রচনাকাল কিংবা উপস্থাপিত চরিত্রগুলির অবস্থান স্থলের সুনির্দিষ্টতা সম্পর্কে অস্পষ্টতা অথবা সংশয় যে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না, সেটাই সব থেকে বড় কথা।

সঙ্কলিত পালাটিতে কোন বন্দনা সংযোজিত হয়নি। সংলাপ নির্ভর রচনা, অবশ্যই ধুয়া সম্বলিত। অন্যান্য গীতিকার মত এটিতেও আমরা শালীনতাবোধের পরিচয় পাই। যে পরগণা রাজার আশ্রিত ছিল শীলা ও তার পিতা ব্রাহ্মণ রাজা, তাঁর পুত্র শীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, শীলার রূপে মুগ্ধ হয়েছে, তাকে বিবাহ করার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে, আর সেই সঙ্গে আশ্বস্ত করেছে এই বলে :

না ধরিব না ছুঁইব কন্যা আমি দূরে থাইকা খাড়া।
দেখিবে তোমার রূপ আমার দুই নয়ানের তারা।।

শীলাও মনে মনে আকৃষ্ট হয়েছিল রাজকুমারেব প্রতি, কিন্তু মুখে সে তার হৃদয় দৌর্বল্য প্রকাশ করেনি, শুধু তার পিতার উল্লিখিত শর্তের উল্লেখ করে জানিয়েছিল যে জংলা মুণ্ডাকে বেঁধে এনে তার পিতাকে দেবে, তারই হস্তে তার পিতা তাকে সমর্পণ করবেন। রাজকুমার সঙ্গে সঙ্গে শর্ত পূরণে সম্মত হয়ে জংলা মুণ্ডাকে ধরে আনতে যাত্রা করেছে। শীলা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। নারী সুলভ লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে কুমারের হস্তধারণ করে জংলার উদ্দেশে যাত্রা করতে নিষেধ করেছে :

রাজত্বি দৌলতে মোর কোনো কার্য নাই।
আমার লাইগা তোমারে আমি রণে না পাঠাই।।

কবি সুকৌশলে রাজকুমারের প্রতি শীলার দৌর্বল্যকে পূর্বেই অবশ্য সূচিত করেছেন। ফুলের বাগানে রাজকুমার অনূঢ়া কন্যা শীলাকে নিত্য সে কার পূজা করে, সে কি বর যাচ্ঞা করে ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলে সে প্রথমে মনস্থির করেছে আর বাগানে যাবে না। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে সে অবিচল থাকতে পারেনি। কবি বর্ণনা করেছেন :

কোথায় রইল পর্তিজ্ঞা মনের এমুন টানে।
মনে পাও টাইনা লইল ফুলের বাগানে।।

পরগণা রাজার প্রেমিক পুত্র কুসুম চয়নে আগতা শীলার প্রতি তার অন্তরের দুর্বলতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছে :

গোলাপ কেতকী গাছ
রইছে বিস্তর কাঁটা।
শাড়ীর আইঞ্চল জড়ায়া ধরে

গাছের এমুন বুকের পাটা।।

সে আরও বলেছে :

লোকে বলে পুরুষ জাতি
কঠিন সে অন্তরা।
আমি বলি নারী জাতি লো
পাষাণ দিয়া গড়া।।

কেননা শীলা দেবী তার আবেদনে তখন সাড়া দিচ্ছে না। কুমারের প্রতি তার আত্ম সমর্পণের কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। প্রায় সব গীতিকাতেই নায়কের জন্য নায়িকার অথবা নায়িকার জন্য নায়কের অন্তরের অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনার মাধ্যমে নতুবা বিভিন্ন উপকরণের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে। আলোচ্য গীতিকায় নায়িকার হৃদয় দৌর্বল্যের অপূর্ব অভিব্যক্তি ঘটেছে নায়কের উদ্দেশে কখনও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রাণ অথবা সাজসজ্জার উপকরণ বা পরিচ্ছদের সঙ্গে তুলনার পরিপ্রেক্ষিতে :

বন্ধু যদি হইতা আমার
পইরণের নীলাম্বরী।।
সর্বাঙ্গ ঘুরায়া পরতাম
আমি নাই সে দিতাম ছাড়ি রে—
বন্ধু যদি হইতা ভালা
আমার মাথার চুল।
ভালা কইরা বান্ধতাম খোপা
দিয়া সোনার চম্পা ফুল রে—
বন্ধু যদি হইত আমার
এই দুই নয়ানের তারা।
তিলক দণ্ড অভাগীরে
না হইত কাছ ছাড়া রে—
দেহের মধ্যে পরাণ ভালা
বন্ধু হইত রে আমার।
অভাগী রে ছাইড়া বন্ধু
না যাইত দূরান্তর রে—
এক অঙ্গ কইরা বিধি
যদি গড়িত দুইয়ে রে।।
সঙ্গে কইরা লইয়া যাইত
বন্ধু এই না আভাগী রে—

অলংকার প্রয়োগে আলোচ্য পালায় কিছুটা নূতনত্বের পরিচয় মেলে। অনবদ্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় এগুলিতে লভ্য। যেমন—

(ক) দুই আঙখি দেখি কন্যার পরভাতীয়া তারা।
(খ) বনের পাখির মতন পরাণ তোর শূন্যেতে উড়িব।।
(গ) কি জানি অজানা গান আইজ মন-কোকিলায় গায়—
(ঘ) আইব মালঞ্চে তোমার মন-মধুকর—
(ঙ) আবের গায়ে চান্দের কিরণ তেমুন শোভা হইব—
(চ) পুরুষ পরশমণি লো কন্যার, পরশে যায় জানা।
এইবার উপস্থাপিত চরিত্রগুলির আলোচনায় আসা যেতে পারে।

**শীলা দেবী**

শীলা দেবী হল গীতিকাটির নায়িকা। অপরূপা সুন্দরী সে। গায়ের রঙ তার কাঁচা সোনার মত। তার কেশ রাজি হাঁটু বেয়ে নেমে এসেছে। মনে হয় আকাশের কাল মেঘ বুঝিবা ভূমিতে নেমে এসেছে। তার দাঁতগুলি ডালিমের দানার মত। তার যখন দশ বছর বয়স তখন থেকেই তার পিতা ভাটকে পাঠালেন উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে। কিন্তু দীর্ঘ দু'বৎসরের চেষ্টাতেও মনোমত বর তার মিলল না। ক্রমে সে যুবতী হল। যৌবন সমাগমে রাজকন্যার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে গেল। নিঃসঙ্গতাবোধ তাকে পীড়িত করতে লাগল। আহার নিদ্রার কথা তার মনে থাকে না। শীলা দুঃখ করে বলেছে :

মনে লয় নিরলে বইসা কান্দি আনছলে—

তার সখীরা তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়, বলে শীলার বন্ধু তাকে চুল বেঁধে দেবে যত্ন করে, কাজল পরিয়ে দেবে যত্ন করে, ফুলের অলংকার পরিয়ে দেবে, নূতন মালঞ্চ ফুলে তার মালাও গেঁথে দেবে।

জংলা মুণ্ডা শীলাকে লাভে ব্যর্থ হয়ে তাদের প্রাসাদ আক্রমণ করে বসে। আশ্রয় লাভের জন্য শীলা পিতাসহ উপস্থিত হল ব্রাহ্মণ রাজার কাছে। এখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় পরগণা রাজের পুত্রের সঙ্গে। অধিকাংশ গীতিকাতেই নায়ক-নায়িকার মিলনস্থল রূপে পুকুরঘাট বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গীতিকায় সেই স্থলে কুসুম উদ্যান নির্বাচিত হয়েছে।

পরগণা রাজার কুমার শীলার সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট, শীলাও কুমারের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু শীলা তার হৃদয় দৌর্বল্যকে নারী সুলভ স্বাভাবিক লজ্জায় গোপন রেখেছে। কুমার যখন তার কাছে জানতে চেয়েছে শীলা যে নিত্য ফুল তোলে তা সে ফুলে সে কার পূজা করে. আর পূজা যদি করে তবে কি উদ্দেশ্যে করে, নিশ্চয়ই মনোমত বর লাভের প্রত্যাশা থাকে, কুমার এইসব সম্পর্কে জানতে চাইলে শীলা বেশিক্ষণ তাব কাছে অপেক্ষা করেনি, শুধু জানিয়েছে তার পিতার পূজার্চনার জন্য সে কুসুম চয়ন করে, দেরী হওয়ার অজুহাত দেখিয়েই সে স্থানত্যাগ করেছে। কুমার কিন্তু তখনও কুসুম উদ্যানে অবস্থানরত। কবি অপূর্ব সূক্ষ্মতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন—

পন্থে যাইতে কন্যা ফিইরা ফিইরা চায়।

অর্থাৎ তার মন পড়ে রইল কুমারের প্রতি। এরপর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর কুসুম চয়নে যাবে না, গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে না। সেক্ষেত্রে পরগণা রাজার পুত্রের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু নিশাবসানে কোথায় রইল তার প্রতিজ্ঞা :

কোথায় রইল পর্‌তিজ্ঞা মনের এমুন টানে।
মনে পাও টাইনা লইল ফুলের বাগানে।।

পুনরায় কুমার তাকে ধরেছে, এবারে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব। অবস্থা বিপাকে শীলা অন্যের আশ্রিতা হলেও তার মধ্যে 'আত্মমর্যাদাবোধ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাই সে বলেছে, কুমারকে পরামর্শ দিয়েছে :

ভালো ভালো রাজাব কন্যা তারারে ছাড়িয়া।
ভিক্ষুক বামুনের কন্যা কেনে করবা বিয়া।।

কখনও বা কুমারকে বলেছে :

চিত্তে ক্ষেমা দেও রে কুমার, শুন মন দিয়া।
মাও বাপে সুন্দর কন্যা তোমারে করাইব বিয়া।।

কিন্তু কুমারও নাছোড়বান্দা, সে শীলাকে ভিক্ষা চেয়েছে, বলেছে তাকে পেলেই সে পৌঁছে যাবে 'সব পেয়েছির দেশে'। তখন কন্যা শুনিয়ে দিয়েছে তার পিতার শর্ত :

যে জন আনিয়া দিব মুণ্ডারে বান্ধিয়া।
সেই সে জনার কাছে বাপ আমারে দিব বিয়া।।

শীলা ইতিপূর্বে তার কুসুম চয়নেব কারণ হিসাবে পিতার পূজার্চনার উল্লেখ করেছিল। কিন্তু এখন সে জানাল যে নিজেই নিত্য ব্রত পূজাদি করে। আগে যে এসবের উল্লেখ করেনি তাব কারণ প্রথম বাক্যালাপ চলছিল কুমারের সঙ্গে, তাই স্বভাবতঃই লজ্জার কাবণে বেশিক্ষণ তার কাছে থাকেনি। কারণ তার পূজার্চনাব প্রসঙ্গে তাকে ববযাত্রার বিষয়ে বলতে হত, এই বিষয়টিকে সে এড়িয়ে যেতেই ঈষৎ অসত্য ভাষণ কবেছিল। কিন্তু এখন সেই তাকেই অকপটে স্বীকার করতে হল :

আমার আছে বর্‌ত—পূজা নিত্যি আমি পূজি।
সেই কারণে ফুল তুলিতে আইলাম লয়্যা সাজি।।

পরগণা রাজের পুত্র যখন এক কথাতে ব্রাহ্মণ রাজার শর্তে সম্মত হয়েছে, জংলা মুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে বলে ঘোষণা করেছে, তখন শীলা আর তার অন্তরের আবেগকে দমন করতে পাবেনি। সে নারী সুলভ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে কুমাবের হাত ধবে বলেছে সে যেন যুদ্ধে না যায় :

না যাইও না যাইও কুমার তুমি এই না রণে।

কুমার শীলাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, সাহস দিয়ে বলেছে তার পিতার শর্ত পালন করে তবেই তাকে সে ভিক্ষা চাইবে। সরল হৃদয়া শীলা এই সান্ত্বনা বাক্যে খুশী হয়ে বাড়ী ফিরে গেছে। কিন্তু এ সান্ত্বনালাভ ছিল তার নিতান্তই সাময়িক। এরপরই শুরু হয়েছে তার দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা কুমারের জন্য। তার দুর্ভাবনাব কথা সে দ্বিতীয় কাউকে প্রকাশ

করতে পারেনি। তাতেই দুশ্চিন্তা তার গেছে বেড়ে।

যাইহোক শেষপর্যন্ত কুমার রণ জয় করে ফিরে এসেছে। শর্ত পূরণ হওয়ায় শীলার সঙ্গে তার বিবাহের আয়োজন হয়েছে। কিন্তু বিবাহ শেষ হবার পরই জংলা মুণ্ডা পুনরায় আক্রমণ করেছে ব্রাহ্মণ রাজার বাড়ী। প্রাথমিকভাবে কুমার এবারেও জয়ী হয়েও বিষের তীরে মৃত্যু বরণ করেছে। নবোঢ়া শীলার পক্ষে এ ঘটনা ছিল মর্মান্তিক। সে কুমারের বক্ষে বিদ্ধ তীর নিজ বক্ষে ধারণ করে আত্মঘাতিনী হয়েছে এবং এইভাবেই প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে।

**পরগণা রাজকুমার**

শীলা দেবীর পরই উল্লেখ করতে হয় পরগণা রাজের প্রেমিকপুত্রের প্রসঙ্গ, সে শুধু প্রেমিক ছিল না, ছিল বীর, ছিল কর্তব্যপরায়ণ।

শীলার সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট, কিন্তু কি তার আভিজাত্যবোধ, সে শুধু শীলাকে মিনতি জানিয়ে বলেছে :

> না ধরিব না ছুইব কন্যা আমি দূরে থাইকা খাড়া।
> দেখিবে তোমার রূপ আমার দুই নয়ানের তারা।।

অকপটে সে স্বীকার করেছে, যে মনের কথা সে মনেই গোপন রাখতে চেয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত সে তার হৃদয় দৌর্বল্যকে আর গোপন রাখতে পারেনি :

> মনরে বুঝায়্যা রাখি কন্যা
> আমি শিকলে বান্ধিয়া।
> আইজ না পারিলাম আমি
> মনরে কইয়া বুঝাইয়া।।

শীলা নানাভাবে তাকে বুঝিয়েছে যে সে অন্যত্র বিবাহ করুক, অনেক উপযুক্ত কন্যা সে পাবে পত্নীরূপে, কিন্তু পরগণা রাজের কুমার নাছোড়বান্দা, তার বক্তব্য হল :

> শুন কন্যা, যার মনে যা চায়।
> পাইলে হাজার দান ভিক্ষা তার না যায়।।
> ধন-দৌলত রাজ-রাজত্বি কন্যা, তোমার পায়ের ধূলা
> তোমার দুয়ারে খাড়া আমি হস্তে ভিক্ষার ঝুলা।।
> বামুন ভিখারীর জাতি হইল চিরকাল।
> রাজার পুত্র হইয়া লো আমি এই ধনে কাঙাল।।

মনে রাখতে হবে সে হল শীলাদের আশ্রয়দাতা, আর শীলা, তার মা, বাবা তাদের আশ্রিত। কিন্তু তথাপি আশ্রয়দাতার অহংকার বা বলপ্রয়োগের কোন পথ সে অবলম্বন করেনি, সে কেবল আবেদন জানিয়েছে, ভিক্ষা চেয়েছে শীলার কাছে। শীলা যখন তার পিতার শর্তের কথা বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে কুমার সেই শর্তে সম্মত হয়ে জংলা মুণ্ডাকে ধরে আনতে গেছে। কুমারের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে জংলা পালিয়ে গেছে। যুদ্ধে বিজয়ী

হয়ে, তবেই কুমার শীলার পাণি গ্রহণ করেছে। কিন্তু কপাল তার মন্দ। বিবাহ রাত্রেই পুনরায় আক্রান্ত হয়েছে জংলার হাতে। বর-সজ্জা ত্যাগ করে সে দ্রুত যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়েছে এবং উপযুক্ত ভাবে শত্রুর মোকাবিলাও করেছে। কিন্তু :

রণ জয় কইরা কুমার আইল পুরীর দোয়ারে।।
অইন্ধকারে বিষের তীর বিন্ধিল কুমারে।।

অকাল মৃত্যুর শিকার বেচারী কুমারের আর সুখী দাম্পত্য জীবন আস্বাদন করা হল না।

**জংলা মুণ্ডা**

পরিশেষে জংলা মুণ্ডার প্রসঙ্গ। জংলা পিতৃমাতৃহীন, সহায় সম্বলহীন, আশ্রয়হীন। এমন অবস্থায় তাকে ব্রাহ্মণ রাজা অনুগ্রহ পরবশ হয়ে আশ্রয় দিলেন। আশ্বাস দিলেন তাকে জমি দেবার, বাড়ী দেবার এবং বেতন দেবার। রাজের কোটাল পদে তাকে নিযুক্ত করবেন বলে জানালেন। কিন্তু জংলা জানাল সে দীর্ঘ দশ বৎসর আশ্রয়হীন হয়ে যাযাবরের জীবন যাপন করছে। তার বাড়ী, জমি, কিছুই চাই না, চাই শুধু রাজার শ্রীচরণের আশ্রয় :

পায়ের নফর হয়্যা রে রাজা, আমি থাকিমু দুয়ারে।

শক্তিশালী, অদ্বিতীয় বীর জংলাকে ব্রাহ্মণ রাজা তার কোটালদের কর্তা করে দিলেন। ছুঁচ হয়ে ঢুকে এই জংলাই শেষে ফাল হয়ে বেরুল। পাঁচ বৎসর রাজার কাছে কাজ করে সে বিদায় চাইল আর সেই সঙ্গে তার পাঁচ বৎসরের বেতন মিটিয়ে দিতে বলল। রাজা তাকে ইচ্ছামত ধনদৌলত নেবার জন্য বললেন। কিন্তু সে চেয়ে বসল রাজকন্যা শীলাকে :

যুবাবতী কন্যা তোমার নাই সে দিছ বিয়া।
আমার পরাণ রাখবা রাজা, সেই ধন দিয়া।।

সে আরও জানাল :

পাঁচ বছর খাইটাছি খাটুনি যে ধনের আশায়।
সেই ধন করিবা দান কহি যে তোমায়।।

স্বভাবতঃই ব্রাহ্মণ রাজা তার এই দাবীতে জ্বলে উঠলেন। বন্দী করা হল জংলাকে কিন্তু অদ্বিতীয় শৌর্য বীর্যের আধার জংলা রাত্রে দেউড়ি থেকে শিকল ভেঙ্গে পালাল। এরপর সে জংলীদের নিয়ে ডাকাতের দল তৈরী করে ব্রাহ্মণ রাজার বাড়ীতে হানা দিল আকস্মিকভাবে। ব্রাহ্মণ রাজা স্ত্রীকন্যাসহ পরগণা রাজার আশ্রয় নিলেন। চরম বিশ্বাসঘাতক জংলা কিন্তু সহজে হার স্বীকার করার পাত্র নয়। সে ওঁত পেতে রইল উপযুক্ত সুযোগ লাভের আশায়। সে পরগণা রাজার কুমারের কাছে পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করল। কিন্তু পরগণা রাজার কুমার যখন শীলার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হল, সেই বিবাহ রাত্রেই সে আক্রমণ করল বিবাহ উৎসবে মত্ত প্রাসাদের লোকজনকে।

ইতিপূর্বেই সদলবলে সে ব্রাহ্মণ রাজার প্রাসাদে বাদ্যকরের ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিল, শীলাদেবীর বিবাহোৎসবে বাজনা বাজাবে বলে। পরগণা কুমারের কাছে জংলার দ্বিতীয় বারের আক্রমণাত্মক প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। তবে কৌশলে পরগণা কুমারকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। শেষপর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ সদলবলে জংলাকে বন্দী করে নিয়ে এসে তোপের দ্বারা উড়িয়ে দিলেন।

আশ্রয়দাতার বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং প্রতিহিংসাবশত: একাধিকবার ব্রাহ্মণ রাজার গৃহ আক্রমণ করে শেষপর্যন্ত মৃত্যু বরণ করল। সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যেতে পারে, 'মুণ্ডার চরিত্রটি যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।'[৩৬]

## মুকুট রায়

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে 'মুকুট রায়' পালাটি। পালাটি অবশ্য অসম্পূর্ণ, তথাপি এমন একটি স্থানে পালাটি শেষ হয়েছে, যার ফলে এর রসাস্বাদনে তেমন অন্তরায় ঘটে না।

শিলুইরাজার পুত্র হল মুকুট রায়। মুকুট রায়ের যখন বিশ বৎসর বয়স, তখন তার পিতা বিবাহে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু কোন পাত্রীকেই মুকুটের পছন্দ নয়। রাজা পুত্রের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি মুকুটকে একশতটি ঘোড়া ও একশতটি হাতী এবং পছন্দমত লোকলস্কর নিয়ে মনোমত পাত্রীর সন্ধানে যেতে বললেন.

রাজকুমার সাত জঙ্গল তের নদী অতিক্রম করল। সুন্দর একটি ঘোড়ার সওয়ার হয়ে সে পৌঁছে গেল গভীর বনে। বনমধ্যে একটি হীরামণকে দেখে সেটিকে জীবন্ত ধরার প্রয়াসে রত অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটে গেল এক বন্য রমণীর। কুমার জানাল তার পাত্রী অপছন্দ হবার কথা। আরও জানাল ব্যাধ কন্যাকে তার পছন্দ হওয়ার কথা। ব্যাধ কন্যাও কুমারকে ভালবেসে ফেলল। কিন্তু ভয় হল ব্যাধেদের নজরে পড়লে কুমারের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকার পর মুকুটের পরামর্শে ব্যাধ কন্যা মুকুটসহ শিলুই রাজার রাজ্যে চলে এল।

দিব্বি সুখে দিন কাটছিল দুজনের। কিন্তু আকস্মিকভাবে দুশমন 'বনুয়া'র নিক্ষিপ্ত বিষযুক্ত তীরে মারা পড়ল কুমার। সব দোষ পড়ল কন্যার উপর। বলা হল নর মাংস আহারের লোভেই কন্যা কুমারকে হত্যা করেছে। একটি সিন্দুকে কুমারের মৃতদেহ সহ কন্যাকে তালাবন্দী করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। জেলের জালে উঠল সিন্দুকটি। সিন্দুক খুলে একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত দুজনকে দেখে তারা ভয় পেল। তারা পালাল। ব্যাধ কন্যা মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে কেঁদে কেটে বেড়াতে লাগল। তার ক্রন্দনে আল্লা নিরঞ্জন ব্যাকুল হয়ে বত্রিশ পয়গম্বরকে দ্রুত মুকুট রায়কে পুনর্জীবিত করতে আদেশ দিলেন। কন্যার দৃষ্টির অন্তরালে মুকুট রায়কে তিনি জীবনদান করলেন। পয়গম্বর কন্যাকে জানালেন যে সে নেয়াজার সরের রাজার কন্যা। নেয়াজার রাজার সঙ্গে মিলিত হল কন্যা।

এদিকে শিলুই রাজা পুত্রকে পেয়ে খুশী, কিন্তু মুকুট তার পত্নীর জন্য উন্মাদ।

ওদিকে নেয়াজার কন্যাও মুকুটের জন্য পাগল। মুরশীদের মধ্যস্থতায় উভয়ের মিলন ঘটল। মুরশীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে নেয়াজাব রাজা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

গীতিকাটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। সংক্ষিপ্ততা ধর্ম রক্ষা কল্পে আখ্যানের প্রায় প্রথমে রাজকুমারকে একেবারে বিশ বৎসর উত্তীর্ণ করা হয়েছে :

এক দুই তিন করি বরষ গুনরে।
দেখিতে দেখিতে কুমার কুড়ি বচ্ছর ধরে।।

শিলুই রাজা পুত্রেব উন্নাসিকতায় বিরক্ত হয়ে তাকে ইচ্ছামত পাত্রী নির্বাচনের অধিকার দিয়েছিলেন :

ধুবা নাপিতের কন্যা খেউরের ভাণ্ডারী
যারে পর্ছান্তবে তারে আন বিভা করি।।

যতই ক্রোধের প্রকাশ ঘটুক, তথাপি জাতি ধর্ম, বৃত্তি নিয়ে বোধকরি যে সময়ে যে সমাজে এই গীতিকাটির উদ্ভব, সেখানে তেমন গোঁড়ামি ছিল না। বাস্তবেও রাজকুমার যাব পাণিগ্রহণ করেছে প্রথমে তাকে ব্যাধ কন্যা বলেই জ্ঞান করা হয়েছিল, পরে অবশ্য সে যে রাজপুত্রী তা জানা গেছিল।

পালাটিতে জীবনের অনিত্যতা বিষযে কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন :

গৈরব না কর বান্দারে আরে বন্দা দৈব কাছে কাছে।
আজ ত আইসাছে সুখ, দুঃখু তাহার পাছে।।
আজ যে হাসিছ বান্দা না বাখ খবর।
কালুকা কান্দিয়া মরবা বেইলেব আড়াই পর।।
আজত সুখের গুজরান করছ গুণাগাব।
কাইল ত চাহিয়া দেখবা দুইনাবি আন্ধাব।।
কোদালে কাটিয়া মাটি উপরে দিবে চাপা।
চারিদিকে চাহিয়া দেখবে কোথারে মা-বাবা।।

পালাটিব মাধ্যমে কবি ইসলাম ধর্মেব জযগান গেয়েছেন :

আল্লা আল্লা বল ভাইরে নবী কব সাব।
নবীর কলেমা পড-বন্দা গুণাগাব।
গৈরব করিছ বান্দা এ দেহের মিছা।
মিছা কথা এ দুনিয়া আল্লা নবী সাঁচা।।

সমালোচক 'মুকুট রায' কে পালা গান বলে স্বীকার করেননি, 'গীতিকথাব লক্ষণাক্রান্ত' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আরও বলেছেন, 'ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোনও চিহ্ন নাই, কিন্তু ইসলাম ধর্মেব মহিমা ঘোষণা করার চেষ্টা আছে। এই পালায় 'শকুন্তলা' ও 'মিরান্দা'র ছাযা পাই।'[৩৭]

নায়িকার তার মৃত স্বামীর ব্যাপারে যে ভূমিকা দেখা গেছে, তা আমাদের বেহুলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পয়গম্বরের সাহায্যে মৃত রাজকুমার মুকুট রায়ের পুনর্জীবন

লাভের ঘটনা বলাবাহুল্য অলৌকিকতার পরিচয়বাহী। অলংকার প্রয়োগে কিংবা কাব্যিক প্রকাশে তেমন মনোযোগী ছিলেন না কবি।

## রাজা তিলক বসন্ত

রাজা তিলক বসন্ত করম পুরুষের বরে ধনেশ্বর হলেন। কিন্তু করম পুরুষ শর্ত আরোপ করেছিলেন যে একদিনের জন্যও তিনি যেন অতিথিকে বিমুখ না করেন, করলে ধনৈশ্বর্য সব যাবে :

একদিন অতিথি যদি বিমুখ হইয়া যায়।
রাজ্যধন সকল মোর যাইব বেথায়।।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে গোঁসাই গভীর রাত্রে আহার্যের প্রার্থনা জানিয়ে ব্যর্থ হলেন। তাতেই রাজার কপাল পুড়ল। অথচ রাজা কিছুই জানেন না, কেননা তিনি ছিলেন নিদ্রাভিভূত। হঠাৎ শুনতে পেলেন অভিশাপ :

ভাণ্ডার হবে লক্ষ্মীশূন্য ওহে রাজা লক্ষ্মী যাইব ছাড়ি।
কাল বিয়ানে হইবা রাজা পন্থের ভিখারী।।
যারা তোরে আপনা বলে তারা হইব পর।
ভাণ্ডার লুটিয়া লইব পন্থের সম্বল কড়া।।

রাজা বনবাসী হবেন, কিন্তু রাণীকে বললেন পিত্রালয়ে ফিরে যেতে। রাণী রাজি হলেন না। অগত্যা রাজা রাণী দুজনেই বনবাসী হলেন। কষ্টের আর অবধি নেই তাদের। কাঠুরিয়াগণ অনুগ্রহ করে তাদের কুটির নির্মাণ করে দিল। রাজা কাঠুরিয়াদের সঙ্গে কাষ্ঠাহরণে যান। একদিন রাজা চন্দন কাঠ বিক্রয় করে অর্থ পেয়ে কাঠুরিয়াদের নিমন্ত্রণ করলেন। রাণী ছত্রিশ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে নদীতে স্নান করতে গেলেন।

এদিকে এক সাধু ব্যবসা করে প্রভূত সম্পদ নিয়ে নদীপথে ফিরছিল। করম পুরুষ একটি টাকা তার কাছে চেয়ে ব্যর্থ হলেন। অভিশাপ দিলেন তিনি। সাধুর নৌকা আটকে গেল। করম পুরুষ জানালেন সতী কন্যার স্পর্শেই কেবল ডিঙ্গি জলে ভাসবে, অন্য ভাবে নয়। এমন সময়ে রাণীকে নদীতে স্নান করতে আসতে দেখে সাধু তার শরণাপন্ন হল। রাণীর স্পর্শে ডিঙ্গা ভেসে উঠল। দরিয়ায় যদি পুনরায় কোন বিপদ হয়, তা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য সাধু রাণীকে ডিঙ্গায় তুলে নিল। সুলা রাণীর মনে পড়ে গেল করম ঠাকুরের কথা। অভিশাপ দিয়ে বললেন, যদি তিনি সতী হন, তবে চৌদ্দ ডিঙ্গার গতিরুদ্ধ হবে। সাধুর কুড়ি কুষ্টি গলে পড়বে। মাঝি-মাল্লারা যখন দেখলে রাণীর অভিশাপ ফলে গেছে তখন তারা সাধুকে ফেলে পালাল।

রাজা সন্ধ্যাবেলায় কাঠ কেটে এসে সুলা রাণীর দেখা না পেয়ে অনুসন্ধান করে সব অবগত হলেন। রাজা কুটিরে আগুন দিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন।

এইবার অন্য এক প্রসঙ্গ। এক রাজা ও রাণীর সুখের রাজত্ব। একদিন রাজা রাণীর কাছে জল চাইলেন। রাণীর পরিবর্তে রাজকন্যা জল দিল। রাজা কন্যাকে বুঝতে না

পেরে—'রাণী জ্ঞানে পরিহাস করে বসলেন।' তারপর লজ্জিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন পরদিন সকালে প্রথমে যার মুখ দেখবেন তারই সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন। এইভাবে এক মালীর সঙ্গে রাজার কন্যার বিবাহ হল। মালী আর কেউ নয়, পূর্বের বনবাসী রাজা। রাজকন্যা পবনকুমারী সব কিছু মানিয়ে নিল। রাজার আদেশে মালীর গৃহে বার ভাণ্ডারের ধন বণ্টিত হয়, কিন্তু মালী ও রাজকন্যা সেসব সম্পদ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। ফলে কাঙ্গালীরা রাজবাড়ীর পরিবর্তে মালীর বাড়ীতে এসে ভীড় জমায়। রাজকন্যা পবনকুমারীর সাতটি ভাই তার ওপর খুবই অসন্তুষ্ট। তাদের নির্দেশে রাজকন্যার কাছে বারভাণ্ডারের ধন বণ্টন বন্ধ হয়। রাজকুমারী বিপদে পড়ে। কিন্তু গরীবদের দান-খয়রাতি এতেও বন্ধ হয় না।

তখনও ত সতী কন্যা বেকন্ কাম করে।
অঙ্গের যত গয়নাগাটি বেলায় সবাকারে।।
কাণের না কন্নদোলা গলার না হার।
একে একে দিল কন্যা ভিক্ষুক বিদায়।।

একদিন এক ব্রাহ্মণ প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হলেন এবং অন্ধ বলে চোখ ভিক্ষা চাইলেন। মালী নিজের চোখ ব্রাহ্মণকে দান করে অন্ধ হল। রাজকন্যা পবনকুমারী তখন রাজার অন্তঃপুরে মালীর পরিবর্তে ঝাড়ু দেওয়ার কাজ নিল। সাত রাজপুত্রের বধূরা ননদের অবস্থা দেখে হাসাহাসি করে. রাণী কন্যার অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলেন. কিন্তু পুত্রদের ভয়ে কিছুই করতে পারেন না।

একদিন রাজপুত্ররা শিকারে গেল। শিকারের বাজনা শুনে মালী চাইল সেও শিকারে যাবে। রাজকন্যার নিষেধে কাজ হল না। সে মালীকে বললে তার সাত ভাই যে হরিণ শিকার করে আনবে, সে তাদের কাছ থেকে মাংস ভিক্ষা করে আনবে। কিন্তু মালী নাছোড়বান্দা। অগত্যা বাবার কাছ থেকে রাজকন্যা শব্দভেদী ধনু ও ছিলা চেয়ে আনল। হাতড়ে হাতড়ে মালী রাজা বনে উপস্থিত হল। রাজপুত্ররা ত কোন শিকারই পেলে না। হঠাৎ পায়ে ঠেকল মালী রাজার কি যেন। আসলে সুলা রাণী পড়ে ছিলেন, তারই দেহ পায়ে ঠেকল। স্বামীর পাদস্পর্শে সুলা রাণী নিরাময় হয়ে উঠলেন। অপরদিকে মালী রাজাও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। দীর্ঘ বারবছর পরে উভয়ের মিলন হল। শিকারে ব্যর্থ সাত রাজকুমার এক বৃক্ষতলে দেবদেবীকে এবং সাতটি হরিণকে তাদের সামনে দেখতে পেল। তারা ঠিক করল মালী রাজাকে মেরে হরিণগুলি নেবে। কিন্তু সকলেই মালী রাজার কাছে পর্যুদস্ত হল। সকলের কপালে তপ্ত অঙ্গুরীয়ের ছাপ দিয়ে দিল মালী রাজা। রাজকন্যা পবনকুমারীর জন্যও একটি অঙ্গুরীয় দিয়ে দিল তাদের কাছে। পবনকুমারীকে রাজপুত্ররা অঙ্গুরীয়টি দিয়ে জানাল মালীকে বাঘে খেয়েছে। কিন্তু অঙ্গুরীয় রাজকন্যাকে সব ঘটনা বিবৃত করল।

পবনকুমারী মালী রাজার উদ্দেশে নিষ্ক্রান্ত হল। সে আশ্রয় নিল এক ধোপার কাছে। ধোপানী যখন রাজবাড়ীতে কাপড় দিতে গেল, তখন রাণীর কাপড়ের মধ্যে পবনকুমারী

অঙ্গুরীয়টি লুকিয়ে রেখে দিল। রাণী অঙ্গুরীয়টি রাজাকে দিল। রাজা ধোপানীকে ডেকে পাঠাল। তার কাছ থেকে পবনকুমারীর সন্ধান মিলল। মিলন হল পবনকুমারীর সঙ্গে মালী রাজার। সুলাও পবনকুমারীকে গ্রহণ করলেন। পবনকুমারীর পিতা মালী রাজাকে তাঁর অর্ধেক রাজত্ব দান করলেন।

'রাজা তিলক বসন্ত' পালাটিকে দীনেশচন্দ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেছেন। কেউ কেউ এই পালায় শ্রীবৎস-চিন্তার প্রভাব দেখেছেন,[৩৮] কেউবা মহাভারতের নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।[৩৯] দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'পালাগানে সচরাচর আমরা নায়কদিগকে কতকটা হীন ভাবাপন্ন দেখিতে পাই। নাযিকারাই অধিকাংশ স্থলে চরিত্র গৌরবে আমাদিগকে মুগ্ধ করেন। কিন্তু নায়কগণের মধ্যে অনেকেই বিপদ বা প্রলোভনে পড়িলে তাঁহাদের আদর্শ-চ্যুত হইয়া আমাদের অবজ্ঞাভাজন হন। কিন্তু এই পালাটিতে যেমন তিলক বসন্ত, তেমনি তাঁহার দুই রাজ্ঞী।'[৪০]

নায়ক তিলক বসন্তকে 'উজ্জ্বল, সহিষ্ণু, প্রেমিক, একনিষ্ঠ এবং বীর' রূপেই আমরা পালায় পেয়েছি। কেবল তাঁর সম্পর্কে একটি অভিযোগ সুলা রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি নিজে পবনকুমারীর সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন বোধ কবেন নি। অবশ্য পবনকুমারীকে তিনি পববর্তীকালে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন, এক্ষেত্রে সুলারাণীর মহত্ত্বকেও স্বীকার কবতে হবে। তিলক বসন্ত ও রাণীর বনবাসের চিত্র মনোজ্ঞ। কাঠুরিয়াদের সহজ, সরল অকৃত্রিম আচবণও আমাদের মুগ্ধ করে। পালা রচয়িতা মালী রাজার মাধ্যমে শাশ্বত সত্যপ্রকাশ করেছেন—'সুখ যদি চাও কর দুঃখেরে ভজন' কিংবা 'সুখ যদি পাইতে চাও দুঃখ আপন কর'।

সুলা রাণী এবং পবনকুমারী উভয়েব মাধ্যমেই পাতিব্রত্যের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। বনে যেতে উদ্যত রাজা তিলক বসন্ত সুলা রাণীকে বনবাসের দুঃখ বরণ না করে পিত্রালয়ে চলে যাবার পরামর্শ দিলে সুলা রাণী বলেছেন :

আমি থাকবা বাপের বাড়ী তুমি থাকবা বনে।
পতি যদি নারীবে ছাড়ে কি করব তাব ও ধনে।।
বাপেব মায়ের সোহাগেতে আমার কাজ নাই।
কিরপা কইবা লহ সঙ্গে বনে চইলা যাই।।

রামায়ণের সীতার ছায়াপাত সুলা রাণীব বক্তব্যে ঘটেছে। অনুরূপভাবে উল্লেখ্য পবনকুমাবীর পতিপ্রেম :

দুই হস্ত তোমাব পতি আমার গলার সাতনালা।
তোমাব সোহাগের ডাক আমাব কর্ণদোলা।।
তোমার পায়ের ধূলা অঙ্গ আভবণ।
তুমি আমার হিয়া মণি তুমি যে কাঞ্চন।।
নয়নেব জলে পতি তোমার পা ধুযাই।

সেই পা মুছাইয়া ফেলে বড় তিপ্তি পাই।।

কবির ছন্দোনৈপুণ্যের পরিচয় স্বরূপ উল্লিখিত হল নিম্নোদ্ধৃত অংশটি :

বনে থাকে কাঠুরিয়া।
বুক ভরা দয়ামায়া।।
গাছ কাটে বিরক্ষ কাটে।
বিকায় নিয়া দূরের হাটে।।

কিংবা

সঙ্গে নারী।
লক্ষ্মী যায় না ছাড়ি।
অত দুঃখে বাঁচে
তও লগে লগে আছে।।
রূপে গুণে ধন্যা।
ও গো তুমি কোন রাজার কন্যা।।

প্রকৃতিতে 'রাজা তিলক বসন্ত' রূপকথা জাতীয় রচনা। রূপকথার একাধিক অভিপ্রায় গল্পটিতে বিদ্যমান।

### আন্ধা বন্ধুর পালা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডে 'আন্ধা বন্ধু' সংকলিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়িতভাবে এই একই পালা সংকলিত হয়েছে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পঞ্চম খণ্ডে। দীনেশচন্দ্রের মতে, 'চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে এই পালাটি বিরচিত। ক্ষিতীশচন্দ্রও প্রায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 'পালাটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্বের রচনা।'

আন্ধা বন্ধুর পালার মত ট্রাজিক পালা খুব কমই আছে। এক নিঃসন্তান রাজার অধিক বয়সে এক পুত্র সন্তান জন্মে। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতার আশা ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর সেই সিংহাসনে বসবে। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ায় স্বভাবত:ই কনিষ্ঠ রাজ ভ্রাতা নিরাশ হয়। এদিকে রাজকুমারের যখন মাত্র দুই বৎসর বয়স, তখন দস্যুদের দ্বারা সে অপহৃত হয়। রাজা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন সন্তানের উদ্ধারের আশায়। দস্যুরা তখন বহু দূরে পলায়ন করল, তার আগে শিশুর দুটি চক্ষু বিনষ্ট করে গেল।

এক ব্যাধ বনে শিকার করতে এসে শিশুটির কান্নায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করে। ব্যাধটি জেনেছিল যে এই শিশুটি অপহৃত রাজকুমার। কিন্তু তার ভয় হল, রাজকুমারের চক্ষু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে যদি রাজা তাকেই দায়ী করেন, এই ভয়ে একদিন ব্যাধ শিকার করতে গিয়ে আর ফিরে এল না। তখন রাজকুমারের বয়স বারো বৎসর। ব্যাধ-পত্নী স্বামীর সন্ধানে গিয়ে সেও আর ফিরল না। আলোচ্য পালাটি এর

পরবর্তী ঘটনাকে নিয়ে রচিত। রাজকুমার পরবর্তীকালে পরিচিতি অর্জন করে 'আন্ধা বন্ধু' নামে। অপূর্ব বাঁশী বাজিয়ে সে ভিক্ষা করে, তার দুর্ভাগ্যের জন্য সে বিধাতাকে দোষ দেয় না :

বিধাতারে না দোষী আমি
কপাল দোষ আমার।
দিবস রজনী আমার
রাজা, সমান অইন্ধকার—

নিজের বিড়ম্বিত জীবন-কথা বলতে গিয়ে রাজকুমার বলেছে :

কোকিলায় দিয়াছে জনম
মোরে কাকে ত পুষিল।
শিশু কালে নিদয়া কাকে
মোর চক্ষু কাইড়্যা নিল।।

সে আরও জানিয়েছে :

শিশুকালে মায়ের কোলের ফুল
আইন্যাছে চুরি কোরে।।
দুশ্‌মনে কইরাছে লো কন্যা
আমার অন্ধ দুইটি আখি।

এ হেন রাজকুমারের বাঁশী শুনে এক রাজকন্যা তার প্রেমাসক্ত হয়েছে। রাজাও সহানুভূতিশীল হয়ে অন্ধ রাজকুমারকে প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছেন, রাজৈশ্বর্যভোগের অধিকার দিয়েছেন, আর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন বাঁশী বাজিয়ে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করতে এবং রাজকন্যাকে বাঁশী শেখাতে। রাজকুমার খুশীমনেই সে দায়িত্ব পালন করছিল, কিন্তু যখন বুঝতে পারল রাজকন্যা তার প্রেমে আসক্ত, তখনই সে প্রাসাদ ত্যাগ করে গেছে। সে চায়নি তার বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজকন্যার জীবন নষ্ট হোক। রাজকন্যাকে সে পরামর্শ দিয়েছে :

হিয়ারে না কাটো কন্যা, আপন হাতের লউখে।
দুর্জনিয়া চিন্তারে স্থান নাই সে দেও বুকে।।

যথাসময়ে রাজকন্যার সুপাত্রে বিবাহ হয়েছে। শ্বশুরালয়ে অবস্থানকালে রাজকন্যা দীর্ঘদিন পরে পুনরায় তার পরিচিত বাঁশীর স্বর শুনে অন্ধ রাজকুমারের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাকে গৃহে ফিরে যাবাব পরামর্শ দিয়েও রাজকুমার যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে প্রথমে বাঁশীটি নদীতে বিসর্জন দিয়েছে, তাতেও কন্যার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত না হওয়ায় সে নিজেই জলে ঝাঁপ দিয়েছে, ঝাঁপ দিয়েছে সেই সঙ্গে রাজকন্যাটিও। এইভাবে প্রেমের অমোঘ আকর্ষণে রাজকন্যা তার মূল্যবান জীবন বিসর্জন দিয়েছে। অপরপক্ষে রাজকুমারও রাজকন্যার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। রাজকন্যার অন্ধ রাজকুমারের প্রতি সুগভীর ভালবাসাই তাকেই পতিত্বে বরণ

করতে উৎসাহিত করেছে। সে আন্ধা বন্ধুকে উদ্দেশ করে বলেছে :

চন্দনে মিশায়া পইরা
আমি দেহ করবাম্ শীতল।
সুখে দু:খে করবাম্ তোমারে
আমার দুই নয়ানের কাজল।।
বলুক্ মোরে লোকে মন্দ
আমি কানে না তুলিব।
দুই অঙ্গ ঘুচায়্যা মোরা
বন্ধু, এক অঙ্গ হইব।।
আমার দুই নয়ানে রে বন্ধু,
তুমি দেখিবা সংসার।।
এমুন হইলে ঘুচ্‌বে তোমার
দুই আঙখির আঁধার।।

অপর পক্ষে আন্ধা বন্ধু যখন তার দৃষ্টিশক্তিহীনতা বিষয়ে বলে :

না দেখিলাম আলোর মুখ
আমি জ্ঞানমানে অখ্নি খুলি।
নয়ানেব দিষ্টি বে বিধি
মেইল্যা মাইর্‌ল ধুলি।।
কোন দেশেব নদী লো কন্যা
এই অইন্ধকারে বয়।
আশমানেতে চান্দ সুরুজ্
কেমুন কইরা বয়।।
আলো জানি কেমন লো কন্যা,
কোন গগনে উঠে।
নিরল বায়ে ফুলের কলি
কেমুন কইর‍্যা ফুটে।।
শব্দে শুনি তরুলতা
আমি না দেখি নয়ানে।
বিধাতা কইরাছে অন্ধ
এই জন্ম দুঃখী জনে।।

—তখন তার অসহায়ত্ব আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কোন অপরাধ না করেও বেচারী রাজকুমার যে রাজকীয় সুখভোগ থেকেই শুধু বঞ্চিত হয়নি, বঞ্চিত হয়েছে প্রকৃতির রূপরস সৌন্দর্য আস্বাদনের সুযোগলাভ থেকেও, তার এই করুণ পরিণতি স্বভাবতঃই তার প্রতি পাঠককে সহানুভূতিশীল করে তোলে।

**গীতিকাগুলিতে সচরাচর প্রেমের কাহিনী উপস্থাপিত হয়ে থাকে। প্রেমিকারা সকলেই তাদের অভিলষিত প্রেমিকের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেছে, নিজেদের প্রেমের জন্য তারা চরম কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। কিন্তু আলোচ্য পালায় দেখা গেল প্রাক বিবাহ প্রেম বিবাহোত্তর জীবনেও সমানভাবে নায়িকাকে প্রভাবিত করেছে। এমনকি নায়িকা বিবাহিত জীবনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে অন্ধ প্রেমিকের কারণে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে।**

## বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা

'বাইন্যা বউ লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা'র কাহিনী অংশ অতিশয় দুর্বল। সচরাচর গীতিকায় যে নায়ক নায়িকার প্রেমের বিষয় উল্লিখিত হতে দেখা যায়, এখানে তা অনুপস্থিত। এক বণিকের বাণিজ্যে গিয়ে সলিল সমাধি ঘটল। বণিকের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তার পরিবার চরম আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হল। শেষপর্যন্ত বণিকের ডিঙ্গা থেকে ভেসে আসা লক্ষ্মীর ঝাঁপি পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করল, বণিক পুত্র পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাণিজ্য শুরু করল। বণিক পত্নীর স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পালার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

কাহিনী অংশের দৌর্বল্য কিংবা চরিত্র চিত্রণের তেমন অবকাশ না থাকলেও সমসাময়িক সমাজ জীবনের জীবন্ত দলিল হিসাবেই পালাটির গুরুত্ব স্বীকার্য। বাঙ্গালী এক সময়ে যে নৌবাণিজ্যে বিশেষ পটু ছিল তার ইঙ্গিত পালাটিতে সুস্পষ্ট। নৌবাণিজ্যের প্রস্তুতি, যাত্রারম্ভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রীতি-নীতি ইত্যাদি বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে :

> বৈশাক মাস শুভদিন তিথি যে অক্ষয়া।
> সদাইগর বাইন্যা যাইব শুভযাত্রা যে করিয়া।।

নৌবাণিজ্য যাত্রার পক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি শুভদিন বলে বিবেচিত হত। বর্ণিত হয়েছে লক্ষ্মীর ঝাঁপির প্রসঙ্গ :

> গণেশাদি দেবতা সব পূজিয়া যতনে।
> লক্ষ্মীর ঝাঁপি তুলে ডিঙ্গায় অতি শুদ্ধ মনে।।
> মধুকর ডিঙ্গায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি ত তুলিয়া।
> বেসাতি তুলিল বাইন্যা সপ্ত ডিঙ্গায় ভরিয়া।।

বাণিজ্য যাত্রার সময় বণিকেরা সঙ্গে করে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে যেতেন লক্ষ্মীর শুভাশীর্বাদ লাভে বাণিজ্য যাত্রাকে সার্থকতায় মণ্ডিত করতে।

বণিক পত্নী সওদাগরের ডিঙ্গায় নানাবিধ দ্রব্যাদির ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে, কেননা :

> সাইগরের বুকে ডিঙ্গা হাট-বাজার নাই।
> শাগ তরকারী ফল মূল পন্থে নাই ত পাই।।

তাই সওদাগরের জন্য তার পত্নী সংগ্রহ করে দিয়েছে :

হুড়ুম, চিড়া, খৈ, উপ্‌ড়া, নাইরকলের নাড়ু।
ডাল বড়ি সজ্-মশলা আর চাইল সরু।।
নানান রকম কাসুন্দি আর মোরব্বা আচার।

পালায় উল্লিখিত হয়েছে চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে নীলপূজার কথা, সেকালের বহুল পরিচিতি 'অগ্নি পাটের শাড়ী', মহাষ্টমীর সন্ধিপূজায় বক্ষের রক্ত দিয়ে পূজা করার মানসিক, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, বাস্তুপূজা তৎসহ কালামানিক দক্ষিণ রায়ের পূজার্চনার কথা :

পৌষমাসে পৌষ পার্বণ আর বাস্তুপূজা।
কালামাণিক দক্ষিণ রায় পৌষ দেবতার রাজা।।

এককালে দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের রাজা দক্ষিণ রায় ও রাজা মাণিক রায় বাংলাদেশের নদীপথ ও বঙ্গোপসাগর থেকে জলদস্যুদের বিতাড়িত করে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। এখানে তারই ইঙ্গিত রয়েছে। দক্ষিণ রায় রূপান্তরিত হন বনের দেবতাতে :

শুন ঠাকুর দক্ষিণ রায়, তুমি বনের দেবতা।
বৈদেশে দুশমনের মধ্যে তুমি হইও ত্রাতা।।

পালাটিতে বর্ণিত হয়েছে 'ভরা পূজা'র প্রসঙ্গ :

নবমী পূজা শুভক্ষণে ঠাকুর ভরা পূজা করিল।
পূজা শেষে বাইন্যার পোলা ভরা মস্তকে তুলিল।।
ঝারি হস্তে কন্যায় দিল পন্থে জলের ছিটা।
বড়ো ঘরে উইঠ্‌ল ভরা কইরা কত ঘটা।।

'ভরা' অর্থ হল মাল বোঝাই বড়ো নৌকা। সে যুগে পণ্য বোঝাই বৃহৎ ডিঙ্গা যা সমুদ্রযাত্রায় ব্যবহৃত হত তাই পরিচিত ছিল 'ভরা' নামে। কিন্তু 'ভরা তোলা' বলতে বোঝান হত বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে প্রত্যাগত বণিকের ডিঙ্গাপূর্ণ পণ্য সামগ্রী লক্ষ্মীর ঝাঁপি ও ব্যবসা বিষয়ক হিসাবের খাতাপত্র। দুর্গোৎসবে নবমীর পূজা শেষে ভরা তোলা উৎসব অনুষ্ঠিত হত। 'একখানা কাঠের বড়ো বারকোশের উপরে একখানা খেলনা নৌকা বসাইয়া সেই নৌকার আগা-গলুই পাছা-গলুইতে সিন্দুর চন্দনের ফোঁটা ও আশীর্বাদী ধান-দূর্বা দিয়া তাহার উপরে ধান, কড়ি, টাকা পয়সা ও সোনা রুপার কুচি ঢালিয়া দেওয়া হয়। সেই ধান ও অন্যান্য জিনিযগুলির উপরে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বা লক্ষ্মীর কৌটা বসাইয়া লাল কাপড়ে ঢাকিয়া ভরা লক্ষ্মীর পূজা হয়। পূজা শেষে গৃহকর্তা ও তাঁহার স্ত্রী গাঁটছড়া বাঁধিয়া কুল প্রথানুযায়ী মণ্ডপ হইতে ভরা অন্দরমহলের প্রধান ঘরে নিয়ে যান। গমনপথে কুমারী কন্যা ঝারি হইতে জলধারা দেয ও পুরোহিত ঘণ্টা বাজাইয়া শাস্ত্রীয় মঙ্গলাচরণ মন্ত্রপাঠ করেন।'

পালাটিতে যে রন্ধন তালিকা প্রদত্ত হয়েছে, তা থেকে বাঙ্গালীর রসনা তৃপ্তিকর খাদ্যগুলির যেমন পরিচয় মেলে, তেমনি ভোজন রসিক বাঙ্গালীকে সহজে চেনা যায়।

দীর্ঘদিনের জন্য বণিক বাণিজ্যযাত্রা করছে, তাই বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে বণিকপত্নী স্বামীর জন্য নানাবিধ উপাদেয় আহার্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করেছে :

ডাইল রান্ধিল ডালনা রান্ধিল শাক সুক্তা যত।
কুমড়ার বেসসরী রান্ধিল ভাজাভুজি কত।।
রউ মাছে রান্ধিল বউ দিয়া পাঁচ মশলা বাঁটা।
টাটকা ইলসা মাছ রান্ধে কাঞ্চা মরিচ কাটা।।
বোয়াল মাছে আদা বাঁটা ঘণ্ট করে ভালা।
নয়া জলের ফুল চাঁইফ্‌লা চচ্চড়ি রসালা।।
মাছের মুড়ার মুড়িঘণ্ট ইলসা গাদা ভাজা।
বাইলা মাছের অম্বল রান্ধন অতি সোজা।।
বড়ো বড়ো কইমাছ পেটে ডিম্ব ভরা।
বেন্নুন রান্ধিল বউ দিয়া ডাইলের বড়া।।

সাধু সকালে পূজা শেষে যে জলপান করেছে তা থেকে সচ্ছল পরিবারের জলপানের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় :

সাইলা ধানের চিড়া আর গাম্‌ছা বান্ধা দই।
ঘরের গাইয়ের দুধের ক্ষীর বিন্নি ধানের খই।।
মস্ত মস্ত শবরি কলা আর কাশীর চিনি।
তাল গুড়ের উপড়্যার সাথে ঘোলের মাঠানি।।
নাইরকল কুড়ায়্যা দিছে হুড়ুমের সাথে।
পাত্‌ ক্ষীর কইরা দিছে হুড়ুমের পাতে।।

নানাবিধ ধর্মীয় রীতিনীতি, সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত সংস্কার ইত্যাদিরও উল্লেখ লক্ষণীয়। ভাদ্রমাসে ভাদুই ষষ্ঠীতে কলাগাছের খোলের নৌকায় প্রবাসী স্বজনের উদ্দেশে ক্ষীর পিঠা ভাসানের রীতি প্রচলিত ছিল :

ভাদ্দরে ভাদুই ষষ্টি
কলা-পাইট্যার নায়।
বৈদেশী স্বজনের লাইগ্যা
ক্ষীরপিঠা ভাসায়।।

শত দারিদ্র্য সত্ত্বেও বণিক ভার্যা ক্ষীরপিঠা ভাসিয়েছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে :

এত দুঃখের মাঝে বউ ভাদুই ষষ্ঠীর দিনে।
সাত গোটা পাইটার ডিঙ্গা ভাসায় গিয়া গাঙ্গে।।

পথিমধ্যে শূন্য কলসীদর্শন, হাঁড়িচাচা পাখীর নৃত্য, গৃহের সমীপে কাকের ডাক, গোয়ালে গরুর ডাক, বনমধ্যে শিয়ালের ডাক ইত্যাদিকে কুলক্ষণ বলে গণ্য করার রীতি ছিল।

**বণিকপত্নী**

বণিক পত্নীকে রক্তমাংসের মানবী করে কবি চিত্রিত করেছেন। সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে বিভিন্ন অশুভ লক্ষণ দেখে বেনে বউ খুবই ভেঙ্গে পড়েছে এবং স্বামীকে বাণিজ্যযাত্রা থেকে বিবত থাকতে অনুরোধ করেছে। জানিয়েছে তার বিলাসিতার প্রয়োজন নেই, শুধু এয়োস্ত্রী হয়ে বাঁচার ইচ্ছা তার :

সোনাদানা না চাই গো আমি
না চাই অগ্নিপাটের শাড়ী।
সিথার সিন্দুর বজায় থাউক
আমি এই পারথনা করি।

স্বামী তার ইচ্ছাপূরণ করেনি, বাণিজ্যে যাত্রা করেছে। হতভাগিনী পতির অমঙ্গল আশংকায় দেবতার কাছে মানসিক করেছে, দেবতাদের আশীর্বাদ যাজ্ঞা করেছে আর দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করেছে। শেযপর্যন্ত বেনেবউয়ের অমঙ্গল আশংকা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সওদাগরের সলিল সমাধি ঘটেছে। দীর্ঘ বার বৎসর চরম আর্থিক অনটনে পড়তে হয়েছে তাকে, যতই দুঃখ দারিদ্র্য এবং স্বামীর প্রত্যাগমনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই সে অধিক পরিমাণে দেবতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উপবাসে কেটেছে সমগ্র পরিবারের, সূতা কেটে ধান ভেনে কোনক্রমে তাকে সংসার প্রতিপালন কবতে হয়েছে কিন্তু তথাপি পুত্রকে প্রতিবেশীদের পরামর্শমত গঞ্জে চাকুরীর জন্য পাঠায়নি। পারিবারিক মর্যাদাবোধে লেগেছে তার! কেননা :

সাই সদাইগরের পুত্র হয্যা নোকরী নাই ত সুঝে।।

তাছাড়া শত অভাবেও সে প্রচলিত আচারগুলি ঠিক ঠিক পালন করেছে। আধপেটা খেয়েও ক্ষীর সন্দেশ করেছে প্রবাসী আত্মীয়দের মঙ্গল কামনায় ভাদুই ষষ্ঠীর দিনে তা ভাসাবার জন্য।

**সওদাগর**

সওদাগরকে দেখান হয়েছে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন পুরুষরূপে। স্ত্রী তাকে বাণিজ্যে যেতে দিতে না চাইলে বণিক বলেছে :

আমি যদি বাণিজ্যে না যাই
তবে লোকে কইব কি।।
সাই-সদাগরের পোলা লো আমি
আমার বাণিজ্য বৈদেশে।

সওদাগরের কর্তব্যবোধের পরিচয় মেলে বাণিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীকে প্রদত্ত উপদেশাবলীতে :

অতিথ বরাহ্মণ গিরে আইলে
যতনে সেবিবা।।

দুঃখী কাঙ্গালী ভিক্ষার লাইগ্যা
আইব তোমার দোয়ারে।
খাইলা হাতে ফিইরা না যায়
তুমি দেখিবা সবারে।।

* * *

হাইল্যা চাকর দাস দাসী
রাইখো খুশীতে ভরিয়া।।

এমনকি গৃহের পালিত পশুপক্ষীগুলিও যেন কোন দুঃখ না পায়, সে বিষয়েও দৃষ্টিদানের কথা বলে গেছে সে।

পালাটিতে সওদাগর, সওদাগর পত্নী কারুব কোন নাম উল্লিখিত হয়নি, এমনকি নির্দিষ্টভাবে কোন স্থানের প্রসঙ্গও বর্ণিত হতে দেখা যায়নি। এই কারণে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মশাইয়ের মনে হয়েছে, "পালাটির মূলে কোনো ঘটনা নাই, তৎকালে বাঙ্গালী বণিক সমাজের ব্যবসায়ী সততা, দুর্জয় সাহস, দেবভক্তি ও পারিবারিক চিত্র লইয়া কবি এই পালা রচনা করিয়াছিলেন।"

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অন্তে সওদাগরের নৌকায় লক্ষ্মীর ঝাঁপির প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গটি অলৌকিকতা মণ্ডিত। সচরাচর আমাদের গীতিকাগুলিকে অলৌকিকতা মুক্ত দেখতে পাওয়া যায়। সেদিক দিয়েও পালাটি একটি বিরল ব্যতিক্রমরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে স্বীকার করতে হয়।

## মলয়া কন্যার পালা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে 'মলয়া কন্যার পালা'টি। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ধিতাকারে পালাটি সংকলিত হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র পালাটির রচয়িতা রূপে কঙ্ককে অভিহিত করেছেন। কেননা পালাটির অষ্টম অধ্যায়ে মলয়ার বারোমাসীতে বেশ কয়েকবার কঙ্কের উল্লেখ রয়েছে—। কমপক্ষে আটবার। যেমন ·

ক. কঙ্ক কয় না ছাইড় কইন্যা পরাণের আশ।।

খ. কঙ্ক কয়, 'না ছাইড় কইন্যা,
তুমি জীবনের আশ।'

গ. কঙ্ক কহে, 'কইন্যা লো,
তুমি না ছাইড় তার আশ।'

ঘ. কঙ্ক কয়, 'আলো কইন্যা,
তুমি না হইও পাগলিনী।'

ঙ. কঙ্ক কয়, 'কইন্যা, তুমি না হইও উতলা।'

চ. কঙ্ক কয়, 'না কাইন্দ কইন্যা, তুমি স্থির কর মন।
সুমুখে আইসাছে তোমার মাস যে আগণ।।'

ছ. দুষ্কিনীর দুষ্কের কপাল কাইন্দ্যা কঙ্ক কয়
সাওরে বিছায়া শয্যা কইন্যা, নীহারে কি ভয়।।

জ. কঙ্ক কয় ; শুন কইন্যা, তুমি মনে কব বল।
দুষ্কের নিশি কাইট্যা যাইব পাইবা সুফল।। ইত্যাদি।

কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্র দীনেশচন্দ্রের বক্তব্যকে স্বীকার করে নেন নি। তাঁর মতে, 'মলয়া পালার অন্তর্গত বারোমাসী গান কঙ্কের পূর্ববর্তী রচনা।' ক্ষিতীশচন্দ্রের বক্তব্য, 'ষোলো সতর বৎসর বয়সে মলয়ার বারোমাসীর মত আদি রসাত্মক গান রচনা করা সম্ভব কিনা তাহাও বিবেচ্য।' সর্বোপরি তাঁর যুক্তি হল, 'ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ—এই তিনমাসের গানে কোনো ভণিতা নাই, জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে অবশিষ্ট নয় মাসের মধ্যে পাঁচমাসের গানে কঙ্কের ভণিতা পাওয়া যায়। পাঁচটি ভণিতায়ই দেখা যায় কঙ্ক মলয়াকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, বাঁচিয়া থাকিলে বন্ধুর সঙ্গে মিলন হইবে। ইহাতে কঙ্ক যদি এই পালার রচয়িতা হইতেন, তবে মলয়ার সঙ্গে বসন্তকুমারে.. মিলনান্তে পালা শেষ হইত।' ক্ষিতীশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত হল, 'পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে রচিত কাব্যের কবি নাম ভণিতা দৃষ্টে অনুপ্রাণিত হইয়া কঙ্ক তাঁহার অভ্যস্ত মলয়ার বারোমাসী গানের পাঁচটির শেষে নিজেব নাম ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন।'

একথা ঠিকই যে 'লীলা ও কঙ্ক' পালাতে বর্ণিত হয়েছে কঙ্ক পীরের কাছে 'মলয়ার বারোমাসী' শুনিয়েছিল এবং ঐ পালা অনুযায়ী কঙ্কের বয়স তেমন কিছু ছিল না, মলয়ার বারোমাসী রচনার প্রেক্ষাপটে কিন্তু আলোচ্য পালায় কঙ্কের ভণিতা পাঁচবার নয়, অন্ততঃপক্ষে আটবার লক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অন্যের রচনায় কঙ্ক নিজের নামটুকু যুক্ত করে দিযেছেন ভণিতা স্বরূপ, যুক্তির দিক দিয়ে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। তৃতীয়ত, যেহেতু কঙ্ক মলয়াকে বারংবার আশ্বস্ত করেছে যে তার স্বামীর সঙ্গে তার পুনরায় মিলন ঘটবে, কিন্তু বাস্তবে যেহেতু তা ঘটে নি, অতএব তা কখনই কঙ্কের রচনা হতে পারে না, এক্ষেত্রেও যুক্তি খুব বলিষ্ঠ নয়। কেননা পালার প্রয়োজনে মলয়াকে যে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন, সেই পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে আশ্বাস বাণী উচ্চারিত হয়ে থাকতে পারে। মনোকষ্টে যদি বনমধ্যে নির্বাসিতা মলয়া সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করত, তবে কাহিনী অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট হত। পরবর্তীকালে কোনো কঙ্ক নামীয় কবি কর্তৃক আলোচ্য পালাটি রচিত হয়ে থাকতে পারে। অথবা 'লীলা কঙ্ক' পালায় উল্লিখিত কঙ্ক পরবর্তীকালে মলয়ার বারমাসীকে পরিমার্জিত করে রচনা করে থাকতে পারে। কেননা পীরকে সে কি বারোমাসী শোনাত তার আনুপূর্বিক বিবরণ আমাদের অজানা।

এইবার আমরা পালাটির সাধারণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই পালাটির সমাপ্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সমাপ্তিটি অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট। হাইর্যা ডাকাত বন্দী হয়ে রাজসভায় আনীত হল, সেই অন্যান্য রাজাদের সাক্ষাতে

সব বিবরণ জানাবার কথা বলেছিল। সে রাজাদের নির্বুদ্ধিতাকে রূঢ়ভাবে সমালোচনা করেছে, তার ডাকাতে রূপান্তরিত হবার করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছে, বর্ণনা করেছে মলয়াকে অপহরণ করে মানুষ করার কাহিনী, বলেছে বলাই রাজার ভূমিকার কথা। কিন্তু কোনমতেই মলয়ার সংবাদ আর প্রকাশ না করার দৃঢ়তায় তার যত না অপত্যস্নেহ প্রকাশিত হয়েছে, তদপেক্ষা প্রকাশ পেয়েছে তার নির্বুদ্ধিতা এবং এক গুঁয়েমি। কেননা সে যখন জেনেছে মলয়ার স্বামী মলয়ার সন্ধানে বেরিয়েছে, তখন তার হাতে মলয়াকে তুলে দেওয়াতেই তার অপত্য স্নেহের উপযুক্ত কাজ হত। যেখানে সে বন্দী হয়ে রইল, সেখানে মলয়ার পক্ষে সুখাতিশয্যে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমাদের গীতিকাগুলির করুণ পরিণতির আদর্শে যদি আলোচ্য গীতিকাটিকেও করুণ রসাত্মক করতে হত, তবে সেক্ষেত্রেও পরিণতি অন্যবিধ হলেই শ্রেয়ঃ ছিল।

'মহুয়া'র মত মলয়া শৈশবেই ডাকাত কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিল। হাইর‍্যা মলয়াকে ভালবাসত খুবই। তারপর রাজকুমার বসন্তকুমার বনে তাকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মলয়াকে বিবাহ করে। রাজা বলাইয়ের পুত্রের নজর ছিল মলয়ার প্রতি, কিন্তু মলয়াকে পুত্রবধূরূপে লাভ না করায় বলাইয়ের অসন্তোষ ছিল। হাইর‍্যা এই সুযোগ গ্রহণ করে বলাইয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে আকস্মিকভাবে সদ্য বিবাহিত বসন্তকুমার ও বরযাত্রীদের আক্রমণ করে বসে। মলয়ার কারণে সেই আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যায়। এদিকে বসন্তকুমারের অনুপস্থিতির সুযোগে প্রজাদের অসন্তোষ এবং রাজা বলাইয়ের ষড়যন্ত্রে হতভাগিনী মলয়া শ্বশুরালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে চরম কষ্টে পড়ে। দীর্ঘ তিন বৎসর কাল পরে বসন্তকুমার এসে হাইর‍্যাকে বন্দী করে বটে কিন্তু মলয়ার সন্ধানলাভে ব্যর্থ হয়। হুমরা বেদের সঙ্গে হাইর‍্যার নানা বিষয়ে মিল। সেও শুধু ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়াকে চুরি করেনি, তার দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে। এখানেও হাইর‍্যা সেই ব্যবস্থাই করেছে বলা যেতে পারে। হুমরার মত তাকেও দেখা গেছে প্রতিহিংসা পরায়ণরূপে। হুমরার যেমন মহুয়ার জন্য ছিল সুগভীর অপত্য স্নেহ, মলয়ার জন্য হাইর‍্যারও ছিল একই রূপ অপত্য স্নেহ।

পালাটির বন্দনাংশে নানা দেব-দেবীর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হলেও জোর দেওয়া হয়েছে সত্যনারায়ণ এবং দেবী সরস্বতীর ওপর। হিন্দু ও মুসলমান উভয়শ্রেণীর শ্রোতৃমণ্ডলীকেও সেলাম জানিয়েছেন কবি। আখ্যানে কবি নানাক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ততা ধর্মকে রক্ষা করেছেন। যেমন হাইর‍্যার হেফাজতে নয় বৎসরে বালিকা মলয়া এসেছিল, তারপর বনে তার দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল অতিবাহিত হয়েছে। এই তথ্য আমরা পেয়েছি বসন্তকুমারকে নিজের দুঃখময় জীবন বৃত্তান্ত যখন মলয়া বর্ণনা করেছিল সেই সূত্রে। মলয়া অপহৃতা হবার পরে তার মাতা কিংবা পরবর্তীকালে তার পিতার কোনো প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়নি। এমনকি দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে হারানো কন্যা গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, অথচ কবি মাত্র ছয়টি পংক্তিতে তার প্রত্যাবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাকে সীমিত রেখেছেন। মলয়ার বিবাহের বর্ণনাও অতিশয় সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত। রাজকুমার বসন্তের তিন বৎসরের বিদেশ ভ্রমণ

সংক্রান্ত কোনো তথ্যাদিও উল্লিখিত হয়নি।

পালাটির একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হাইর‍্যার ডাকাত হওয়ার বিবরণ দান। এই বিবরণ যেমন করুণ, তেমনি বাস্তবরসে সমৃদ্ধ। বিশেষত: সমাজের তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর মানুষের স্বরূপ নগ্নভাবে প্রকটিত হয়েছে এতে :

হাইলার ঘরের পুত্র আমি হাইলা বাপ মাও।
হাল গরু জমিন আছিল ঘাটে বান্ধা নাও।।
পাঁচ বচ্ছর বয়সের কালে বাপ মইরা গেল।
দেনার দায়ে মহাজনে জমা-জমিন লইল।।
রাজার কারকুন লইল ঘরের মালামাল।
জমিন নাই বলদ নাই কে বাইব হাল।।

ডাকাত নরসিং তার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়েই তাকে ডাকাত করে তুলেছিল। তাই হাইর‍্যা যখন সামাজিক মানুষ সম্পর্কে বিষোদ্গার করে বলেছে :

বনের পশু পথের কুকুর
তারাও বহুত ভালা।
সোমাজী মাইন্ষের ভালা মন্দ
কেবল ধনদৌলতের খেলা।

কিংবা নরসিং বলে,

ধন দৌলত না থাকিলে
আপন হয় রে পর।।

তখন তা বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত অভিব্যক্তি বলেই মেনে নিতে হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—রাজাদের যেভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে পালাটিতে। সমবেত রাজন্যবর্গকে হাইর‍্যা তীব্র ভর্ৎসনা করেছে, কেননা তারা কেউই বলাই রাজার ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করেন নি, অসহায় নির্দোষ মলয়াকে অন্যায়ভাবে গৃহছাড়া করেছিলেন :

দুশ্মন বলাই রাজার পরামিশ শুনিলা।
পরীক্ষা কইবা নির্দুষী কইন্যারে বনবাসে দিলা।।
কি কইবাম তোমাগরে মুরুখ্ রাজার দল।
সিঙ্গাসনে বইসা বিচার করে বুদ্ধির ছাগল।।

কবি একটি ক্ষেত্রে প্রবাদের অনবদ্য ব্যবহার করেছেন। পৌষমাসে শীতের প্রকোপের কথা ভেবে বনবাসিনী মলযা চিন্তিত হলে কবি তাকে উদ্দেশ করে বলেছেন :

সাওরে বিছায়া শয্যা কইন্যা, নীহারে কি ভয়।।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিত্ব শক্তির পরিচয় মেলে। আষাঢ় মাসের নদীর বর্ণনা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

নদীতে যইবন আইসাছে
নদী কূল ভাইঙ্গা চলে।

**বসন্ত সমাগমে বনবাসিনী পতিহারা মলয়ার খেদোক্তিতে বলা হয়েছে :**

যইবনের বনে মোর
লাইগ্‌ল রে আগুন।।

বৈশাখ মাসের সূর্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে :

আগুন মাখিয়া অঙ্গে
ভানুর উদয়।।

**কঙ্ক যেভাবে হতভাগিনী মলয়াকে সান্ত্বনা দিয়েছে এবং তাকে দুঃখ ভোগের মাধ্যমে সুখলাভের গোপন রহস্যের কথা জানিয়েছে, তাতে তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে মনে হয় :**

দুক্ষেরে করিয়া লও আপন গলার মালা।।
সুখ যদি পাইতে চাও কর দুক্ষের ভজনা।

**মলয়া**

চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মলয়ার। আমরা বিনা অপরাধে দুঃখভোগের প্রসঙ্গে প্রায়শই সীতার উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু মলয়া সীতার তুলনায় অধিকতর হতভাগিনী। মাত্র নয় বৎসর বয়সে ডাকাত কর্তৃক অপহৃতা হয়ে পিতৃমাতৃ স্নেহচ্ছায়া থেকে সে বঞ্চিতা। এরপর যদিই বা রাজকুমার বসন্ত তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ায় তার সুখী দাম্পত্য জীবনভোগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু তার স্থায়িত্ব এক বৎসরের বেশি হয় না। কেননা তারপরই প্রজাদের অসন্তোষের কথা কানে যেতে মলয়ার চরিত্র সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। বলাই রাজা ও অন্যান্যদের পরামর্শে মলয়ার চরিত্রের পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরিণামে তাকে নির্বাসিতা হতে হয়। সীতা তবু বনবাসে বাল্মীকিকে সহায়করূপে পেয়েছিলেন, কিন্তু মলয়া কিছুই পায়নি। খাওয়া পরা, বাসস্থান সব ব্যাপারেই তাকে চরম দুঃখ পেতে হয়েছে। শেষে পুনরায় ডাকাত পিতা হাইর্‌যার খপ্পরে পড়েছে সে।

অন্ততঃ একবারের জন্য হলেও তাঁকে বীরাঙ্গনারূপে দেখা গেছে। হাইর্‌যার দলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সে যেভাবে তাদের মোকাবিলা করেছে তা আমাদের বিস্মিত করে :

সুয়ামীর বিপদ দেইখ্যা মলয়া সোন্দরী।
তাঞ্জামের থুন্ বাইর হইল হস্তে কিরিচ ধরি।।
কিরিচ চালায় কইন্যা যেমুন কুমারের চাক।
ডাকাইতের দলে হইল বিষম বিপাক।।

**বসন্তকুমার**

বসন্তকুমার রাজকুমার। শিশুসুলভ সারল্য তার মধ্যে। মায়ের কাছ থেকে বনমধ্যে পরীরা আছে শুনে সে বনে শিকারের নামে গিয়েছিল পরী দেখতে, কিন্তু পরিবর্তে

দেখতে পেল মলয়াকে। তার কাছে তার জীবনের করুণ ইতিহাস শুনে সে তাকে পিত্রালয়ে পৌঁছে দিয়েছে এবং প্রতিজ্ঞা করেছে বিবাহ করার। বসন্তকুমার তার কথাও রেখেছে। একটি বৎসর ব্যাপী সে মলয়াকে স্বর্গসুখে রেখেছিল। তার অনুপস্থিতিতে মলয়াকে বনবাসে বিসর্জন দেওয়া হলে সে ফিরে তা জেনেই মলয়ার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে এবং ডাকাত হাইর‍্যাকে বন্দী করেছে। কিন্তু বেচারীর আর মলয়ার সন্ধান লাভ ঘটেছিল কিনা জানা যায়নি। মলয়ার সন্ধানে সে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে রাজ্যসুখ ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিল। মলয়ার প্রতি তার প্রেম কত অকপট ছিল, এ থেকেই তার প্রমাণ মেলে।

**হাইর‍্যা**

হাইর‍্যা ডাকাত। কিন্তু তার এ জীবন হওয়ার কথা ছিল না। অন্য পাঁচজন সুখী গৃহস্থের মত জীবনলাভের কথা ছিল তারও। তার পিতা ছিল চাষী। তাদের গরু ছিল, হাল ছিল, ছিল জমি। এমনকি নৌকাও ছিল তাদের। কিন্তু ভাগ্যের বিপর্যয়ে তার পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দেনার দায়ে মহাজন তাদের জমিজমা সব আত্মসাৎ করে নেয়। রাজার কারকুন এরপর তাদের গৃহের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করে নেয়। দশ বৎসর বয়সে তার মাতৃবিয়োগ হলে সে একেবারে অনাথ হয়ে পড়ে। কেউ তাকে আশ্রয় দেয় নি, একমুঠো খেতেও দেয় নি। পথের দুটি কুকুর ছিল তার সঙ্গী। দীর্ঘ তিনটি বৎসর চরম অভাবে দুঃখে ও অনিশ্চয়তায় অতিবাহিত করার পর সে নরসিং ডাকাতের দলে নাম লেখায়। নরসিংয়ের মৃত্যুর পর সেই হয় সর্দার। ডাকাতির সূত্রে সে অপহরণ করে নয় বৎসরের বালিকা মলয়াকে। গভীর অপত্য স্নেহ ছিল তার মলয়ার প্রতি। সেই মলয়া যখন বসন্তকুমারের সঙ্গে হাইল্যার বন থেকে পালিয়ে এল, তখন মলয়ার জন্য কেঁদে সারা হয়েছে সে। শেষে নববঙ্গপুরে গিয়ে মলয়ার হদিস পেয়েছে। বলাই রাজার সঙ্গে চক্রান্ত করে বরবেশী বসন্তকুমারকে সে আক্রমণ করে বন্দী করেছে, কিন্তু মলয়ার প্রতিরোধে সব ষড়যন্ত্র তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। ডাকাতি ছেড়ে সে বনবাসী হয়েছে। দুটি বৎসর এইভাবে অতিবাহিত করেছে, কিন্তু কিছুতেই মলয়াকে বিস্মৃত হতে পারেনি। ঘটনাক্রমে মলয়ার সঙ্গে আবার বনে দেখা হয়েছে। তার দুর্দশার কথা শুনে প্রতিহিংসার অনল জ্বলে উঠেছে তার হৃদয়ে। যাদের জন্য তার প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা মলয়ার এমন দুর্গতি, সে তাদের কাউকে ছাড়বে না। এইভাবেই প্রথমে সে হত্যা করেছে বলাই রাজাকে, যেহেতু মলয়ার দুর্গতির মূলে সেই ছিল প্রধান ষড়যন্ত্রকারী। বন্দী অবস্থাতেও সে উপস্থিত রাজাদের বিচার শক্তিকে চরমভাবে ধিক্কার জানিয়েছে। তাদের মূর্খ এবং 'বুদ্ধির ছাগল' বলতেও সে দ্বিধা করেনি। সে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছে শত চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে মলয়ার কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না। বন্দীশালে তাকে বন্দী করে, শিকলে আবদ্ধ করে এবং বক্ষে দশমনি প্রস্তর চাপিয়েও মলয়া সম্পর্কে কোনো তথ্য তার মুখ থেকে বের করা যায় নি। আপাত

নির্মম ও নির্দয় শরীরে তার যে অপত্য স্নেহ ফল্গুধারায় প্রবাহিত ছিল, আমরা সেই পরিচয় পেয়েই মুগ্ধ হই।

### সোণা রায়ের জন্ম

ধারাবাহিকতাহীন, বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ রচনা হল 'সোণা রায়ের জন্ম'। পীরের বরে জন্ম হল সোনা রায়ের। সোনার বর্ণের অধিকারী বলে নাম হল সোনা রায় :

সোণা রায় নাম রাখল সোণার বরণ।

পালাটিতে যেমন ছড়ার প্রভাব, কাহিনীতেও তেমনি ছড়ার অসংলগ্নতা উপস্থিত। যেমন :

গোয়াল গোয়াল গোয়াল মামী দধি দেও মোরে।
গোষ্ঠের গাভী বাথান গেছে দুগ্ধ নাই মোর ঘরে।।
গোয়াল গোয়াল মামী দুগ্ধ দাও আমারে।
চান রায়ের হুকুম হইছে পুকুর ভরিবারে।।
এক পুকুর ভরিয়া দিছি দধি দুগ্ধ দিয়া।
সোমবার রাত্তির শেষে তান জন্মিছে এক ছাও নিয়া।।

ধাইমার সঙ্গে সোনা রায়ের মায়ের কথোপকথনেও ছড়ার আমেজ লক্ষিত হয় :

তোমার ছাওয়াল তুমি লও মা আমায় দিবা কি?
অন্ন খাওযার সুবর্ণ থালা তোমায় দিয়াছি।
তোমার ছাওয়াল তুমি নিলা আমায় দিলা কি?
পান খাওয়ার সোণার বাটা তোমায় দিয়াছি।
রাজার ঘরত ছাওয়াল হল তুমি রাজার ঝি।
লেহাতি গবীবি আমায় দিবা কি?

আরও কিছু নিদর্শন, যেখানে ছড়ার আমেজ :

চান্দের কোলে শালম গাছটি বায় হাল হাল করে।
সেই না গাছের তলায় বসি বুড়ী সুতা কাটে।।
ওলো বুড়ী তোর সুতার কিবা কাপড বুনে।
আমার সুতা উড়িয়া পড়িব জমিনে।।

এইবার ছড়ার মত অসংলগ্নতার পরিচয় জ্ঞাপক কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল। সোনা রায়ের বিবাহ প্রসঙ্গে সমস্যা হয়ে উঠেছে বিবাহের প্রয়োজনীয় ফুল নিয়ে :

আসমানেতে ছিল ফুল রে পড়িল ঝরিয়া।
সেও ফুলে হলো নারে সোণা রায়ের বিয়া।।
আরবার যায় মালি ফুলের লাগিয়া।
আনয়ে বাগের ফুল মাল্‌তি ভরিয়া।।
এত ফুলে না হইল রে সোণা রায়ের বিয়া।

আনল পদ্মর ফুল পদরী ভরিয়া।।
সেও ফুলে হইল না রে সোণা রায়ের বিয়া।

একই শব্দের পুনরাবৃত্তি এই সব অংশে লক্ষণীয়। সোনা রায়ের মা খুব চতুরা, তার চাতুর্যের প্রমাণ :

সোণা রায়ের মাও রে সে বড় চতুব।
চালেতে শুকায়ে রাখে চাম্পার ফুল।।

ছড়া ব্যতীত অন্যত্র কি এতাদৃশ চাতুর্যের পরিচয় লভ্য?

আখ্যানে হঠাৎ করে সোনা রায়ের প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে এবং তলাপাত্র নামীয় এক ব্রাহ্মণ এবং খাজা নামে এক ব্রাহ্মণের সোনা রায় নামে এক পুত্র সন্তানের জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এরপরই উত্থাপিত হয়েছে খাজনা পরিশোধ জনিত সমস্যার বিবরণ :

মায়ত ছাওয়াল লইয়া জঙ্গলায় পালায়।
খাজানার কড়ি নাই কি হবে উপায়।
কোলের ছাওয়াল বিক্রী করব কেউ না কিনতে চায়।

ভূস্বামী, সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাব প্রতিভূদের অম ়াবিক শোষণেব ইঙ্গিতবাহী নিম্নোধৃত অংশটি :

বাসুদেব কয় ওগো ভগবানের ঝি।
খাজানা দেবার উপায় নাই ভাব বস্যা কি?
এ দেশ ছাড়িয়া চল অন্যদেশে যাই।
জিক্‌কাইর সারিয়া ওই কই করার লস্কর আসে।
ত্বরা কইরা সামালরে ভাই ঘরের যুবা নারী।।
বেটা পুত্র কোলের ছাওয়াল সামাল সকাল করি।
ঘবে দিব বেড়া আগুন কে নিবাইতে পারে।
হাত না বান্ধিয়া ফেলায় সিঙ্গের পাগারে।।

পালাটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে পীরের মাহাত্ম্য :

অপুত্রাব পুত্র হয় রে নির্ধনিয়ার ধন।
অন্ধ ফিরিয়া পায় দুনয়ন।।
আমার এই গাভান পীর যে করিব হেলা।
দুই চক্ষির মণি দিয়া বাড়া তা চেলা।।
ঘরে মরব হালে বলদ বাথানে মরব গাই।
গাভার পীরের লাগ্যা আমরা ছিন্নি কিছু খাই।।
নয়াধানের নয়া চাল দুগ্ধ দুটি দিবা।
ক্ষিরসা লইতে তোমরা পীরের ঘাটে যাবা।।
পীরের ঘাটে গেলে পর চরণ দর্শন পাবা।

## সোনাবিবির পালা

দীনেশচন্দ্র জানিয়েছেন এই পালাটির সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে। পালাটির ছত্রসংখ্যা ৫৫০, কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ৮২টি পংক্তি। ফলে অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট হয়েছে। পালাটির নায়ক মামুদ। প্রকাশিত অংশে নায়কের প্রেমের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। মামুদ তার বিবি সোনার জন্য কত উৎকণ্ঠিত, কত ব্যাকুল তাই বর্ণিত হয়েছে। পাছে সোনাকে মশা দংশন করে, পিঁপড়ের দংশনে তার দেহে চাকা চাকা দাগ হলে মামুদ তার নিজের পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে সোনার অঙ্গ আবৃত করে দেয়। সোনাকে নিয়ে সে কি করবে, তা মামুদ ভেবে পায় না। পাছে সোনার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাই মামুদ কোকিলকে পর্যন্ত ডাকতে নিষেধ করেছে। কিন্তু এহেন সোনা গত প্রাণ মামুদের নৌকাডুবি হল। তার মনে পড়তে লাগল সোনার মুখখানি। মামুদ নিজের প্রাণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশের পবিবর্তে তার বিচ্ছেদে সোনাব কি প্রতিক্রিয়া হবে. সেই চিন্তায় চিন্তান্বিত হল। প্রকাশিত অংশটি মামুদের জবানীতে রচিত।

### চম্পকলতা

চিত্তরঞ্জন দেবেব 'বাংলার লোকগীত কথা'র প্রকাশকাল ১৩৯৩ (১৯৮৬)। ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ মোট এই তিরিশ বছরের মধ্যে উভয় বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত মোট ৭টি গীতিকার সংকলন এটি। সংকলিত গীতিকাগুলির মধ্যে আছে চম্পকলতা, আসমান তারা, ফুলবানু, সোহাগী বাইদ্যানী, সাকিনা বিবি, ক্যাশবতী কইন্যা, রূপধন কইন্যা, রূপবান কইন্যা এবং সতী রুমুনা ঝুমুনার পালা। সংকলিত প্রতিটি পালার বিবরণ প্রথমে গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন, তারপর মূল গীতিকাটি প্রকাশ করেছেন। দুরূহ শব্দগুলির অর্থ নির্দেশ করেছেন এবং গীতিকাগুলি সম্পর্কে সীমিত পরিসরে আলোচনা করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে সংকলিত গীতিকার পাঠান্তরেরও নির্দেশ করেছেন। উল্লিখিত হয়েছে গীতিকাগুলির সংগ্রহক্ষেত্র।

সংকলিত প্রথম গীতিকাটি হল 'চম্পকলতা'। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকা বর্তমান সংকলনের। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গীতিকাটিকে বিস্তাবিত করার অবকাশ থাকলেও রচয়িতা বিশেষ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন সংক্ষিপ্ততাকে আশ্রয় করে। যেমন গীতিকার প্রথমেই কাঞ্চনপুরের রাজা আদিশূর অপুত্রক ছিলেন বলে বর্ণনা করে তারপরই বলা হল :

> 'সেইনা রাজার এক পুত্র যদি হইল,
> আটকুঁড়া নামও তার তবে যে ঘুচিল।

ইচ্ছা করলেই এক্ষেত্রে দৈব সহায়তায় বা কোন সাধুর সহায়তার বিষয় সংযোজিত হতে পারত, সংযোজিত হতে পারত অপুত্রক রাজার লজ্জিত হবার বিস্তারিত বিবরণ; কিংবা রাজকুমার কন্দর্পের শিক্ষালাভের বিবরণকেও অনায়াসে দীর্ঘায়িত করা যেত, কিন্তু এক্ষেত্রেও সংক্ষিপ্ততাকে আশ্রয় করা হয়েছে, বলা হয়েছে :

ওগো এদিগেতে রাজপুত্তুর মুরুক্ষু কিন্তু নয়,
ঘরে বইস্যা গুরুর কাছে লেখে গোণনা সমুদায়।
এইমত পুঁথি পত্তর রাজপুত্তুর কত পইড়্যা যে ফ্যালাইলো,
নাই তার ল্যাখাজোকা কতবা বলিব।

সমগ্র মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে যেখানে ঈশ্বরের একচ্ছত্র আধিপত্য, সেখানে বাংলার গীতিকাগুলিতে মানুষের রাজকীয় আধিপত্য। আলোচ্য গীতিকার দুটি ক্ষেত্রে মাত্র ঈশ্বরের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু দেবতার সক্রিয় ভূমিকা অনুপস্থিত। রাজকুমার কন্দর্পের সাতরাজার ধন মানিকটি চোরে চুরি করে নিলে বেচারী রাজকুমার অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে এবং ঈশ্বরের স্মরণ নিয়েছে :

রাজপুত্র কান্দি কয়　　কোথা তুমি দয়াময়
এ কি বিষম করম লিখা।
আসিলাম বিদ্যাশেতে,　　ঘরে যামু শুধা হাতে
অসময়ে দিও তুমি দেখা।।

চম্পকলতা তার সাত ডাকাত ভাইয়ের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছে কন্দর্পকে হত্যা করতে, এদিকে সে রাজকুমারকে মনেপ্রাণে ভালবেসে ফেলেছে, ফলে ভীষণ দায়ে পড়ে সে স্মরণ নিয়েছে চন্দ্র, সূর্য ও দেবতার, স্বর্গের দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছে :

কুমারের বধের ভাগী কইরো না আমায়।

'চম্পকলতা' গীতিকাটির কেন্দ্রীয় ঘটনা হল চম্পকলতা ও কন্দর্পের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, নানা বিপত্তির পর উভয়ের বাঞ্ছিত মিলন। চম্পকলতা কনকলতার কন্যা, তার পিতা ছিল সওদার। শিশুকালে সে মাতৃহীনা, কৈশোরে পিতৃহীনা। ভায়েরা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে দস্যুতাকে জীবিকা করে। চম্পকলতা জ্যোতিষ শিক্ষা করায় তার ভায়েরা তাকে কাজে লাগায় তাদের দস্যুতায়। চম্পকলতা গণনা করে বলে দেয়, আর সেইমত সাত ভাই শিকার ধরে। বলাবাহুল্য নিজেদের স্বার্থেই তারা তাদের ভগ্নীর বিবাহ দেয় নি। সে দুঃখ করে বলেছে :

'যৈবনে না দিল বিয়া মুই বড় আবাগী।

যে চম্পকলতা গণনার সাহায্যে কন্দর্প যে বহু মূল্যবান সাত রাজার ধন মানিকের অধিকারী, তা জেনে ডাকাত ভাইদের বলে দিয়েছে, শেষপর্যন্ত সেই কন্দর্পকে লাভ করার জন্যই সে ব্যাকুল হয়েছে। অত্যন্ত চমৎকারিত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে কিরূপ বুদ্ধিমত্তা সহকারে সে সাত ভাইয়ের কবল থেকে কন্দর্পকে উদ্ধার করেছে এবং তার বহু অভিলষিত বিবাহিত জীবন আস্বাদনের সুযোগ পেয়েছে। চম্পকলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল কন্দর্পও :

অগো পদ্মের মতন বদন তোমার তাহে জোড়া ভুরু,
কিবা তোমার নরম দ্যাহ্ কলার মত উরু।
চান্দ বরণ তোমার কইন্যা রূপের নাইকো তুলা.

বিদ্যাশী পথিক মুই দ্যাহ নয়ন মেইল্যা।
অগো তেলাকুচার মতন ওষ্ঠ চৌকখে মানিক জ্বলে।
তোমার লগে মিলন অইলে ডুইব্যা মরতাম জ্বলে।
অগো মিষ্ট তোমার মুখের হাসি দন্ত মুকুতা পাতি,
তোমারে না পাইলে আমার ফাটে বুকের ছাতি।

চম্পকলতাও প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হয়েছিল কন্দর্পের প্রতি, তাই তাকে বলতে শোনা গিয়েছে :

'শীঘ্র কর অগ্রজ দস চলগো সত্বর,
উয়াকে আনিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।

আপাতভাবে মনে হবে বুঝিবা কন্দর্প নয়, তার বহু মূল্যবান মানিকটির জন্যেই চম্পকলতার এই আর্তি। পরবর্তীকালে কন্দর্পের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে চম্পকলতার ভাইয়েরা বিপর্যস্ত হলে তার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছে স্বয়ং চম্পকলতা। মিথ্যা করে ভীল রাজাকে সে জানিয়েছে কন্দর্প তার স্বামী হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে চম্পকলতার কাতরোক্তি অভিনয় গুণে সমৃদ্ধ হলেও, প্রকৃতপক্ষে তার অন্তরে অবরুদ্ধ বেদনারই অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে :

সূরয ছাড়া আসমান দ্যাহ সদাই যে আন্ধারা,
যৈবন কালে নারীর পতি পুষ্পের ভোমরা।
উথালী তরঙ্গ নদীর তাতে যৈবন তরী,
অসময়ে ছাইড়্যা গ্যালে কে অইব কাণ্ডারী।

এর পরবর্তী পর্যায়ে চম্পকলতার হৃদয় দৌর্বল্যের প্রকাশ ঘটেছে। রাজবাড়ীতে আশ্রিত ঘুমন্ত রাজকুমারকে দেখে চম্পকলতা স্বীকার না করে পারে নি :

সূরয বরণ তোমার কুমার রূপে মানিক জ্বলে,
তোমার লগে মিলন অইলে নাম্তিাম পাতোলে।
যেদিন দেইখ্যাছি কুমার তোমার সোন্দর মুখ,
হেওই থিকা জ্বইলা মইলাম য্যান অগ্নির আগে ধূপ।

ভায়েদের নির্দেশে এ হেন রাজকুমারকে বধ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে সে। ইচ্ছা করলেই রাজকুমার প্রতিশোধ নিতে পারত, কিন্তু তৎপরিবর্তে সে বহুযত্নে রক্ষিত তার মানিকটি চম্পকলতাকে দিয়ে বিদায় নিতে বলেছে। এক্ষেত্রেও তার চম্পকলতার প্রতি দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত উভয়ে মিলে পরামর্শ করে সাত ডাকাতের ঘোড়াগুলিকে অকর্মণ্য করে দিয়ে পালিয়েছে। কাহিনীতে শাখাকাহিনী হিসেবে চোর চুন্নী ও ঠগনগরী উঠান দমদমির প্রসঙ্গ সংযোজিত। বিশেষ করে ঠগনগরী ও উঠান দমদমির শঠতার সাহায্যে অর্থোপার্জন ও তার সাহায্যে কন্দর্প ও চম্পকলতার আপ্যায়ন ও তাদের উপঢৌকন দান—কাহিনীর আকর্ষণবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

রাজকুমার মানিকটি একটি পুষ্করিণীর পাড়ে তার পরিধেয় বস্ত্রাদির মধ্যে গোপনে

রেখে স্নান করতে নামলে পুষ্করিণীর পাড়ে উপবিষ্ট এক চোর সেটি চুরি করে নেয়। রাজপুত্রও বাঘের ডাক ডেকে চোর ও চুন্নিকে সন্ত্রস্ত করে ঘরের বাইরে এনে কৌশলে তাদের কুটির থেকে মানিকটি পুনরায় হস্তগত করে রওনা দেয়। চোরচুন্নিও সহজে ছাড়ার পাত্রপাত্রী নয়। তারাও রাজপুত্রের অনুসরণ করতে থাকে। রাজপুত্র পথিমধ্যে এক রাজার গৃহে আশ্রয় নিলে চুন্নি কান্না জুড়ে দেয় :

কোথাও যাও আমারে ফ্যালাইয়া
দুসকুতে বুক ফাটে।
তোমার লইগ্যা আমি যে গো জীয়ন্তেতে মরা,
দোষে ছাইড়া মোরে করলা কপালপোড়া।
তোমার লগে আমার পীরিত অইল অগঠন,
কচি গাছে ওঠলে যেমুন পড়িয়া মরণ।
আসমানেতে হাত বাড়াইলে শূন্য না লয় টাইন্যা,
পর কভু আপন না হয় হিয়ার মাংস দিলে কাইট্যা।
ফুলের লগে ভোমরার পীরিত যেমুন আগে বোঝা দায়,
এক ফুলেব মধু খাইয়া আর ফুলেতে ধায়।

চুন্নি দিব্বি রাজপুত্রকে তার স্বামী বলে জাহির করে নিজেকে তার পরিত্যক্তা স্ত্রী হিসেবে অভিহিত করে ঐরূপ বিলাপ জুড়ে দেয়। তার শঠতায় কাজও হয়। রাজা ধরে পড়েন রাজপুত্রকে, ব্যাপার কি? রাজপুত্রও কম চতুর নয়, সে জানায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও সংসার চালাতে সে সক্ষম হয় নি, তাই বাধ্য হয়েই সংসার বিবাগী হতে হয়েছে তাকে। রাজা দয়াপরবশ হয়ে তাদের রাজপুরীতে আশ্রয় দেন। সুযোগমতো রাজকুমার এখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চোর চুন্নির হাত থেকে রক্ষা পায়। নির্মল হাস্যরসের আধারে রচিত হয়েছে চোর-চুন্নিব কাহিনীটি। অথচ উল্লেখ্য অশ্লীলতা প্রকাশের সুযোগ ছিল রীতিমত। রাজপুত্র এবং চুন্নি স্বামী স্ত্রীর ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদে কয়েকদিন অতিবাহিত করেছে বলে বর্ণিত হয়েছে। চুন্নি ইচ্ছা করলে রাজপুত্রের সঙ্গে কামলীলায় মত্ত হতে পারত। কিন্তু এদিক দিয়ে সে তার দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করেছে। রাজকুমারও অন্তত: শত্রুর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায়ে চুন্নির দৈহিক শুচিতা বিনষ্ট করতে পারত। কিন্তু না, তা সে করে নি।

এইরূপেতে দুইজনাতে পুরীমধ্যে থাকে যেন সুখে দম্পতিতে
কথা কেহ কারও সঙ্গে না করে বিশেষ।
--রাজপুত্র দিবাভাগে কার্য করে রাজসভাতে,
সারারাত্তির কাটায় শুইয়া পালঙ্কের উপারে।

গীতিকাটির রচয়িতার সংযমের পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না। ঠগনগরী ও উঠান দমদমির কাহিনীও উপভোগ্য। এ'দুটি চরিত্রকে শঠতার আধাব ও প্রতারণার মূর্ত প্রতীকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পথশ্রমে ক্লান্ত চম্পকলতা ও রাজকুমার নিতান্ত

নিরুপায় হয়েই এদের কুটিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। চম্পকলতা দিব্বি এদের বোনঝি বনে যায়। বোনঝি এবং জামাইকে উপযুক্ত আতিথ্য দান করার জন্যে ঠগনগরী যে উপায় অবলম্বন করল তা তার নামেরই উপযুক্ত :

অগো সেই দ্যাশের রাজার কুমার—
বিয়া করতে যায়।
ঠগনগরী হেই রাস্তায় এক মরা পোলা
কোলে নিয়া করে হায় হায়
ঠগী কয়, রাজার পুত্তুর বড় মাইনষের বেটা,
দুঃখিনীর লাতী মাইর‍্যা বাধাইলা এক ল্যাঠা।

ঠগ মবা শিশুকে নিয়ে রাজাব কাছে উপস্থিত হয়ে রাজকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করে, রাজকুমার বিনা কারণে তার নাতিকে হত্যা করেছে। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আদায় করে সে চম্পকলতা ও রাজকুমারের আতিথ্যের ব্যবস্থা করেছে। অপরপক্ষে ঠগনগরী মাধব নামীয় এক বেণেকে প্রতারণা করেছে কৌশলে। একটি খুতিতে সোনাদানা আর বাকি চারটি খুতিতে মাটির হাঁড়িকলসীর ভাঙ্গা টুকরো ভর্তি করে তীর্থে যাবাব ছলনায় পাঁচটি খুতিই মাধবের কাছে রেখে গেছে গচ্ছিতস্বরূপ। বিনিময়ে একটি ভূর্জপত্রে লিখিয়েও নিয়েছে গচ্ছিতের ব্যাপারটি। তারপর কয়েকদিন পরেই সে খুতি ফেরত চাইতে গেছে। মাধব ফেরত দিতে খুব একটা ইচ্ছুক নয়। ঠগী সরাসরি হাজির হয়েছে রাজার কাছে। শেষে দুইশত সিপাই গিয়ে মাধবকে ধরে এনেছে। অগত্যা তাকে পাঁচটি খুতিও আনতে হয়েছে। সোনায় পূর্ণ খুতিটির পব অন্যান্যগুলি খুলে হাড়ি-কলসীর ভগ্নাংশ দেখে ঠগীর ত বুক চাপড়িয়ে কান্না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ঐসব ঠগীবই কার্তি। অগত্যা মাধব বেচারীকে ক্ষতিপূরণ করতে হল। ঠগনগরী প্রতারণার সাহায্যে যা আদায় করেছে, সবই দিয়ে দিয়েছে চম্পকলতাকে :

হাইস্যা কয় ঠগনগরী শোন, প্রাণের বুইনঝি,
যাওয়ার কালে লইয়্যা যাও যা কিছু দিতেছি।

অর্থাৎ চরম প্রবঞ্চক ও শঠ হলেও ঠগনগরী ও উঠান দমদমির অন্তরের অন্তস্তলে যে অপত্যস্নেহ সুপ্ত অবস্থায় ছিল তারই প্রমাণ মেলে এসব ঘটনায়।

অগো এতকালের সেয়ানা মাইয়্যা যৈবতী রওন,
লাজেতে মইর‍্যা গ্যাল ছোড ছেমড়ীর মতন।

বাংলা গীতিকা সম্পদের জগতে 'চম্পকলতা' এক বিশিষ্ট সংযোজন।

## আসমান তারা

'আসমান তারা' গীতিকাটি 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার ১৩৭০ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

উজানী নগরের জহিরুদ্দিন নামক সওদাগরের চারটি ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠটির নাম হাচান। হাচান ছিল বোকা। অন্যান্য ভায়েরা যখন ব্যবসায় ব্যস্ত, তখন তার সময় কাটে অর্থহীনভাবে। কিন্তু এ হেন হাচানের বরাত কিভাবে খুলে গেল সেই নিয়েই গীতিকাটি রচিত।

একদিন হাচান হঠাৎ করে বাণিজ্য যাত্রা করে বসল। কারো কোনো নিষেধই সে শুনল না। বাণিজ্য যাত্রা করে পাঁচ দিনের দিন হাচান লোহিত সাগরে উপনীত হল। এরপর দুধ সাগর অতিক্রম করে সে কালাপানির তীরে পৌঁছে গেল। তীরেতে গরু চরতে দেখে সে মাঝিমাল্লার সাহায্যে গোবরের ঘষি দেওয়ালো। তারপর শুষ্ক ঘষিগুলি নৌকায় নিয়ে যাত্রা করল। ক্ষীরসাগরে পড়ে হাচান দেখলে ছেলের দল একটি ইঁদুর ধরে তার লেজ বেঁধে সমুদ্র দেখাচ্ছে। ছেলেদের কাছ থেকে হাচান ইঁদুরটি টাকার বিনিময়ে কিনে নিল। কিছু দূরে যাত্রা করে হাচান দেখলে বাচ্চারা মিলে একটি বিড়াল ধরে মজা করছে। সেটিকেও সে কিনে নিল। হাচান বনে আগুন লেগেছে দেখে তার নৌকা পাড়ে ভেড়াতে বলল। দেখলে বনে দাবানল লেগেছে আর আগুনের কারণে একটি অজগর মৃত্যুর সম্মুখীন। সে মাঝিদের সাহায্যে বনের আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করল। অজগর কিছুটা শান্তি পেল। সে হাচানকে বর দিতে চাইল। মা ফতিমার নির্দেশ মত হাচান অজগরের কাছ থেকে আংটি চাইল। আংটিটি দিয়ে সাপের মৃত্যু হল। আংটিটি ছিল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। এর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। বাণিজ্য শেষে হাচান বাড়ী ফিরল। ফেরার আগে আংটির ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য নৌকার সমস্ত ঘষি হীরা জহরৎ পান্নায় যাতে পর্যবসিত হয় সেই ইচ্ছার কথা জানাল। নৌকার সব ঘষি তাই হয়ে গেল। হাচান তার মা, বৌদি এবং অন্যান্য সকলকে মাণিক্য দিয়ে সন্তুষ্ট করল। অর্থের কারণে হাচান এবার জাতে উঠল, 'বুদ্ধিমন্ত মানুষ অইলো হাচান সদাগর'।

একদিন সরোবরে হাচান শাহজাদী আসমান তারাকে দেখতে পেলে। দেখামাত্রই তার প্রেমে পড়া।

ঘরে ফির্‌্যা হাচান তহন কীরা এক কাটিল।<br>
হাচান কয়, এই না কইন্যা যদি আমার নাই অয়,<br>
জীয়ন্তে শেল লইমু শোনগো নিচ্চয়।

বাদশা হাচানের বিবাহ করার ইচ্ছা জ্ঞাত হয়ে শর্ত আরোপ করলেন রাতারাতি হাচান যদি ষোল হাত দৈর্ঘ্যের একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করে দিতে পারে আর সেই নবনির্মিত পথের দুইপ্রান্তে যদি মিষ্টি ফলের গাছ শোভা পায় যেখানে পাখীরা এসে কলকাকলিতে ভরিয়ে তুলবে, যা শুনে বাদশার নিদ্রাভঙ্গ হবে, তবেই কন্যাকে তিনি তুলে দেবেন হাচানের হাতে। আর হাচান যদি না পারে তাহলে তার জীবন যাবে। অজগর প্রদত্ত আংটির সাহায্যে হাচান অনায়াসেই বাদশার শর্ত পূরণ করে আসমান তারাকে লাভ করল।

আসমান তারা ছিল অসৎ চরিত্রের। সেনাপতির সঙ্গে তার গুপ্ত প্রণয় ছিল। কৌশলে আসমান তারা হাচানের কাছ থেকে আংটিটি আত্মসাৎ করে পালাল। বাদশা বন্দী করলেন হাচানকে। হাচানকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল তার ক্রীত ইঁদুর ও বিড়ালটি। তারা গিয়ে উপস্থিত হল আসমান তারা ও সেনাপতির কাছে। কৌশলে আসমান তারার কাছ থেকে আংটিটি সংগ্রহ করে উভয়ে ফিরে এল। আর হাচানকে পায় কে। আসমান তারার অসতী সুলভ আচরণের জন্য স্বয়ং বাদশা, সেনাপতি ও আসমান তারাকে হত্যা করলেন। হাচান বাদশার স্থলাভিষিক্ত হল।

এ'টি প্রকৃতিতে রূপকথাধর্মী রচনা। পালাটির বৈশিষ্ট্য হল এতে অলৌকিকতার বিবরণ রয়েছে, সংযোজিত হয়েছে বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর কার্যকলাপ। অজগরের আংটি প্রদান থেকে শুরু করে আংটির সাহায্যে নৌকা ভর্তি ঘষির মূল্যবান মাণিক্যে রূপান্তরিত হওয়া, আংটির সাহায্যে রাতারাতি ষোল হাত দীর্ঘ পাকা রাস্তা নির্মাণ—সবই অলৌকিকতার পরিচয়বাহী।

আসমান তারা যেমন তার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তেমনি শেষপর্যন্ত সে তার আচরণের উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছে। মৃত্যুবরণ করেছে সেনাপতির সঙ্গে নিজের পিতার হাতে।

ইঁদুর ও বিড়ালের কার্যকলাপ কিছুটা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। বেশ কিছু অভিপ্রায় পালাটিতে অভিব্যক্ত। প্রধান অভিপ্রায়টি হল 'Successful youngest son' —কৃতী কনিষ্ঠ সন্তান। যে হাচান ছিল বোকা, সেই শেষপর্যন্ত বাদশার স্থলাভিষিক্ত হল। তাছাড়া উপকারী ইঁদুর ও বিড়াল, অন্যায় কর্ম করার জন্য শাস্তিলাভ ইত্যাদি অভিপ্রায়গুলিও পালায় স্থান পেয়েছে।

আসমান তারার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতেই নারী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে :

নারী হাসী, নারী ফাঁসি, নারী মহাপাপ,<br>নারী খুশী, নারী দুষি, নারী অভিশাপ।

—বলাবাহুল্য সাধারণভাবে নারীদের প্রসঙ্গে এই মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। হলে তা নাথ ধর্মের প্রভাব সঞ্জাত হত।

পালাটিতে সতী নারীর পতির ভাগ্যের যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে অসতী নারীর পতির দুর্ভাগ্য :

সতী নারীর পতি যেমুন মজিদেরি চূড়া,<br>অসইত্যা নারীর পতি তেমুন ডাঙ্গা নায়ের গুড়া।

অলংকার প্রয়োগে কবি তেমন নূতনত্বের পরিচয় দিতে না পারলেও অলংকারগুলি সুপ্রযুক্ত হয়েছে স্বীকার করতে হয়। যেমন হাচানের দুর্ভাগ্যের অবসানে সৌভাগ্যের উদয় বর্ণনায় কবি বলেছেন—ম্যাঘের শ্যাষে, যেমুন উদিল রন্দুর। আসমান তারার সৌন্দর্য বর্ণনায় বলা হয়েছে :

আসমানের বদন যেমুন বা আহাশেরও চন্দর,

কাঁচি হলদির বন্ন গাত্রের যৈবনও সোন্দর।
ম্যাঘের মতন কালা ক্যাশ খোপাতে শোভিল,

নারীর কুলক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

উচ কপালী, চিরল দাঁতী, পিঙ্গলা মাথাঁর ক্যাশ,
হেইনা নারী সাদী করলে দুঃখের না অয় শ্যাষ।

পালাটিতে দোহারদের ভূমিকা খুবই স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয়েছে।

## ফুলবানু

'ফুলবানু' পালাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় ১৩৭০ বঙ্গাব্দের মাঘ-চৈত্র সংখ্যায়।

জাহিরুদ্দিনের বিবি পরীবানুকে বাদশা বলপূর্বক অপহরণ করলেন, মারা পড়ল জাহিরুদ্দিন। জাহিরুদ্দিনের শিশু সন্তানকে পালন করতে লাগল পরীবানুব এক বোন বাতাসী বিবি।

শিশু সন্তানের নাম আত্তাপউদ্দিন। সে মানুষ হল স্বরূপ নগরে। অসাধারণ রূপ তার আর বড় গুণ তার খুব ভাল আড়বাঁশী বাজাতে পারে সে। কাজ তার গরু চরানো। এ হেন আত্তাপউদ্দিনের প্রেমে পড়ল ফুলবানু। সেও অসামান্যা সুন্দরী। কিন্তু এরই মধ্যে রাজপুত্র সাত্তাপউদ্দিন আকৃষ্ট হয় ফুলবানুর প্রতি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফুলবানুকে সে বিবাহ করল, তুলল নিয়ে গিয়ে রাজপ্রাসাদে। ফুলবানু কিন্তু ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল। তার সৌন্দর্য হ্রাস পেতে লাগল। ইতিমধ্যে পুনরায় আত্তাপের বাঁশী শুনে উতলা হয় ফুলবানু। সাত্তাপ তাকে নানাভাবে বোঝায়। কিন্তু ফুলবানুর মন মানে না। একদিন আত্তাপ ডাকাত হয়ে হাজিব হল প্রাসাদে। তুমুল সংগ্রাম হল সাত্তাপের সঙ্গে আত্তাপের। শেষে আত্তাপ মৃত্যু ববণ করল। জানা গেল আত্তাপ ও সাত্তাপ একই মায়েব সন্তান—দুজনেরই জননী পরীবানু। আত্তাপের শোকে মুহ্যমান হয় পরীবানু, অপরদিকে আত্তাপের কারণে ফুলবানু আত্মহত্যা করে।

পরীবানুর সঙ্গে ফুলবানুর কতই না পার্থক্য। পরীবানু ও ফুলবানু উভয়েই ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপহৃতা হয়েছে। কিন্তু পরীবানু যেক্ষেত্রে তার অপহরণকে মেনে নিয়েছে, বাদশার সঙ্গে সুখে ঘর সংসার করেছে, সেক্ষেত্রে ফুলবানু কিন্তু তার প্রেমিকের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। সাত্তাপের গৃহে বৈভবের অভাব ছিল না। সাত্তাপ নিজেও নানা ভাবে ফুলবানুর মন পাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ফুলবানু কোনমতেই বিশ্বাসঘাতিনী হতে পারেনি। শেষপর্যন্ত সে তার প্রেমিক আত্তাপের অকাল মৃত্যুর কারণে আত্মঘাতিনী হয়ে নিজেকে প্রেমের পরাকাষ্ঠা রূপে প্রতিপন্ন করেছে।

পুরুষ চরিত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় জাহিরুদ্দিনের এবং বিশেষ করে আত্তাপউদ্দিনের প্রসঙ্গ। বাদশা যখন জাহিরুদ্দিনকে অর্থের বিনিময়ে তার বিবিকে তালাক দিতে বলেছে, তখন জাহির 'থুক কইর্যা ফ্যালায় ছ্যাপ দববার মইধ্যে খানে।'

শুধু তাই নয়, সে প্রকাশ্যে বাদশার সমালোচনায় মুখরিত হয়েছে :

জাহির কয়, দুষ্টামতি, অনাচারী তুমিই দ্যাশের পতি,
পরের ইস্তিরী পাবার আশা কইরো না সম্প্রতি।

আত্তাপ তার প্রেমিকাকে লাভ করতে ডাকাতি করতেও পিছপা হয়নি। শেষপর্যন্ত প্রেমিকার কারণেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সাত্তাপউদ্দিন বলপূর্বক অপহরণ করেছিল ফুলবানুকে ঠিকই, কিন্তু ডাকাতরূপে আত্তাপ তাদের প্রাসাদে উপস্থিত হলে সে যে প্রস্তাব দিয়েছিল আত্তাপকে তাতে তাকে প্রশংসাই করতে হয়।

সত্তাপউদ্দিন ডাইক্যা কয়, শোন মেঞা বাই,
তোমার লগে কাজিয়া নাই আপোষ মুই চাই।
ফুলবানু খাড়াইয়্যা রইছে আমাগের সামুনে,
কার লগে যাইবে কইন্যায় বোলাও না উনারে।

তবে পালায় সর্বাপেক্ষা ট্রাজেডি দেখা গেছে পরীবানুর ক্ষেত্রে—তারই সন্তান যাত্তাপের হাতে মৃত্যু বরণ করেছে তার আর এক সন্তান আত্তাপ।

পালাটি প্রমাণ করে বাদশা ও বিত্তবানরা কিভাবে নারীকে অপহরণ করে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করতেন। বিশেষ নারীকে লাভের জন্য চরম অমানবিক কার্য সম্পাদনেও তাঁরা সংকুচিত হতেন না। এদেরই প্রসঙ্গে কবি জাহিরুদ্দিনের বকলমে বলেছেন :

'রক্ষকই ভক্ষক হইয়্যা গিলা খাবার চায়।'

ক্ষেত্রবিশেষে অলংকার ব্যবহারে কবির প্রশংসনীয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ফুলবানুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাত্তাপ বিবাহ করেছে। কিছুতেই সে সাত্তাপের সঙ্গে তার বিবাহকে মেনে নিতে পারছে না, কবি ফুলবানুর অসহায় অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

চাষার মাইয়্যা ফুলবানু য্যামুন বোনের পঙ্খী ছানা,
বাঁশের খেঁচায় বন্দী হইয়্যা গুটাইয়্যা থুইছে ড্যানা।

ফুলবানু গভীররাত্রে একাকিনী ছাদে গিয়ে নিজের দুঃখের কথা বলে যায়, বলে যায় তার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী, বলে প্রেমাগ্নিতে তার দহনের কথা। হঠাৎ সে দেখতে পায় তার স্বামী সাত্তাপকে, তখন তার আচরণের বর্ণনায় কবি মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন—

লাজেতে মরিয়া গিয়া সোয়ামীরে দ্যাখতে পায়।

যে স্বামীকে নিদ্রামগ্ন দেখে ফুলবানু একাকিনী ছাদে এসে মনের দুঃখে সমস্ত কথা অকপটে প্রকাশ করেছে, সেই যখন তার স্বামীকে দেখতে পেয়েছে, তখন কিন্তু লজ্জিত না হয়ে পারেনি সে। পালাটিতে কোনো বন্দনা অংশ সংযোজিত হয়নি। তবে কবি যে মুসলমান তা শব্দ ব্যবহারেই প্রমাণিত। পালাটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

## সোহাগী বাইদ্যানী

'সোহাগী বাইদ্যানী' পালাটির রচয়িতা নিবারণ দাস কর।

চন্দ্রদ্বীপের মুন্সী বাড়ীতে একদিন এক বেদেনী সাপ খেলা দেখাতে এল। তার নাম সোহাগী। তার খেলা দেখানো শেষ হলে মুন্সী বাড়ীর ভাবী উত্তরাধিকারী সুজন, তাকে একটি আংটি উপহার স্বরূপ দেয়। বেদেনী চলে যাবার পর সুজন তার জন্য কিন্তু ব্যাকুল হয়ে পড়ল। সে একদিন বেদেনীর সন্ধানে পথে বেরিয়ে পড়ল। সুজন এসে উপস্থিত হল শঙ্খ নদীর তীরে। দূর দিয়ে যাচ্ছিল ষোল মাল্লাই বেবাজিয়া নৌকা। সুজনের সংকেতে নৌকা পাড়ে এসে ভিড়ল। নৌকায় ছিল নানা বয়সের মেয়েরা। এদের মধ্যেই সুজন তার অভিলষিত সোহাগীকে দেখতে পেল। সুজন এই নৌকারই যাত্রী হয়ে বসল। সোহাগীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল। সুজনের সঙ্গের অর্থ নিঃশেষিত হলে কুটনী শুরু করল তার ওপর নির্যাতন। কায়িক পরিশ্রম করতে হচ্ছিল তাকে। কিন্তু সে সোহাগীর জন্য সব কিছুই নীরবে সহ্য করছিল। সুযোগমত সোহাগী এবং সুজন কোশডিঙা নিয়ে পালাল। এক চড়ায় পৌঁছে তারা এসে আশ্রয় নিল এক বাড়ীতে। আসলে এটি ছিল চডুয়া ডাকাত মোঙ্গল সর্দাবের বাড়ী। মোঙ্গল সোহাগীকে দেখে ত পাগল। তাকে লাভ করার আশায় সে সুজনকে হত্যার জন্য ঘুমন্ত সুজনের কাছে কালনাগিনী ছেড়ে দিল। কিন্তু সোহাগীর জন্য সুজন সে যাত্রায় বেঁচে গেল। কালনাগিনীকে হত্যা করে দুজনে অনতিবিলম্বে বেরিয়ে পড়ল। মোঙ্গলও তাদের পিছু নিল। শেষে মোঙ্গল মারা পড়ল কুমীরের হাতে।

নৌকা থেকে নেমে দুজনে রওনা দিল চন্দ্রদ্বীপের উদ্দেশে। পথে সন্ধ্যায় তারা আশ্রয় নিল এক গাছতলায়। এখানেই একজোড়া শুকপাখীর কাছে সোহাগী জানতে পারল তাব আর সুজনের প্রকৃত পরিচয়। সঙ্গে সঙ্গেই সে স্থির করল সুজনের সঙ্গে আর যাবে না বলে। কিন্তু সুজন নাছোড়বান্দা। তখন সোহাগী শর্ত আরোপ করল যে সে সুজনকে বিবাহ করলেও, বিবাহের পর তারা একত্রে থাকবে না, উভয়ে থাকবে পৃথক স্থানে। সুজন এই শর্তে সম্মতি দিলে। উভয়ে চন্দ্রদ্বীপে উপনীত হল। উভয়ের বিবাহ হয়ে গেল। শুরু হল দুজনের পৃথক থাকা।

কয়েকমাস অতিবাহিত হবার পর একরাত্রে সুজন উপস্থিত হল সোহাগীর কক্ষে। সোহাগী তাকে জানাল যে সে সুজনকে সব কিছু দিতে প্রস্তুত কেবল তাব যৌবন সে তাকে দান করতে পারবে না। সুজনের ধারণা হল সোহাগী বুঝিবা অন্য কারো প্রেমে আসক্ত। সুজনের পীড়াপীড়িতে তখন সোহাগী তার অস্বাভাবিক আচরণের ব্যাখ্যা দিতে সম্মত হয। তবে সেই সঙ্গে শর্ত আবোপ করে যে সে সব কথা খুলে বললে চিরতরে সুজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে। সুজন নাছোড়বান্দা। সে সব কিছু শুনতে চায় সোহাগীর কাছ থেকে। সোহাগী সুজনকে নিয়ে উপস্থিত হয় নদীর ঘাটে। এখানে পৌঁছে সোহাগী জানাল হুশুমপুরের সুবুদ্ধিচাঁদ নামে বণিকের কথা। বণিক তার যুবতী স্ত্রী বাতাসী আর তার দুটি যমজ সন্তান—তার একটি পুত্র অপরটি কন্যা রেখে বাণিজ্যে

গেল। এদিকে বন্যায় ভেসে যাবার উপক্রম হল বাতাসী ও তার সন্তানদ্বয়। অতিকষ্টে তারা রক্ষা পেল। এরপর বাতাসী এক জলদস্যুর দ্বারা অপহৃতা হয়। কৌশলে সে তার সতীত্ব রক্ষা করে। সে জলে ঝাঁপ দেয়। জ্ঞানলাভের পর তার শিশুসন্তানদের কথা মনে পড়ে। সে মস্তিষ্ক বিকৃত নিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এদিকে বাতাসীর পরিত্যক্ত মেয়েটিকে আশ্রয় দেয় এক বেবাজিয়া নৌকার কুটনী। মেয়েটি পড়েছিল গাছতলায় আর একটি কেউটে সাপ তার মাথায় ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল। পুত্র সন্তানটি আশ্রয়লাভ করে জমিদার গিন্নী বিদ্যাবতীর কাছে। সোহাগী বারংবার বলে শেষটুকু যেন সুজন না শুনতে চায়। কিন্তু সুজনের আগ্রহাতিশয্যে সোহাগী সেটুকুও প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। জানায় তারা দুজনে ভাইবোন। পূর্বকৃত পাপের জন্য সোহাগী নদীর জলে আত্ম বিসর্জন করে। সুজনও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। রাজা সুবুদ্ধিচাঁদ রায় এবং তাঁর মহিষী বাতাসী তাঁদের সন্তানদ্বয়ের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

গীতিকাটির সুস্পষ্ট দুটি বিভাগ। একটি বিভাগ বিকশিত হয়েছে সোহাগীকে কেন্দ্র করে, অপর বিভাগটি বাতাসীকে কেন্দ্র করে। সোহাগীকে নিয়ে গঠিত অংশটির সঙ্গে 'মহুয়া' পালার কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। মহুয়াও ছিল বেদেনী, সোহাগীও তাই। নদেরচাঁদ ছিল সম্পন্ন পরিবারের সন্তান, সুজনও তাই। নদের চাঁদ যেমন মহুয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার জন্য বিষয়সম্পত্তি ঘরদোর ত্যাগ করে সীমাহীন কৃচ্ছ্রসাধন করেছিল, সুজনও তাই করেছে। তবে মহুয়ার সঙ্গে নদের চাঁদের মিলনে বাধ সেধেছিল হুমরা বেদে, কিন্তু 'সোহাগী বাইদ্যানী' পালায় সেরকম না হলেও কুটনী কিছুটা বাধার সৃষ্টি করেছিল। মহুয়া পালাতে যেমন মহুয়া নানা নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তার সতীত্বধর্ম রক্ষা হয়েছিল, সোহাগীকেও তেমনটা নাহলেও কিছুটা করতে দেখা গেছে। মহুয়া পালায় হুমরা বেদের কারণে মহুয়ার সঙ্গে নদের চাঁদের মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, দুজনেই অকালমৃত্যুর শিকার হয়েছে, 'সোহাগী বাইদ্যানী'তে দৈব দুর্বিপাকেই নায়ক-নায়িকাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কেননা সোহাগী ও সুজন ছিল নিজের ভাইবোন। তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ উভয়ের মধ্যে দৈহিক মিলন সাধিত হয়েছিল। তাই সেই অনুশোচনায় দুজনেই একে একে মৃত্যুবরণ করেছে।

আলোচ্য গীতিকায় সোহাগীর চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তার কাছে সুজন হয়েছে নিষ্প্রভ। গীতিকাটি কিছুটা রূপকথাধর্মী। শুক পাখীদের মাধ্যমে সোহাগী ও সুজনের জন্মবৃত্তান্তের প্রকাশ তারই ইঙ্গিতবাহী। কবি সোহাগী ও সুজনের প্রকৃত পরিচয়টিকে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করেছেন। পাঠকের কৌতূহল শেষপর্যন্ত জাগরুক থাকে সোহাগীর আরোপিত অদ্ভুত শর্তের কারণ বিষয়ে। সোহাগী জানিয়েছিল সে সুজনকে স্বামীরূপে বরণ করতে প্রস্তুত কিন্তু তারা পৃথকভাবে অবস্থান করবে। সুজনের পীড়াপীড়িতে সোহাগী তার অদ্ভুত আচরণের কারণ যেভাবে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করেছে এবং বারংবার মিনতি জানিয়েছে চরম পরিণতিটি না জানার জন্য, তাতেও পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। সুজন যেন পাঠকের প্রতিনিধিত্ব করেছে, যাই ঘটুক সে পরিণতি

জানতে জেদ ধরেছে। কাহিনীর একেবারে শেষাংশে অপেক্ষা করেছিল চরম বিস্ময়—সোহাগী ও সুজন দুজনে একই মাতা পিতার সন্তান অথচ উভয়ে উভয়কে ভালবেসেছিল, তাদের দৈহিক মিলনও ঘটেছিল। আখ্যানের climax রচনায় কবির নৈপুণ্যের স্বাক্ষর মেলে। তবে কিছু কিছু বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বাণিজ্য করতে গিয়ে সুবুদ্ধিচাঁদ কেমন করে রাজা হয়ে বসল, সে সম্পর্কে কবি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। সোহাগীর প্রতি সুজনের আকৃষ্ট হওয়ার বর্ণনায় কবি অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সোহাগীর ক্রীড়া নৈপুণ্যে মুগ্ধ সুজন 'অনায়াসে খুইল্যা দিল হের অঙ্গুরী কোনো বা না কইর্যা।' যে সোহাগীর জন্য সুজন পরবর্তীকালে তার বিষয় আশয় সব তুচ্ছ জ্ঞান করে পথে বেরিয়ে পড়বে, তার সূচনা হয়েছে সোহাগীকে অঙ্গুরীয় প্রদানের ঘটনা থেকেই।

পালাটিতে সংক্ষিপ্ততা ধর্ম রক্ষিত হয়েছে নানাস্থলেই। বিবাহের পরেও সুজন সোহাগীর সঙ্গে দৈহিক মিলনে ব্যর্থ হয়েছে দীর্ঘদিনের জন্য। কবি বর্ণনা করেছেন—

একদিন, দুইদিন কইর্যা সুজন কতবা সবুর করে,

সুবুদ্ধিচাঁদের বাণিজ্যে গিয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

একমাস, দুইমাস কতদিন না জানি,
বাণিজ্যে গ্যাছেরে মানুষ ফেরবার নাম করেনি।

পালাটিতে কবির জবানীতেই মুখ্য অংশ উপস্থাপিত, সে তুলনায় পালায় চরিত্রগুলির কথোপকথনের অংশ কম। বাতাসীর বারমাস্যাটি অন্যান্য গীতিকার মতই গতানুগতিকভাবে বর্ণিত।

পালায় একস্থানে দার্শনিক ভাবনা প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। সোহাগী ও সুজন পরস্পর পরস্পরকে দেহ ও মন দান করলেও যে উভয়ের স্বামী স্ত্রীর মত জীবনযাপন করা সম্ভব হবে না পরিণামে, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ণিত হয়েছে—

সংসার সোমাজ আছে, আছে পরিজন,
অনিত্যের মইধ্যে দেখ নিত্য নিরঞ্জন।
কে কার, তুমি কার, কে বুঝিতে পারে,
তামাম জগৎ চলে দেখ হেনারই বিচারে।

একাধিক ক্ষেত্রে কবি সুন্দরভাবে প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করেছেন।

ক. মার থন মাসীর দরদ দ্যাখায় মোঙ্গলেরই মায়।

খ. দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা ঘনইয়্যা বসে কাছে,
কথা দিয়া কথা নেয় প্রাণে মারে শ্যাষে।

আখ্যানটির তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমেই সংযোজিত হয়েছে ভাটিয়ালী গান—

(হারে), ও আমার মন পবনের নাও,
হিজল কাষ্ঠের নাও গো তোমার সুন্দেরা কাষ্ঠের গুড়া,
(হারে) পিওলের গলুইগো তোমার মাথায় ময়ূর পাঙ্খা।

(হারে) এই না নাও বাইয়্যারে সুজন ভাটির দ্যাশে চলে,
রঙিলা বাদামে তার বাতাস আইস্যা দোলে।

পালাটিতে কবি অলংকার ব্যবহারে বেশ চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। ঘুমন্ত সোহাগীর সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—চাঁদের আলো মুখে পড়েছে 'দ্যাহায় মোমের মতন'। সোহাগীর সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র কবি বলেছেন—

(অগো) শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলা য্যামুন পড়ে দ্বাদশীতে,
ত্যামুন যোবতী কইন্যার রূপেতে দ্যাশ ফাটে।

কিংবা, (অগো) পিছাল পদ্মের পাত জল উছলি যায়,
পরম সুন্দারী কইন্যা নয়ন জুড়ায়।

সোহাগীর বক্র ও ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টির বর্ণনায় কবি বলেছেন—

কাঁচির আগা য্যামুন ব্যাকা যেমুন তার ধার,
ত্যারছা কোনে দ্যাখলে পরে রক্ষা নাই যে আর।

মও বোম্বেটের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

চৌক্ষু দুইডা লাল তার য্যামুন চত্তির মাইসা সঙ।

বোম্বেটের সান্নিধ্যে সোহাগীর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনায় বলা হয়েছে—

জ্বইল্যা ওঠে অগ্নি য্যামুন বাতাসের স্বোয়াদ পাইয়্যা,
তেইজ্যা ওঠে ফণি য্যামুন হইয়্যা মণি হারা।
বাতাসী তেমন বুঝি উন্মাদ হইয়্যা যায়।

## সাকিনা বিবি

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'সাকিনা বিবি' পালাটি। পালাটিতে যে সব চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে যেমন হাসান, হোসেন, জয়নাব, এজিদ এরা সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র।

যে ঘটনাটি পালায় উপস্থাপিত হয়েছে তা যেমন মর্মান্তিক তেমনি করুণ। হাসানের অপূর্ব রূপসী স্ত্রী জয়নাবকে লাভ করতে এজিদ পানীয়তে বিষ মিশিয়ে হাসানকে হত্যা করে। হাসান মৃত্যুকালে ভাই হোসেনকে বলে গেলেন তাঁর পুত্র কাশেমের সঙ্গে যেন হোসেন কন্যা সাকিনার বিবাহ দেওয়া হয়।

এজিদের সৈন্যদের সঙ্গে যখন হোসেনের তুমুল সংগ্রাম চলছে কারবালা প্রান্তরে, তখনি হোসেন ভ্রাতুষ্পুত্র কাশেমকে তার পিতার অন্তিম ইচ্ছাকে রূপায়িত করার কথা বলেন। কাশেম চেয়েছিলেন যুদ্ধ থেকে ফিরে তিনি সাকিনার পাণিগ্রহণ করবেন, কিন্তু পিতৃ ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালেই সাকিনাকে বিবাহ করেন তিনি। পরদিনই কাশেম যুদ্ধযাত্রা করেন এবং মৃত্যু বরণ করেন। বিবাহের একদিনের মধ্যেই সাকিনা পতিহারা হল। পালাটি শেষ হয়েছে অবশ্য এজিদের পরাজয়ের বিবরণ দানে। সাকিনার করুণ পরিণতি যেমন আমাদের অন্তর স্পর্শ করে, তেমনি হোসেনের তৃষ্ণা

নিবারণের সুযোগ পেয়েও তৃষ্ণার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত আপনজনদের কথা স্মরণ করে পানীয় গ্রহণ না করে অবসন্ন হয়ে শত্রুহস্তে মৃত্যুবরণের বিবরণও আমাদের চিত্তকে দ্রবীভূত করে। পালাটি সংক্ষিপ্ত। অলংকার প্রয়োগে তেমন অভিনবত্বের কোনো পরিচয় মেলে না। একটি ক্ষেত্রে অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে—'পতির বিহনে সতী, কি-বা আমার গতি, পতি বিনা সতীর গতি নাই।' পালাটির চতুর্থ পর্যায়টি শুরু হয়েছে : 'বেলা দিপ্পহর শুধু বালুচর ধূপেতে কলিজা ফাটে পিয়াসে কাতর।'—এই পরিচিত লোকসঙ্গীতটি দিয়ে। বিভিন্ন প্রকারের নারীর বিবরণ পালায় কিছুটা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। যেমন—

এক জাইত্যা নারী হায়রে পাড়ায় পাড়ায় যায়,
এর কথা তারে কইয়্যা গুয়া তাম্বুল খায়।

কিংবা, থুম থুমাইয়্যা হাটে গো নারী চৌখ পাকাইয়্যা চায়,
সেই না রাক্ষুসী নারী খসম আগে খায়।

সংক্ষিপ্ত বন্দনাংশে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষণীয়--

এতে ফতেমার চরণ যেমন বন্দনা করা হয়েছে, তেমনিই উত্তরের কৈলাস শিখর বন্দিত হয়েছে, বন্দিত হয়েছে পশ্চিমের সর্বতীর্থ সার, কিংবা দক্ষিণের ক্ষীর নদী সাগর। পালাটিতে বর্ণনাংশই সিংহভাগ অধিকার করেছে, তুলনামূলকভাবে চরিত্রগুলির কথোপকথনের অংশ কম।

## ক্যাশবতী কইন্যা

মালঞ্চী রাজের পুত্র শঙ্খনাথ একদা নদীর ঘাটে ভেসে আসা একটি চাঁপাফুল থেকে হাত পাঁচেক দীর্ঘ একটি কালো কেশ পেয়ে প্রতিজ্ঞা করে বসল, যার কেশ, তাকেই সে বিবাহ করবে।

শঙ্খনাথ সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে বাণিজ্যে গেল। দুধ সাগর, ক্ষীর সাগর ইত্যাদি সাত সাতটি সাগর অতিক্রম করে লবণহ্রদে পড়ে সম্মুখীন হল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের। সপ্তডিঙা মধুকরের সলিল সমাধি হল। কোনক্রমে প্রাণে বাঁচল শঙ্খনাথ। একটি মাস্তুলকে অবলম্বন করে কুমার কূলে এসে অবতরণ করল। সে লক্ষ্য করল সানবাঁধা একটি ঘাট। বুঝলে লোকালয় কাছেই আছে। কুমার একটি বৃক্ষে চড়ে বসল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। শতেক সেবাদাসী নিয়ে এক পরমাসুন্দরী যুবতী নদীর ঘাটে এসে পরিপাটি করে স্নান করল। সখীসহ যুবতী চলে গেলে কুমার আশ্রয় নেয় এক ব্রাহ্মণের গৃহে।

কুমার অবহিত হয় রূপনগরের রাজকন্যা কেশবতী সম্পর্কে। বয়স তার অষ্টাদশী। পিতার মৃত্যুর পর কেশবতী রাজত্ব করে চলেছে। তার পণ যে তাকে পাশায় হারাতে পারবে, তাকেই সে বিবাহ করবে। কিন্তু কেউই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। কেননা রাজকুমারী গভীর রাতে পাশা খেলায় বসে। যেই দেখে সে পরাজয়ের সম্মুখীন, সঙ্গে সঙ্গে সে তার পোষা ইঁদুরের সাহায্যে প্রদীপ উল্টিয়ে দেয়। অন্ধকারের

সুযোগ নিয়ে পাশার দান ইচ্ছামত নিজের অনুকূলে যাতে যায় সেইমত নিয়ে নেয়। তাছাড়াও কেশবতী পাশা খেলায় যদি কেউ বিজয়ী হয়, তবে তাকে বিবাহ করার প্রলোভন দেখিয়ে স্নান করতে পাঠায়। দুটি একইরকম জলাশয় আছে, তাদের একটি যক্ষের দীঘি, অপরটি শীতল দীঘি। ঠিক ঠিক জলাশয়ে উপস্থিত না হলে যক্ষের হাতে প্রাণ যাবার আশঙ্কা। শঙ্খনাথ কেশবতীর সমস্ত চালাকি জেনে প্রস্তুত হয়ে গেল তার মোকাবিলা করতে। তার সঙ্গে ছিল বেড়াল। তাই ইঁদুরের সাহায্যে আর আলো নিভিয়ে পাশার দান পাল্টানো গেল না। কেশবতী পাশাখেলায় পরাজিত হল। স্নান করতে গিয়ে ইঁটের সাহায্যে ঠিক ঠিক জলাশয়টির সন্ধান নিয়ে স্নান করে ফিরে এল শঙ্খনাথ। অগত্যা তার সঙ্গে বিবাহ হল কেশবতীর।

কেশবতীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের রাজ্যে আসার সময় যারা পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে কেশবতীর কর্মচারী হয়ে দিন কাটাচ্ছিল তাদের মুক্তি দেবার মানসে সঙ্গে নিল। কিন্তু তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করে শঙ্খনাথকে জলে ফেলে দিল। কেশবতী প্রেরিত পত্র শুকপাখীর সাহায্যে পেয়ে লবণ রাজা বিশ্বাসঘাতক রাজপুরুষদের সকলকে বন্দী করলেন। লবণ রাজার হেফাজতেই রইল কেশবতী। এদিকে শঙ্খনাথ এক জেলের হাতে ধরা পড়ল। জেলের মেয়ে সোনালতার শুশ্রূষায় শঙ্খনাথ নিরাময় হয়ে উঠল। তারপর উপযুক্ত প্রমাণাদি দিয়ে সে লবণ রাজার হেফাজত থেকে লাভ করল কেশবতীকে, অপরদিকে স্বেচ্ছায় সোনালতা নৌকা নিয়ে অনির্দিষ্টপথে যাত্রা করল। 'কেশবতী কন্যা' পালাটি রূপকথাধর্মী।

### কেশবতী

পালাটিতে মুখ্য নারী চরিত্র হল কেশবতীর। অসাধারণ চতুরা সে। পিতার মৃত্যুর পর সে রাজকার্য পরিচালনা করেছে নৈপুণ্যের সঙ্গে। নিজের বিবাহের ব্যাপারে সে যে শর্ত আরোপ করেছে এবং তার পাণিপ্রার্থীদের কৌশলে পর্যুদস্ত করার ব্যাপারে সে যে পথ অবলম্বন করেছে, তাতেই তার বুদ্ধিমত্তা তথা চতুরতার প্রমাণ মেলে। স্বামী শঙ্খনাথের সঙ্গে শ্বশুরালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করার সময় সে যে সঙ্গে করে তার শুকপাখীকে নিয়েছিল, তার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। শুকপাখীর সাহায্যেই লবণ রাজা সংবাদ পেয়ে বিশ্বাসঘাতক রাজপুরুষদের বন্দী করেছেন। কেশবতীর আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য, শঙ্খনাথের শুশ্রূষাকারিণী জেলের কন্যা সোনালতাকে সতীনরূপে মেনে নেওয়ার ঔদার্যপ্রকাশ, যদিও শেষপর্যন্ত সোনালতা কেশবতীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শঙ্খনাথের প্রেমের অংশীদার হয়নি।

### সোনালতা

সোনালতার চরিত্রটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। অসুস্থ অপরিচিত শঙ্খনাথকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছে সে। তারপর জেলেনী সেজে শঙ্খনাথের সঙ্গে কেশবতীর মিলনের

পথকে সুগম করে দিয়ে নীরবে বিদায় নিয়েছে। বারংবার বলা সত্ত্বেও সে নৌকা নিয়ে ফিরে আসেনি, শুধু বলেছে 'মোর বুইন ক্যাশবতী থাহে যেন সে সুখে।'

**শঙ্খনাথ**

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে শঙ্খনাথ উল্লেখযোগ্য। সে নিজের জেদে অটল। কেশবতীর কেশ দেখে সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং নিজের বুদ্ধিমত্তায় কেশবতীকে লাভও করেছে। বুদ্ধিমত্তাতেই সে কেশবতীকে পর্যুদস্ত করেছে।

পালাটিতে কবি অলংকার ব্যবহারে নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন, বিশেষত: নায়িকার রূপৈশ্বর্য বর্ণনায় :

করমচা রাঙা ঠোঁট দুইখান মুক্তা-পাতি দাঁত,
হাসলে গালে টোল খায়, শঙ্খের মতন হাত।

কিংবা,

পানপাত্তি বদন হের ধনুক ব্যাঁকা ভুরু,
তিলফুলের মতন নাক মোমের নাগান উরু।

পালাটির যেখানে রাজকুমারীর পোষা ইঁদুরের রাজকুমার শঙ্খনাথের বিড়ালের ভয়ে পলায়নের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, হাস্যরস সৃষ্টির উৎস হয়ে উঠেছে তা :

বেগতিক বুইঝ্যা কইন্যা ইঁদুরে দেয় ইসারা,
ইসারায় ইন্দুর রাজ আউগায় পীর্দুমের সীমানা।
শেখাইন্যা পড়াইন্যা ইন্দুর বাতি নেভাবার যায়,
এই না দেইখ্যা কুমার বিলাইরে ঠ্যালে আলগোছায়।
বিলাই দেইখ্যা ইন্দুর রাজের তড়াশে ওড়ে প্রাণ,
*　　*　　*
রাজকুমারী যত না ঠ্যালে ইন্দুর আউগাইয়্যা আয়,
হেবে দেইখ্যা মোছ ফুলাইয়া বিড়ালমশাই খাড়া হইয়্যা যায়।
বিলাইরে খাড়াইতে দেইখ্যা ইন্দুর উল্টা দৌড় মারে,

কেশবতীর বারমাস্যাটি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত। গতানুগতিকতা অনুসৃত হয়েছে এই বিবরণে। কথোপকথনের অংশই পালাটিতে অধিক।

কিছু কিছু সমাজজীবনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পাখীর সাহায্যে সংবাদপ্রেরণ, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কলকে পুড়িয়ে ছেঁকা দেওয়ার রেওয়াজ, পুরুষমানুষের বাজু, কুণ্ডল ইত্যাদি আভরণাদি ব্যবহারের রীতি, পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয়ের ব্যবহার পরিচ্ছদরূপে, পাশাখেলার জনপ্রিয়তা, নৌবাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

## রূপধন কইন্যা

'রূপধন কইন্যা' পালাটিও রূপকথাধর্মী। ইলিমপুরের রাজার অধিক বয়সে যে পুত্র

সন্তান জন্মে, তার সঙ্গে মন্ত্রীর অধিক বয়সের কন্যার বিবাহ হয়। মাত্র আড়াই দিনের রাজপুত্র রহিমকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে দ্বাদশবর্ষীয়া মন্ত্রী কন্যা রূপধন দূরদেশে পাড়ি জমায়। আশ্রয় নেয় এক মালিনীর গৃহে, নাম তার মালঞ্চী।

রূপধন শিশু স্বামীকে অপত্য স্নেহে পালন করতে থাকে। তবে তার অবস্থান অন্তরালে। সাতবৎসর বয়সে রাজপুত্র প্রেরিত হল পাঠশালায়। রহিম গুরুর সব বিদ্যা শীঘ্র আয়ত্ত করে ফেলে গুরুর চক্ষুশূল হয়ে উঠল। গুরু তাকে যাদুবলে পাঁঠায় রূপান্তরিত করলেন, উদ্দেশ্য হাটে কসাইয়ের কাছে তাকে বিক্রয় করা। মালিনী গুরুর অপকীর্তি সব স্বচক্ষে দেখে রূপধনকে এসে জানাল। রূপধন মালিমীর সাহায্যে পাঁঠা রূপী রাজপুত্রকে কিনিয়ে আনাল তারপর মন্ত্রের সাহায্যে সে স্বামীকে পূর্বরূপে ফিরিয়ে আনল। রাজপুত্র ভাবলে মালিনীই বুঝিবা তার প্রাণদাত্রী। মালিনী তখন রূপধনের পরিচয় সব প্রকাশ করে দিল, মন্ত্রীকন্যা রূপধনের সঙ্গে রহিমের মিলন ঘটল। খবরটা গুরু জানতে পেরেই রাজপুত্রকে হত্যা করার যডযন্ত্র করলেন। কিন্তু রূপধন সতর্ক, সে গুরুর ঘোড়ায় চেপে অনির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে রওনা হল। ক্লান্ত হয়ে তারা আশ্রয় নিল এক ডাকাতের গৃহে। ডাকাতদের জননী কৌশল অবলম্বন করল রূপধন ও রহিমকে আটকানোর, কিন্তু বুদ্ধিমতী রূপধন তা বুঝতে পেরে দ্রুত ডাকাত গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ডাকাতরা কিন্তু তাদের পিছু নিল। তাদের হাতে রাজপুত্রের মৃত্যু হল। রাজপুত্রের কাছ থেকে তারা মণি মাণিক্যের একটি থলি নিয়ে গেল, ফেলে গেল পাথরের থলি। রূপধন স্বামীর জন্য ক্রন্দনরতা হলে পার্বতীব দয়া হল, পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব রহিমকে পুনর্জীবিত করলেন। পুনরায় গুরু এসে উপস্থিত। মন্ত্রবলে তিনি রাজপুত্রকে পায়রায় রূপান্তরিত করলেন। রূপধনের কান্নায় গুরু কিছুটা সদয় হলেন। তিনি জানালেন মানুষকে পশুপক্ষীতে রূপান্তরিত করার ক্ষমতার অধিকারী হলেও পুনরায় তাকে মানুষ করতে তিনি অক্ষম তবে তিনি কথা দিলেন ভবিষ্যতে আর রাজপুত্রের বিরোধিতা করবেন না। রূপধন তখন যাদুপাথরের সাহায্যে পায়রারূপী রাজপুত্রকে পুনরায় মানুষ করে তুলল। দুজনে ফিরে এল ইলিমপুরে। রাজা এবং মন্ত্রী উভয়েই তাদের লাভ করে খুব খুশী হলেন।

**রূপধন**

পালাটির মুখ্য আকর্ষণ রূপধন। পিতৃ সত্য তথা পিতৃস্বার্থ রক্ষার্থে সে দ্বাদশ বৎসর বয়সে আড়াইদিনের শিশুকে স্বামী রূপে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তার এই বিবাহে প্রবল আপত্তি ছিল, থাকাই স্বাভাবিক। কেননা তার বক্তব্য তার কাছে আড়াই দিনের শিশুকে দেখলে লোকে তার সম্পর্কে খারাপ ভাববে। বিবাহের রাত্রেই রূপধন গৃহত্যাগী হয়েছে। মালিনীর আশ্রয়ে থেকে সে তার অসাধারণ যোগ্যতায় স্বামীকে মানুষ করে তুলেছে। রক্ষা করেছে স্বামীকে প্রতিহিংসা পরায়ণ শঠ গুরুর আক্রোশ থেকে, রক্ষা করেছে ডাকাতদের হাতে মৃত্যু লব্ধ রাজপুত্রকে। রূপধনের পাতিব্রত্য

আমাদের মুগ্ধ করেছে যদিও তা প্রথমাবধিই অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট। শিশু স্বামীকে মানুষ করতে সে মালিনীর হাতে অবলীলাক্রমে তুলে দিয়েছে মোতির মালা, সোনার খাড়ুয়া। মুখেও বলেছে :

আমার যতেক শক্তি, যত ধন আছোৎ
সগলি পতির বাদে কহি শোনো মন,

রূপধন ডাকাতদের হাতে মৃত্যুবরণকারী স্বামীকে বাঁচাবার জন্য প্রায় বেহুলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল :

যদ্দিন মোর সোয়ামীর জীবন ফিরি নাই পাইম্,
তদ্দিন এই মরা দেহা নিয়া এইটে বসি থাকিম্।
আর কিবা দাম আছে এই বিধুয়ার জীবনের,
তাও ভাল্ যদি না খাঁয়া দায়া এইটে জীউ যায় মোর।

রূপধনের ব্যাকুলতায় পার্বতী তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মহাদেবের সাহায্যে রহিমকে পুনর্জীবিত করেন।

রূপধনের পতিভক্তির পরিচয় মেলে অন্যত্রও, সে বলেছে :

পন্থের ধূলায় বালারে যত,
মোর সোয়ামীব গুণ তত রে,

সে অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী, তাই একাধিকবার স্বামীকে সে মন্ত্রবলে রক্ষা করেছে। তারই অনুরোধে দুর্বৃত্ত গুরুর মন পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে. রূপধন যে দেশে তার স্বামীসহ যেতে ইচ্ছা করেছে তাতে তার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে—

যেটে কোনো মানুষ কোন মানযির ক্ষেতি করে নাই,
কোনো মানুষ কোনো মানুষোক হিংসা করে নাই।

### মালিনী

মালিনী চরিত্রটিরও প্রশংসা করতে হয়, কেননা তার আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে রহিমকে মানুষ করা রূপধনের পক্ষে সম্ভব হত না। প্রত্যক্ষত সেই রাজকুমারকে লালন পালন করেছে আবার যথাসময়ে রূপধনের সঙ্গে রাজকুমারের মিলনের পথকেও সে সুগম করে দিয়েছে।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রাজপুত্রের। তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ তেমন ঘটেনি, তবে সে যে মেধাবী, বিনয়ী, কৃতজ্ঞতাবোধের অধিকারী সে সবের পরিচয় মেলে।

রাজা যেভাবে নিছক সত্যরক্ষার্থে তার আড়াইদিনের পুত্রের সঙ্গে দ্বাদশবর্ষীয়া মন্ত্রীকন্যার বিবাহ দিয়েছেন, তা রূপকথাতেই সম্ভব, বাস্তবে নয়। মন্ত্রীর অসহায়ত্ব সহজেই অনুধাবনযোগ্য। গুরু চরিত্রটি কলঙ্কের আধার হয়ে উঠেছে। শিষ্য পাছে তার বৃত্তির পথে অন্তরায় হয়, সেজন্য যেভাবে তার সর্বনাশে উদ্যত হয়েছেন, তা অকল্পনীয়। শুধু তাই নয়, শিষ্য-পত্নীকে তিনি যেভাবে পেতে চেয়েছিলেন, তাতেও তার চারিত্রিক

মহিমা বাড়ে না। তবে রূপধনের পিতৃসম্বোধনে তার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতেই বোঝা যায় তিনি একেবারে মনুষ্যত্ববোধে বিবর্জিত হয়ে পড়েননি।

পালাটিতে অলৌকিকত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। গুরু যেমন অলৌকিকশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি পরিচয় দিয়েছে রূপধনও অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে। মহাদেব কর্তৃক রহিমের পুনর্জীবিত হওয়ার মূলেও অলৌকিক ক্ষমতা কার্যকরী হয়েছে। রূপকথা জাতীয় পালা বলেই পার্বতী মহাদেবের ন্যায় দেবদেবী চরিত্র অবলীলাক্রমে পালায় উপস্থিত হতে পেরেছেন, মর্ত্যের মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ডাকাত জননীর আচরণে কিছুটা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। তার অভিনয় নৈপুণ্য কিংবা পুত্রদের বিলম্বিত উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য—

গোলামের ব্যাটারা মোর ডাকাতী করবার গেইচে,
ফিরি আসবার নাম গোন্দো না করিল।

—উপভোগ্য হয়েছে।

রহিমকে পরীক্ষার জন্য গুরু যে প্রশ্ন দুটি করেছেন তা আসলে প্রহেলিকা জাতীয়--

পদ্মবনে জয় যাব কিবা নাম তার,
সর্প শিশু লইয়া খেলে দিন রাত্রি আর।
পরমা সুন্দরী তবু এক চক্ষু নাই,
বলে সদা, মানুষের পূজা আমি চাই।

রহিম জবাবে বলেছে :

সর্পনাম মনসা সে এক নাম কানি,
চন্দ্রধর দিল পূজা তাকে আমি জানি।
এইরূপে মানুষের পূজা সে যে পায়,
পত্তিঘরে আজি সবে পূজে মনসায়।

ছন্দ কিংবা অলংকার প্রয়োগে তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে না। কাব্যিক প্রকাশও পালাটিতে অনুপস্থিত। 'তবে পালাটিতে বাস্তব এবং কল্পনার বেশ সংমিশ্রণ ঘটেছে তা স্বীকার করতে হবে।

### রূপবান কইন্যা

নিরাশপুরের বাদশা একবার এক সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ করার অপরাধে অভিশাপ লাভ করেন, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বাদশা লাভ করেন রহিমকে। তাঁর অপুত্রক নাম ঘোচে। সন্ন্যাসীর পরামর্শমত বাদশা তাঁর দ্বাদশদিনের সন্তানের সঙ্গে উজির কন্যা দ্বাদশ বর্ষীয়া রূপবান কন্যার বিবাহ দেন উজির ও উজির কন্যার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। এরপর রূপবান কত ক্লেশ, কত বিপদের সম্মুখীন হয়ে তার শিশু স্বামীকে মানুষ করে তুলল, দস্যু থেকে শুরু করে বাঘ, ছায়েদ বাদশা—সকলের আক্রমণ ও প্রতিকূলতা থেকে রহিমকে রক্ষা করল, শেষে আক্ষরিক অর্থেই রহিমের সঙ্গে রূপবানের মিলন হল, তারা

নিজেদের রাজ্যে ফিরে এল এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল সেই নিয়েই 'রূপবান কইন্যা' গীতিকাটি রচিত।

'রূপধন কইন্যা' পালাটির সঙ্গে আলোচ্য পালাটির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। 'রূপধন কইন্যা' পালাতেও রাজাকে তার পুত্রকে মন্ত্রী কন্যার সঙ্গে বয়সের গুরুতর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ দিতে দেখা গেছে, আলোচ্য পালাতেও তাই বর্ণিত হয়েছে। তবে 'রূপধন কইন্যা' পালায় যেখানে আড়াইদিনের রাজপুত্রের সঙ্গে দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহের বিষয় উল্লিখিত, আলোচ্য পালায় তৎপরিবর্তে দ্বাদশদিনের রাজপুত্রের সঙ্গে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। দুটি পালারই নায়কের নাম রহিম। দুটি পালাতেই নায়িকা অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে শিশু-পতিকে প্রতিপালন করেছে, মানুষ করে তুলেছে। দুটি পালাতেই নায়িকা দীর্ঘদিন আত্মপরিচয় গোপন রেখেছে নায়কের কাছে। 'রূপধন কইন্যা' এবং 'রূপবান কইন্যা' দুটি পালাই মিলনাত্মক। দ্বাদশবর্ষের অবসানে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে সকল দুঃখের অবসান শেষে যোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে দুটি ক্ষেত্রেই। দুটি পালাতেই শিশু নায়ক গুরুর পাঠশালায় প্রেরিত হয়েছে, দুটি পালাতেই মালিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে অপরিণত বয়স্ক নায়ককে প্রতিপালনে নায়িকাকে সহায়তা করার ব্যাপারে। তবে পার্থক্য যে নেই তাও নয়। বর্তমান পালাটি 'রূপধন কইন্যা'র তুলনায় দীর্ঘ। 'রূপধন কইন্যা'র যেখানে গুরুকে ভিলেন চরিত্রে দেখা গেছে, সেখানে বর্তমান পালায় ভিলেনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন ছায়েদ বাদশা। গুরুর শত্রুতা করার তবু একটা কারণ ছিল, কিন্তু অকারণে বাদশা কেন যে নাবালক রহিমের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন তার কারণ সুস্পষ্ট নয়। গুরুর মত বাদশাকেও দেখা গেছে নারী দেহ লোভী রূপে। এমনকি বাদশা-কন্যাও পিতৃবিরোধিতায় অবতীর্ণা। আলোচ্য পালাটি সঙ্গীতে সমৃদ্ধ। এই পালায় রূপবানের সহায়ক হিসাবে জংলী রাজের প্রসঙ্গ এসেছে, তাকে আমরা মুশকিল আসানের ভূমিকায় দেখি। 'রূপধন কইন্যা' পালাটি বড বেশি অলৌকিক ঘটনায় সমৃদ্ধ, সে তুলনায় অবশ্য 'রূপবান কইন্যা' পালাটি তেমন অলৌকিকতার বিবরণ সমৃদ্ধ নয়, এমনকি এই পালায় দেব-দেবীদেরও আনা হয়নি। 'রূপবান কইন্যা'য় ছায়েদ বাদশার কন্যা তাজেলকে রহিমের প্রেমিকা রূপে উপস্থিত করে কাহিনীতে কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। রূপবান কইন্যার সাগ্রহ অনুমতি নিয়ে তাজেলকেও স্ত্রীরূপে রহিম গ্রহণ করেছে। যাইহোক পার্থক্য যাই থাক, তথাপি মূলতঃ 'রূপধন কইন্যা' পালাটিরই যে বর্তমান পালাটি রূপান্তরিত রূপ তাতে সন্দেহ নেই, 'এ পালাটি উত্তরবঙ্গের রূপধন কইন্যা পালাটিরই হুবহু অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।'[৪১]

আলোচ্য পালাটি যে সঙ্গীত সমৃদ্ধ তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদী, সারি ইত্যাদি গানগুলিকে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। জংলী রাজার মুখে হিন্দী সংলাপ প্রযুক্ত হয়েছে (মাই, তুহার কুছ ডর নাই, তোহার লেড়কাকে মুই আদাব জানাই)। বৈরাগীর ছদ্মবেশে রহিম রূপবানের কাছে উপস্থিত হয়ে রূপবানের প্রশ্নের

উত্তরে যে আত্মপরিচয় দিয়েছে তা প্রহেলিকাময়, সে বলেছে, 'রামের বয়সে থাকি আমি গো, অসখী রহিম আমার মিতাজী, শোন সখী, সখী গো।' রূপবানের সতীত্ব, পিতৃমাতৃভক্তি, ছায়েদ কন্যা তাজেলের প্রেমিকার ভূমিকা, শত দুঃখভোগ করেও উজিরের নিজ সিদ্ধান্তে অটুট থাকা, অসম বয়সী পাত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহে অনীহা প্রকাশ, জংলী রাজার নিঃশর্ত সহায়তাদান উল্লেখযোগ্য। চিত্তরঞ্জন দেব, 'রূপবান কইন্যা'কে 'বহুলপ্রচারিত লোক নাটিকা'[৪২] বলেছেন, তিনিই আবার এটিকে 'আদর্শ লোকগীতিনাট্য' বলেছেন, পুনরায় স্বীকার করেছেন এর 'গীতকথা'রূপে স্বীকৃত হবার দাবীকে। আলোচ্য পালায় নাটকীয়তা অধিক পরিমাণে থাকলেও এটি গীতিকারূপেই বিবেচিত হবার দাবী রাখে অধিক।

## সতী রুমুনা ঝুমুনার পালা

চিত্তরঞ্জন দেব সংকলিত 'বাংলার লোক-গীত-কথা' সংকলনের সর্বশেষ পালাটি হল 'সতী রুমুনা ঝুমুনার পালা'। পালাটি সংকলক ২৪ পরগণার অন্তর্গত সোনারপুর অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছেন। গীতিকাটির চারটি সুস্পষ্ট বিভাগ। প্রথম বিভাগটি গড়ে উঠেছে রাজা চন্দ্রকেতুকে নিয়ে। চন্দ্রকেতু ইন্দি পরবের আয়োজন করলে দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর ভয় পাছে তাঁর ইন্দ্রত্ব যায়। তাই তিনি চন্দ্রকেতুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। চন্দ্রকেতু গঙ্গার পরম ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও গঙ্গা অঙ্গীকার করেন যে চন্দ্রকেতুর রাজত্বে প্রবেশ করার পর যাত্রাপথে যদি কোনো অনাচার বা অধর্মীয় কিছু প্রত্যক্ষ করেন, তবে তিনি সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করবেন। ইন্দ্র এবার যোগাযোগ করেন ভাটির প্রধান বড় খাঁ গাজীর সঙ্গে। চন্দ্রকেতুর বন্ধু হয়েও ইন্দ্রের প্ররোচনায় তিনি গঙ্গার যাত্রাপথে কয়েকটি গরুর কাটা মুণ্ড স্থাপন করে রাখলেন। ফলে কুপিত গঙ্গা যাত্রা অসম্পূর্ণ রেখে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর শুরু হল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, চন্দ্রকেতু হারিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বিভাগটি আবর্তিত হয়েছে দক্ষিণ রায়ের প্রতাপ ও কার্যাবলীকে অবলম্বন করে। চন্দ্রকেতুর বংশধর স্বরূপচাঁদের একমাত্র কন্যা ঝুমুনার সঙ্গে বিবাহ হল রায়মঙ্গলের অবনী চাঁদ সাহুর পুত্র মোহনের। ঘটকস্বরূপ চাঁদকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল জামাই নিয়ে আসার সময় পথে কেঁদোখালিতে যেন তিনি দক্ষিণরায়ের থানে পূজা দিয়ে আসেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত দক্ষিণ রায়ের পূজা দেওয়া হল না। আর তারই পরিণামে বিবাহের পর মোহন যখন নববধূসহ শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হল, সেখান থেকে দক্ষিণ রায়ের এক অনুচর ব্যাঘ্র তাকে চুরি করে নিয়ে গেল।

পালাটির তৃতীয় পর্যায়ে বনদেবীর উপাখ্যান, বিশেষত: তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বনদেবীর সক্রিয় প্রয়াসে রক্ষা পেয়েছে মোহনের জীবন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে, বনদেবীর ভক্ত মাধাইয়ের কন্যা রুমুনার বিবাহও সম্পন্ন হয়েছে। শেষপর্যন্ত ঝুমুনার সঙ্গেও মিলন হয়েছে মোহনের। রুমুনা-ঝুমুনা একত্রে যাত্রা করেছে স্বামী মোহনের সঙ্গে। পালাটির

চতুর্থ পর্যায় বনদেবী ও দক্ষিণ রায়ের সখ্য অবলম্বনে রচিত, এই পর্যায়ে বনদেবী ও দক্ষিণ রায়ের একত্র পূজার প্রচলন বৃত্তান্ত বর্ণিত। মূলতঃ পালাটিতে দক্ষিণ রায়ের ও বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। পাঠকের কাছে উভয়কে পূজনীয় করে তোলাব উদ্দেশ্য প্রকট।

মাধাই বলেছে :

বাবা রায়ের দয়ায় আর বনদেবীর কৃপায়,
কিছুরই আর অভাব মোর নাই এ ধরায়।
যে দিন হইতে বাবার দয়া পাইরাছি সার,
ঘরেতে বসিয়া মোম, মধু পাই ভাড়ে ভাড়।
কাষ্ঠ বেচি, মোম বেচি, দুঃখ কিছু নাই,
সাঁঝ সইঞ্ঝায় পূজি মুই দুই দেবতায়।

রুমুনা ঝুমুনাকে নিয়ে যাত্রাকালে মোহন—

অঞ্চলে বাঁধিয়া ফুল, বাবা দক্ষিণ বায়ের,
বনবিবি (বনদেবী) তলার মাটি লইল শিরোপরে।

পালাটিতে চন্দ্রকেতুর প্রসঙ্গটি অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে দেখা দিয়েছে। মূল পালার আস্বাদনে চন্দ্রকেতুর প্রসঙ্গটি অনাবশ্যক। দেবদেবী মাহাত্ম্য প্রচারই উদ্দেশ্য হওয়ায় স্বভাবত:ই পালাটিতে দুজনারই অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়েছে। বনদেবীর রক্ষীর মূর্তিধারণ, বাজপাখীর ছদ্মবেশে অবসন্ন মোহনকে ভূমিশয্যা থেকে তার ডানায় স্থাপন, দক্ষিণ রায়ের ব্যাঘ্র রূপ ধারণ তারই নিদর্শন। পালাটির দুটি ঘটনা উপভোগ্য, তন্মধ্যে একটি হাস্যরসোদ্দীপক, অপরটি মানবিক রসে মণ্ডিত। উপস্থিত বাঘেদের ফাঁকি দিয়ে মোহন বনদেবীর পরামর্শে বৃক্ষে আরোহণ করলে, তাকে ধরার অভিপ্রায়ে ব্যাঘ্রদের প্রয়াস

—একের পৃষ্ঠে আরেক বাঘ তখন লাগিল উঠিতে,
(আহা) যেন ইটের পরে ইট দিয়া দালান লাগিল গাঁথিতে।

এরপর বনদেবীর চক্রান্তে ভীমরুল কর্তৃক ব্যাঘ্রদের আক্রান্ত হওয়া ও তজ্জনিত পরিণতি—

আচমকা ভীমরুলের পাল আইলো ঝাঁকে ঝাঁকে
ভীমরুল আসিয়া দংশায় বাঘের চৌখেমুখে,
যন্ত্রণায় কাতর হইয়্যা বাঘের পালে নড়াচড়া করে।
নড়াচড়ায় বাঘের মেল গেল আলগা হইয়া,
ঝপাঝপ পড়ে বাঘ চৌদিগে ছড়াইয়া।

এইবার দ্বিতীয় ঘটনাটির প্রসঙ্গ। রুমুনা বনদেবীর নির্দেশে মোহনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েও ঝুমুনাকে আশ্বস্ত করেছে—

এই সত্য করি আজি তোমার গাত্র ছুঁই,
তোমার সুখের পথের কাঁটা কভু না হইব মুই।

স্বামী সঙ্গে নিশ্চিন্তিতে সুখে নিশি যাপ,

ঝুমুনাও প্রত্যুত্তরে রুমুনাকে প্রসন্নচিত্তে সতীন বলে মেনে নিয়েছে—

ঝুমুনা বলে, ভগ্নী, বুঝিলাম সার,
সকলই দেবতার ইচ্ছা মোরা নিমিত্তের ভার।
আজি হতে মোরা দুই বোন রহিব একত্রে,
নিজের হাতে নিজের গহনা দিয়ে সে সাজিয়ে দিয়েছে রুমুনাকে।

দুটি প্রযুক্ত অলংকারের উল্লেখ করা যেতে পারে, তন্মধ্যে প্রথমটিতে বাস্তবিকই অভিনবত্বের স্বাক্ষর বিদ্যমান—

নামেতে মোহন যার রূপে চান্দ পানা,
খেসারীর ডাইলের মত অপূর্ব দেহ খানা।

দ্বিতীয় অলংকারটি অবশ্য গতানুগতিক—

উপরে চান্দোয়া শোভে নিচেতে ফরাশ পাতা,
তার মধ্যে বেনিয়ার পোর আসন যেন বিলের পদ্মপাতা।

## দোলেহার

আমাদের অনেকেরই মনে এবকম একটা সংশয় আছে যে গীতিকা বুঝিবা আর রচিত হয় না, মৈমনসিংহ গীতিকা কিংবা পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংকলন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গীতিকার সংগ্রহ কিংবা এব রচনার ধারা স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই ধারণা যে যথার্থ নয়, তারই প্রমাণ মোহম্মদ আয়ুব হোসেন সংগৃহীত 'দোলেহার' গীতিকাটি। গীতিকাটি প্রকাশিত হয 'লোকসংস্কৃতি' পত্রিকার বৈশাখ—আষাঢ় সংখ্যায়, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে।

পালাটি যে মুসলিম কবির বচনা তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'বন্দনা'য় শব্দব্যবহারে এবং পালার আখ্যানাংশে। পালাটি যে অর্বাচীনকালের রচনা তার প্রমাণ দোলেহাবের উদ্দেশে নাগরের উক্তিতেই মেলে :

তুমি বালিশ পেতেছ, বালিশে ওয়াড় লাগাও নাই কেনো।।
তুমি কাপড পড়েছ, শাযা পড় নাই কেনো।।

বালিশের ওয়াড়, শায়া ইত্যাদির উল্লেখ লক্ষণীয়। দোলেহারের উক্তিতেও অর্বাচীনত্বের স্বাক্ষব বিদ্যমান :

তুমি ধুতি পড়েছ, আণ্ডারপ্যান পড নাই কেনো
তুমি জামা পড়েছ, গেঞ্জি পড় নাই কেনো।।
তুমি জুতো পড়েছ, মোজা পড় নাই কেনো।।

'দোলেহার' পালার আখ্যানে কোনো অভিনবত্ব নেই, আকর্ষণীয কবিত্ব শক্তিব পরিচয়ও তেমন মেলে না, এমনকি ছন্দব্যবহারেও তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে না। এক গ্রাম্য প্রেমকাহিনী নিয়ে পালাটি রচিত হয়। এর পরিণতিটি করুণ রসাত্মক। পালাটির নায়িকা দোলেহার। পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় সে প্রতিপালিত হয় খুড়তুতো ভাই

ও তার স্ত্রীর কাছে। দোলেহার চাল বিক্রয় করতে যাবার পথে চেংড়া কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাকে রক্ষা করে নাগর। ক্রমে নাগরের সঙ্গেই তার প্রেম এবং শেষে উভয়ের বিবাহ হয়। দোলেহারকে নাগরের মাতা এবং ভগ্নী উৎপীড়ন করত। ননদের বিবাহ হয়ে গেল। দোলেহারের শাশুড়ী প্রতিহিংসাপরায়ণবশতঃ বিষযুক্ত পিঠে দিল পুত্রবধূকে। তাতেই নায়ক-নায়িকার মৃত্যু হয়। আমরা ছড়ায় শাশুড়ী-বধূর তিক্ত সম্পর্কের পরিচয় পেয়েছি, গীতিকায় কিন্তু মোটামুটিভাবে এর বৈপরীত্যই লক্ষ্য করা গেছে। 'দোলেহার' পালাটিতে শাশুড়ীর আক্রোশে পুত্র পুত্রবধূর মৃত্যু ঘটেছে। অবশ্য দোলেহারের শাশুড়ীও রেহাই পায়নি, ভুল করে সে নিজেও বিষ পিঠে খেয়ে মৃত্যুর শিকার হয়েছে। এইভাবেই তার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। ধুয়া, কথোপকথন, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি গীতিকার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচ্য পালাটিতেও বর্তমান। তবে মৈমনসিংহ গীতিকা কিংবা পূর্ববঙ্গ গীতিকায় অলংকারপ্রয়োগে যে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর মিলেছে এখানে তা অনুপস্থিত। নানাবিধ পিঠের বিবরণ, আভরণের উল্লেখ পালাটিতে লক্ষণীয়। যদিও পালাটি মুসলমান কর্তৃক রচিত, তথাপি রাধাকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষভাবে পালাটিতে লক্ষণীয়। দোলেহারের সৌন্দর্য বর্ণনায় নানাবিধ কুসুমের উল্লেখ কিছুটা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। নাগরের চাচাতো শালার বউয়ের চরিত্রটি খুব জীবন্ত হয়েছে। কৈমাছের হিসাব দিতে গিয়ে সে যা বলেছে তা হল :

বাছতে ধুতে দুটে গেল চিলের ছো-এ।
সজাতে গিয়ে দুটে খেলে পুষি বিড়াল।।
রাঁধতে গিয়ে পড়ল দুটো চুলোর ভিতর।
লুন চাখতে পড়ল দুটো ছায়ের গাদায়।।
পাড়ার নানী চাইলে দুটো তাকে দিলাম।।
খেলোন খুলে মাছের ভাপ ছাড়ালাম।।
ইন্দুরেতে তখন দুটো নিয়ে গর্তে ঢুকল।।
ইন্দুরেতে মুখ দিয়েছে তিনটে আমি ফেলিয়ে দিলাম।।
একটা ছিল সেইটা আমি পাতে দিলাম।।
আমি যে আনের বিটিবঝি তাইতো ধরে হিসাব দি
আর যদি হও আনের বিটির পো
আগা আর নেজ খেয়ে মাঝখানটা থো।।

এইভাবেই নাগরের চাচাতো শালার বউ ষোলটি কইমাছের হিসাব দিয়েছে স্বামীকে, অবশ্যই পরে বোঝা গেছে নাগর ও দোলেহারকে মাছ দেবে না বলেই সে মিথ্যা করে এই হিসাব দাখিল করেছিল।

উইলিয়াম কেরী সংকলিত প্রথম যে বাংলা ছড়াটি কেরীর 'ইতিহাসমালা'য় (১৮১২) সংকলিত হয়েছিল, সেটি এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হল :

'মাছ আনিলা ছয়গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাঁকী রহিল ষোল

তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট দুইটায়
কিনিলাম দুই আটি কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে
চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল দুই তার একটা চাখিয়া
দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক ঐ পাতপানে চাহিয়া
দেখ এখন হইস যদি মানুষের পো তবে কাঁটা
খান খাইয়া মাছ খান থো আমি যেঁই মেয়ে
তেই হিসাব দিলাম কয়ে...।

নাগরের সাতদিন অনুপস্থিতিতে দোলেহারের নাগরের আচরণে অভিমানের বর্ণনাটি বড় বাস্তবানুগ হয়েছে স্বীকার করতে হয়। পালাটিতে গদ্য বিবরণও বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণেই সংযোজিত হয়েছে।

## নাদের-মনোয়ারা

নাদের-মনোয়ারা পালাটি খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে গীতিকার বৈশিষ্ট্যগুলি এই পালাটিতে বিদ্যমান রয়েছে লক্ষিত হয়। পালাটি 'বন্দনা' অংশ দিয়ে শুরু। বন্দনাংশে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষণীয়। দয়াল নবীর চরণ কিংবা কাবাগৃহ যেমন বন্দিত হয়েছে, তেমনি বন্দিত হয়েছে হিমালয় এবং গঙ্গা। এটি যে গীত হবার জন্য রচিত, ধূয়ার সংযোজনেই তা প্রমাণিত। তাছাড়া পালাটির অর্ধাংশ নায়িকার স্বগতোক্তিতে রচিত। পালাটির বিষয় বডই বিচিত্র। কুলতলা গ্রামের মুন্‌শী পরিবারের দুই ভাই কাদের ও নাদের। কাদের বযসে নাদেরের তুলনায় অনেক বড়—বারো বছরের ব্যবধান উভয়ের মধ্যে। কাদেরের বিবাহ হল বকুলতলা গ্রামে। তার একটি কন্যা সন্তানও হল। তার নামকরণ করা হল মনোয়ারা বা মোনোরা। ষোল বছরের নাদের মুন্‌শী ভাইঝিকে কোলেপিঠে করে মানুষ করে। আকস্মিকভাবে মুন্‌শী পরিবারে বিপদ ঘনিয়ে এল। পরপর দু'রাত আড়াআড়ি সময়ে মারা গেল কাদের এবং তার স্ত্রী। মাতৃহীন মনোয়ারকে মানুষ করতে লাগল নাদের।

নাদের ঠিক করল সে বিবাহ করবে না, যথাসময়ে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দেবে, জামাইকে ঘবজামাই করবে। আর সে নিজে কবির গান করে জীবিকা নির্বাহ করবে। ক্রমে মোনোরা বড় হয়। কিশোরী থেকে সে হয় যুবতী।

একদিন স্নানরতা মোনোরাকে দেখতে পেল নাদের। পরিবর্তন ঘটে গেল তার মানসিকতায়। যে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সে অপত্য স্নেহে লালন করছিল, হয়ে উঠল সে তার প্রেমিক। শেষপর্যন্ত :

চাচায় করলো লালন পালন বক্ষে ধরে পাণি।
চাচাই হরণ করলো আমার সোনার অঙ্গখানি।।

মোনোরার এ বিবাহে সায় ছিল না। সে দুঃখ করে বলেছে :

আগে যদি জানতাম আমি চাচায় করবে বিয়া

আতুর ঘরে মরতুম আমি মুখে লবণ দিয়া।।

এমনকি, ভাইঝি থেকে বিবি হবার পর সে আত্মঘাতিনী হবারও চেষ্টা করেছে, কলঙ্কিত জীবনকে নিঃশেষিত করতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা আর পারেনি :

কোথায় ছিল চাচা আমাব ধরলে ছুরির হাত।
বললে তুমি বেঁচে থাক আমি মরি কম জাত।।

পালাটির মধ্যে যে পংক্তিটি খুবই মর্মান্তিক এবং করুণ তা হল :

এখন আমি তোমার বিবি, ভাইঝি গেল মরে।।

ঘটনার অভিনবত্ব ব্যতীত পালাটিতে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে না। অলংকার প্রয়োগ গতানুগতিক। কাব্যিক প্রকাশেরও তেমন কোন পরিচয় নেই। কন্যার মুখে তার নিজের রূপবর্ণনা এবং কামাতুর চাচার স্পর্শে তাব মধ্যে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা কিছুটা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। সচরাচর গীতিকায় নারীর দেহ সৌন্দর্য বণনায় যে শালীনতা রক্ষিত হতে দেখা যায়, আলোচ্য পালাটিতে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে।

## পাদটীকা

১. বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড ; ৩য় সংস্করণ (১৯৬২) ; পৃ: ৪১২
২. „ „ „ পৃ: ৪১৪
৩ „ „ „ পৃ: ৪১৬
৪ „ „ „ পৃ: ৪১৬
৫. „ „ „ পৃ: ৪১৮
৬. „ „ „ পৃ: ৪১৮
৭. „ „ „ পৃ: ৪২০
৮. „ „ „ পৃ: ৪২৬
৯. „ „ „ পৃ: ৪২৬
১০. বাংলা গাথা কাব্য ; ১৯৬২ , ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য , পৃ: ৩৬
১১. „ „ পৃ: ৪২২-৪২৩
১২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, (১৯২৬), ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা পৃ: ২৯
১৩. „ „ পৃ: ৮২
১৪ „ „ পৃ: ৭৮
১৫ „ „ পৃ: ৩৮
১৬ „ „ পৃ: ১৪
১৭ „ „ পৃ. ২৬
১৮ „ „ পৃ.
১৯. „ „ পৃ: ৯
২০. 'যে ঘটনা-সমৃদ্ধি গীতিকাগুলিকে নাট্যগুণ দান করিয়াছে, ইহাও সেই গুণ হইতে বঞ্চিত নহে'। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য , বাংলার লোক-সাহিত্য ; ১ম খণ্ড ; ৩য় সং (১৯৬২) ; পৃ: ৪৩৫।
২১ 'কবিত্বের দৈন্য ঘটনার বাহুল্য দ্বারা পূর্ণ করিবার প্রয়াস যে সকল গীতিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে 'ভেলুয়া' অন্যতম'।—বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড ; ৩য় সং (১৯৬২) ; পৃ: ৪৩৬।
২২ বাংলার লোক-সাহিত্য , ১ম খণ্ড, ৩য় সং (১৯৬২) ; পৃ: ৪৩৬।
২৩ প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ; ২য় খণ্ড ; পৃ: ৩৮১।
২৪. 'মাঞ্জুর-মার অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিলাভ করিয়া নিরপেক্ষভাবে নায়ক-নায়িকার মর্মস্থল আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সামাজিক সংস্কার, চিরাগত ধারণা কিছুতেই সেই অনাবিল অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই।'—দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ৩য় খণ্ড; ২য় সংখ্যা; পৃ. ৫।
২৫. বাংলাগাথা কাব্য : ১৯৬২ ; ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য ; পৃ. ৬৭।
২৬. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা পৃ. ৫৪১।
২৭. প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত) , ২য় খণ্ড , পৃ: ৩১৯।
২৮. পূর্ববঙ্গ গীতিকা (দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত) , ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা , পৃ: ৪৮৪।
২৯. „ „ পৃ. ৫৮৪।
৩০ „ „ পৃ. ৫৩৭।
৩১ কতকটা রূপকথার মত হইলেও এই গানটি পল্লীরস মাধুর্যে ভরপুর।...আমাদের চোখে বাঙ্গলার পল্লীমহিমা উদঘাটিত করিয়া দেখায়।'- ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য ; বাংলা গাথাকাব্য ; পৃ: ১০৫।
৩২. 'পালাগুলিতে উৎকৃষ্ট নায়িকার অভাব নাই, কিন্তু নায়িকার উপযুক্ত নায়কের সংখ্যা কম। এই

অল্পসংখ্যক নায়কের মধ্যে বীরনারায়ণ একজন।'—ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য : বাংলাগাথা কাব্য ; পৃ: ৯৪।

৩৩. 'অপরাপর পালাগানগুলির প্রথিতকীর্তি মহীয়সী মহিলা চরিত্রসমূহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবার যোগ্যা, তিনি সর্ববিধ গুণমণ্ডিতা।' দীনেশচন্দ্র সেন . পূর্ববঙ্গ গীতিকা , ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা পৃ: ৫০৯।

৩৪ পূর্ববঙ্গগীতিকা ; ৪র্থ খণ্ড , ২য় সংখ্যা , পৃ ৫০৯।

৩৫ 'পালাটি প্রাচীন ভাল পালাগুলির সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার দাবী করিতে পারে.. ।' দীনেশচন্দ্র সেন , পূর্ববঙ্গ গীতিকা ; ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা। পৃ. ৪৯১।

৩৬ পূর্ববঙ্গ গীতিকা , ৪র্থ খণ্ড , ২য় সংখ্যা , পৃ. ৪৯১।

৩৭ ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য , বাংলা গাথাকাব্য , ১৯৬২ ; পৃ ৮৩-৮৪।

৩৮. ,, ,, ,, পৃ. ১০০।

৩৯ পূর্ববঙ্গ গীতিকা , ৪র্থ খণ্ড ; ২য় সংখ্যা , পৃ. ৫৪৩।

৪০ ,, ,, ,, পৃ: ৫৪৫।

৪১ বাংলার লোক-গীতকথা , ১৯৮৬ , পৃ. ২৯৪।

৪২. ,, , পৃ: ২৯৪।

## পরিশিষ্ট

# গীতিকায় ব্যবহৃত দুরূহ ও অপরিচিত শব্দাবলী

"রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই পালা"

যাগা—জায়গা
খবুরগা—সংবাদদাতা
ইল্‌বিশ—সজারু
টাঙ্গন—দৌড়ের ঘোড়া
জলাত্‌—জলায়
কেবার—দরওয়াজা
মাসমিত্রা—মাসীমা
সইন্ধ্যা—সন্ধ্যা
ছেয়ান—স্নান
পোত্তলা—পুতুল
এন্দুর- ইন্দুর
গোলইন—লাথি
নাঠা—দুষ্ট
গৈরের—গরান কাঠের
কিয়েরলাই—কিসের জন্য
চোবাড—চপেটাঘাত
তজ্‌বিজ—তদ্বির
চেগ—চক্ষু
আল্‌গে—আড়ালে
সাজিপাড়ি—সেজেগুজে
খেসিকুটুম—আত্মীয়স্বজন
উড়্‌গালড়—ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়
মালুমদিন—সারাটা দিন
ঘাঁড়া—গ্রাম্যরাস্তা
হেকমত—কৌশল
ছরদ্ধা—শ্রদ্ধা
পাত্তর—পাত্র
ডালুম—ডালিম
যাগার—জায়গার
টবা—তোবড়া
তেতই—তেঁতুল
যুল—ষোল
মত্তর—মোহর
জিঙ্গল—কঞ্চি
কিস্টব—কৃষ্ণের
পউদ্দের—পদ্মের
আবাজ—আওয়াজ
আসান—আশ্বাস
সুজিব—শোধ করব
বেভারের—ব্যবহারের
চৌখুট—চতুষ্কোণ
ঘেণ্ডির—ঘাড়ের
কোস্তি—কুস্তি
নুকাত্‌—নৌকাতে
যত্তন—যত্ন
কোব—কোপ
জঙ্গে—যুদ্ধে
হাঁচুরি—সাঁতরে
বেনুন—ব্যঞ্জন
লাউগ—নাগাল
দুক্ষিত—দুঃখিত
হুলুকা—মশাল
কিরগা—প্রতিশ্রুতি

### "মানিকতারা ডাকাইতের পালা"

বরম্‌পুত্র—ব্রহ্মপুত্র
বরম্‌দত্তি—ব্রহ্মদত্তি
অন্ধিকার—অন্ধকার

তেলেছ্মাত্—তেলের মত তরঙ্গশূন্য
আজুরা—পারিশ্রমিক
গুদারা—আবরণহীন নৌকা
রুসাই—রসুই
জেহরপাতি--গহনাপত্র
নাই—নাপিত
পুনাই—পুত্রসন্তান
ছোন—শন
মইল—মরিল
ছোট্কা--কনিষ্ঠপুত্র
লড়ি—লাঠি
পাছের থনে--পেছন থেকে
জগদিষ্ট--জগদীশ
ফ্যটিক—কিছু
মচ্ছ—মৎস্য
ডাঙ্গর—কর্মক্ষম
বিরিক্ষ--বৃক্ষ
দিরি—দিকে
কোয়ানে—কোথায়
নাঠি—লাঠি
দব্ব--দ্রব্য
বনেলা--বন্য
ঠাকরাইন—ঠাকুরাণী
কাইন্দল—কাঁদলেন
গুন্যা--শুনিয়া
রাখ্বাইন—রাখিবেন
যাইবাইন –যাবেন
ভুরা—ভেলা
জব্—গুজব
কাকোই—চিরুণী
আছাড়ি—বাট
আশ্যিপশ্যি—আশপাশের লোক
বেইল—বেলা
অ্যাহনত্যাহন—এখন তখন
নাফাগোফা—মোটাসোটা
কাঞ্জি--আমানি
বাড়ীথিক্যা—বাড়ী থেকে
আজল--অঞ্জলি
পইবাণী--পবী
যইবতী—যুবতী
চিন্—পরিচয়
আছুইন—আছেন
জানুইন্--জানেন
জীবমানে—জীবিতকালে
রোউ--রুই
হাউড়ী—শাশুড়ী
হুড়ুম—মুড়ি
হউর—শ্বশুর
মাইজালেতে--মেঝেতে
অইষ্টক্ষণ- সর্বক্ষণ
আচ্পন—আচমন
বিধপা--বিধবা
অহন—এখন
শুইজবার- শোধ করবার
পুনি--কন্যা
কানছিকোনা—আনাচকানাচ
ফাটক--ফাঁদ
ধুন্কী-বাটোইল—ধনুক ও বাটুল
চাইকের—চাকের
কপাল কের্মে—কপালক্রমে
অখনে--এখন
সুজবাম—শোধ করব
বাইয়ালী—নর্তকী
কাল্লা--মস্তক
দিরিরতন- দিক থেকে
বেড়াবেড়ি—পীড়াপীড়ি
পিঁধন—পরিধেয় বস্ত্র
এন্দুরে—ইঁদুরে

**"নেজাম ডাকাইত পীরের কেরামতি"**

পরভুকরতা—প্রভুকর্তা
খাজুইর‍্যা—খেঁজুরগাছের মত
উচল—উচ্চ
ইছিম—ইষ্টমন্ত্র
বির্দ্দ—বৃদ্ধ
হেষ্টমুখী—হেঁটমুখে
আবাজ—আওয়াজ
ভূইচাল—ভূমিকম্প
করদাকর্‌দা—গাদাগাদা
চলভল্—চঞ্চল
মিস্কিন—উদাসীন
বুগ—বুক
ইছিমডা—ইষ্টমন্ত্র
আন্দরে—অন্দরে
ফাল—লম্ফ
অকমানী—হতমান
পাকল—পাগল
চুম্প—চুম্বন
বেমান—অসীম
কজলে—অনুগ্রহে
হোঁস—হুঁশ্
থির—স্থির
নিচ্চয়—নিশ্চয়
পশরা—আলো
কুঁদখুঁটি—কুন্দকলি
আইশনা—আশ্বিনমাসের
সাত্‌র—সাঁতার
পওন- পবন
সিঞ্চা—আর্দ্র
পিঁউরী—পাপড়ি
নিগম্‌কথা—গোপনকথা
বিলাই—বিড়াল
গুড়ু—গুড
মিত্তিকায়—মৃত্তিকায়
ফ্রুঙ্গি—স্ফুলিঙ্গ
রসুয়া—রসিক
চাড়িগাইযা—চট্টগ্রামী
ঠামকি—ঠোকা
ঝিনাই—ঝিনুক
দুধপানি—সাদাজল
চাকি—বেতের ঝুড়ি
দুর্জন্যা—দুর্জন
কাডাল—বড়ো হালচালানোর দং
নাল—নালা
তোফান—তুফান
মইল—মরিল
বইডা—বৈঠা

**"মইষাল বন্ধু সাঁজুতি কন্যার পালা"**

ময়ালে—মহলে
খরষাণ—খরস্রোতা
গিবস্থ—গৃহস্থ
আসান—সান্ত্বনা
পাথর—পাথর
অনাটন—অনটন
অয়রাণে—অরণ্যে
সুজিতে—শোধ করতে

**"শান্তি কন্যার হাহলা"**

বিয়ালে—বৈকালে
জ্ঞিয়ানী—জ্ঞানী
বাইন্যার—বেনের
ধরের মদ্দি—ধড়ের মধ্যে
সুহাইগ্যা—সোহাগের
নবীলা—নবীন
সয়স্রেক—সহস্র
দীঘ্যাল—দীর্ঘ

মশইর—মশারী
নেওয়ালী—তোষক
হিজা—হিজড়ে
উয়্যা—উহা
আনছাও—এনেছ
তউ—তবু
বিগানার মণ্ডলে—লম্পটের গৃহে
কক্কালে—কাঁখে

**"রতন ঠাকুরের পালা"**

দিলাইন—দিলেন
বিকায়্যা—বিক্রয় করে
বির্দ্ধমালী—বৃদ্ধ মালী
জিগাই—জিজ্ঞাসা করি
দুইন্যায়—দুনিয়ায়
দিয়ম—দিব
ছান—স্নান
বান্ধিম—বাঁধিব
ডালুম—ডালিম ফল
লাইম্‌ছে—নামিতেছে
পৈথান—পায়ের দিক
শিথান—মাথার দিক

**"হরিণকুমার জিরালনী কন্যার পালা"**

চৌঘুড়ি—চার ঘোড়ার টানা গাড়ি
দূরণ—দূর
বেগানন্‌-বেগবান
বেবান—গভীর
গোটা—একটা
কন্ন—কর্ণ
পোষণীয়া—বশীভূত
লাইম্যা—নেমে
মোইত—মোহিত
সেজুতিয়া—সন্ধ্যা
শিশুতি—শিশু
পউদ্মের—পদ্মের
সুরণ—স্মরণ
গিয়ান—জ্ঞান
বেভুলা—বিহ্বল
চিন্‌—চিহ্ন
গুমুর—গুপ্ত
অথির—অস্থির
বেরথা—বৃথা
সপ্প—সর্প
বেইল—বেলা
উলাস—উল্লাস
উতাল—উতোল
অঘুব—ঘোরতর
ভাইন—ভগিনী
থুন—থেকে
মুইট—মুষ্টি
গিরকার্য—গৃহকার্য
উবাসে—উপবাসে
যুব্বামতি—যৌবনোচিত
পরতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা
গতাগম্য—গমনাগমন
কিবান—কি প্রকার
পরজা—প্রজা
গিয়ানগম্য—কাণ্ডজ্ঞান
চক—কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র
ভরষ্ট—ভ্রষ্ট
সর্মান—সম্মান
গাবর—গোঁয়ার, নির্বোধ
বিরধাতা—বিধাতা

**"সন্নমালার পালা"**

উজালা—উজ্জ্বল
ঝালা—ঝলমলে

পরাণী—প্রাণী
কবিলা—কপিলা
বিবারণ—বিবরণ
পরজা—প্রজা
পরতিম—প্রতিমা
দরিশন—দর্শন
সহেলা—সই
নিব্বন্দ—নির্বন্ধ
খিয়াতি—খ্যাতি
নিচ্চয়—নিশ্চয়
মড়ি—মড়া
পরস্তা—প্রস্তাব
উদাম—উদ্দাম
চন্নন—চন্দন
গাথা—গর্ত
স্মুবি—স্মরণ করে
সল্‌কি—সড়কি

**"দেওয়ান ঈশা খাঁর পালা"**

দুস্তি—দোস্তি
ডেমাক—দেমাক
মিরিগেব—মৃগের
সর্মত—সম্মত
অখনি—এখনই
ঢংস—ধ্বংস
বাস্তব্যি—মাতব্বরি
ফুইদ—সন্ধান
ধুন্ধ—বুদ্ধিহীন
সর্মান—সম্মান
পলাখুজি—লুকোচুরি
ছন্নদ—সনদ
গুছুল—গোসল
সিতাবি—দ্রুত
পুনর্চয়—পুনর্বার

দাদ—আক্রোশ
পুন্নিত—পূর্ণ, সম্পূর্ণ
স্তিরি—স্ত্রী
খাউয়া—খাইবার
পরচার—প্রচার
কটুয়াল—কোতোয়াল
চুন্ন—চূর্ণ
কুইমর—কুমীর
আগান্ত-বাগান্ত—আদ্যোপান্ত
বেনুন—ব্যঞ্জন
অরচিত—হরষিত
জেযর—জহরত

**"রাজা রঘুর পালা"**

শুইত্যা—শুয়ে
ছালি—ছাই
উফর্ ফাফর—ধড়ফড়
শইল্যে—শরীরে
আলামালা—এলোমেলো
সন্দ—সন্দেহ
বাইড়্—বৃদ্ধি
আজুকা—অদ্য
জোয়াপ—জবাব
আবেস্থায়—অবস্থায়
পাযাড়—পাহাড়
শৃকাল—শৃগাল

**"পরীবানু বেগমের পালা"**

কাড়াকাড়ি—কাটাকাটি
ডুপাইলি—ডুবাইলি
পইখ্‌পহালী—পাখ-পাখালী
দোনো—দু'জন
উয়র—উপর
ফাল—লম্ফ

কণ্ডে—কোথায়
নুকা—নৌকা
আদিগুড়ি—আগাগোড়া
ভোকালুয়ে—ক্ষুধার্ত
হাবা—হাওয়া
ভরমণা—ভ্রমণ
মনত্—মনে
ছালৈন—ব্যঞ্জন

**"সুজা তনয়ার বিলাপ"**
ভইন—বহিন
লালছে—লালসার
ছুল্লুক—পরামর্শ
দুরগইত্যা—দুর্দশাগ্রস্ত
তুইষর—তুষের
বুগ—বুক
জীয়ত—জীবিত
ঘিন—ঘৃণা
বাছন—বাসন
বালুশ—বালিশ
চোগর—চোখের
পিনবার—পরিধানের
গায়র—গায়ের
তলাত—তলে
আছমান—আসমান

**"মহুয়া"**
পির্থিমি—পৃথিবী
বইন্ধ্যা—বন্দনা করিয়া
ইন্দু—হিন্দু
মাইন্সের—মানুষের
ববাম্মন—ব্রাহ্মণ
শুল—ষোল
কছরত—কসরত

বির্দ্ধ—বৃদ্ধ
ভর্মিতে—ভ্রমণ করিতে
শুক্কুর—শুক্র
দইয়ল—দোয়েল
গুয়াইল—অতিক্রান্ত হল
টেকা—টাকা
ছেরি—ছুঁড়ি
কইলৎ—কবুলত
বাইঙ্গন -বেগুন
চান—চাঁদ
বয়ারে—বাতাসে
সুদর—সহোদর
যইবন—যোবন
হেওলা—শে. ওলা
পুইর‍্যা—পুড়িয়া
গহীন—গভীর
বইন—বোন
চউক্ষে—চক্ষে
অইছে—হয়েছে
মুরতেক—মুহূর্তের জন্য
কুইল—কোকিল
ছেড়ি—ছুঁড়ি
ঘাঘুরি—গাগরি
গুচ্যা—ঘুচিয়া
গরাস—গ্রাস
সন্দে—সন্দেহ
পরবুধ—প্রবোধ
উরদিশে—উদ্দেশে
তিরভুবন-ত্রিভুবন
রাউখাল—রাখাল
চইতের—চৈত্রের
বরত—ব্রত
আগুণ—অগ্রহায়ণ
ভোঞ্জন—ভোজন

পরখাই—পরীক্ষা
বইক্ষেতে—বক্ষেতে
সাওরে—সাগরে
সুনালী—সোনালী
শণেতে—শূন্যেতে
ময়ালে—মহলে
অজগইরা—অজগর
মুছ—গোঁফ
হাজি—মাঝি
তেরালেঙ্গা—ট্যারাল্যাংডা
অকরসাত—অকস্মাৎ
কয়বব—কবব
গন্থি—গাঁথি

"মলুয়া"
আইশ্‌নারে—আশ্বিনের
আগণ—অগ্রহায়ণ
মাও—মা
কিশ্যি—কৃষি
ছাল্যা—ছেলে
মইষ—মহিষ
ডুগল—অগ্রভাগ
মাজনে—মহাজনকে
শীগারে—শিকারে
ঘর তনে—ঘর থেকে
জিল্কি—বিদ্যুৎ
পুইরা—পুড়ে
গেরাম—গ্রাম
জেঠ—জ্যৈষ্ঠ
ডাগল—ডাগর
মবল—মোড়ল
দুধবিয়ানী—দুগ্ধবতী
ছান—স্নান
ডংশিলে—দংশন করিলে

পিন্দ্যা—পরিধান করে
আগুসার—অগ্রসর
রুসনাই—রোশনাই
অর্গা—অর্ঘ
সাজুয়ারতারা—সাঁঝের তারা
পরদীম—প্রদীপ
আশ্যা—আশ্রয়
সাউদেরে—সাধুরে
ফানা—পাগল
পরণা—পরোয়ানা
অপরকাশ—অপ্রকাশ
উবাস—উপবাস
চনামিতি—চরণামৃত
শরীলে—শরীরে
উত্তকা—উতলা
স্বীকুবি—স্বীকার
মৈলান—মলিন
আলুফা—ভাল
বাজেপ্ত—বাজেয়াপ্ত
পাছুরী—পশ্চাৎ
পরতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠা
পরাচিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত
পন্নামিল—প্রণাম করল
পরীখাইয়া—পরীক্ষা করিয়া
দৈমত—দ্বিমত
হাউড়ী—শাশুড়ী

"চন্দ্রাবতী"
বাছ্যাবাছ্যা—বেছে বেছে
যোগল—যুগল
ঢুল—ঢোল
আব্যধিক—আভ্যুতিক
উতরুল—উদ্বিগ্ন
জম্মথ—আজন্মকাল

উমেদা—উন্মত্ত
দুষ্কু—দুঃখ

"কমলা"
তুইন—তুই / তুইনা
নিয়ড়ে—নিকটে
ইতে—ইহাতে
ঘরতনে—ঘর থেকে
লুচ্চা—লোচ্চাড়
ঠুট—ঠোঁট
কেল—কোঁড
গজন্দম—গজেন্দ্রগমন
ছান-স্নান
আনিগুনি—আনাগোনা
আইছুইন—এসেছেন
বৈসনের—বসিবার
সাজুয়া—সাজানো
চান্দমা—চন্দ্রিমা
পদুম- পদ্ম
কাছলা—গামছা
সাধ্যা—সেধে
আঁচ—আঁচল
ছোরত—রূপ
পবতিশোধ—প্রতিশোধ
জান্য—জানিও
উগাইল—উশুল করল
পরাচিত্তির—প্রায়শ্চিত্ত
অবিয়াত—অবিবাহিত
কানবে—কাঁদিবে
যাগা—জায়গা
মেন্নত—মেহন্নত
উপচিল—উপস্থিত হল
আচরিত—আশ্চর্য
কৈয়াম—বলব

গলুব—গয়লাব
আশ্রা—আশ্রয়
আবের—অভ্রের
সিনানের—স্নানের
কড়ি—গুঁড়ি
আইঞ্চল—আঁচল
শায়ান্যা—শ্রাবণের
চান্নি—চাঁদনী
নাইচ—নাচ
ভাইস্তা—ভ্রাতুস্পুত্র
মুখচন্দিকে- মুখচন্দ্রিকা

"দেওয়ান ভাবনা"
গিরের—গৃহে
ইরামতী—হীরামতী
পরদীপ্—প্রদীপ
বিরক্ষ—বৃক্ষ
পরতিবাসী—প্রতিবেশী
যেমুন— যেমন
শুক্যা—শুকাইযা
যৈবন—যৌবন
গেরাম—গ্রাম
বেবসা—ব্যবসা
বাউন—ব্রাহ্মণ
রুল—গুঞ্জন
কালুকা—কল্য
বর্মা—ব্রহ্মা
পরতি—প্রতি
রাইতের-রাতের
আইজের—আজকের
গাঁইথ্যো—গেঁথো
পুষ্কণী—পুষ্করিণী
বাউন্ন—বাহান্ন
কাগায়—কাকে

নিব্যা—নিবিয়া
ঘিরত্—ঘৃত
যৈবতী—যুবতী
অলছ তলছ—উচ্ছল
কিরপা—কৃপা
চউখে—চক্ষে
খবইরা—সংবাদদাতা
সরে—সহরে
উদ্দিশে—উদ্দেশে
শাউরী—শাশুড়ী

**"দস্যু কেনারামের পালা"**
আটখুর—আঁটকুড়ো
রাত্তি—রাত্র
ছিকর—শিকর
ভক্তিযুথ—ভক্তিযুক্ত
হালিধান—শালিধান
কুবেতে—কোপে
মাইঝ—মধ্যে
গাহান—গান
শিচিয়া—সিঞ্চন করে
উচিচ্ছল্লা—ছুতো
বৈয়া—বসে
গুছি—গুচ্ছ
ঢুরা—ঢোড়া
ছিমের—শিমের

**"ধোপার পাট"**
বাউড়া—অর্ধোন্মাদ
পিনেস—প্রমোদ তরণী
পশচান—সশস্ত্রসৈনিক
সুরুজ—সূর্য
অলছতলছ—চঞ্চল
বাউন—বেঁটে

পরখাই—পরীক্ষা করিয়া
কাঞ্চে—কক্ষে
বিয়ানে—প্রভাতে
সুত—স্রোত
আশ্রা—আশ্রয়
শরীল—শরীর
বন্ন—বর্ণ
দিশারা—সন্ধান
যুগী—যোগ্য
আদিগুড়ি—আগাগোড়া
করকাইন—করুণ
দুষ্কিনীর—দুঃখিনীর
গীরকাম—গৃহকর্মাদি
দব্ব—দ্রব্য
ঝাপা হোগলাপাতার ঝুড়ি
আচানক—আশ্চর্যজনক
ছানি—ঘরের ছাউনি
হাওড়ের বাকুণ্ডি—বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ঘূর্ণি বায়ু
সাওরে—সাগরে
ভোখে—অনাহারে
আকাইলা—অকাল
উরদিশে-উদ্দেশে
গিরবাস—গৃহবাস

**"কমলা রাণী"**
পাকড়—শিমুল
টাইল—গোলা
কাছাড়ে—নিকটে
আন্দরে—অন্তঃপুরে
সিজিল—নির্মিত হল
পুনাই—সন্তান
বিরুষ—বিরোধ
কুইল—কোকিল

হাওট—সাড়া
ছান—স্নান
তেজশ—তেজস্বী
তন—স্তন
কৈতরা—কবুতর
বনেলা—বন্য
সোইপ্যা—সমর্পণ করে
বেজানা—অজ্ঞাতপূর্ব
হাউস—সাব

"রূপবতী"
বিয়ানবেলা—প্রভাতে
হাত্তি—হাতি
হাযরখানা—নহবতখানা
দীঘড় —দীঘল
পাশাল—প্রশস্ত
পারা—পদন্যাস
ঝালা—আভা
ষুল—ষোল
জুইত—যুক্ত
বিরুণী—পোশাক ঝাড়া বুরুশ
গাউইয়্যা বাজুইয়া—গাইয়ে বাজিয়ে
আবের—অভ্রের
ধৈরয—ধৈর্য
ছালুন—ব্যঞ্জন
ফইজত—লাঞ্ছনা
ফরমাই—ফরমাস
পরথমে—প্রথমে
আবিয়াইত—অবিবাহিত
আবেস্তা—অবস্থা
অইব—হইবে
যোগ্য—জোড়া
পাশাল—প্রশস্ত
জোর—জোড়

ছেড়া—ছেঁড়া
পোষনিয়া—পোষা
বিছানি—বিছানা
কেল্লেশে—ক্লেশে
মাকড়াসা—মাকড়সা
সঁপ্যা—সঁপে
গিরবাস—গৃহবাস
বাগোয়ান—বাগান
যুবাবতী—যুবতী
বেন্নুন—ব্যঞ্জন
ছুরৎজামালি—শ্রেষ্ঠ সুন্দরী
ছাহেবান—পূজা
নিরলক্ষ্যা—জনমানবহীন
চরণদাব—আরোহী
বিছানি—শয্যা
কেলেশ—ক্লেশ
পওবা—পাহারা
পরতীত—প্রতীতি
মইল—মরিল
কোড়া—চাবুক
কাতি—দড়ি, কাঠারি
কসবি—বেশ্যা
মাতবব—মাতব্বর
ট্যাটা—তিন / পাঁচফলাযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র
কাইনী—কাহিনী
ছরাদ্দ—শ্রাদ্ধ

"পীর-বাতাসী কন্যার পালা"
বন্দুম—বন্দনা করি
তেনা—কাপড়ের খণ্ডাংশ
বেবান—কূলকিনারাহীন
চিড়া—ছিন্ন
চিরল—চিকণ
ভেউর—গভীর

গোখা—গোখরো
দৈচ্ছত—বেদনা
সুয়াস—শ্বাস
দহিনালী—দক্ষিণা
ছেউড়াশৈশব—অতি শিশুকাল
জোড়নী—জুড়ি
গদ—অতিভোজনে অজীর্ণতা
ভুখা—ক্ষুধার্ত
ময়ালে—মহলে
কাইনী—কাহিনী

**"সদাগর কন্যা বগুলা"**
ছন্‌ভন্‌—ছিন্নভিন্ন
খিন্ন—ক্ষীণ
উদাম—উদ্দাম
চান্‌—চন্দ্র
শিথানে—শিয়রে
আসছুস—আফশোষ
বেভার—ব্যবহার
সপ্প—সর্প
আলুফা—দুষ্প্রাপ্য
চৈতরের—চৈত্রের
জেঠ—জ্যৈষ্ঠ
পশ্চিমাল—পশ্চিমদিক থেকে আগত
পূবাইল—পূর্বদিক থেকে আগত
কালুকা—আগামীকল্য
পন্নতি—প্রণতি

**"দেওয়ানা মদিনা / আলাল দুলালের পালা"**
খোরল—কোটর
উম—তাপ দেওয়া
লহু—রক্ত
বে-নালে—বেকায়দায়
বেরথা—বৃথা
পালখাইন—পালন করুন
শুতিলা—শয়ন করিল
কুহালে—দুরবস্থায়
তিরুভি—ত্রুটি
ডেরুয়া—কুঁড়েঘর
হিথানে—এখানে
জুলুঙ্গা—খাঁচা
পউরী—প্রহরী
আলুফা—দুষ্প্রাপ্য
গাহান—গান
কাড়ালী—হালের মাঝি
খোশালা—আত্মীয়তা
বড়া—বীজ, আঁটি
পতাবরে—শেষরাত্রে / প্রভাতে

**"কঙ্ক ও লীলা"**
থাকুরা—খেকো
সাটিয়ারা—ষষ্ঠীর
সিলুক—শ্লোক
সুতের—স্রোতের
চান্নি—চাঁদনী
বান্দে—বান্ধে
সাউদের—সাধুর
লুকে—লুকায়
সারগিদ—সাকবেদ
হেকমত—ক্ষমতা
জুহরী—জুহুরী
সমাজি—সামাজিক
থানা—স্থান
ভোগা—ডগা
আলুই—আলুলায়িত
জোয়ার—যোগ্য হয়
খরসুতে—খরস্রোতে

সাজুতীয়ার-সাঁঝের

**"কাজলরেখা"**

মিন্নতি—বিনতি
কিরপায়—কৃপায়
আঙ্গুইট্—আংটি
আত্তি—হাতি
পাল্যা—পালন করে
এরুর—ইহার
বনেলা—বন্য
রইদ—রৌদ্র
দুপইরা—দুইপ্রহর
মির্‌ত—মৃত
সুইচ—ছুঁচ
ঘির্‌তের—ঘৃতের
ছান—স্নান
ঢুইকাই—ঢুকেই
আগু—অগ্রসর
আকিরত—আকৃতি
পুন্নু—পূর্ণ
বাজুইন্যা—বাজিয়ে
মউয়া—মহুয়া
আর্মির্ত্তি—অমৃত
বিদ্দমানে—বর্তমানে

**"দেওয়ানা মদিনা"**

পিয়া—প্রিয়া
শরীল—শরীর
কয়বরে—কবরে
অইয়ো—হইও
পর—প্রহর
অইব—হইব
দন—বিরোধ
এবারে—এদের

গিরধনী-গৃধিনী
ছেউবা—অনাথ / অসহায়
বেথা—ব্যথা
ছেল—শেল
অন্তুম—অন্তিম
পুতেরাম—পুত্রের
অদুন্যাই—অপরিমেয়
জর্ম্মে—জন্মে
বের্ত্তা—বৃথা
গুরজান—গুজরান
দুঃখু—দুঃখ
অইল—হইল
শুন্‌খাইন—শুনুন
বিষুম—বিষম
নছিবেতে—নাসিবেতে
যুদি—যদি
ছিক্কা—শিকা
নির্চয়—নিশ্চয়
বুজএগা- বুজিয়া
লুডায়—লুটায়
কাত্তলা—কবুলত
অখনই—এখনি
ভীডাৎ—ভিটেতে
ইরাধর—হীরাধব
গিরস্থি—গৃহস্থ
বেউস্—বেহুঁশ
উছিলায়—অছিলায়
গির—গৃহ
কানল—কানন
থির—স্থির
অরষিত—হরষিত
আত্তি—হাতী
পেকিয়া—পাকিয়া
তাবিপ - তারিফ

আগুয়াইয়া—অগ্রসর হয়ে
অজজ্বর—অঝোরে
বিরয়ে—বিরহে
কাইনী—কাহিনী
আভাগ্য—অভাগা
কাছারে-কাছে
রইছে—রয়েছে
থান—স্থান

**"ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা"**

আচানক—আশ্চর্য
পরচিমে—পশ্চিমে
নুকা—নৌকা
জুইতর—উপযুক্ত
ভোবন—ভবন
খেসি—আত্মীয়
দহিনালী-দক্ষিণা
ফাউন—ফাল্গুন
শীয়ারে—শিকারে
একিন—যুক্তি
কইবুলি—বলেকয়ে
দইরা—দরিয়া
আউন—আগুন
ছুয়ান—হালবাঁধার দড়ি
কোরে—কূলে
মিক্যা—উদ্দেশে
কঁড়ে—কোথায়
যাইয়ম—যাব
ধৈজ্ঞল—পালের দড়ি ধরে যারা পাল ঘোরায়
ছড়ক—ছটা
পত্তিমা—প্রতিমা
নিত্তিপত্তি—প্রতিদিন
গর্দানাত—ঘাড

সিনা—বক্ষ
ডুপাইত—ডোবাত
সোহাইগ্যা—সোহাগের
পিনুনে—পরণে
বাজুবন—বাজুবন্দ
কেঁকাইলে—কাঁকালে
বর্ক—বর্গ
রিশে—ঈর্ষায়
ভারুয়া—স্ত্রৈণ

**"কমল সদাইগর"**

জাগা—জায়গা / স্থান
কোইলার—কোকিলের
ঘাঁটার আগত—পথের সামনে
পাহির—পুকুর
সুলুপ—ক্ষুদ্রাকৃতির সমুদ্রগামী পোত
আড়ি—বেতের নির্মিত ঝুড়ি
পোতলা—পুতুল
হাপুতা—সন্তান প্রয়াসী জননী
মওলে—মহলে
হাইল্যা—হাল দেয় যে
কামিলা—দিন মজুর
টেণ্ডল—জাহাজের কর্মী
হোঁত—স্রোত
আহাশ—আকাশ
রাতুয়া—রাত্রি
আভাবনা—দুর্ভাবনা
বুগর—বুকের
শুয়া—শুক
চোগর—চোখের
আমাত—নির্বাক
নিপাই—নিভিয়ে
রাউয়া—রবাহূত
ছুয়ানি—জাহাজের কর্ণধার

ডুপিল—ডুবিল
লাখর—লক্ষ লক্ষ টাকার
উবাসে—উপবাসে
পিঁধনে—পরিধানের
কেঁড়া—কাঁটা
মাঝিলা—মাঝারি
কোইলা—কোকিল
কালুকা—কালকে
ছুয়ান—হাল
দহিন—দক্ষিণ
পরখাই—পরীক্ষা
অপসর—অবসর
হোড়া—আঘাত
জিঙ্কারে—গর্জন করে
রিশ—ক্রোধ
ভৈন—ভগিনী
শোর—চিৎকার
পালুনি—পান্তাভাতের জল
বুগত—বুকেতে
চিলিভিলি—বিশৃঙ্খলা
মাথাকঁয়ড়ি—মাথার যন্ত্রণা
পোতলা—পুতুল
দুষ্ক—দুঃখ
তাগর—তাদের
কাটাইল্যা—কাঠুরে
কুতঘাটি—পথের খাজনা

**"আন্ধাবন্ধু"**

ডালুম—ডালিম
রসইয়া—রসিক
খবরিয়া—সংবাদগ্রহণকারী
কাউয়া—কাক
সুরুজ্—সূর্য
ছাও—শিশু
উপখুসী—উপহাস
আউলাপন্থে—অজানাপথে / খোলা রাজপথে
কটরায—কৌটায
দুর্জনিয়া—অনিষ্টকারী
দেওয়ানা—ভাবোন্মাদ
শেজ—শয্যা
কিবান্—কিইবা
অবুলার—অবোলার
লালিম—রক্তিমবর্ণ
গির—গৃহ
পালা—খুঁটি
বেবান—গভীর
আইজ—আজ
উইট্‌ল—উঠিল
সাইগরে—সাগরে
নিদ্দি—নিদ্রা
ফিইর‍্যা—ফিরে
কোথারতণে—কোথা থেকে
থির—স্থির
বইক্ষে—বক্ষে
আঁইক্যা-অঙ্কিত হয়ে
উতাল—উতলা
ভোর বিয়ানে—ভোরবেলায়
ভাণ্ডারা—ভাণ্ডার
রাখন্—রাখা
ডংশিয়া—দংশন করে
ফিইর‍্যা—ফিরে

**"ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালা"**

সূরণ—স্মরণ
পরধান—প্রধান
পেগাম্বর—পয়গম্বর

কইরত--করত
আছলাইন--ছিলেন
আগিয়ার--আগের
শুনখাইন—শুনুন
লগে—সঙ্গে
দিলাইন—দিলেন
সরে—সহরে
খুরলী—অন্দরমহলের ক্ষুদ্র জানালা
টুইয়ের--সর্বোচ্চ চিলেকোঠার
যানার--যাঁহার
বইছুন-বসেছেন, বসুন
পর্জা—প্রজা
খিরাজ—খাজনা
মওর—মোহর
হাউলি—হাভেলি
লাগাত—নাগাদ
ছুরত—রূপ
আরজ—আরজি
কিম্মত—মূল্য
তরাতরি—তাড়াতাড়ি
বন্ন—বর্ণ
পাক্না—পাকা
পুন্নমাসীর—পূর্ণিমার
গোছল—স্নান
বেদিন--অকৃতজ্ঞ / নির্দয়
সামিনা--সাবধান
পরামিশ—পরামর্শ
ভইষ—মহিষ
বেন্নুর—ব্যঞ্জন
খেজালত্তে—বিড়ম্বনায়
কাবিল—কাহিল
উছিলা—অছিলা / অজুহাত
বইল—বসিল
ক্ষেমতা—ক্ষমতা

কাঞ্চ্যা—কাঁচা
খসম—পাত্র / স্বামী
আংকা—অযাচিত
বির্তান্ত—বৃত্তান্ত
সন্দে—সন্দেহ
পইরণ—পরিধান
হায়াত্—পরমায়ু
স্বীকুরি—স্বীকৃতি
সিতারি—শীঘ্র
দেশেরতন—দেশ থেকে
খেদাড়িয়া—খেদাইয়া
অপমাইন্যা—অপমানিত
রণথলা—রণস্থল
মিয়ন্নত—মেহন্নত
পিল—রণহস্তী
শিরগাল্—শৃগাল
চুলি—বক্ষআবরণী
লৌ—রক্ত
নোউর—নূপুর
হাঞ্জাবেলা—সন্ধ্যাবেলা
মামানী—মামাতো
পুত্লা—পুতুল
আকাম—অকার্য

**"আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা"**

বুগর—বুকের
টোবার—ডোবার
পাড়াল্যা—পাড়াপ্রতিবেশী
হাঙ্গা—সাঙা / নিকা
পুইষ্যম—পুষিব
কন্নত্—কোথায়
ঘরজা—ঘরামি
চাডর—মানচিত্র / চার্ট
খুচি—রঙীন ফিতা

আউন—আগুন
জেয়র—অলঙ্কার
টাগা-টোকা
খনা—ডিমপাড়ার গর্ত
লবেজান—হয়রাণ
পুষ্যিম—পোষ্য
ছল্লা—পরামর্শ
গাথ—গর্ত
হাপ—সাপ
ছুয়ানি—কর্ণধার
ফেরুৎ—পতঙ্গ
ছুয়ান—হাল
মউত—মৃত্যু
দুরফু—দুইপ্রহর
বদব—দুর্গন্ধ
বানাউটি—মিথ্যা
গব—গুজব
চিয়নি—ছোটশীতল পাটি
লানছান—লণ্ডভণ্ড

"মণির ওঝা—মাঞ্জুর মাও"
জুয়াপ—জবাব
সুজে—ভাল লাগে
জর- জহর বিষ
আলকাপ—অভিলাষ
পউদ্দের—পদ্মের
বিচাড়ি—খুঁজিয়া
থিয়াস—দুশ্চিন্তা
আজলে—কপালে

"কুমার বীরনারায়ণের পালা"
আঞ্জুক্যা—অন্ধকারময়
হারুইল—টিকটিকি
ভাটি বেইলে—অপরাহ্নে

হিথানে—শিয়রে
মচ্ছি—মাছ
আউগপাছ—অগ্রপশ্চাৎ
চিক্কাইর—চিৎকার
গতাগম্ব-গতায়াত
ভাওযায়—চিন্তা করে
মিঠান—মিষ্টি
ডোংনাও—বড় নৌকার পিছনে বাঁধা ছোট নৌকা
বিচড়ায়—খোঁজে
কুইমর—কুমীর
কাওলা-কাওলি—চিৎকার-চেঁচামেচি
জিউ—জীবন
আঞ্জাদিয়া- দুইহাতে
বর্মাণ্ডের—ব্রহ্মাণ্ডের
আসসি-পশ্যি—পাড়া-প্রতিবেশী
সল্‌কি—সড়কি
তডরস্থ—তটস্থ
গফর—গর্ত
উনা—অল্প
খানছাড়া—উচ্ছন্ন
বেভুল—বেহুঁশ
আবাজ—অস্পষ্ট
আগণ—অগ্রহায়ণ
বাও—বাতাস
দাড়াক—বনস্পতি
পাউড়ি—পাড
খিরাজ—রাজস্ব

"ভেলুয়া সুন্দরী-মদন সাধুর পালা"
ঠুনি—খুঁটি
টুই—মটকা
আবে—অভ্রে
তোয়াঙ্গর—মাতব্বর

খবরিয়া—সংবাদদাতা
সাইসঙ্গত—সঙ্গীসাথী
বেচুনী—মহিলাবিক্রেতা
সল্লাপরামিশ—সলাপরামর্শ
সল্লা—পরামর্শ
পউরী—প্রহরী
অতিক্যা—অতিশয়
মওল্লা—মহল্লা
দাগুারা—ঢেঁড়া
উখেড়া—দমকা

**"বাইন্যা বউ—লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা"**

ময়াল—মহল
ছিয়ান—স্নান
হুডুম—মুড়ি
উপড়া—মুড়কি
রউমাছ—রুইমাছ
পরথ্না—প্রার্থনা
ব্রেথা—বৃথা
উটকি—বমি
মোয়ন—মোহন
নির্চয়—নিশ্চয়
ছত্তর—ছত্র
নামডাকি—বিখ্যাত
পরামিশ—পরামর্শ
কুমইর—কুমির

**"মলয়া কন্যার পালা"**

পবশ্নে—প্রশ্ন করে
মুরুখ—মূর্খ
রণথলাতে—রণস্থলীতে
পওরা—পাহারা
হাইলা—চাষী
নিরল—নির্মল

বিভোলা-বিভোর
পিথিমীর—পৃথিবীর
স্বীকুরী—স্বীকৃতি
গোস্বায়—রাগে
সর্মান, সোর্মান—সম্মান
সাচা—সত্য
নির্ত্য—নৃত্য
ভেউর—গভীর
ভবমণা—ভ্রমণ
গুয়াইল—অতিবাহিত করল
খেতিমা—সুখ্যাতি / যশ

**"হাতি খেদার গান"**

ভেঞ্জি—নিবেদন করি
কিস্তা—কেচ্ছা
জেয়র—গহনা
সুজিব—শোধ করিব
জারৈল—জারুল
কেওর—কাহারও
কাঁট্টাল—কাঁঠাল
হুনি—শুনিয়া
পুগব—পূর্বের
নুকা—নৌকা
বেশোধ—অসাড়
ছুল্লুক—দল / যূথ
ছোড়তা—শুঁড়
হগ্গল—সকল
মাউত—মাহুত
ওদা—ভিজা
তুম্বুরু-তুবড়ি
হোঁসগোঁস—জ্ঞান, হুঁশ
গিবেত্—গৃহে
হাঁজরকালে—সন্ধ্যাবেলায়
আবাজ—আওয়াজ

গরাস—গ্রাস
পাইখপহলে—পাখপাখালি
কস্তে—কোথায়
রোইদর—রোদের
পৈত্য—প্রত্যয়
রাতুয়া—রাত্রে
কঁডে—কোথায়
মৈলান—মলিন
থিল—স্থির
ফাডা—ফাটা
হাওবা—হাওয়া
অগেন—অজ্ঞান
ফিরতুন—পুনরায়
বিরিষরে—বৃষকে
লাফা—লাভ
তিরাই—তৃতীয়া
হোঁতে—স্রোতে
শাক্‌রিদ—সাকরেদ
কুশরে—কুহরে
হদেহদ্—যথাযথ
পোগে—পোকায়
ডুপাত্ত—ডোবাও
পুনী—পুষ্করিণী

**"কাফেন চোরা পালা"**
খাপ্‌দি—ব্যগ্র হয়ে
সোন্দর—সুন্দর
ভোকের—ক্ষুধার
যাইরগই—যাইতেছি
গোজারিয়া—অতিবাহিত হইয়া
গোগরমতন—গোমড়ার মতন
গুণারগাট্টি—পাপের বোঝা
শোয়াস—শ্বাস
ডুপিয়া—ডুবিয়া

খাইল্যা—খালি
ছড়াত্—ঝরণানদী
সিংকাডি—সিঁধ কেটে
জিঙ্কাব—চিৎকার
নিমায়া—নির্মম
হামিক্ষণ—অনুক্ষণ
পুগ—পূর্ব
দুয়ারগ্যা—দ্বারী
মইরগ্যাম—মরে যাব
শুতিল—শয়ন করল
কোয়ানে—কোথায়
অপস্বর—অবসর
উদিস—ব্যাপারি
বয়ান—বর্ণনা
দোতীয়—দ্বিতীয়
মিডা—মিঠা
তয়্সা—তামাসা
পোণর—পোকার
ডাগ—ডাক
বৈরাতী—বরযাত্রী
সোতি—স্রোতা
জোনপহরগ্যা—জ্যোৎস্নাপক্ষের
আজুকা—অদ্য
ভুতর—ভিতরে
সন্ধুক—সিন্দুক
চৌউগ্—চক্ষু
সুরুজ্—সূর্য
বিবিষ—বৃষ
আষ্টপর—অষ্টপ্রহর
লেণ্ডি—লেংটি
সোত স্রোত
কেলা—কলা
ভরমণ—ভ্রমণ
হুতা—সূতা

হাডে—হাটে
মির্গ—মৃগ

**"ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী পালা"**
ময়ালে—মহলে
পওরা—প্রহরা
মাইরল—মারিল
পরামিশ—পরামর্শ
ঝলুঙ্গা—বাণ রাখার তূণ
ঝুকা—বেত নির্মিত শিরস্ত্রাণ
পুতি—পুত্র
মালেমস্ত—বড্ড পালোয়ান
যাইখনে—যখন
শুরে—স্মরণ করে
হাবায়—হাওয়ায়
কন্নে—কর্ণে
কাত্যালির—কার্তিকের ঝড়ে
বির্দ্দমানে-বর্তমানে
অকর্সাৎ—অকস্মাৎ
বজ্জর—বজ্র
যুবাবতী—যুবতী
স্বীকুরী হইল—স্বীকৃত হল
সরে—সহরে
পাশুরা—বিস্মৃত
রুল—রোল
পরামিশ—পরামর্শ
ঘবযুয়ানী—ঘরের অনূঢ়া কন্যা
বুণ্টায়—বৃন্তে
গুয়াই—অতিবাহিত করি
কাতি—নারকেল দড়ি / দা
ছালি—ছাই
উপাক্যা—উপকারী
ফতুরী—নিঃস্ব
আবের—অভ্রের
শেজে—শয্যায়
গুয়াইছ—অতিবাহিত করছ
যোগল—যুগল
ধাতাকাতা—বিধাতা ও কর্তা
দেবাই—ঈশ্বর
দারাক তরু—দেবদারু তরু
বাউড়া—পাগল
দুরক্ষরা কথা—দুর্বাক্য
আশ্রা—আশ্রয়
পৈরণে—পরিধানে
মচ্ছ—মৎস্য
বাকুণ্ডি—ঘূর্ণিবাতাস

**"শীলাদেবীর পালা"**
বিরিক্ক—বৃক্ষ
রাইজ্যত—রাজ্যে
জন্নম—জন্ম
শিশুতকাল—শৈশবাবস্থা
মুরুই—হিসাবপত্তর
গুড়ি—লাথি
ফুম্‌কি—স্ফুলিঙ্গ
মওলে—মহলে
মডুক—মুকুট
চিন—চিহ্ন

**"ছুরত্ জামাল—অধুয়া সুন্দরীর পালা**
হর্য্যা—সরষে
করলা—করলে
ছভাতে—সভায়
ছাহেবান—সাহেব
নছিবে—নসিবে
ছোক—শোক
শল্লা—পরামর্শ
পরসব—প্রসব

কুডি—লাঠি
লাখেরাজ—নিষ্কর
ছফর—সফর
খাউয়া—খাবার লোক
হামকুড়—হামাগুড়ি
অকর্‌স্মাতে—অকস্মাতে
আক্কিতি—আকৃতি
আন্দেস্—অনুমান
ফয়ছানা—ফয়সলা
চুম্পা—চুম্বন
বেকল—ব্যাকুল
তাওয়াই—শূন্য
আগল—অগ্রগণ্য
সরজন—সৃজন
পরখাইয়া—পরীক্ষা করে
কেরদানি—কৃতিত্ব
ছলিকার—ছলনার
আরদশ্—প্রার্থনা
ঘির্ত—ঘৃত

**"কবরের কান্না"**

পেকাম্বর—পয়গম্বর
গিয়ান—জ্ঞান
পাক্‌লা—পাগলা
পরভু—প্রভু
বুগত্—বুকে
আঁইচল—আঁচল
পেড্‌ত—পেটে
ছিবাতলা—বাঁশতলা
পথর—পাথর
পৈত্য—প্রতি
দুধর—দুধের
অহন—এখন
নুনা—লোনা

গড়াক—সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস
মড়কি—মড়ক
টালাটাল—প্রাচুর্য
পহির—পুকুর
চান্নির সোমান—চাঁদের সমান
উড়ন্ত—উদ্ভিন্ন
হামিস্কণ—সর্বদা
পচিমে—পশ্চিমে
কাঁট্রল—কাঁঠাল
মাদ্‌বর—মাতব্বর
হেপজ—মুখস্থ
দুই আক্ত—দুইবেলা
কন্‌তে—কোথায়
কোড়া—ক্ষেত
খেত্যাল-চাষী
হোঁতর—স্রোতের
খিল—ঠিক
ছড়ক্—চমক
অলড়—অনড
মউতেও—মরণেও।
মউত—মৃত্যু
উজ্জাল—জ্বলন্ত
চিক্কিরপাড়ি—চিৎকার করে
জুইতর—মনের মত
চাবত—চাপে
আসান—সান্ত্বনা
টালাটাল—চলাচল
উতর—উত্তর
চৈলর—চাউলের
গরমিবকালে—গ্রীষ্মকালে
উপে—উবিয়া যায়
ডেঁয়া—লাথি
বাঁন—বাঁধ
কন্তে—কোথায়

লালছ—লালসা
পুগর—পূবের
ঘুর— ঘোর
কদু—লাউ
আউন—আগুন
ফানা—আত্মহারা
ঝোঁড়া—খোঁপা
জার—জর্জর
হাঁতুড়ি—সাঁতার
ভিডাত—ভিটায়
তোয়াঙ্গর—ধনী
হুঁজ—ছুয়ি, কাঁচি রাখার পাত্র

**"বারো তীর্থের গান"**
মুরাই—মুড়ি
ছেয়ান—স্নান
প্যাকের—পাঁকের
গোন্দ—দগ্ধ
বোন্দ—বন্ধ
বিদবা—বিধবা
ঠাইরাণ—ঠাকুরাণী
হাইত্যার—হাতিয়ার
কন্নে—কর্ণে
অন্ত্রিম—অন্তিম
পাক--পবিত্র
বাওনরা—ব্রাহ্মণগণ
সোর্মান—সম্মান
কাইনী—কাহিনী
ট্যাহা—টাকা
পিরতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা
লেহাজোহা—লেখাজোখা
টুপরি—ঝুড়ি
পিরতি—প্রত্যেক
মাডি—মাটি

**"শ্যামরায়ের পালা"**
চিরল—চিকণ
বাডিগুডি—বলিষ্ঠ গড়ন
শুয়া—শুকপাখী
দিয়ম—দিব
ডাবুর—ডাবর
ধান্দুরী—দাসী
শেজ—বিছানা
সিখানের—সিঁথির
বাখর—লালমাটি
পরদীম—প্রদীপ
উদলা-খোলা
কুবে—কোপে

**"আয়না বিবির পালা"**
কূলের—কোলের
রুয়া করে—রোপণ করে
কেচেডা বয়সে—কাঁচা বয়সে
কাচি—কাস্তে
উবাসী—উপবাসী
সুজে—সাজে
রাইন্যা—বেনে
সকাল করিয়া—শীঘ্র করে
কিন্যা—কিনিয়া
আরাকারা—উন্মত্ত
আকাইলা—অকালে
লাইমা—নামিয়া
কাইলাজ্বর—কালাজ্বর
ঠেকি হইয়া—সমাজচ্যুত হয়ে
দুবরাজি—পরিষ্কার

## গ্রন্থপঞ্জী

বাংলার লোক-সাহিত্য ; ১ম খণ্ড ; ৩য় খণ্ড ; ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ; ষষ্ঠ সংস্করণ ; ১৯৭৫ ; ডঃ আশুতোষ ভট্টাচায
বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস ; ২য় সংস্করণ ; ১৯৮৬ ; লোকসংস্কৃতি : নানাপ্রসঙ্গ ; ১৯৮০ ; ডঃ বরুণকুমাব চক্রবর্তী
মৈমন সিংহ-গীতিকা ; ৪র্থ সং ; দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত
ময়মনসিংহ-গীতিকা ; সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ; ১ম খণ্ড (১৯৭০), ২য় খণ্ড (১৯৭১), ৩য় খণ্ড (১৯৭১), ৪র্থ খণ্ড (১৯০২), ৫ম খণ্ড (১৯৭৩), ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৭৪), ৭ম খণ্ড (১৯৭৫) ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত।
বাংলা গাথা কাব্য ; ১৯৬২ , ডঃ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ; ৩য় খণ্ড, ২য় পর্ব, পুনর্বিন্যস্ত ২য় সং ; ১৯৮১, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জাতি-সংস্কৃতি ও সাহিত্য ; ১৯৩৮ ; ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোকসংস্কৃতিচর্চা ; ডঃ সুভাষ ব ন্দ্যাপাধ্যায়
আশুতোষ স্মৃতিকথা ; ১৯৩৫, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন
গোপীচন্দ্রের গান, (১৯৫১), ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।
বাংলার লোক-গীত কথা, ১৯৮৬, চিত্তরঞ্জন দেব
ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪, ঢাকা, বাংলাদেশ, ডঃ মযহারুল ইসলাম
লোক-সাহিত্য (২য় খণ্ড), ২য় সং, বাংলাদেশ, ডঃ আশ্‌রাফ সিদ্দিকী
ইতিহাস মালা, ১৮৩২, উইলিয়াম কেরী
বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, ১৯৪০, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
বাদ্যানীর গানের পালা, ১৩৫১, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ
পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৯২৬, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।
পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ১৯২৬, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।
পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ; ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬৯, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৮৫
English & Scottish Popular Ballads (1904), Edited by Helen Child Sargent & George Lyman Kittredge, U. S.A.
The Literary Ballads, London, (1966), by Anne Henry Ehrenpreis.

The English Ballad, London, (1927), by Robert Groves.
The Ballads, London, (1950), by M. J. C. Hodgart.
The Ballad of Tradition, Oxford, (1932), G. H. Gerould.
Simile and Metaphor in the English & Scottish Ballads, New York, (1892), George Clinton Demsmoreodell.
Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, Vol-1 New York, 1949, by Maria Leach.
The Ballad Tree, New York, 1950, Evelyn Kendrick Wells.
The Faber Book of Ballads, London, 1965, Mathew Hodgart
History of the Ballads Proceedings of the British, Volume 4, Professor W. P. Ker.
Popular British Ballads, Cambridge, 1894, R. Brimley Johnson.
The Ballad Revival, 1961, A. B. Friedman.
A History of English Balladry, America, 1973, Frank Egbert Bryant.
Bengali Folk Ballads from Mymensingh and the problems of their Authenticity, 1963, Calcutta, by Dr. Dusan Zbavitel
Folklorists of Bengal, 1965, Sankar Sengupta.
World Perspective (21), Myth and Reality, New York, 1963 Mircea Eliade
The Themes Common to English German Balladry, 1940, Archer Taylor.
Folklore in the English and Scottish Ballads, 1928, L. C Wimberly.
The Ballad in Literature, Cambridge, 1912, T. F. Henderson.
Scottish Ballads Their Evidence & Authorship and origin, 1926, A. Keith.
The Ballad, Cambridge History of Literature, 1908, F. B. Gummere
A Study of Ballad Rhythem, 1936, J. W. Hendren.
Ancient Scottish Ballads, 1827, G. R. Kinloch.
European Balladry, Oxford, 1939, W J. Entwistle.
Scottish Vernacular Literature, 1898, T. F. Henderson.
The Viking Book of Folk Ballads, 2nd Edition, 1961, (New york)
The Popular Ballad Francis B. Gummere, Boston & New York, 1907.
The Ritual Theory of Myth, 1971, London; Joseph Fontenrose.
The Forms of Folklore, 1965, William Bascom.

# নি র্দে শি কা

## বইটি সম্পর্কে একটি অভিমত

প্রাজ্ঞ লোকবিজ্ঞানী ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' (২য় সংস্করণ ১৯৮৬), 'লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ' ১৯৮০ ইত্যাদি গ্রন্থগুলি উপমহাদেশের ফোকলোর চর্চাব ইতিহাসে অনন্য অবদানের স্বাক্ষর হয়ে বেঁচে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

তাঁর আলোচ্য 'গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' (১৯৯৩) গীতিকার ভুবনে গবেষণা ও ব্যাখ্যার এক অনন্য দলিল হয়ে থাকবে। এই গ্রন্থে বিংশ পরিচ্ছেদে আছে গীতিকার উদ্ভব ইতিহাস ও সংজ্ঞা, ব্যালাড ও গীতিকা, গীতিকার প্রকাশ রীতি, গীতিকার রচয়িতা প্রসঙ্গ, গীতিকা চর্চার ইতিহাস, গীতিকার শ্রেণীবিভাগ, গীতিকার বন্দনা অংশ, গীতিকার সমাজচিত্র, গীতিকায় কবিত্ব, গীতিকায় প্রকাশিত মনস্তত্ত্ব, গীতিকায় শ্লীলতা, গীতিকার পাঠান্তর ইত্যাদি। এছাড়াও আছে পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জী, প্রায় ছয়শ পৃষ্ঠার মত।

"...বাংলা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্তমানে এক স্বীকৃত সত্য। আমাদের লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য রসিক মানুযকে সহজেই আকৃষ্ট করে। বিদেশীয় পণ্ডিত গবেষকবাও তাই আমাদের লোকসাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন। আমাদের গীতিকা, লোকসাহিত্যের ভাণ্ডাবে অমূল্য সম্পদ বিশেষ।..বস্তুতঃ আমাদের গীতিকায় এমন ঐশ্বর্য আছে যা সহজেই রসিক মানুষের চিত্তকে আপ্লুত করে..।" ড. চক্রবর্তীর এসব কথা যে কত সত্য তা আমি ১৯৫৮-৬০ ; ১৯৬৩-৬৬ পর্যন্ত বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফোকলোর ইনস্টিটিউট ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে (আমেবিকা) পাঠকালে নিজেই উপলব্ধি করেছি। সেখানে পাঠ্য তালিকায় ড ডি. সি সেন সম্পাদিত Eastern Bengali Ballad (1923-32) ও ছিল--এশিয়ান ফোকলোব শাখায় তা যে কোন ছাত্রছাত্রী পাঠ্য হিসাবে নিতে পারতেন। আমাদের এশিয়ান ব্যালাড পড়াতেন বিশ্ববিশ্রুত লোক বিজ্ঞানী Dr Emond Richmond, Dr. Linda Degh, কখনো চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক Edward C. Dimok (Visiting Professor) একবার গেলেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েব Dr. B. C Barua (Visiting Professor); আমার এখনো মনে পড়ে এইসব বিশ্ববরেণ্য প্রাজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং সেই সঙ্গে ইউরোপীয়ান আমেরিকান গীতিকাব সঙ্গে তুলনা কবে (ম্যাপসহ) আমাদের এই গীতিকাগুলিকেই শ্রেষ্ঠ বলতেন।--যা তিরিশেব দশকেই প্রাজ্ঞ প্রাচ্য-বিদ্যা বিশারদ রোঁমা রোঁলা, ড. সিলভান লেভি, স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, উইলিযাম ডি. এলেন, উইলিয়াম রথেনষ্টাইন প্রমুখ বহু বরেণ্য ব্যক্তিও মন্তব্য করেছেন (দ্রষ্টব্য ভূমিকা : Eastern Bengal Ballads 4 vols 1923-32)।

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য (১৯৯৩) গ্রন্থে বাংলা গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ফুটনোট ও গ্রন্থপঞ্জীর মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন যাব ভিত্তিতে গীতিকা নিয়ে ডক্টরেট পর্যায়েব অনেকগুলি গবেষণা কাজ হতে পারবে এবং ইতিমধ্যে বাংলা গীতিকা নিয়ে উভয়বঙ্গে অন্ততঃ এক ডজন

কাজ হয়েছে যাতে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর নাম পথিকৃৎ গীতিকা গবেষক ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছে। আমার সম্পাদিত তিন খণ্ড 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় (ঢাকা, ১৯৯৫; ২০০৩, ২০০৩) বিভিন্ন সংস্করণে আমি তাঁর নাম বারবার উচ্চারণ করেছি।—এই প্রাজ্ঞ গবেষক নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন—উভয় বাংলায় তাঁর যোগ্য তত্ত্বাবধানে বহু ছাত্রছাত্রী ডক্টরেট পর্যায়ে কাজ করেছেন, করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। আমরা আশা করবো কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগকে আজ তিনি যে পর্যায়ে উন্নীত করেছেন তার ধারাবাহিকতা দিন দিন আরো উজ্জ্বলতর হবে। আমরা প্রাজ্ঞ গবেষক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর সুস্থ দীর্ঘজীবন কামনা করি।